হুমায়ূন আহমেদ

হুমায়ূন আহমেদ
স্মারকগ্রন্থ
১৯৪৮-২০১২

স্মারকগ্রন্থ

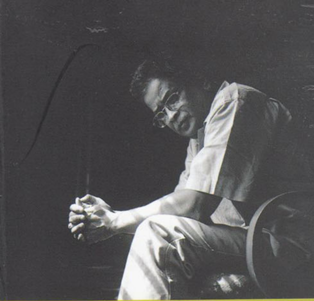

হুমায়ূন আহমেদের ৬৪তম জন্মদিন উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর স্মারকগ্রন্থ। এই বয়সে তাঁর চলে যাওয়ার কথা ছিল না। কালান্তক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার পরেও সবাই যখন আশা করছে যে, তিনি সুস্থ হয়ে ফিরে আসবেন আমাদের মধ্যে, তখনই তিনি চলে গেলেন। জীবনে যেমন, মরণেও তেমনি হুমায়ূন আহমেদ অসামান্য হয়ে রইলেন মানুষের হৃদয়-নিংড়ানো ভালোবাসায়, স্বতঃস্ফূর্ত শোকোচ্ছ্বাসে। তাঁর স্মৃতিচারণ করে কিংবা তাঁর সাহিত্যের আলোচনা করে নানা পত্রপত্রিকায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন কবি ও ছড়াকার, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও সমালোচক, সাংবাদিক ও সম্পাদক, গায়ক ও সুরকার, সংগীত পরিচালক ও টেলিভিশনের প্রযোজক, নাট্যাভিনেতা ও নাট্যপরিচালক, চিকিৎসক ও স্থপতি, সহযোগী ও সহকর্মী, সহপাঠী ও আত্মীয়পরিজন। মূলত এসব লেখাই সংকলিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। বেশ কিছু নতুন লেখাও যুক্ত হয়েছে। তাঁকে হারাবার দুঃখ, তাঁর বিশালতার আভাস, তিনি কেমন করে ছুঁয়ে গেলেন আমাদের জীবন, রাঙিয়ে গেলেন, মাতিয়ে গেলেন, তারই পরিচয় এতে তুলে ধরা হয়েছে।

হুমায়ূন আহমেদ যে কালজয়ী হবেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আমাদের নেই। এর কারণ, নিজের কালকে তিনি প্রবলভাবে আলোড়িত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মানুষের হৃদয়ে তিনি স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। এই সংকলন একইসঙ্গে তাঁর পরিচিতি এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ।

প্রচ্ছদ : মাসুম রহমান
প্রচ্ছদের আলোকচিত্র : নাসির আলী মামুন

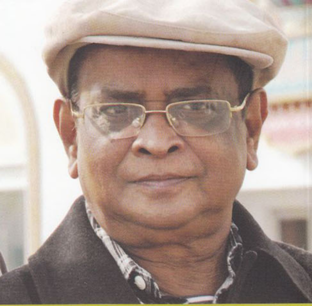

কিংবদন্তি কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে নন্দিত নরকের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ। এই উপন্যাসে নিম্নমধ্যবিত্ত এক পরিবারের যাপিত জীবনের আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন, মর্মান্তিক ট্রাজেডি মূর্ত হয়ে উঠেছে। নগরজীবনের পটভূমিতেই তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস রচিত। তবে গ্রামীণ জীবনের চিত্রও গভীর মমতায় তুলে ধরেছেন এই কথাশিল্পী। এর উজ্জ্বল উদাহরণ অচিনপুর, ফেরা, মধ্যাহ্ন। মুক্তিযুদ্ধ বারবার তাঁর লেখায় ফুঠে উঠেছে। এই কথার উজ্জল স্বাক্ষর জোছনা ও জননীর গল্প, ১৯৭১, আগুনের পরশমণি, শ্যামল ছায়া, নির্বাসন প্রভৃতি উপন্যাস। গৌরীপুর জংশন, যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ, চাঁদের আলোয় কয়েকজন যুবক-এ জীবন ও চারপাশকে দেখার ভিন্ন দৃষ্টিকোণ মূর্ত হয়ে উঠেছে। বাদশা নামদার ও মাতাল হাওয়ায় অতীত ও নিকট-অতীতের রাজরাজড়া ও সাধারণ মানুষের গল্প ইতিহাস থেকে উঠে এসেছে।

গল্পকার হিসেবেও হুমায়ূন আহমেদ ভিন্ন দ্যুতিতে উদ্ভাসিত। ভ্রমণকাহিনি, রূপকথা, শিশুতোষ, কল্পবিজ্ঞান, আত্মজৈবনিক, কলামসহ সাহিত্যের বহু শাখায় তাঁর বিচরণ ও সিদ্ধি।

হুমায়ূন আহমেদের জন্ম ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮ এবং মৃত্যু ১৯ জুলাই ২০১২।

আলোকচিত্র : মাজহারুল ইসলাম

হুমায়ূন আহমেদ
স্মারকগ্রন্থ

সম্পাদনা-পরিষদ

সভাপতি

আনিসুজ্জামান

সদস্য

সালেহ চৌধুরী

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

ইমদাদুল হক মিলন

অন্যপ্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখবন্ধ

এও এক বিপরীতার্থক ব্যাপার যে, যখন হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে তার ৬৪তম জন্মদিন পালনের কথা, তখন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তার স্মারকগ্রন্থ। এই বয়সে তার চলে যাওয়ার কথা ছিল না। কালান্তক ব্যাধিতে সে আক্রান্ত হওয়ার পরেও সবাই যখন আশা করছে যে, সে সুস্থ হয়ে ফিরে আসবে আমাদের মধ্যে, তখনই সে চলে গেল। জীবনে যেমন, মরণেও তেমনি হুমায়ূন আহমেদ অসামান্য হয়ে রইল মানুষের হৃদয়-নিংড়ানো ভালোবাসায়, স্বতঃস্ফূর্ত শোকোচ্ছ্বাসে। তার স্মৃতিচারণ করে কিংবা তার সাহিত্যের আলোচনা করে নানা পত্রপত্রিকায় তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন কবি ও ছড়াকার, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও সমালোচক, সাংবাদিক ও সম্পাদক, গায়ক ও সুরকার, সংগীত পরিচালক ও টেলিভিশনের প্রযোজক, নাট্যাভিনেতা ও নাট্যপরিচালক, চিকিৎসক ও স্থপতি, সহযোগী ও সহকর্মী, সহপাঠী ও আত্মীয়পরিজন। মূলত এসব লেখাই সংকলিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। এতে সাহিত্যবিচার আছে সামান্যই, কেননা এই মুহূর্ত তার অনুকূল নয়। এখন নানাজন যে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে দেখেছেন, তারই কথা। সময় আসবে, যখন হুমায়ূন আহমেদের বহুমুখী প্রতিভার প্রত্যেক দিক নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ হবে এবং তার সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত সংকলন উপহার দেওয়া যাবে পাঠককে। আপাতত তাকে হারাবার দুঃখ, তার বিশালতার আভাস। সে যে কেমন করে ছুঁয়ে গেল আমাদের জীবন, রাঙিয়ে গেল, মাতিয়ে গেল, তারই পরিচয় এতে তুলে ধরা হয়েছে।

হুমায়ূন আহমেদ যে কালজয়ী হবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আমাদের নেই। এর কারণ, নিজের কালকে সে প্রবলভাবে আলোড়িত করতে সমর্থ হয়েছিল। মূলত সে সমকালীন জীবনের কথা বলেছে। নিজেদের চারপাশ অবলোকন করলে আমরা কোনো না কোনো উৎকেন্দ্রিক মানুষের দেখা পাব। এমন উৎকেন্দ্রিক মানুষকে হুমায়ূন অনেক সময়েই তার উপাখ্যানের কেন্দ্রে উপস্থাপন করেছে। হুমায়ূনের আখ্যান সবসময়ে কার্যকারণ-সম্পর্ক মেনে চলে নি। সে আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী ছিল, দুর্জ্ঞেয়তায় আস্থাবান ছিল। অন্যদিকে সাধারণের মধ্যেও সে অসাধারণকে আবিষ্কার করতে পারত। আত্মশক্তিতে তার প্রবল বিশ্বাস ছিল। সহজ, সরল, নিরলংকৃতভাবে সে গল্প বলে গেছে, পাঠক তাতে চমৎকৃত হয়েছে। তার জানাশোনা ও পড়াশোনার পরিধি ছিল ব্যাপক। চরিত্র নির্মাণে কী সংলাপ-যোজনায় তা তার সহায়ক হয়েছে। একাধিক কাহিনিতে একই চরিত্র স্থাপন করে সে শুধু ধারাবাহিকতার সৃষ্টি করে নি, পাঠকদের সঙ্গে তাদের একধরনের আত্মীয়তা তৈরি করেছে।

এও এক আশ্চর্য কথা যে, হুমায়ূন যেখানেই হাত দিয়েছে, সেখানেই সোনা ফলেছে। গল্প-উপন্যাস-নাট্যরচনা, টেলিভিশনের ধারাবাহিক নাটক, চলচ্চিত্র, গান লেখা ও তাতে সুর দেওয়া। সবশেষে সে ঝুঁকেছিল চিত্রকলার দিকে, আলোকচিত্রে উৎসাহ ছিল আগে থেকেই। এত বিচিত্র ক্ষেত্রে একজনের পদচারণা খুব কম দেখা যায়। সাহিত্য-সংগীত-চিত্রকলা-চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঙ্গনে কী রূপ নিয়েছে, সে-সম্পর্কে সে অবহিত ছিল। আবার দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতিও তার বড় টান ছিল। এই পটভূমিতেই সে নিজের সৃষ্টিশীলতার প্রয়োগ করেছে।

মানুষ হিসেবেও তার অসাধারণত্ব ছিল। মানুষের সঙ্গ সাধারণভাবে তার পছন্দ ছিল। সে কৌতুকপ্রবণ মানুষ ছিল। উপস্থিত কারও সম্পর্কে অতিরঞ্জিত কিংবা সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনি বলে তাকে অপ্রস্তুত করতে কিংবা হাসির খোরাক করতে সে ভালোবাসত। মেঝেয় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে গল্প করে যেত। তার প্রাণশক্তি ছিল অফুরন্ত। এই প্রাণশক্তিই তার সম্মোহনের মূলে ছিল কার্যকর।

গাছপালা, পশুপাখি, ফুলফলের প্রতি হুমায়ূনের অগাধ ভালোবাসা ছিল। নুহাশপল্লীতে তার অক্ষয় স্বাক্ষর সে রেখে গেছে।

এই বইতে মানুষ ও শিল্পস্রষ্টা হুমায়ূন আহমেদের সেই বর্ণাঢ্য জীবনের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

হুমায়ূন ত্রুটিশূন্য মানুষ ছিল না। আমরা কেউই ত্রুটিশূন্য নই। তার সৃষ্টির মধ্যেও কিছু ত্রুটি আবিষ্কার করা সম্ভবপর। কিন্তু এসব বহুগুণে ছাড়িয়ে গিয়েছিল তার ইতিবাচক সব গুণ। মানুষের হৃদয়ে সে-কারণেই হুমায়ূন স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। এই সংকলন একইসঙ্গে তার পরিচিতি এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ।

বইতে সংকলিত সকল লেখককে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের। বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি মাজহারুল ইসলাম ও আবদুল্লাহ্ নাসেরকে তাদের উদ্যোগের জন্যে। সকলের মিলিত চেষ্টায়ই বইটির প্রকাশ সম্ভবপর হলো।

নভেম্বর ২০১২ আনিসুজ্জামান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

আয়েশা ফয়েজ/ সোনার পুতলা ৯
আতাউর রহমান/ শিল্প-সাহিত্যের অনন্য কর্ণধার ১৪
আন্দালিব রাশদী/ আমার হুমায়ূন আহমেদ ১৮
আনিসুজ্জামান/ তুমি রবে নীরবে ২৩
আনিসুল হক/ আমাদের স্বপ্নের কারিগর ২৬
আবদুল্লাহ্ নাসের/ তাঁকে ভাবলেই কাহিনিরা ভিড় করে ৩২
আবদুশ শাকুর/ গল্পবলিয়ে হুমায়ূন আহমেদ ৪০
আবেদ খান/ পথভোলা এক পথিক ৪৯
আমীরুল ইসলাম/ হুমায়ূন আহমেদ : শিশুসাহিত্যের রাজা ৫২
আলম তালুকদার/ নুহাশপল্লী থেকে কুতুবপুর ৫৬
আলী যাকের/ বৃক্ষরাজিতে ঠিকানা এবং বৃক্ষ হননের মহোৎসব ৬২
আসাদুজ্জামান নূর/ দেখা-অদেখায় হুমায়ূন আহমেদ ৬৫
আহসান হাবীব/ মহান ফিহা ৬৮
ইমদাদুল হক মিলন/ আমাদের হুমায়ূন আহমেদ ৭১
এইচ এম মনিরুজ্জামান/ হুমায়ূন-সান্নিধ্যে মুহসিন হলের দিনগুলি ৮০
এম এ করীম/ বগুড়া জিলা স্কুলের বাচ্চু ৮৬
গোলাম মুরশিদ/ হুমায়ূন আহমেদ ৯০
গোলাম সারওয়ার/ মহাসিন্ধুর ওপারে তুমি ৯৮
জাহিদ হাসান/ ভালো থাকুন ১০৩
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী/ হুমায়ূন আহমেদ : এক অনন্য উদাহরণ ১০৫
জুয়েল আইচ/ আমাদের শান্তা ক্লজ ১০৮
জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত/ মনে পড়ে, রকি মাউনটেন হাই ১১১
ধ্রুব এষ/ হুমায়ূন আহমেদ এবং আমাদের প্রচ্ছদ ১১৬
নওয়াজীশ আলী খান/ হুমায়ূনের প্রথম প্রহর... ১১৯
নাসরীন জাহান/ ঝকঝকে রোদ শেকড়হীন চাঁদ আর হুমায়ূন আহমেদের গভীর মৃত্যুবোধ ১২৪
নাসির আলী মামুন/ রহস্যকার হুমায়ূন আহমেদ ১২৭
নিয়াজ জামান/ বাংলাদেশের হৃদয়ে হুমায়ূন ১৩৪
পূরবী বসু/ জ্যোৎস্না, বৃষ্টি আর অন্ধকারের গল্প ১৩৮
ফরিদুর রেজা সাগর/ জীবনবাদী হুমায়ূন আহমেদ ১৪৬
বিনায়ক সেন/ মধ্যাহ্নের সমাজ ১৫১

[পরের পৃষ্ঠায় দেখুন]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেলাল চৌধুরী/ দুই গগনের দুই তারকা ১৫৭
মকসুদ জামিল মিন্টু/ এক ক্ষণজন্মা মানুষ হুমায়ূন আহমেদ ১৬৪
মতিউর রহমান/ হুমায়ূনের যুদ্ধ ১৬৭
মফিদুল হক/ রূপবদলের নায়ক হুমায়ূন আহমেদ ১৭০
মহাদেব সাহা/ হুমায়ূনের জন্য অশ্রু আর ভালোবাসা ১৭৫
মাজহারুল ইসলাম/ কেন পিরিতি বাড়াইলেরে বন্ধু, ছেড়ে যাইবা যদি ১৭৮
মাহবুব আজীজ/ জীবন ও মৃত্যু : হুমায়ূন আহমেদের বেঁচে থাকার লড়াই ১৮৮
মাহমুদ আল জামান/ হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে কিছু কথা ১৯৬
মুনিয়া মাহমুদ/ আমি পূর্ণিমার চাঁদ ছুঁয়েছি ২০০
মুনীর আহমেদ/ হুমায়ূন আহমেদ ও যত কথা ২০৪
মুম রহমান/ মায়াবী গল্পের মানবিক জাদুকর ২১৬
মুস্তাফা জামান আব্বাসী/ হুমায়ূন আহমেদের গান ২৩৪
মুহম্মদ নূরুল হুদা/ হুমায়ূননামা-র জন্যে ২৪৮
মোকারম হোসেন/ হুমায়ূন আহমেদের বৃক্ষ-ভুবন ২৫২
মোমিন রহমান/ হুমায়ূন আহমেদ : চলচ্চিত্রের বিষয়আশয় ২৫৮
মোহাম্মদ হাননান/ হুমায়ূন আহমেদের ধর্মচেতনা ২৭৯
রাবেয়া খাতুন/ যাকে হারালাম ২৯৩
রিজিয়া রহমান/ একজন-বহুজন হুমায়ূন ২৯৬
রেজানুর রহমান/ ফ্লাশব্যাক ৩০৭
শফি আহমেদ/ নাট্যকার হুমায়ূন আহমেদ ৩১২
শহিদ হোসেন খোকন/ এসেছিলে তবু আসো নাই ৩২৩
শাওন/ হুমায়ূনের টেপরেকর্ডার ৩২৯
শাকুর মজিদ/ মরিলে কান্দিস না ও হুমায়ূন আহমেদ ৩৩৭
শামসুজ্জামান খান/ হুমায়ূন আহমেদকে যেভাবে দেখি ৩৪৩
শাহাবুদ্দিন আহমেদ/ সিংহহৃদয় হুমায়ূন আহমেদ ৩৪৫
শিহাব সরকার/ নিঃসঙ্গ ভুবনে হুমায়ূন আহমেদ ৩৪৮
সরদার আবদুস সাত্তার/ হুমায়ূন, কান পেতে শুনছি আপনার 'অন্ধকারের গান' ৩৫১
সালেহ চৌধুরী/ হুমায়ূন আহমেদের চরিত্রেরা ৩৫৯
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী/ হুমায়ূনকে স্মরণ-করা ৩৬৪
সিরাজুল কবির চৌধুরী কমল/ হুমায়ূন আহমেদের বডিগার্ড ৩৭৩
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম/ সে বড় অদ্ভুত সময় ছিল ৩৭৫
সৈয়দ শামসুল হক/ হুমায়ূন আহমেদ : তাঁর চলে যাওয়া ৩৮০
হামিদ কায়সার/ হুমায়ূন আহমেদের অচিনপুর : একটি সরল পাঠ ৩৮৩
হামীম কামরুল হক/ হুমায়ূন আহমেদের শূন্যতার শিক্ষা ৩৮৮
হাসান হাফিজ/ নয়নের মাঝখানে নিয়েছে যে ঠাঁই... ৩৯৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনার পুতলা

আয়েশা ফয়েজ

কাজল, সবাই যাকে হুমায়ূন আহমেদ নামে জানে, আমার প্রথম সন্তান। আমার সোনার পুতলা।

ওর জন্মের সময় আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ি। ডাক্তার পর্যন্ত ডাকতে হয়েছিল। অবশ্য ডাক্তার আসার আগেই ওর জন্ম হয়। সুস্থ-সুন্দর সন্তানের মুখ দেখে সমস্ত যন্ত্রণা মুহূর্তেই উবে গিয়েছিল। সবাই খুব খুশি। আমার বাবা ছিলেন পরিবারের প্রথম সন্তান, আমিও আমার বাবার প্রথম মেয়ে, কাকতালীয়ভাবে আমার শ্বশুর ও স্বামীও ছিলেন পরিবারের প্রথম সন্তান। সে কারণেই আমাদের প্রথম সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন আনন্দটা একটু বেশিই ছিল।

'আমার ছেলেবেলা' গ্রন্থের এক জায়গায় হুমায়ূন লিখেছেন: "নভেম্বর মাসের দুর্দান্ত শীত। গারো পাহাড় থেকে উড়ে আসছে অসম্ভব শীতল হাওয়া। মাটির মালসায় আগুন করে নানিজান সেক দিয়ে আমাকে গরম করার চেষ্টা করছেন। আশপাশের বৌ-ঝিরা একের পর এক আসছে, আমাকে দেখে মুগ্ধ গলায় বলছে— 'সোনার পুতলা।' এতক্ষণ যা লিখলাম সবই শোনা কথা। মা'র কাছ থেকে শোনা। কিন্তু আমার কাছে খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। কারণ আমি ঘোর কৃষ্ণবর্ণের মানুষ।"

হুমায়ূন বিশ্বাস না করুক, কিন্তু ছেলেবেলায় ও আসলেই টুকটুকে ফর্সা ছিল। এতটাই ফর্সা ছিল যে ওর ফুফু-খালারা ওকে 'সোনার পুতলা' বলে ডাকত। কেন যে দিন দিন কালো হয়ে গেল ঠিক বুঝলাম না।

এদিকে সবাই ছেলেসন্তান হওয়ায় অনেক বেশি খুশি হলেও আমার স্বামীর প্রত্যাশা ছিল কন্যাসন্তানের। উনি ধরেই নিয়েছিলেন যে আমাদের মেয়ে হবে। সে জন্য কন্যাসন্তানের জন্য জামাকাপড়ও কিনেছিলেন। হুমায়ূনের অনেক ছেলেদের পোশাক থাকলেও ওর বাবা ওকে মেয়েদের পোশাক পরাতে বেশি পছন্দ করতেন। মেয়েদের পোশাকে ওর ছেলেবেলার অনেক ছবিও ছিল।

আরেকটি কথা, হুমায়ূনের বাবা কিন্তু জ্যোতিষ চর্চাও করতেন। তিনি জন্মের পরপরই ছেলেকে দেখে বলেছিলেন—এই ছেলে অনেক বড় মাপের কেউ হবে।

হুমায়ূন আর প্রিন্স চার্লসের জন্ম একই দিনে। একদিন ওর বাবা আমাকে বললেন, দেখো আমাদের ছেলে একদিন চার্লসের মতোই বিখ্যাত হবে। আমি হেসে বললাম, কোথায় রানীর ছেলে আর কোথায় আমার ছেলে! উনি ভীষণ রেগে গেলেন। আমাকে বললেন, তুমি হাসলে কেন? রানীর ছেলে বিখ্যাত হবে পারিবারিক কারণে আর আমার ছেলে বিখ্যাত হবে তার নিজের যোগ্যতায়। তখন তো তাঁর কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু পরে দেখেছি তাঁর প্রতিটি কথাই সত্যি হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন যে অনেক বড় মাপের লেখক হবে—এটিও উনি বলেছিলেন। মনে পড়ে, হুমায়ূনের লেখা প্রথম উপন্যাস 'শঙ্খনীল কারাগার'-এর পাণ্ডুলিপিটি পড়ে উনি খুব উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন, 'তুমি তো অনেক বড় লেখকের মা হতে যাচ্ছ। দ্যাখো ছেলের লেখা পড়ে দ্যাখো। কত চমৎকার লিখেছে! আমাদের ছেলে অবশ্যই একদিন অনেক বড় মাপের লেখক হবে।' উনার নিজেরও সাহিত্যের প্রতি অনেক ঝোঁক ছিল। তার লেখা একটি বইও প্রকাশিত হয়েছিল। আরও বেশ কয়েকটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি ছিল। যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আগুনে সব পুড়ে গেছে।

লেখালেখির বিষয়টি যেমন হুমায়ূন ওর বাবার কাছ থেকে পেয়েছে, স্বভাবও অনেকটা ওর বাবার মতো। তিনিও ছিলেন অন্য ধরনের মানুষ। যেমন একদিন রাতে আমি এবং হুমায়ূনের বাবা সিনেমা দেখে ফিরছিলাম। রিকশাটা একটা দিঘির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমার ওই দিঘিতে গোসল করার ইচ্ছে হয়েছিল। কেননা দিঘির পানি খুবই চমৎকার ছিল। চাঁদের আলোয় পানিটা একদম টলমল করছিল। দেখেই গোসল করতে ইচ্ছে হয়। তো আমি বললাম, ইস! আমি যদি এখন ওই পানিতে নামতে পারতাম! কথাটা বলতেই উনি বললেন, মানুষের জীবন খুবই সামান্য সময়ের। এইসব ছোটখাটো ইচ্ছাগুলো অপূর্ণ রাখতে নেই। আমি বাধা দিয়ে বললাম, কী পাগলামি করছ? উনি বললেন, কোনো অসুবিধা নেই। চলো তো। পরে রিকশাওয়ালাকে দাঁড় করিয়ে রেখেই দুজনে মিলে নেমে পড়লাম পানিতে।

হুমায়ূনের একটা স্বভাব ছিল—মানুষকে চমকে দিয়ে আনন্দ দিতে পছন্দ করত খুব। ওর বাবারও তো এই স্বভাবটা ছিল। বলা যায়, মানুষকে হঠাৎ ভয় দেখানো, নানারকম মজা করা, অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা করে সবাইকে চমকে দেওয়া—এই অভ্যাসটা বাবা-ছেলে দুজনের মধ্যেই প্রবল মাত্রায় ছিল।

হুমায়ূন ছোটবেলায় ভীষণ দুষ্টু ছিল। অদ্ভুত কাণ্ডকারখানায় মেতে থাকত সারাক্ষণ। আর এসব কিছুতে ওর বাবা বাধা তো দিতেনই না বরং সবসময় উৎসাহ দিতেন। একবার হুমায়ূনের কী এক অদ্ভুত খেয়াল হলো, গাছের কাঁঠাল সব পেড়ে ফেলবে। কাঁঠাল পেড়ে ফেললে নাকি লিচু হয়। আমি ওর বাবাকে বললাম সব। তখন উনি আমাকে বললেন, তুমি বোঝ না কেন? নিশ্চয়ই এর ভেতর ওর অন্য ধরনের একটা চিন্তা আছে। আবার একবার ছোট বোনকে সঙ্গে নিয়ে খেতে গেল লঙ্গরখানায়। পুলিশের ছেলেমেয়ে হিসেবে তখনকার কেউ একজন চিনতে পেরে ওদের বাসায় নিয়ে আসে। আমি তো সব কথা শুনে দুজনকে অনেক বকাঝকা করলাম। ওদের বাবাকে কথাটা বললে সব কথা শুনে খানিকক্ষণ হাসলেন। বললেন, লঙ্গরখানায় যারা খায় তারাও মানুষ। তাদের সঙ্গে খেয়েছে বলে রাগ করার কিছু নেই। আমি তখন রাগ করে হুমায়ূনকে বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে, বাইরের খাবার যদি এতই ভালো লাগে তাহলে বের হয়েই যা। লঙ্গরখানাতেই খা। তখন উনি বললেন, তুমি এইভাবে চিন্তা করো কেন? বিষয়টি অন্যভাবে চিন্তা করো। এরপর হুমায়ূনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন লঙ্গরখানায় কেন খেতে গিয়েছিল। তখন হুমায়ূন বলল, কলাপাতায় যখন খাবার দেয়, খাবারটা অনেকখানি ছড়িয়ে যায়। দেখতে তখন বেশ লাগে। খেতেও ভালো লাগে। তখন ওর বাবা আমাকে বললেন, দেখেছ অন্যেরা শুধু খেয়েই গেছে। কিন্তু সেটার মাঝে যে একটা সৌন্দর্য আছে, সেটা কেউ বোঝে নি। তোমার ছেলে সেটা বুঝেছে। ওর মধ্যে আলাদা একটা জিনিস আছে। ও অন্যরকম একটা কিছু করলেই তুমি রাগ করো না। ওর কাছ থেকে বিষয়টা ভালোভাবে শুনো। বিষয়টা চিন্তা করে দেখো।

আরেকটি কথা, হুমায়ূনের জন্মের পর আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। হুমায়ূনকে দেখাশোনা করবে কে ? তাই ওকে নানাবাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের ওই বাড়ির পরিবেশ কিছুটা রহস্যময় ছিল। ওই বাড়িতে যেহেতু হুমায়ূনের শৈশব কেটেছিল, ওই বাড়ি এবং বাড়ির পরিবেশ ওর মনে গভীর দাগ কেটেছিল। হুমায়ূন নিজেই বলত, এই রহস্যময় বাড়িটিই আমাকে সাহিত্যিক বানিয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষ জমিদার ছিল। বাড়িতে পুরনো দিনের অনেক কিছু ছিল।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেছে—কোনো অলৌকিক শক্তি বা কোনো রহস্যময় বিষয় কি হুমায়ূনের মধ্যে ছিল ? আলাদা একটা শক্তি যে ছিল, এটা আমি বিশ্বাস করি। ছেলেবেলায় একবার আমাদের দেশের বাড়িতে রাতে উঠে একবার বলছে—আম্মা, আমি গরুর কথা বুঝতে পারছি। তখন আমি ওকে ধমক দিয়ে বললাম, গরুর কথা আবার মানুষ বোঝে কী করে ? এখন ঘুমাও। তখন আমার ভাই বলল, পাশেই গরুর ঘর আছে। ওর ভুলটা ভাঙিয়ে নিয়ে আসি। গরু পাহারা দেওয়ার জন্য ওখানে তো মানুষ ঘুমায়। ওকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। হুমায়ূনকে কোলে করে নিয়ে আমার ভাই গরুর ঘরের দিকে গেল। গিয়ে দেখে ওই ঘরে যে থাকে সে নেই। ফাঁকি দিয়ে সে রাতে যাত্রা দেখতে চলে গেছে। অর্থাৎ গরুর ঘরে গরু-ই আছে, পাহারা দেওয়ার মানুষ নেই। যা হোক, হুমায়ূন বরাবরই বলত, আমি গরুর কথা বুঝি। তখন আমি জিজ্ঞেস করতাম, আচ্ছা তুই কী বুঝিস, বল। ও বলত, আমি বলতে পারব না। তবে আমি গরুর কথা বুঝি। আমার একটা ধারণা ছিল যে আল্লাহ্ একটা বিশেষ শক্তি ওকে দিয়েছে। ও আসলেই কিছু একটা বুঝতে পেরেছিল। ওর যে বিশেষ একটা শক্তি ছিল—এটা আমি বিশ্বাস করি।

মনে পড়ছে, একটা সময় আমিও মানুষের ভবিষ্যৎ বলতে পারতাম। ওই সময়ে আমি স্বপ্নে যা দেখতাম, সেটা সত্যি হয়ে যেত। কিছু একটা মনে মনে চিন্তা করলে দেখা যেত সেটাও সত্যি হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য আমার স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে এই বিষয়গুলি আর ঘটে না।

হুমায়ূনের বাবার মৃত্যু-প্রসঙ্গ যখন এলই, এই সম্পর্কে কিছু বলি। যুদ্ধের সময় উনি মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তিনি তখন মহকুমা শহরে দায়িত্ব পালন করতেন। উনি সবাইকে বোঝালেন, মিলিটারিরা জেলা শহরগুলো পর্যন্তই আসবে। মহকুমা শহরে তারা আসবে না। পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা ছয় মাসের অগ্রিম বেতন উঠানোর সিদ্ধান্ত নিল। উনি সবাইকে কাজটি না করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কেউ তাঁর কথা শুনল না। এদিকে উনার স্বাক্ষর ছাড়া বেতন ওঠানো তো সম্ভব না। উনি বাধ্য হয়েই স্বাক্ষর করলেন। এরপর সবাই মিলে সেখানকার ট্রেজারি লুট করার সিদ্ধান্ত নেয়। তিনি সবাইকে বোঝালেন, ট্রেজারি জ্বালিয়ে দিলে মিলিটারি এখানে আসবেই। তোমরা এ কাজটি কোরো না। তাঁর কথা কেউ শোনে নি। ট্রেজারি লুট হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে মিলিটারি আসে। তখন আমরা বাবলা নামক একটা জায়গায় ছিলাম। তিনি যখন মিলিটারিদের সঙ্গে দেখা করার জন্য যেতে চাইলেন, আমি তাঁকে যেতে নিষেধ করেছিলাম। তিনি বললেন, পুলিশ কখনো পালিয়ে থাকতে পারে না। যেভাবেই হোক তারা আমাকে খুঁজে বের করবেই। আর যেহেতু আমার তিন ছেলেমেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে, সে কারণে আমাকে একটু বেশিই খোঁজ করবে। এরপর তাঁকে কোর্টে নিয়ে গেল। সেখান থেকে এসডিও আবদুর রাজ্জাক এবং ট্রেজারি অফিসার মিজানুর রহমানে সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনাকেও নদীর পাড়ে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে। লাশ ভাসিয়ে দেয় নদীতে। ওইসময় তহশীলদারকেও ধরে নেওয়া হয়েছিল হত্যা করার জন্য। কিন্তু শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আফজাল হোসেনের পরামর্শে তাকে মিলিটারিরা বাঁচিয়ে রাখে। কারণ তাকে হত্যা করলে অর্থের হিসাবটা ঠিকমতো পাওয়া যাবে না। মৃত্যুর আগে তিনি নাকি বলেছিলেন, আমার ছেলে হুমায়ূন আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নে পড়ে। তাঁকে তোমরা বলো তার বাবাকে অন্যায়ভাবে মিলিটারিরা হত্যা করেছে। তহশীলদার এই কথাটা শুনেছিল। তার এক ভাগ্নে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। তার মাধ্যমেই খবরটা পেয়েছিলাম। তাঁকে হত্যা করার পর কেউ কেউ বলত যে তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে, আবার কেউ কেউ বলত তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। ওই সময় আফজাল সাহেবের সঙ্গে দেখা করলে তিনিও বলেন, তোমার স্বামী বেঁচে আছে। তিনি যে মারা গেছেন—এই কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইতাম না। আমার মেজ ছেলে ইকবাল আমাকে বোঝাত—দেখো, তুমি যদি এভাবে ভেঙে পড় আমাদের কি হবে? যুদ্ধে অনেকের বাবা মারা গেছে। আমাদের বাবাও বেঁচে নেই। তুমি কারো কথা বিশ্বাস করো না। এরও বেশ কিছুদিন পর তাঁকে যারা নদী থেকে তুলে কবর দিয়েছিল, তাদের কাছে সংরক্ষিত থাকা উনার কিছু জিনিসপত্র দেখে তারপর কথাটি বিশ্বাস করি।

হুমায়ূনকেও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ওকে অনেক অত্যাচারও করেছিল। অনেকদিন আগের কথা তো। পুরোটা মনে নেই। সেই সময়ে হুমায়ূন হলে থাকত। একজন শিক্ষক আর ৫-৬জন ছাত্রের সঙ্গে তাকেও ধরে নিয়ে গিয়েছিল। পরে তারা কীভাবে যেন জানতে পেরেছিল যে ওর বাবাকেও আর্মিরা ধরে নিয়ে গিয়েছে। বাবাকে আর্মিরা ধরে নিয়ে যাওয়ার পরও ছেলে হলে রয়েছে জেনে ওর ওপর ভালোই অত্যাচার করে তারা। ওই সময়ে আমার দূরসম্পর্কের এক ভাই আর্মিতে চাকরি করতেন। তারই অনুরোধে খুব সম্ভবত হুমায়ূনকে ছেড়ে দেয়। হুমায়ূন ছিল খুব ভীতু টাইপের একটা ছেলে। আর্মিরা যখন ওকে ছেড়ে দেয়, ও হলে এসে রুমের ভেতর থেকে বাইরে তালা লাগানোর একটা সিস্টেম বের করে। পরে আর্মিরা আবার হলে এসে সবাইকে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু হুমায়ূনের ঘরে তালা দেখে তারা চলে যায়। এই কারণে সে বেঁচে যায়।

এবার একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাই। আমি বই পড়তে ভীষণ পছন্দ করি। আমার স্বামীর বই পড়ার প্রতি ঝোঁক রয়েছে শুনে আমার বাবা আমাকে রবীন্দ্রনাথের *নৌকাডুবি* উপন্যাসটা কিনে দিয়েছিলেন বিয়ের আগে। আর আমি *নৌকাডুবি* উপন্যাস পড়েছি জেনে আমার স্বামী অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মোট কথা, আমি অনেক আগে থেকেই বই পড়তে খুব ভালোবাসতাম। তো যখন হুমায়ূন উপন্যাস লেখা শুরু করল, তখন আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল।

ছেলের লেখা প্রতিটি বইই আমার অনেক প্রিয়। এমনকি যেসব বই সম্পর্কে অনেকে বলে যে বইটি ভালো হয় নি, সেসব বইও আমার অনেক ভালো লাগে। হুমায়ূন লেখা শুরু করার আগে আমি ভারতীয় লেখকদের লেখা অনেক পড়তাম। কোনো বই না পাওয়া গেলে ভারত থেকে আনিয়ে নিতাম। কিন্তু ছেলে লেখা শুরু করার পর অন্য কারও লেখা পড়ার আর প্রয়োজন পড়ে নি। ছেলের লেখা প্রতিটি উপন্যাসই আমার খুবই প্রিয়। এর মধ্যে *বাদশাহ নামদার*, *মধ্যাহ্ন*, *জোছনা ও জননীর গল্প*, আর তার জীবনের প্রথম বই *নন্দিত নরকে* ও *শঙ্খনীল কারাগার* আমার খুবই প্রিয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরেকটি কথা, হুমায়ূনের প্রতিটি বইই আমার পড়া। কেননা বই প্রকাশিত হলেই হুমায়ূন আমাকে তা পাঠিয়ে দিত। আমি ওকে একদিন বললাম, কী চিকন চিকন বই লিখিস! অল্প সময়েই শেষ হয়ে যায়। মোটা বই লিখতে পারিস না—যাতে অনেকদিন ধরে পড়তে পারি ?

যেদিন সত্যি সত্যিই হুমায়ূন এ ধরনের বই লিখল, সেদিন আমি যে অনেক বেশি আনন্দিত হয়েছিলাম—সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বলা যায়, বিমল মিত্রের *সাহেব বিবি গোলাম, কড়ি দিয়ে কিনলাম, আসামী হাজির* এইসব বড় উপন্যাস পড়ে যে আনন্দ পেয়েছিলাম, তার চেয়েও বেশি আনন্দ পেয়েছিলাম।

এবার হুমায়ূনের স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা বলি।... হুমায়ূনের বাবা মানুষের বাড়িতে জায়গীর থেকে পড়ালেখা করেছিলেন। তো আমি ওকে বলেছিলাম, আল্লাহ্ তো তোকে অনেক কিছুই দিয়েছে। তোর বাবা অনেক কষ্ট করে পড়ালেখা শিখেছে। তুই এই এলাকার ছেলেমেয়েদের কষ্ট দূর করার জন্য একটা স্কুল করে দে। এর পরেই ও নেত্রকোনায় 'শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ' নামে বিদ্যালয়টি গড়ে তোলে।

হুমায়ূনের দু'একটি প্রবণতার কথা এবার বলি। ছোটবেলা থেকেই ও বৃষ্টি খুব ভালোবাসত। বিশেষ করে টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার শব্দ ছিল ওর খুবই প্রিয়। শুধু বৃষ্টি নয়, জ্যোৎস্নাও ওর খুব প্রিয় ছিল। জ্যোৎস্নার প্রতি ও খুবই দুর্বল ছিল। ও যখন আমেরিকা থেকে দেশে এল, ওই সময় খুব গরম ছিল। বৃষ্টি হচ্ছিল না। হঠাৎ করেই জোরে বৃষ্টি এল। বৃষ্টির পরে আমরা সবাই বসে আছি, হঠাৎ ও বলল, এই বৃষ্টিটা কেন এল জানেন? আমি বললাম, কেন ? ও বলল, আমি মনে মনে বলেছিলাম—আল্লাহ, আমি এতদূর থেকে এলাম আমার দেশের বৃষ্টি দেখার জন্য আর তুমি আমাকে বৃষ্টিটা দেখালে না! আমার কথা আল্লাহ শুনেছে।

AMARBOI.COM

হুমায়ূন দেশকে অনেক ভালোবাসত। বিদেশে যখন ছিল তখন তো দেশে ফেরার জন্য ছটফট করত। বলা যায়, হুমায়ূন বিদেশ পছন্দ করত না, হাসপাতাল পছন্দ করত না। ডাক্তার পছন্দ করত না। আমি হাসপাতালে গেলে একমাত্র আমাকে দেখতে হাসপাতালে যেত। এমনকি হাসপাতালে যাওয়ার ভয়ে নিজের অসুখ-বিসুখও চাপা দিয়ে রাখত। বিদেশে ও যখন পিএইচডি করতে যায় প্রায়ই বলত, আমি আর পড়ব না। দেশে ফিরে আসব। যে দেশের মানুষ ঠিকমতো খেতে পায় না, সে দেশের মানুষের এত পড়ে কী হবে ? তখন আমি অনেক বোঝাতাম।

হুমায়ূন দেশকে ভালোবাসত, দেশের মানুষকে ভালোবাসত। দেশের মানুষও যে ওকে কত পছন্দ করে, কত ভালোবাসে ওকে—এটা শহীদ মিনারেই দেখলাম; নুহাশপল্লীতে ওকে কবর দেওয়ার সময়ও দেখেছি। কিন্তু এ দৃশ্য আমি কখনোই দেখতে চাই নি। এরচেয়ে অনেক বেশি আনন্দের হতো আমার কবরের মাটি যদি আমার ছেলে দিয়ে যেতে পারত। সন্তানের লাশের সামনে বসে থাকার চেয়ে বড় কোনো কষ্ট একজন মায়ের হতে পারে না।

এখন হুমায়ূন নুহাশপল্লীর লিচুতলায় শুয়ে আছে। জন্মের পর কয়েক বছর ও আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। নানার বাড়িতে নানির কাছে মানুষ হয়েছে। কেননা আমি তখন অসুস্থ ছিলাম। সুস্থ হওয়ার পর যখন আমার বুকের মানিককে কাছে পেলাম, তখন ওকে জড়িয়ে ধরে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম—বাকি জীবন যেন আমার ছেলেকে তিনি সুখে রাখেন; শান্তিতে রাখেন। তা হয় নি। হুমায়ূন সুখ পায় নি; শান্তি পায় নি। তাই পরম করুণাময়ের কাছে আমার প্রার্থনা : ইহলোকে ওকে শান্তি না দিলেও পরলোকে তুমি শান্তি দাও। ওর আত্মা শান্তি পাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্প-সাহিত্যের অনন্য কর্ণধার

আতাউর রহমান

গুণী অথবা সৃজনশীল মানুষ সম্পর্কে লিখতে গেলে সেই লেখা দু'রকমের হয় বলে আমার ধারণা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সম্পর্কে যদি আমাকে লিখতে বলা হয়; তাহলে কেবলমাত্র তাঁদের সৃষ্টিকর্মের গুণগত মান বিচারের লক্ষ্যে আমার অক্ষম কলম সচেষ্ট হবে। কারণ দুই লেখকের একজনকেও আমি ব্যক্তিগতভাবে জানতাম না। আমাদের দেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানতাম; খুব ঘনিষ্ঠভাবে কয়েকবছর মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর সম্পর্কে আমার এই লেখনী প্রয়াসে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গই প্রাধান্য পাবে। কারণ তাঁর উপন্যাস ও গল্পের মান বিচার করার জন্য আমি নিজেকে যোগ্য ব্যক্তি মনে করি না। তাঁর বেশ কয়েকটি টেলিভিশন নাটক ও সিরিয়ালে অভিনয় করে আমি প্রভূত আনন্দ পেয়েছি এবং প্রশংসাও পেয়েছি। হুমায়ূন আহমেদ রচিত ও নির্দেশিত 'সবুজ সাথী', 'সবুজ ছায়া' টিভি সিরিয়াল ও 'হাবলংয়ের বাজার' নাটকে আমি অভিনয় করেছি এবং যথেষ্ট পরিচিতি পেয়েছি। হুমায়ূন রচিত ও নির্দেশিত নাটকগুলো তাঁর উপন্যাস ও গল্পের মতোই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। একথা অনস্বীকার্য যে, আজকের অনেক বিখ্যাত অভিনেতাই হুমায়ূন আহমেদের নাটকে অভিনয় করে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছিল।

হুমায়ূন আহমেদের নাটকে অভিনয় করার সুযোগ পাওয়ার জন্য দেশের প্রথিতযশা অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীরাই উন্মুখ হয়ে থাকত। আজকের বিখ্যাত মানুষ সাংসদ আসাদুজ্জামান নূরও একসময় 'বাকের ভাই' বলে পরিচিত ছিল। নূর অভিনীত তাঁর 'কোথাও কেউ নেই' টিভি সিরিয়াল জনপ্রিয়তার নিরিখে আজও অনতিক্রম্য। তাঁর 'অয়োময়' নাটকেও নূরের অভিনয় ছিল অসাধারণ। 'অয়োময়' হুমায়ূনের এক ব্যতিক্রমী অথচ জনপ্রিয় নাট্য রচনা হিসেবে সবসময় বিবেচিত হবে। তাঁর নাটক বিটিভি'র যে প্রযোজকই নির্মাণ করেছেন তিনিও সুনাম অর্জন করেছেন বিপুলভাবে। এইভাবে হুমায়ূনের নাটকে অনবদ্য অভিনয় করেছেন নূর ছাড়াও আবুল খায়ের, সালেহ আহমেদ, জাহিদ হাসান, মোজাম্মেল হক, নাজমা আনোয়ার, সারা যাকের প্রমুখ। মঞ্চের বিখ্যাত নট ও নির্দেশক আলী যাকের হুমায়ূন আহমেদের 'আজ রবিবার' নাটকে অভিনয় করে 'মামা' নামে পরিচিত ছিলেন বহুদিন। হুমায়ূন আহমেদের কাছের লোক হিসেবে আমি বেশ কয়েকজন তরুণ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছ থেকে হুমায়ূন আহমেদের নাটকে অভিনয় করার জন্য নিয়মিত অনুরোধ ও উপরোধে উত্ত্যক্ত হতাম। আমি কয়েকজনের জন্য হুমায়ূনের কাছে তদবিরও করেছি।

আমি হুমায়ূন আহমেদের *নন্দিত নরকে* উপন্যাস পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম এবং এই উপন্যাসের টিভি নাট্যরূপ দেখেও ভালো লেগেছিল। তাঁর *শঙ্খনীল কারাগার* উপন্যাস পড়ে এবং এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন দেখেও আমি প্রীত হয়েছিলাম। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে, হুমায়ূনের *নন্দিত নরকে*-র জনপ্রিয়তার পাশাপাশি এর সাহিত্যমূল্যও অপরিসীম। 'শঙ্খনীল কারাগার' চলচ্চিত্রটি আমার হৃদয়গ্রাহী মনে হয়েছে। আমি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার 'জুরি বোর্ডের' সদস্য হিসেবে বছর তিনেক আগে তাঁর নির্মিত 'আমার আছে জল' দেখেছিলাম। এই ছায়াছবিটিও আমার কাছে নতুনের স্বাদ নিয়ে এসেছিল। এই ছায়াছবির অপূর্ব সুন্দর ক্যামেরায় কাজ করেছে চিত্রগ্রাহক মাহফুজুর রহমান খান। পরিচালক হিসেবে এই ফটোগ্রাফির অনেকখানি কৃতিত্ব ছিল হুমায়ূন আহমেদের। হুমায়ূন আহমেদের 'ঘেটুপুত্র কমলা'র খুব সুনাম শুনেছি, কিন্তু এখনো আমার দেখা হয়ে ওঠে নি। 'ঘেটুপুত্র কমলা' আমেরিকার অস্কার চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় বিদেশি চলচ্চিত্র হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছে। আশা করি চলচ্চিত্রটি সাদরে বিদেশি দর্শকদের কাছেও গ্রহণীয় হবে। হুমায়ূন আহমেদের লেখা এবং নির্দেশিত টিভি নাটক অথবা চলচ্চিত্র মানেই 'সুপার হিট', অর্থাৎ অতি জনপ্রিয় সৃজন হিসেবে দর্শক নন্দিত হতো।

হুমায়ূন আহমেদের লেখার প্রসঙ্গে সামান্য কিছু অনুভবের কথা ব্যক্ত করি। খুব সম্ভবত তিনি শরৎচন্দ্রের পরে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক। তাঁর মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা তিনশ'রও অধিক। নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যের কোনো লেখক কেবলমাত্র বই লিখে এত বিশাল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেন নি। আমি নিজ চোখে দেখেছি, ২১শে ফেব্রুয়ারি বইমেলার আগে হুমায়ূন বই লেখার জন্য কত বিশাল অঙ্কের অর্থ আগাম হিসেবে পেতেন। হুমায়ূনের গল্পের বই অথবা উপন্যাস মানেই বাজিমাত। তরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা নেশাগ্রস্তের মতো তাঁর যে-কোনো লেখা গিলত এবং আজও তাঁর জনপ্রিয়তা এতটুকু ম্লান হয় নি। সামনের ২১শে বইমেলায়, আমি নিশ্চিত যে, তাঁর জনপ্রিয়তার পরিচয় আরও বেশি করে পাওয়া যাবে। হুমায়ূন আমাকে প্রায় প্রশ্ন করত যে, জনপ্রিয়তার সঙ্গে গভীরতার সংঘর্ষ আছে কি না ? আমি প্রায়ই পাশ্চাত্যের লেখকদের উপমা টেনে বলতাম, জনপ্রিয় বইও গভীর হতে পারে। লিও টলস্টয়ের *ওয়ার এন্ড পিস*-ই তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। আমি, 'শার্লক হোমস'-এর স্রষ্টা আর্থার কনল ডয়েলের প্রসঙ্গও উত্থাপন করতাম। হুমায়ূন ছিল এক অনন্য কথক, যিনি অতি কঠিন বা দুরূহ বিষয় অত্যন্ত সহজভাবে উপস্থাপন করতে পারতেন। তাঁর লেখায় এক অনাস্বাদিত রঙ্গ-রস আছে এবং কিছু অদ্ভুত ও অচেনা মানুষের দেখা পাওয়া যায় তাঁর উপন্যাস ও গল্পে। তাঁর লেখার ঢংটি ছিল আটপৌরে, তাই সহজ। তিনি মাঝে মধ্যে জীবনের কথা বলতে গিয়ে আমাদেরকে রূপকথা ও কল্প-কথার জগতে নিয়ে যেতেন। তাঁর সাহিত্যকর্মে কিছু অভিনব প্রতীক ও রূপলঙ্কারের ব্যবহার আছে যাতে কোনো প্যাঁচ নেই, তাই সহজবোধ্য। এই কারণে 'হিমু'র মতো একাধিক রোমাঞ্চকর, অচেনা অথচ প্রিয় চরিত্র উনি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

বয়েসে হুমায়ূন আহমেদ আমার সাত বছরের ছোট ছিলেন। আমাকে আতাউর ভাই বলে ডাকতেন। হুমায়ূন আহমেদকে রসায়নশাস্ত্রের কৃতী অধ্যাপক এবং লেখক হিসেবে দূর থেকে চিনতাম। ১৯৯৮ সালের আগে ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। আমাদের পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে। ইস্ট এশিয়াটিক কমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড কোনো সোস্যাল প্রোগ্রামের অধীনে 'এইডস' রোগের ভয়াবহতা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক একটি নাটকের সিরিয়াল লেখা এবং নির্দেশনা দেওয়ার জন্য হুমায়ূন আহমেদকে অনুরোধ জানান। হুমায়ূন রাজি হন, আসাদুজ্জামান নূরের সঙ্গে তাঁর নিবিড় বন্ধুত্বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণে। আসাদুজ্জামান নূর 'এশিয়াটিক'-এর অন্যতম পরিচালক। 'এশিয়াটিক'-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলী যাকের এবং অন্যতম পরিচালক সারা যাকেরের সঙ্গেও হুমায়ূনের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। সিরিয়ালটির নাম ছিল 'সবুজ সাথী'। টিভি নাটক হিসেবে অত্যন্ত সুলিখিত ছিল সিরিয়ালটি। এশিয়াটিক-এর ক্লায়েন্ট গোঁ ধরে বসেছিল যে, হুমায়ূন আহমেদের মতো নামি লেখককে দিয়ে নাটকটি লেখানো হোক। আমাকে এই সিরিয়ালে জাহিদ হাসানের শ্বশুরের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য এশিয়াটিক মনোনীত করেছিল। চরিত্রটি ছিল অভিনব, জীবনে অসফল একজন মানুষ; যে পেশায় যায় সেখানেই সে অকৃতকার্য হয়। চায়ের দোকান দিয়ে নিজেই দোকানের সব চা খেয়ে ফেলে। একেবারে অপরিণামদর্শী একজন মানুষ। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পোশাক-আশাকে জীর্ণ ও সর্বোপরি 'বেচারা' ধরনের। শাওন আমার কন্যার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। হুমায়ূন এশিয়াটিক-এর এই পছন্দকে একেবারে অপছন্দ করলেন। তিনি নূরকে প্রশ্ন করেছিলেন, এমন শহুরে মার্কা, শক্ত চোয়ালসম্পন্ন এই বুদ্ধিজীবি মার্কা লোককে কেন তাঁরা এই চরিত্রে পছন্দ করলেন ? নূর বলেছিল, লোকটা পারবে। আমি মঞ্চনাটক 'দেওয়ান গাজীর কিস্সায়' তখনো 'মোক্তার' নামে একটি হতচ্ছাড়া-নোংরা চরিত্রে অভিনয় করছি এবং অনেকেই আমার অভিনয়ের প্রশংসা করেছে। তখনো 'নুহাশপল্লী' গড়ে উঠে নি। পুরো নাটকটির শুটিং হয়েছিল 'মনিপুরী পাড়ায়'। 'মনিপুরী পাড়া' বর্তমান নুহাশপল্লী থেকে খুব দূরে নয়। যাহোক, হুমায়ূন আহমেদেরই ঘাড়ে পড়লাম আমি, তিনি তাঁর স্পোর্টস কারে করে আমাকে আমার বড় মগবাজারের বাসা, সেঞ্চুরী এস্টেট থেকে তুলে নিলেন। পথে হুমায়ূন আহমেদ অর্ধেক নোয়াখাইল্লা এবং অর্ধেক চাটগাঁইয়া মানুষটির একটি অপরিশোধিত রূপ দেখে খুব খুশি হলেন। আমার নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের খিস্তি খেউড় এবং রসবোধ তাঁকে তৃপ্ত করল।

আমার দেশ নোয়াখালীতে এবং স্কুল ও কলেজ জীবন চট্টগ্রামে অতিবাহিত হয়। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার জন্য ১৯৬০ সালে ঢাকায় আসি। আমিও বিজ্ঞানের ছাত্র এবং হুমায়ূন ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। সেখানেও একটা বন্ধুত্বের যোগসূত্র হুমায়ূন খুঁজে পেলেন। হুমায়ূনের সঙ্গে খুব জমে গেল। আমার জীবনের অন্যতম সেরা সময় কেটেছে মনিপুরী পাড়ায় 'সবুজ সাথী' নাট্য-সিরিয়াল শুটিংয়ের সময়। নূর, জাহিদ হাসান, আবুল খায়ের, হুমায়ূন আহমেদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্থপতি করিম, ডাক্তার করিম, প্রকাশক আলমগীর এঁদের সমভিব্যাহারে সময় যেন উড়ে যেত। শুটিংয়ের সঙ্গে সমান তাল রেখে আড্ডা ও হুল্লোড় চলত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'সবুজ সাথী' সিরিয়াল আমেরিকার 'এমি' এওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হয়েছিল। আড্ডার মধ্যমণি ছিল হুমায়ূন আহমেদ স্বয়ং।

হুমায়ূন আকাশছেঁড়া কৌতুক এবং মজার সব ব্যাপারের জন্ম দিত। এমন কৌতুক প্রিয় এবং রসিক মানুষ আমি জীবনে কম দেখেছি। এমন সিরিয়াস মুখ বানিয়ে আমি কাউকে কৌতুক করতে দেখি নি। হুমায়ূন ব্যক্তিগত জীবনে একটি লুকিয়ে থাকা এবং মুখচোরা গোছের মানুষ ছিলেন। উনি তাঁর ব্যক্তিত্বের লাগাম ছেড়ে দিতেন কেবল মাত্র খুব চেনা-জানা বন্ধু-মহলে। আমি এইভাবে হুমায়ূনের ঘনিষ্ঠ চক্রের একজন সদস্য হয়ে গেলাম। হুমায়ূনের অভিনব রসবোধ এবং জীবন যে হাডুডু, ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলার মতোই একটি খেলা এই বোধের প্রতিভাস তাঁর জীবনাচরণে যেমন দেখা যেত, তেমনি তা প্রতিফলিত হতো তাঁর সৃজনশীল বিভিন্ন লেখায়। আমার মাঝে মাঝে মনে হতো হুমায়ূনের কাছে কৌতুকের আরেক নাম 'জীবন'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আমাকে শ্রদ্ধা করত এবং পছন্দও করত। তার প্রমাণ পেয়ে গেলাম তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের কিছুদিনের মধ্যেই। ১৯৯৮ সালে কলকাতার বইমেলা থেকে প্রকাশিত হুমায়ূন আহমেদের *স্বনির্বাচিত গল্প* লেখক আমাকে উৎসর্গ করলেন। বইয়ের উৎসর্গপত্রে লেখা—'সখা প্রিয় নাগরিকের আতাউর রহমানকে'। আনন্দে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। এমন গৌরব এবং ভালো লাগার মুহূর্ত আমার জীবনে কম এসেছে। বইয়ের সব কটা গল্প পড়ে ফেললাম। যে-কোনো বড় লেখকের গল্পের মতোই ভালো লাগল। তারপরের ঘটনা ছোট করেই বলি। আমাদের সামনে নুহাশপল্লী গড়ে উঠল। অনেক সুখ-দুঃখ-ভালো লাগার কাহিনিতে ভরে উঠল নুহাশপল্লী। আমি হুমায়ূনের বেশ কয়েকটি নাটকে অভিনয় করে জনপ্রিয় হয়ে উঠলাম। কোনো কোনো তারাভরা রাতে নুহাশপল্লীর প্রশস্ত উঠানে বসে হুমায়ূনের সঙ্গে গভীর রাত পর্যন্ত আড্ডায় মেতে থাকতাম। তাঁর আকর্ষণ ছিল চুম্বকের মতো। আমার আগে হুমায়ূন একুশে পদক পেয়েছে। আমাকে বলত—'আতাউর ভাই জাতীয় সম্মাননা কিন্তু বেশ আনন্দের, আমি আশা করি আপনি মঞ্চনাটকের নির্দেশক এবং অভিনেতা হিসেবে এই সম্মাননা পেয়ে যাবেন'। আমি ২০০১ সালে একুশে পদক পাওয়ার পরে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন।

অনেক দিন খোলা আকাশের নিচে বসে ইহলোক-পরলোক-পৃথিবী-চাঁদ-সূর্য-নীহারিকা মণ্ডল থেকে শুরু করে নিয়ে প্রাণী জগৎ ও উদ্ভিদ জগৎ নিয়ে অনেক আড্ডা দিয়েছি। বিশ্ব চরাচর ছিল আমাদের দুজনেরই প্রিয় বিষয়। এই বিশ্বের রহস্যময়তা আমাদের দুজনকে মুগ্ধ করত। আমরা দুজনে বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও বিশ্বাস করতাম যে বিজ্ঞান সব প্রশ্ন ও রহস্যের উত্তর দিতে পারে না। এই ধরনের একটি আড্ডায় আবিষ্কার করেছিলাম আমেরিকা থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়া একজন অত্যাশ্চর্য মেধাবী রসায়নবিদকে। আমেরিকাতে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে একটি মোটরযান নির্মাণ কোম্পানির সমস্যার সমাধান তিনি কীভাবে করেছিলেন তা শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম। মোটরযান নির্মাণের পরপরই ঝকঝকে যানটির রং দু'একদিনের মধ্যে ফেটে যেত। হুমায়ূন আবিষ্কার করেছিলেন যে, পাশের এয়ারপোর্ট থেকে ফাইটার প্লেন উড্ডীন অবস্থায় যখন 'সাউন্ড ব্যারিয়ার' অর্থাৎ শব্দের গতি অতিক্রম করত তখন পাশের মোটরযান কারখানার রঙ করা মটরগুলোর রঙ পরিবেশে উত্থিত কম্পনে ফেটে যেত।

হুমায়ূনের সঙ্গে আমার গভীর বন্ধুত্ব ৬-৭ বছরের মতো স্থায়ী ছিল। আমরা বন্ধুরা একসঙ্গে নেপাল গিয়েছিলাম। সেখানেও টিম লিডার-কাম-মধ্যমণি ছিল হুমায়ূন। পরের দিকে হুমায়ূনের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে দেখা হতো ঢাকা ক্লাবের আড্ডায়। হুমায়ূন উষ্ণ সম্বোধনে আমাকে গ্রহণ করত এবং নানা রসিকতা করত। আসলে আমি মঞ্চনাটকের কাজ ও নিজের দাপ্তরিক কাজে তেমন সময় দিতে পারতাম না। হুমায়ূন প্রশংসা করে বলত, 'আতাউর ভাই, আপনি রবীন্দ্রনাথকে খুব ভালো বোঝেন'। শুনে আমার গর্ববোধ হতো। এমন একটি গুণী, জ্ঞানী এবং অনন্য প্রতিভাবান লেখক আমাদেরকে অকালে ছেড়ে গেলেন, এই দুঃখ আমার শুধু একার নয়, বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের থেকেই যাবে। তাঁর বিদেহী আত্মার উদ্দেশে বলি, 'সম্মুখে শান্তি পারাবার ভাসাও তরি হে কর্ণধার'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার হুমায়ূন আহমেদ

আন্দালিব রাশদী

হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আমার কখনো সশরীর সাক্ষাৎ হয় নি। এমনকি তাঁর ১০০ হাতের মধ্যেও আমার আসার সুযোগ হয় নি। এমন নয় যে 'পাবলিক ক্যারিয়ার ৫টন সমগ্র বাংলাদশ' শক্তিমান ট্রাকের মতো পশ্চাদ্দেশে লিখে রেখেছেন : ১০০ হাত দূরে থাকুন। আমার এই কখনো দেখা না হওয়ার ব্যাপারটি কথাসাহিত্যিক মঈনুল আহসান সাবেরকে বলেছিলাম, তাঁর ষাটতম জন্মদিনে সম্ভবত। আমার এই 'না দেখার' খানিকটা পূরণ করার জন্য রাতের বেলা তাঁর বাসা থেকে সাবের আমাকে ফোন করে বললেন, 'হুমায়ূন ভাইয়ের জন্মদিন। উইশ কর।'

ততক্ষণে ফোন হুমায়ূন আহমেদের হাতে। তাঁর কণ্ঠের 'হ্যালো' শুনে আমি তাঁরই গল্পের ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মানুষের মতো তোতলাতে থাকি। উইশ করতে হলে আমার কোন কথাটি বলতে হবে আমি তা সাজিয়ে বলতে ব্যর্থ হই। তবুও নিশ্চয়ই আস্থাহীন বক্তার মতো মিনমিন করে কিছু একটা বলেছিলাম। বরং তিনিই বললেন, একেবারে নিজস্ব স্বরে, নিজস্ব ভাষায়, দ্রুতলয়ে, 'আপনি কেমন আছেন? আসেন না একদিন।'

তঁর সঙ্গে এইটুকু আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ।

তারপর আরও কয়েকটি বছর খুব দ্রুত কেটে গেল। আমার আর সুযোগই হলো না ১০০ হাতের মধ্যে যাওয়ার না দূর থেকে কথা বলার।

২

মারিয়ো বার্গাস য়োসার বিখ্যাত 'প্যারিস রিভিও সাক্ষাৎকার' থেকে একটুখানি টেনে আনছি। য়োসা বেশ লিখে চলেছেন, বন্ধুদেরও কাউকে কাউকে ডিঙিয়ে যাচ্ছেন। সে সময়কার একটি প্রকাশনায়... 'এই লেখাটিতে আমাকে অপমান করা হয়েছে এবং আমার সম্পর্কে মিথ্যে কিছু কথা ছাপা হয়েছে। লেখাটা আমি (পাবলো) নেরুদাকে দেখলাম। পার্টির মাঝখানেই (টেমস নদীতে নৌকায় পাবলো নেরুদার জন্মদিনের পার্টি) তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন : তুমি বিখ্যাত হতে যাচ্ছ। তোমার জন্য কী অপেক্ষা করছে আমি চাই তুমি তা জেনে যাও—তুমি যতই বিখ্যাত হবে, এভাবে তুমি ততই আক্রমণের শিকার হবে। প্রতিটি প্রশংসার জন্য দুটো বা তিনটে নিন্দা থাকবেই। আমার তো এক সিন্দুক ভর্তি সব ধরনের অপমান, কুখ্যাতি ও শঠতার দলিল জমা হয়ে আছে। আমাকে একটি অপবাদ থেকেও রেহাই দেওয়া হয় নি— চোর, বিকৃতমনা, বিশ্বাসঘাতক, শঠ, ব্যভিচারী স্ত্রীর স্বামী... সবই বলেছে। তুমি যদি বিখ্যাত হও তা হলে এর মধ্য দিয়েই তোমাকে যেতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেরুদা সত্য কথা বলেছেন, তাঁর দেওয়া পূর্বাভাস চরম সত্যে পরিণত হয়েছে। **কেবল এক** সিন্দুকই নয়, বহু স্যুটকেস ভর্তি এসব রচনা—যাতে মানুষের জানা সব ধরনের অপমানই আমাকে করা হয়েছে।'

হুমায়ূন আহমেদের বেলায় সম্ভবত, সম্ভবত বলি কেন বাস্তবিকই তাঁর খ্যাতি সহ্য করতে অসমর্থ প্রায় সকলেই বৈরী ভূমিকাটিই পালন করেছেন।

শঠতার আরও তীব্র দৃশ্যটি দেখা গেছে তার মরদেহ ঘিরে তাদেরই প্রবল মায়াকান্নায়।

আমি হুমায়ূন আহমেদের পরম ভক্ত পাঠকদের একজন নই, আবার বিদেশি বইয়ের ব্যাক ফ্ল্যাপ পড়া যে পাঠক ফুৎকারে হুমায়ূন আহমেদকে উড়িয়ে দেন আমি তাদের দলেও নই। আমি আমার মতো করেই হুমায়ূন আহমেদ পড়েছি, আমার মতো করেই উপসংহার টেনেছি : যে লেখক তাঁর পাঠক সৃষ্টি করতে পারেন নি মহাকাল তার কী মূল্যায়ন করবে, ততদিন অপেক্ষা করে দেখে যাওয়ার সুযোগ তার পাওয়ার কথা নয়। লেখকের কীর্তি একান্তই তার নিজস্ব; বুদ্ধিজীবী একে ভালো বললেন কি মন্দ বললেন তাতে কিছু এসে যায় না।

হুমায়ূন আহমেদ এই সত্যগুলো খুব ভালো করে জানতেন বলেই তিনি কেবল পাঠকের জন্যই লিখেছেন। পাঠক তাঁর প্রতিদান জীবদ্দশায় দিয়েছেন, তাঁর মৃত্যুতে পাঠকের সঞ্চিত প্রতিদানে যে অলঙ্ঘনীয় হিমালয় সৃষ্টি হয়েছে বুদ্ধিজীবীরা নিশ্চয়ই তা দেখেছেন। সমকালের পাঠকই হোন কি আগামীকালের—লেখকের বেঁচে থাকা পাঠকের সাড়াতেই।

. . .

লেখালেখির কিঞ্চিৎ সুযোগে হালে বিনে পয়সায় কয়েকটি ঈদসংখ্যা পাচ্ছি। কিন্তু বহু বছর ধরে আমার ঈদসংখ্যা কেনার পূর্বশর্ত ছিল একটাই—হুমায়ূন আহমেদের লেখা আছে তো ? থাকলে ঈদসংখ্যার দামটা উঠবে। আমার হাত ঘুরে অন্তত আরও পাঁচজন পাঠকের হাতে পৌঁছবে। তাদেরও আগ্রহ হুমায়ূন আহমেদের লেখাটির জন্যই। ঈদসংখ্যা কেনার এই ফর্মুলাটি কেবল আমার নয়, বাংলাদেশের হাজারো ক্রেতার।

এই ফর্মুলার প্রয়োগ এখন আর কেমন করে করব ? ঈদসংখ্যাগুলো নিউজ স্ট্যান্ডে নেমে আসবে। পাঠক এক পাতা দু'পাতা করে সূচিপত্র উল্টাবেন। স্পষ্ট শুনতে পাবেন সূচিপত্র উল্টানো পাঠকের দীর্ঘশ্বাস।

না, হুমায়ূন আহমেদের লেখা নেই।

এই দীর্ঘশ্বাসটি আমাকে এবং আমার চেয়েও অনেক বেশি হুমায়ূনভক্ত পাঠককে ফেলতে হবে বছরের পর বছর। কত বছর কে জানে!

আমার বয়স তখনো কুড়ি ছোঁয় নি। *বিচিত্রার* এমনি একটি বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হলো হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস *নির্বাসন*।

উপন্যাস পড়ে কষ্ট পাওয়ার অভিজ্ঞতা তখন আমার হয়েছে। কিন্তু উপন্যাস পড়ে কাঁদার অভিজ্ঞতাও যে হতে পারে—*নির্বাসন* আমাকে দিয়ে তা-ই করাল। ভাবলাম ব্যাপারটা 'মেয়েলি ধরনের' হয়ে গেল। সুতরাং মাস ছয়েক পর নিজের পুরুষালি ধরনটাকে সচেতনভাবে জাগিয়ে *বিচিত্রার* পাতা উল্টে আবার *নির্বাসন* পড়তে শুরু করলাম। জরী বধূবেশে চলে যাচ্ছে। আনিস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপর থেকে দেখছে। এ পর্যন্ত আসার পর আমার প্রতিরক্ষা ব্যূহ খানখান করে ভেঙে গেল। আমি আবার সেই আগের মতোই কেঁদে ফেললাম। তারপর ছ'মাস এক বছর পরপর *নির্বাসন* পড়া আমার নেশায় পরিণত হলো—আমার যখন কাঁদতে ইচ্ছে করে আমি *নির্বাসন* নিয়ে বসি। আমি বইটি কিনি নি, কেবল *বিচিত্রার* পাতা উল্টে বারবার পড়েছি।

এই ব্যাপারটি ঘটল এমন একসময় যখন আমি সগর্বে বলে বেড়াচ্ছি আমার প্রিয় লেখকের নাম বুদ্ধদেব বসু। একশত ষাটেরও বেশি বুদ্ধদেবগ্রন্থ থেকে এক এক করে এক শতাধিক গ্রন্থ মুগ্ধ বিস্ময়ে পাঠ করেছি। আমার তখন যতটুকু সাধ্য সেই সাধ্যমতো বুদ্ধদেবের *মৌলিনাথ, রাত ভরে বৃষ্টি, মেঘদূত, তপস্বী ও তরঙ্গিণী* এবং *চরম চিকিৎসা* নিয়ে নিবন্ধ লিখছি। কান্না নিয়ে কি আর প্রবন্ধ লেখা যায় ? বুদ্ধিজীবী ধরনের লেখকরা 'ইমম্যাচুরুড' ভাবতে পারেন সেই আতঙ্ক থেকেই *নির্বাসন* যে কাঁদিয়েছে সে কথা আর লেখা হয়ে উঠে নি।

তারপর তেত্রিশ নয়, ছত্রিশ বছর কেটে গেল। হুমায়ূন আহমেদ তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন। বলে গেলেন কিংবা বলেন নি : মৃত্যু এমনই, এভাবেই আসে।

সে রাতে টেলিভিশনের স্ক্রিন থেকে চোখ সরে নি। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে হুমায়ূন আহমেদ। একসময় সন্ধিক্ষণ অপসৃত হলো। নতুন করে লেখা হলো : হুমায়ূন আহমেদ আর নেই।

বাকি রাতটা কেটে গেল ঘোরের মধ্যে।

একটি দিন কাটল কোনো কিছু না পড়েই। নাকি একটা কিছু করেছি। এতসব বিখ্যাত বইয়ের মাঝখানে *নির্বাসন* খুঁজে বেড়ালাম। এত বছর পর আরও একবার পড়ব। যদি আবার চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে, যদি দুফোঁটা অশ্রুবিন্দু নেমে আসে। হুমায়ূন আহমেদের জন্য এটাই হবে আমার শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য।

কিন্তু *নির্বাসন* পেলাম না। দৈবচয়ন পদ্ধতিতে তারই অন্য একটি বই হাতে তুলে নিলাম। সেই বইটির নাম *এপিটাফ*। এটিও নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ঈদসংখ্যায় পড়েছি।

নাতাশা কিংবা টিয়া নামের তের বছরের মেয়েটি ক্যানসারে ভুগছে। তার রোগটির নাম মেনিনজিওমা। ডাক্তার বলেছেন, মাঝে মাঝে মেনিনজিওমার গ্রোথ ইউলিউসিভ হয়। ধরা দিতে চায় না।

নাতাশা কিংবা টিয়া নামের মেয়েটিকে বিদেশ নিতেই হচ্ছে—মাথায় মটরদানার মতো যে টিউমারটি বেড়ে উঠছে তা অপারেশন করে ছেঁটে ফলতে হবে।

রিকশায় মা আর মেয়ে। মা বলছে :

ডাক্তার অপারেশন করে ওই টিউমার সরিয়ে ফেলবেন। সেই অপারেশনও সহজ অপারেশন। আমাদের দেশে হচ্ছে না, তা বিদেশে হরদম হচ্ছে। তোর অপারেশন আমি বিদেশে করাব।

এত টাকা কোথায় ?

সেটা নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। যেভাবেই হোক আমি জোগাড় করব।

কত টাকা লাগবে ?

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাও তোর জানার দরকার নেই। তুই শুধু মনে সাহস রাখবি। তোর মনে সাহস আছে তো?

হুঁ আছে।

সাহস খুব বড় একটা গুণ। এই গুণ পশুদের অনেক বেশি। মানুষের কম। কেন কম বলো তো?

মানুষ বুদ্ধিমান, এ জন্যই মানুষের সাহস কম। বুদ্ধিমানরা সাহসী হয় না।

হুমায়ূন আহমেদ নাতাশার আঙুলে আমাদের চোখে খোঁচা দিয়ে বলে গেলেন, সাহসের অহংকারটা বড্ড মিথ্যে। আমাদের সংসারটা বড্ড ভয়ের। কষ্টের। কখনো আনন্দেরও।

যেভাবেই হোক চিকিৎসার জন্য নাতাশার বিদেশ যাওয়া হচ্ছে। যাওয়ার আগে চারটি চিঠি লিখেছে নাতাশা। চারটি চিঠির একটু একটু কথা উল্লেখ না করে পারছি না।

৭৮৬

প্রিয় ফুলির মা বুয়া,

তুমি যখন আমার এই চিঠি পড়বে আমি তখন বেঁচে থাকব না। মৃত্যুর পর সবাই মৃত মানুষকে দ্রুত ভুলে যেতে চেষ্টা করে। সেটাই স্বাভাবিক। যে নেই—বারবার তার কথা মনে করে কষ্ট পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

প্রিয় নানিজান,

আসসালামু আলাইকুম।

আমাদের বাংলা রচনা ক্লাসে একবার রচনা লিখতে দেওয়া হলো—তোমার জীবনের আদর্শ মানব। কেউ লিখল, মহাত্মা গান্ধী, কেউ লিখল, শেখ মুজিবুর রহমান। একজন লিখল, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল, একজন লিখল, মাদার তেরেসা। শুধু আমি লিখলাম—আমার নানিজান।

প্রিয় বাবা,

বাবা, তোমাকে আমি যতটা ভালোবাসি সেটা কি তুমি জানো? জানো না, তাই না? আমিও জানি না। ভালোবাসা যদি তরল পানির মতো কোনো বস্তু হতো তাহলে সেই ভালোবাসায় সমস্ত পৃথিবী তলিয়ে যেত। এমনকি হিমালয় পর্বতও।

বাবা, আমি যখন থাকব না তখন তুমি আমার কথা ভেবে কষ্ট পেয়ো না। তুমি কষ্ট পেলে সেই কষ্ট কোনো না কোনোভাবে আমার কাছে পৌঁছবে। তখন আমার খুব খারাপ লাগবে।

প্রিয় মা-মণি,

আমি ঠিক করে রেখেছি, মৃত্যুর ঠিক আগে আমি আল্লাহকে বলব হে আল্লাহ, তুমি আমার মা'র মন থেকে আমার সমস্ত স্মৃতি সরিয়ে নিয়ে যেয়ো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনোদিন যেন আমার কথা ভেবে মা কষ্ট না পায়। আল্লাহ নিশ্চয়ই আমার সেই প্রার্থনা শুনবেন।

চিঠি পড়তে পড়তে বহু বছর পর আবার আমার ভেতরটা খাঁ খাঁ করতে থাকে। আমার প্রতিরোধ ব্যূহ আবার ভাঙতে থাকে। আমার ভারাক্রান্ত চোখের সামনে নাতাশা হয়ে যায় আমারই মেয়ে। ঝাপসা চোখে আমি দেখতে পাই নাতাশা ইমিগ্রেশন পার হয়ে যাচ্ছে। দুই ফোঁটা অশ্রু দুদিক থেকে নেমে আসে। হুমায়ূন আহমেদ, আপনার জন্য এটাই আমার নৈবেদ্য।

এ বছর আমি কার্লোস ফুয়েন্তস, মারিও বার্গাস য়োসা এবং ওরহান পামুক পড়েছি। কিছু কিছু লিখেছিও। কিন্তু আপনার নাতাশা যেভাবে কাঁদিয়ে গেল, এমন তো কেউ কাঁদাতে পারেন নি।

এ তো গেল কান্নার কথা।

আপনার মতো হাসাতে কি পেরেছেন কেউ?

পারেন নি।

হুমায়ূন ভাই, আমরা বুদ্ধি ও তত্ত্বের ভারে ভারাক্রান্ত লেখকরা এখন আপনাকে ভালোবাসি। রুশ কবি আলেকজান্ডার পুশকিন সম্ভবত আমাদের সম্পর্কেই লিখেছেন : They are capable of loving the deads only. আমরা কেবল মৃতদেরই ভালোবাসতে সমর্থ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি রবে নীরবে

আনিসুজ্জামান

হুমায়ূন আহমেদকে শেষ বিদায় জানাতে শহীদ মিনারে যে-অভূতপূর্ব জনসমাগম ঘটেছিল, তা থেকে বোঝা গেছে বাংলাদেশের মানুষের কাছে তার স্থানটা কেমন ছিল। দূর ও নিকট থেকে এসেছিলেন নানা শ্রেণীর, নানা বয়সের, নানা পেশার নরনারী। এঁদের অনেকেই হুমায়ূনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, অনেকে হয়তো তাকে দেখেনও নি কখনো। শুধু তার লেখার সঙ্গে, তার টেলিভিশন নাটকের সঙ্গে, তার নির্মিত চলচ্চিত্রের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে তাঁরা এসেছিলেন আবহাওয়ার প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে, এসেছিলেন অনেকটা পথ পায়ে হেঁটে, এসেছিলেন নিকটাত্মীয়-বিয়োগের বেদনা বহন করে। বাংলাদেশের কোনো সাহিত্যিকের ভাগ্যে এমনটা হয় নি।

এরপর হুমায়ূন সম্পর্কে নতুন করে আর কী বলার আছে?

২৪ বছর বয়সী এক তরুণ—বিজ্ঞানের ছাত্র—প্রথম উপন্যাস লিখেই পাঠকসমাজে সাড়া জাগিয়ে ফেলল। তারপরে আর পেছনে ফিরে তাকাবার অবকাশ বা প্রয়োজন হলো না। সে যা-ই লেখে পাঠকেরা তা সাগ্রহে লুফে নেয়। বইমেলায় লম্বা সারিতে দাঁড়িয়ে তারা তার বই কেনে, তাতে লেখকের স্বাক্ষর নিতে না পারলে দুঃখিত হয়। প্রকাশকেরাও অমন অদৃশ্য সারিতে দাঁড়িয়ে থাকে তার পাণ্ডুলিপি পাওয়ার জন্যে, বড় অঙ্কের আগাম টাকা দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হয়। হুমায়ূনের উপন্যাসের নাট্যরূপ ধারাবাহিকভাবে টেলিভিশনে প্রচারিত হলে বাড়িসুদ্ধ লোকজন সব কাজ ফেলে তা দেখতে থাকে। হুমায়ূন চলচ্চিত্র নির্মাণ করে, তা দেখতে শহর ভেঙে পড়ে। চলচ্চিত্র বা নাটকের জন্যে হুমায়ূন গান লেখে, তাতে সুর দেয়, তা সমাদৃত হয়। মনের আনন্দে হুমায়ূন ছবি আঁকে, তা নিয়ে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়।

হুমায়ূন লিখেছে দু'হাতে। তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ৩০০ ছাড়িয়ে গেছে। সে লিখেছে উপন্যাস ও ছোটগল্প, নাটক ও রম্যরচনা, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ও শিশুতোষ রচনা। প্রথম প্রথম সমালোচকেরা তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তারপর তাঁরা তার ত্রুটিসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। উপন্যাস নামধেয় হুমায়ূনের বেশিরভাগ রচনা আসলে বড়গল্প—উপন্যাস নয়। হুমায়ূন বেশি লেখে, তাতে তার লেখার মান পড়ে যায়। হুমায়ূন বড় বেশি জনপ্রিয়, তার মানে তার লেখায় গভীরতা নেই। হুমায়ূন কেবল গল্প বলে, দেশ ও সমাজের প্রতি তার কোনো অঙ্গীকার নেই।

নিজের রচনার শিল্পরূপ নিয়ে হুমায়ূন কখনো বলেছিল বলে আমার জানা নেই। তবে সে জানত যে, পৃথিবীর সর্বত্রই আগে শিল্প সৃষ্টি হয়েছে, পরে তার স্বরূপ ও লক্ষণ নির্ণীত হয়েছে। হুমায়ূনের অধিকাংশ রচনা হয়তো উপন্যাসিকা বলে গণ্য হবে—জীবনের খণ্ডচিত্রই তারা তুলে ধরে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসও যে সে অনেক লিখেছে, তাও ভোলা যায় না।

যাঁরা বলেন, জনপ্রিয়তা সাহিত্যকর্মের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়, তাঁরা ভুল বলেন না। তবে জনপ্রিয়তা লেখকের একটা অর্জন নিঃসন্দেহে। কারও রচনা গুণেমানে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু পাঠক তা গ্রহণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে পারে না। আবার কারও রচনা মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে যায়। কোনো লেখকই কেবল নিজের জন্যে লেখেন না, দশজনের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে লেখেন। জনপ্রিয় হলে তাঁর রচনা খেলো বলে গণ্য করতে হবে, এটা একটা কুসংস্কার মাত্র।

হুমায়ূন একবার বাংলা সাহিত্যের এক অধ্যাপককে একটা গল্প পড়তে দেয় তার মতামত জানার জন্যে। অধ্যাপক স্বীকার করেন, গল্পটা মন্দ নয়। তবে, তাঁর মতে, এতে গভীরতা কম। পাণ্ডুলিপিটা পকেটে ভরতে ভরতে হুমায়ূন তাকে বলেছিল, 'গল্পটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আমি চরিত্রের নাম পালটে কপি করে দিয়েছি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় যখন গভীরতার অভাব, তখন আমার লেখা অগভীর হলে আমার দুঃখ নেই।'

হুমায়ূন কখনো দাবি করে নি যে, গল্প বলার অধিক সে কিছু করতে চেয়েছে। বাংলাদেশের নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনকে যেমনভাবে সে দেখেছে, তেমনিভাবে তাকে উপস্থিত করেছে। দেখা যাবে, সে যা তুলে ধরেছে তার লেখায়, তা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু তার দেখার ভঙ্গি, উপস্থাপনের ভঙ্গির মধ্যে এমন একটা বিশেষত্ব আছে যাতে এই চেনা জগৎ ও জানা কথার মধ্যে আমরা নতুনত্ব খুঁজে পাই, আনন্দ-বিষাদের দোলায় দুলতে থাকি। ভালো করে গল্প বলাই তো কথাসাহিত্যের প্রধানতম কাজ। টেলিভিশন নাটকে তার সৃষ্ট চরিত্রের শাস্তি যেন না হয়, তার জন্যে বাংলাদেশের একাধিক জায়গায় মিছিল হয়েছে। বাস্তবতার বিভ্রম সৃষ্টির বড় দৃষ্টান্ত এর চেয়ে আর কী হতে পারে? আর সামাজিক অঙ্গীকার? আবার তার টেলিভিশন-নাটকের কথাই বলি। ধারাবাহিকের বিশেষ একটি পর্ব প্রচারিত হওয়ার পরের দিন সকালেই বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে শুনি ছাত্রদের মুখে মুখে 'তুই রাজাকার' বাক্যটি সজোরে ঘুরে ফিরছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে হুমায়ূনের লেখার মধ্যে যে-অসাধারণত্ব আছে—বিশেষ করে, ১৯৭১-এর মতো অসাধারণ সংযত রচনায় এবং *জোছনা ও জননীর গল্পের* মতো প্রেক্ষাপটবিস্তারী উপন্যাসে—তার গুণগ্রাহিতার পূর্ণ পরিচয় ভবিষ্যতে যে পাওয়া যাবে, তাতে আমার সন্দেহ নেই।

নন্দিত নরকে ও *শঙ্খনীল কারাগার*—হুমায়ূনের প্রথম বই দুটি পাঠককে মুগ্ধ করেছিল মূলত সমকালীন সমাজের প্রতিফলন ও সমালোচনারূপেই। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তার রচনার কথা বলা বাহুল্য। যে-সাহস নিয়ে সে 'হলুদ হিমু ও কালো র‍্যাব' লিখেছিল, তা যেমন দুর্লভ, তেমনি বিপজ্জনক—সমাজের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার না থাকলে অমন বই লেখা যায় না।

হুমায়ূন পাঠকসৃষ্টিতে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, ইংরেজি মাধ্যমে পড়া ছেলেমেয়েরা—বাংলা সাহিত্যে যাদের কোনো আগ্রহ নেই—হুমায়ূনের বই পড়তেই ভালো করে বাংলা শেখার উদ্যোগ নিচ্ছে। হুমায়ূনের কল্যাণে এ-দেশের প্রকাশনা শিল্প যেমন সহায়তালাভ করেছে, তারও তুলনা বিরল।

হুমায়ূনের মধ্যে যে-সৃষ্টিশীল মানুষটি বাস করতো, সে ছিল অনেকটা খেয়ালি। তার ব্যক্তিগত আচরণে এই খেয়ালিপনার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে, তবে তা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। তার রচনার একটা বড় অংশ জুড়ে আছে দুর্জ্ঞেয়তা ও রহস্যময়তা—যেখানে চরিত্রের আচরণে বা ঘটনার পরম্পরায় আমরা সবসময়ে সামঞ্জস্য বা কার্যকারণ-সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারি না। তবে নিজের রচনায় হুমায়ূন যে-গতিশীলতা সৃষ্টিতে পারঙ্গম, তার ফলে এ-সম্পর্কে মনে প্রশ্ন বা অবিশ্বাস জাগার আগেই গল্প এগিয়ে যায়। আসলে হুমায়ূনের মনে অতিপ্রাকৃতে আস্থার একটা জায়গা ছিল, তা অনস্বীকার্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন সম্পর্কে নতুন কথা সম্ভবত এই যে, ৬৪ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে সে আমাদের ছেড়ে চলে গেল। তার মৃত্যু সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল, এ কথা বলা যাবে না। তারপরও আশা ছিল, সে আমাদের মধ্যে ফিরে আসবে। তার অগণিত বন্ধুবান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী-গুণগ্রাহী এই মৃত্যুতে হতাশ ও বেদনার্ত। তারপরও, হুমায়ূন নেই, এ কথাটি বলতে পারি না। হুমায়ূন আছে। ভালো করেই আছে। চিরদিনই থাকবে।

হুমায়ূন তার পূর্বসূরিদের রচনা দিয়ে নিজের অনেক বইয়ের নাম রেখেছিল। জীবনানন্দ দাশের 'দারুচিনি দ্বীপ' কিংবা 'যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ' মনে পড়ে। সবচেয়ে সে বেশি নিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ থেকে : 'আগুনের পরশমণি', 'আমার আছে জল', 'এই আমি', 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা', 'চলে যায়', 'তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে', 'দিনের শেষে', 'দূরে কোথায়', 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল', 'ভালোবেসে যদি সুখ নাহি', 'মেঘ বলেছে যাব যাব', 'যদিও সন্ধ্যা', 'রোদনভরা এ বসন্ত', 'শ্যামল ছায়া', 'সকল কাঁটা ধন্য করে', 'সবাই গেছে বনে', 'সেদিন চৈত্রমাস'। তাকে অনুসরণ করে এবং তার চলে যাওয়াকে মনে করে আমিও রবীন্দ্রনাথের কথাই ব্যবহার করেছিলাম : যাওয়া তো নয় যাওয়া। যাওয়ার প্রশ্নটি মূলতবি রেখে আজ বলতে ইচ্ছে করছে : তুমি রবে নীরবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের স্বপ্নের কারিগর

আনিসুল হক

হুমায়ূন আহমেদ আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখকদের কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিলেন। সেটা ১৯৯০ সালের কথা। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি একটা বই লিখেছিলেন, *মে ফ্লাওয়ার*। বইটি কাকলী প্রকাশনী ১৯৯১ সালে প্রকাশ করে। হুমায়ূন স্যার জন্মগ্রহণ করেছেন ১৯৪৮ সালে ১৩ নভেম্বর। আমি জন্মেছি, যত দূর আব্বা-আম্মা সূত্রে জেনেছি, ১৯৬৫ সালে। মানে হুমায়ূন স্যারের সতের বছর পরে। আমি হুমায়ূন স্যারের আইওয়া গমনের প্রায় বিশ বছর পরে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের একই কর্মসূচিতে অংশ নিতে যাই।

তাতে কিছু আসে যায় না। রবীন্দ্রনাথও তার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির আগে আমেরিকার এইসব জায়গা ভ্রমণ করেন। তখনই তার কবিতা অনূদিত হয়ে আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হয়। সেটা বোদ্ধামহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং পরবর্তীকালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। স্কুল পালালেই রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় না, তেমনি আইওয়া গেলেই হুমায়ূন আহমেদ হওয়া যায় না।

যদিও আমাদের কাছে আইওয়াকে আকর্ষণীয় করে রেখেছেন আসলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তার *ছবির দেশে কবিতার দেশে* ও *সুদূর ঝর্ণার জলে* বইয়ের মাধ্যমে এবং শঙ্খ ঘোষ তার *ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম* বইটির মাধ্যমে।

আমি গেলাম ২০১০ সালে। আইওয়ার পাবলিক লাইব্রেরিতে আমাকে একটা বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল: হোয়াই ডু আই রাইট দি ওয়ে আই রাইট। আমি কেন এই রকম লিখি!

আমি আমার বক্তৃতা শুরু করেছিলাম বাংলাদেশের দুই লেখকের কথোপকথন দিয়ে।

একবার হুমায়ূন আহমেদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। সৈয়দ শামসুল হক তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান। সৈয়দ শামসুল হক তাঁকে বলেন, হুমায়ূন, তোমাকে সেরে উঠতে হবে। কারণ তুমি সাধারণ মানুষ নও। সাধারণ মানুষের হাতে আঙুল থাকে পাঁচটি। কিন্তু তোমার ডান হাতে আছে ছয়টি আঙুল। ষষ্ঠ আঙুলটি হলো তোমার কলম। তোমাকে সেরে উঠতেই হবে, কারণ তুমি লেখক, তোমার কাজ হলো স্বপ্ন নির্মাণ করা।

আমি বললাম, আমিও একজন লেখক, আমারও হাতে আছে ছয়টি আঙুল। আমি একটা জাদু দেখাতে পারি। হাতের তালুতে কলম বিনা আঠায় আটকে রাখতে পারি। সেই ম্যাজিকটা আমি শ্রোতাদর্শকদের দেখিয়ে দিলাম।

আমি বললাম, আমি বাংলাদেশের লেখক, আমারও হাতে ছয়টা আঙুল দেখো।

আমাদের ওপরে একটা দায়িত্ব পড়েছে। কেউ দেয় নি, আমরা নিজেরাই নিয়ে নিয়েছি। সেটা হলো, ১৬ কোটি মানুষের জন্য স্বপ্ন নির্মাণ করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির কাজ সম্পর্কে *পুরস্কার* কবিতায় লিখেছেন :

সংসার-মাঝে কয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর...
তার পরে ছুটি নিব।
সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল
আরও আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে,
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ-'পরে
শিশিরের মত রবে।
না পারে বুঝাতে, আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
মাগিছে তেমনি সুর,
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু-চারিটা কথা
রেখে যাব সুমধুর।

AMARBOI.COM

শিশুর হাসি সুন্দর, কিন্তু কবি লিখে লিখে সেই হাসিকে আরও মধুর করে তোলেন, তখন আরও কিছু স্নেহ শিশুর মুখে শিশিরের মতো জমে ওঠে।

হুমায়ূন আহমেদ তা-ই করেছেন। তিনি বিগত ৪০টি বছর ধরে সাড়ে সাত কোটি মানুষ থেকে ১৬ কোটি মানুষের জন্য স্বপ্ন নির্মাণ করেছেন। আমাদের জ্যোৎস্না চিরটা কাল সুন্দর ছিল, কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ লিখে লিখে তা আরেকটু সুন্দর করে গেছেন। আমাদের বৃষ্টি চিরকালই সুন্দর ছিল, কিন্তু হুমায়ূন লিখেছেন বলে তা আরেকটু সুন্দর হয়েছে। আমাদের রবীন্দ্রসংগীত আগেও মধুর ছিল, কিন্তু তিনি লিখে লিখে, তিনি নাটকে রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করে আমাদের রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি আরেকটু বেশি অনুরাগী করে তুলেছেন।

আমরা বড় হয়েছি হুমায়ূন আহমেদের কালে। আমরা যখন স্কুলে পড়ি তখন বেরুচ্ছে তার প্রথম দিকের বইগুলো। আমরা যখন কলেজে পড়ি, তখন জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে তার টেলিভিশনের এক ঘণ্টার নাটকগুলো। আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, তখন টেলিভিশনে শুরু হলো তার জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'এইসব দিনরাত্রি'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি হুমায়ূন আহমেদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ করি যে, তিনি আমাদের বেড়ে ওঠার কালটাকে আনন্দপূর্ণ করে তুলেছিলেন। তিনি আমাদের মন গড়েছেন, তিনি আমাদের রুচি গড়েছেন এবং তিনি আমাদের গদ্যভঙ্গির ওপরে প্রভাব ফেলেছেন। আমরা দল বেঁধে সিনেমাহলে ফিরে গেছি তাঁর 'আগুনের পরশমণি' কিংবা 'শ্রাবণ মেঘের দিন' দেখবার জন্য।

হুমায়ূন আহমেদ *বলপয়েন্টে* লিখেছেন, তিনি টেলিভিশন নাটকে সচেতনভাবেই পূর্ব বাংলার ভাষা ব্যবহার শুরু করেন। আগে সংলাপে লেখা হতো, আসুন, বসুন, হুমায়ূন আহমেদ সেখানে লিখতে শুরু করেন 'আসেন', 'বসেন'। তিনি বাংলাদেশের প্রকাশনা জগতকে প্রায় একাই তার জাদুকরী শক্তিবলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। আজকে যে বইমেলা এত বড়, আজকে যে এত বিচিত্র ধরনের বই বেরুচ্ছে, তার পেছনে তার একটা বড় অবদান আছে।

হুমায়ূন আহমেদের লেখার কতগুলো বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি ছোট ছোট বাক্য লিখতেন। তার সেন্স অফ হিউমারের কোনো তুলনা নেই। পরিমিতিবোধ অসাধারণ। খুব অল্প আঁচড়ে একটা চমৎকার ছবি আঁকতে পারতেন... সেটা মানুষের বর্ণনা হোক, পরিবেশের বর্ণনা হোক, তুলির অল্প কটা টানই তার লাগত জিনিসটাকে সম্পূর্ণ করতে। তাঁর চরিত্র তৈরির ক্ষমতা অতুলনীয়।

তার লেখা পড়লে মনে হয়, তিনি সবকিছু পরিমিত পরিমাণে দিয়েছেন। আবেগ, সহানুভূতি, হাস্যরস, নাটকীয়তা, করুণরস... সব কিছু মাপা। কিন্তু তিনি প্রায় অটোমেটিক রাইটার ছিলেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই লিখতেন। তার প্রতিভা বোধ করি সহজাত, এবং এই প্রতিভার কোনো তুলনা হয় না।

তাঁর প্রতিভা যে সহজাত, তাঁর প্রমাণ *নন্দিত নরকে*। বই হয়ে বেরিয়েছিল ১৯৭৩ সালে। তার আগে এটি প্রকাশিত হয় *মুখপত্র* নামের একটি পত্রিকায়। এটি লিখিত হয়েছে ১৯৭০ সালে। তখন তার বয়স মাত্র বাইশ। তখনো তিনি ছাত্র। মুহসিন হলে থাকেন। বলা হচ্ছে, *নন্দিত নরকে* তার দ্বিতীয় উপন্যাস। আসলে তিনি প্রথমে লেখেন *শঙ্খনীল কারাগার*। ২২ বছর বয়সে মানুষের গদ্য তৈরি হয় ? দেখার চোখ তৈরি হয় ? উপলব্ধি করার মতো বোধ ও বোধি ? *শঙ্খনীল কারাগার* ও *নন্দিত নরকে* এখন পড়তে বসলে মনে হবে, এটা একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের রচনা ?

নন্দিত নরকে প্রথম পঙ্‌ক্তি থেকেই বিস্ময়কর।

> 'রাবেয়া ঘুরে ঘুরে সেই কথা কটিই বলছিল।
>
> রুনুর মাথা নিচু হতে হতে থুতনি বুকের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল। আমি দেখলাম তার ফরসা কান লাল হয়ে উঠেছে। সে তার জ্যামিতি খাতায় আঁকিঝুঁকি করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে 'দাদা আমি একটু পানি খেয়ে আসি' বলে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল।
>
> রুনু বারো পেরিয়ে তেরতে পড়েছে। রাবেয়ার অশ্লীল কদর্য কথা না বুঝার কিছু নেই। লজ্জায় সে লাল হয়ে উঠেছিল। হয়তো সে কেঁদেই ফেলত। রুনু অল্পতেই কাঁদে। আমি রাবেয়াকে বললাম, ছিঃ রাবেয়া, এসব কথা বলতে আছে ? ছিঃ! এগুলি বড় বাজে কথা। তুই কত বড় হয়েছিস!'

রাবেয়া কী বাজে কথা বলল, সেটা এই বইয়ে কখনোই বলা হবে না।

এই পরিণতি বোধ তিনি বাইশ বছর বয়সেই অর্জন করেছিলেন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর গদ্যও ওই বাইশ বছর বয়সেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

'মা দুধের বাটি টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। কাল রাতে তাঁর জ্বর এসেছিল। বেশ বাড়াবাড়ি রকমের জ্বর।'

এই যে একটা বিশেষণকে প্রথম বাক্যে ব্যবহার না করে পরের বাক্যে ব্যবহার করা, এটা তার গদ্যের স্থির বৈশিষ্ট্য। এই কায়দায় তিনি চিরটা কাল লিখে যাবেন। তার অনুকরণকারীরাও পরবর্তীকালে বহুবার এটাকে নকল করবে।

হুমায়ূন আহমেদের পরিণতিবোধের কোনো তুলনা হয় না।

নন্দিত নরকে উপন্যাসে মন্টু খুন করে মাস্টার কাকাকে।

সেই বর্ণনাটা শুনুন :

> বারোটার দিকে ফিরে এলেন মাস্টার কাকা। সঙ্গে শহর থেকে আনা বড় ডাক্তার। আর মন্টু... দিনে-দুপুরে অনেক লোকজনের মধ্যে ফালা ফালা করে ফেলল মাস্টার কাকাকে একটা মাছকাটা বঁটি দিয়ে। পানের দোকান থেকে দৌড়ে এল দু তিনজন। একজন রিকশাওয়ালা রিকশা ফেলে ছুটে এল। ডাক্তার সাহেব চেঁচাতে লাগলেন, হেল্প! হেল্প!
>
> চিৎকার শুনে বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখলাম, বঁটি হাতে মন্টু দাঁড়িয়ে আছে। পেছন থেকে তাকে জাপটে ধরে আছে কজন মিলে। রক্তের একটা মোটা ধারা গড়িয়ে চলেছে নালায়। মন্টু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দাদা, ওকে আমি মেরে ফেলেছি।
>
> আমার মনে পড়ল হাস্নাহেনা গাছের নিচে মন্টু একটা সাপ মেরেছিল।

এরপরে সেই সাপ মারা বর্ণনা/মানুষ খুন করার বর্ণনা আর নাই। আশ্চর্য নয় কী?

আর মানুষের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা গাঢ় অন্ধকারের খবর ওই বয়সেই হুমায়ূন আহমেদ পেয়েছিলেনই বা কোথায়? মাস্টার কাকার মতো ভালো মানুষটি যে একজন প্রতিবন্ধী মেয়েকে যৌন-হয়রানি করতে পারে, এটার ইঙ্গিত তিনি কোথাও দিয়ে রাখেন নি। হুমায়ূন চিরকাল আমাদের এই খবরই দিয়েছেন, মানুষ কেবল সাদা বা কালো হয় না, মানুষের মন আসলে ধূসর।

মন্টুর ফাঁসির পর তার লাশ নেওয়ার জন্য খোকা তার বাবা, মা, বোনকে নিয়ে জেলখানায় যায়। সেইসব বর্ণনা অপূর্ব।

যদিও থিমটা হয়তো হুমায়ূন পেয়েছিলেন 'জাগরী' থেকে। *জাগরী*র মতো চমৎকার উপন্যাস বাংলা ভাষায় খুব কমই লেখা হয়েছে।

কিন্তু হুমায়ূনের বর্ণনা হুমায়ূনের মতোই :

> গাছের নিচে ঘন অন্ধকার। কী গাছ এটা? বেশ ঝাঁকড়া। অসংখ্য পাখি বাসা বেঁধেছে। তাদের সাড়াশব্দ পাচ্ছি। পেছনের বিস্তীর্ণ মাঠে ম্লান জোছনার আলো। কিছুক্ষণের ভেতরই চাঁদ ডুবে যাবে। জেলখানার সেন্ট্রি দুজন সিগারেট খাচ্ছে। দুটি আগুনের ফুলকি ওঠানামা করছে দেখতে পাচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাসাহিত্যিক কাজ করেন মানুষের মন নিয়ে। মানুষের মনের বর্ণনা দেওয়ার জন্যই তাকে প্রকৃতির বর্ণনা দিতে হয়, অন্তত কখনো কখনো। বাংলা সাহিত্যে এই কাজটা সবচেয়ে সুন্দরভাবে আমরা করতে দেখেছি রবীন্দ্রনাথকে।

'পোস্টমাস্টার' গল্পের এই অনুচ্ছেদটি খেয়াল করলেই আমরা সেটা বুঝতে পারব, 'যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল।'

হুমায়ূন আহমেদ তাঁর কুড়ি বাইশ বছরে লেখা *নন্দিত নরকে* বইয়ে সেই কাজটিই করলেন। মন্টুর ফাঁসি হয়েছে। তার লাশ আনতে স্বজনেরা গেছে জেলগেটে। সেখানে তিনি প্রকৃতির বর্ণনা, পরিবেশের বর্ণনা দিচ্ছেন নিপুণ ভঙ্গিতে।

উপন্যাস মানে যে কেবল গল্প বা কাহিনি বলে দেওয়া নয়, একটা ভূগোল নির্মাণ করা, একটা জগৎ তৈরি করা, এটা হুমায়ূন জানতেন। তাঁর উপন্যাস *১৯৭১*-এ আমরা সেই কাজটা তাঁকে করতে দেখব :

> রুবাইল বাজারকে পেছনে ফেলে আরও মাইল ত্রিশেক উত্তরে মধুবন বাজার। যাতায়াতের একমাত্র ব্যবস্থা গরুর গাড়ি। তাও শীতকালে। বর্ষায় হাঁটা ছাড়া অন্য উপায় নেই। উজান দেশ, নদীনালা নেই যে নৌকো চলবে।
>
> মধুবন বাজার পেছনে ফেলে পূব দিকে সাত-আট মাইল গেলে ঘন জঙ্গল। স্থানীয় নাম মধুবনের জঙ্গলা-মাঠ। কাঁটা-ঝোপ, বাঁশ আর জারুলের মিশ্র বন। বেশকিছু গাব এবং ডেফল জাতীয় অন্ত্যজ শ্রেণীর গাছও আছে। জঙ্গলা-মাঠের এক অংশ বেশ নিচু। সেখানে মোরতা গাছের ঘন অরণ্য। শীতকালে সেইসব মোরতা কেটে এনে পাটি বানানো হয়।...
>
> জঙ্গলা মাঠের পেছনে নীলগঞ্জ গ্রাম। দরিদ্র, শ্রীহীন ত্রিশ-চল্লিশ ঘরের একটি বিচ্ছিন্ন জনপদ। বিস্তীর্ণ জলাভূমি গ্রামটিকে কাস্তের মতো দুদিকে ঘিরে আছে। সেখানে শীতকালে প্রচুর পাখি আসে।...

এই বর্ণনা আরও দীর্ঘ, আরও বিশদ।

পরবর্তীকালের উপন্যাসে হুমায়ূন আহমেদ এই ডিটেইলের কাজ আর করেছেন কিনা, আমার জানা নেই। আমার একটা দুঃখ হয় বাংলাদেশের লেখকদের নিয়ে, আমরা লেখালেখির কাজটা মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে নিবিষ্টচিত্তে করতে পারি না অনেকেই, আমাদেরকে অনেক কাজ একসঙ্গে করতে হয়। আশির দশকে এসে হুমায়ূন আহমেদ টেলিভিশনের জন্য নাটক লিখতে শুরু করলেন, আরেকটু পরে নাটক নির্মাণ করতে লাগলেন... নাট্যপরিচালনা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ কাজ... এবং বাংলাদেশের কোটি কোটি তরুণের পাঠতৃষ্ণা মেটানোর জন্য তাঁকে সুপ্রচুর লিখতে হলো, গণদাবি তাঁর মতো বিস্ময়কর সহজাত প্রতিভাকে বেশি কাজ করিয়ে নিয়েছে, বিচিত্র কাজ করিয়ে নিয়েছে, যার ফলে তিনি কোনো একটা উপন্যাসকে থিতু হওয়ার জন্যে যে সময়টা দেওয়া দরকার, তা দিতে পেরেছেন খুব কম ক্ষেত্রেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেক্সপিয়ারের কথায় :

> My candle burns at both ends;
> It will not last the night;
> But, ah, my foes, and, oh, my friends
> it gives a lovely light.
> ...Edna St. Vincent Millay 'First Fig'

হুমায়ূন আহমেদের মোমবাতির দুই দিকেই আমরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলাম, তিনি বিরামহীনভাবে লিখেছেন, নাটক পরিচালনা করেছেন, গান রচনা করেছেন, সিনেমা বানিয়েছেন, বইমেলায় তাকে প্রতিবছর অনেকগুলো বই লিখতে হয়েছে প্রতিবছর, তিনি আমাদের আলো দিয়েছেন, মনোরম আলো, প্রীতিময় আলো, কিন্তু নিজের আয়ু যে তিনি ধ্বংস করছেন, সেদিকে আমরা খেয়াল করি নি এবং *নন্দিত নরকে* যিনি লিখতে পারেন, তার প্রতিভার একমাত্র তুলনা তো আমি দেখি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, যে-মানিক অতি অল্প বয়সে *দিবারাত্রির কাব্য* লিখেছিলেন, সেই হুমায়ূন আহমেদকে দিয়ে ঈদের হাসির নাটক নির্মাণ করিয়ে নিয়ে আমরা আমাদের ঈদের সন্ধ্যাগুলোকে আনন্দপূর্ণ করে তুলেছি। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর ক্যানসার ধরা পড়ার পরে তার নিকটজন লেখকদের কাছে এই দুঃখ করেছেন যে, নাটক পরিচালনায় সময় কম দিয়ে তার হয়তো উপন্যাস লেখার দিকে বেশি সময় দেওয়া উচিত ছিল।

আমি বলব না যে, হুমায়ূন আহমেদ নাট্যপরিচালনা উপভোগ করেন নি। বা তিনি এসব না **করলেও পারতেন**। কিন্তু এটা আমি বলবই যে, এটা তিনি কেবল নিজেই করেন নি, আমরা তাকে **দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলাম**। এই হতভাগা দেশে একজন লেখক তো কেবল নিজের খেয়ালে **চলতে পারেন না, সমাজের**, দেশের অনেক দাবি যে আছে তার ওপরে। এটা তার **বিধিলিপি ছিল।**

AMARBOI.COM

হুমায়ূন আহমেদ নেই। এই ক্ষতি আমাদের প্রকাশনা-জগৎ কীভাবে সামলাবে, বলা খুব মুশকিল। **তাঁর পাঠকেরা বহুকাল** তাঁর অভাব অনুভব করবে।

আমি ২০১২ সালের বইমেলাতেই তাঁর অনুপস্থিতি অনুভব করেছি। সামনের বইমেলায় **হয়তো** তাঁর পুরনো বইগুলো নিয়েই তিনি সগৌরবে মহাসমারোহে উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু তারপর? পাঠকেরা তাঁর নতুন হিমু, নতুন মিসির আলী, নতুন শুভ্র জন্য অপেক্ষা করবে। এই শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁকে ভাবলেই কাহিনিরা ভিড় করে

আবদুল্লাহ্ নাসের

শিরোনামটি ধার করেছি পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী কবির সুমন (সুমন চট্টোপাধ্যায়)-এর কাছ থেকে। প্রিয় কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ স্মরণে সুমন রচনা করেছেন ষোলটি চরণ। সেগুলোরই একটি এই শিরোনাম। সুমনের এই চরণগুলো যেন লক্ষ-কোটি হুমায়ূনভক্তের আবেগ-অনুভূতির হৃদয়নিংড়ানো পঙ্‌ক্তিমালা। পাঠকদের সাথে তাঁর সম্পর্ক গাঢ়-গভীর ভালোলাগার। অচ্ছেদ্য এই সম্পর্ক তাঁর ইহলৌকিক অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে। তাই তাঁর প্রয়াণ বা প্রস্থান মানে চলে যাওয়া নয়। মৃত্যুহীন প্রাণ তাই বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে পাঠকহৃদয়ে, তাদের আনন্দ-বেদনার কাব্যে ও এইসব দিনরাত্রির গল্পমালায়।

কবির সুমন বলছেন—'তাঁকে ভাবলেই কাহিনিরা ভিড় করে'। এখানেই তো তাঁর মুন্সিয়ানা আর সাফল্য। এজন্যই তিনি জীবদ্দশাতে কিংবদন্তি মর্যাদা অর্জন করেছেন। বাংলা ভাষার জনপ্রিয়তম লেখক যে তিনিই—এ তো সেজন্যই। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ছাড়িয়ে গেছে। কথাটা সত্যি, তবে তাঁর জনপ্রিয়তার ব্যাপকতা বোঝাতে এই মন্তব্যে আরও একটি শব্দ জুড়ে দেওয়া আবশ্যক। বলা প্রয়োজন, হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ছাড়িয়ে গেছে *বহুগুণে*।

AMARBOI.COM

'তাঁকে ভাবলেই কাহিনিরা ভিড় করে'

মধ্যবিত্তের আনন্দ-বেদনার যে কাহিনি কিংবা তাদের নিস্তরঙ্গ যাপিত জীবনের যে-সকল শব্দচিত্র তিনি নিপুণ কুশলতায় বর্ণনা করেছেন, সে সবের কথা বলছি না। বলছি এই কিংবদন্তিকে ঘিরে আমাদের যে স্মৃতি জমেছে সতের বছরে, সেসবের কথা। সেগুলোও তাঁর গল্প-উপন্যাসের মতো একেবারেই সজীব আর সচল। মানসপটে ছবিরা এসে ভিড় করছে, একের পর এক। উজ্জ্বল সব ছবি। সব ছবিরই মধ্যমণি একজন হুমায়ূন আহমেদ।

নিজের সৃষ্ট নন্দনকানন নুহাশপল্লী ছিল হুমায়ূন আহমেদের সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। প্রায়ই তিনি ছুটে যেতেন সেখানে। তাঁর নাটক-চলচ্চিত্রের শুটিংয়ের জন্য তো সেখানে যেতেনই, তা ছাড়া শুধু অবসর যাপনের জন্যেও চলে যেতেন সেখানে। এখানেই যেন তিনি নিজেকে খুঁজে পেতেন। ধানমণ্ডির 'দখিন হাওয়া'র ফ্ল্যাট আর নুহাশপল্লী ছিল তাঁর মুক্ত বিচরণভূমি। তিলে তিলে শিল্পীর মমতায় তিনি গড়ে তুলেছেন নুহাশপল্লীকে। এখানকার সবুজ বৃক্ষরাজি আর পোষা প্রাণীরা তাঁর সঙ্গে কথা বলত, যেন তিনিই তাদের সবচেয়ে আপনজন।

সময়টা ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাস। হুমায়ূন আহমেদ আমন্ত্রণ জানালেন নুহাশপল্লীতে বিশেষ এক পূর্ণিমা রাতে। সন্ধ্যায় রওনা হলাম নুহাশপল্লীর উদ্দেশে। সেখানে পৌঁছে দেখি বেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড়সড় আয়োজন জোছনা উপভোগের। আমন্ত্রিত অনেক অতিথি ছিলেন সেখানে। রাত্রির শেষ ভাগ পর্যন্ত চলল এ আয়োজন। অপরূপ জোছনায় ভেসে যাচ্ছে গভীর নির্জন শালবন। আমরা তখন যেন এক অপার্থিব জগতের বাসিন্দা।

নুহাশপল্লীতে যে বাংলো বা কটেজগুলো এখন আমরা দেখি, সেগুলো তখন ছিল না। ছিল ছোট ছোট কিছু টিনের ঘর আর একটি বড় বাংলো। বাংলোটি ছিল পাহাড়ি এলাকার আদিবাসীদের বাড়ির মতো, কোমরসমান উঁচু মাচার ওপর। কাঠ ও টিনের এই সুদৃশ্য বাংলোটি সংরক্ষিত ছিল বিশেষ অতিথিদের জন্য। এমনকি হুমায়ূন স্যার নিজেও ওই বাংলোয় না থেকে সাধারণ ঘরগুলোর একটিতে থাকতেন। তীব্র শীতের সে রাতে তিনি আমাদের (মাজহার, মাসুম, কমল ও আমি) বললেন, তোমরা বাংলোয় থাকবে। তাঁর এই আতিথেয়তায় আমরা মুগ্ধ। রাতটা আমাদের কাটল অভিজাত এই বাংলোয়। এখন যেখানে স্যার চিরনিদ্রায় শায়িত সেই লিচুতলার কাছেই ছিল বাংলোটির অবস্থান। বাংলোয় একটা লাইব্রেরি ছিল, প্রচুর দেশি-বিদেশি বই ছিল সেখানে। সেই আমাদের প্রথম নুহাশপল্লীতে রাত্রিযাপন। পরে অবশ্য এই বাংলোটি দুষ্কৃতকারীরা পুড়িয়ে দেয়। বইয়ের বিশাল সংগ্রহ আর দামি আসবাবপত্রসহ পুরো বাংলোটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের দাবিতে অনশন করতে যে রাতে হুমায়ূন আহমেদ সিলেটের উদ্দেশে ট্রেনে করে যাত্রা করেন, সে রাতেই এই ঘৃণ্য কাজটি করে অন্ধকারের জীবেরা। খবর পেয়ে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। সে যাত্রায় আমরাও তাঁর সঙ্গে অনশনে গিয়েছিলাম। বাংলো পোড়ানোর ঘটনায় খুব কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন।

নুহাশপল্লীতে যাওয়ার সড়কটি তখনো পাকা হয় নি। কাদামাটির রাস্তা। বর্ষায় গাড়ি নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। ভরসা মহিষের গাড়ি। প্রায় ৮ কিলোমিটার রাস্তার এ অবস্থা। মহিষের গাড়ি আরামদায়ক তো নয়ই, বরং কর্দমাক্ত পথে মহিষের পা আর গাড়ির চাকার ঘূর্ণনে ছিটানো কাদায় বহুবার একাকার হয়েছি। সেজন্য বর্ষায় সাধারণত এ পথে যাওয়া হতো না। ভাওয়াল মির্জাপুর বাজারে গাড়ি রেখে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় প্রায় দুঘণ্টা পাড়ি দিতে হতো বিস্তীর্ণ জলরাশি। তারপর পৌঁছে যেতাম নুহাশপল্লীর ঘাটে। হুমায়ূন স্যারের একটা বিশেষ বজরা ছিল। সবসময় সদলবলে আমরা সেই বজরাতে করে গিয়েছি। তুমুল আড্ডা চলত বজরাতে। রাতে যখন বজরায় করে আমরা যাতায়াত করতাম, আকাশে চাঁদের আলো থাকলেই স্যার আমাদের ডেকে নিতেন বজরার ছাদে। বহু রাতে বজরার ছাদে বসে জোছনায় ভিজতে ভিজতে আমরা পৌঁছে গেছি নুহাশপল্লী।

অনেক সময় এমন হয়েছে—স্যার আগেই চলে গেছেন নুহাশপল্লীতে কোনো শুটিংয়ের কাজে, পল্লীর তদারকিতে কিংবা শুধুই সময় কাটাতে। ফোন করে জানিয়েছেন আমরাও যেন সেখানে যাই। আমরা ভাওয়াল মির্জাপুর ঘাটে গিয়ে দেখি স্যারের বজরা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। ওখান থেকে ভাড়া করা ইঞ্জিন নৌকাও পাওয়া যেত। কিন্তু স্যার আমাদের জন্য সবসময় বজরা পাঠাতেন।

আপাতদৃষ্টিতে কঠোর আর অহংকারী মনে হলেও যারা খুব কাছ থেকে তাঁকে দেখেছেন তারা জানেন স্যারের কোমলতা আর উদারতার কথা। শিশুর মতো একটা মন ছিল তাঁর। কোনো জটিলতা সেখানে ছিল না। কোনো কারণে হঠাৎ করে প্রচণ্ড রেগে গেলেও খানিক বাদেই সব ভুলে যেতেন। এ তো শুধু শিশুদের পক্ষেই সম্ভব। শিশুদের পছন্দ করতেন খুব। তাদের সঙ্গে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনভাবে মিশে যেতেন যেন তিনি নিজেও তাদের একজন। শিশুদের বিনোদনের জন্যে নুহাশপল্লীকে বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে সাজিয়েছেন।

ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে খুব ভালোবাসতেন হুমায়ূন আহমেদ। হুট করেই বেড়ানোর কোনো পরিকল্পনা এবং দ্রুত তা বাস্তবায়ন। দেশে বা দেশের বাইরে বহু জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি তাঁর সঙ্গে। বঙ্গোপসাগরের বুকে সেন্টমার্টিন দ্বীপে আমি প্রথম গিয়েছি তাঁর সঙ্গে। তাঁর লেখালেখি আর 'সমুদ্রবিলাস'-এর জন্য সেন্টমার্টিন তখন আমার কাছে স্বপ্নের এক দ্বীপ। আমি জানি, আমার মতো লাখো বাঙালিকে এই অপূর্ব সুন্দর দ্বীপের স্বপ্ন দেখিয়েছেন তিনি। তাই যখন সেন্টমার্টিনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো, আমার ভেতর সে-কী উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ! অপেক্ষার প্রহর যেন ফুরোয় না। সেন্টমার্টিনে যাচ্ছি, সেই আনন্দ বহুগুণে বেড়ে যাচ্ছে এটা ভেবে—যিনি এই স্বপ্নদ্বীপের কথা জানালেন, তাঁর সঙ্গেই সেখানে যাচ্ছি। আমরা সেখানে 'সমুদ্রবিলাসে' উঠেছি। কয়েকটি দিন আর রাত্রি যেন স্বপ্নের মতো কেটেছে। বাড়ির উঠোনে বসে দিনে বা রাতে ম্যারাথন আড্ডা। পায়ের কাছে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের ঢেউ। রাতের নিঃশব্দতার মাঝে সমুদ্রের গর্জন। চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া চরাচর। এমনিভাবে তাঁর সঙ্গে আরও দু'বার সেন্টমার্টিনে গিয়েছি। প্রতিবারই ভ্রমণসঙ্গীর সংখ্যা ৭ থেকে ১৫। তখনো টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিনে স্টিমারসার্ভিস চালু হয় নি। আমরা প্রতিবারই গিয়েছি মাছধরা ট্রলারে চেপে। রোমাঞ্চকর যাত্রা। একবার তো এমন হলো– মনে হলো সমুদ্রেই বুঝি আমাদের সলিল সমাধি ঘটবে। সমুদ্র অশান্ত। বিশাল ঢেউ যেন উল্টে দিবে আমাদের ট্রলারকে। ঢেউয়ের দোলায় একবার ডানে একবার বামে কাত হয়ে যাচ্ছে ট্রলার। হিংস্র ঢেউগুলো মনে হচ্ছে ট্রলারসমেত আমাদের গিলে খাবে। সমুদ্রের দানবীয় রূপ। বারবার মনে পড়ছিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমুদ্র ঝড়ের রূপ বর্ণনা। ভয়ে আত্মা শুকিয়ে গেছে আমাদের কারও কারও। স্যারকে দেখে মনে হলো প্রকৃতির এই রুদ্র রূপেও যেন তিনি খুঁজে পেয়েছেন বিশেষ কিছু। সেন্টমার্টিনের যাত্রাপথে একবার আমরা টেকনাফে রাত্রিযাপন করি। স্যারের অসম্ভব ভক্ত নুরুল হকের শূন্য বাড়ি আমাদের কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে সে রাত্রিতে। পরদিন আমরা টেকনাফ সৈকতে যাই। কক্সবাজারের চেয়ে আরও সুন্দর এই সৈকত। আরেকবার আমরা বাংলাদেশের শেষ স্থলসীমা শাহপরী দ্বীপে গিয়েছিলাম নুরুল হকের গ্রামের বাড়িতে। আমরা যখন সেখানে পৌঁছাই, নুরুল হক বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর বাড়ির লোকজন আমাদের আপ্যায়নের জন্য গাছ থেকে ডাব পাড়ার লোক খুঁজছিল। এমন সময় বাড়ির সামনের একটি গাছ থেকে ঝুপ করে এক কাদি ডাব আপনা-আপনি নিচে পড়ল। সবাই অবাক। নারকেল ঝরে পড়তে দেখা যায়। কিন্তু ডাবের কাঁদি ঝরে পড়তে কেউ দেখে নি কখনো।

একবার আমরা ঈশ্বরদি, পাকশী, পাবনা, কুষ্টিয়া, শিলাইদহ এসব জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি পাঁচ দিন ধরে। বেশ বড় একটা দল ছিল আমাদের। স্যার তো ছিলেনই। পাকশীতে স্যারকে একটা সংবর্ধনা দেওয়া হয় জমকালো আয়োজনে। 'অয়োময়' নাটকে জমিদার আসাদুজ্জামান নূরের লাঠিয়াল চরিত্রে অভিনয় করে বিখ্যাত হওয়া মোজাম্মেল সাহেব দু'দিনের জন্য আমাদের দলের সঙ্গে ছিলেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান। আমরা একদিন লালনের মাজারে যাই। আরেকদিন শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে। হুমায়ূন আহমেদের খুবই প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত এই জায়গায় এসে তিনি যেন আনমনা হয়ে যান। ঘুরে ঘুরে সব দেখেন। কুঠিবাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংলগ্ন দিঘীর ঘাটে বসে থাকেন অনেকক্ষণ। তারপর একসময় দিঘীতে নেমে পড়েন গোসল করতে। আমরা ফেরার পথে পাবনায় আসি। সেখানে সদলবলে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের আশ্রম ঘুরে দেখি।

হুমায়ূন আহমেদের পছন্দের বেড়ানোর অল্প ক'টি জায়গার একটি ছিল নেপাল। কয়েকবার তিনি নেপাল গিয়েছেন সদলবলে। 'দখিন হাওয়া'য় এক রাতের আড্ডায় ঠিক হলো আমরা নেপাল যাব। এও ঠিক হলো এটা হবে 'ব্যাচেলরস ট্রিপ'। অর্থাৎ শুধু ছেলেরাই যাবে এ যাত্রায়, কোনো মেয়ে থাকবে না। স্যার, তাঁর তিন বন্ধু অধ্যাপক ডা. করিম, স্থপতি করিম, প্রকাশক আলমগীর রহমান, অভিনেতা চ্যালেঞ্জার আর আমরা তিনজন মাজহার, কমল ও আমি—এই আটজনের দল। খুব আনন্দ হয়েছিল সেবার। একেবারে বাঁধন ছেঁড়া ঘুরে বেড়ানো। চারদিন ছিলাম নেপালে। একদিন কাঠমান্ডুর বাইরে গিয়েছিলাম রাফটিং করতে। সবাই নেমেছিলাম পাহাড়ি নদীতে। শুধু আলমগীর ভাই নামেন নি। পাথুরে পাহাড়ি নদী। খরস্রোতা। বড় বড় পাথর এখানে-সেখানে। এমনি এক পাথরের গায়ে সজোরে ধাক্কা খেতে খেতে প্রায় অলৌকিকভাবে বেঁচে যান চ্যালেঞ্জার। মাথায় আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা ছিল তাঁর। সে-যাত্রায় বেঁচে গেলেও ক্যানসার পরে কেড়ে নিয়েছে তাঁকে।

সিকিম আর দার্জিলিংয়ের গল্প বেশ রোমাঞ্চকর। গ্যাংটককে তো বেঁধেই গেল গণ্ডগোল। স্যারসহ আমরা ১৩জন দুটি মাইক্রোতে করে যাই রংপুরের তিস্তা ব্যারেজ রেস্ট হাউজে। সেখানে রাত্রিযাপন শেষে পরদিন চ্যাংরাবান্দা সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করি আমরা। তারপর সেখান থেকে শিলিগুড়ি হয়ে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক। দুটি জিপে করে আমরা রওনা হই। পথে পাহাড়ি রাস্তায় চলন্ত জিপের ছাদ থেকে আমার লাগেজ পড়ে যায়, রুদ্ধশ্বাস কিছু সময় পর তা ফিরে পাই। পরনের পোশাক ছাড়া অন্য সব পোশাক, টাকাপয়সা, এমনকি আমার পাসপোর্টটিও ছিল ওই লাগেজে। যা হোক, রাত আটটা নাগাদ আমরা পৌঁছাই সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে। গণ্ডগোল যেন ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। জিপ চালকেরা আমাদের একটা খুব সুন্দর হোটেলে নিয়ে এল। সবার পছন্দ হলো হোটেলটা। সিদ্ধান্ত হলো, যে ক'দিন গ্যাংটকে আছি আমরা এই হোটেলেই থাকব। পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেকেই ঘুরতে আসে এখানে, দেখতে-শুনতে তারা আমাদেরই মতো। তাই হোটেল ম্যানেজার যখন আমাদের দলনেতা মাজহারের কাছে জানতে চাইলেন আমরা কোথা থেকে এসেছি, মাজহার বাংলাদেশের কথা বললেন। ম্যানেজার বললেন, তা হলে তোমাদের পাসপোর্টগুলো দাও। মাজহার সবার পাসপোর্ট তার হাতে দিতেই তিনি বললেন, সিকিম ভ্রমণের পূর্বানুমতি নিয়েছ তোমরা? বিদেশিদের এই অনুমতি প্রয়োজন। আকাশ ভেঙে পড়ল যেন মাজহারের মাথায়। বললেন, অনুমতি নেওয়ার ব্যাপারটা তো আমরা জানতাম না। ম্যানেজার অভয় দিলেন, চিন্তা কোরো না। সবাই রুমে যাও, ফ্রেশ হও, তারপর রাতের খাবার সেরে একটা ঘুম দাও। সকালে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে গিয়ে রিপোর্ট করলে অনুমতি পেয়ে যাবে। রাত দশটায় আমরা সবাই হোটেলের নিচতলার রেস্টুরেন্টে জড়ো হলাম রাতের খাবারের জন্য। খাবারের অর্ডার দেওয়া হয়েছে, আমরা অপেক্ষা করছি। এমন সময় একজন বেয়ারা এসে মাজহারকে ডেকে নিয়ে গেল এই বলে যে ম্যানেজার তার সঙ্গে কথা বলবেন। মিনিট দশেক পেরিয়ে গেলেও মাজহার আসছে না দেখে অভিনেতা স্বাধীন খসরু

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন, দেখে আসি মাজহার ভাই ফিরছে না কেন। আমাদের এই ট্রিপে পুরনো অনেকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন স্বাধীন। আরও দশ মিনিট পেরিয়ে যায়, মাজহার বা স্বাধীন কেউই ফেরেন না। স্যারসহ আমরা অপেক্ষা করছি খাবার সামনে নিয়ে। স্যার বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন—ব্যাপারটা কী! ওরা ফিরছে না কেন ? আমাকে বললেন, নাসের, যাও তো দেখে এসো কী হলো। ওদের মতো আবার হারিয়ে যেয়ো না। হোটেলের লবিতে রিসেপশন কাউন্টারের সামনে এসে আমি হতবাক। জনা পনের পুলিশ সদস্য সেখানে। একজন অফিসারের সঙ্গে কথা বলছেন মাজহার ও স্বাধীন। বোঝা গেল, আমাদের অবস্থানের বিষয়টি পুলিশকে জানানোর যে দায়িত্ব হোটেল কর্তৃপক্ষের, তা পালনে এতটুকু শিথিলতা দেখায় নি তারা। মাজহার-স্বাধীনের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ অফিসারটি আশ্বস্ত হলেন বলে মনে হলো। বললেন, তোমাদের কাল সকালে অনুমতি নিতে হবে। পেয়ে যাবে আশা করছি। কোথা থেকে অনুমতি নিতে হবে সেই ঠিকানাও বুঝিয়ে দিলেন। তারপর আমাদের দলের অন্য সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত হতে অফিসারটি রেস্টুরেন্টে এলেন। আমাদের নৈশভোজের আমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে শুধু এককাপ কফি খেলেন। বেশ রসিক ছিলেন ভদ্রলোক। এই স্বল্পপরিচয়ে আমাদের সঙ্গে আড্ডায় মেতে উঠলেন, ব্যক্তিগত রসিকতাও হলো অনেক। যাওয়ার আগে আমাদের ভ্রমণের সাফল্য কামনা করলেন। ঠিক হলো, পরদিন সকালে মাজহার আর স্বাধীন অনুমতি সংগ্রহের জন্য যাবেন। আমরা সারা দিন হোটেলেই থাকব, টিভিতে খেলা দেখব, বাংলাদেশ-পাকিস্তানের ক্রিকেট ম্যাচ। পাকিস্তানে খেলতে গেছে বাংলাদেশ। স্যার এই খেলা দেখা বাদ দিয়ে কোথাও বেরুবেন না।

দুপুর বারোটার দিকে মাজহার-স্বাধীন ফিরে এলেন বিমর্ষমুখে। জানালেন, অনুমতি পাওয়া যায় নি। এখনই আমাদের সিকিম ছেড়ে চলে যেতে হবে। নইলে পুলিশ আইনী ব্যবস্থা নিবে। সে ব্যবস্থা অনেকটা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বহুল আলোচিত 'পুশব্যাক'-এর মতো। সিকিম ত্যাগের জন্য মাজহার-স্বাধীন সঙ্গে গাড়ি ঠিক করে এনেছেন। আমরা দ্রুত লাগেজপত্র নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ি। বাংলাদেশ-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে না-পারার ক্ষোভ আর সিকিমের সৌন্দর্য উপভোগের দীর্ঘদিনের ইচ্ছা পূরণ না-হওয়ার হতাশায় আমরা আচ্ছন্ন। সিকিমকে এভাবে বিদায় জানাতে হবে কেউ ভাবতেই পারছিল না।

আমরা চলে আসি দার্জিলিংয়ে। সেখানে চারদিন নানা পর্যটন কেন্দ্রে ঘুরে বেড়াই। আমি আর স্বাধীন তখন ব্যাচেলর। আমরা দুজন একটা রুমে থাকি। অন্যেরা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে আমাদের সঙ্গী। দেশে বা দেশের বাইরে সবসময়ই স্যারকে দেখেছি যত রাতেই ঘুমান না কেন, খুব ভোরে উঠে যান। নুহাশপল্লীতে দেখেছি ভোরে উঠে স্যার সবুজ মাঠে বা গাছগাছালির মাঝে হাঁটাহাঁটি করছেন। এখানে প্রতি ভোরে আমাদের রুমে ফোন করে আমাকে আর স্বাধীনকে নিজের রুমে ডেকে নিতেন চা খেতে। এই ভ্রমণটি আমার জীবনের আনন্দময় অংশগুলোর একটি।

মেঘালয়ের রাজধানী শিলং, চেরাপুঞ্জি ও সেখানকার আরও কিছু জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছি আমরা দিন সাতেক। আমরা উঠেছিলাম শিলং ক্লাবে। পরিকল্পনা ছিল চারদিন থাকার। বিডিআর-বিএসএফ সংঘর্ষে ৬ বিএসএফ সদস্য মারা যাওয়ায় সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমরা আটকা পড়ি শিলংয়ে। তবে মেঘালয়ের সৌন্দর্য আমাদের সব উৎকণ্ঠা ভুলিয়ে দেয়। সেবারে স্যারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমন্ত্রণে আমাদের সঙ্গী হয়েছিলেন নুহাশ চলচ্চিত্রের তিন কর্মী। এদের ভ্রমণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছেন স্যার। তাঁর এই ঔদার্যে আরেকবার মুগ্ধ হই আমরা। পুরোটা সময় আমরা নুহাশ চলচ্চিত্রের কর্মীদের সঙ্গে একই হোটেলে থেকেছি, একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করেছি, ঘুরে বেড়িয়েছি।

তাঁর মানবিক ঔদার্যের পরিচয় পেয়েছি বহুবার, বহুভাবে। একটা অসম্ভব সংবেদনশীল মনের মানুষ ছিলেন তিনি। নুহাশ চলচ্চিত্রের এক কর্মী, স্যারের একজন সহকারী পরিচালক, দুলাল বিয়ে করছেন। ওর বাড়ি জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলায়। বিয়ে সেখানেই হবে। দুলাল স্যারকে আমন্ত্রণ করেছেন বিয়েতে। আমাদেরও দাওয়াত দিয়েছেন। আমরা কেউই উৎসাহী ছিলাম না এতদূরে এই দাওয়াতে যেতে। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, হুমায়ূন আহমেদও যাবেন না। আমাদের যে অভিজ্ঞতা, তাতে ঢাকাতেই কখনো তাঁকে এ ধরনের কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতে দেখি নি। ফর্মাল অনেক অনুষ্ঠানে তাঁকে প্রধান অতিথি বা বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হতো। তিনি এসব আমন্ত্রণ রক্ষায় তাঁর অপারগতা সবিনয়ে জানিয়ে দিতেন। তিনি আমাদের বলতেন, আমি হচ্ছি 'গর্তজীবি'। এ ধরনের অনুষ্ঠান-আয়োজন আমার জন্যে নয়।... আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে স্যার জানালেন তিনি যাবেন দুলালের বিয়েতে। আমরাও নিজেদের সিদ্ধান্ত পাল্টে প্রস্তুতি নিলাম জামালপুরে যাওয়ার। প্রায় পনের জনের দল। ইসলামপুরের দুর্গম চরে বিয়েবাড়িতে পৌঁছে আমরা সবাই ক্লান্ত। বাড়ি পর্যন্ত গাড়ি পৌঁছে নি। কয়েক কিলোমিটার দূরে গাড়ি রেখে চরের বালুতে হেঁটে পৌঁছাতে হয়েছে আমাদের। স্যারকে মনে হলো খুবই খুশি। তিনি খুশি হয়েছেন দুলালকে চমকে দিয়ে। দুলাল কল্পনাই করতে পারে নি এই দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে স্যার বিয়েতে আসবেন।

২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারির শেষে ঠিক হলো আমরা এবার খুব কাছের একটি ভারতীয় শহর আগরতলায় যাব। আগরতলা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে ত্রিপুরার সঙ্গে। মার্চের প্রথম সপ্তায় বিআরটিসির ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিসে করে আগরতলা পৌঁছলাম আমরা। স্যারের নেতৃত্বে এবারের সফরের সদস্য সংখ্যা ১৫। এই দলে আছেন লেখক ইমদাদুল হক মিলন, অধ্যাপক শফি আহমেদ, প্রকাশক আলমগীর রহমান, স্থপতি ফজলুল করিম প্রমুখ। আখাউড়া সীমান্ত পেরিয়ে আগরতলা সীমান্তে প্রবেশ করতেই আগরতলায় আমাদের কিছু সুহৃদ উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। পাঁচ দিন ছিলাম আমরা ত্রিপুরায়। সে সময় আগরতলা বইমেলা চলছিল। একদিন মেলায় গেলাম। সেখানে হুমায়ূন আহমেদ ও ইমদাদুল হক মিলনকে সংবর্ধনা দেওয়া হলো। বাকি চারদিন নানা ট্যুরিস্ট স্পট ঘুরে ঘুরে দেখলাম। রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত কিছু স্থান ছিল। কিছু প্রাচীন মন্দির ছিল। আগরতলা থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে পানিবেষ্টিত প্রাসাদ 'নিরমহল' দেখতে গেলাম। প্রাসাদটি স্যারকে মুগ্ধ করেছিল, তিনি বেশ সময় নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। এটি ত্রিপুরার একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। রাতে এখানে লাইট এন্ড সাউন্ড শো হয়। প্রাসাদের কাছেই পর্যটনের একটি হোটেলে আমরা রাত্রিযাপন করলাম। গভীর রাত পর্যন্ত হোটেলের ভেতরেই একটা খোলা চত্বরে জমজমাট আড্ডা হলো। যেখানে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম সেখানে থেকে দেখা যাচ্ছিল জলের বুকে ভেসে আছে 'নীরমহল'। এই আড্ডায় যোগ দিয়েছিলেন আমাদের ত্রিপুরার কিছু বন্ধু। শচীন দেব বর্মনকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে নানা প্রসঙ্গে অনেক কথা হলো। কারণ আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন শচীনের বংশধর কবি রাতুল দেব বর্মন। সবার অনুরোধে শাওন কয়েকটি গান গাইলেন। এই ত্রিপুরা ভ্রমণের কথা হুমায়ূন আহমেদ তাঁর *দেখা না-দেখা* গ্রন্থে বিশদ উল্লেখ করেছেন।

আরও বহু ভ্রমণে তাঁর সঙ্গী হয়েছি। সবশেষ ভ্রমণটি ছিল সুন্দরবন। ২০০৯ সালের ১১ জানুয়ারি থেকে ৫ দিনের নৌযাত্রা। ঢাকার সদরঘাট থেকে জাহাজে চেপে সুন্দরবন যাওয়া ও ফিরে আসা। অসাধারণ সেই অভিজ্ঞতা। সত্যি বলতে কী, তাঁর সঙ্গে প্রতিটি ভ্রমণই যেন আনন্দদায়ক এক-একটি উপাখ্যান।

ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা প্রিয়জনদের সঙ্গে আড্ডা দিতে খুব পছন্দ করতেন তিনি। এই আড্ডার প্রসঙ্গ তাঁর অনেক লেখায় উল্লেখ করেছেন। আড্ডার একটা নামও দিয়েছিলেন তিনি—'Old Fools' Club' (বৃদ্ধ বোকা সঙ্ঘ)। এই সঙ্ঘের সভ্যদের বেশিরভাগই তাঁর বয়সী। 'অন্যদিন' গ্রুপের আমরা এবং আরও দু'চারজন বয়সে তাঁদের চেয়ে বেশ ছোট। কখনো কখনো আড্ডায় আমরাই হয়ে উঠতাম সংখ্যায় ভারী। তবে তাতে আড্ডার রসাস্বাদনে ছেদ ঘটত না কোনো। স্যার তখন বলতেন, শিং ভেঙে এখন আমি বাছুরের দলে। আড্ডার কোনো ধরাবাঁধা বিষয় ছিল না। আলোচনার সূত্রপাত সাধারণত স্যারই করতেন এবং মূল বক্তাও তিনি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সবাই আমরা তাঁর কথা শুনতাম। সার্বক্ষণিক লেখালেখির জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক পদ থেকে ইস্তফা দেন। রসায়ন ছিল তাঁর নিজের বিষয়। আড্ডার বিষয় হিসেবে রসায়ন উঠে আসত প্রাসঙ্গিকভাবে। তবে তা বিজ্ঞানের রসকষহীন কচকচানি নয়। সাধারণ বিজ্ঞান বা পপুলার সায়েন্স নিয়ে আলোচনা হতো। ধর্ম ও জ্যোতির্বিদ্যায় স্যারের আগ্রহ ও পড়াশোনা ছিল ব্যাপক। আলোচনায় আসত তাও। রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলসঙ্গীত কিংবা সিলেট-ময়মনসিংহ অঞ্চলের মরমী শিল্পীদের গান আলোচনার বিষয় হয়েছে বহুবার। জ্যোতিষ শাস্ত্র, জাদুবিদ্যা, ব্ল্যাক ম্যাজিক, হিপনোটিজম—আলোচনা হতো এগুলো নিয়েও। সাহিত্যের প্রসঙ্গ এসব আড্ডায় খুব কমই এসেছে। যেটুকু আলোচনা সাহিত্য নিয়ে হতো, আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করতাম সাহিত্য-বিষয়ে তাঁর পড়াশোনা কত গভীর ও ব্যাপক। শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, বিশ্বসাহিত্যও ছিল তাঁর পাঠতালিকার অন্তর্ভুক্ত। মুগ্ধ হয়ে আমরা উপভোগ করতাম রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দের দীর্ঘ কবিতার মুখস্থ পাঠ তাঁর কণ্ঠে। একের পর এক কবিতা পাঠ করে যেতেন তিনি। আড্ডায় স্যার নিজের কোনো নতুন লেখা পড়ে সবার মতামত জানতে চাইতেন। অনেক আড্ডার উপলক্ষ ছিল তাঁর নাটক বা চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য পাঠ, কখনো নাটক-টিভিতে প্রচারের আগে বাসায় ভিডিও-তে দেখা। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের কোনো ম্যাচ থাকলে সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে পুরোটা সময় জুড়ে চলত খেলা দেখা আর আড্ডা। আড্ডার উপলক্ষ খুঁজে পেতে স্যারকে খুব একটা ভাবতে হতো না। বিষয়টা অনেকটা এরকম—আজ সারা দিন ঝলমলে রোদ ছিল, তাই সন্ধ্যায় আড্ডা; কিংবা আজ আকাশের মন ভার ছিল দিনভর, আড্ডা তো তাই হতেই হবে। মাঝে মাঝে আড্ডার কিছু বিশেষ উপলক্ষ তৈরি হতো, তখন আড্ডায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বেড়ে যেত। অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি বা বিদেশিও বিভিন্ন সময়ে এইসব আড্ডায় যোগ দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের দুই বিখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও সমরেশ মজুমদার বেশ কয়েকটি আড্ডায় উপস্থিত থেকেছেন। সুনীল তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণমূলক রচনায় লিখেছেন,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হুমায়ূন আহমেদ আড্ডায় বসে যেসব চমৎকার গল্প করেন সেগুলি রেকর্ড করে রাখা উচিত।...' সূর্যাস্তের পর স্যার লেখালেখি করতেন না, ঘুমুতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এই সময়টা আড্ডায় কাটাতে পছন্দ করতেন। এই আড্ডাগুলোর সিংহভাগই ছিল 'দখিন হাওয়া'র ফ্ল্যাটে কিংবা নুহাশপল্লীতে।

সতের বছরের অসংখ্য স্মৃতি তাঁকে ঘিরে। আনন্দময় সব স্মৃতি স্মরণে এলেই মনটা বিষণ্ন হয়ে ওঠে। চোখ ভেসে যায় জলে। মনে পড়ে, প্রথম যেদিন নুহাশপল্লীতে গিয়েছিলাম শ্রাবণের অঝোর ধারা ঝরছিল। প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে গাড়ি রেখে নৌকায় উঠেছিলাম আমরা। প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে নুহাশপল্লীর ঘাটে পৌছালাম। তখন সেখানে 'শ্রাবণ মেঘের দিন' চলচ্চিত্রের শুটিং চলছিল। স্যার আমাদের স্বাগত জানালেন তাঁর আপন ভুবনে। স্যারের স্বপ্নের সেই নুহাশপল্লীতেই তাঁকে আমরা চিরবিদায় জানালাম ২৪ জুলাই। এও শ্রাবণেরই এক বর্ষণমুখর দিন। আকাশের কান্না আর অগণিত ভক্তের চোখের জলে একাকার শাল-গজারির বন।

স্যার এখন এক অদেখা ভুবনের বাসিন্দা। সেখানে ইহজাগতিক কোনো প্রিয়জনের প্রবেশাধিকার নেই। তাই বলে তিনি নিঃসঙ্গ নন। তাঁর চারপাশে পত্রপুষ্পশোভিত বৃক্ষরাজি। তাদের সঙ্গেই তাঁর জম্পেশ আড্ডা, বৃষ্টিযাপন তাদেরই সঙ্গে। আকাশে চিরপূর্ণিমার চাঁদ। যে চাঁদের ছায়া পড়েছে ময়ূরাক্ষী নামের এক নদীতে। সেই নদীর স্বচ্ছ জলে সারাক্ষণ খেলা করে জোছনার ফুল। দূরের বন থেকে ভেসে আসে অপার্থিব সংগীত।... আর আমরা, এই ভুবনে তাঁর সহচরেরা, মস্তিষ্কের নিউরনে শত-সহস্র স্মৃতি নিয়ে নিঃসঙ্গতার তীব্র এক হাহাকারে কেবলই খুঁজে ফিরি তাঁকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্পবলিয়ে হুমায়ূন আহমেদ

আবদুশ শাকুর

অকালে লোকান্তরিত অনন্যসাধারণ কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ সম্পর্কে আমি অল্প কয়েকটা কথা বলার অধিকার বোধ করছি। এই অধিকার তাঁর সঙ্গে আমার একটি বিশেষ সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত। সম্পর্কটি হল কোনো সম্পর্ক না থাকার সম্পর্ক। তাঁর সঙ্গে কখনো আমার দেখা হয় নি, হয় নি ফোনে কথাও কোনোদিন। এটা সম্পূর্ণই আমার অজ্ঞাতবাসপ্রসূত, অন্য কোনো কারণজনিত নয়। আমাদের সম্পর্কটি তাই একান্তই অ্যাকাডেমিক। আমার মূল্যায়নে একরত্তি মূল্য বর্তালেও, তা বর্তাবে কেবল এ কারণে। কথাটা একটু খুলে বলছি।

এই স্মারকগ্রন্থে কোনো অপ্রিয় সত্য উচ্চার্য নয় জেনেও পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আমাকে উচ্চারণ করতে হচ্ছে যে বহুল আলোচিত 'রবীন্দ্র-দূষণে'র মতো 'হুমায়ূন-দূষণে'রও একটা গুঞ্জন 'বোদ্ধামহলে' বহুদিন ধরেই চলেছে। এ বিষয়ে ফিসফিস শুনলেই আমার মনে পড়ে যায় 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিধার্য মন্তব্যটি : 'বঙ্গদেশে রবিবাবুকে তুচ্ছজ্ঞান না করিলে বিজ্ঞ হওয়া যায় না।' শতবর্ষ পূর্বের কথাটা ধার করে বলা যায় : 'বাংলাদেশে হুমায়ূন আহমেদকে তুচ্ছজ্ঞান না করলে বিজ্ঞ হওয়া যায় না'।

সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৩১ সালে আয়োজিত তাঁর জীবৎকালের বৃহত্তম জন্মজয়ন্তি অনুষ্ঠানটিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের অভিভাষণে 'রবীন্দ্র-দূষণে'র ধরনটি বর্ণনা করেছিলেন এইভাবে : 'এমন অনবরত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মতো আর কোনো সাহিত্যিককেই সইতে হয় নি।'

পরিণত বয়সে যখন তিনি দেশবরেণ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী তখনও তাঁকে অত্যন্ত অশ্রদ্ধার সঙ্গে লাগাতার হেয় করার কারণে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কবি এবং সে ক্ষোভ অ-ব্যক্তও রাখেন নি। প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র পরিষদের ১৩ ডিসেম্বর ১৯২৭ সালের সভায় কবি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন :

> '...দেশের লোক কাছের লোক—তাঁদের সম্বন্ধে আমার ভয়ের কথাটা এই যে, তাঁরা আমাকে অনেকখানি দেখে থাকেন, সমগ্রকে সার্থককে দেখা তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।...নানা লোকের ব্যক্তিগত রুচি, অভিরুচি ও রাগ-দ্বেষের ধূলিনিবিড় আকাশে আমি দৃশ্যমান। যে দূরত্ব দৃশ্যতার অনাবশ্যক আতিশয্য সরিয়ে দিয়ে দৃষ্টি-বিষয়ের সত্যকে স্পষ্ট করে তোলে দেশের লোকের চোখের সামনে সেই দূরত্ব দুর্লভ। মুক্ত কালের আকাশের মধ্যে সঞ্চরণশীল যে সত্যকে দেখা আবশ্যক, নিকটের লোক সেই সত্যকে প্রায়ই একান্ত বর্তমান কালের আলপিন দিয়ে রুদ্ধ করে ধরে তার পাখার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিধির পরিমাণ দেখে, কিন্তু ওড়ার মধ্যে সেই পাখার সম্পূর্ণ ও যথার্থ পরিচয় দেখে না।...'

হুমায়ূন আহমেদের লেখালেখি সম্পর্কে তাঁর যার পর নাই প্রিয় ও পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ধৃত মন্তব্যটি একান্তই লাগসই বলে মনে করি। মন্তব্যে ব্যাখ্যাত 'সেই সত্যকে' আমি দেখতে পেয়েছি তাঁর নিকটের লোক বা দূরের লোকও ছিলাম না বলে। দূরের লোক বলতে বোঝাচ্ছি তাঁদের—যাঁরা তাঁর লেখা অনুধ্যান সহকারে পাঠ না করে মন্তব্য করেন।

আমি তাঁর নিম্নবর্ণিত বইগুলো পড়ে এবং নাটক ও চলচ্চিত্রগুলো দেখে মন্তব্য করছি যে হুমায়ূন আহমেদ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতোই সহজাত গল্পবলিয়ে ছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী' আলোচনাকালে রবীন্দ্রনাথ যা অতীব প্রশংসার সঙ্গে লিখেছিলেন, তা ধার করে আমিও লিখতে চাই যে হুমায়ূন আহমেদের উদ্দাম কল্পনাশক্তি আর দারুণ রসবোধ তাঁর সৃজনমাত্রকেই সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর তাবৎ রচনার প্রসাদগুণ অত্যধিক বড়মাপের অনেক উদ্‌যাপিত কথাসাহিত্যিকের রচনায়ও পাই না। 'মুক্ত কালের আকাশের মধ্যে সঞ্চরণশীল যে সত্যকে দেখা আবশ্যক', সে সত্যকে এখন থেকে হুমায়ূন আহমেদের মনোযোগী পাঠক অবশ্যই দেখতে পাবেন বলে আমি আশা করি।

ছোটগল্প : চোখ, অচিন বৃক্ষ, নিশিকাব্য, জীবনযাপন, খেলক, ছায়াসঙ্গী, ভয়, সে, আয়না, রহস্য, জলিল সাহেবের পিটিশন, যন্ত্র, অপেক্ষা, সৌরভ।

উপন্যাস : নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার, অচিনপুর, যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ, মেঘের ওপর বাড়ি, মধ্যাহ্ন, আমি এবং আমরা, চাঁদের আলোয় কয়েকজন যুবক, নি, আমি এবং কয়েকটি প্রজাপতি, নক্ষত্রের রাত, লীলাবতী, বাদশাহ নামদার।

নাটক : এইসব দিন রাত্রি, বহুব্রীহি, কোথাও কেউ নেই, অয়োময়।

চরিত্রাবলি : ময়ূরাক্ষী, দরজার ওপাশে, পারাপার, হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম, হিমুর মধ্যদুপুর, আজ হিমুর বিয়ে (হিমু)।

আমিই মিসির আলি, দেবী, বৃহন্নলা, মিসির আলির চশমা, যখন নামিবে আঁধার, কহেন কবি কালিদাস (মিসির আলি)।

সায়েন্স ফিকশন : তোমাদের জন্য ভালোবাসা, ইরিনা, শূন্য, নিউটনের ভুল সূত্র।

চলচ্চিত্র : আগুনের পরশমণি, শ্রাবণ মেঘের দিন, শ্যামল ছায়া।

WWW.AMARBOI.COM

সাহিত্যের জগতে সকলেই একমত যে হুমায়ূন আহমেদ গল্পের জাদুকর। তাঁর গল্প শুনতেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সর্ব শ্রেণীর পাঠক। ডক্টর ইউনূসের মন্তব্যও প্রকারান্তরে একই কথা বলতে চেয়েছে—হুমায়ূন আহমেদ কেমন করে যেন সকল মানুষের মনের মধ্যে ঢুকে পড়েন। আসলে কেমন করে নয়, ঢুকে পড়েন গল্প বলতে বলতেই। কারণ তিনি জানেন, গল্প শোনা মানুষের চিরন্তন অভ্যাস। হুমায়ূন গল্প মুখে বলেন না, লিখে বলেন। মানুষকেও তাঁর গল্প পড়ে শুনতে হয়। তাই তাঁর লেখা পড়তে ভিড় জমান পাঠক।

প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, এ যুগে গল্প পড়বার—

"এপিডেমিক থেকে মুক্ত শুধু নিরক্ষর লোক—যেমন বেরি-বেরি থেকে মুক্ত শুধু নিরন্ন লোক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু একটু চোখ চেয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি সকল যুগেই মানুষের সর্ব্বপ্রধান মানসিক আহার হচ্ছে গল্প। পৃথিবীর অন্যান্য ভূ-ভাগের কথা ছেড়ে দিয়ে একমাত্র ভারতবর্ষের অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায়, সে অতীত গল্পপ্রাণ। এ দেশে পুরাকালে যত গল্প বলা হয়েছে ও লেখা হয়েছে, অন্য কুত্রাপি তার তুলনা নেই। আমরা ধর্মপ্রাণ জাতি ব'লে বিশ্বে পরিচিত। কিন্তু যুগ যুগ ধ'রে আমাদের ধর্ম্মের বাহন হয়েছে, মুখ্যতঃ গল্প। রামায়ণ মহাভারত বাদ দিলে হিন্দুধর্ম্মের পোনেরো আনা বাদ প'ড়ে যায়, আর জাতক বাদ দিলে বৌদ্ধধর্ম্ম দর্শনের কচকচি মাত্র হয়ে ওঠে। রামায়ণ, মহাভারত, জাতক ছাড়াও এ দেশে অসংখ্য গল্প আছে, যা সেকালে সাহিত্য বলেই গণ্য হ'ত। এ দেশের যত কাব্যনাটকের মূলে আছে গল্প। তা ছাড়া আখ্যায়িকা ও কথা নামে দুটি বিপুল সাহিত্য সেকালে ছিল, এবং একালেও তার কতক অংশের সাক্ষাৎ মেলে। আখ্যায়িকাই বলো আর কথাই বলো, ও দুই হচ্ছে একই বস্তু—শুধু নাম আলাদা। ইংরাজী লজিকের ভাষায় যাকে বলে genus এক species আলাদা।—

এর থেকে স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষের লৌকিক অলৌকিক সকল সাহিত্যের প্রাণ হচ্ছে কথা-সাহিত্য।

কথা-সাহিত্য এ দেশে বিলেত থেকে আমদানী-করা নূতন সাহিত্য নয়। বরং সত্য কথা এই যে, পুরাকালে কথা-সাহিত্য ভারতবর্ষে রচিত হয়ে, তারপর দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। এককালে পঞ্চতন্ত্র ও জাতকের প্রচলন য়ুরোপের লোকসমাজে যে অতি বিস্তৃত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উপরন্তু বহু পণ্ডিতের মতে আরব্য উপন্যাসের জন্মভূমিও হচ্ছে ভারতবর্ষ।

আজ যে আমরা সকলেই গল্প শুনতে চাই, তার কারণ এ প্রবৃত্তি আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি।"

(*সবুজ পত্র*, দশম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ॥ পৌষ, ১৩৩৩)

আসলে মানুষের ইতিহাস যেদিন থেকে শুরু হয়েছে, তার গল্পও আরম্ভ হয়েছে সেদিন থেকে। শ্রমপর্বের অভিজ্ঞতা বর্ণনার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মকে অভিজ্ঞ করে তোলা এবং বিশ্রামপর্বে আনন্দ পরিবেশন করার দ্বৈত প্রেরণা থেকেই মনুষ্যজীবনে গল্পের আবির্ভাব ঘটেছে। (স্মরণ করুন : মানবজীবনের আদিতে দিনভর অ্যাডামের মাটি কোপানো ও ইভের কাপড় বানানোর শেষে সন্ধ্যার অবসরে সন্তানদের কাছে তাঁদের গল্প করার কথা)। পরিবেশ, জীবনযাত্রা এবং আনন্দলাভের প্রয়োজনে সব দেশের মানুষই মোটামুটি অভিন্ন ধারায় গল্প কল্পনা করতে অভ্যস্ত হয়েছে। প্রধান দুটি ধারা—নীতিশিক্ষা আর রূপকথার উপকরণও প্রায় একই রকম। সম্ভবত সকল গল্পের প্রথম নায়কও ছিল অভিন্ন—সূর্য। কারণ প্রাচীন মানুষকে সূর্য আলো দিয়ে নিরাপদ করতো, রোদ দিয়ে তার ফসল ফলাতো, তেজ দিয়ে ফল পাকাতো, বরফ গলাতো, মাছ ভাসাতো এবং আরও অনেক উপকার করতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প-সাহিত্যের ভাগ মোটামুটি তিনটি : Fable অথবা কথা, Anecdote বা আকর্ষণীয় ঘটনা এবং Table কিংবা আখ্যায়িকা। প্রথমটাতে ছোটগল্পের সঙ্কেত, দ্বিতীয়টাতে গল্পের আমেজ আর তৃতীয়টাতে উপন্যাসের আভাস। Fable বা কথা বহু পূর্বেই বিলুপ্ত। বিষ্ণুশর্মা বা ঈশপের মতো প্রাণী-নির্ভর কিংবা মানব-আশ্রয়ী নীতিধর্মী ছোট ছোট গল্পের রেওয়াজ আজ আর নেই। সে-বস্তু বলতে গেলে উনিশ শতকের রুশ সাহিত্যের গল্পের জাদুকর ইভান ক্রাইলভের (Ivan Krilov) সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু টেল্ বা আখ্যায়িকা বা কাহিনী এবং অ্যানিকডোট বা কিস্সা কিংবা কোনো বিশেষ ঘটনার বৃত্তান্ত ছোটগল্পের ছদ্মবেশে এখনও বিদ্যমান। তাই এ-দুটি প্রকরণ সম্বন্ধে ধারণাটা স্পষ্ট রাখা দরকার। দরকার হুমায়ূন আহমেদের গল্পের প্রকৃতি এবং ধারাগুলো বোঝার জন্য।

'আখ্যায়িকা' অতি পুরাতন কথাসাহিত্য এবং তা একাই জমিয়ে রেখেছে জাতক, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎ-সাগর, দশকুমার-চরিত, শুকসপ্ততি, আরব্য উপন্যাস (আল্‌ফ লায়লা), তার নবতর সংস্করণ পারস্য উপন্যাস (হাজার আফসানে), দেকামেরন এবং উপদেশাত্মক গল্পমালার বৃহত্তম ইয়োরোপীয় সংস্করণ গেস্তা রোমানোরাম (রোমানদের কার্যকলাপ) বা সংক্ষেপে গেস্তা, ক্যান্টারবেরি টেল্‌স, গারগাঁতুয়া, পাঁতাগ্রুয়েল। সংকলিত এসব আখ্যান গল্পরসে টইটম্বুর এবং বৈচিত্র্যে জমজমাট। কিন্তু খণ্ড তার মধ্যে অখণ্ডের হদিস মেলে দেয় না। মানুষের সহজাত গল্প বলার প্রেরণা থেকেই এদের উদ্ভব। তাই সাধারণত কোনো ব্যঞ্জনা নিহিত থাকে না এদের বুনটে, পাওয়া যায় না ইঙ্গিতধর্মী একমুখিতা বা অনন্য কোনো মহামুহূর্ত। পাওয়া যায় বরং ঘটনাবহুল, এমনকি দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়, শিথিল-পৃথুল উপন্যাসেরই জৌলুস। বর্ণিত নেতিধর্মী এবং ইতিধর্মী, এইসব চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই আখ্যায়িকা ছোট হলেও ছোটগল্প হয়ে ওঠে না; ভেজাল হিসাবে ছোটগল্পের দলে ভিড়ে গেলেও সহজেই ধরা পড়ে যায়।

কিন্তু তেমন সহজে ধরা পড়ে না 'অ্যানিকডোট' বা 'কথানক' বা 'বৃত্তান্ত'-নামক ছদ্মবেশী ছোটগল্প। কারণ সে জন্মগতভাবে ছোটগল্পেরই সহোদর। দুই ভাইয়ের মধ্যে 'শর্ট স্টোরি' যেন কবি-স্বভাবের দার্শনিক আর 'অ্যানিকডোট' যেন ব্যবহারিক স্বভাবের সাংসারিক। 'ছোটগল্প' গৃহী-সন্ন্যাসীও হতে পারে, কিন্তু কথানক বা বৃত্তান্ত নিতান্তই গৃহী। এই গৃহীটিকে চেনার প্রথম উপায়টি হল তার দ্ব্যর্থহীন অন্তিম যতি। ওটি এমনই পূর্ণতা-সূচক যে এর পরে যেমন তার নিজের কোনো কথা থাকে না, তেমনি পাঠকেরও কোনো কথা জন্মায় না। কারণ ওটা এমন একটা 'ঘটিত' ঘটনা— যা পড়বার পরে একান্তভাবেই শেষ হয়ে যায়—'শেষ হয়ে হইল না শেষ' বলে মনে হয় না পাঠকের। ফলে 'শেষ' করার আকুলিবিকুলিতে তাঁর মনে নিজস্ব কোনো সৃষ্টি-প্রক্রিয়াও আনাগোনা করে না। কারণ অ্যানিকডোট একটা 'ফিনিশ্‌ড প্রোডাক্ট', প্রতিপক্ষে ছোটগল্প যেন 'আন্‌ফিনিশ্‌ড'।

অ্যানিকডোটের সমার্থক যুৎসই কোনো বাংলা প্রতিশব্দ আমি পাচ্ছি না। এর পরিভাষা হিসাবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্যে ছোট গল্প'-শিরোনামক গ্রন্থের 'রূপতত্ত্ব'-অনুশিরোনামক দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যবহার করেছেন 'বৃত্তান্ত'। আমার মতে শব্দটিতে অ্যানিকডোটের অর্থের অপরিহার্য কিছু দিক বাদ পড়ে যায়। দেশি-বিদেশি সকল প্রামাণ্য শব্দকোষ একমত যে অ্যানিকডোটকে হতে হবে 'ছোট', 'মজাদার' বা 'আকর্ষণীয়', 'প্রকৃত কোনো ব্যক্তি কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা সম্পর্কিত'। এসবের একটিকেও আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে না বৃত্তান্ত-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দটি। যেমন 'আব্রাহাম লিংকন সম্বন্ধে অনেক অ্যানিকডোট আছে', 'ওয়ার-হেরো আলেক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কিত অনেক অ্যানিকডোট জানে'। এই বাক্য-দুটি অ্যানিকডোট-শব্দটি দিয়ে যা বোঝাচ্ছে, 'বৃত্তান্ত'-শব্দটি দিয়ে তা বোঝানো যাবে না; উল্টে বাক্যগুলির ভাবার্থে বিভ্রান্তিও ছড়াবে। বিভ্রান্তি না-ছড়িয়ে অনেকটাই বোঝানো যাবে বরং 'গল্প'-শব্দটি দিয়ে। যেমন লিংকন সম্বন্ধে অনেক 'গল্প' আছে, আলেক মহাযুদ্ধ সম্পর্কে অনেক 'গল্প' জানে। এজন্যেই গণসম্প্রচার সংস্থা 'ভয়েস অব অ্যামেরিকা' মেজর 'স্টোরিজ অব দ্য ডে' প্রচার করে। নিউজ কিংবা রিপোর্ট নয়, 'স্টোরি' তথা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আমি বলতে চাই, ইঙ্গিতপূর্ণ এবং ব্যঞ্জনাময় 'শর্ট স্টোরি'-কে আমরা যখন 'ছোটগল্প' বলছি, তখন ইঙ্গিতবিহীন-ব্যঞ্জনাহীন 'অ্যানিকডোট'কে তো 'স্টোরি' বা 'গল্প'ই বলতে পারি। 'বৃত্তান্ত' তো ঠিক কাহিনীও নয়—সংবাদ বা বিবরণ কিংবা প্রতিবেদন। অ্যানিকডোট কিন্তু সংবাদ নয়, গল্পই। অতএব আমার পরিভাষায় 'টেল্' হল 'কাহিনি', 'ফেবল' বা কথার জায়গায় চলুক 'ছোটগল্প' আর 'অ্যানিকডোট'কে বলা হোক 'গল্প'। এই গল্প হল 'শেষ হয়ে হইল' যে 'শেষ'।

অ্যানিকডোট নিয়ে এই তুলকালামের কারণ : আমার উপস্থিত উপজীব্য হুমায়ূন আহমেদের গল্পে, ছোটগল্পে, এমনকি উপন্যাসে তাঁর সমধিক কৃতিত্ব প্রত্যক্ষদৃষ্ট চরিত্রাবলির বা ঘটনাবলির সম্যক চিত্রণে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতীতির গল্পরূপায়ণে। তাঁর দেখা বা শোনা এইসব বাস্তবভিত্তিক চরিত্রাবলী এবং ঘটনাবলি অ্যানিকডোটধর্মী। [অ্যানিকডোটের সংজ্ঞা : short, usually amusing, story about some real person or event, (Oxford Advanced Learner's Dictionary)]।

AMARBOI.COM

তবে কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদের কুশলী রূপায়ণে অনেক অ্যানিকডোটই যে-কোনো সমালোচকের বিবেচনায় সার্থক ছোটগল্পে উত্তীর্ণ। প্রমথ চৌধুরীর নিরিখে তো বটেই। তিনি বলেছেন :

> "মাসিক সাহিত্যের প্রধান সম্বল হচ্ছে ছোটোগল্প। এই ছোটোগল্প কী ভাবে লেখা উচিত সে বিষয়েও আজকাল আলোচনা শুরু হয়েছে। এও আর-একটি প্রমাণ যে, লেখবার বিষয়ের অভাববশতই লেখবার পদ্ধতির বিচারই আমাদের দায়ে পড়ে করতে হয়।
>
> এ সম্বন্ধে আমার দুটি কথা বলবার আছে। আমার মতে ছোটোগল্প প্রথমে গল্প হওয়া চাই তার পরে ছোটো হওয়া চাই; এ ছাড়া আর-কিছুই হওয়া চাই নে।
>
> যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে 'গল্প' কাকে বলে, তার উত্তর 'লোকে যা শুনতে ভালোবাসে'। আর যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন 'ছোটো' কাকে বলে, তার উত্তর 'যা বড়ো নয়'।
>
> এর উত্তরে পাঠক আপত্তি করতে পারেন যে ডেফিনিশনটি তেমন পরিষ্কার হল না। এ স্থলে আমি ছোটোগল্পের তত্ত্ব নির্ণয় করবার চেষ্টা করছি। এবং আশা করি সকলে মনে রাখবেন যে তত্ত্বকথা এর চাইতে আর পরিষ্কার হয় না। এর জন্য দুঃখ করবারও কোনো কারণ নেই; কেননা, সাহিত্যের তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে সাহিত্য রচনা করা যায় না। আগে আসে বস্তু, তার পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার তত্ত্ব। শেষটি না থাকলেও চলে, কিন্তু প্রথমটি না থাকলে সাহিত্যজগত শূন্য হয়ে যায়।" (পৃ. ১৫৮, টীকা ও টিপ্পনি, *বীরবলের হালখাতা*)।

ছোটগল্প বিষয়ক আলোচনায় প্রমথ চৌধুরী অন্যত্র আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন : 'ট্র্যাজি-কমেডিই হচ্ছে ছোটোগল্পের প্রাণ'। (ছোট গল্প, *সবুজ পত্র*, পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা)। চৌধুরীমশায়ের এ মন্তব্য হুমায়ূন আহমেদকে মহান ছোটগল্পকারের মর্যাদায় আসীন করে। কেননা তাঁর ছোটগল্প যুগপৎ হাস্যরস ও করুণরসে মণ্ডিত।

গল্প-উপন্যাস-নাটক-সিনেমা-কলাম সব কিছুতেই দেখা মিলবে গল্পবলিয়ে হুমায়ূনের। এখানে আমি উদাহরণ দেব তাঁর যে লেখা থেকে সেটা তাঁর প্রয়াণের এক সপ্তাহ পরে (২৬ জুলাই ২০১২) স্মরণিক স্তম্ভস্বরূপ সংকলিত হয়েছে *দৈনিক প্রথম আলোর* উপসম্পাদকীয় কলামে–'যোগাযোগমন্ত্রীর পদত্যাগ'-শিরোনামে।

কলামটির আরম্ভ এ রকম :

> [এখানে যে যোগাযোগমন্ত্রীর গল্প বলা হচ্ছে তিনি আওয়ামী লীগ, বিএনপি বা এরশাদ আমলের মন্ত্রী নন। অন্য কোনো আমলের। তবে আনন্দের বিষয়, সব আমলের জিনিস একই।—লেখক]
>
> যোগাযোগমন্ত্রী সালাহউদ্দিন খান ভুলু সাহেবের দুপুরে কিছুক্ষণ ঘুমানোর অভ্যাস। মন্ত্রীর কঠিন দায়িত্ব পালনের সময়ও তিনি এই অভ্যাস বহাল রেখেছেন। একটু উনিশ-বিশ অবশ্য হচ্ছে; আগে ঘুমানোর সময় একজন গায়ের ঘামাচি মেরে দিত, এখন সেটা সম্ভব হচ্ছে না। প্রায়ই ভাবেন, পলিটিক্যাল পিএসকে ঘামাচি মারতে বলবেন। সে আগ্রহ নিয়ে কাজটা করবে। একটাই ভয়, কোনো পত্রিকায় যদি নিউজ চলে যায়! পত্রিকাগুলো চলে গেছে দুষ্টদের দখলে। তারা সম্মানিত মন্ত্রীদের ওপর টেলিস্কোপ ফিট করে রেখেছে। আরাম করে ১০ মিনিট ঘুমানোর উপায়ও নেই।
>
> সালাহউদ্দিন খান ভুলু দিবানিদ্রা সেরে উঠেছেন। মন-মেজাজ এখনো ধাতস্থ হয় নি। তিনি কয়েকবার হাই তুললেন। এই সময় তাঁর পিএস (সরকারি) ঢুকলেন। বিনীত গলায় বললেন, স্যারের ঘুম ভালো হয়েছে?
>
> মন্ত্রী বললেন, আমি আপনাকে অনেকবার বলেছি, দুপুরে আমি ঘুমাই না। চোখ বন্ধ করে একধরনের যোগব্যায়াম করি। 'শবাসন' এই ব্যায়ামের নাম। এতে টেনশন কমে।
>
> পিএস বললেন, স্যার, সরি। আমি যোগব্যায়ামের ব্যাপারটা বুঝতে পারি নি। আপনার নাক ডাকার শব্দে বিভ্রান্ত হয়েছি।
>
> আর বিভ্রান্ত হবেন না। নাক ডাকা না। দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলা যোগব্যায়ামেরই অংশ। আমার নাকে পলিপ আছে বলে দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় নাক ডাকার মতো শব্দ হয়। এখন ক্লিয়ার হয়েছে?
>
> অবশ্যই, স্যার।
>
> কোনো কাজে এসেছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা রোড অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। মাইক্রোবাস ভেঙে গুঁড়া হয়ে গেছে। পাঁচজন মারা গেছে।

অ্যাকসিডেন্ট হলে মানুষ মারা যাবে, এটা নতুন কী ? এই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আপনি আমার কাছে এসেছেন ?

মাইক্রোবাস দুর্ঘটনায় কিছু বিখ্যাত মানুষ মারা গেছেন। যাঁরা আহত, তাঁদের দেখতে যাওয়া উচিত।

বিখ্যাত মানুষ কে মারা গেল ?

পিএস বিখ্যাত মানুষদের তালিকা বললেন।

মন্ত্রী বিরক্ত গলায় বললেন, এরা বিখ্যাত হলো কবে ? আমি তো নামও শুনি নাই। মিডিয়া এদের বিখ্যাত বানিয়েছে। সব মিডিয়ার কারসাজি। দেশটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে মিডিয়া।

যথার্থ বলেছেন। তবে মিডিয়াকে অগ্রাহ্য করা ঠিক হবে না।

আমাদের এই মুডি মন্ত্রী নানা ধরনের কথাবার্তা বলা শুরু করলেন। মিডিয়া তাঁকে নিয়ে কিছু কাজকর্ম করল। মন্ত্রী যখন গাড়ি নিয়ে রাস্তার বেহাল দশা দেখতে গেলেন, তখন বদগুলো তাঁর হাসিমুখের ছবি ছাপাল। রাস্তায় বিশাল এক গর্তের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি হাসছেন—এ রকম ছবি। এই অপরাধ ক্ষমা করা যায়, কিন্তু তাঁর পদত্যাগ চেয়ে প্রতিবেদন ক্ষমা করা যায় না। বাংলাদেশের ইতিহাসে কখনো কোনো মন্ত্রী পদত্যাগ করেছে ? মন্ত্রীরা হলেন কচ্ছপ। কচ্ছপের মতো কামড় দিয়ে তাঁরা মন্ত্রিত্ব ধরে রাখবেন। এটাই নিয়ম।

AMARBOI.COM

মন্ত্রী তাঁর রাজনৈতিক সচিবের পরামর্শে কিছু জটিল পদক্ষেপ নিয়ে নিলেন। একজন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। একটা ছোট্ট সমস্যা তাতে হলো; দেখা গেল, সবাই দুর্নীতিবাজ। রসুনের বোঁটা অবস্থা। একজনকে শাস্তি দিলে বাকিরা খেপে যাবে। ওদের গায়ে হাত দেওয়া যাবে না। কাজেই অনেক ঝামেলা করে একজন সৎ কর্মচারী খুঁজে তাঁকে বরখাস্ত করা হলো।

মন্ত্রী মহোদয় সব পত্রিকায় তাঁর একটি ছবি পাঠালেন। সেই ছবিতে তিনি কোদাল হাতে ভাঙা রাস্তার পাশে দাঁড়ানো। নিচে লেখা, 'মন্ত্রী মহোদয় নিজেই রাস্তা মেরামতে নেমে পড়েছেন'।

কোনো পত্রিকা এই ছবি ছাপাল না, উল্টো এক বদ পত্রিকা এই ছবি নিয়ে কার্টুন বানিয়ে ছাপিয়ে ফেলল। কার্টুনে দেখা যাচ্ছে, রাক্ষস টাইপ চেহারার এক লোক খালি গায়ে খাকি হাফপ্যান্ট পরে বেলচা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ের এবং পায়ের বড় বড় লোম দেখা যাচ্ছে। কার্টুনের নিচে লেখা, 'যোগাযোগমন্ত্রী বলেছেন, আমি একাই ৩৫০ কিলোমিটার রাস্তা মেরামত করব, ইনশাআল্লাহ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক সকালবেলার কথা। মন্ত্রীর স্ত্রী সালমা বানু (বিশিষ্ট সমাজসেবী, পরিবেশ রক্ষাকর্মী, বিপন্ন হনুমান বাঁচাও আন্দোলনের সভানেত্রী) তাঁর স্বামীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, আমাকে না জানিয়ে, আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে তুমি কী করে এই কাজ করলে ?

মন্ত্রী বললেন, কী কাজ করলাম ?

পদত্যাগ করেছ, আমাকে না জানিয়ে।

পদত্যাগ করব কোন দুঃখে ?

পত্রিকায় নিউজ এসেছে। এই দেখো।

মন্ত্রী মহোদয় হতভম্ব হয়ে পড়লেন, 'যোগাযোগমন্ত্রীর পদত্যাগ। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, মন্ত্রী মহোদয় স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন।'

হতভম্ব মন্ত্রী তাঁর পিএসকে টেলিফোন করলেন। অনেকবার রিং হলো, পিএস ধরলেন না। তিনিও নিউজ পড়েছেন। এখন যে মন্ত্রী নন তাঁর টেলিফোন কেন ধরবেন! আমজনতার টেলিফোন ধরার কিছু নেই।

মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক পিএসকে টেলিফোন করলেন। পিএস তাঁর কোনো কথা না শুনেই বললেন, পদত্যাগ করে ভালো করেছেন। দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। আচ্ছা রাখি।

AMARBOI.COM

মন্ত্রী লাইন কেটে দেওয়ার পর আরেকবার চেষ্টা করলেন, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব টেলিফোন ধরলেন না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি লক্ষ করলেন, পত্রিকার এই বানোয়াট খবর সবাই বিশ্বাস করে বসে আছে। তাঁর নিরাপত্তায় নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীর সাব-ইন্সপেক্টর সিগারেট ফুঁকছিল, তাঁকে দেখে সিগারেট ফেলে না দিয়ে শুধু পেছনে আড়াল করল।

মন্ত্রী মহোদয় প্রধানমন্ত্রীকে ধরার অনেক চেষ্টা করলেন। তাঁর চেষ্টা দেখতে পেলে রবার্ট ব্রুসও লজ্জা পেত। একসময় চেষ্টা সফল হলো। প্রধানমন্ত্রী টেলিফোন ধরলেন এবং বললেন, আপনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে একটি সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন। আপনাকে অভিনন্দন। মন্ত্রী না থেকেও জনগণের সেবা করা যায়। জনগণের সেবা করুন।

প্রধানমন্ত্রী টেলিফোন রেখে দিলেন।"

[গল্পের মোরাল : মন্ত্রীদের বুকে এবং পায়ে লোম না থাকা বাঞ্ছনীয়।]

প্রতিভাবান গল্পবলিয়ের চমৎকার গল্পকথনের অন্তে যোজিত পাদটীকাটি প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। এক, এই লেখক অসংকোচে 'মরাল'কে 'মোরাল' লিখতে পারেন। দুই, সূক্ষ্ম রসের লেখাটির সঙ্গে অহেতুক যুক্ত হয়েছে স্থূলরস। বিষয়বস্তু-বিশেষজ্ঞদের এ ধরনের প্রশ্নের জবাব চেয়েছেন হুমায়ূন আহমেদের অনেক সাক্ষাৎকারী। তাঁরা আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলেছেন তাত্ত্বিকদের মতে এ ধরনের অযত্নে তাঁর লেখায় নান্দনিকতা ক্ষুণ্ন হয়, তাঁর পরিবেশিত রস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরেকটু গাঢ় হওয়া বাঞ্ছনীয়, বা সার্বিকভাবে তাঁর লঘুপাকের কথাসাহিত্য আরেকটু কড়াপাকের হওয়া কাম্য। এসব প্রশ্নে সাক্ষাৎকারে হুমায়ূনের জবাব হতো তাঁর স্বভাবসুলভ—এটাই আমার স্বাভাবিক পাক, আমি জানি আমি কী করছি। সুতরাং আমি চলবো আমার পথে, তাত্ত্বিকরা তাঁদের পথে চলতে পারেন।

প্রকারান্তরে হুমায়ূন আহমেদ প্রমথ চৌধুরীর উপরে বর্ণিত কথাটাই বলেছেন :

> সাহিত্যের তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে সাহিত্য রচনা করা যায় না। আগে আসে বস্তু, তার পরে তার তত্ত্ব। শেষটি না থাকলেও চলে, কিন্তু প্রথমটি না থাকলে সাহিত্যজগত শূন্য হয়ে যায়।

সাহিত্যস্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির পালা শেষ করে অতীতকালে চলে গেছেন। এবার তত্ত্ববোদ্ধা তাঁর ব্যাখ্যা করে যাবেন অনন্তকাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথভোলা এক পথিক

আবেদ খান

রবীন্দ্রনাথ তাঁর *কণিকায়* লিখেছেন, 'আকাশেতে আমি রাখি নাই মোর উড়িবার ইতিহাস/ তবু উড়েছিনু এই মোর উল্লাস।' হুমায়ূন আহমেদ তাঁর সাহিত্য-জীবনে ঠিক এভাবেই নিজের আনন্দে স্বাধীনভাবে বিচরণ করেছেন। এই বিচরণের বিষয়টি সাহিত্যাঙ্গনে কীভাবে বিবেচিত বা বিশ্লেষিত হবে তা নিয়ে তিনি এতটুকু মাথা ঘামান নি। তাঁর সৃষ্টি শিল্পের বিচারে উত্তীর্ণ হয়েছে কি হয় নি সেটা ভাবছেন তারাই যাঁরা 'পাত্রাধার তৈল না তৈলাধার পাত্র' সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে গলদঘর্ম হয়ে যান। কিন্তু সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনসংলগ্ন সাহিত্যকর্মটি যিনি কখনো উদ্ধত কখনো বিনীত ভঙ্গিতে আবালবৃদ্ধবনিতার হাতে অকপটভাবে তুলে দিতে পেরেছেন তিনি হুমায়ূন আহমেদ। তুর্কি কবি নাজিম হিকমত শিল্পের জন্য শিল্প না মানুষের জন্য শিল্প—এই প্রশ্নে অকুণ্ঠচিত্তে যে রায়টি দিয়েছেন তা হলো—'সেই শিল্পই খাঁটি যা মানুষকে জীবন সম্পর্কে মিথ্যে ধারণা দেয় না।' শিল্প-সাহিত্য কখনো গগনচারী নয় এ কথাটি মানুষের জন্য যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করতে চেয়েছেন তাঁরা সবসময় মাথায় রেখেছেন। তাঁদের শিল্পসাধনা হবে বৃক্ষের মতো যার শেকড় মাটিতে থাকলেও দৃষ্টি থাকবে আকাশের দিকে। হুমায়ূন সেই জাতেরই সাহিত্যস্রষ্টা।

একবার এক পাঠক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অনুযোগ করে বলেছিলেন, 'আপনার লেখা পাঠ করে তো আমরা বুঝি, কিন্তু কবিগুরুর লেখা তো বুঝি না। কারণ কি বলতে পারেন?' তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'কারণটি তো সহজ। আমি লিখি আপনাদের জন্য কিন্তু তিনি লেখেন আমাদের জন্য।' হুমায়ূন এভাবে বলতেন না বটে তবে নানা রসিক মন্তব্যের মধ্য দিয়ে এ ধরনেরই বক্তব্য প্রকাশ করে যেতেন।

২

হুমায়ূন আহমেদকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ যেমন হয়েছে তেমনি দূর থেকেও দেখেছি তাঁকে। আমি তাঁকে চিনেছি প্রথম তাঁর লেখা *নন্দিত নরকে* আর *শঙ্খনীল কারাগার* দিয়ে। গতানুগতিকতার একটু বাইরে সাবলীল প্রকাশভঙ্গিটি চমকে দেওয়ার মতো। এরপর দীর্ঘ দিনের যতি। হুমায়ূন তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য পড়াশোনা করছেন বলেই হয়তো-বা। তবে আমার স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় আমাদের বিবাহ-পূর্বকালের—তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহপাঠী হিসেবে। শুনেছি বন্ধুর কাছে যেতেন প্রায়ই। তবে তখন তিনি এই হুমায়ূন আহমেদ হয়ে ওঠেন নি। *নন্দিত নরকে* কিংবা *শঙ্খনীল কারাগার*-এর হুমায়ূন আহমেদ সাহিত্যমহলের নজর কেড়েছিলেন বটে তবে সে ক্ষেত্রটি ছিল খুবই সীমিত। আসল ঝাঁকুনিটি তিনি ঠিকই দিতে পেরেছিলেন টেলিভিশনের পর্দায়। তাঁর সংলাপ কোনো বানানো সংলাপ নয়, একেবারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আড়ম্বরহীন সাদামাটা ভাষা—যেন পাহাড়ের গা বেয়ে ঝর্ণার দুরন্ত জলধারার মতো নেচে নেচে কলকল শব্দে নামছে অবিরল। প্রথমে নাটক, তারপর ধারাবাহিক—তারপর দুটোই। তখন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ছিল না। কেবলমাত্র বাংলাদেশ টেলিভিশন। দর্শক হুমড়ি খেয়ে পড়ল টিভি পর্দায়। জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীরা হুমায়ূনের নাটকের চরিত্র পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হলেন। এর পাশাপাশি চলতে থাকল তাঁর গ্রন্থ রচনা। নাটকের জনপ্রিয়তার ছায়াপাত ঘটল তাঁর গল্প আর উপন্যাসে। জনপ্রিয় হওয়ার কৌশলটি তিনি রপ্ত করে ফেললেন নিপুণভাবে। এর ফলে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী একসঙ্গেই আসীন হলেন হুমায়ূনের গৃহে। এই দুজনের সম্মিলিত অধিষ্ঠানের ঘটনাটি খুব দুর্লভ হলেও হুমায়ূনের মেধাবী মস্তিষ্ক অতি দ্রুত তাঁদের আগমনি ধ্বনি শুনতে ভুল করে নি। নিখুঁত হিসাব করে হুমায়ূন ছেড়ে দিলেন তাঁর অধ্যাপনার চাকরি। তারপর শুধুই সামনে চলা। জনস্রোত ছুটছে তাঁর পেছনে, বৈভব লুটোচ্ছে তাঁর পদতলে। তিনি যেন পথ চলছেন হ্যামিলনের সেই বংশীবাদকের মতো। অবিশ্বাস্য অর্জন তাঁর! বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছেন, ভূসম্পত্তি গড়ে তুলেছেন, নিজের রুচি এবং সৌন্দর্যবোধ দিয়ে নিপুণ শিল্পীর মতো গড়ে তুলেছেন স্বপ্নপুরী। কেবলমাত্র লেখার ভেতর দিয়ে সৎ প্রক্রিয়ায় এই বাংলাদেশে শুধু নয় এই উপমহাদেশে কি কেউ এতখানি বিত্তের অধিকারী হতে পেরেছেন? হুমায়ূনের কৃতিত্ব এখানেই। লেখক-সাহিত্যিকেরা করুণা ভিক্ষা করে না, তীব্র অহংকারে করুণা বিতরণ করে, এটা তিনি প্রমাণ করেছেন। লেখক এবং শিল্পীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন। একটা বিশাল জনগোষ্ঠী বিশেষ করে তরুণ ও যুবসমাজকে পাঠ্যাভিমুখী করেছেন। একইসঙ্গে প্রকাশনাশিল্পের স্রোতহীন জলধারায় তরঙ্গ সৃষ্টি করেছেন।

AMARBOI.COM

৩

বয়সে কনিষ্ঠ হলেও হুমায়ূন আহমেদকে আমি শ্রদ্ধা করতাম তাঁর অসাধারণ শিল্পতৃষ্ণার জন্য। প্রচণ্ড আড্ডাবাজ তিনি এবং বন্ধু-বান্ধব পরিবৃত হয়ে থাকতে পছন্দ করতেন। তার চতুস্পার্শ্বে গুণগ্রাহীর সংখ্যা যেমন কম ছিল না, তেমনি স্তাবকের সংখ্যাও। যেমন প্রশংসা উপভোগ করতেন তেমনি মতলবি প্রশংসাও ঠিক বুঝতে পারতেন। রসিক মন্তব্যের মাধ্যমে স্তাবকদের স্বরূপ উন্মোচন করায় তাঁর কোনো রাখঢাক ছিল না।

আড্ডাবাজ হুমায়ূনের বাড়ির দরজা সবসময়ই অবারিত থাকত। ধানমণ্ডির ১০/এ সড়কের যে ফ্ল্যাটে হুমায়ূন একসময় থাকতেন সেই একই ভবনে থাকতেন আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ। সম্ভবত ওই একই সড়কের উল্টোদিকের একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন হুমায়ূন ফরীদি এবং সুবর্ণা। কাজেই হুমায়ূন আহমেদের বাসায় আড্ডার নিয়মিত অংশীদার না হলেও তাঁর খোঁজখবর পাওয়া যেতই। একসময় আমাদের সঙ্গে তাঁর কিছুটা ঘনিষ্ঠতা থাকলেও পরবর্তীকালে কিঞ্চিৎ দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। তবে সে জন্য পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধে কোনো ঘাটতি ছিল না। আমাদের এই দূরত্বের কারণ আমরা উভয়েই জানতাম, কিন্তু তা কখনো কেউ উচ্চারণ করি নি কাজেই সেটা অনুচ্চারিতই থাকুক। তবে হুমায়ূনের নাটক আমি খুব একটা মিস করি নি কখনো। তার *জোছনা ও জননীর গল্প* এবং *বাদশাহ নামদার* গোগ্রাসে পড়েছি। এ ছাড়া অসুস্থ হওয়ার আগে সে একবার অত্যন্ত যত্ন করে এবং ভালোবেসে আমাদের তার রচনাবলী দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূনদের সব ভাই-ই ভালো ছবি আঁকেন এবং ভালো লিখতে তো পারেনই। হুমায়ূনও একসময় ছবি আঁকতেন এবং মজার ব্যাপার যে তিনি বেশ কিছু ম্যাজিকও জানতেন। শেষদিকে আবার ছবি আঁকার ঝোঁক পেয়ে বসেছিল তাঁকে। এসব বলছি এ কারণে যে, হুমায়ূন আহমেদ একজন আপাদমস্তক শিল্পী এবং অসাধারণ সৃজনপ্রতিভার অধিকারী মানুষ ছিলেন আর তাই শিল্পের সব অংশের প্রতিই ছিল তাঁর তীব্র আকর্ষণ।

কদিন আগে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের উদ্যোগে আয়োজিত স্মৃতিতর্পণ অনুষ্ঠানে রজনীকান্ত সেনের যে গানটির মাধ্যমে এই অসামান্য প্রতিভাধরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছিল সেটি ছিল 'আমি অকৃতি অধম তাই বলে মোরে কম করে কিছু দাও নি।' সত্যি হুমায়ূন প্রকৃতির কাছ থেকে পার্থিব সবকিছু পেয়েও যেন কিছু একটা অপ্রাপ্তির যন্ত্রণায় ছটফট করে গেছেন। অনেক মানুষের ভেতরেও একজন নিঃসঙ্গ মানুষ, অনেক বৈভবের ভেতরেও যেন এক রিক্তহস্ত ভিক্ষুক।

হুমায়ূনের জন্য আমার খুব কষ্ট হয়। অসামান্য প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটি বড় অস্থিরতার ভেতর দিয়ে আজীবন তৃষ্ণার্ত থেকেই মানবজীবন থেকে তিরোহিত হলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদ : শিশুসাহিত্যের রাজা

আমীরুল ইসলাম

এক আশ্চর্য প্রতিভাসম্পন্ন, বহুমাত্রিক ও বহুপ্রজ কথাসাহিত্যিকের নাম হুমায়ূন আহমেদ। অবিস্মরণীয় গল্পকথক তিনি। যেমন সৃজনশীল তেমনই মেধাবী। যেমন তাঁর ভাষাশৈলী তেমনই চরিত্র নির্মাণ। যেমন সৌন্দর্যচেতনা তেমনই জীবনঘনিষ্ঠতা। যেমন সহজ-সরল অনাড়ম্বর তেমনই দার্শনিকতায় আচ্ছন্ন। এক রহস্যময়, অবিশ্বাস্য জাদুকরী লেখক তিনি। তিনি স্বর্ণপ্রসবা। যেখানে করস্পর্শ করেছেন সেখানেই সোনা তৈরি হয়েছে। তিনি যেন গ্রিক পুরাণের মিডাস। কথাসাহিত্যিক, ছোটগল্পকার, নাট্যকার, চলচ্চিত্র নির্মাতা, নাট্যনির্মাতা প্রতিটা ক্ষেত্রেই তিনি একক, স্বয়ম্ভু। মিডাসের মতোই। সফল ও সার্থক। জীবৎকালেই কিংবদন্তিতে রূপান্তরিত হয়েছেন।

তিনি আমাদের প্রণম্য—হুমায়ূন আহমেদ। তিনি জীবন-বাস্তবতার কবি। তিনি মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে হ্যামিলনের বংশীবাদক। তিনি অসুরের রাজ্যে সুরের স্রষ্টা। তিনি উদ্ভট খেয়াল রস ও ফ্যান্টাসির নিপুণ কারিগর। কালো অক্ষরে রচিত তাঁর চরিত্রসমূহ বাস্তব জগতে যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে।

বহুমাত্রিক হুমায়ূন আহমেদের পরিচয়ের সকল মাত্রা যে এখনই উন্মোচিত হয়েছে—বলা যাবে না। অনেক পরিচয়, অনেক অধ্যায়ের বিষয়-আশয় এখনো উন্মোচিত হয় নি। হুমায়ূন আহমেদ সম্পর্কে গৌরচন্দ্রিকা লিখতে লিখতে হঠাৎ মনে হলো—ছোটদের জন্য নানা রঙের লেখা তিনি লিখেছেন। শিশুসাহিত্যের তিনি রাজা। যেহেতু কথাসাহিত্যের রাজা তিনি, তাই শিশুসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের পরিচয় আমাদের চোখের আড়ালে রয়ে গেছে। শিশুদের তিনি বড় ভালোবাসতেন। শিশুদের জন্য লিখেছেনও অসাধারণ সব লেখা। বিশ্ব-শিশুসাহিত্যের বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলেও হুমায়ূন আহমেদকে শীর্ষস্থানেই রাখতে হবে—এ কথা বললে খুব বেশি বাড়াবাড়ি হবে না।

২

প্রায় চল্লিশ বছরের অধিককাল ধরে হুমায়ূন আহমেদ লেখালেখি করেছেন। বড়দের এই অজস্রধারার রচনাসমূহের পাশাপাশি তিনি ছোটদের কখনো বঞ্চিত করেন নি। বছরে পাঁচ-ছটা বয়স্কজন পাঠ্য গল্প-উপন্যাস বা বিবিধ রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও একটি বই তিনি অবধারিতভাবে শিশু-কিশোরদের জন্য উপহার দিতেন।

কৌতুকপ্রিয় হুমায়ূন আহমেদ পরিহাসচ্ছলে বলতেন, ছোটদের জন্য যদি না লিখি তবে ওরা একদিন বড় হয়ে আমার বই পড়বে না। ওদের ছোটবেলাতেই ওদের মন আমি জয় করার চেষ্টা করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড়দের জন্য বহুবিচিত্রধারার লেখা তিনি যেমন অনর্গল লিখেছেন, ছোটদের জন্যও সেই একই ধারার একই ঘরানার অজস্র রচনার দিকে পাঠদৃষ্টি দিলে বিস্মিত হতে হয়ে। হুমায়ূন আহমেদের পরিচ্ছন্ন একটা শিশুমন ছিল। তিনি যে-কোনো ঘটনাকে, চরিত্রকে ও বিষয়কে কচি-কাঁচা মন নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে পারতেন। আর শিশুমন বরাবর গল্প শুনতে খুব পছন্দ করে। তাদের কল্পনার জগৎ প্রসারিত হয়। চিন্তাশক্তি স্বচ্ছ হয়। হুমায়ূন আহমেদ শিশুদের শিশু ভাবেন নি কখনো। কখনো কোনো অবাঞ্ছিত শিক্ষা দিতে চান নি। শিশুর সামনে হাজির করেছেন অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার। তাঁর সেই বিপুল আনন্দের মধুভাণ্ডের দিকে তাকালে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। শুধু যদি তিনি ছোটদের বইগুলোই লিখতেন তা হলেও অবিস্মরণীয় হয়ে থাকতেন তার বিপুল পাঠকগোষ্ঠীর কাছে।

তিনি ছোটদের এক সংকলন-গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন :

> আমার লেখালেখির বয়স ত্রিশ। ত্রিশ বছর ধরে লিখছি—গল্প, উপন্যাস, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি, ভূত-প্রেত বিষয়ক জটিলতা, শিশুতোষ রচনা। একজন যখন ত্রিশ বছর বিরতি ছাড়া লিখে যায় তখন একটা ব্যাপার ঘটে। শেষ বেলায় হিসাব মিলাতে গিয়ে সে ভড়কে যায়। ভুরু কুঁচকে ভাবে, এত লেখা কখন লিখলাম?
>
> আমার বেলা ব্যাপারটা ঘটেছে শিশুতোষ রচনার একটা নির্বাচিত সংকলন বের করতে গিয়ে। খুবই অবাক হয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করেছি—বাচ্চাদের জন্য এত লেখা কখন লিখলাম?

হুমায়ূন আহমেদ নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু এই প্রশ্ন পাঠকদেরও। এত দিগন্তবিস্তারী বিপুল রচনা তিনি কীভাবে ছোটদের উপহার দিয়েছিলেন?

AMARBOI.COM

৩

হুমায়ূন আহমেদের ছোটদের বইয়ের নামের তালিকার দিকে চোখ বুলিয়ে দেখলে সহজেই উপলব্ধি হবে, কত বিচিত্র রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর শিশুসাহিত্য।

সব ধরনের লেখা তিনি লিখেছেন ছোটদের জন্য। ছোটদের ছোট বলে কখনো অবহেলা ও অবজ্ঞা করেন নি; বরং শিশু-কিশোরদের কৌতূহলী মন ও মননের প্রতি তিনি ছিলেন বরাবর শ্রদ্ধাশীল। শিশুর দৃষ্টিতে তিনি পৃথিবী দেখতেন।

তাঁর বৈচিত্র্যময় লেখার অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। তিনি গল্প-উপন্যাসের পাশাপাশি নানাবিধ লেখা লিখেছেন। ছোটদের জন্য সহজ-সাধারণ আটপৌরে মধ্যবিত্ত জীবনের গল্প লিখেছেন। ভূতের কাহিনি, সায়েন্স ফিকশন, ভ্রমণ, অদ্ভুতুড়ে গল্প, রহস্যকাহিনি, নাটিকা, অমীমাংসিত রহস্য—নানা ধরনের অবিশ্বাস্য গল্প শুনিয়েছেন ছোটদের। মুক্তিযুদ্ধের গল্প লিখেছেন। থোকা থোকা অসংখ্য বইয়ের নাম। কয়টা বইয়ের উদাহরণ দেওয়া যায়?

নীল হাতি, অন্যভুবন, সূর্যের দিন, বোতল ভূত, ছেলেটা, পুতুল, নুহাশ এবং আলাদিনের আশ্চর্য চেরাগ, তোমাদের জন্য রূপকথা, গোবর যাদু, এক ভয়ংকর অভিযানের গল্প, মিতুর অসুখ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিজান সাহেবের ভূত, রানী কলাবতী, কানী ডাইনি, তিনি এবং সে, বোকাভূত, মজার ভূত, পরীর মেয়ে কলাবতী, চেরাগের দৈত্য এবং বাবলু—কত লেখার নাম উল্লেখ করব ? কত বইয়ের নাম উল্লেখ করব ? কত ধরনের লেখার বিভাজন নিরূপণ করব ?

এখানেই হুমায়ূন আহমেদ বিস্ময় তৈরি করেন। নিজেকে নিজে বারবার অতিক্রম করেন বলেই তিনি হয়ে ওঠেন আশ্চর্য সফল শিশুসাহিত্যিক। শিশুরা বৈচিত্র পছন্দ করে। ভৌতিক গল্প বা অভিযান কাহিনি বা রহস্য গল্প বা রূপকথা—এসবই ছোটদের জগৎ। হুমায়ূন আহমেদ সেইসব অনিন্দ্য, ধ্রুপদী জগতে বসবাস করেন। লেখেন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে। লেখা তাঁর হয়ে ওঠে নাটকীয় গতিসম্পন্ন এবং সুস্বাদু। শিশু-কিশোর পাঠকদের ভাবনার পৃথিবীকে তিনি বদলে দেন দ্রুততার সঙ্গে, আশ্চর্য জাদুমন্ত্র দিয়ে। তাঁর হাতে থাকে সোনার কাঠি, রুপার কাঠি। তিনি অনায়াসে ঘুম ভাঙিয়ে দেন রাজকুমারীর। শিশুদের তিনি যেমন স্বপ্নবিলাসী ও কল্পনাপ্রবণ করে তোলেন, তেমনি তাদের বাস্তববাদী ও মুক্তচিন্তার এক পৃথিবীর অধিবাসী হিসেবে দেখতে পছন্দ করেন।

হুমায়ূন আহমেদ শিশুদের সমালোচনাকে খুব গুরুত্ব দিতেন। কারণ ছোটরা মিথ্যুক ও স্বার্থপর নয়। তারা যা সত্যি মনে করে তা-ই অকপটে বলে দেয়। তাই ছোটদের লেখার সময় খুব সচেতন থাকতেন হুমায়ূন আহমেদ। বছরে একটি-দুটি ছোটদের বই লিখতেন। খুব যত্ন নিয়ে খুব আদর দিয়ে তিনি ছোটদের বই উপহার দিতেন। চমৎকার প্রচ্ছদ, ভালো কাগজে ছাপা, রঙিন ছবিঅলা বই তিনি লিখতেন তাদের জন্য। তারপরও হুমায়ূন আহমেদের দুঃখ ছিল—আন্তর্জাতিক মানের ছোটদের বই আমাদের দেশে খুব-একটা প্রকাশিত হয় না। সে রকম মুদ্রণ, বাঁধাই, ছবিসমৃদ্ধ বই কবে প্রকাশিত হবে ? লেখার মান বিশ্বমানের, কিন্তু প্রকাশনার মান নিম্ন। এই দুঃখের কথা হুমায়ূন আহমেদ নিকটজনদের কাছে সবসময় প্রকাশ করতেন।

AMARBOI.COM

৪

হুমায়ূন আহমেদ তাঁর স্বভাবসুলভ কৌতুক ও জীবনদর্শন মিশিয়ে ছোটদের সংকলনধর্মী এক গ্রন্থে বলেছিলেন :

> তোমাদের একটা গোপন কথা বলি, এখানকার সবগুলি লেখাই আমি আমার ছেলেমেয়েদের খুশি করার জন্য লিখেছিলাম। তারা এখন বড় হয়ে গেছে। লেখাগুলির আগের আবেদন তাদের কাছে নেই। তোমরা যেহেতু এখনো ছোট, লেখাগুলির মালিক তোমরা। তোমরা যখন বড় হবে তখন যদি এই লেখাগুলো তোমাদের ছেলেমেয়েদের কাছে চলে যায় তা হলে বুঝব আমার মানবজীবন সার্থক।...

উপরে উদ্ধৃত কথাকটির মধ্যেই হুমায়ূন আহমেদ প্রকাশ করতে পেরেছেন—ছোটদের লেখার প্রতি তাঁর মমতা ও মনোভঙ্গি। ছোটদের জন্য প্রচুর লিখতে পেরেছিলেন সহজাত মমতার কারণে। আমাদের দেশের শিশুসাহিত্যের শূন্যতা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

আমাদের দেশের অধিকাংশ ছোটদের বই যে বুড়োমিতে আচ্ছন্ন আর শিক্ষার নামে একধরনের অত্যাচার—একথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। কৌতুক, বিনোদন, ফ্যান্টাসি আর অবাধ কল্পনা ও রহস্য-রোমাঞ্চের জগতে দুরন্ত ঘোড়ার মতো ছোটদের ছুটিয়ে দিতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরকম সুস্থ শিশুসাহিত্য রচনার নিপুণ কারিগর ছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। তাঁর মতো আপন করে, গভীর মমতায় কে আর ছোটদের কথা ভাববে? কোন সে লেখক, হুমায়ূন আহমেদের মতো ছোটদের আর ছোট ভাববে না? ছোটদের জন্য ছোটদের মতো নরম হৃদয় নিয়ে কে ছোটদের জন্য লিখবে?

হুমায়ূন আহমেদের ছোটদের লেখা অনন্ত-স্থায়িত্ব লাভ করবে। বাংলাভাষী শিশু-কিশোরদের হৃদয় আচ্ছন্ন করে রাখবে দীর্ঘকাল, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তাঁর শিশুসাহিত্য পঠিত হবে—দৃঢ়তার সঙ্গে এই আশাবাদ ব্যক্ত করতেই পারি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নুহাশপল্লী থেকে কুতুবপুর

আলম তালুকদার

২০১১ সালের বৈশাখী গরমের সময়ের স্মৃতি। হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আমার যত কথা। তাঁর লেখা তো পড়ি। তাতে আমার তৃপ্তি হয় না। তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিতে হবে এই স্বপ্ন আমি লালন করি। কিন্তু বললেই তো হবে না। আমি গেলাম আর তাঁকে পেলাম আর বললাম, তা তো হবে না। তিনি মহাব্যস্ত মানুষ। আর আমার কী পরিচয়? বিখ্যাত কেউ নই যে নাম নিলেই হ্যাঁ, হ্যাঁ করে গল্প জুড়ে দিবেন। খোঁজ-খবর রাখি—তাঁর সঙ্গে গভীর ভাবসাব কার বেশি। প্রকাশক তো অনেক। তার মধ্যে কার সঙ্গে খাতিরটা বেশি? অন্যপ্রকাশ? হ্যাঁ, মাজহার, তিনিই গোলাপ অথবা পারুল। তার সঙ্গে লাইন দিলাম। আমার মনের কথাটা বলে রাখলাম। তাকে চুটকি বলে বলে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়েছে। তবে তিনি সাবধান করে দিয়েছেন, স্যার যদি অনুমতি না দেন তাহলে যেন তাকে চুটকি না শোনাই। তাতেই রাজি।

মহাসুযোগ এসে গেল। সন্ধ্যার আগে নুহাশপল্লীতে হাজির থাকতে হবে। আমি বেলা ডোবার আগেই ঢাকা থেকে নুহাশপল্লীতে হাজির। আর কখন যাবেন তা আমাকে মাজহার জানায় নি। তো আমি বিশাল গেইট দিয়ে সোজা ঢুকে গেলাম। মাজহারের লোক—এটাই আমার পরিচয়। গেইট দিয়ে ঢুকতেই সামনে বিশাল সবুজ মাঠ। চারদিকে গাছপালা। সূর্য অস্ত যায় যায়। ডানের দিকে একতলা বিল্ডিং। তার সামনে কয়েকটা চেয়ার। স্যারকে দেখলাম আসছেন। লুঙ্গিপরা। স্যান্ডেল পায়। হাফহাতা গেঞ্জি। মুখে সিগারেট ছিল কি না মনে নেই। তিনি কিছু বলার আগেই বললাম, আমাকে মাজহার আসতে বলেছে। আমার নাম আলম তালুকদার। 'এই চেয়ার দেও'। শাওনকে দেখলাম বাচ্চা কোলে দালানের দরজায়।

এর মধ্যে প্রধান গেইট দিয়ে একটা পাজারো জীপ হর্ন দিয়ে হুশ করে সবুজ চত্বরে ঢুকে সোজা পশ্চিমে দৌড়। স্যার সে দিকে তাকিয়ে বললেন, কার গাড়ি? কার পারমিশনে ঢুকছে? একটু পরে একজন এসে জানাল পুলিশের ডিআইজি।

ডিআইজি তো কী হইছে, কার পারমিশনে ঢুকছে? তাকে আসতে কও। লোকটি আবার খবরে গেল। দেখলাম সিভিল ড্রেসে একজন লোক, মনে হলো বউ-বাচ্চাসহ হাজির। আসতেই স্যার বললেন, আপনি ডিআইজি, আইনের মানুষ। এটা কার বাড়ি কী সমাচার তা না জেনে ঢুকে গেলেন যে! তার সঙ্গে এক সিপাই হঠাৎ বলে উঠে, স্যার উনি পুলিশের ডিআইজি। সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম স্যারের চেহারা বদলে গেল। ডিআইজি হইছে তো কী হইছে। ডিআইজি হইলেই যেখানে ইচ্ছা সেখানে প্রবেশ করা যায় নাকি! এইসব ডিআইজির আমি খেতা পুরি। এই আইজিকে ফোন লাগাও। ডিআইজিরে আইনের ব্যাখ্যা শিখাইয়া দেই।

বেচারার যে কী কাহিল অবস্থা। কাচুমাচু করে, স্যার মাফ চাই, ভুল হইয়া গেছে। সরি স্যার, মিসটেক। ইংরেজি বোধহয় একটা বাক্য বলেছে, স্যার আরও ক্ষেপে গেলেন। আমি চেয়ারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসতে পারি নাই। জীবনে প্রথম এমন ঘটনা দেখলাম। আমি তো ভয়ে জড়সড়। এ কোন বিপদরে বাবা! হায় মাজহার, কে করিবে উদ্ধার। শাওন ? অনেক দূরে অবস্থান তার। কিন্তু তার মন বড়ই ভার। ডিআইজি বেচারা বউ-পোলাপান নিয়ে মন খারাপ করে চলে গেল। তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। বসলেন। আমিও ভয় আর শঙ্কা নিয়ে বসলাম।

একটু পরে শাওন বাচ্চা কোলে নিয়ে স্যারের সামনে এসে খুব মোলায়েম করে জিজ্ঞেস করল, এই ব্যবহারটা কি ঠিক হলো ?

স্যার চুপ।

ডিআইজির খ্যাতা পুড়ল কি পুড়ল না সেটা বড় নয়। তার সঙ্গে তার বউ আছে, তার সন্তানেরা আছে, তারা হয়তো তোমার ভক্ত। তোমার এই ব্যবহারে তারা তোমার সম্বন্ধে কী ধারণা পোষণ করবেন ?

যা ইচ্ছা তাই করুকগে। বাদ দাও তোমার যুক্তি। তালুকদার সাব এসেছে, তাকে চা দিতে বলো। এর মধ্যে মাজহার এসে গেল। কিছুক্ষণ পরে ইমদাদুল হক মিলন এল। রাত আটটার দিকে কবি কামাল চৌধুরী এবং অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এসে গেলেন। ডিআইজি তলে পড়ে গেল।

বিদ্যুৎ চলে গেল। জেনারেটর চালু হলো। হুমায়ূন আহমেদ আমাদের নিয়ে তাঁর বাগানবাড়ি দেখাতে চললেন। নানারকম গাছগাছালি। বনজ, ফলজ, ভেষজ গাছে ভরা। বেশ কয়েকটি মূর্তিও দেখলাম। মৎসকন্যা সাদা ধবধবে, সেটাও দেখালেন। সহজে প্রাপ্য নয় এমন ফলজ ও ভেষজ গাছও দেখতে হলো। পুকুরের মাঝখানে সেতু। চাঁদনি রাত উপভোগের জন্য। চমৎকার হাহাকার করা অবারিত পরিবেশ। রাত ১১টা পর্যন্ত বৃক্ষ পর্যবেক্ষণ পর্ব। স্টুডিও বাদ দেন নি। সেটাও ঘুরে ঘুরে দেখালেন। কী অসীম ধৈর্য নিয়ে বর্ণনা করে যাচ্ছেন! স্যারের এই দিকটা আমার অজানা ছিল। ভূতের ভয় দেখানোর একটা গোপন বাসনা স্যারের ভেতরে কাজ করেছিল মনে হয়। ভূতের প্রসঙ্গ কয়েকবার তুলেছিলেন। কিন্তু ভূত-প্রসঙ্গ তেমন জমে নি। খানাদানা মাঠের এককোণে। ১২টা পর্যন্ত চলল আড্ডা। নানান প্রসঙ্গ। বকাউল্লাহ তিনি আমরা শোনাউল্লা। মিলন ভাই, কামাল চৌধুরী মাঝে মাঝে পাইল দোহার। আড্ডায় তিনি ব্ল্যাক হিউমার শোনালেন।

AMARBOI.COM

দুটি জোক্স। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। ব্ল্যাক হিউমার কেমন হয় ? পাক আর্মিরা অনেক জয় বাংলার লোক ধরে লাইনে দাঁড় করিয়েছে। এখন গুলি করে মারবে। ১০ নম্বরের পালা এলে ওই বাঙালি খুব সাহস করে পাকসেনাকে বলল, ভাই আমি খুব ভীরু। আমাকে আস্তে গুলি করবাইন। হাসবেন ? না কাঁদবেন ?

আরও একটা।

জয় বাংলার লোকদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে। হিন্দুদের বাড়িও পুড়িয়ে দিচ্ছে। তো এক গ্রামে অনেক হিন্দুর বাস ছিল। অনেক বাড়ি পাক বাহিনী কর্তৃক পোড়ানো হয়েছে। এক হিন্দু ভদ্রলোকের পরিবারের সবাই ভারত চলে গেছে। কিন্তু বৃদ্ধ লোকটা যান নি। তার ইচ্ছা বাপ-দাদার ভিটাতে বাড়িঘর পোড়ালে কেমন লাগে, কেমন দেখায় এটা সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে তারপরে ভারতে যাবেন। এখন অপেক্ষার পালা। একবার, দুইবার, তিনবারে তার বাড়ি অক্ষত রয়ে গেল। আশপাশের সব বাড়ি পুড়ে ছারখার। তার বাড়িতে কেউ আগুন লাগাতে আসে না। তিনি অস্থির হয়ে অপেক্ষা করেন। এইবার আগুন লাগাবেই। কিন্তু বারবার তিনবারেও যখন তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ি পোড়ানো হলো না তখন ভদ্রলোক আর লোড নিতে পারছিলেন না। পাগল হয়ে তিনি বাজার থেকে নিজে কেরোসিন কিনে এনে বাড়িতে কেরোসিন ছিটায়ে নিজেই নিজ বাড়িতে আগুন লাগিয়ে নিরাপদ দূরে দাঁড়িয়ে বাড়ি পোড়ানোর দৃশ্য দেখলেন। তারপর ভারতে চলে গেলেন। এইটা হলো ব্ল্যাক হিউমারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

রাত দুটা পর্যন্ত আড্ডা। ১২টায় গোল হয়ে বসে খানাদানা হলো। তার আগে এক কাঁদি পাকা সবরি কলা। মুড়ি দিয়ে পেটে চালান হয়ে গেল। যে কক্ষে আমরা খেলাম সেই কক্ষে বিশাল আলমিরা ভরা বই আর বই। তাঁর লেখা এবং অন্যের লেখা বইয়ের উপস্থিতি দেখলাম। এর মধ্যে তার শ্বশুর-শাশুড়ি আমাদের মাঝে আড্ডায় যোগ দিয়ে আরও মাতিয়ে দিলেন। উহঃ, এত মজা! এত অনাবিল উদার আনন্দদায়ক পরিবেশ আমার কাছে অচিন্তনীয় ছিল।

বিছানায় যেতে যেতে রাত ২টা। আমি আর মাজহার এক কক্ষে। ঘুম কি আর হয়? আধা জাগরণ, আধা সন্তরণে রাত পার হয়ে গেল। ভূতের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া হলো না। পরের দিন সকাল। ঘুম থেকে উঠে প্রাকৃতিক কাজ সেরে সবুজের ডাকে বের হলাম। শিশির ভেজা ঘাস। মাঝখানে খয়েরি রাস্তা ধরে পশ্চিমের দিকে হাঁটতে থাকি। ডানে তাকাতেই দেখি ঘরের বারান্দায় স্যার ছোট্ট পোলা নিয়ে যোগাসনে বসে আছেন। তার মানে রাতে কয়েক ঘণ্টা মাত্র ঘুমিয়েছেন। সালাম দিয়ে সবুজে হাঁটতে থাকি। মাজহার তখনো ঘুমে। খোলা মাঠের বাতাস গায় লাগিয়ে যথাস্থানে ফিরে আসি। আস্তে আস্তে নুহাশপল্লী জেগে উঠে। রান্নাবান্নার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

সকাল সাড়ে আটটার দিকে নাস্তা সেরে সবাই প্রস্তুত। কিছুক্ষণ ছবি তোলা হলো। তারপর সারিবদ্ধ গাড়িতে যার যার মতো উঠে বসা হলো। এবার শুভ যাত্রা শুরু। নুহাশপল্লী থেকে ৬/৭টা গাড়ি সারিবদ্ধভাবে ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কে। স্যারের গাড়ি আগে। আমরা পেছনে। ময়মনসিংহ শহর পেরিয়ে শম্ভুগঞ্জ ব্রিজ পার হয়ে শম্ভুগঞ্জ বাসস্টেশন ভেদ করে ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ সড়কে সোজা ঈশ্বরগঞ্জ রাস্তায় আমরা দৌড়াতে থাকি। গৌরীপুর সীমানা পার হলেই রাস্তা বড়ই খাস্তামার্কা। প্রায় ১৫ কিলো রাস্তা এতটাই খারাপ যে তা কহতব্য নয়। গাড়ির চালক বলে, স্যার, গাড়ি শেষ। আমি বলি আনন্দ আয়েশ। এটাই রাস্তা এটাই দেশ। দশ মিনিটের রাস্তায় ১ ঘণ্টা খতম। ঈশ্বরগঞ্জে এক সময় আমি চাকরি করেছি। অনেক লোক অপেক্ষায় ছিল। যাক চা বিরতি এবং পান বিরতি শেষে এবার সোহাগপুর হয়ে আঠারবাড়ী। আমার খুব ভালো লাগছিল। কারণ সেই '৯৩ সালের অনেক স্মৃতি মানসপটে ভাসছিল। আঠারবাড়ী বাজার ভেদ করে সীমানা শেষ করে এবার কুতুবপুরের দিকে গাড়ি চলছে। রাস্তার দুপাশে সবুজ ধানক্ষেত। ৬/৭টা গাড়ি একত্রে চললে যা হয়। ধুলায় ধূসরিত বাতাস উড়ছে আর উড়ছে। রাস্তার পাশে লোকজন অবাক দেখছে আর দেখছে।

অবশেষে কুতুবপুর দেখা গেল। লাল ইটের ঘর। সামনে বিশাল মাঠ। মূল গেইটে স্মৃতিস্তম্ভ। দূর থেকে দেখাতেই আমি মুগ্ধ। প্রায় ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী, এলাকার অনেক লোকজন। মহাসমাবেশ। শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। আমাদের ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা করা হলো। চমৎকার পোশাকে সজ্জিত ছেলেমেয়েরা। স্কুলঘর একেবারেই অন্য রকম। এর ডিজাইনার শাওন। সে একজন আর্কিটেক্ট। অনন্য এবং ভিন্ন রকমের স্থাপনা। এককথায় দৃষ্টিনন্দন এবং সৃষ্টিবন্ধন।

প্রধান শিক্ষক আমাদের ক্লাসে ক্লাসে নিয়ে গেলেন। হুমায়ূন স্যার আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। আমরা সব ক্লাসেই কিছু কিছু কথা বলার সুযোগ পেলাম। আমি প্রতি ক্লাসেই 'পড়িলে বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোকিত হই, না পড়িলে বই অন্ধকারে রই' এই স্লোগানটি সব শিক্ষার্থীকে দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছি। শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে উচ্চস্বরে উচ্চারণ করে অন্যরকম আবহ সৃষ্টি করে। আমি তো মোহিত এবং অভিভূত। কবি কামাল চৌধুরী আমাকে অনুসরণ করে একটি ছড়া তাদের শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

শেষে পাঠাগার পরিদর্শন। বেশ বড় জায়গায় পাঠাগার। 'শহীদ ফয়জুর রহমান স্মৃতি পাঠাগার'। দেখলাম বাংলাদেশের প্রায় সব বিখ্যাত লেখকদের নানা স্বাদের নানা পদের বই নিয়ে পাঠাগার সাজানো হয়েছে। স্যারের প্রায় সব বই একদিকে সাজানো আছে। দুঃখ, আমার কোনো বই নেই। আমি আনুষ্ঠানিকভাবে স্যারের হাতে আমার লেখা কয়েকটি বই পাঠাগারের জন্য হস্তান্তর করে দুঃখ ঘোচাতে পেরেছিলাম। এবার আনুষ্ঠানিকতার পালা। পুরস্কার বিতরণ এবং বক্তব্যের পালা। এর মধ্যে রাশেদা কে চৌধুরীর আগমন ঘটেছে। একে একে এবার আমার পালা। আমি সংক্ষিপ্তভাবে আমার অনুভবের কথা বলে শেষ করি।

এবারে বিস্ময়ের পালা। সব অতিথির জন্য স্যারের অবাক উপহার। প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, চিন্তা করে বলুন তো আমাদের কী উপহার দেওয়া হয়েছিল। কী, বই ? না। কী, শার্ট বা পাঞ্জাবি ? না। মিষ্টির প্যাকেট ? না। তবে ? তবে কি সিডি-টিডি ? নারে ভাই না। এটা সবার মাথায় আসবেই না। এটা কেবল স্যারের মাথাতেই খেলতে পারে। কীরে ভাই জিনিসটা কী ? আরে ভাই বলছি। অত অস্থির কেন ? জিনিসটা কিছুই না। দেখি একটা ব্যাগ। পাটের একটা চমৎকার ব্যাগ। যাতে লেখা আছে 'শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ। কুতুবপুর।' বেশ ওজনদার। হাতে নিলেই হাত নেমে গেল। শক্ত করে ধরতে হলো। স্যারের কাছ থেকে ব্যাগটা নিয়ে পেছনে গিয়ে দেখলাম—কী আছে ? দেখি কী চিকন ঢেঁকিছাঁটা চাল কয়েক কেজি। মাষকালাইর ডাল কয়েক কেজি। আর ? আর দেখি লাল লাল ছোট ছোট লম্বা আলু। যার স্বাদ অসাধারণ।

কেমন বুঝলেন! এই না হলে হুমায়ূন আহমেদ। কীভাবে উল্লাসের সঙ্গে আমাদের বেকুব আর আহাম্মক বানিয়ে দিয়ে তিনি ব্যতিক্রমী উপহারদাতা হিসেবে আমাদের মননে চির অমর হয়ে রইলেন। স্যারের চিন্তা-ভাবনাই ছিল একটু অন্যরকমের, অন্য কিসিমের। দুপুরের খানাদানাও অন্যরকমের। ভাত, শাকসবজি, গোস্ত, ডাল, দই। যত ইচ্ছা তত খাও। না নাই। দেশি পিঠাও ছিল। খানা শেষে পানের খোঁজে ঢুকে গেলাম একটা কক্ষে। সেখানে দেখি স্যারের মা জননী, তাঁর বোনেরা বসে বসে জনসংযোগ করে যাচ্ছেন। সেখানেই পানের সন্ধান পেলাম।

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে বেশ সময় গেল। কারণ অনেক লোক। আমরা, বিশেষত আমি, পুরো বিদ্যালয়ের চত্বর ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে শিক্ষকদের কমনরুমে গিয়ে বসামাত্র কয়েকজন ছাত্রী খাতাকলম নিয়ে হাজির। কী ব্যাপার ? স্যার অটোগ্রাফ। আমি বলি, বাপরে বাপ। আমারে করো মাফ। এমনিতেই গরমের চাপ। আর এখানে হাজির আছে সব লেখকের বাপ! কেমনে, কোন সাহসে দেই অটোগ্রাফ ?

না, স্যার দ্যান একটা অটোগ্রাফ। স্যারেরটা তো আছেই। আপনারটাও দরকার।

কী আর করা। অনুরোধে খাইলাম ধরা। প্রথমে ছিল ৪/৫ জন। ৪/৫ জনের বিদায়ের পর দেখি ১০/১২ জনের লাইন। প্রায় সবাই কন্যা। অটোগ্রাফের বন্যা। একজনের পর অন্যজন। ছড়া লেখার ভুবন। নাম বলার সঙ্গেই মিল। আর ওরা হাসে খিলখিল। প্রায় দেড়ঘণ্টা আমি ঘেরাও। ছেড়ি এবং সঙ্গে ছ্যাড়াও। তালুকদার! এখন খুব বেড়াও! হু বিখ্যাত হতে চাও ? অতই ফাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন অটোগ্রাফ দাও। তাও আবার হুমায়ূন আহমেদের গ্রামে এবং তাঁর বিদ্যালয়ে? স্বয়ং তাঁর উপস্থিতিতে। আমার জীবনে একসঙ্গে এতজনকে অটোগ্রাফ দেওয়ার সুযোগ আসবে কি না জানি না। ১০০ জন। তা তো হবেই। শুধু দস্তখত দিলেই হবে না। নাম দিয়ে ছড়া মিলিয়ে দস্তখত দিতে হবে। যাক হাতে ব্যথা কোমরের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আমি ভাগার তালে ছিলাম। এর মধ্যে দুই কন্যা এসে বলল, আমার সঙ্গে ওর ছড়া মিলে গেছে। একজনেরটা আবার লিখতে হবে। কী মুশকিল! দিলাম মুশকিল আছান করে। একটু পরে এক কন্যা এসে বলল, স্যার একটা কথা।

কী কথা?

আপনারে না আমার বড় মামার মতো লাগে। তার চেহারার সঙ্গে আপনার চেহারার খুব যে মিল।

তাহলে তো খুব ভালো। বিনা ঝামেলায় একটা ভাগ্নি পেলাম।

জে মামা। আপনাকে স্যার না বলে মামা ডাকতে পারি?

অবশ্যাই অবশ্যই। কিন্তু শর্ত হলো পড়বে বেশি বেশি বই।

তাহলে আপনার মোবাইল নম্বর দ্যান।

নাও না লিখে নাও। নম্বর বললাম ও লিখে নিয়ে একটা কৃতজ্ঞতার হাসি দিয়ে চলে গেল।

এখন বিদায়ের পালা। সূর্য আস্তে আস্তে তার তাপ কমিয়ে দিয়েছে। আমাদের বিস্ময় আর আনন্দে ভাটা পড়ার আগেই আমরা যে যার গাড়িতে উঠে যাচ্ছি। ছাত্র-শিক্ষকের কাছ হতে বিদায় নিয়ে কুতুবপুরের বিদ্যাপীঠের সবুজ মাঠ থেকে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের গাম্ভীর্য থেকে বিদায় নিয়ে আস্তে আস্তে সোজা দক্ষিণের বাতাস সূর্যের দিকে তাকে ধরার জন্য গাড়ি ছুটে চলতে থাকে। অন্তরে ভালো লাগা, বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার আলোকময় দ্যুতি পুরো শরীর মনে সাঁতার কাটতে থাকে। কুতুবপুর দৃষ্টির সীমানা থেকে ছোট হতে থাকে। কিন্তু দুদিনের স্যারের সান্নিধ্য খামাখাই বড় হতে থাকে।

ঢাকায় ফেরার ক'দিনের মাথায় আরও অবাক করা কাণ্ড। স্যারের একটা পত্র হাতে এল। তারিখ ২৪ এপ্রিল, ২০১১।

জনাব আলম তালুকদার
ছড়াকার
পরিচালক (জাতীয় গণগ্রন্থাগার)

প্রিয়জনেষু,

বৈশাখের তীব্র দাবদাহ, দুর্গম পথ, সব উপেক্ষা করে আপনি উপস্থিত হয়েছেন কেন্দুয়ার এক প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুলে। আপনার উপস্থিতি আমাকে এবং আমার স্ত্রী শাওনকে চিরঋণে আবদ্ধ করেছে। এইভাবে ঋণগ্রস্ত হওয়া পরম আনন্দের ব্যাপার।

আমাদের দু'জনকে এই আনন্দ দেওয়ার জন্যে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

বিনীত
হুমায়ূন আহমেদ

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আবারও বে-বাক সঙ্গে সীমাহীন অবাক। এত বড় মাপের মানুষ, এত বড় নন্দিত কথাসাহিত্যিক তাঁর কী ঠেকা পড়েছে আমার মতো একজন নগণ্যকে ধন্যবাদ দেওয়ার! ভাবলাম এরা এই কারণেই বড়। তাঁদের কাছে কেউ ক্ষুদ্র নয়, নগণ্য নয়। বড় হওয়া অত সোজা নয়। ছোটদের ছোট ভাবে না বলেই হুমায়ূন আহমেদ এইভাবে বড়দের কাতারে শামিল হয়ে যান। আমি পত্রটির জবাব দিয়েছিলাম।

জবাব পাঠানোর পর আমি স্যারের মোবাইলে ফোন করলাম। মনে মনে ভয় ছিল হয়তো ফোন ধরবেন না। কিন্তু আমাকে হতবাক করে স্যার ফোন ধরলেন। নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে চিনলেন। জবাবের জন্য ধন্যবাদ জানালেন। তিনি তো একটু দ্রুত কথা বলতেন। বেশ দ্রুতই আবারও বললেন, তালুকদার সাব, আপনার মুক্তিযুদ্ধের বইটা আমরা পড়েছি। কুতুবপুরে যাওয়ার পথেই গাড়িতে বইটা পড়ে শেষ করেছি। খুব ভালো লেগেছে।

আমার যে কী আনন্দ লাগল তা ভাষায় বোঝাতে পারব না। স্যারকে ধন্যবাদের ওপর ধন্যবাদ দিয়ে কথা শেষ করি। এসব ঘটনা তাঁর বিদেশে চিকিৎসার জন্য যাওয়ার আগের ঘটনা। চিকিৎসা-বিরতিতে যখন আবার ঢাকায় এলেন তখন স্যারের সঙ্গে শেষ দেখাটা হলো বসুন্ধরা সিটির সিনেমাহলে। অন্যপ্রকাশের প্রধান নির্বাহী মাজহারুল ইসলাম আমার জন্য একটা প্রিমিয়ার শোর দাওয়াত কার্ড পাঠালেন। স্যারের ঘেটুপুত্রের শো। গিন্নীর আগ্রহ প্রচণ্ড। তাকে নিয়ে আধাঘণ্টা আগেই বসুন্ধরায় হাজির। দেখলাম বসুন্ধরার ৭ তলায় ঢাকার বিভিন্ন স্তরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা হাজির। 'ঘেটুপুত্র কমলা'র প্রিমিয়ার শো। আমাদের সঙ্গে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. আনোয়ার হোসেনের দেখা। তিনিও ভাবিকে নিয়ে হাজির। আমরা হলের মাঝামাঝি বসলাম। সবার হাতে হলুদ রুমাল দেওয়া হলো। আরেক রকম মজা। স্যার তার বাহিনী নিয়ে হাজির শো শুরুর আগে। স্যার বক্তব্য রাখলেন। স্যারকে বেশ উৎফুল্ল দেখা গেল। সিনেমা তো অনেকদিন পর দেখলাম। যারা ছিল তারা সবাই মহামুগ্ধ। শো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্যার হল ত্যাগ করেন। আমি পেছনে পেছনে ছুটছি। আবার চিকিৎসার জন্য চলে যাবেন। শেষ দেখাটা করে একটু কথা বলা দরকার। স্যারকে ধরতে হলো দৌড়ে। গিন্নী অনেক পেছনে। ভাগ্য ভালো লিফট ছিল না। দু'মিনিট অপেক্ষা, এর মধ্যে কুশলাদি বিনিময়। সামনা-সামনি কথা। হাসি-খুশি ভাবভঙ্গি। অসুখ বা যন্ত্রণার কোনো প্রকার ছায়া নেই। যা দেখলাম তা খালি মায়া আর মায়া। আমরা লিফটে একসঙ্গে নিচে নেমে এলাম। সালাম জানিয়ে স্যারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ির খোঁজে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। **সেইসময় থেকে সেদিন থেকে চির-বিচ্ছিন্ন হয়ে** একেবারে ফতুর হয়ে গেলাম।

তিনি তো খালি লেখক ছিলেন না। তিনি ছিলেন সমাজের শিক্ষক ও দীক্ষক। আর ছিলেন কথার জাদুকর। অনেকের আইকন। এখন ? আমাদের মাথা ভনভন, কান শনশন, উন্মাদ আমাদের মন। সংসার বৃন্দাবন। হায়রে জীবন এত ছোট কেনে! স্যারের একটি কবিতা দিয়েই **শেষ করি—**

'কষ্ট আমি কারে বলি
কষ্ট কাকে বলে
মনের ভিতর কষ্ট থাকে
বুকের মধ্যে জ্বলে'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃক্ষরাজিতে ঠিকানা এবং বৃক্ষ হননের মহোৎসব!

আলী যাকের

শেষমেশ হুমায়ূন চলে গেল। ভেবেছিলাম, যে মানুষটি জীবনযুদ্ধে সবসময় জয়ী হয়েছে, হারে নি কখনো, সে এবারেও বিজয়ীর বেশে ফিরে আসবে। এই মানুষটির মধ্যে একটি প্রায় অবিশ্বাস্য প্রত্যয় ছিল যা, যদিও আমি রাশিচক্রের ধার ধারি না, বৃশ্চিক রাশির জাতকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলেই সাধারণত বলা হয়ে থাকে। আমার সঙ্গে তাঁর তেমন সখ্য ছিল না যে আমি প্রায় প্রতিদিনই কিংবা এমনকি ঘনঘন তাঁর সাক্ষাৎ পেতে পারি। যখন দেখা হতো, কাজে কর্মেই দেখা হতো। সে নাট্যকার, আমি অভিনেতা। অথবা সে পরিচালক, আমি কুশীলব। এর বাইরে হয়তো দুই কি তিনবার সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে আমার। তবে, এক ধরনের ভালো লাগা কাজ করত আমার মধ্যে, যখনই তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছি আমি। ভালো লাগত, কেননা মানুষটি সবসময়ই সোজাসাপ্টা কথা বলতে ভালোবাসত। এই চাঁছাছোলা কথা বলবার কারণে অনেক মানুষ বিমুখ হয়েছে তাঁর প্রতি। কিন্তু সে কখনো তার তোয়াক্কা করে নি। যা বলবার, তা স্পষ্টভাবেই বলত। আমি কখনো দেখি নি তাঁকে কারও মন রক্ষা করে কথা বলতে। আরও একটি বিষয় ছিল তাঁর। একেবারে অভিব্যক্তিহীন মুখাবয়ব নিয়ে এমন সব রসিকতা করত যাতে, যারা শুনতো সেইসব কথা, হেসে গড়াগড়ি খেত। আমাকে সে একসময় বলেছিল, খুব বেশিদিন আগে নয় যে, হাস্যরসাত্মক চরিত্রে অভিনয় করাই আমার উচিত হবে। কেননা, আমি সহজেই বোকা, বোকা কথা বলে মানুষকে হাসাতে পারি। বোধ করি এটিও সে বলেছিল কারণ, যখন আমি 'বহুব্রীহি'তে 'মামা' কিংবা 'আজ রবিবার'-এ 'বড় চাচা'র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম, সে হয়তো তারই চেহারার প্রতিচ্ছবি দেখছিল আমার চেহারায়, বিশেষ করে রসে ভরা সংলাপ উচ্চারণ করার সময়।

আমার মনে আছে, আমরা, অর্থাৎ আমি, সারা যাকের, আসাদুজ্জামান নূর এবং হুমায়ূন আহমেদ একবার লস এঞ্জেলেসে বঙ্গ সম্মেলনে গিয়েছিলাম তাঁরই রচিত একটি নাটক নিয়ে। লস এঞ্জেলেসে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল আমার পুত্র ইরেশ যাকের, যে তখন আমেরিকাতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অধ্যয়ন শেষ করে ফিলাডেলফিয়াতে গবেষণাকেন্দ্রিক একটি চাকরি করছে। হুমায়ূনের নাটকটি ছিল হালকা চালের, হাস্যরসময় অথচ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। যতদূর মনে পড়ে, দর্শকের পছন্দও হয়েছিল সেই নাটক। সেখানে কলকাতার এক ভদ্রলোক নাটক শেষে একটি বৈরী মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, আমরা কেন আমাদের শিল্পকর্মে এত বেশি মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে বলি। তার ধারণা ছিল যে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আসলে আমাদেরকে জিতিয়ে দিয়েছিল ভারতীয় বাহিনী। আমি যখন সেই ভদ্রলোককে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে, কোনো বিদেশি বাহিনীর পক্ষে অন্য কোনো দেশে ঢুকে যুদ্ধ জয় করা অত সহজ নয়, যদি না সেই দেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণ মানুষ এবং তাদের যোদ্ধাদের সার্বিক সহায়তা না পাওয়া যায়। তখন হুমায়ূন আমাকে সেখান থেকে চলে আসতে বলল। আমি তাঁর সঙ্গে হেঁটে সম্মেলন কেন্দ্র থেকে যখন হোটেলে ফিরছি, তখন হুমায়ূন আমাকে বলেছিল, তাঁর স্বভাবসুলভ ভাষায়, "বেকুবকে বোঝানোর চেষ্টা করা বৃথা।" কথাগুলো এখনো আমার কানে বাজে। ভারী প্রাঞ্জল ভাষায় এই মানুষটি অনেক বড় বড় কথা বলতেন, যা অনেক নামজাদা লেখকের কাছ থেকেও আমরা সহজে শুনতে পাই না।

ওই লস এঞ্জেলেস-এ যে হোটেলটিতে আমরা ছিলাম, সেটি একেবারে সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। আমরা এমন একটা বয়সে পৌঁছেছি, যখন অল্প-বিস্তর শরীরচর্চা, সে যত সামান্যই হোক না কেন, করা বাঞ্ছনীয়। অতএব, আমি, সারা, নূর এবং ইরেশ সকাল সকাল উঠেই সমুদ্রতটে যেতাম হাঁটতে। সেখানে আমাদের মধ্যে কেউ হাঁটত, কেউ দৌড়াত। প্রায় প্রতি সকালেই হুমায়ূন আমাদের সঙ্গী হতো। ওই ভোর বেলায়, সূর্য কেবল উঠেছে, কী ওঠে নি, নির্মল বাতাসস্নাত হয়ে বালুকাবেলার ওপর দিয়ে হাঁটা বড়ই আনন্দদায়ক ছিল। হুমায়ূন কিন্তু একটু দূরে দাঁড়িয়ে দার্শনিকের মতো চেহারা করে সূর্যোদয় দেখত আর আমাদের কসরত দেখে মিটিমিটি হাসত। যেদিন শেষবারের মতো আমরা সমুদ্রতটে গেছি, সেদিন আমি আর সারা হুমায়ূনের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। তখনো দৌড়ানো আরম্ভ করি নি। হুমায়ূন হঠাৎ করে আমাকে আর সারাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা আপনাদের বাড়িতে কি কাজের লোকেরাও সকালে ব্যায়াম করে?' আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'আপনার হঠাৎ এরকম কেন মনে হলো?' জবাবে সে বলল, 'প্রতিদিন সকালেই তো দেখছি আপনারা নিয়ম করে এই সমুদ্রতটে এসে সূর্যোদয়ের সৌন্দর্য না দেখে কসরত করতে লেগে যান।' আমি প্রমাদ গুণলাম। আমি ভাবলাম হুমায়ূন নিশ্চই এই কথাগুলো তাঁর পরবর্তী কোনো বইয়ে লিখে দেবে। আমি তাঁর দু'হাত ধরে মিনতি করলাম যে, আপনি যদি এই রসময় কথাটি লিখতে চান, অবশ্যই লিখতে পারেন, তবে দয়া করে আমাদের নাম উল্লেখ করবেন না। আমি যতদূর জানি, হুমায়ূন আমার কথা রেখেছিল।

হুমায়ূনের সঙ্গে আমার পরিচয় সেই '৮০-র দশকে যখন 'বহুব্রীহি' নাটকের কুশীলব নির্বাচনের কাজ শুরু করেছেন নাট্যকার হুমায়ূন আহমেদ এবং নাটকটির প্রযোজক নওয়াজেশ আলী খান। হুমায়ূনেরই সুপারিশে আমাকে 'ফরিদ' চরিত্রটিতে নির্বাচিত করা হয়। পরে এই ফরিদ চরিত্রটি 'মামা' হিসেবে দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ওই সময় নাটকের মহড়ায় কিংবা শুটিংয়ে হুমায়ূনের সঙ্গে অনেক কথা হতো। তখনো অবশ্য হুমায়ূন তত আড্ডাবাজ হয়ে ওঠে নি। সামান্য দূরত্ব রেখেই কথাবার্তা হতো। যদিও তাঁর রসিকতার কমতি ছিল না তখনো। গম্ভীরমুখে তাঁর ছোটখাটো মন্তব্যগুলো শুনে হাসি চেপে রাখা যেত না। পরে আমাদের ঘনিষ্ঠতা আরও গভীর হয় এবং ঠোঁটকাটা হুমায়ূন সবার সামনেই তখন চোখা চোখা মন্তব্য উচ্চারণ করত।

হুমায়ূনের প্রচণ্ড কৌতূহল ছিল অতি সাধারণ সব বিষয়ের প্রতি। মনে আছে, বিভিন্ন দিন তার ইচ্ছে হতো লস এঞ্জেলেসে বিভিন্ন খাদ্য কিংবা পানীয়ের স্বাদ গ্রহণ করার। আমরা যেহেতু মহড়া এবং মঞ্চায়ন নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম, ইরেশ তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছে এবং ইরেশের প্রতি তাঁর এক ধরনের অপত্য স্নেহ গড়ে উঠেছিল তখন। খুব পছন্দ হয়েছিল তাঁর ইরেশকে। আজ এই কলামটি লিখতে বসে, এই কথাগুলো বড়ো মনে পড়ছে আমার। তবে সবকিছু ছাপিয়ে মনে পড়ছে সেই সময়ের কথা যখন গতবার একপ্রস্থ চিকিৎসা শেষে সে ঢাকায় এসেছিল কয়েকদিন কাটিয়ে যেতে। সে কি বুঝতে পেরেছিল যে, সে আর ফিরবে না এখানে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবদ্দশায় ? এবং এসেই সে সরাসরি চলে গিয়েছিল নুহাশপল্লীতে। তাঁর প্রিয়, পছন্দের বৃক্ষরাজি ঘেরা, শ্যামল নুহাশপল্লী। তাঁর সেই সফর বাংলাদেশের অনেক টেলিভিশন চ্যানেলে দেখা গেছে। তারা নুহাশপল্লীতে গিয়ে তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে। আমি লক্ষ করেছি, চতুর্থ মাত্রার ক্যানসার থেকে আরোগ্যপ্রত্যাশী একজন মানুষ কী অসম্ভব জীবনীশক্তি নিয়ে তাঁর প্রিয় বৃক্ষগুলোর মধ্য দিয়ে অতি দ্রুতগতিতে হেঁটে যাচ্ছে। আমার মনে হয়েছে যে, মার্কিন দেশের অতি উন্নত চিকিৎসাও তাঁর দেহমনের নিরাময়ে যতটা সাফল্য অর্জন করতে পারে নি, তাঁর অতি প্রিয় শ্যামল-সবুজ বৃক্ষরাজি বোধহয় তার অনেকটাই অর্জনে সফল হয়েছে। কেন যেন মনে হচ্ছিল মানিকগঞ্জের পারিলনিবাসী সেই বৃক্ষসখার কথা, যে নিজের সমস্ত রোগ-জরা দূর করত একটি বটগাছকে জড়িয়ে ধরে। এই গল্পটি বলেছিলেন আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধু ড. নওয়াজেশ আহমেদ। আহা, তিনিও প্রয়াত আজ।

আজ, হুমায়ূন ফিরে এসেছে তাঁরই বৃক্ষরাজির সান্নিধ্যে। সেখানেই রচিত হয়েছে তাঁর শেষ শয্যা। পাঠক, আমায় ভুল বুঝবেন না। তাঁর সমাধি কোথায় হয়েছে, বা হওয়া উচিত ছিল তা নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না। এটা তাঁর পরিবার-পরিজনের বিষয়। কিন্তু শ্যামল বনের মধ্য দিয়ে তাঁর দৃপ্ত পদচারণা আমার বড় ভালো লেগেছিল। সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল ওইরকম হাঁটতে হাঁটতে যদি ক্লান্তি এসে ঘিরে ধরে তাঁকে, তবে তাঁরই অতি পরিচিত কোনো একটি বৃক্ষের ছায়ায় তিনি বসে পড়বেন এবং বড় আনন্দে নিদ্রায় নিমজ্জিত হবেন। এই ধরনের বৃক্ষপাগল মানুষ বাংলাদেশে আছেন অনেকেই। তাঁদেরই প্রতিভূ হুমায়ূন আহমেদ বৃক্ষেরই ওপর একাধিক সৃজনশীল লেখা লিখে গেছে। নানাভাবে আমরা হুমায়ূনকে জেনেছি, নিসর্গপ্রেমিক হুমায়ূনকে হয়তো অনেকেই চেনেন না। এটি তাঁর চরিত্রের আরও একটি মাত্রা, তা আমরা কোনোভাবেই ছোট করে দেখতে পারি না।

আমরা, যারা হুমায়ূনকে জানি, যাদের ভালোবাসায় তিনি স্থান করে নিয়েছেন তাদের হৃদয়ে, তাদের প্রতি একটি আবেদন। যদি ইচ্ছে এবং ক্ষমতা থাকে, আমরা যেন অন্তত্পক্ষে এই বর্ষায় একটি বৃক্ষরোপণ করি তাঁর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে। সেই বৃক্ষ যখন আস্তে আস্তে পূর্ণবয়স্ক হবে, আকাশ ছোঁয়ার ইচ্ছে হবে তার, তখন আমাদের ভাষা, আমাদের অভিব্যক্তি এবং সৃজনশীল চিন্তায় আমাদের এই ক্ষমতাও হুমায়ূনেরই মতো আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা-অদেখায় হুমায়ূন আহমেদ

আসাদুজ্জামান নূর

নাট্যকার হিসেবে চেনার আগে তাঁকে আমি লেখক হিসেবে চিনতাম। বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্টুডিওতে তাঁর সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা, তার আগেই *শঙ্খনীল কারাগার*, *নন্দিত নরকে*-র মতো উপন্যাসগুলো তাঁকে পরিচিতি দিয়েছে। তবে নাটকপাড়ায় হুমায়ূন আহমেদ তখনো খুব আলোচিত নাম নয়। এক পর্বের একটি নাটক করতে গিয়ে নাট্যকার হুমায়ূনের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। নাটকটির প্রযোজক ছিলেন সম্ভবত মোস্তাফিজুর রহমান। আমার একটা অভ্যাস, সবসময় একটা দৃশ্যের দৃশ্যায়ন শেষ হলেই সবার কাছে জানতে চাইতাম, কেমন হলো কাজটা। এই আচরণই হুমায়ূন আহমেদের কাছে আমাকে আলাদা করে তুলেছিল। আর আমার দিক থেকে, ভালো নাট্যকার এবং লেখক হিসেবে এক ধরনের শ্রদ্ধাবোধ তো ছিলই। সেই থেকে শুরু। বলছি সম্ভবত '৭৬ সালের কথা।

এরপর একে একে 'অয়োময়', 'এইসব দিনরাত্রি', 'বহুব্রীহি', 'কোথাও কেউ নেই'... সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। সেই সময় হুমায়ূন আহমেদের প্রায় সবগুলো নাটক-সিনেমাতেই আমি ছিলাম পরিচিত মুখ। শুধু অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূরই না, ব্যক্তি নূরের সঙ্গেও ততদিনে তাঁর বেশ ভালো বোঝাপড়া। তাই আমি যখন রাজনীতি শুরু করলাম, প্রথম প্রথম খুব ক্ষেপে গিয়েছিলেন। 'আপনি রাজনীতি করলে নাটক করবে কে?' পরে অবশ্য মেনে নিয়েছেন।

এক পর্বের নাটক, ধারাবাহিক নাটক—হুমায়ূন আহমেদের বহু নাটকে আমি অভিনয় করেছি। একটা নাটকের কথা বলি। নাটকের নাম 'নিমফুল'। তবে 'নিমফুল' নাম হওয়ার পেছনে একটা মজার গল্প আছে। সেই সময় বিটিভির টিভি গাইড ছাপা হতো। নাটক প্রচার হওয়ার আগেই নাটকের নাম জমা দিতে হতো। একটা গল্প মাথায় রেখে হুমায়ূন নাম দিলেন—'নিমফুল'। পরে দেখা গেল, গল্প বদলে গেছে। তখন আর নাম বদলের সুযোগ নেই। 'নিমফুল' নামে দর্শক যে নাটক দেখল, সেটি আসলে হুমায়ূন আহমেদের লেখা 'চোখ' গল্পটির নাট্যরূপ। নাটকে আমার চরিত্র—মনা ডাকাত। হুমায়ূনের নাটকগুলোতে একেকবার আমি একেক রূপে হাজির হতাম। এই ব্যাপারটা আমাকেও খুব আনন্দ দিত। 'কোথাও কেউ নেই' নাটকে কথা ছিল আমি মোনার প্রেমিকের চরিত্রটা করব। যে চরিত্রে পরে খায়রুল আলম সবুজ অভিনয় করেছেন। আমি হুমায়ূন আহমেদকে বলেছিলাম, এই চরিত্রে অভিনয় করলে আমি সচরাচর যা করি, তা-ই করা হবে। হুমায়ূন মেনে নিয়েছিলেন। সে চিন্তা থেকেই পরে বাকের ভাইয়ের চরিত্রে আমাকে নেওয়া।

হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে একটা দীর্ঘ সময় কেটেছে নুহাশপল্লীতে। নুহাশপল্লীর প্রথম দিককার কথা। সেই সময় এখনকার মতো পাকা ঘর ছিল না। একটা টিনের ঘর ছিল, আর ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা বাঁশের মাচার ঘর। মনে আছে সেই মাচার ঘরে পা ফেললেই ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হতো। একবার শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল ছাত্র শিবিরের হামলায়। দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। একটা বিশ্ববিদ্যালয় এত দিন ধরে বন্ধ—হুমায়ূনের কাছে ব্যাপারটা ভালো লাগে নি। তাঁর পরামর্শে ঢাকা থেকে আমরা দলবেঁধে রওনা হলাম সিলেট, বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার দাবিতে অনশন করব বলে। ষাট-সত্তর জনের বিশাল দল, সিলেটে থাকা-খাওয়ার কোনো বন্দোবস্ত নেই, এ নিয়ে তাঁর কোনো চিন্তাও নেই। সেই সময় সিলেটে এ নিয়ে দারুণ উত্তেজনা। ট্রেনে রওনা হওয়ার দু'এক ঘন্টার মধ্যেই আমরা খবর পেলাম, নুহাশপল্লীতে সেই বাঁশের মাচার ঘর কে বা কারা যেন পুড়িয়ে ফেলেছে।

একবার আমরা একটা দৃশ্যের দৃশ্যায়ন করলাম। সেই দৃশ্যের অন্যতম কুশীলব ছিল কালো একটা ঘোড়া। ক'দিন পর একই নাটকের শুটিং, আবারও সেই কালো ঘোড়াকে তলব করা হলো। জানা গেল, কালো ঘোড়াটা বিক্রি হয়ে গেছে। কালো ঘোড়াটা নেই, তবে একটা সাদা ঘোড়া পাওয়া গেছে। একদিন দেখি এক লোক জুতার ব্রাশে রঙ লাগিয়ে ঘোড়াকে কালো করার চেষ্টা করছে। হুমায়ূন সেই সাদা ঘোড়াকেই জুতার কালি মেখে কালো করবেন। ঘোড়া নিয়েই আরও কাণ্ড আছে। নদীর ওপারে শুটিং হবে। ঘোড়াটাকেও নদীর ওপার নিতে হবে। রাতের বেলা, ঘোড়া নিয়ে নদী পাড়ি দেওয়া—বিরাট ঝক্কি। ঘোড়া কিছুতেই নৌকায় উঠতে চায় না। একসময় তো ঘোড়া নৌকা থেকে পানিতেই পড়ে গেল। শুটিং-টুটিং মাথায় উঠল, সে এক বিপজ্জনক অবস্থা! এত রাতে সবাই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘোড়াটাকে টেনেটুনে পাড়ে তুলেছিল। সেই দৃশ্যের শুটিং করতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল পরদিন পর্যন্ত। এরকম আরও কত শত ঘটনা। আজই করতে হবে, এক্ষুনি করতে হবে—এই পাগলামি হুমায়ূন আহমেদের মধ্যে অধিক মাত্রায় ছিল। চট করে রেগে যেতেন, আবার ঠিক হয়ে যেতেন।

আমার বিজ্ঞাপনী সংস্থা থেকে তাঁকে দিয়ে বেশ কিছু জনসচেতনতামূলক নাটক করিয়েছি। এসব নাটক হুমায়ূন যে খুব আনন্দ নিয়ে করতেন, তা না। তবে আমার অনুরোধ ফেলতেও পারতেন না। আমার চাপে পড়ে এক প্রকার বাধ্য হয়েই লিখতেন। মাঝেমাঝে এসব নাটক লেখার পর প্রযোজনা সংস্থাগুলো কিছু কিছু জায়গা পরিবর্তন করতে বলত। হুমায়ূন বলতেন, আমি ওসব পারব না, আপনি করে নিন। ছোটখাটো পরিবর্তনগুলো আমিই করতাম, হুমায়ূনকে দেখাতামও না। পরে তিনি অবাক হয়ে বলতেন, 'আপনি তো আমার মতো করেই লিখেছেন!' তাঁর সঙ্গে কাজ করতে করতেই আসলে এমন একটা বোঝাপড়া তৈরি হয়ে গিয়েছিল, হুমায়ূন আহমেদের সংলাপ কেমন হবে, আমি জানতাম।

হুমায়ূনের সঙ্গে গল্প করতে বসলেই বোঝা যেত, পড়ার প্রতি তাঁর ভীষণ ঝোঁক। শুধু যে সাহিত্য পড়তেন তা না, বিজ্ঞান নিয়েও প্রচুর পড়তেন। লিখতেনও। কঠিন কঠিন বিষয়—সহজ করে লিখে ফেলতেন। তাঁর পড়ালেখার বিষয় বিজ্ঞান। যে সময় পড়ালেখা করেছেন, শুধু সেই সময়ের বিজ্ঞানই না, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার নিয়েও তিনি খুব ভালো ধারণা রাখতেন। আমার খুব অবাক লাগত। ভাবতাম, হুমায়ূন পড়েন কখন? যতদূর মনে হয়, ভোর থেকে শুরু করে দুপুরে খাওয়ার আগে পর্যন্ত—এই ছিল তাঁর পড়া আর লেখার সময়। কখনো হয়তো তাঁকে ধরেছি, টেলিভিশনের জন্য একটা ছোট্ট নাটিকা লিখে দিতে হবে। দুই কি এক মিনিট দৈর্ঘ্যের। বলতেন, আজ না কাল আসেন। এমন করতে করতে বেশ কয়েকদিন পেরিয়ে গেলে তাঁর বাসায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়ে হাজির হতাম, বলতাম যে করেই হোক, আজ লেখাটা লাগবে। হুমায়ূন বলতেন, আপনি আধঘণ্টা ঘুরে আসেন। ঘুরে এসে দেখতাম, লেখা হয়ে গেছে। অথচ সামনে বসে থাকলে লেখা হতো না। হুমায়ূনের লেখার গতি—অবিশ্বাস্য!

হুমায়ূন আহমেদ কৌতুক শুনতে আর বলতে ভালোবাসতেন। আর ভালোবাসতেন ম্যাজিক। ম্যাজিক দেখাতেনও দারুণ! আমার কখনো কখনো মনে হতো, তাঁর মধ্যে এক ধরনের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা আছে। জানি না কেন। একটা কারণ হতে পারে, হুমায়ূন যখন নানা ধরনের গল্প বলতেন, মাঝেমাঝে কিছু গল্প সত্যি বলে মনে হতো। তা ছাড়া অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা না থাকলে একটা মানুষ এভাবে লিখতে পারেন না। অনেকে বলে, হুমায়ূনের সব লেখা ভালো না। এটা সব বড় লেখকের ক্ষেত্রেই সত্যি। শুধু তাঁর ভালো গল্প-উপন্যাসগুলোই যদি ধরেন, তার সংখ্যাও কিন্তু অনেক।

হুমায়ূন খুব গানপাগল ছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত পছন্দ করতেন। হাছন রাজার ভীষণ ভক্ত ছিলেন। আমার মনে হয়, তাঁর নিজের জীবনটাও অনেকটা হাছন রাজার মতোই! একেবারেই সাদাসিধে ছিলেন। ঘরের দরজা কখনোই লাগাতেন না। বেশির ভাগ সময়ই খালি গায়ে থাকতেন। আমি বাসায় গেলে হয়তো বলতেন, 'নূর, আসেন।' বলতে বলতে শার্টটা গায়ে দিতেন, বোতামও লাগাতেন না। এরকমই ছিলেন মানুষটা...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহান ফিহা

আহসান হাবীব

বড়ভাই হুমায়ূন আহমেদ কখনো আমার বই পড়ে নি বলেই আমার ধারণা। কারণ আমার লেখা নিয়ে তাকে কখনো কোনো মন্তব্য করতে শুনি নি। আমিও আমার কোনো বই তাকে কখনো পড়তে দিই নি, মেজোভাই জাফর ইকবালকেও না। কারণ আমার একটু লজ্জাই লাগত। ছোটভাই বলে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশাও একটু বেশিই হতো। মেলায় বেশি বই বেরোলে বলত, 'শাহীন তো দেখছি বইয়ের ফ্যাক্টরি হয়ে উঠছে...' এই ধরনের (আমার বাসার নাম শাহীন)। তো সেই বড়ভাই হঠাৎ একদিন আমাকে ফোন করল।

এই শাহীন ?

বলো।

তোর লেখা সমরেশ মজুমদার খুব পছন্দ করেছে...আচ্ছা রাখি। বলে ফোন রেখে দিল।

তার তরফ থেকে লেখালেখি নিয়ে সেই একবার মাত্র প্রশংসাবাক্য। তাও আরেকজনের মন্তব্য তার মুখে। তবে যেবার আমি কিউবার হাভানা কনটেস্টে কার্টুনে পুরস্কার পেলাম, তখন সে আমার পল্লবীর বাসায় এসে নগদ কিছু টাকা দিয়ে খুশি হয়ে। আমার লেখালেখি আর কার্টুনে ওই দুইবার তার প্রতিক্রিয়া... একবার ক্যাশ একবার কাউন্ট। আমার সেই ভাইটা আর নেই। তার ক্যানসার আক্রান্ত হওয়ার খবরটা যখন পেলাম... সে বেশ চাছাছোলাভাবেই সিঙ্গাপুর থেকে ফোনে বলল, শোন, লুকোছাপার কিছু নেই, ক্যানসার ধরা পড়েছে, দ্রুত ছড়াচ্ছে। আম্মাকে বল এখনি বল...আর ভাইবোনদের বল দোয়া করতে... আচ্ছা রাখি। আমি মাকে বললাম। মা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকলেন আমার দিকে। তার মৃত্যুসংবাদটাও আমি মাকে দিলাম...এই কঠিন কাজটাও আমাকে করতে হয়েছে।

১৯ জুলাই। উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম কার্টুনিস্ট কাজী আবুল কাসেমের (দোপেঁয়াজা) মৃত্যুবার্ষিকী ছিল, তাঁকে স্মরণ করে একটা লেখা লিখেছিলাম *বণিক বার্তায়,* রাতে বাড়ি ফিরে সেটাই পড়ছিলাম (কে জানত তারও মৃত্যু ওই ১৯ জুলাই হবে)। এ সময় আমেরিকা থেকে মেজো ভাবি (ইয়াসমিন হক) ফোন করলেন। তিনি খুবই শক্ত ধাতের মানুষ। তখন রাত এগারোটা বিশের মতো বাজে... তিনি ফোনে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, শাহীন, আমরা দাদাভাইকে ধরে রাখতে পারছি না...তিনি চলে যাচ্ছেন...তাঁর সবকিছু একে একে ফেইল করছে...তাঁর প্রেসার এখন ৪০..., শাহীন, এখন ৩০..., শাহীন এখন ২০..., শাহীন এখন ১০... ... ... শাহীন, দাদাভাই নেই। ওপাশে তার আর্তনাদ শুনলাম। ফোন কেটে গেল। আমি তারপরও ফোন কানে ধরে রইলাম, নিঃশব্দ ফোন। বোনেরা ছুটে এসে ঘিরে ধরল।

কী রে ? কী হলো ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ফিসফিস করে বললাম, 'দাদাভাই মারা গেছে...' কী অসম্ভব একটা বাক্য। মনে আছে, ঠিক ৪০ বছর আগে আমার মেজোভাই জাফর ইকবাল আম্মাকে বলেছিল, 'আম্মা, আব্বাকে মিলিটারিরা গুলি করে মেরে ফেলেছে... ।'

ঠিক সেই রকম আমি মাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'আম্মা, দাদাভাই মারা গেছে...'

বহু বছর পর...প্রায় ৪০ বছর পরই বলব আমাদের পুরো পরিবার একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল... আহ্, কী কষ্ট!

...তার পরের ঘটনা সবাই জানে। তাকে রাষ্ট্রীয় সম্মানে ঢাকায় আনা হলো। আপামর জনগণের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে প্রথমে শহীদ মিনার, তারপর জাতীয় ঈদগাহে জানাজা...সবশেষে নুহাশপল্লীতে দাফন। মাঝখানে তাঁকে আমরা পরিবারের সদস্যরা দেখতে গেলাম বারডেমের হিমঘরে। কী আশ্চর্য একটা জায়গা! ঝকঝকে পরিষ্কার। স্টেইনলেস স্টিলের একটা বিশাল ফ্রিজ। সশব্দে একটা ট্রে টেনে বের করা হলো। সাদা কাফনে জড়ানো হুমায়ূন আহমেদ। ঠান্ডার একটা ধোঁয়াটে ভাপ বেরুল...তাঁর মুখের কাপড় সরানো হলো। নীল একটা মুখ...ক্লিন শেভড ক্লান্ত চোখ দুটো বোজা...ভেজা চুলগুলো এলোমেলো...চারদিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, এ যেন তাঁর সেই *তোমাদের জন্য ভালোবাসা* উপন্যাসের একটা দৃশ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি...মহান ফিহা শুয়ে আছে ঝকঝকে স্টেইনলেস স্টিলের একটা ট্রেতে নিথর... আহ্! এত কষ্ট ছিল এক জীবনে? আমার মা মহান ফিহার গালে গাল ঠেকিয়ে কেঁদে উঠলেন হু হু করে...আমি স্পর্শ করলাম, তার চুল, গাল, মুখ...আমার প্রিয় বড়ভাইটা প্রতিবাদহীন শুয়ে রইল...ছোটবেলায় তাঁর মাথায় বিলি কাটলে পরে শোনাত...আমি বিলি কাটার মতো তাঁর ভেজা চুলে হাত রাখলাম...

নুহাশপল্লীতে তাঁর কবরে আমি নেমেছি। আমার পাশে নুহাশ...আমরা অপেক্ষা করছি। তাঁকে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, এ যেন তার বিখ্যাত উপন্যাস *নন্দিত নরকে*র মন্টুর জন্য অপেক্ষা করা। আমরা তাঁকেই শুইয়ে দেব মাটিতে, যেখানে সে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে থাকবে একা। ওপরে তাকিয়ে দেখি পুলিশ, র‍্যাব আর বর্ডার গার্ডের একটা জটিল বেষ্টনী, তার ওপর শত শত ক্যামেরা...সবাই অপেক্ষায় তাঁকে আনা হবে...এখনই আনা হবে। আনা হলো। কফিন থেকে বের করা হলো...ডাক্তার এজাজ কাঁদতে কাঁদতে তার পায়ের দিকটা আমার দিকে তুলে দিয়ে বলল, 'শাহীন ভাই, স্যারকে ধরেন... ।' আমরা তাঁকে ধরে নামালাম গহীন কবরে। হালকা নরম একটা শরীর। শুইয়ে দিলাম তাঁকে শেষ শয্যায়। আমি তখন বসে পড়ে তার পা, হাত সব ধরে ধরে দেখছিলাম। সবই কাফনের কাপড়ে ঢাকা। তারপরও ধরছিলাম তার চেনা হাত-পাগুলো, এখন কত অচেনা। একটা বিষয় খেয়াল করলাম, তাঁর ডান পা-টা হাঁটুর কাছে একটু ভাঁজ করা। মৃত্যুর পর ঠিক এ রকমটাই ছিল আমার বাবারও, ভাইয়ার মুখে শুনেছিলাম। কেন এই মিল?

সে অলৌকিক বিষয়গুলো খুব পছন্দ করত। আর তখনই যেন একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটল। হঠাৎ দেখি, আমার পেছনে কবরের কোনায় দুটো জিনিস পড়ে আছে। একটু আগেও এ দুটো ছিল না। আমি কিছু না ভেবেই জিনিস দুটো পকেটে ঢুকিয়ে ফেললাম।

ফেরার পথে গাড়িতে বসে জিনিস দুটো পকেট থেকে বের করলাম। একটা ছোট্ট কার্ড সুতো বাঁধা ট্যাগের মতো, তার ওপরে ইংরেজিতে লেখা আহমেদ হুমায়ূন, নিচে ডাক্তারের নাম, হাসপাতালের নাম, একটা সিরিয়াল নম্বর আর তারও নিচে ছোট্ট করে লেখা 'এটাচড টু টো'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মানে এই ট্যাগটা তার বুড়ো আঙুলে বাঁধা ছিল আর ছিল একটা প্লাস্টিকের ব্যান্ড। সেটাও নিশ্চয়ই পায়ে রিংয়ের মতো পরানো ছিল। কিন্তু খুলে গেল কীভাবে ? নিউইয়র্কে তাঁকে ধোয়ানোর সময় খুলে যেতে পারে। কিন্তু কাফনের ভেতরেই থাকার কথা, বাইরে এল কীভাবে ? বাইরে এলই যদি, আমার হাতে কেন পড়ল ? তবে কি তাঁর শেষ চিহ্নটা আমাকেই দিয়ে গেল আমার প্রিয় বড়ভাইটা ?

অনেক আগে থেকেই আমার মানিব্যাগে সবসময় একটু মাটি রাখতাম, শহীদ বাবার কবরের মাটি। আর এখন আছে বড়ভাইয়ের ট্যাগটা। দুটো জিনিস সঙ্গে নিয়েই ঘুরি...কেন, আমি নিজেই জানি না।

মহান চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াস একবার তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশে বললেন :

আজ আমি তোমাদের একটা কৌতুক বলব। শিষ্যরা সবাই হতভম্ব। কারণ চীনা দার্শনিকেরা তখন মনে করতেন হাস্যকৌতুক এসব মূর্খদের কাজ, জ্ঞানীদের নয়। শিষ্যরা কিছু বলল না। কনফুসিয়াস কৌতুকটি বললেন, সবাই হাসল তাঁর কৌতুক শুনে। কনফুসিয়াস দ্বিতীয়বারও ওই একই কৌতুক বললেন...এবার কেউ হাসল না, তৃতীয়বারও তিনি ওই একই কৌতুক বললেন, এবারও কেউ হাসল না। তখন কনফুসিয়াস বললেন, আমরা একটা হাসির ঘটনায় একবারই হাসি। কিন্তু একটা দুঃখের ঘটনায় কেন বারবার কাঁদব ?

হে মহান কনফুসিয়াস, ক্ষমা করবেন, আমাদের গোটা পরিবারকে বারবার কাঁদতে হচ্ছে। একটি দুঃখের ঘটনা আমাদের বারবার চোখের পানি ফেলতে বাধ্য করছে। কে জানে, হয়তো একদিন সময় বদলে দেবে সবকিছু। যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সঙ্গে তার হয় নাকো দেখা...

(জীবনানন্দের এই লাইনটা বড়ভাই সবসময় ব্যবহার করত, এবার আমি করলাম তার জন্য।)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের হুমায়ূন আহমেদ

ইমদাদুল হক মিলন

হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে যেদিন পরিচয় হলো সেদিন আমার মাথা ন্যাড়া।

জীবনে দুবার ন্যাড়া হওয়ার কথা আমার মনে আছে। একবার একাত্তরের মাঝামাঝি আরেকবার তিরাশির শুরুর দিকে। দুবারই মন ভালো ছিল না।

একাত্তরে আমি এসএসসি ক্যান্ডিডেট। আমাদের বয়সী ছেলেরাও মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছে। এই কারণে বাবা আমাকে বাড়ি থেকে বেরুতে নিষেধ করে দিলেন। দুঃখে আমি ন্যাড়া হয়ে গেলাম। ন্যাড়ামাথা নিয়ে রাস্তায় বেরুতে লজ্জা করবে, ফলে বাড়ি থেকে বেরুনো হবে না।

সত্যি তাই হয়েছিল। ন্যাড়া মাথার কারণে একাত্তরের অনেকগুলো দিন আমি বাড়ি থেকে বেরুই নি। তিরাশি সালে সেই স্মৃতি মনে করেই ন্যাড়া হয়েছিলাম। আমার তখন রুজি রোজগার নেই। একাশির অক্টোবরে জার্মানি থেকে ফিরে 'রোববার' পত্রিকায় জয়েন করেছি। *ইত্তেফাকের* সামনে দিনদুপুরে ট্রাকের তলায় এক পথচারীকে থেঁতলে যেতে দেখে *রোববারে* একটা রিপোর্ট লিখলাম, সেই রিপোর্টে বিশেষ একটি মন্তব্য করায় চাকরির চলে গেল। তারপর বন্ধুদের সঙ্গে 'দোয়েল' নামে একটা এডফার্ম করলাম। এক-দেড় বছরের মাথায় সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। ততদিনে বিয়ে করে ফেলেছি। কিন্তু পকেটে একটি টাকাও নেই। এই অবস্থায় সিদ্ধান্ত নিলাম, সমরেশ বসু হয়ে যাব। লিখে জীবন ধারণ করব। কিন্তু বাংলাদেশের মতো দেশে সে যে কী কঠিন কাজ, আজকের কোনো তরুণ লেখক ভাবতেই পারবেন না। তখন একটা গল্প লিখে পঞ্চাশ এক শ' টাকা পাই। ঈদসংখ্যার উপন্যাসের জন্য পাঁচ শ', একহাজার। তাও পেতে সময় লাগে তিন চারমাস। লেখার জায়গায়ও কম। এত পত্রপত্রিকা তখন ছিল না। দৈনিক পত্রিকায় উপন্যাস ছাপার নিয়ম ছিল না। কঠিন সময়। দু' চারটা বই ততদিনে বেরিয়েছে, সেগুলোর অবস্থাও ভালো না। পাবলিশাররা টাকাই দিতে চায় না। একটা বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থা তো অভাবী লেখক দেখে ষোল শ' টাকায় আমার দুটো বইয়ের গ্রন্থস্বত্বই কিনে নিয়েছিল। প্রথম প্রকাশিত বইয়ের জন্য আমি কোনো টাকাই পাই নি। এই অবস্থায় লিখে জীবন ধারণ! সত্যি, সাহস ছিল আমার! সেইসব দিনের কথা ভাবলে এখনো বুক কাঁপে।

যা হোক, লিখে জীবন ধারণ মানে প্রতিদিন দিস্তা দিস্তা লেখা। লেখার জন্য সময় দেওয়া এবং ঘরে থাকা। কিন্তু সারাদিন ঘরে আমার মন বসবে কেমন করে! যখন তখন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা না দিলে আমার পেটের ভাত হজম হয় না। তখনই একাত্তরের ন্যাড়া হওয়ার স্মৃতি মনে এসেছিল। ন্যাড়া হয়ে গেলাম। ন্যাড়ামাথা নিয়ে সারাদিন ঘরে বসে উন্মাদের মতো লিখি। লেখার কষ্ট দেখে জ্যোৎস্না একদিন আমার ন্যাড়া মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেছিল, সাধ্য থাকলে তোমার লেখাগুলো আমি লিখে দিতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেবারের বাংলা একাডেমী বইমেলায় তিন-চারটা বই বেরুল। 'কালোঘোড়া' 'তাহারা' ইত্যাদি। বইয়ের বিক্রি বাড়াবার জন্য লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে ন্যাড়ামাথা নিয়েই মেলায় যাই। আমার অবস্থা যে বেশ ভালো বোঝাবার জন্য জার্মানি থেকে আনা জিনস কেডস আর একেকদিন একেকটা শার্ট পরি। জ্যোৎস্নার মোটা ধরনের একটা সোনার চেন পরে রাখি গলায়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমার অবস্থা তখন 'উপরে ফিটফাট, ভিতরে সদরঘাট'। পকেটে সিগ্রেট খাওয়ার পয়সা পর্যন্ত থাকে না।

বইমেলায় এক বিকেলে নওরোজ কিতাবিস্তানে বসে আছি, প্রতিষ্ঠানটি তখনো ভাগ হয় নি, আমার 'তাহারা' বইটি হাতে নিয়ে চশমা পরা, রোগা, দেখলেই মেধাবী এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মনে হয়, এমন একজন মানুষ সামনে এসে দাঁড়ালেন। অটোগ্রাফ। মুখের দিকে তাকিয়ে দিশেহারা হয়ে গেলাম। নিজের অজান্তে উঠে দাঁড়ালাম। মুখটি আমার চেনা। ছবি দেখেছি। হুমায়ূন আহমেদ। তখনো পর্যন্ত খান ব্রাদার্স থেকে তাঁর তিনটি বই বেরিয়েছে। *নন্দিত নরকে*, *শঙ্খনীল কারাগার* আর বাংলাদেশের প্রথম সায়েন্স ফিকশন 'তোমাদের জন্য ভালবাসা।' তিনটি বইয়ের কোনো একটির ব্যাক কভারে পাসপোর্ট সাইজের ছবিও আছে। আর কে না জানে স্বাধীনতার পর পর 'নন্দিত নরকে' বাংলাদেশের সবচাইতে আলোচিত উপন্যাস। আহমদ শরীফ, শওকত আলী, আহমদ ছফা এইসব শ্রদ্ধেয় মানুষ উপন্যাসটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সনাতন পাঠক ছদ্মনামের আড়ালে বসে তখনই বিখ্যাত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'দেশ' পত্রিকায় 'নন্দিত নরকের' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন।

তিয়াত্তর-চুয়াত্তর সালের কথা। আমি জগন্নাথ কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ি। লেখার পোকা মাত্র মাথায় ঢুকেছে। আমার বন্ধু কামালের বন্ধু হচ্ছে খান ব্রাদার্সের মালিকের ছেলে ফেরদৌস। তার কাছ থেকে *নন্দিত নরকে* এবং *শঙ্খনীল কারাগার* জোগাড় করে আনল কামাল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই বই পড়লাম আমরা। পড়ে মুগ্ধ এবং বিস্মিত! এমন লেখাও হয়! এত সহজ-সরল ভাষায়, এমন ভঙ্গিমায়, মধ্যবিত্ত জীবনের সামান্য ঘটনাকে এমন অসামান্য করে তোলা যায়! সেই প্রথম হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে একটা ঘোর তৈরি হলো আমার। সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশ, কত নতুন নতুন লেখক লিখতে শুরু করেছেন, এমনকি আমাদের প্রবীণ লেখকরাও নতুন লেখকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লিখছেন, কিন্তু বেশিরভাগ লেখকেরই লেখা আমি বুঝতে পারি না। ভাষার কারুকার্যে অযথাই জটিল। গল্পে গল্প খুঁজে পাওয়া যায় না। কায়দা সর্বস্ব। এই অবস্থায় দুতিন বছরের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে আরও দুতিনটি লেখা পড়লাম হুমায়ূন আহমেদের। *জনান্তিক* কিংবা এই ধরনের কোনো একটি লিটল ম্যাগাজিনে পড়লাম 'নিশিকাব্য' নামে এক আশ্চর্য সুন্দর গল্প। বাংলাবাজার থেকে *জোনাকী* নামে উল্টোরথ টাইপের একটি সিনেমা পত্রিকা বেরুত, সেই পত্রিকার কোনো এক বিশেষ সংখ্যায় পড়লাম 'সূর্যের দিন'। এই 'সূর্যের দিন'ই পরে *শ্যামল ছায়া* নামে বই হয়। যদিও *সূর্যের দিন* নামে পরে অন্য আর একটি মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস লিখেছেন হুমায়ূন আহমেদ। যা হোক *বিচিত্রা*-র ঈদসংখ্যায় সেসময় উপন্যাস লিখলেন হুমায়ূন আহমেদ। 'নির্বাসন'। বুক হু হু করা এক প্রেমের উপন্যাস। তারও পর লিখলেন 'অন্যদিন'। এইসব লেখা পড়ে আমি বুঝে গেলাম লেখা এমনই হওয়া উচিত। সাদামাটা নিজস্ব ভাষায়, নিজের মতো করে জীবনের কথা বলে যাওয়া যা প্রতিটি মানুষকে আলোড়িত করবে, দ্রুত পৌঁছাবে পাঠকের কাছে। বলতে দ্বিধা নেই, লেখায় সরলতার মন্ত্র আমি হুমায়ূন আহমেদের কাছ থেকেই পেয়েছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু বইমেলার সেই বিকেলের আগে তাঁকে কখনো চোখে দেখি নি। শুনেছি তিনি ছ'বছর ধরে আমেরিকায়, পলিমার কেমিস্ট্রিতে পিএইচডি করছেন। এদিকে বাজারে সম্ভবত চারটি মাত্র বই, *নন্দিত নরকে*, *শঙ্খনীল কারাগার*, *তোমাদের জন্য ভালবাসা* আর *নির্বাসন*। সেই চারটি বইয়ের কল্যাণেই বিরাশি সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়ে গেছেন। পরে শুনেছি, আমেরিকায় বসে তিনি যখন বাংলা একাডেমী পুরস্কার পাওয়ার কথা শুনলেন, শুনে তার শিক্ষককে দিলেন খবরটা, আমেরিকান শিক্ষক হতভম্ব। তুমি কেমিস্ট্রির লোক, লিটারেচারে একাডেমি অ্যাওয়ার্ড পাও কী করে?

সেই শিক্ষক কি জানতেন কালক্রমে বাংলাসাহিত্যের রসায়ন সম্পূর্ণ চলে আসবে হুমায়ূন আহমেদের হাতে! সাহিত্যের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ তিনি অবলীলায় ছেড়ে আসবেন! মনে আছে তিরাশির বইমেলায় খান ব্রাদার্স থেকে বেরিয়েছে তাঁর 'অন্যদিন' উপন্যাসটি। মাঝখানে ছ'বছর লেখালেখি করেন নি তবু 'অন্যদিন' খুব ভালো বিক্রি হচ্ছে। এই অবস্থায় তিনি এসেছেন আমার অটোগ্রাফ নিতে। একজন স্বপ্নের মানুষ এসে দাঁড়িয়ে আছেন সামনে, কিসের অটোগ্রাফ, আমি তাঁর পা ধরে সালাম করব কিনা ভাবছি, কোনো রকমে শুধু বলেছি, হুমায়ূন ভাই, আপনাকে আমি চিনি। তিনি বললেন, আমি আমেরিকায় বসে খবর পেয়েছি বাংলাদেশে ইমদাদুল হক মিলন নামে একটি ছেলে গল্প-উপন্যাস লিখে জনপ্রিয় হয়েছে। তুমি কী লেখ আমার একটু বোঝা দরকার।

আমাদের পরিচয় হয়েছিল এইভাবে।

সেদিনই সন্ধের পর আমাকে তিনি তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। শ্যামলীতে এখন যেখানে শামসুর রাহমানের বাড়ি তার পেছন দিকে খেলার মতন মাঠ পেরিয়ে একটা বাড়ি। সেই বাড়ির দোতলা কিংবা তিনতলায় হুমায়ূন ভাইয়ের ফ্ল্যাট। খালাম্মা, শাহিন মানে আজকের বিখ্যাত সম্পাদক কার্টুনিস্ট এবং লেখক আহসান হাবীব, ছোটবোন, ভাবি, ফুটফুটে নোভা, শিলা, বিপাশা। বিপাশা তখন ভাবির কোলে। আর রফিকের মা নামে একজন বুয়া ছিল। পরবর্তী সময়ে এই বুয়াটির বহু মজার মজার আচরণ হুমায়ূন ভাইয়ের বিভিন্ন নাটকে হাসির উপাদান হয়ে এসেছে।

সেদিন আমার সঙ্গে আরও দুজন মানুষ গিয়েছিলেন হুমায়ূন ভাইর বাসায়। *দৈনিক বাংলার* সালেহ চৌধুরী আর বাংলাদেশের প্রথম গ্রান্ডমাস্টার নিয়াজ মোরশেদ। সালেহ চৌধুরীকে হুমায়ূন ভাই ডাকতেন 'নানাজী', আর নিয়াজ মোরশেদের দাবার তিনি ভক্ত। নিয়াজের জন্য ভালো রান্নাবান্না হয়েছিল বাসায়। ভাবি বেশ বড় সাইজের আস্ত একখানা ইলিশমাছ ভেজে খুবই লোভনীয় ভঙ্গিতে সাজিয়ে রেখেছেন ট্রেতে। ইলিশটির ওপর ভাজা পেঁয়াজ ছড়ানো, চারপাশে চাক চাক করে কাটা টমেটো, শসা। ভাত পোলাও দুটোই আছে, মাছ মুরগি সবজি, মিষ্টি সব মিলিয়ে টেবিল ভর্তি খাবার। নানাজী এবং নিয়াজ মোরশেদকে ভাবি চিনতেন, হুমায়ূন ভাই ভাবির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভাবি তাঁর স্বভাবসুলভ হাসিমুখে আমার দিকে তাকালেন, একটু বুঝি অবাকও হলেন। ন্যাড়ামাথা, গলায় সোনার চেন, পরনে জিনস কেডস, এ কেমন লেখক!

সেই সন্ধ্যায় সেই যে হুমায়ূন আহমেদ পরিবারের সঙ্গে আমি মিলে গেলাম আজও সেরকম মিলেমিশেই আছি। আমাদের কোথাও কোনো গ্যাপ হয় নি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন ভাই তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির কেমিস্ট্রির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। ইউনিভার্সিটির কাজ সেরে শ্যামলীর বাসায় ফিরে যান, বিকেলবেলা আসেন ইউনিভার্সিটি টিচার্স ক্লাবে। সালেহ চৌধুরী আসেন; হুমায়ুন আজাদ আসেন, আমিও যাই। চা সিগ্রেট, শিঙাড়া আর গল্পগুজব চলে। সালেহ চৌধুরী গল্প শুরু করলে সহজে থামেন না। শুরুর আগেই হুমায়ুন আজাদ বলেন, কাহিনিটা কি খুব দীর্ঘ ? দুজনের ছোটখাটো খুনসুটিও লাগে কোনো কোনো দিন। হুমায়ূন ভাই আর আমি চুপচাপ বসে থাকি। হুমায়ূন ভাই চেয়ারে বসেন দু'পা তুলে, আসনপিঁড়ি করে। সেই ভঙ্গিতে বসে মাথা নিচু চুপচাপ সিগ্রেট টানেন। তখন কথা বলতেন খুব কম। শুনতেন বেশি। আর আমি শুধু তাঁকে খেয়াল করি। পরিচয়ের দিন থেকে ব্যক্তি মানুষটাকেও তাঁর লেখার মতোই নেশা ধরানো মনে হচ্ছিল আমার। আস্তে ধীরে হুমায়ূন নেশায় আচ্ছন্ন হচ্ছিলাম আমি।

এসময় হুমায়ূন ভাইর একবার জন্ডিস হলো। পেঁপে নিয়ে আমি তাঁকে দেখতে গেছি। জন্ডিসভরা শরীর নিয়েও এমন মজাদার আড্ডা দিলেন তিনি, আমি হতভম্ব। সেদিন প্রথম টের পেলাম হুমায়ূন আমেদ পুরনো হতে জানেন না, তিনি প্রতিদিন নতুন। এমন ঠাট্টাপ্রিয় মানুষ আমি আর দেখি নি। অবলীলাক্রমে নিজেকে নিয়েও ভয়ানক ঠাট্টা করতে পারেন। আর অসম্ভব মেধাবী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, আগাগোড়া যুক্তিবাদী, সম্পূর্ণ স্মার্ট এবং ভয়াবহ শিক্ষিত। জানেন না এমন বিষয় পৃথিবীতে কম আছে। অদ্ভুত সব বিষয়ে আসক্তি। হিপনোটিজম শেখার জন্য আমেরিকা থেকে দুবার নোবেল প্রাইজ পাওয়া প্রফেসর ফাইন ম্যানের বই আনলেন। *অন্যদিন*-এর সম্পাদক মাজহারুল ইসলামকে হিপনোটাইজ করে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। ভূত বিজ্ঞান ধর্ম ম্যাজিক মানুষ আর মানুষের মনোজগৎ, সাহিত্য গান নাটক সিনেমা দাবা আর শিশু এইসব একত্রে ককটেল করলে যে জিনিসটা দাঁড়ায় সেই জিনিসের নাম হুমায়ূন আহমেদ।

প্রচণ্ড শীতে নুহাশপল্লীতে শুটিং করতে এসেছে একটি গ্রাম্য মেয়ে। মা গেছে মেয়েটির জন্য শীতবস্ত্র জোগাড় করতে। পাতলা জামা পরা মেয়েটি ঠকঠক শীতে কাঁপছে। আগুন জ্বেলে তার চারপাশে লোকজন নিয়ে বসে আছেন হুমায়ূন ভাই। মেয়েটিকে খেয়াল করছেন। আগুনের পাশে আসতে মেয়েটি একটু লজ্জা পাচ্ছে, কারণ এখানকার কাউকে সে চেনে না। তারপরও শীত সহ্য করতে না পেরে আস্তে ধীরে আগুনের পাশে এসে দাঁড়ায়। সেই তাপেও তার শীত মানে না। হুমায়ূন ভাই উঠে গিয়ে নিজের কম্বল এনে দেন মেয়েটিকে। তারপর জিজ্ঞেস করেন, তুমি চেন আমাকে ? মেয়েটি তাঁর মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বলে, মনে হয় আপনে হুমায়ূন আহমেদ। আপনেরে আমি চিনছি।

যখন মাথায় যা আসে সেই কাজ না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই হুমায়ূন ভাইর। কিছুদিন আগে মনে হলো নুহাশপল্লীতে একটা একুরিয়াম থাকা দরকার। বিশাল এক একুরিয়াম বসালেন সুইমিংপুলের পাশে। বিদেশি নানা ধরনের মাছের সঙ্গে দুটো দেশি সরপুঁটি, কয়েকটা ট্যাংরা, ছোট সাইজের গোটা চারেক ফলি ছাড়লেন। আমরা গেছি নুহাশপল্লীতে, আর্কিটেক্ট করিম ভাই গেছেন সস্ত্রীক, তাঁর বছর দুআড়াইয়ের ছেলে রিশাদকে নিয়ে একুরিয়ামের পাশে গিয়ে বসে রইলেন হুমায়ূন ভাই। রিশাদ তাঁকে ডাকে হাদা, তিনিও রিশাদকে ডাকেন হাদা। দুজনে এমন ভঙ্গিতে গল্প জুড়ে দিল, দেখে করিম ভাই বললেন, দুটো শিশু গল্প করছে।

বছর আট দশেক আগের কথা। অবসর এবং প্রতীক প্রকাশনীর মালিক আলমগীর রহমান তখন গেণ্ডারিয়ার বাড়িতে থাকেন। তাঁর একমাত্র পুত্র প্রতীকের জন্মদিন। বেশ বড় আয়োজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন আলমগীর ভাই। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন হুমায়ূন ভাই, মুখে ভয়ংকর এক মুখোশ।

মাজহারের বছর দেড়েকের ছেলে অমিয় যখন তখন এসে ওঠে হুমায়ূন ভাইর কোলে। অমিয়র একমাত্র নেশা মোবাইল ফোন। মোবাইল দেখলে সে ধরবেই। যার যত মোবাইল হাতের কাছে পান শিশুর ভঙ্গিতে অমিয়কে তা ধরিয়ে দেন হুমায়ূন ভাই।

শিশুদের সঙ্গে মেশার সময় তিনি শিশু হয়ে যান। এত মনোযোগ দেন শিশুদের দিকে, ভাবা যায় না। আর অসম্ভব আড্ডাপ্রিয়। একা বলতে গেলে চলতেই পারেন না, দলবল লাগে। কেউ দাওয়াত করলেও একা যান না। দলবল নিয়ে যাওয়া যাবে না এমন জায়গায় যাবেনই না। ঠান্ডা খাবার খেতে পারেন না, মাকড়সায় প্রচণ্ড ভয়, হঠাৎ করে রেগে যান। রাগ থাকে অল্প কিছুক্ষণ। কিন্তু সেই অল্প কিছুক্ষণের ঠেলা সামলাতে জান বেরিয়ে যায়। যার ওপর রাগেন তার সর্বোচ্চ শাস্তি কান ধরে উঠবস। দুটো মাত্র গাল ব্যবহার করেন রাগের সময়, 'ফাজিল কোথাকার' আর 'খেতাপুড়ি'। কৃপণতা বলতে গেলে কিছু নেই। দুহাতে খরচা করেন। ভালো রান্না না হলে খেতে পারেন না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো খাদ্যরসিক। খান অল্প কিন্তু আয়োজন রাজকীয়। হঠাৎ করে চার হাজার টাকা দিয়ে একটা চিতলমাছ কিনে ফেললেন। ভাবিকে দিয়ে দিয়ে রান্না করিয়ে প্রিয় বন্ধুদের ডাকলেন। যত প্রিয় মানুষই হোক তার বাড়িতে দাওয়াত খেতে গিয়ে যদি দেখেন রান্না খারাপ হয়েছে, মুখের ওপর বলে দেবেন। ভণিতা বলে কোনো কিছু হুমায়ূন ভাইর নেই, সত্য কথা তিনি বলবেনই, কে কী ভাবল তোয়াক্কা করেন না। আপাতদৃষ্টিতে রুক্ষ, কাঠখোট্টা এবং প্রচণ্ড অহংকারী। নুহাশের আগে তাঁর একটি ছেলে হয়ে মারা যায়, শুনে আমি গেছি দেখা করতে, তখন শহীদুল্লাহ হলের হাউস টিউটর তিনি, আমাকে দেখে খুবই বিরক্ত হয়ে বললেন, চলে যাও। আমার ভালো লাগছে না। কিন্তু চোখে পানি ছিল না তাঁর। অথচ নিজের লেখা পড়ে আমি তাকে কাঁদতে দেখেছি। নাটকের স্ক্রিপ্ট পড়তে পড়তে চোখ মুছছেন, কান্নায় বুজে আসছে গলা।

AMARBOI.COM

হুমায়ূন আহমেদ কোনো কিছু লুকাতে জানেন না, আড়াল করতে জানেন না। তিনি তাস খেলেন মাটিতে ফেলে। সবাই দেখতে পায় তাঁর হাতের তাস। সম্পূর্ণ নিজের মতো একটি জীবন তিনি যাপন করেন। যা ভালো লাগে, বিশ্বাস করেন, তাই করেন। কোনো কাজ করার আগে বন্ধুদের সঙ্গে খোলামেলা আলাপ-আলোচনা করেন, প্রত্যেকের মতামত নেন, কিন্তু করেন সেটাই নিজে যেটা ভালো মনে করেন। সেন্টমার্টিন দ্বীপে বেড়াতে গিয়ে ভাবলেন এরকম দ্বীপে একটা বাংলো বাড়ি করলে কেমন হয়? জায়গা কিনে বাড়ি করে ফেললেন। তাঁর সেই বাড়ি ইতিহাস হয়ে গেল। দেশের সব মানুষ জানে। বাবা ফয়েজুর রহমান আহমেদ একাত্তরের বীর শহীদ, বাংলাদেশ সরকার তাঁর নামে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে আর হুমায়ূন আহমেদ তাঁর পিতার স্মরণে সত্তর লক্ষ টাকা ব্যয় করে নিজগ্রামে একটা স্কুল করেছেন। সেই স্কুলের ডিজাইন এবং পরিবেশ স্কটল্যান্ডের মতো। তাঁর নুহাশপল্লী এখন আপন মহিমায় বিখ্যাত। বহুলোক দেখতে যায়। ঢাকা-ময়মনসিংহ রোডে হোতাপাড়ার পশ্চিমে ঢুকে গেছে যে সড়ক সেই সড়কের নাম 'নুহাশপল্লী সড়ক'। মোটকথা হুমায়ূন আহমেদ যা করেছেন তাই ইতিহাস হয়ে গেছে! জীবনে যা চেয়েছেন তিনি পেয়েছেন তারচেয়ে বহুগুণ বেশি। একমাত্র 'বিচিত্রা'ই তাঁকে নিয়ে পাঁচ ছবার কভার স্টোরি করেছে, রোববার, পূর্ণিমা, অন্যদিন তো করেছেই, আরও কত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রিকা যে করেছে। তাঁর একক বইমেলা হয়েছে বাংলাদেশের বহু জায়গায়, নিউইয়র্কে, ফ্রাঙ্কফুর্টে। নিজের তৈরি ছবির ফ্যাস্টিভাল হয়েছে জাপানে। জাপানের বিখ্যাত টেলিভিশন এনএসকে তাঁকে নিয়ে সতেরো মিনিটের ডকুমেন্টারি করেছে, 'হু ইজ হু ইন এশিয়া'। শাহরিয়ার কবির, অভিনেতা মাহফুজ আহমেদ তাঁকে নিয়ে বই লিখেছেন। 'কোথাও কেউ নেই' নাটকে বাকের ভাইর যাতে ফাঁসি না হয় সেজন্য মিছিল বেরিয়েছে ঢাকার রাস্তায়, পোস্টারিং হয়েছে। আসাদুজ্জামান নূরের মতো জনপ্রিয় অভিনেতা চাপা পড়ে গেছেন বাকের ভাইয়ের আড়ালে। এখনো লোকে তাঁকে বাকের ভাই বলেই চেনে। নাটকটির শেষপর্ব যেদিন প্রচার হয়, হুমায়ূন ভাই বাড়ি থাকতে পারেন নি। বাকেরের যাতে ফাঁসি না হয় সেজন্য হাজার হাজার লোক এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁর বাড়ির সামনে।

যেখানে হাত দিয়েছেন হুমায়ূন ভাই, সোনা ফলেছে। ব্যর্থতা বলে কোনো জিনিস হুমায়ূন আহমেদের ধারে কাছেও ভিড়তে পারে নি কখনো। টিভি নাটক লিখতে এসে সম্পূর্ণ নতুন এবং নিজস্ব একটি ধারা তৈরি করে দিলেন তিনি। হুমায়ূন আহমেদের নাটক শুধুই হুমায়ূন আহমেদের নাটক, অন্য কারও সঙ্গে মেলে না, অন্য কেউ তাঁর মতো লিখতেও পারেন না। 'এইসব দিনরাত্রি' থেকে শুরু হলো। 'বহুব্রীহি' 'অয়োময়' 'কোথাও কেউ নেই' আরও কত তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয় নাটক। সিনেমা করলেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণী আবার হলে ফিরল। প্রথম ছবিতেই আট-দশটি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড। অসাধারণ কিছু গান লিখলেন, যেমন 'এক যে ছিল সোনার কন্যা মেঘবরণ কেশ, ভাটি অঞ্চলে ছিল সেই কন্যার দেশ'। দুর্দান্ত কয়েকটি বিজ্ঞাপন চিত্র তৈরি করলেন। যেমন হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো কুদ্দুস বয়াতীর পেছনে চল্লিশ-পঞ্চাশজন শিশু ছুটছে। প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিজ্ঞাপন। তাঁর প্রায় প্রতিটি ধারাবাহিকের জনপ্রিয় চরিত্রদের নিয়ে বিজ্ঞাপন হয়েছে। একটি নাটকে রাধারমণের গান ব্যবহার করলেন, 'আইজ পাশা খেলবো রে শ্যাম'। গানটি জনপ্রিয়তায় রেকর্ড করল। সিনেমা-নাটকে ব্যবহার করে হাছন রাজার গানকে নতুন করে জনপ্রিয় করালেন তিনি। তাঁর গল্প পড়ে রমাপদ চৌধুরী বলেন, বিশ্বের যে-কোনো ভাষার ভালো গল্পগুলোর সঙ্গে হুমায়ূন আহমেদের গল্প তুলনীয়। তিনি একমাত্র বাঙালি লেখক গত ছবছর ধরে *দেশ* পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় উপন্যাস লিখছেন। আর তাঁর বইয়ের বিক্রি ? গত অনেকগুলো বছর ধরে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে হুমায়ূন আহমেদ সবচাইতে জনপ্রিয় লেখক। তাঁর কোনো কোনো বই আশি-নব্বই হাজার কপিও বিক্রি হয়েছে। টাকার বস্তা নিয়ে প্রকাশকরা তাঁর বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একসঙ্গে পঞ্চাশ-লক্ষ টাকা অগ্রিম দেন কোনো প্রকাশক। তাঁর বই না পেয়ে হতাশায় ডায়াবেটিস হয়ে যায় প্রকাশকের। গাড়ি-ফ্ল্যাট হয়ে যায় পর পর কয়েক বছর বইমেলায় তাঁর একটি করে বই পাওয়া ভাগ্যবান প্রকাশকের। বইমেলায় যে স্টলে বসেন তিনি, ভিড় ঠেকাতে সেখানে আট-দশজন পুলিশ লাগে। আড়াইঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে তাঁর অটোগ্রাফ নিতেও ক্লান্ত হয় না পাঠক। তাঁর সঙ্গে একদিনের জন্য আড্ডা দিতে নুহাশপল্লীতে কলকাতা থেকে ছুটে আসেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বাড়িতে দেখা করতে আসেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নুহাশ পদক দিতে তিনি ডাকেন সমরেশ মজুমদারকে। কিশোর তরুণ-তরুণীরা তো আছেই, অনেক শ্রদ্ধেয় এবং বুড়ো বুড়ো লোকও তাঁর ভক্ত, পেছন পেছন ঘুরছে আর স্যার স্যার করছে। অভিনেতা-অভিনেত্রী পাঠক-প্রকাশক এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে তিনি 'স্যার'। নিজ গ্রামে তিনি পীর সাহেব। লোকে তাঁকে তেমন করে মানে। ভাবতে বিস্ময়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগে, পাঁচফিট সাত ইঞ্চি মাপের রোগা পটকা একজন মানুষ কোন মন্ত্রবলে এমন আকাশছোঁয়া হয়ে ওঠেন, মাত্র চুয়ান্ন বছর বয়সে কী করে হয়ে ওঠেন কিংবদন্তি!

তাঁকে নিয়ে ভাবতে শুরু করলে ঘোর লেগে যায়। আমি আমার ঘোর কাটাতে আবার পিছন ফিরে তাকাই। হুমায়ূন ভাইর ফেলে আসা জীবনটা দেখি।

শ্যামলীর বাসা ছেড়ে হুমায়ূন ভাই তারপর আজিমপুর চলে এলেন। নিউমার্কেটের দক্ষিণ পাশ দিয়ে সোজা পশ্চিমে বিডিআর গেট, সেই গেটের বাঁদিককার রাস্তা দিয়ে খানিক এগিয়ে হাতের ডানদিকে একটা রাস্তা ঢুকে গেছে, রাস্তার একপাশে একটা ডোবা আর কয়েকটা কবর, তার উল্টোপাশের তিনতলায় ফ্ল্যাট। ততদিনে জয়যাত্রা শুরু হয়ে গেছে তাঁর। ঈদসংখ্যাগুলোতে একটার পর একটা উপন্যাস লিখছেন, বইয়ের পর বই বেরুচ্ছে, প্রতিদিনই বিস্ময়করভাবে বাড়ছে বইয়ের বিক্রি। পাবলিশারদের আসা-যাওয়া শুরু হয়ে গেছে। হুমায়ূন ভাইও প্রায়ই যাচ্ছেন বাংলাবাজারে। নওরোজ কিতাবিস্তানে ইফতেখার রসুল জর্জের ওখানে আড্ডা হয়। প্রায় নিয়মিত আসেন হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ। কখনো কখনো বিউটি বুক হাউস, কখনো কখনো স্টুডেন্ট ওয়েজ। আমিও যাই। দুচারদিন পরপর হুমায়ূন ভাইর সঙ্গে দেখা হয়। কোনো কোনো দিন দুপুরবেলা আমাকে তিনি সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যান। দুপুরে তাঁর ওখানে খেয়ে বিকেলবেলা ইউনিভার্সিটি ক্লাবে আড্ডা দিতে যাই। এ সময় টেলিভিশনে শুরু হলো তাঁর দেশমাতানো ধারাবাহিক 'এইসব দিনরাত্রি'। নাটকটির পরিচালক প্রোডিউসার মুস্তাফিজুর রহমান। মুস্তাফিজ ভাই তখন আজিমপুর স্টাফ কোয়ার্টারে থাকেন। আমাকে নিয়ে হুমায়ূন ভাই প্রায়ই তাঁর ওখানে যান, স্ক্রিপ্ট নিয়ে কথা হয়। কোনো কোনো দিন টিভি ভবনে রেকর্ডিংয়েও যাই আমি। সেই সময় নিজেদের গ্রামে বাবার নামে একটা পাঠাগার করলেন হুমায়ূন ভাই। নির্মলেন্দু গুণ, হুমায়ুন আজাদ এবং আমাকে নিয়ে গেলেন উদ্বোধন করাতে। ফেরার দিন রাতে ময়মনসিংহ শহরে নির্মলেন্দু গুণের বাসায় থাকলাম। উহ্, সারারাত নির্মলেন্দু গুণ আর হুমায়ুন আজাদ ঝগড়া করলেন। ঝগড়ার শ্রোতা আমি আর হুমায়ূন আহমেদ।

মনে আছে হুমায়ূন ভাইর আজিমপুরের বাসায়ই মুহম্মদ জাফর ইকবালের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তখন তিনি আমেরিকায় থাকেন। ছুটিতে দেশে এসেছেন। আমি মুহম্মদ জাফর ইকবালেরও ভক্ত পাঠক। যতদূর জানি তখনো পর্যন্ত তাঁর দুটো মাত্র বই বেরিয়েছে। মুক্তধারা থেকে 'কপোট্রনিক সুখ দুঃখ' এবং শিশু একাডেমী থেকে 'দিপু নাম্বার টু'। 'কপোট্রনিক সুখ দুঃখ' গল্পটি *বিচিত্রায়* ছাপা হয়েছিল। এবং আজকের অনেক পাঠকই জানেন না হুমায়ূন ভাইর 'নন্দিত নরকে'র প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন দুজন শিল্পী, মুহম্মদ জাফর ইকবাল এবং শামা সিকদার।

হুমায়ূন আহমেদরা তিনভাই-ই বিখ্যাত, তিনভাই-ই লেখক। জনপ্রিয়তায় হুমায়ূন ভাইর পরই জাফর ভাই। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে মুহম্মদ জাফর ইকবালের মতো প্রিয় লেখক আর কেউ নেই। শিক্ষক হিসেবে দারুণ জনপ্রিয় তিনি, স্কুল-কলেজের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আদর্শ, অসম্ভব সাহসী এবং সৎমানুষ। যে কজন মানুষের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে আমাদের সময় মুহম্মদ জাফর ইকবাল তাঁদের একজন।

আর আহসান হাবীব 'উন্মাদ' পত্রিকার সম্পাদক, দুর্দান্ত কার্টুন আঁকে, রম্য লেখায় তার তুলনা সে নিজেই। তার জোকসের বইয়ের যে বিক্রি বইমেলায় আমি দেখেছি, বিস্ময়কর!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই পরিবারের আরেকজন মানুষের আমি খুব ভক্ত, হুমায়ূন ভাইর মা। সারাদিন বই পড়েন, সাহিত্য নিয়ে ভাবেন। 'নূরজাহান' ফার্স্ট পার্ট পড়ে আমাকে বললেন, সেকেন্ড পার্ট বেরুলে আমাকে দিয়ো। সেকেন্ড পার্টটা বেরুতে সাত বছর লাগল। এই সাত বছরে যতবার দেখা হয়েছে ততবারই তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, বেরোয় নি ?

বই বেরুবার পর প্রথম কপিটি আমি তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এসেছি।

আজিমপুরের সেই বাসা ছেড়ে হুমায়ূন ভাই তারপর এসে উঠলেন শহীদুল্লাহ হলের হাউস টিউটরের কোয়ার্টারে। ততদিনে 'অনিন্দ্য পাবলিশার্স' নামে একটি প্রকাশন সংস্থা বেশ জাঁকজমক করে এসেছে প্রকাশনায়। হুমায়ূন ভাইয়ের *অমানুষ*, আমার *কালাকাল* এইসব বই নিয়ে শুরু করল। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই অনিন্দ্যর স্বত্বাধিকারী নাজমুল হক একদিন একটা মিষ্টির প্যাকেট আর একটা নতুন সাদা ডায়হাটসো গাড়ি নিয়ে হুমায়ূন ভাইর বাড়িতে এসে হাজির। গাড়িটা আপনার জন্য। রয়্যালটি থেকে এডজাস্ট হবে।

ঘটনাটি অবিশ্বাস্য। বাংলাদেশের কোনো লেখকের ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা আগে বা পরে আজ পর্যন্ত আর ঘটে নি।

সেই সময়ে *দৈনিক বাংলা*-র সাহিত্য পাতায় 'মৌনব্রত' নামে একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখেছিলেন হুমায়ূন ভাই। ধারাবাহিকভাবে লেখা তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাসই শেষ পর্যন্ত শেষ হয় না। 'মৌনব্রত'ও শেষ হলো না। পরে এই লেখাটি নাম বদলে বই করলেন তিনি। *জনম জনম*। উপন্যাসটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা স্বীকার করবেন *জনম জনম* এক অসাধারণ উপন্যাস।

AMARBOI.COM

আমি হুমায়ূন আহমেদের প্রায় সব উপন্যাসই পড়েছি। বহু ভালো ভালো উপন্যাস লিখেছেন তিনি। কতগুলোর নাম বলব! *নন্দিত নরকে*, *শঙ্খনীল কারাগার* এই দুটো উপন্যাস তো ইতিহাস! তারপর *নির্বাসন*, *সূর্যের দিন*, *অন্ধকারের গান*, *চাঁদের আলোয় কয়েকজন যুবক*, *গৌরিপুর জংশন*, *শ্রাবণ মেঘের দিন*, *কবি*, *উনিশ শো একাত্তর*, *ফেরা*, *জীবনকৃষ্ণ মেমোরিয়াল হাই স্কুল*, *আগুনের পরশমণি*, *কোথাও কেউ নেই*, *রুমালি*, *শুভ্র*, *অপেক্ষা*, *আজ চিত্রার বিয়ে*, *সে আসে ধীরে*, আরও কত উপন্যাস। তাঁর লেখার একনিষ্ঠ পাঠক এবং ভক্ত ছিলেন বাংলাদেশের খুব বড় একজন শিক্ষিত মানুষ, অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক। বেশ কয়েকবার হুমায়ূন ভাই আমাকে রাজ্জাক স্যারের ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টারে নিয়ে গেছেন, মনে আছে রাজ্জাক স্যার নিজহাতে পাঙাশ মাছের ডিম রান্না করে আমাদের দুজনকে একদিন খাইয়েছিলেন। তাঁর মুখে কী যে প্রশংসা শুনেছি হুমায়ূন ভাইয়ের এক একটি লেখার।

একবার বইমেলায় আবু হেনা মুস্তাফা কামাল বললেন, হুমায়ূন মধ্যবিত্তের নাড়ি স্পর্শ করেছে। তাঁর 'চোখ' গল্পটি পড়ে *সংবাদে* দুর্দান্ত একটি লেখা লিখলেন সৈয়দ শামসুল হক। 'চাঁদের আলোয় কয়েকজন যুবক' উপন্যাসটি পড়ে আহমদ ছফা আমাকে বলেছিলেন অসাধারণ লেখা। মাত্র কয়েকটি আঁচড়ে বাংলাদেশের চেহারা ফুটিয়ে তুলেছে হুমায়ূন। ফরহাদ মযহার বলেছিলেন, হুমায়ূনের গল্পগুলোর কোনো তুলনা হয় না। নির্মলেন্দু গুণ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তাঁর 'জলিল সাহেবের পিটিসন' গল্পটি পড়ে। কলকাতার 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকায় হুমায়ূন ভাইর '১৯৭১' গল্পটি ছাপা হলো। আমার সামনে সেই গল্পের এমন প্রশংসা করলেন আল মাহমুদ, হুমায়ূন ভাই লজ্জা পেয়ে গেলেন।

এ রকম কত ঘটনার কথা লিখব!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একই হাতে কত রকমের লেখা যে লিখেছেন হুমায়ূন ভাই। বাংলাভাষায় সায়েন্স ফিকশনের জনক তিনি। প্রথম সার্থক সায়েন্স ফিকশন লিখেছেন, সায়েন্স ফিকশনকে জনপ্রিয় করেছেন। এখন তাঁর অনুজ মুহম্মদ জাফর ইকবালের সায়েন্স ফিকশনও ভীষণ জনপ্রিয়। ভূতের গল্পে হুমায়ূন আহমেদের কোনো জুড়ি নেই। তাঁর মতো এত ভালো ভূতের গল্প বাংলাভাষায় আর কোনো লেখক লেখেন নি। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে 'ছায়াসঙ্গী' গল্পটির কথা। রহস্য, ফ্যান্টাসি, থ্রিলার আর অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয়ের লেখা। 'দেবী' 'নিশিথিনী' লিখে আরেকটা জগৎ তৈরি করলেন। 'অন্যভুবন' লিখে আরেকটি জগৎ তৈরি করলেন। 'আয়নাঘর', 'পোকা' 'ভয়', কত লেখার কথা বলব! আর তাঁর সেই অবিস্মরণীয় চরিত্র 'মিসির আলী', তুমুল জনপ্রিয় চরিত্র 'হিমু'! সিলেটে একটি মেয়ে 'হিমু'র সঙ্গেও আমার একবার দেখা হয়েছিল। সব মিলিয়ে হুমায়ূন আহমেদ একটি নেশার নাম, হুমায়ূন আহমেদ একটি প্রতিষ্ঠান। শিশু-কিশোরদের লেখা, রূপকথা কোথায় তাঁর হাতের পরশ পড়ে নি ? আর যেখানে পড়েছে সেখানেই সোনা ফলেছে। বাংলাভাষায় তাঁর প্রিয় লেখক রবীন্দ্রনাথ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ বলে যেতে পারেন। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক, সীতনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস গল্প তাঁর প্রিয়, জন স্টাইনবেক, স্টিফান কিং তাঁর প্রিয়। সারাক্ষণ লেখা নিয়ে ভাবছেন। লেখার ব্যাপারে অসম্ভব খুঁতখুঁতে। মনমতো না হলে সেই লেখা কিছুতেই লিখবেন না। মাথা ভর্তি নতুন নতুন আইডিয়া। সবার মধ্যে থেকেও, তুমুল আড্ডার মধ্যে থেকেও কোন ফাঁকে যেন একা হয়ে যান, লেখার জগতে চলে যান। যখন তখন লিখতে পারেন। যেখানে মেঝেতে বসে, লেখার জন্য চেয়ার টেবিল দরকার হয় না। লেখার মতোই অসম্ভব আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে গল্প বলতে পারেন, বাস্তবের সঙ্গে কোথায় যে মিশেল দেবেন কল্পনা তিনি নিজে ছাড়া কেউ তা বুঝতে পারবে না। কখনো তিনি নিজেই মিসির আলি, কখনো হিমু। সব মিলিয়ে এক বিস্ময়কর মানুষ। কাউকে মা-বাবা ডাকতে পারেন না। নিজের শ্বশুর-শাশুড়িকেও কখনো মা কিংবা বাবা বলে ডাকেন নি। কাউকে দুঃখ দিতে চাইলে বেশ ভালোভাবেই তা দিতে পারেন। নিজের নাটকে একবার এক বিশাল নাট্য ব্যক্তিত্বের অভিনয় দেখে এত বিরক্ত হলেন, বললেন, এটা কি অভিনয় ? আরে আপনি তো অভিনয়ই জানেন না। একবার তাঁর নুহাশপল্লীতে নাটকের রেকর্ডিংয়ে এসে সন্ধের পর কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রী অন্য একটি ঘরে বসে হুমায়ূন আহমেদের তুমুল নিন্দামন্দ করছে। তিনি তো আর তা জানেন না, খুবই উৎফুল্ল ভঙ্গিতে সেই ঘরের দিকে যাচ্ছেন, ঘরের কাছে গিয়েই শোনেন এই অবস্থা। বাইরে দাঁড়িয়ে খানিক ওসব শুনে মন খারাপ করে ফিরে এলেন, সেইসব অভিনেতা-অভিনেত্রীকে বুঝতে দিলেন না কিছু। আবার পেটে কথাও রাখতে পারেন না। যদি বন্ধুরা কেউ কোনো গোপন কথা বলে বলল, কাউকে বলবেন না, সেটাই সবার আগে বলে ফেলবেন। পাগলের সাঁকো নাড়াবার মতো।

পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন হুমায়ূন আহমেদকে দীর্ঘজীবী করেন। তাঁর হাতের ছোঁয়ায় যেন আরও সমৃদ্ধ হয় বাংলা সাহিত্য।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন-সান্নিধ্যে মুহসিন হলের দিনগুলি

এইচ এম মনিরুজ্জামান

আমি পড়ি এমএ ফাইনাল ইয়ারে—ইতিহাসে। হুমায়ূন আহমেদ সেকেন্ড ইয়ার অনার্সের ছাত্র—রসায়নে। আমরা দু'জনে থাকি মুহসিন হলে। আমি ছ'তলায়, আর ঠিক আমার নিচে হুমায়ূন আহমেদ। সেই সময় ঢাকা শহরের দর্শনীয় স্থাপনাগুলোর অন্যতম ছিল কার্জন হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল। এসএম হলকে মনে করা হতো এশিয়ার বৃহত্তম ছাত্র হোস্টেল। ১৯৬৭ সালে এই এসএম হলের গৌরবকে ম্লান করে দিয়ে নির্মিত হয় সুউচ্চ, সুবৃহৎ ও অত্যাধুনিক দুটি ভবন—মুহসিন হল ও জিন্না হল (পরে সূর্যসেন হল)। প্রতিটি হলের ছাত্র ধারণক্ষমতা ছয় শ' করে। ঝকঝকে তকতকে নতুন ভবনের উত্তর ব্লকে থাকতাম আমরা সিঙ্গেল সিটেড কামরায়। আমি সিঙ্গেল সিটেড কামরা পেয়েছিলাম মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র হিসেবে। মাস্টার্সের ছাত্র ছিলাম বোধহয় আমরা জনাতিনেক। আর বাকি সবাই অনার্স ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। তারা সিঙ্গেল সিটেড কামরা পেয়েছিল মেধাবী ছাত্র হিসেবে। এদের বেশিরভাগ এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষায় প্লেস পাওয়া। তখন প্রায় সবাইকে চিনলেও এখন আর তাদের নাম মনে করতে পারছি না। আমার পাশে কোনো এক কামরায় থাকত রফিক, পড়ত ইতিহাসে। হুমায়ূনের পাশের কামরায় থাকত অর্থনীতির ছাত্র মাসুম। পরে এই মাসুম আমাদের সঙ্গে 'দখিন হাওয়া'র বাসিন্দা ছিলেন। শিক্ষকতা করতেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। হুমায়ূনের ফ্লোরেই একজনকে ডাকা হতো 'করাচিওয়ালা' বলে।

হুমায়ূনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের একটা গল্প আছে তার *মাতাল হাওয়া* উপন্যাসে। এ বিষয়ে আমার কিছু মনে নেই। আমি বরং হুমায়ূন আহমেদকে যেভাবে দেখতাম চিনতাম সে বিষয়ে বলি। খুব হালকা পাতলা গড়ন, ছোটখাটো একজন মানুষ। স্বভাবে বেশিরকম লাজুক ও বিনয়ী। কিন্তু কথাবার্তায় ভারি চটপটে। চোখ দুটি খুবই উজ্জ্বল, শাণিত বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। তার মেলামেশা ছিল নির্বাচিত ও সীমিত। মাসুমের সঙ্গে তার বেশ ভাব ছিল। হুমায়ূনের বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল আনিস সাবেত। ফিজিক্সে সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। আনিসও খুব মেধাবী ছাত্র ছিল। থাকত সাউথ ব্লকে। তার এক বড়ভাইও থাকত সাউথ ব্লকে। ফিজিক্সে মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারে পড়ত। নাম আসিফ সাবেত। আসিফ সাবেতের সঙ্গে আমার সাধারণ আলাপ-পরিচয় ছিল। হুমায়ূনের জীবনে শ্রেষ্ঠ বন্ধু আনিস সাবেতও মারা যায় ক্যান্সারে, সুদূর আমেরিকাতেই। দশ-বারো বছর আগে। হুমায়ূনকে জীবনে অনেক বড় বড় আঘাত সইতে হয়েছে, কিন্তু আনিস সাবেতের মৃত্যু তাকে খুব বেশি বিচলিত করেছিল।

হুমায়ূনকে বাবার বদলির চাকরির কারণে একাধিক স্কুলে পড়তে হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার শুরু সিলেট শহরে। এসএসসি পাশ করেছে বগুড়া জিলা স্কুল থেকে। মাঝখানে চট্টগ্রামের একটি স্কুলেও পড়েছে। এইচএসসি পড়েছে ঢাকা কলেজে। থাকত কলেজ হোস্টেলে। হুমায়ূন ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলেজের কিছু গল্প মাঝে মাঝে করত। সেসব গল্পে বেশির ভাগই থাকত তার অপছন্দের কথা, ভালো না লাগার কথা। ঢাকা কলেজে তেমন কোনো বন্ধু বোধহয় তার ছিল না। পরিচিতের সংখ্যা বিস্তৃত হলেও বন্ধুর সংখ্যা বরাবরই তার খুব সীমিত ছিল। তার ছাত্রজীবনে তো বটেই, শিক্ষকতা এবং লেখালেখি জীবনের দীর্ঘকাল পর্যন্ত নীরবে এবং নিরিবিলিতে থাকতেই পছন্দ করত। হাউস টিউটর হিসেবে শহীদুল্লাহ হলে থাকার সময় থেকে তার জীবনের এই ধারাটিতে কিছু পরিবর্তন আসতে শুরু করে। হুমায়ূন নিজে থেকে কারও সঙ্গে মিশত না বা মিশতে পারত না। কিন্তু কেউ তার কাছে এগিয়ে এলে সে কাউকে ফিরিয়ে দিত না। একবারে নয়, সম্পর্কে গড়ে উঠতে পারত খুব ধীরে ধীরে। এ ব্যাপারে তার পছন্দ-অপছন্দ ছিল খুব তীব্র। ঢাকা কলেজে আইএসসি পরীক্ষা দেওয়ার সময়ের একটি ঘটনা একাধিকবার তার কাছে আমি শুনেছি। লিখিত পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছে। বিপত্তি হয় ফিজিক্স প্রাক্টিক্যাল পরীক্ষার সময়। ঢাকা কলেজের ফিজিক্সের বিভাগীয় শিক্ষকদের নাম তখন হয়তো বলেছিল, এখন আমার আর মনে নেই। তবে এক্সটারনাল পরীক্ষক হিসেবে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্সের তখনকার ডাকসাইটে শিক্ষক প্রফেসর মতিন চৌধুরী। হুমায়ূন একটি এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে খুব দামি একটি যন্ত্রের বড়রকমের ক্ষতি করে ফেলে। যন্ত্রের একটি পার্টস ভেঙে যায়। বিভাগীয় শিক্ষক হুমায়ূনের ওপর দারুণভাবে রাগান্বিত হয় ও বিশ্রীভাবে বকাঝকা করতে থাকে। "তোমার দ্বারা কিছু হবে না। তুমি এত বড় ক্ষতি করে ফেললে, তোমার আর পরীক্ষা দেওয়া হবে না, তোমার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে", এসব কঠিন কথা বলে হুমায়ূনকে হল থেকে বের করে দেওয়া হয়। হুমায়ূন স্যারদের অনেক অনুরোধ ও কাকুতি মিনতি করে, কিন্তু কোনো কাজ হয় না। চরম হতাশায় হুমায়ূন বারান্দার এক কিনারায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে। ওই সময় মতিন চৌধুরী বারান্দায় বেরিয়ে এলে ক্রন্দনরত হুমায়ূনকে তার নজরে পড়ে। মতিন চৌধুরীর ছিল খুব জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর। কিন্তু তিনি হুমায়ূনের কাছে এসে সস্নেহে তার কাঁধে হাত রেখে খুব মোলায়েম কণ্ঠে কেন কাঁদছে জিজ্ঞেস করেন। হুমায়ূন সংক্ষেপে পুরো ঘটনাটি বলে। সব শুনে তিনি ক্ষেপে যান। হুমায়ূনকে হাত ধরে আবার পরীক্ষার ল্যাবে নিয়ে যান এবং শিক্ষকদের তিরস্কার করেন। "বাচ্চা একটি ছেলে কাঁদছে, কেন কাঁদবে সে, কাজ করতে গিয়ে একটি জিনিস ভেঙে গেছে, তা তো ভেঙে যেতেই পারে। ভেঙে গেলে আবার কিনে আনবে, একশবার কিনে আনবে, ডাকো তোমাদের প্রিন্সিপ্যালকে" এই ধরনের কথা বলে মতিন চৌধুরী বেশ হৈচৈ লাগিয়ে দেন। বিভাগের শিক্ষকেরা মতিন চৌধুরীর ছাত্র হওয়াই স্বাভাবিক। তারা মতিন চৌধুরীর সামনে সব কাঁচুমাচু হয়ে গেল। বারবার ক্ষমা চাইতে লাগল। হুমায়ূনকে নতুন আরেকটি এক্সপেরিমেন্টে দেওয়া হলো। হুমায়ূন খুশি তো বটেই, মনেও আবার সাহস ফিরে এলো। হুমায়ূন মতিন চৌধুরীকে তখন চিনত না বা তার সম্পর্কে কিছুই জানত না। জানলো অনেক কিছুই, জানলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরে।

হুমায়ূন বিজ্ঞানের ছাত্র। অলৌকিকতা, ভূতপ্রেত, ব্ল্যাক আর্ট এসবে তার বিশ্বাস ছিল কি না তা বুঝা যায় না, কিন্তু এসব নিয়ে তার আগ্রহ ছিল অনেক। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি লিখেছে, সৃষ্টি করেছে মিসির আলি ও হিমুর মতো অসাধারণ দুটি চরিত্র। মনে হয় মিসির আলি, হিমু তার সত্তারই অংশ। অলৌকিকতা, ভূত, জ্বিন, এসব নিয়ে গল্প বলা এবং গল্প শোনায় সর্বাদাই তার আগ্রহ লক্ষ করেছি। পঁয়তাল্লিশ বছর আগের কথা, স্পষ্ট সব মনে নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহসিন হলে থাকার সময়ের হুমায়ূন বর্ণিত অলৌকিক কাহিনি। কেউ তাকে বলেছে অথবা কোথাও সে পড়েছে—মানুষের বেশে মানুষের মাঝে অনেক সময় জ্বিন চলাফেরা করে। তাদের সালাম দিলে সালামের উত্তর তারা দিবে এবং উত্তরের ধরন থেকে তাদের চেনা যাবে। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর নিয়ম করে সে একা একা হাঁটতে বের হয়। রাস্তায় তরুণ-বৃদ্ধ যাকেই পায়, তাকেই বলে, 'আসসালামু আলাইকুম'। অনেকেই খুব স্বাভাবিকভাবেই সালাম নেয়, আবার অনেকে একটু কৌতূহল নিয়ে তাকায়। অনেক সময় ভিখারিরা এরকম সালাম দিয়ে প্রত্যাশার হাত বাড়িয়ে দেয় বা করুণভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। যাই হোক, দিনের পর দিন হুমায়ূন এই কাজ করে যাচ্ছে এবং প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাও প্রায় একই রকমের। সেদিনও হুমায়ূন শিক্ষক ক্লাবের পাশের ফুটপাত ধরে পশ্চিম দিকে হেঁটে যাচ্ছিল। সালাম দেওয়ার ব্যাপারটা তখন তার রীতিমতো অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। ওই পথের ধারে অনেক বড় বড় গাছ আছে। গাছের ছায়ার আলো-আঁধারিতে দীর্ঘদেহী ঘন লম্বা চুল দাড়িসহ একজনকে দেখে হুমায়ূন বলল, 'আসসালামু আলাইকুম'। সঙ্গে সঙ্গে 'ওয়া আলাইকামুস সালাম' জবাব দিয়েই সে বলে উঠল, 'শোন, যা খুঁজছিস, তা পাইছিস ? এবার যা'। লোকটি তার মতোই হেঁটে হেঁটে সামনে চলতে থাকে। হুমায়ূন খুব ভড়কে যায় এবং খুব ভয় নিয়েই হলে ফিরে আসে। হুমায়ূনের মুখ থেকে এ ধরনের আরও কাহিনি শুনেছি।

হুমায়ূনের খুব ঘনঘন চা খাওয়ার অভ্যাস সেই হল জীবনেও ছিল। আমিও চা খেতাম অভ্যাস বশে নয়, আড্ডার ছলে। কোনো কোনো সময় বেশ অধিক রাতে বন্ধুদের সঙ্গে দল বেধে নীলক্ষেতে রেললাইনের পশ্চিম পাশে চা খেতে আসতাম। তখন ওইসব চায়ের দোকানে হুমায়ূনের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। সেও এসেছে তার কোনো দলের সঙ্গে। চায়ের কথায় মনে পড়ল—আমার রুমেও চায়ের আয়োজন ছিল। আমার এক আত্মীয় কাম বন্ধু থাকত মুহসিন হলে। থাকত মানে হলে তার সিট ছিল। হলের খাবার তার সইত না বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তার কোনো আত্মীয় বাড়ি চলে যায়। যাওয়ার সময় কাপ, পিরিচ, কেতলি ও একটি হিটার আমাকে দিয়ে যায়। হলে হিটার ব্যবহার নিষেধ ছিল। কিন্তু সে নিষেধ মানার জন্য থোড়াই তার ভাবনা ছিল। আমার রুমে সবসময়ই কিছু আড্ডা হতো, অন্যান্য হল থেকে বন্ধুরা আসত। তখন অনেক চা চলত। হুমায়ূন এমনিতে চা খাওয়ার জন্য খুব বেশি আসত না, কিন্তু ডেকে নিয়ে এলে আসত। আমি চা তৈরি করে খাওয়াতাম।

এ প্রসঙ্গে অন্য একটি গল্প বলেই ফেলি। নির্মলেন্দু গুণ এবং আমি একই সময়ে আনন্দমোহন কলেজে পড়তাম। নিঃসন্দেহে গুণ একজন ভালো ছাত্র ছিল। কিন্তু একাধিকবার পরীক্ষা দিয়েও তার বিএসসি পাস হলো না। আমি যখন এমএ ফাইনাল ইয়ারে পড়ি, গুণ তখন বাংলায় অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে এসে ভর্তি হয়। ফের পড়াশোনা সে শুরু করে। সঙ্গী তখন তার কবি আবুল হাসান। গুণের নির্দিষ্ট কোনো থাকার জায়গা ছিল না। বেশির ভাগ সময়ই থাকত আমাদের আরেক বন্ধু তরিক সালাউদ্দিনের সঙ্গে জিন্নাহ হলে। তরিক সেদিন ময়মনসিংহ চলে গেছে। তরিকের রুম থেকে আমি হতাশ হয়ে ফিরে আসছি—পথে গুণের সঙ্গে দেখা। তরিক নাই, সুতরাং তার থাকার জায়গা দরকার। চলে এল আমার সঙ্গে। রাতে থাকল। পরের দিন সকালে বিছানা ছেড়ে উঠবে না। আমি ক্যান্টিনে নাস্তা খেয়ে ওর জন্য নাস্তা রুমে পাঠিয়ে ক্লাসে চলে গেলাম। আমি ফিরে এসে দেখি, সে নির্ধারিত জায়গায় চাবি রেখে দরজায় তালা দিয়ে চলে গেছে। ঘরের অবস্থা শোচনীয়। সে চা তৈরি করে খেয়েছে। কিন্তু রুমে কেতলি পায় নি। অন্য রুমের কেউ নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে। তাই গুণ চা বানিয়েছে বদনায়। বদনায় পানি গরম করে ওর ভেতর চা পাতা ঢেলে চা বানিয়ে খেয়েছে। আমি সেটি বুঝতে পারি বদনা নিয়ে বাথরুমে যাওয়ার পর। আমি হাসব না কাঁদব! তবে একটা ভালো হয়েছিল, হলের বদনা তো কেউ ঘষে মেজে পরিষ্কার করে না। ভেতরে ময়লা জমে জমে স্তর পড়ে যায়। বদনায় পানি গরম করার পর এর ভেতর একদম পরিষ্কার। গুণ সেদিন চা-তে কিসের স্বাদ পেয়েছিল কে জানে!

নিরিবিলি টাইপের মানুষ হুমায়ূন রাজনীতির ধার ধারত না। আড্ডার দিকেও ঝোঁক ছিল না। তবে টিভি রুমে গিয়ে নিয়মিত বসত। আর যেত শরীফের ক্যান্টিনে। এহেন হুমায়ূন আহমেদের হলে তেমন পরিচিতি থাকার কথা নয়। কিন্তু ব্যাপার মোটেও ওইরকম ছিল না। অল্পকালের মধ্যেই হুমায়ূন ব্যাপকভাবে পরিচিত ও আলোচিত হয়ে উঠেছিল তার বিচিত্র সব কাণ্ডকারখানার জন্য। তাকে ঘিরে নিত্য গল্প তৈরি হতো। তার কক্ষে একটি নরকঙ্কাল ছিল। সে জাদু, হাত দেখা ইত্যাদির চর্চা করত। অনেকে মানত সে ভূতপ্রেতের সঙ্গে কথা কয়। তাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে বলত, 'আরে না না, ওসব কিছু না', কিন্তু এমন এক ভাবসাব নিয়ে বলত তাতে বরং মানুষের সন্দেহকে আরও উসকে দেওয়া হতো। এতে তার উদ্দেশ্য সাধিত হতো। তাকে ঘিরে যে এক ধরনের রহস্যময়তার আবহ তৈরি হয়েছিল তা সে বেশ উপভোগ করত।

ওই সময় মুহসিন হলে কয়েকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছিল। একটি ঘটনার হোতা হুমায়ূন নিজেই। এক রাতে, বোধহয় একটু বেশি রাতেই, নর্থ ব্লক জুড়ে প্রচণ্ড হইচই। বারান্দার সামনে দৌড়াদৌড়ি। নিচে নেমে দেখি সব জটলা হুমায়ূনের কক্ষের সামনে। বিষয় কী? বিষয় জটিল এবং অবিশ্বাস্য। এক ছাত্র, সম্ভবত কমার্সের, মাঝে মধ্যে হুমায়ূনকে বিরক্ত করত। হুমায়ূন তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য জাদু করে চেয়ারের সঙ্গে আটকে দিয়েছে। সে আর নড়াচড়া করতে পারছে না। কথাও বলতে পারছে না। চেয়ারে বসে আছে জড় পদার্থের মতো। এ দৃশ্য দেখে সবাই হতভম্ব। খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে হাউস টিউটর এলেন। তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত ছেলেটিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো, ইনজেকশন দিয়ে তাকে স্বাভাবিক করা হলো। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, ছেলেটির পীড়াপীড়িতে হুমায়ূন তাকে হিপনোটাইজ করেছিল। হিপনোটিজমে এটাই ছিল তার প্রথম এক্সপেরিমেন্ট। কিন্তু এর উদ্ধার তখনো তার জানা ছিল না।

AMARBOI.COM

এবার মুহসিন হলের আরেকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার কথা বলি। প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটি চাঞ্চল্যকর নয়, ছিল খুবই বেদনার। আবু সুফিয়ান নামে পরিসংখ্যান বিভাগের এক ছাত্র থাকত আমাদের ব্লকে, কোন ফ্লোরে মনে নেই। আমাদের সিঙ্গেল সিটেড কক্ষে পড়ার আলাদা কোনো টেবিল ছিল না। দেয়ালের ভেতর একটি স্ল্যাব ঢুকানো ছিল। ওটাই টেবিল। টেবিলের ওপরদিকটায় একটা বক্স বা খুপড়ি ছিল কাপড়-চোপড় লেপ তোষক ইত্যাদি রাখার জন্য। খুপড়িতে পাল্লা লাগানো ছিল। সুফিয়ান দরিদ্র পরিবারের ছেলে, চলত টিউশনি করে। টিউশনি করতে গিয়েই সে একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে এবং মেয়েটিকে সে বিয়ে করে। মেয়েটিও ছিল খুব দরিদ্র ঘরের। থাকার ভিন্ন কোনো উপায় না করতে পেরে সুফিয়ান মেয়েটিকে তার কক্ষে নিয়ে আসে এবং একত্রে বসবাস করতে থাকে। সুফিয়ান বের হয়ে যাওয়ার সময় বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে যেত। কেউ ওঘরে ঢুকতে গেলে দরজায় টোকা পড়ামাত্র মেয়েটি লুকিয়ে যেত ওপরের খুপড়িতে। এটি একেবারে অসম্ভব একটি ব্যাপার। খুপড়িটি ছিল অনেক ওপরে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেবারে সিলিং ঘেঁষে। খুপড়িটি এত ছোট ছিল যে এর আয়তন তিন-চার ঘনফিটের বেশি হবে না। কী করে মেয়েটি এত দ্রুততার সঙ্গে ওপরে উঠে যেত, কী করে তার শরীরটাকে ওই ছোট জায়গাটুকুর মধ্যে আটাত, পাল্লা বন্ধ করার পর ওই খুপড়িতে তার শ্বাস-প্রশ্বাসইবা চলত কীভাবে! কোনো অ্যাটাচড বাথরুম ছিল না। কমন বাথরুম ছিল খুব দূরে। তিন মাসের মতো মেয়েটি এই দুর্বিষহ জীবন কাটিয়েছে। রান্নাবান্না করত ঘরের মাঝেই হিটারে। আর এতেই ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ধরা পড়ে গেল। ছাত্রদেরই কারও নজরে পড়ল—ঘরে খুটখাট আওয়াজ, কড়াইতে তেল মসলা দেওয়ার ছ্যাতছ্যাত শব্দ ও গন্ধ। ছাত্রদের কৌতূহল বেড়ে গেল। হুমায়ূনের কারণে অনেকে এমনিতেই ভূতের আতঙ্কে থাকে। তারা ভাবল এটি একটি ভুতুরে কাণ্ড। একরাতে দলবেধে সবাই হাউস টিউটরের কাছে গেল, হাউস টিউটরের সামনে উৎসাহী ছাত্র ও কর্মচারীরা ছোট ঘরটা তন্নতন্ন করে খুঁজল। কিছুই পাওয়া গেল না। নিরাশ হয়ে সবাই চলে আসবে এমন সময় কেউ একজন বলল, ওপরের খুপড়িটা দেখা দরকার। কারও ধারণাতেই আসে নি এত ছোট একটি খুপড়িতে কোনো মানুষের পক্ষে লুকিয়ে থাকা সম্ভব। খুব অনিচ্ছার সঙ্গে সেই খুপড়ি খোলা হলো। কিন্তু একি! তাজ্জব ব্যাপার। বিস্ময়ে সবাই হতবাক। সেই একটুখানি খুপড়ির ভেতরে দলা পাকিয়ে পড়ে আছে একটি মেয়ে। মেয়েটিকে নামিয়ে আনা হলো। ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার মুখ, থরথর করে কাঁপছে তার সারা শরীর। যথেষ্ট রূপবতী একটি মেয়ে। সুফিয়ানের বিয়ে করা স্ত্রী। বিজয়ের আনন্দে কেউ কেউ খুব উল্লসিত, চরম বিষাদে কারও কারও চোখে পানি। মেয়েটির অসহায় কাতর চাহনি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবু সুফিয়ানের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছিল—দু'বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার।

কাছাকাছি সময়ই পাশের জিন্নাহ হলে একই রকমের একটি ঘটনা ঘটেছিল। সেক্ষেত্রে ছেলেটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বড় ছাত্রনেতা, খুবই বিত্তবান আর প্রতাপশালী পরিবার থেকে আগত। সে তার কক্ষে দিনের পর দিন মাসের পর মাস তার বান্ধবীকে নিয়ে কাটাত। গোপনে নয়, সদর্পে প্রকাশ্যে। বান্ধবীটিও ছিল খুবই বিখ্যাত এবং অনেক ক্ষমতাবান পরিবারের মেয়ে (তিনি আজ জাতীয়ভাবে খুব উঁচুতে প্রতিষ্ঠিত)। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো আইন তাদের ছুঁতে পারে নি। প্রভোস্ট হাউস টিউটররা রাউন্ডে এসে হয়তো বিগলিত হেসে জিজ্ঞেস করতেন, 'কেমন আছ তোমরা, ভালো তো?'

হুমায়ূন আহমেদ তাঁর 'মাতাল হাওয়া'য় তখনকার ছাত্র রাজনীতির স্বরূপ তুলে ধরতে চেয়েছেন। এনএসএফ, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া), ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) এবং ইসলামী ছাত্র সংঘ সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ সঠিক বলেই মানা যায়। আমি নিজে কোনো অ্যাক্টিভিস্ট ছিলাম না। এমএ পড়ার সময় মেনন গ্রুপের রাজনীতির সঙ্গে শিথিল যোগাযোগ ছিল মাত্র। আমার বড়ভাই আসাদ মেনন গ্রুপের একজন প্রধান নেতা ছিলেন। মেনন গ্রুপের রাজনীতিতে তখন কিছু নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল। পুরান ঢাকার প্রভাবশালী ও ডানপিটে অনেক ছেলে মেনন গ্রুপের শক্তি বৃদ্ধি করে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল কলতাবাজার গ্রুপ। এছাড়াও এলিফেন্ট রোড, কলাবাগান, ধানমণ্ডি এসব অভিজাত এলাকার বিত্তবান ও ক্ষমতাবান পরিবারের কিছু ছেলে বিপ্লবী রোমান্টিসিজমে আকৃষ্ট হয়ে মেনন গ্রুপে যোগদান করে। প্রাদেশিক মুসলিম লীগেও ওই সময় কাজী কাদের ও মুনায়েম খানের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ দেখা দেয়। এর প্রভাবে এনএসএফ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। একপক্ষের নেতা জমির আলী, অপর পক্ষে দোলন। বিশ্ববিদ্যালয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এনএসএফ-এর শক্তি ও দাপট হ্রাস পায়। এই সুযোগে মেনন গ্রুপ এনএসএফকে শুধু প্রতিরোধ নয়, পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। একপর্যায়ে নিহত হয় এনএসএফের টপটেরর পাঁচপাত্তুর ওরফে সাইদুর রহমান। রচিত হয়ে যায় ঊনসত্তরের পটভূমি। উল্লেখিত ছাত্রদলগুলোর বাইরে ছিল বিশাল সংখ্যক ছাত্র, যাদের কোনো রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না। মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত এসব ছেলেদের অনেকেই ছিল খুব কেরিয়ার সচেতন। একমাত্র লক্ষ্য ছিল সিএসপি হওয়া। সিএসএস পরীক্ষা দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি ভালো চাকরি পাওয়া। এদের বেশিরভাগই ছিল খুব ভালো ছাত্র। যারা তত ভালো ছাত্র নয় তাদেরও সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল কোনোরকমে একটি ভালো সরকারি চাকরি পাওয়া। *মাতাল হাওয়ায়* বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি বা তাদের রাজনৈতিক চিন্তা সম্পর্কে বেশি কিছু লেখা নেই। আওয়ামী লীগের ছয় দফা আন্দোলন এদেশের শিক্ষিত সমাজকে কিছুটা সচকিত করেছিল। কিন্তু এর প্রভাব ছিল খুব স্বল্পস্থায়ী। আমার কেন জানি মনে হয় অধিকাংশ শিক্ষক 'মোহের কাছে পরাজিত'। এবং Somehow they reconciled to the Ayub regime. কিন্তু অকস্মাৎ এক মাতাল হাওয়া যার শুরু ২০ জানুয়ারি ঊনসত্তরে—যা এইসব শিক্ষককে, নির্লিপ্ত ছাত্রদের একাত্ম করে তোলে; আপামর মানুষের সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে চলে এক নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে।

এ লেখা শেষ করার আগে ফিরে আসি হুমায়ূন আহমেদ প্রসঙ্গে। আমি মুহসিন হলে ঢুকেছিলাম ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি, আর এম এ পরীক্ষার পর বের হয়ে যাই ১৯৬৮'র শেষের দিকে। হুমায়ূন তখনো লেখক হয়ে উঠেন নি। তবে তিনি ছিলেন ক্ষুধার্ত পাঠক। নানা বিষয়ে তার আগ্রহ। ঝোঁক ছিল তার বিচিত্র দিকে। জাদু, জ্যোতিষবিদ্যা, প্রেতশাস্ত্র এসবের ওপর তার কাছে অনেক বই ছিল। ইংরেজি-বাংলা সাহিত্যেরও বই ছিল মেলা। মাঝে মাঝে তাঁর কাছ থেকে আমি বই নিয়ে পড়তাম। Jhon Steinback-এর কয়েকটি উপন্যাস হুমায়ূন আহমেদের কাছ থেকে নিয়েই আমি পড়েছি। স্টেইনবেক তাঁর খুব পছন্দের লেখক ছিলেন। হুমায়ূন আহমেদও কখনো কখনো আমার কাছ থেকে বই নিয়ে পড়তেন। William Shirer-এর 'Rise and Fall of the Third Reich' বিশালাকৃতির একটি বই এবং Mikhail Sholokhov এর 'And Quite flows the don' আমার কাছ থেকে নিয়ে তিনি পড়েছিলেন। শলোখভ এই বইয়ের জন্য ১৯৬৫ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ওই সময়ে একটি বেশ সুবিধা ছিল। হলে রুমে বসেই আমরা বই কিনতে পারতাম। বইওয়ালাদের কাছে Times, News week, Reader's Digest এসব পত্রিকা ছাড়াও অনেক রকমের বই পাওয়া যেত। রাশান লেখকদের বই খুব সুলভ ছিল। আমি অনেক বই তাদের কাছ থেকে কিনেছি। বাকিতেও তারা বই দিত। মুহসিন হলে আমার অবস্থানকাল খুব দীর্ঘ ছিল না। কিন্তু ওই সময়টুকু আমার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অনেক প্রাপ্তি অনেক অর্জন। শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আমার সারা জীবনের বন্ধুত্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বগুড়া জিলা স্কুলের বাচ্চু

এম এ করীম

সে প্রায় অর্ধশত বছর আগের কথা। এ সময়ে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে, এনালগ থেকে ডিজিটাল যুগ এসেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পৃথিবীর অনেক কিছু বদল হয়ে গেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে। তবুও মৃত্যুর কাছ থেকে কিছু বছরের জন্য হলেও আমরা পারলাম না আমার বাল্যবন্ধু এদেশের কথাসাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, চিত্রপরিচালক, চিত্রনাট্যকার, গীতিকার, সুরকার, জাদুকর, চিত্রশিল্পী হুমায়ুন আহমেদকে দূরে রাখতে। বগুড়া জিলা স্কুলে যাকে সবাই জানত 'বাচ্চু' বলে। ছোটবেলায় তার নাম নাকি কাজল ছিল কিন্তু বগুড়াতে এ নামে তখন কেউ ডাকে নি— আমরা বন্ধুরা তো নই এমনকি মাকেও (হুমায়ুনের মাকে আমি 'মা' বলে ডাকি) কোনোদিন ডাকতে শুনি নি।

আমি ছোট থেকেই একা থাকতে পছন্দ করতাম না। তাই সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করতাম। বন্ধুহীন জীবন নাবিকবিহীন জাহাজের মতো। তাই মানুষ প্রতিটি মুহূর্তে একজন ভালো বন্ধুর প্রয়োজন অনুভব করে। কারণ একজন প্রকৃত বন্ধু জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার অংশীদার হয়। প্রকৃত বন্ধুই পারে আত্মার আত্মীয় হয়ে কিছুক্ষণের জন্য হলেও দুঃখ-কষ্টকে ভুলিয়ে রাখতে। তাই তো আমরা সবাই ছোটবেলার বন্ধুকে অকৃত্রিম বন্ধু বলে ভাবি। এখানে চাওয়া-পাওয়ার কোনো হিসেব থাকে না। আমাদের বেলায়ও ছিল না। আমার ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল। বাচ্চু যে কখন আমার ডায়েরিতে লিখেছে তা আমি বুঝতেই পারি নি। ডায়েরি খুলে দেখি সে লিখেছে, "হাজার হাজার বন্ধুর চেয়ে দু'একজনকে বেছে নিস তারাই হবে প্রকৃত বন্ধু।" কথাটা কঠিন বাস্তব। পরিণত বয়সে তা হাড়েহাড়ে টের পেয়েছি। বাচ্চুর লেখাটা যে কত বাস্তব তা আমি পদে পদে উপলব্ধি করি। আমার এক বন্ধু আমাকে বন্ধুত্বের সংজ্ঞা বলতে বলেছিল। তার সঠিক উত্তর দিতে পেরেছিলাম কি না জানি না তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অ্যারিস্টেটলের উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম "দুটি দেহে একটি আত্মার অবস্থান হলো বন্ধুত্ব"। এমারসনের উক্তি হলো, "প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির নাম হলো বন্ধুত্ব।" নিটসে বলেছেন, "বিশ্বস্ত বন্ধু হচ্ছে প্রাণরক্ষাকারী ছায়ার মতো। যে তা খুঁজে পেল সে একটি গুপ্তধন পেল।" ১৯৬৪ সালে আমি সেই গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছিলাম।

আমি ও সাইফুল (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব) গ্রাম থেকে অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়ে বগুড়া জিলা স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। তখন বগুড়া জিলা স্কুলে ভালো ছাত্র না হলে বা সরকারি কর্মকর্তার ছেলে না হলে ভর্তি হওয়া যেত না। নবম শ্রেণীতে ভর্তি হলাম। ঠিক সেই সময়ে বাচ্চুও নবম শ্রেণীতে ভর্তি হলো। খালুজান (হুমায়ুনের বাবা) পুলিশের অফিসার ছিলেন। নতুন চাকরিস্থল বগুড়া শহরে এসেছেন। এর আগে থেকেই আমাদের আর এক বন্ধু প্রকৌশলী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহকাফ (পটল) প্রথম স্থান অধিকারী হয়ে আমাদের নজর কেড়ে ছিল। এরপরে ভর্তি হলো আহসান হাবীব (যে এখন আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভবত অধ্যাপক)। আহসান হাবীবের বাবা ছিলেন তখনকার এডিসি। এ কথাগুলো বলার প্রয়োজন এ জন্যই যে এরা তখন কে কেমন ছাত্র ছিল তা নির্ণয়ে সহায়তা করবে।

বাচ্চুর দেহের গঠন ছিল পাতলা ছিপছিপে এবং সে ছিল শান্ত প্রকৃতির। কথা বেশি বলত না। সব সময় দেখা গেছে চুপচাপ থাকত। আর আহসান হাবীব ছিল খুব মুখর। সে কারণে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জব্বার স্যার বলতেন, "আহসান হাবীব বাচাল আর বাচ্চু শান্ত সৌম্য প্রকৃতির। আমার মনে হয় বাচ্চু একদিন অনেক বড় মাপের মানুষ হবে।" জব্বার স্যার এখনো বেঁচে আছেন তবে অসুস্থ। লেখাপড়ায় বাচ্চু কেমন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল নবম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায়। যে পটল প্রথম স্থান অধিকার করেছিল সে হলো প্রথম, তার সঙ্গে প্রথম হলো আহসান হাবীব এবং বাচ্চু হলো দ্বিতীয়। আবার দশম শ্রেণীতে নির্বাচনী পরীক্ষায় বাচ্চু এদের দুজনকে ডিঙিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। এভাবে আস্তে আস্তে হুমায়ূনের মেধার বিকাশ ঘটতে আমরা দেখি। আমরা কজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমি, ডঃ ছালাম, টুনু, খলিল, তাজুল (প্রকৌশলী), সরফরাজ (সাবেক সচিব) ডাঃ নাজমুল, সাইফুল (অতিরিক্ত সচিব) পড়াশোনায় ছিলাম আমরা বাচ্চুদের পরেই। আস্তে আস্তে বাচ্চু সবার নজর কেড়ে নিল। এরপর এসএসসি-তে রাজশাহী বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে প্রমাণ করল সে লেখাপড়ায় শ্রেষ্ঠ। হুমায়ূন যে নাটকপ্রিয় ছিল তার প্রমাণ আমরা তখন থেকেই টের পেয়েছি। বাৎসরিক নাটক করার প্রস্তাব করলেন আমাদের বাংলার শিক্ষক রকীব স্যার। আমাদের বিপত্তি বাধল নারী চরিত্র নিয়ে। কেউ নারী চরিত্র করতে রাজি হয় না। তা ছাড়া আমাদের স্কুল শুধুমাত্র ছেলেদের জন্যে। হুমায়ূন তখন চিন্তা করে রকীব স্যারকে বলল, "স্যার, রবি ঠাকুরের 'মুকুট' তো নারী বর্জিত। রবি ঠাকুরের 'মুকুট' তো আমরা করতে পারি।" স্যার একবাক্যে রাজি হলেন। আমরা নাটকটি মঞ্চস্থ করলাম। আমি, বাচ্চু ও ডাঃ নাজমুল ভালো অভিনয় করে প্রশংসা পেলাম। বাচ্চু যে রবীন্দ্রপ্রেমী ছিল তার অকাট্য প্রমাণ সে সময়ে তার এই প্রস্তাব। ছোটবেলায় হুমায়ূনকে খেয়ালি ও মাঝে মধ্যে অন্যমনস্ক হতে আমি দেখেছি। মাঝে মাঝে একা একা চিন্তা করতে দেখেছি। হয়তো আমি ডাকছি 'বাচ্চু এই অঙ্কটা বুঝতে পারছি না একটু বুঝিয়ে দে।' কিন্তু না বাচ্চুর সাড়া নেই। চুপচাপ, কিছুক্ষণ পরে বলে, তুই কিছু বলছিলি ? এ ধরনের ঘটনা স্কুলজীবনে অনেক ঘটেছে।

হুমায়ূন তখন থেকেই 'প্লানচেট' করত। করতোয়া নদীর পাড়ে শ্মশান ঘাট সম্ভবত মালতি নগরের পাশেই। সূর্য অস্তমিত হচ্ছে। চারদিকে অন্ধকার নেমে আসছে। এমনি সময়ে আমি, টুনু, পটল সঙ্গে আরও দু'একজন (এই মুহূর্তে আমি তাদের নাম মনে করতে পারছি না) মিলে সে আসরে বসতাম। বাচ্চু বলত কে 'প্লানচেট' করতে চায় ? আমরা সবাই পটলকে বললাম, তুই বস। বাচ্চু তার স্বভাবসুলভভঙ্গিতে বলতে শুরু করে, চোখ বন্ধ করো। কিছু দেখতে পাচ্ছ ? আসছে আসছে ওই আসছে...। এভাবে চলে 'প্লানচেট'-এর কাজগুলো। হুমায়ূন বন্ধুপরায়ন। আমি তখন হোস্টেলে থাকতাম। সে আমাকে বলে, তুই হোস্টেলে থাকবি কেন ? আমাদের বাসায় আয়। আমাদের বাসায় থাকবি। গ্রামের আনা সেই টিনের সুটকেসটি নিয়ে ওদের বাসায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠলাম। আমি যে ঘরে থাকতাম, সেই ঘরটা আজও আছে। পাশেই রান্নাঘর ছিল, সেটাও আছে। নাই শুধু বাচ্চুরা যে দুটো ঘরে থাকত সেই ঘর। সেখানে দালান করা হয়েছে।

বাচ্চু যে-কোনো ঝুটঝামেলা বা নিয়মবর্হির্ভুত কিছু পছন্দ করত না তার একটা গল্প বলছি। একদিন বাচ্চু বলল, করীম এই ছুটিতে তোদের বাড়িতে যাব। আমি রাজি হলাম। আমাদের বাড়ি যেতে হলে ট্রেনে করে যেতে হয়। সে সময়ে এমন রাস্তাঘাট ছিল না । ট্রেন ছাড়া কোনো গতি নেই। সঙ্গে আমাদের আর এক বন্ধু মঞ্জু (বর্তমানে সে আমেরিকায় বসবাস করছে)। আমি টিকিট কাটলাম তৃতীয় শ্রেণীর। ওরা দুজন জানে না কোন শ্রেণীর টিকিট কেটেছি। পাকিস্তান আমল। স্পেশাল চেকিং করত একদল কর্মকর্তা। এদেরকে সাধারণ মানুষ 'মোবাইল চেকিং' বলত। ট্রেন প্রায় সব স্টেশনেই থামে। বগুড়া ছেড়েছে ট্রেন। আমরা উঠেছি ইন্টার ক্লাসে। পরের স্টেশনেই মোবাইল চেকিং। আমি তাদের দেখে ট্রেন থেকে নেমে আর এক ইন্টার ক্লাসে উঠলাম। ভাগ্যক্রমে স্টেশনে আমার পরিচিত লোকদের দেখা পেলাম। তাদেরকে বললাম, আমি বিপদে পড়েছি। আপনাদের তিনটা টিকিট কিছুক্ষণের জন্য ধার দেন। ওরা যেন আমার বিপদ দেখে রাজি হয়ে গেল। পরের স্টেশনেই আমি হুমায়ূনদের কামরায় উঠলাম। হুমায়ূন তো একেবারে নার্ভাস। টিটিদেরকে বললাম, চাচা টিকিট আমার কাছে। টিকিট দেখালাম। ওরা দেখে টিকিট ফেরত দিল। হুমায়ূন তখন ভীষণ ক্ষ্যাপা আমার ওপর। বাচ্চু তখন থেকেই রাগী ছিল। রাগটা ক্ষণস্থায়ী। কিছুক্ষণের জন্যে থাকে। সেদিন সে রাগ করে বলেছিল, তুই এরকমভাবে নিয়ে যাবি জানলে আসতাম না। আমি বলেছিলাম, টিকিট আমার ছিল তা সেটা তৃতীয় শ্রেণীর। দুষ্টুমি করে ইন্টার ক্লাসে উঠেছি। পরক্ষণেই আমার উপস্থিত বুদ্ধি দেখে বুদ্ধির প্রশংসাও করেছিল।

বাচ্চু বন্ধুর জন্য অনেক কিছু করতে পারে। তার আর একটা উদাহরণ। এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছি। সেদিন ছিল কেমেস্ট্রি পরীক্ষা। প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে আমাদের সিট পড়েছে। একই ঘরে আমাদের সিট। বাচ্চু আমার আগের বেঞ্চে। পেছনে সম্ভবত টুনু আর খলিল। পরীক্ষা প্রায় শেষ। আর একঘণ্টা বাকি। আমাদের একটি প্রশ্ন ছিল ফর্মুলার। সেটাও লিখে ফেলেছি। আমার সিটটা জানালার পাশে। পেছনে দেখি খলিল একটা কাগজ দেখে লিখছে। সম্ভবত খলিলই হবে। আমি ওকে বললাম, এটা কী ? 'ফর্মুলা'। ওর লেখা শেষ। আমি বললাম, দেখি। হাতে নিয়ে দেখি এ প্রশ্ন আমি লিখে ফেলেছি। তবুও বেঞ্চের ওপরে রেখে তা মেলাতে চেষ্টা করছি। এমন সময় বাইরে থেকে পরীক্ষক এসে আমার খাতাটা কেড়ে নিল। ওই কাগজ ও খাতা নিয়ে চলে যাওয়ার উপক্রম। আমি ভাবছি আত্মহত্যা করব ? কীভাবে বাড়ি যাব! বাবা-মাকে মুখ দেখাব! এমন ভাবনা যখন তখন বাচ্চু দাঁড়িয়ে গেল। বলল, "স্যার ও ভালো ছাত্র। ভুল করেছে। ওকে মাফ করেন।" আর আমাকে বলল, "যা স্যারের কাছে মাফ চা।" স্যার দাঁড়িয়ে গেল। ওর কথা শুনে খাতা ফেরত দিল। তবে সব উত্তর কেটে দিল। মাত্র আর এক ঘণ্টা। এক ঘণ্টায় বাকি উত্তর দিয়েছিলাম। পাঠক অন্য বন্ধুরা কেউই তখন ওভাবে উঠে দাঁড়ায় নি। বন্ধুপ্রেম কী তা বাচ্চু দেখাল। এ গল্প বাচ্চুর কাছ থেকে বাচ্চুর কাছের লোক ও বন্ধুরা শুনে থাকবেন নিশ্চয়ই। এ রকম অনেক গল্প আছে বাচ্চুকে নিয়ে। এই স্বল্প পরিসরে তা বলা সম্ভব নয়।

বাচ্চু নেই। বগুড়া জিলা স্কুলের সেই বাচ্চু পরে বাংলা কথাসাহিত্যের 'বাদশাহ নামদার', বাংলা সাহিত্যের নক্ষত্র। বন্ধু তুই নেই। ভাবতেই পারি না। সন্ধ্যায় আর কেউ ডাকে না। তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝি তুই নেই। নোভা, শিলা, বিপাশা ও নুহাশ তোর আদরের কথা মনে রাখতে পারবে, কিন্তু নিষাদ ও নিনিত তোকে মনে রাখতে পারবে কি না তাতে আমার সন্দেহ, ওরা এত ছোট যে ওদের পক্ষে এটা মনে রাখা সম্ভবও না। ওরা বাবার স্নেহ ও আদর থেকে বঞ্চিত। একমাত্র আমার বন্ধুপত্নী শাওনই পারবে তাদের বাবার স্নেহ দিয়ে মানুষ করতে। নিষাদ-নিনিত, তোমাদের বাবা শারীরিকভাবে নেই, কিন্তু বাংলার প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিনয় মজুমদারের কবিতার কিছু অংশ পরিবর্তন করে আমি বলতে চাই :

পৃথিবী নামক গ্রহের নাম
পাল্টে ফেলা হয়েছে ।
সকলের কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক
পৃথিবীকে বদলে এই গ্রহের
নতুন নামটি কী ?
সবার অবগতির জন্য জানাই
নতুন নামটি 'হুমায়ূন গ্রহ'।
বাংলাদেশের সব ভূগোল বইতে ছাপুন
'আমরা হুমায়ূন গ্রহে বাস করি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদ

গোলাম মুরশিদ

হুমায়ূন আহমেদকে প্রথম দেখি বেশ কয়েক বছর আগে—তাঁর 'চন্দ্রকথা' চলচ্চিত্রের প্রিমিয়ার শোতে। অসাধারণ একটি ছবি। যেমন কাহিনি, তেমনি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কয়েকটি চরিত্র। কেবল তা-ই নয়, প্রতিটি চরিত্রের অভিনয়ও অসামান্য। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছ থেকে পরিচালক হিশেবে তিনি তাঁদের সর্বোত্তম প্রয়াসটুকু আদায় করে নিয়েছিলেন।

প্রদর্শনী আরম্ভ হওয়ার আগে হুমায়ূন ছবিটি সম্পর্কে বলেন যে, তাঁকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, ছবিটি কেমন, তা হলে তিনি বলবেন, 'অবশ্যই কমার্শিয়াল'। কেন একে তিনি কমার্শিয়াল মনে করেন, তাও ব্যাখ্যা করে বলেন তিনি। তারপর যখন ছবিটি দেখলাম, তখন বুঝতে পারলাম, কী অগতানুগতিক এর কাহিনি। শতকরা ৯৯টা ছবিতেই যেমন গতবাঁধা প্রেমের কাহিনি থাকে, এ কাহিনি আদৌ সে রকমের নয়। এতে যেমন আছে দুই তরুণ-তরুণীর উচ্ছ্বসিত উদ্দাম প্রেমের কাহিনি, তেমনি আছে একটি অপ্রেমের মর্মান্তিক কাহিনি। আমার ধারণা, নায়িকার আগের জন্মের নর্তকীর ভূমিকাটুকুন এই কাহিনির দুর্বল দিক। এটুকু বাদ দিলে ছবিটি একটি সত্যিকার আর্ট ফিল্ম হিশেবে বিবেচিত হতো। কিন্তু পরিচালক মনস্থির করতে পারেন নি, তিনি ঠিক কী ধরনের ছবি তৈরি করতে চান। শিল্পী হুমায়ূন এতে মানবচরিত্রের অদ্ভুত দ্বন্দ্বময় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন; অন্যদিকে হাততালি পাওয়ার নেশায় তিনি প্রায় জোর করে কাহিনির ওপর নাচগানের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। এ হলো বিশুদ্ধ শিল্প আর শস্তা জনপ্রিয়তার অস্বস্তিকর সহাবস্থান। হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্টিকর্ম, এমনকি, তাঁর নিজের চরিত্রও এমনি।

তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় আমাদের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধুটি পানভোজনের রসিক। খাওয়াতে ভালোবাসেন। রান্নাও জানেন নানা রকমের—বাঙালি থেকে মোগলাই; থাইল্যান্ডী থেকে ইংল্যান্ডী। ঢাকায় থাকলে তাঁর বাড়িতে ডাক পড়ে মাঝেমধ্যেই। এবং এসব আসরের বৈশিষ্ট্যই হলো জমজমাট আড্ডা, স্বর্গ থেকে পাতাল পর্যন্ত তাবৎ বিষয়ে উচ্চকণ্ঠ আলোচনা, মুখরোচক পরনিন্দা, সেই সঙ্গে হালকা খাবার, গলনোন্মুখ বরফ আর কঠিন পানীয়। রাত এগারোটার পর খেয়েদেয়ে তাঁর গাড়িতে করে বাড়িতে ফেরা। অন্যদের কথা জানি না, কিন্তু আমি দারুণ উপভোগ করি এই সন্ধ্যাগুলো।

এমনি এক সন্ধেয় গিয়ে দেখি সেই বন্ধুর বাসায় হাজির হুমায়ূন। আমি তাঁকে আগেই দেখেছিলাম প্রিমিয়ার শোতে। কাজেই চিনতে পারলাম এক দৃষ্টিতেই। কিন্তু অখ্যাত মানুষ আমি, আমাকে তাঁর চেনার কথা নয়। তাই হইচই আর তৃপ্তির চুমুক দিতে দিতে কিছুক্ষণ কেটে গেল। তারপর আমার বন্ধুটি লক্ষ করলেন যে, আমাদের দুজনের মধ্যে কোনো বাক্যবিনিময় হচ্ছে না। তিনি তখন পরিচয় করিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ফৌজি তৎপরতায় দুজনের তড়াক গতিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়ানো ও আলিঙ্গন। এর পর থেকে যতবারই ওই বন্ধুর বাসায় গেছি প্রায় প্রতিবারেই হুমায়ূন আসতেন শাওনকে নিয়ে। এ আসরে শাওনের গানও শুনেছি বেশ কয়েকবার।

আসরে নিজেদের উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা, স্বপ্ন এবং উদ্ভট কল্পনা, সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ ইত্যাদি সবই আলাপ হতো। কখনো তাতে আবেগ মিশতো, কখনো উত্তেজনা, কিন্তু সারাক্ষণই প্রবল ধারায় বই তো এন্তার হাসির খোরাক। রবীন্দ্রনাথ, ভূত, চলচ্চিত্র, ধর্ম, আবহাওয়া, বিজ্ঞান, পরকাল, ম্যাজিক—হেন বিষয় নেই যা সেখানে অচল ছিল। একবার প্রায় ডিফেনসিভ ভঙ্গিতে হুমায়ূন বলেছিলেন, 'আমি কিন্তু আল্লায় বিশ্বাস করি!' সে তাঁর বিশ্বাস যেমনই হোক, একটা বিষয় নিয়ে কখনোই আমরা আলাপ করি নি—যেটা বেগম থেকে বেটি, সাহেব থেকে সহিস [বর্তমান কালে যাকে বলে ড্রাইভার] সবারই সবচেয়ে প্রিয় বিষয়; স্বামী-স্ত্রী গভীর রাতে শুতে গিয়েও প্রেমালাপ বাদ দিয়ে যে-প্রসঙ্গে উত্তেজিত হন—রাজনীতির কথা।

হুমায়ূনের একটা প্রিয় বিষয় ছিল বই পড়া। প্রতিবারেই নতুন নতুন বইয়ের কথা বলতেন। সাধারণ গল্পের বই নয়। বরং অদ্ভুতসব বিষয় সম্পর্কিত বই—এমনকি, ভুতুড়ে গল্প। আমাকে জিজ্ঞেস করতেন পড়েছি কি না। প্রতিবার একই উত্তর শুনতেন আমার কাছ থেকে, পড়ি নি। তারপর অনুরোধ করতেন, অবশ্যই যেন পড়ে দেখি। তিনি আমার নামে একটা বই উৎসর্গ করেছিলেন–*গল্প পঞ্চাশৎ*। সে বইতেও উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছিলেন পড়ার কথা। উইলিয়াম লিয়ন ফেপসের একটা উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছিলেন : 'আমি পাঠকদের ভাগ করি দু ভাগে—এক দল যারা পড়ে মনে রাখার জন্যে, আর-একদল পড়ে ভুলে যাবার জন্যে। আপনি কোন দলে ?' আজ আর হুমায়ূন নেই, কাজেই অসংকোচে বলতে পারছি—মনে রাখা কি ভুলে যাওয়া তো পরের কথা; আমি বই খুব কমই পড়ি। তাঁর সুপারিশ-করা বইগুলোও পড়া হয় নি।

আসলে আমি পড়ি খুব ধীর গতিতে। তাই নিতান্ত দরকারি বই ছাড়া কিছুই পড়ি না, পড়তে পারি না। যেমন, কতকাল যে একটাও উপন্যাস পড়ি নি, নিজেরই মনে নেই। না, ভুল বললাম, শেষ যে উপন্যাসটি পড়েছি, তার কথা মনে আছে। সেটি তিনিই দিয়েছিলেন আমাকে–*জোছনা ও জননীর গল্প*। বেশ মোটা বই—মুক্তিযুদ্ধের সময়কার কাহিনি নিয়ে লেখা। গল্প ও বাস্তব তাতে একাকার হয়ে গেছে। বেশ কয়েক দিন লেগেছিল শেষ করতে। কিন্তু শেষ করেছিলাম। আমার উল্টো কোটির লোক হুমায়ূন। পড়তে ভালোবাসতেন। আধাবাস্তব, পরাবাস্তব বিষয়বস্তু তাঁর বিশেষ পছন্দের ছিল। বাস্তবের মধ্যেও তিনি অতিবাস্তবের সন্ধান পেতেন; আবার অবাস্তবকে মন্থন করে তার মধ্য থেকে বাস্তবের অমৃত বের করতেন।

ভাবলে অবাক লাগে, কী করে অত লিখেছিলেন। সেদিন কোনো এক পত্রিকায় তাঁর একটি গ্রন্থতালিকা দেখলাম। তাতে প্রায় শ তিনেক নাম। কোথায় সময় পেতেন এত লেখার, আমার মাথায় আসে না। তাও তো কম্পিউটারে লিখতেন না। অবশ্য অনেকবারই বলেছেন, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত নিয়মিত লিখতেন। এ সময়ে কারও সঙ্গে দেখা করতেন না। তারপরও, অতগুলো বই লেখা প্রায় অতিমানবের কাজ বলে মনে হয়। লেখা ছাড়া, নাটক এবং সিনেমা ছিল তাঁর প্যাশন, তার পেছনে সময় দিয়েছেন অনেক-অনেক। তা না-হলে তাঁর বইয়ের সংখ্যা কত হতো, সেটা অনুমানের বিষয়। কিন্তু নাটক-সিনেমায় যে-সময় দিয়েছেন, তাকে অপব্যয় বলে ঠাওরালে ভীষণ ভুল হবে। বস্তুত, আমি যে-হুমায়ূনকে চিনি, তাঁকে চিনি তাঁর নাটক-চলচ্চিত্রের মাধ্যমে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারা দিন গুরুতর কাজকম্ম করে সন্ধেবেলায় খেয়ে একটু হালকা হওয়ার, হাসার ইচ্ছে হতো। রাত সাড়ে আটটা থেকে তাই ঘণ্টাখানেক তাঁর একটা নাটক দেখতাম। 'বুয়া-বিলাস' থেকে 'সমুদ্র-বিলাস'; 'উড়ে যায় বকপক্ষী' থেকে 'চন্দ্রকারিগর'। দেখতে থাকলাম যতদিন না বই আর রেকর্ডের দোকান—'সঙ্গীতা'র তাকে-রাখা তাঁর ডিভিডির সারি শেষ হলো। কোনো কোনো ডিভিডি একাধিকবারও কেনা হলো—কারণ অত নাম মনে রাখা মুশকিল। কতগুলো নাটক তৈরি করেছিলেন, নিজেও তার সঠিক হিশেব রাখতেন কিনা, জানি না। রসিক মানুষ ছিলেন তিনি, তাই সিরিয়াস বিষয়বস্তুর মধ্যেও হাসির তরঙ্গ তুলতে পারতেন। তিনি আর হাসবেন না বটে, কিন্তু তাঁর নাটক দেখে আমরা আরও অনেক কাল হাসতে পারব, হাসতে থাকব।

তাঁর ডিভিডি দেখে টেলিফিল্ম দেখা প্রায় অভ্যেসে পরিণত হয়েছিল। তাই তাঁর নাটক যখন শেষ হলো, তখন দেখা শুরু করলাম অন্যদের নাটক। কিন্তু দেখতে গিয়েই অনুভব করলাম, মাঝারির সঙ্গে উত্তমের পার্থক্য কোথায়। অন্যরা সাধারণ নাটক এবং মেগাসিরিয়াল দিয়ে প্রমাণ করেছেন, কত অগভীর এবং বাণিজ্যসর্বস্ব তাঁরা। সেসব নাটক অথবা ধারাবাহিকে না-আছে কাহিনি, না-আছে মনে রাখার মতো কোনো চরিত্র। একবার একজন মেগাসিরিয়াল-লেখক তো গর্ব করে এক বক্তৃতায় বলেই দিলেন, কীভাবে তাঁর ধারাবাহিক লেখা হয়। তিনি বললেন, একবার দেশের বাইরে থাকার দরুন তাঁর একটা সিরিয়ালের কয়েকটা কিস্তির কাহিনি তিনি লিখতে পারেন নি। তখন তাঁর পরিচালক লিখে দিয়েছিলেন। তারপর তিনি স্বয়ং দেশে ফিরে পরিচালকের কাছ থেকে কাহিনিটা সবশেষে কোথায় দাঁড়িয়েছে শুনে নিয়ে সেখান থেকে আবার নিজে লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর দম্ভের কথা শুনে অবাক হলাম। অবাক হলাম, নিজের লেখার প্রতি এই লেখকের এমন পর্বতপ্রমাণ অবহেলা এবং সাগরপ্রমাণ অসাধুতার কথা শুনে। জোড়াতালি দিয়ে এমন এজমালি নাটক লেখেন এঁরা!

অপর পক্ষে, হুমায়ূনের নাটকে কাহিনি আছে, কাহিনির অগ্রগতি আছে, এমনকি, প্রতিটা নাটকে একটা-না-একটা মনে রাখার মতো অসাধারণ চরিত্রও আছে। বাস্তব-অবাস্তবের আলো-আঁধারী পরিবেশ তৈরি করে হাসির বোমশেল ফাটিয়ে কাহিনিটা পরিবেশন করতেন তিনি। রহস্যময়তার দিকে ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ।

এই থেকে মনে পড়ল তাঁর একটি কাহিনির কথা। মরে কবরে গিয়ে পরের দিন বেঁচে উঠে কবর থেকে ফিরে আসার গল্প। এ কাহিনি প্রায় অবিশ্বাস্য এবং ভুতুড়ে। কিন্তু এমন ঘটনা কখনো ঘটে নি, এমন নয়। ওয়াল্টার স্কটের মাও তাঁর বিয়ের আগে 'মরে গিয়েছিলেন'। তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। তারপর সেই কবরের পাশ দিয়ে একজন লোক যাবার সময় তাঁর গোঙানির শব্দ শুনতে পান। ঘটনাটা নিয়ে হইচই শুরু হলো। কবর খোঁড়া হলো। সেখান থেকে বের করা হলো অসুস্থ এই তরুণীকে। তার কিছু কাল পরে তাঁর বিয়ে হলো। এবং তাঁর সন্তান প্রখ্যাত সাহিত্যিক ওয়াল্টার স্কট।

হুমায়ূনের গল্পের নায়ক একটি বালক। সে মরে যাওয়ার পরে যথারীতি তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল। তারপর রাতের বেলা তার বোন স্বপ্ন দেখল তার ভাইটি বেঁচে আছে। বোনের কথা কেউ বিশ্বাস করল না। কিন্তু তবু তারই কান্নাকাটি আর জোরাজুরিতে ভাইয়ের কবর খোঁড়া হলো এবং দেখা গেল কবরের মধ্যে বসে আছে তার ভাই। এ কাহিনিকে বিশ্বাসের যোগ্য বলে মনে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় না। বিশেষ করে বোনের স্বপ্ন দেখা। তবে বিশ্বাস না-করে উপায় কী ?—হুমায়ূন নিজ মুখে আমাদের বলেছিলেন যে, তিনি এ কাহিনি শুনেছেন খোদ এই ছেলেটির কাছ থেকে। কাজেই মনের মধ্যে প্রশ্ন উঁকি দিলেও তাকে চেপে যেতে হয়। হওয়া সম্ভব যে, ছেলেটি মিথ্যে বলেছিল। তা ছাড়া, অতিরঞ্জন করে বলা তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এই রহস্যময় ঘটনা হুমায়ূনকে রীতিমতো আকৃষ্ট করেছিল।

এই ঘটনার প্রমাণস্বরূপ হুমায়ূন আর-একটা সত্য ঘটনা বলেন এবং শাওন তাতে সাক্ষ্য দেন। একদিন গাড়িতে করে তাঁরা যাচ্ছিলেন। একটা জায়গায় গিয়ে তাঁর মনে হয় যে, তাঁর পিতা ধারে-কাছেই কোথাও আছেন। তাঁর পিতা মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। হুমায়ূনের মনে হলো : সেই কবরটা তিনি পিছে ফেলে এসেছেন। তাই গাড়িটাকে মাইলখানেক পিছিয়ে নেওয়া হলো। তারপর গাড়ি থেকে নেমে খোঁজখবর নিয়ে তিনি জানতে পেলেন, সত্যিই সেখানে তাঁর পিতার কবর রয়েছে। সেই কবরের মাটিই এনে দেওয়া হয়েছে তাঁর কবরে। এই যে হুমায়ূনের একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাঁকে বলে দিয়েছিল যে, তিনি পিতার কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন—এটা তাঁর পাঠকদের আকৃষ্ট করত, কিন্তু তার থেকেও বেশি আকর্ষণ করত স্বয়ং হুমায়ূনকে।

তাঁর উপন্যাসের দিকে তাকালে লক্ষ করি, সূচনা থেকে কাহিনি ধীরে ধীরে তার স্বাভাবিক পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। আর তার মধ্যে থাকে এমন এক-একটা চরিত্র, যা পাঠকদের ধরে রাখে, আকর্ষণ করে। নয়তো হাজার হাজার ভক্ত তৈরি হতো না হিমু চরিত্রের, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে। নয়তো তারা পাগলের মতো হলুদ পোশাক পরে বইমেলায় মিছিল করত না। হিমুর মতো মিসির আলিও শিক্ষিত সমাজের আর-একটা গোষ্ঠীকে আকর্ষণ করে। এই গোষ্ঠী আবার হিমুর ভক্ত নয়। এই যে একজন লেখক শিক্ষিত লোকেদের এক-এক অংশের মন এক-একটা চরিত্র দিয়ে ভোলান, অতি-অসাধারণ লেখক না-হলে এটা করতে পারা সম্ভব নয়।

শরৎচন্দ্রও খুব জনপ্রিয় কাহিনিকার ছিলেন। কিন্তু তিনি সমাজের এক-একটা অংশের কথা মনে করে কোনো চরিত্র সৃষ্টি করেন নি। *কাশীনাথ* থেকে *চরিত্রহীন* কিংবা *শেষপ্রশ্ন* থেকে *পথের দাবি* পর্যন্ত যে-কাহিনিগুলো তিনি সৃষ্টি করেছেন, তা করেছেন তাবৎ পাঠকের জন্যে। তবে এসবের মধ্যে কারও কাছে *রামের সুমতি* ভালো লাগে, কারও কাছে *মেজদিদি*। কারও সতীশকে ভালো লাগে, কারও বা শিবনাথকে। সেটা নির্ভর করে পাঠকদের রুচিভেদের ওপর। নয়তো শরৎচন্দ্র সজ্ঞানে আলাদা-আলাদা পাঠকগোষ্ঠী সৃষ্টি করতে চান নি।

প্রকাশনা-শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে মধ্যম শ্রেণীর শতশত লেখক-লেখিকা তৈরি হয়েছেন, বেশির ভাগই ঘষে-মেজে। অনেকে তাই দিয়েই উপার্জন করছেন এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে পুরস্কার পেয়ে খেতাব বাড়াচ্ছেন। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বেশিরভাগ কথাশিল্পীরই কোনো সহজাত প্রতিভা নেই। জোর করে তাঁরা শিল্পী সেজেছেন। কিন্তু একটু তত্ত্ব করলেই, সত্যিকার শিল্পীদের মধ্যে শিল্পীর ছদ্মবেশ-পরা দু নম্বরী অনুপ্রবেশকারী কারা, তা ধরা পড়বেন। তাঁদের কাহিনি শতছিদ্র 'আজারির চিরে'র মতো। চরিত্রগুলোর নাম এক নয়, কিন্তু মুনীরে আর জমিরে কোনো পার্থক্য নেই। জামিলা আর আমিনাও ভিন্ন নামে একই চরিত্র। এঁদের সঙ্গে হুমায়ূনের তুলনাই চলে না। তিনি ছিলেন প্রতিভাবান শিল্পী। কাহিনি এবং চরিত্রের ভেতরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখতে বসার সময়ে গোড়াতেই নিশ্চয় তাঁর মনে একটা কাহিনি থাকত, থাকতো কয়েকটা চরিত্র। তারপর ধীরে ধীরে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সেই কাহিনি এগিয়ে চলত, চরিত্রগুলো চেহারা পেতে আরম্ভ করত। কিন্তু এ পর্যন্ত এসে তিনি প্রায়ই সংকটে পড়তেন–উভয়সংকটে। একদিকে সৃজনের আনন্দে শিল্পী হুমায়ূন এগিয়ে যেতে চাইতেন এক পথে; অন্যদিকে জনপ্রিয়তার মরীচিকা তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকতো আর-এক পথে। জনপ্রিয়তার স্রোতের টানে সব সময়ে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে তিনি পৌঁছাতে পারতেন, এমনটা হলফ করে বলা যায় না।

একটা প্রশ্ন অবশ্য করা যেতে পারে। তিনি জনপ্রিয় হলেন কী করে ? অথবা জনপ্রিয়তা বজায় রাখলেন কীভাবে ? মনে রাখা দরকার, প্রতিদিনের জীবনের তুচ্ছতা কাউকে আকৃষ্ট করে না। 'সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত করে নাশতা সেরে অফিসে গিয়ে কাজকর্ম করে ক্লান্ত হয়ে বাড়িতে ফিরে কিছুক্ষণ টিভি দেখে রাত নটার দিকে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।'—এ রকমের রুটিনবদ্ধ দিন আমাদের বেশির ভাগ লোকের কাছে যতই বাস্তবিক হোক না কেন, কোনো আকর্ষণীয় কাহিনি হতে পারে না। এমন বৈচিত্র্যহীন দিনের কথা শোনার জন্যে কেউ কান পেতে থাকবেন না। হুমায়ূন সব সময়ে ঘটনার ঘনঘটা না হলেও, ঘটনার বৈচিত্র্য খুঁজে পেতেন। বাস্তবের মধ্যেও কৌতূহল জাগিয়ে তোলার মতো ঘটনা, এমনকি, অ-ঘটনা খুঁজে পেতেন। চরিত্রগুলোর মনস্তত্ত্ব ছিল তাঁর কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এমন লেখক প্রায়-ঘটনাবর্জিত কাহিনিকেও অতি-আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন। হুমায়ূন ছিলেন এই ক্ষমতার অধিকারী।

পাঠককে নিজের দিকে টানার এবং ধরে রাখার তাঁর আর-একটা কৌশল হলো: তাঁর ভাষা। আমার ধারণা, আমাদের দেশের কথাসাহিত্যের একটা বড় দুর্বলতা হলো আমাদের কথাসাহিত্যের ভাষা–বর্ণনার, তার চেয়েও বেশি সংলাপের ভাষা। একজন ঔপন্যাসিকের কথা মনে পড়ছে—অনেক উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু এখনো গল্পের ভাষা আয়ত্ত করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। যে-ভাষায় লেখেন, তা দিয়ে প্রবন্ধ লিখলেই বেশি উপযোগী হতো। আর-একজন শ্রদ্ধেয় ঔপন্যাসিকের কথা মনে হচ্ছে, তিনি বেশ ভাষা-সচেতন সাহিত্যিক। আমি তাঁর দুটি উপন্যাস পড়েছিলাম মুক্তিযুদ্ধের বিষয়বস্তু নিয়ে। দুটো উপন্যাসই আমার খুব ভালো লেগেছিল। কিন্তু এক-একটা জায়গায় তাঁর কোনো কোনো শব্দের ব্যবহার আমাকে থামিয়ে দিয়েছিল। রসভঙ্গ করেছিল। মনে হয়, তাঁদের ভাষাটা স্বচ্ছন্দে পড়া যাচ্ছে কিনা, সে সম্পর্কে অনেক ঔপন্যাসিকই সচেতন নন। বোধ হয় নিজে একবার পড়েও দেখেন না। চলতি ভাষার মতো হচ্ছে কিনা, তাও একবার বিচার করে দেখেন না।

সত্যি বলতে কী, বাংলাদেশের লেখকদের ভাষার ভিত্তিটা হলো সাধুভাষা; তাই সজ্ঞানে চলতি ভাষা লিখতে গিয়ে তাঁরা সাধু-চলতির মিশ্রণ ঘটিয়ে ফেলেন। আমাকে একবার বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে সৈয়দ মুজতবা আলি লিখেছিলেন যে, তাঁরও সমস্যা হলো এটাই, তিনিও চলতি ভাষা লিখতে পারেন না স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে। মাঝেমধ্যেই সাধুভাষার শব্দাবলী লেখার আড়াল থেকে উঁকি মারে। আমার বিবেচনায় বুদ্ধদেব বসুর ভাষা অত্যন্ত সাবলীল এবং সুললিত। তাঁর ভাষা সম্পর্কেই যদি এ রকম মন্তব্য করা যায়, তা হলে আমাদের কাহিনিকারদের ভাষা সম্পর্কে কী মন্তব্য করা যেতে পারে, তা সহজেই অনুমান করতে পারি। প্রথম দিকের উপন্যাসের কথা বলব না; কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক বছর থেকেই হুমায়ূন স্রোতের মতো সহজ গতিতে প্রবাহিত হয়—এ রকমের একটা ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর ভাষা পড়তে গিয়ে হোঁচট খেতে হয় না। তাঁর ভাষায় সাধু-চলতি মিশ্রণের কথা অবশ্য না বলে পারছি না। তিনি ভাষার এমন জাদুকর হয়েও 'দিব' 'নিব' লিখতেন। অর্থাৎ তার মধ্যে আঞ্চলিকতার ছাপ থাকত।

সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষা পাঠকদের ধরে রাখার অন্যতম কার্যকর হাতিয়ার, কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো গল্প বলার কৌশল। এক-একজন আছেন গল্প বলার জাদু জানেন। বলার কৌশলে তাঁদের অর্থহীন গল্পও আমাদের মুগ্ধ করে। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গল্পকারের বর্ণনাকে চোখের সামনে মূর্তিমান হয়ে উঠতে দেখি। শরৎচন্দ্রের কোনো কোনো গল্প আছে জোর করে বানানো—অবাস্তব। কিন্তু রূপকথার গল্প পড়ে বাস্তব কি অবাস্তব সেই প্রশ্ন যেমন আমরা করি না, তেমনি শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পড়েও আমরা বাস্তবতা-অবাস্তবতার বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলি। বিমল মিত্রও এমনি একজন গল্পকার। হুমায়ূন আহমেদ শরৎচন্দ্র অথবা বিমল মিত্র নন; কিন্তু পাঠককে গল্পবন্দি করার জন্যে সূক্ষ্ম জাল কী করে ফেলতে হয়, তিনিও তা ভালো করেই শিখেছিলেন। শিখেছিলেন না-বলে বরং বলি এ ছিল তাঁর সহজাত। সেই জালে পড়ে তাঁর পাঠকরাও স্বপ্ন দেখতে পারেন, স্বপ্ন দেখেন।

পাঠকদের ধরে রাখার তাঁর আর-একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কৌশল হলো, তাঁর অসাধারণ রসিকতা। তাঁর অনেক নাটক দেখে হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলেছি। হাসির নাটকে হাসবো, সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর দুঃখের কাহিনির মধ্যেও থাকে হাসির খোরাক। সেই হাসি কান্নাকে আরও ঘনীভূত করে। তাঁর গানগুলো হৃদয়কে মোচড় দিত। তাঁর মৃত্যুর পর 'যদি মন কাঁদে তুমি চলে এসো এক বরষায়' অথবা 'চাঁদনি পসর রাইতে যেন আমার মরণ হয়' গান দুটো শুনে অনেকবার কেঁদেছি। তাঁর নাটকের বাড়তি আকর্ষণ এই গানগুলো। সবকিছু মিলে হুমায়ূন বাংলা সাহিত্যের একজন অসামান্য লেখক, ইতিহাস সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব।

বই পড়া আমাদের ধাতে নেই। এমন যে রবীন্দ্রনাথ, তিনিও নামেই বিশ্বকবি, নয়তো আমাদের কাছে তাঁর অস্তিত্ব 'আমাদের ছোটো নদী' অথবা 'তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে'র মতো দু-একটি শিশুপাঠ্য কবিতার দু-চার লাইন পর্যন্ত। নজরুল ইসলামও তথৈবচ। তিনি মুসলমানের ঘরে জন্মেছিলেন—এই নিয়ে যতই গর্ব করি না কেন, পড়ার বেলাতে আমাদের দৌড় 'লিচু চোর' কি 'ভোর হল দোর খোল' পর্যন্ত। যাঁরা আর-একটু বেশি খবর রাখেন, তাঁরা 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রথম স্তবকের দু-একটা লাইনও জানেন। আমাদের সেই পাঠবিমুখ বাঙালি জাতিকে সবার আগে বই-পড়া প্রথমে ধরিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। তাঁরই কল্যাণে মধ্যবয়সী মায়েরাও দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় যেতেন *দেবদাস* কি *মেজদিদি* নিয়ে। কিন্তু শরৎচন্দ্র মারা যান ৭৪ বছর আগে। তারপর এত দিনে তিন-চারজন ঔপন্যাসিক ছাড়া, অন্য যেসব কবি-সাহিত্যিক জন্মেছেন তাঁদের প্রায় সবার সীমাই ১১০০ কি ১২৫০। এসব সাহিত্যিককে যোজন যোজন পেছনে ফেলে হুমায়ূন আহমেদ এগিয়ে গেছেন অনেক দূরে। বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বহুলপঠিত লেখক তিনি। একটা অলস জাতিকে বইমুখী করার এই অসামান্য অবদান তাঁর।

তাঁর সাহিত্যের মান? মানের কথা বলছি না। তাঁর জনপ্রিয়তা এবং সাহিত্য কত দিন টিকে থাকবে, সেও দেখার বিষয়। কিন্তু তিনি আমাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক—এতে কোনো সন্দেহ নেই। তার ওপর তাঁর নাটক রাতের বেলা আড্ডা-দিয়ে-দেরিতে-ফিরে-আসা

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকগুলোকে ঘরমুখী করেছিল। তাঁর নাটকের একটি চরিত্র—'বাকের ভাই'য়ের ফাঁসি দেওয়া যাবে না বলে দেয়ালে দেয়ালে লেখা আর মিছিল বের করার মতো ঘটনা হুজুগে বাঙালিদের মধ্যেও অতিবিরল। আর, বিশ্বে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে আমার স্বল্প জ্ঞানে জানা নেই।

সেই হুমায়ূন মারাও গেলেন মেগা-সিরিয়ালের মতো নাটক ক'রে। তাঁর জনপ্রিয়তা এতই বেশি ছিল যে, তাঁর কোনো একটা খবর—নিদেন পক্ষে একটা অ-খবর, আর অ-খবরও তৈরি করা সম্ভব না-হলে গুজব, স্রেফ গুজব নির্মাণের কাজে ব্যস্ত থাকত পত্রিকা আর ইলেকট্রনিক মিডিয়া। কোনো বাঙালি সাহিত্যিকের ভাগ্যে মিডিয়ার এত হৈচৈ জোটে নি—এত পত্রপত্রিকা অথবা এত টেলিভিশন চ্যানেল কোনোকালেই ছিল না।

তিনি যখন নিউইয়র্কে চিকিৎসা করাতে যান তখন তাঁর ক্যান্সার চতুর্থ পর্বে পৌঁছেছিল। তার মানে যেখানে গোড়ায় ক্যান্সার হয়েছিল, সেই কোলোন বা অন্ত্র থেকে তা লিভারে ছড়িয়ে পড়েছিল। তা ছাড়া, আগে থেকেই তাঁর ছিল ডায়াবেটিস। হৃৎপিণ্ডে বাইপাস করিয়েছিলেন অনেক আগে। এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জীবনবাদী, আশাবাদী হুমায়ূন একটা-দুটো নয় বারোটা কেমো নিয়েছিলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় রক্তে লোহিত কণিকায় ঘাটতি পড়েছিল দুই-এক বার। ওষুধ দিয়ে তা বাড়াতে হয়। বারোটা কেমো নিয়ে তাঁর অন্ত্রের এবং লিভারের ক্যান্সার সংকুচিত হয়েছিল, কিন্তু বিলীন হয় নি।

অতঃপর ? অরাল কেমো নিয়ে বছর দুয়েক বেঁচে থাকতে পারতেন, নয়তো পারতেন ঝুঁকি নিয়ে অস্ত্রোপচার করিয়ে বেশি দিন বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে। সেটাই করেছিলেন তিনি। এটা সুবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত বলে আমি মনে করি না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অপারেশন হলো। দ্বিতীয় সার্জারির কিছুদিন পর তাঁর কিডনি বেঁকে বসেছিল। এ ছিল : হুমায়ূন নামক মহানাটকের শেষ অঙ্কের সূচনা। আর, এদিকে, নিউইয়র্কের উল্টো পিঠ বাংলাদেশে শুরু হলো কদিনের জন্যে মিডিয়ার মোচ্ছব। যে যা পারছে লিখছে; যে যা পারে বলছে, হুজুগী এবং গুজবী মধ্যবিত্ত বাঙালিদের ঘরে ঘরে আলোচনার প্রধান উপাদান জুটলো। প্রত্যেকেই বিশেষজ্ঞ, প্রত্যেকেরই একটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য আছে, অনেকে চূড়ান্ত ফলাফলও বলে দিচ্ছেন।

একে-একে তিনটা অস্ত্রোপচার হয়েছিল তাঁর ওপর। ডাক্তাররা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কৃত্রিমভাবে ঘুম-পাড়িয়ে রাখা হুমায়ূন ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকলেন অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে। তৃতীয়বার অস্ত্রোপচার করার আগেই রক্তে সেপ্টিসীমিয়া হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে অলৌকিক ঘটনা ছাড়া কেউ ফিরে আসে না। হুমায়ূন অসামান্য মানুষ ছিলেন, কিন্তু অতিমানব ছিলেন না। সুতরাং তিনিও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন মৃত্যুর কাছে।

মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর এই লড়াই আমি প্রত্যক্ষ করি নি। আমি লন্ডন থেকে ফোন করে খবর নিতাম ড. পূরবী বসুর কাছ থেকে। বোধহয় তিন/চার দিন ছাড়া, অপারেশন-পরবর্তী দিনগুলোতে রোজই আমি ফোন করতাম পূরবীকে। তাঁকে এবং তাঁর স্বামী ড. জ্যোতিপ্রকাশ দত্তকে বিরক্ত করার জন্যে নিজেকে অপরাধী মনে হতো। শাওনকেও কয়েকবার ফোন করেছি। কিন্তু ওঁর ব্যস্ততার কথা ভেবে বিরক্ত করতে মোটেই ভালো লাগত না।

জীবদ্দশায় হুমায়ূনের সঙ্গে আমার বড়ো একটা যোগাযোগ হতে পারে নি। তিনি ঢাকায়, আমি লন্ডনে। তার ওপর, তাঁর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর তিনি বেঁচেছিলেন মাত্র তিন/চার বছর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু নিউইয়র্কের হাসপাতালে অজ্ঞান হুমায়ূনের সঙ্গে মনে মনে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম। রক্তচাপ বহাল রাখা যাচ্ছে না—সর্বোচ্চ মাত্রায় ওষুধ দিয়েও এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য লক্ষণের কথা শুনে বুঝতে পারছিলাম, তিনি নিশ্চিত এগিয়ে যাচ্ছেন মৃত্যুর দিকে। কেবল আশা করতাম, কোনো একটা অলৌকিক ঘটনায় তিনি যদি হঠাৎ জেগে ওঠেন! উঠলেন না। কিন্তু হৃদয়ে তিনি জেগে থাকবেন, জেগে থাকবেন যত দিন আমি জেগে আছি।

পুনশ্চ

হুমায়ূন আমার বছর সাতেকের ছোট। আমাকে মুরশিদ ভাই বলে ডাকতেন। সেই সুবাদে তাঁর পরিবার সম্পর্কে একটা কথা না-বলে পারছি না।

তিনি দারুণ জনপ্রিয় এবং বহু-গুণান্বিত ব্যক্তি ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করার যে-ঘটনা ঘটান, সেটাকে অনেকেই প্রশংসার চোখে দেখতেন না। সত্যি বলতে কী, অস্বাভাবিক না-হলেও, অনেকে বরং এর নিন্দাই করতেন, এখনো করেন। কিন্তু এর জন্যে দায়ী কে? এবং বেশি দায়ী কে? আমি এ ঘটনার আগামাথা কিছুই জানিনে, কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যা সাধারণত ঘটে, তা থেকে মনে হয়, পুরুষরাই বেশি দায়ী। তা না হলে হুমায়ূনের কন্যার বান্ধবী বরমাল্য নিয়ে হুমায়ূনের দিকে এগিয়ে এসেছিলেন বলে আমার মনে হয় না। দায় এজন্যে হুমায়ূনেরই বেশি—এটা অনুমান, তবে সঙ্গত অনুমান।

তাঁর এই বিয়ের ফলে, যাঁকে প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন সেই প্রথমা স্ত্রী এবং সেই ঘরের চার সন্তানই দারুণ কষ্ট পেয়েছিলেন। সন্তানরা অভিমান করে দূরে সরে গিয়েছিল। তাঁদের জন্যে হুমায়ূনের মন কাঁদতো, ফলে সেই কষ্ট তিনি পেয়েই গেছেন। তবে তাঁরা তো কেবল তাঁদের মায়ের সন্তান নন, পিতারও সন্তান। একেবারে মৃত্যুর পরে হাজির না-হয়ে পিতাকে ক্ষমা করে দিয়ে আর-একটু আগে পিতার কাছে এসে একবার দেখা করলে তাঁদের পিতা যে কত সুখী হতেন, সেটা আমরা কেবল অনুমান করতে পারি। আজ তাঁরা ফিরে এসেছেন, তা দেখে আমরাও আনন্দে এবং দুঃখে অশ্রুসিক্ত হই। কিন্তু তাঁর দুটি একেবারে শিশুপুত্রদের কথা ভুলে যাওয়াটা নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত হবে। বড় চার সন্তানেরও এই দুই শিশুপুত্রকে ভাই বলেই কোলে তুলে নিতে হবে। পিতার অপরাধকে অসহায় ভাইদের ওপর চাপিয়ে দিলে সেটা অবিচার হবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাসিন্ধুর ওপারে তুমি

গোলাম সারওয়ার

স্মৃতিকণাগুলো বিষাক্ত কীটের মতো হৃদয়কে এভাবে দংশন করছে কেন হুমায়ূন ভাই ? কেন আপনার হাসিমাখা মুখটি বারবার মনের আয়নায় রোদের মতো উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠার পর ধীরে ধীরে শ্রাবণধারায় ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে ? কোথায় হারিয়ে যাচ্ছেন হুমায়ূন ভাই, কোথায় কোন দূরবর্তী অচেনা দ্বীপে ? আপনার দরাজ কণ্ঠ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে দূরদিগন্তে হারিয়ে যাচ্ছে ? আপনি না-ফেরার দেশে চলে যাচ্ছেন ? বৃহস্পতিবার শেষ রাতে *সমকাল* থেকে বাসায় ফিরে শয্যাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের রাজপুত্র হুমায়ূন ভাই আপনি যেন অলক্ষে আমার আধো ঘুম আধো জাগরণের স্বপ্নলোকে রহস্যপুরুষের মতো বিচরণ করছেন। আপনাকে স্পর্শ করতে গিয়ে শরীর শিহরিত। আপনি যেন অস্ফুট কণ্ঠে বলছেন, আমি 'আসব না ফিরে কোনোদিন'।

হুমায়ূন ভাই, আমার এই অক্ষম লেখাটি একজন সম্পাদকের পেশাগত দায়িত্ব পালনের কোনো অংশ নয়। আপনাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা একটি আবেগঘন সম্পাদকীয় উৎসর্গ করেছি। এই লেখাটি আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয়, অশেষ শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন এক প্রতিভাবান অনন্যসাধারণ মানুষ, হুমায়ূন ভাই আপনার স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত। মাঝে মাঝে মনে হয়, সাংবাদিকরা বড় পাষাণ হৃদয়ের মানুষ। অন্যদের মতো তাদেরও গভীর শোক আচ্ছন্ন করলেও তা ক্ষণিকের জন্য। পেশাগত বাস্তবতায় তারা হৃদয় খুঁড়ে আর 'বেদনা জাগাতে' ভালোবাসে না। বৃহস্পতিবারের রাতটি ছিল আমার জন্য অন্যরকম। ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের একটি সরাসরি টক শো চলার সময় আপনার চিরবিদায়ের মর্মভেদী সংবাদ শুনে অনুষ্ঠান শেষে *সমকালে* ফিরে এসে দেখি, পুরো বার্তাকক্ষে কেউ যেন শোকের চাদর বিছিয়ে দিয়েছেন। আপনি এভাবে না-ফেরার দেশে চলে যাবেন—ভাবতে চাই নি। *সমকালের* দ্বিতীয় সংস্করণের বৃহদাংশেই আপনার মহাপ্রয়াণের খবরটি ছাপা হলো।

বার্তাকক্ষে অনেকগুলো টেলিভিশন সেটে বিভিন্ন চ্যানেলজুড়ে শুধুই আপনি। আপনার প্রিয়জনরা স্টুডিওতে ছুটে এসেছেন তাঁদের প্রিয়জন সম্পর্কে তাৎক্ষণিক কিছু মন্তব্য জানাতে। একটি চ্যানেলে শুনলাম, আমাদের আর এক প্রিয় সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের আপনার উদ্দেশে নিবেদিত অকপট প্রশংসার পঙ্‌ক্তিমালা। তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে বলতে চাই, আমাদের সাহিত্যে আর এক হুমায়ূন কবে জন্ম নেবেন আমরা জানি না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিবিসিকে বললেন, শরৎচন্দ্রকে ছাড়িয়ে গেছে হুমায়ূন। এ কথা কে অস্বীকার করবে হুমায়ূন ভাই, আপনি বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করে অনায়াস ভঙ্গিতে নির্ভার ভাষায় সুখ-দুঃখের যে কথকতা নির্মাণ করেছেন তা কোটি কোটি পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। *সমকাল*

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুক্রবার তিনটি সংস্করণ প্রকাশ করেছে। সর্বশেষ সংস্করণে আপনার চিরপ্রস্থানের শিরোনাম 'শেষের খেয়ায় হুমায়ূন'। সত্যি 'শেষ পাড়ানির কড়ি কণ্ঠে নিয়ে' আপনি শেষের খেয়ায় চড়ে মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে স্বপ্নলোকে চলে গেলেন হুমায়ূন ভাই।

আমাদের অনেকের মতো রবীন্দ্রনাথে বড় আচ্ছন্ন আপনি। রবীন্দ্রসঙ্গীত বারবার ঘুরেফিরে এসেছে আপনার উপন্যাসে, গল্পে, নাটকে। এমনকি শিরোনামেও। ভালোবাসতেন বাংলার লোকগান। বাউল সাধকদের গান। উকিল মুন্সি, শাহ আবদুল করিম প্রমুখ বাংলার লোকসংগীত স্রষ্টাদের আপনিই তো চলচ্চিত্রের গানে এনে অমর করেছেন। কী করে তা ভুলবে লোকজীবন সম্পৃক্ত মানুষ? কুদ্দুস বয়াতির মতো কত আবিষ্কার আপনার!

জ্যোৎস্না ছিল আপনার বড় প্রিয়। অথচ জ্যোৎস্নার বিপরীত অন্ধকার জগতে চলে গেলেন? *জোছনা ও জননীর গল্প*-এর বিশাল কলেবর উপন্যাসে একাত্তর নিয়ে আপনিই তো বলেছেন বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ শোক আর গৌরবের কথা। সেই কত আগে যখন যুদ্ধাপরাধীদের নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য নেই তখন টিভি নাটকে পাখির ঠোঁটে সংলাপ দিলেন আপনি, 'তুই রাজাকার'। এই কটূক্তি ছড়িয়ে গেল দেশময়।

বাংলার তরুণ সমাজে বই পড়ার অভ্যাস-ঐতিহ্য যখন হারিয়ে যেতে বসেছিল, তখন তো আপনিই তরুণদের বইমুখো করলেন, বইমেলা জমে উঠল তো আপনাকে ঘিরেই। ভারতীয় লেখকদের বইয়ের প্রচ্ছদে ধুলো জমলেও আপনার বই নিমিষেই বিক্রি। প্রকাশনাও যে লাভজনক শিল্প হয়ে উঠতে পারে সেই পথও আপনি দেখিয়ে গেছেন, এই ঋণ কি শোধ হবে কোনোদিন?

হুমায়ূন ভাই, আপনার কাছ থেকেই তো আমরা জানলাম কী করে মনোহারী গল্প আর ক্লাসিকস্, ইতিহাসাশ্রয়ী গল্প একই সমান্তরালে রচিত হতে পারে পাঠকপ্রিয় প্রাঞ্জল ভাষার উপন্যাস।

হুমায়ূন ভাই, মনে পড়ে সেদিন আপনার স্বপ্নপুরী নুহাশপল্লীতে আমি, আমার স্ত্রীসহ বেশ কয়েকজন ঘনিষ্ঠজনের সঙ্গে আপনার, আপনার প্রিয়তমা স্ত্রী, ছায়াসঙ্গিনী শাওনের সারা দিনের মাতাল করা কয়েক ঘণ্টার কথা। সেদিন ছিল শুক্রবার। আকাশে কালো মেঘের ছায়া, কখনো রোদের লুকোচুরি। নুহাশপল্লী জুড়ে আপনার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য অনেক চ্যানেলের রিপোর্টার-ক্যামেরাম্যানদের ভিড়। সেদিনই আমার প্রথম 'নুহাশপল্লী' দর্শন। ঘুরে ঘুরে নুহাশপল্লী দেখে মুগ্ধ হলাম আপনার বৃক্ষপ্রেম লক্ষ করে। গল্প-গুজবে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তর। সবকিছু ছাপিয়ে আপনার বেঁচে থাকার অশেষ আগ্রহ, লেখার প্রতি অনুরাগ। আপনার সেই স্বগতোক্তি—কেন মানুষ শত শত বছর বাঁচে না? আপনার এই উক্তি এখন হৃদয়ে হাহাকারের মতো বাজে। আপনি আমার গ্রামের বাড়ি বরিশালের বানারীপাড়ায় যেতে চেয়েছিলেন। সেদিনও মনে করিয়ে দিলেন সে কথা। বললেন, সারওয়ার ভাই, এবার আমেরিকা থেকে ফিরে এসে আমরা আপনার প্রিয় বানারীপাড়ায় যাব। এবার কিন্তু ফাঁকি দিতে পারবেন না। হুমায়ূন ভাই, আপনাকে ফাঁকি দিতে পারলাম না। আপনিই আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন। বানারীপাড়ার মানুষ আপনার শ্যামল ছায়া দেখতে পেল না।

আপনার ও শাওনের সঙ্গে শেষ দেখা বসুন্ধরা সিটির সিনেপ্লেক্স প্রেক্ষাগৃহে। আপনার সর্বশেষ ছবি 'ঘেটুপুত্র কমলা'র একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে একান্ত কাছের কিছু মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আপনি। নুহাশপল্লীতে আপনাকে যেমন প্রমোদে মন ঢেলে দিতে দেখেছিলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেদিনও দেখলাম অভিন্ন দৃশ্য। ভক্তদের সঙ্গে অবিরাম কথা বলছেন, অটোগ্রাফ দিচ্ছেন। কোনো ক্লান্তি নেই। কে বলবে ক্যানসার তখন আপনার জীবনীশক্তি গোপনে নিঃশেষ করে চলেছে! 'ঘেটুপুত্র কমলা'র কুশীলবদের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে আপনি আপনার স্বভাবসুলভ উপভোগ্য কৌতুকে হাসির ঝর্ণাধারা ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। তখন ক্ষণিকের জন্যও ভাবি নি আপনার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা। আপনার সর্বশেষ এই ছবিটি এখনো মুক্তি পায় নি। বৃহত্তর ময়মনসিংহের হাওর এলাকায় বড়লোকের বিকৃত লালসার শিকার ঘেটু গানের গায়ক কমলার জীবন-ট্র্যাজেডি নিয়ে নির্মিত ছবিটি দর্শককে মুগ্ধ করবে। এই মুগ্ধতার কথা আপনি জানতে পারবেন না।

হুমায়ূন ভাই, ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতর সঞ্চিত ব্যথা অশ্রু হয়ে ঝরে পড়তে চায়। আগামী বইমেলায় আপনাকে দেখা যাবে না। আপনার অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য ভক্তদের দীর্ঘ লাইন হবে না। এই মুহূর্তে *সমকালের* ঈদসংখ্যা প্রকাশ নিয়ে আপনার অনুজতুল্য মাহবুব আজীজের সীমাহীন ব্যস্ততা। হুমায়ূনবর্জিত ঈদসংখ্যা কখনো কল্পনা করে নি *সমকাল*। আপনি এবারও বলেছিলেন, বেঁচে থাকলে *সমকালের* জন্য লিখব। বরাবরের মতো এবারও 'সমকাল ঈদসংখ্যা' বেরোবে। আপনি থাকবেন না। আমরাও আপনার পথ ধরে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাব। আমাদের কেউ মনে রাখবে না। মহাকালের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে আপনি, আপনার সাহিত্য অমর হয়ে থাকবে।

আপনাকে হারিয়ে আমরা ভালো নেই। মহাসিন্ধুর ওপারে আপনি ভালো থাকুন হুমায়ূন ভাই। খুব ভালো থাকুন।

জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার

শুক্রবারের সকাল। তবু মাশআল্লাহ কম যানজট ছিল না। গাজীপুর চৌরাস্তা পেরিয়ে বেশ দূরে হোতাপাড়া বাজার থেকে পশ্চিমে বাঁক নিয়ে *সমকালের* কাহিল মাইক্রোবাসটি মোটামুটি চলছিল। কিছুদূর যেতেই বুঝলাম, এ বড় কঠিন যাত্রা। রাস্তার দুরবস্থা দেখে মনে হলো, আজ যদি যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরকে আমাদের সঙ্গী করতে পারতাম! স্বচক্ষে দেখতেন আমাদের প্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদের সুখের ঠিকানা 'নুহাশপল্লী'তে যেতে কী কঠিন পরীক্ষা দিতে হচ্ছে আমাদের। আমাদের মানে আমি, আমার স্ত্রী সালেহা সারওয়ার, সমকালের ফিচার সম্পাদক মাহবুব আজীজ এবং তার দু'সন্তান রূপকথা ও নীলপদ্মসহ সহধর্মিণী আলপনা, *সমকালের* আলোকচিত্র সাংবাদিক রাজীব। 'নুহাশপল্লী'র বন্ধ দরোজা আমাদের জন্য খুলে যেতে যেতে দেখলাম হুমায়ূন আহমেদের প্রিয়জন সালেহ চৌধুরী ও একদা আলোড়ন সৃষ্টিকারী সাময়িকী সচিত্র *সন্ধানীর* সম্পাদক গাজী শাহাবুদ্দীন আহমদও দাঁড়িয়ে। 'নুহাশপল্লী'তে ঢুকলাম। না, 'ঢুকলামে'র মতো একেবারেই নিরাভরণ রুগ্ন কোনো শব্দ 'নুহাশপল্লী'র সঙ্গে বেমানান। তাই বলব, নুহাশপল্লীর সুরক্ষিত সিংহদ্বার দিয়ে 'প্রবেশ' করে দেখলাম বিশাল 'নুহাশপল্লী'তে তাঁর ভক্ত এবং চলচ্চিত্র ইউনিটের লোকজনের ব্যস্ত উপস্থিতি। 'জননী বঙ্গভূমি'র 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়' গ্রামের যে দৃশ্যপট রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন তা আমাদের হৃদয় জুড়ে, তার সঙ্গে হুমায়ূনের স্বপ্নের 'নুহাশপল্লী'র চমৎকার সাদৃশ্য। আজ থেকে ১৫ বছর আগে 'নুহাশপল্লী'র জন্ম। এখন ফলে-ফুলে, পত্র-পল্লবে সুশোভিত নুহাশপল্লী। গাছগাছালি, বিশেষ করে ঔষধি 'বৃক্ষে'র

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাজানো বাগান। হুমায়ূন জানালেন, কমপক্ষে ২০০ ঔষধি গাছ রয়েছে এখানে। নিজের কটেজে বৈঠকি আড্ডায় হুমায়ূন নুহাশপল্লীর নানা বৈচিত্র্যের কথা বললেন। জানালেন, বিদেশ থেকে একটি মজার গাছ এনেছিলেন 'পতঙ্গভুক'। কীটপতঙ্গ কাছে এলেই অবলীলায় মুখের মধ্যে নিয়ে কিছুক্ষণ পর মুখ খুললে দেখা যায় কীট কিংবা পতঙ্গটি সম্পূর্ণ হজম হয়ে গেছে। গাছপালার ন্যায় পশুপাখিকেও দারুণ ভালোবাসেন লেখক। নুহাশপল্লীতে দুটি লিচুগাছ রয়েছে। একদিন দেখলেন পাখি যাতে লিচু 'ধ্বংস' করতে না পারে সে জন্য পাকা গোলাপি লিচুতে ভরপুর দুটি গাছই জাল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এতে ক্ষুণ্ন নয়, ক্ষুব্ধ হলেন হুমায়ূন। বললেন, একটি থেকে জাল সরিয়ে নাও। একটি গাছের লিচু খাব আমরা। অন্যটার লিচু পাখিদের জন্য। এই হচ্ছে হুমায়ূনের পাখিপ্রেম। গল্পকথায় সময় দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছিল। হুমায়ূন আহমেদের মতো গল্পকার হলে আমি চমৎকার সুখপাঠ্য রচনা লিখতে পারতাম। দুর্ভাগ্য আমি লেখক নই। সামান্য সাংবাদিক। 'সেলিব্রেটির' সঙ্গে কথা বলার আগেই সংবাদ তৈরি করার প্রসঙ্গগুলো মনে জমা থাকে। তাই তাঁর আলোচিত পুস্তক 'দেয়াল' প্রসঙ্গ তুললাম। কয়েক দিন আগে হুমায়ূনের সঙ্গে ধানমণ্ডির ফ্ল্যাটে 'দেয়াল' প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল। পাশে ছিলেন হুমায়ূনপত্নী গায়িকা-নায়িকা শাওন। 'দেয়াল' আদালত পর্যন্ত গড়াবার কারণ সম্পর্কে বলেছিলাম 'প্রায় বর্তমানের' কোনো সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে উপন্যাস লেখা ঝুঁকিপূর্ণ। বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের সময়কার লাখ লাখ মানুষ এখনো বেঁচে আছেন। এ নিয়ে নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে। জাতির জনকের জন্য কোটি কোটি মানুষের মনে শ্রদ্ধা-ভালোবাসার পবিত্র একটি স্থান সংরক্ষিত। উপন্যাসের যৌক্তিক প্রয়োজনেও এর বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি মানুষ মেনে নেবে না। *বাদশাহ নামদার* উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অতীতের। 'দেয়াল' তা নয়। আমি কৃতজ্ঞ হুমায়ূন আহমেদ আমার এ বক্তব্য যথার্থ মনে করে জানিয়েছেন, তিনি 'দেয়াল' আপাতত লিখছেন না। তবে তিনি এ কথাও বললেন, যেসব প্রাসঙ্গিক পুস্তকের ওপর ভিত্তি করে তিনি 'দেয়াল' লিখছিলেন, সে বইগুলো পাঠকের হাতে রয়েছে।

কেমো দেওয়ার কারণে হুমায়ূনের কেশরাজি আগের মতো ঘন নেই। তবে স্বাস্থ্য আগের মতোই সুঠাম। চলনে-বলনে ক্লান্তির ছাপ নেই। আগামী ১২ জুন মোটামুটি জটিল একটি অস্ত্রোপচার। তাই মাকে দেখতে, তাঁর দোয়া নিতে তাঁর দেশে ফেরা। আজ শনিবার সকালে নিউইয়র্কের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করবেন। সেখানে ভারতীয় চিকিৎসক ড. জেইন তাঁর শরীরে অস্ত্রোপচার করবেন। অস্ত্রোপচারের পর আরও কয়েকটি কেমো দিতে হতে পারে। কথা যখন বলছিলাম হুমায়ূন পরিবারের একান্ত ঘনিষ্ঠ মাজহার ও শাওন অলক্ষে আমাদের ছবি তুলছিলেন। একপর্যায়ে দেশের মেধাবী আলোকচিত্রী নাসির আল মামুনও কিছু ছবি তুললেন। হুমায়ূনকে বললাম, আপনার মনের জোর রয়েছে, মানুষের দোয়া ও ভালোবাসা রয়েছে। আপনি আবার কোটি প্রিয়জনের মধ্যে ফিরে আসবেন। আপনার শ্রেষ্ঠ রচনাটি লেখা তো এখনো বাকি। নিজের অলক্ষে তার চোখে কি অশ্রুবিন্দু জমা হলো, জানি না। তবে হুমায়ূন একটু ধরা গলায়ই বললেন, মানুষের বয়স মাত্র ৭০-৮০ কেন? এত স্বল্প সময়, জীবনের অনেক স্বপ্ন তো অপূর্ণ থেকে যায়। আমি দীর্ঘদিন বাঁচতে ও অবিরাম লিখে যেতে চাই। মানুষ কেন কাছিমের মতো ২০০-৩০০ বছর বেঁচে থাকে না!

হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে সাংবাদিক গোলাম সারওয়ারের কথা এখানেই শেষ। এরপর হুমায়ূনকে বাদ দিয়ে কথা বললাম শাওনের সঙ্গে, হুমায়ূনের স্ত্রী ও ছায়াসঙ্গিনী। হুমায়ূনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যানসার হয়েছে এই আকস্মিক খবরে কি তুমি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলে ? 'না সারওয়ার ভাই, বিশ্বাস করতে পারি নি ক্যানসারের মতো বড় অসুখ হুমায়ূনের দেহে বসবাস করতে পারে। যখন নিশ্চিত হলাম, তখন নিজেকে শাসন করে বললাম, শাওন, তোমাকে ভেঙে পড়লে চলবে না। হুমায়ূনের মনের জোর বাড়াতে তোমার মন দ্বিগুণ শক্ত করতে হবে। মেইলে, ফেসবুকে হুমায়ূনের অসংখ্য ভক্ত তাদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, দোয়া জানিয়েছে। মানুষের এই আকুল প্রার্থনা আল্লাহ নিশ্চয়ই শুনবেন। আমি মনে মনে বলেছি, আল্লাহ, আমার জীবন থেকে যত খুশি বছর কেটে নিয়ে হুমায়ূনকে দীর্ঘজীবী করো। কারণ একজন শাওন একটু আগে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে কোনো ক্ষতি হবে না। লেখক হুমায়ূনকে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে হবে।' আমি বললাম, 'তোমার মনের জোর আছে জানি, তবু ক্যানসারের কথা শুনে নিভৃতে কি কখনো অশ্রুপাত করেছ ?' 'না, করি নি। হুমায়ূন যেদিন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আমার সামনে এসে বলবে, কুসুম, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। তখন আমি, হুমায়ূনের কুসুম, প্রাণভরে মনের আনন্দে কাঁদব, শুধু কাঁদব।'

হুমায়ূন, রবীন্দ্রনাথের মতো করে বলতে চাই, জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আপনি যেদিন ফিরে আসবেন, সেদিন আমরা শাওনের মতো কাঁদব না। আমরা হাসব, প্রাণভরে হাসব। কারণ আমাদের প্রিয় লেখক তাঁর শ্রেষ্ঠ লেখাটি লেখার জন্যই আমাদের মাঝে ফিরে এসেছেন। দীর্ঘজীবী হোন হুমায়ূন।

['মহাসিন্ধুর ওপারে তুমি' ও 'জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার' শিরোনামের লেখা দুটি দৈনিক *সমকালে* যথাক্রমে ২১ জুলাই ২০১২ ও ২ জুন ২০১২ তারিখে প্রকাশিত হয়।]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালো থাকুন

জাহিদ হাসান

হুমায়ূন আহমেদকে আমি ডাকতাম 'হুমায়ূন ভাই' বলে।

হুমায়ূন ভাইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় মূলত তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে। তাঁর লেখা পড়া আর নাটক দেখার মাধ্যমে। আর ব্যক্তি হুমায়ূনের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে '৯৫-৯৬ সালের দিকে। সেই সময়ে গুণী নির্মাতা হিসেবে হুমায়ূন ভাই রীতিমতো বিখ্যাত। আর আমি সবেমাত্র অভিনয় শুরু করেছি।

হুমায়ূন ভাই তাঁর একটি নাটকের জন্য একজন অভিনেতার খোঁজ করছিলেন। বিটিভির তারা ভাই একদিন আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, দেখতে তো বেশ ভালোই, কিন্তু অভিনয় ঠিকমতো পারবে তো ? তখন তারা ভাই খুব উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, ও মঞ্চে দুর্দান্ত পারফরমেন্স করে। টিভি নাটকও করছে। হুমায়ূন ভাই তখন বললেন, মঞ্চে কেমন করে সেটা বিষয় নয়, ক্যামেরার সামনে কেমন সেটাই বিষয়। যাই হোক, কথায় কথায় একসময় তিনি বলে উঠলেন, শোনো আমার বাড়ি নেত্রকোনা। ঘাড়ের তিনটা রগ ত্যাড়া। উত্তরে আমি বললাম, জানি। তিনি অবাক হয়ে বললেন, জানি মানে ? আমি তখন বললাম, আমার বাড়ি সিরাজগঞ্জ। আমার যদি রগ ত্যাড়া হতে পারে অন্য এলাকার মানুষেরও রগ ত্যাড়া হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তিনি একটু সময় আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, তুমি কখনোই বানরের বাচ্চার মতো থাকবে না, সবসময় বাঘের বাচ্চার মতো থাকবে। হঠাৎ করেই কথাটির অর্থ বুঝতে পারলাম না। অর্থ জানতে চাইলে তিনি বললেন, বানর যখন তার বাচ্চাকে নিয়ে এক ডাল থেকে অন্য ডালে ছুটে বেড়ায় তখন বাচ্চাটি তাকে এমনভাবে আঁকড়ে থাকে যে বিভিন্ন প্রতিকূলতায় যা করা উচিত মা বানরটি সেটা করতে পারে না। এর ফলে বানরের বাচ্চা মারা যায় বেশি। কিন্তু বাঘের বাচ্চা কখনই তার মা'কে আঁকড়ে ধরে থাকে না। বরং মা'ই বাচ্চাকে আঁকড়ে থাকে। যখন যেভাবে প্রয়োজন সেভাবেই বাচ্চার দেখাশোনা করতে পারে। যে কারণে বাঘের বাচ্চা মারা পড়ে কম। অতএব আমাকে তোমার আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে না, আমিই তোমাকে ধরে রাখব। এভাবেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। এর কিছুদিন পরেই তাঁর সঙ্গে কাজ করি 'নক্ষত্রের রাত' নাটকে। পরে তাঁর অসংখ্য নাটকে আমি কাজ করেছি। 'শ্রাবণ মেঘের দিন' এবং 'আমার আছে জল' চলচ্চিত্রেও তাঁর মতো নির্মাতার সঙ্গে কাজ করতে পেরেছি।

হুমায়ূন ভাই অনেক বড় মাপের নির্মাতা ছিলেন। আর তাঁর লেখা সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছুই নেই। তাঁর বেশিরভাগ লেখাই অসাধারণ। তাঁর লেখা নিয়ে আমি নাটকও নির্মাণ করেছি। অন্য কেউ তাঁর লেখা নিয়ে নাটক বা চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে চাইলে তিনি খুব শঙ্কিত হতেন—যদি সেই নির্মাতা লেখার মূল ভাবনাটাকে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে না পারেন! আমার ক্ষেত্রেও এর

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যতিক্রম ঘটে নি। আমি যখন তাঁর লেখা নিয়ে নাটক নির্মাণের ইচ্ছে প্রকাশ করলাম, তিনি বিষয়টি নিয়ে বেশ দ্বিধান্বিত ছিলেন। পরে যখন তাঁর লেখা নিয়ে 'ইবলিশ' নাটকটি নির্মাণ করে তাঁকে দেখালাম, তিনি অনেক প্রশংসা করলেন। এরপর থেকে আমার ক্ষেত্রে তাঁর আর কোনো দ্বিধাই কাজ করে নি। যাই হোক, একটা বিষয় সবসময় আমার মনে হয়েছে, তিনি আমাকে শুরু থেকেই অত্যন্ত স্নেহ করতেন, অনেক বেশি ভালোবাসতেন। তাঁর সঙ্গে যখন কাজ শুরু করি, তার অল্প কিছুদিন পরেই ভারতের আগ্রায় ইয়ানির প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তখন অনেকেই যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেখানে যাওয়ার মতো আর্থিক অবস্থা তখন আমার ছিল না। পরে দেখলাম আমার অজান্তেই হুমায়ূন ভাই অনুষ্ঠানটিতে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আর একবার হিমু সিরিজের একটি বই তিনি আমাকে উপহার দিলেন। বইটির নাম 'হিমুর দ্বিতীয় প্রহর' (১৯৯৭)। আমি বললাম, ভাই, একটা অটোগ্রাফ দিয়ে দেন। তা হলে সবাই বুঝবে এটা আপনার দেওয়া উপহার। তিনি বললেন, এই বইটিতে কোনো অটোগ্রাফ লাগবে না। বইটির পৃষ্ঠা উল্টাতেই কারণটি বুঝতে পারলাম। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে আমাকে। উৎসর্গপত্রে লেখা রয়েছে :

> জাহিদ হাসান, প্রিয় মানুষ
> মানুষ হিসেবে সে আমাকে মুগ্ধ করেছে,
> একদিন হয়তো অভিনয় দিয়েও মুগ্ধ করবে।
> (দ্বিতীয় বাক্যটি দিয়ে তাকে রাগিয়ে দিলাম, হা হা হা)

এরকম হাজারো স্মৃতি রয়েছে তাঁকে ঘিরে। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখেও তা শেষ করা যাবে না।

হুমায়ূন ভাইয়ের এভাবে চলে যাওয়া মেনে নিতে কষ্ট হয়। তবে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে ঘিরে যা কিছু ঘটছে এটাও কাম্য নয়। তিনি কোনো মহামানব ছিলেন না। তিনি রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন। তাঁকে যারা মহামানব বানাতে চায় সেটাও যেমন ঠিক না, যারা তাঁকে খারাপ মানুষ বানাতে চায় সেটাও ঠিক না। বেসিক্যালি তিনি ভালো মানুষ ছিলেন। যদিও অনেক সময় তিনি হঠাৎ রেগে যেতেন; ভালোভাবে না বুঝেই অনেক রাগারাগি করতেন। তাঁর মধ্যে একধরনের অহংকারও ছিল। অবশ্য এ অহংকার তাঁকে মানায়। তবে এটাও সত্য এ অহংকারটা একটু কম হলে তিনি আরও অনেক বেশি মানুষের মনের মাঝে জায়গা করে নিতে পারতেন। অবশ্য তিনি এখনো অগণিত মানুষের মনের মণিকোঠায় স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত আছেন তাঁর অসংখ্য সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে।

হুমায়ূন ভাইয়ের মতো একজন গুণী মানুষের প্রস্থানে আমাদের শিল্প-সাহিত্য অঙ্গনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা আসলে কিছুতেই পূরণ হওয়ার নয়। শুধু দোয়া করি, তিনি যেখানেই থাকুন আল্লাহ তাঁকে ভালো রাখুক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদ : এক অনন্য উদাহরণ

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

একজন সৃষ্টিশীল মানুষ তার চারপাশ, পরিবেশ, সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি পরিবার থেকে নানা উপাদান আহরণের মাধ্যমে নিজ সৃষ্টিকর্মকে সাধারণের কাছে অসাধারণরূপে হাজির করেন। এ প্রক্রিয়া অনুসরণে তাঁকে অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হয়। যিনি যত সহজে এ পথ অতিক্রম করবেন তাঁর স্থিতি এবং স্থায়িত্ব তত বেশি রয়ে যায় সমাজ, রাষ্ট্র এবং সর্বসাধারণের মনে। আপন সৃষ্টিশৈলীর মাধ্যমে সৃষ্টিশীল ব্যক্তিটি গভীর ছাপ রেখে যান ধরাধামে। হুমায়ূন আহমেদ, সেই হাতেগোনা সৃষ্টিশীল মানুষের একজন; যাঁর অনন্য লেখনীশক্তির প্রভাবে বাংলা ভাষাভাষী লাখো পাঠক মুগ্ধ হয়ে থেকেছে, অপেক্ষায় থেকেছে তার নবসৃষ্টির ধারায় অবগাহনের জন্য।

এ কথাগুলো যখন বলছি তখন হুমায়ূন আহমেদ আর আমাদের মাঝে নেই। সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার অবিভাজ্য নিয়মে তাঁকেও মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। হুমায়ূন আহমেদের মতো অদম্য মানসিকতার ব্যক্তিত্বকে অনেকটা অকালেই হারিয়েছি আমরা। জীবদ্দশায় তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, যা অতুলনীয়। শিল্প-সংস্কৃতির যে মাধ্যমেই তিনি হাত দিয়েছেন সেই মাধ্যমে সফলতা এসে ভর করেছে ঈর্ষণীয়ভাবে। গল্প, উপন্যাস, নাটক কিংবা সিনেমা—সর্বক্ষেত্রেই তিনি অনন্য নজির স্থাপন করে গেছেন বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য। বাংলাদেশের একটি সাধারণ পরিবার থেকে সময়ের পালাবদলের সঙ্গে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মোকাবেলার মাধ্যমে নিজেকে শাণিত করে এমন জোরালোভাবে উপস্থিত হওয়ার শক্তি আর কয়জনের আছে?

হুমায়ূন আহমেদ শুধু গল্পকথকই ছিলেন না, তাঁর সাবলীল গদ্যের আলোকচ্ছটায় এবং কাহিনির গতিময়তা, প্রকাশভঙ্গির ঋজুতা ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে একজন পাঠক তাঁর লেখার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘোরের মধ্যে কাটিয়ে দিতে বাধ্য হতো। প্রশ্ন হতে পারে, কী এমন শক্তি ছিল তাঁর? ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, হুমায়ূন আহমেদ স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে জীবনধারার মিশ্রণের প্রভাবে যে মধ্যবিত্ত পরিবার কাঠামো গড়ে উঠেছে এবং ধীরে ধীরে এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও জীবনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মানসিকতা হৃদয়ে ধারণ করে সমাজে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করেছে, তাদেরই জীবনাচরণ দক্ষ শিল্পীর মতো তুলি হাতে যেন এঁকেছেন। যার ফলে প্রতিটি রেখা, রঙ ও বিষয় অনেক গভীর এবং স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে আমাদের কাছে। এককথায় বলা যায়, হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যধারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য দর্পণস্বরূপ, যার সামনে দাঁড়ালে প্রায় সবকিছুই দেখা যায় স্বচ্ছ আকারে। সবাই জানি, মুক্তিযুদ্ধের পরপর *নন্দিত নরকে* উপন্যাস লেখার মধ্য দিয়ে সাহিত্যে হুমায়ূন আহমেদের আবির্ভাব। আবির্ভাব লগ্নেই তিনি নিজ গুণে চমকে দিয়েছিলেন সবাইকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহমদ শরীফের মতো প্রাজ্ঞ অধ্যাপক তখনই লিখলেন, 'হুমায়ূন আহমেদ বয়সে তরুণ, মনে প্রাচীন দ্রষ্টা, মেজাজে জীবন-রসিক, স্বভাবে রূপদর্শী, যোগ্যতায় দক্ষ রূপকার। ভবিষ্যতে তিনি বিশিষ্ট জীবনশিল্পী হবে—এ বিশ্বাস ও প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করব।'

এ কথাও সত্য, সময় যত এগিয়েছে হুমায়ূন আহমেদের লেখায় ভর করেছে বিস্তৃত জনমানস, জীবনবোধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সব চরিত্র। তাঁর লেখার বড় একটি অংশজুড়ে আছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো বিশাল প্রেক্ষাপটের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুক্ত থাকার সুযোগ যার হয়েছে তার চেয়ে এ বিষয়ে আর ভালোভাবে উপস্থাপন করতে কে পারবেন? হুমায়ূন আহমেদ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে তার বাবাকে হারিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর পরিবার নিয়ে যুদ্ধের ভয়াল অবস্থার মধ্যে নানা ঘটনা এমনকি মৃত্যুর হাত থেকেও ফিরে এসেছেন। এমন যার অভিজ্ঞতা তাঁর হাত দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে *জোছনা ও জননীর গল্প* শিরোনামে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাসসহ একগুচ্ছ উপন্যাস ও স্মরণীয় কিছু ছোটগল্প। *জোছনা ও জননীর গল্প* উপন্যাসের প্রায় সব ঘটনাই সত্যাশ্রয়ী। কখনো আত্মজৈবনিক উপাদান, কখনো যুদ্ধদিনের অভিজ্ঞতা, কখনো-বা গ্রন্থপাঠ বা অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে লেখক নির্মাণ করছেন উপন্যাসের কেন্দ্রীয় কাহিনি। হুমায়ূন আহমেদ নিজেই বলেছেন—'*জোছনা ও জননীর গল্প* ইতিহাসের বই নয়, এটি একটি উপন্যাস। তার পরও ইতিহাসের খুব কাছাকাছি থাকার চেষ্টা আমি করেছি। উপন্যাসে বর্ণিত প্রায় সব ঘটনাই সত্যি। কিছু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। কিছু অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে ধার নেওয়া।' *জোছনা ও জননীর গল্প* উপন্যাসে হুমায়ূন আহমেদ সৃষ্টি করেছেন অসাধারণ সব চরিত্র। ইরতাজউদ্দিন, মরিয়ম, নাইমুল, সোবহান, ফয়জুর রহমান, কলিমউল্লাহ, ছদরুল আমিন, আসগর, পণ্ডিত ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর মতো চরিত্ররা, যারা ধারণ করে আছে মুক্তিযুদ্ধকালীন নির্মম বাস্তবতা। আর এ ধারার স্মরণীয় উপন্যাসগুলোর মধ্যে অন্যতম—*আগুনের পরশমণি*, *শ্যামল ছায়া*, *সৌরভ*, *১৯৭১* ইত্যাদি।

AMARBOI.COM

উপমহাদেশীয় ইতিহাস নিয়েও হুমায়ূন আহমেদের আগ্রহ ছিল। যার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই *বাদশাহ নামদার*-এর মতো ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাসে। মোগল সম্রাট হুমায়ূনের জীবনী আশ্রয় করে রচিত এ উপন্যাসে ইতিহাসের নানা বাস্তবতা এবং ঘটনা—লেখকের বর্ণনার সাবলীলতায় ইতিহাস থেকে আলাদা রূপ পেয়েছে। এ উপন্যাসের ভূমিকায় হুমায়ূন আহমেদ লিখেছেন—'কেউ যদি জানতে চান *বাদশাহ নামদার* লেখার কেন ইচ্ছা হলো, আমি তার সরাসরি জবাব দিতে পারব না। কারণ সরাসরি জবাব আমার কাছে নেই। শৈশবে আমাদের পাঠ্যতালিকায় চিতোর রানীর দিল্লির সম্রাট হুমায়ূনকে রাখি পাঠানো বিষয়ক একটি কবিতা ছিল। একটি লাইন এ রকম—বাহাদুর শাহ আসছে ধেয়ে করতে চিতোর জয়। এ কবিতা শিশুমনে প্রবল ছাপ ফেলে বলেই শেষ বয়সে সম্রাট হুমায়ূনকে নিয়ে উপন্যাস লিখতে বসব এ রকম মনে করার কোনো কারণ নেই। সব ঔপন্যাসিকই বিচিত্র চরিত্র নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসেন। এ অর্থে হুমায়ূন অতি বিচিত্র এক চরিত্র। যেখানে তিনি সাঁতারই জানেন না, সেখানে সারাজীবন তাঁকে সাঁতরাতে হয়েছে স্রোতের বিপরীতে। তাঁর সময়টাও ছিল অদ্ভুত। বিচিত্র চরিত্র এবং বিচিত্র সময় ধারার লোভ থেকেও *বাদশাহ নামদার* লেখা হতে পারে। আমি নিশ্চিত না।"

ইতিহাসকে এমন সাবলীল ও সরলতায় উপস্থাপনের শক্তি হুমায়ূন আহমেদের মতো একজন জাত লেখকের পক্ষেই সম্ভব। জীবনের শেষ পর্যায়ে কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন তিনি। এরমধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য *মধ্যাহ্ন*। অসাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে চিরকালীন মানবিকতার এ রকম আখ্যান সমকালে আর লেখা হয় নি। তিনি ছিলেন জীবনবাদী শিল্পী, তাঁর প্রায় সব লেখায় আছে জীবনের জয়গান।

হুমায়ূন আহমেদের প্রকাশিত তিন শতাধিক গ্রন্থের মধ্যে এমন অনেক গ্রন্থই আছে, যা বিস্তর আলোচনার জন্ম দিতে পারে। শুধু সাহিত্যেই নয়, নাটক-সিনেমা বানানোতেও হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর অনেক নাটক একসময় আমাদের দেশের দর্শককে দিয়েছিল নির্মল বিনোদন। পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা তৈরিতে এবং মানুষের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে। সিনেমায় ক্ষেত্রবিশেষে তিনি আলাদা হলেও চিরাচরিত হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্টিশৈলীরই পরিচয় বহন করেছে।

একজন লেখক লিখেই ক্ষান্ত হন না। পাঠককে পাঠে অভ্যস্ততার ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য ভূমিকা পালন করেছেন সুষ্ঠুভাবে। আমাদের দেশের বইয়ের বাজার এবং সর্বস্তরের পাঠককে বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট করানোর নিপুণ কাজটি হুমায়ূন আহমেদ নিজের মতো করেছেন। ফলে প্রকাশনা একটি শিল্পরূপে আমাদের দেশে শক্ত অবস্থান করে নিয়েছে। হুমায়ূন আহমেদকে পাঠকপ্রিয় কিংবা জনপ্রিয় ধারার লেখক বলে মন্তব্য করেন অনেকেই। ব্যক্তিগত সফলতার মানদণ্ডে যদি তাঁকে অবমূল্যায়ন করা হয় সেটা হবে আমাদেরই ব্যর্থতা। কেননা হুমায়ূন আহমেদের পরিশ্রম, মেধা, বিচক্ষণতা, সৃষ্টি এবং কর্মপরিধির বিস্তার আগামী প্রজন্মের জন্য উদাহরণ হিসেবেই ভাবা উচিত। আজকের যে তরুণ কলম হাতে সাহিত্য রচনায় মনোযোগী হতে চাইছেন, হুমায়ূন আহমেদের কৃতিত্ব তার স্বপ্নপূরণে সবচেয়ে বড় উদাহরণ হয়ে থাকবে। শুধু সাহিত্যক্ষেত্র কেন, জীবনে নিজ গুণে সাফল্য অর্জনের অন্যতম উদাহরণ এ দেশে হুমায়ূন আহমেদ।

হুমায়ূন আহমেদ আমাদের মাঝে আজ নেই। তবে তাঁর সৃষ্টিভাণ্ডার রয়ে গেছে; আগামী দিনগুলোতেও থেকে যাবে অবিকল। তাঁর সৃষ্টির প্রতি আমাদের নতুন করে নজর দেওয়ার সময় হয়েছে। কারণ এভাবেই হয়তো ভবিষ্যৎ প্রজন্মে জন্ম নেবে আরও অনেক হুমায়ূন আহমেদ। যারা সমৃদ্ধ করবে আমাদের ভাষা, আমাদের সাহিত্য, আমাদের সমাজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের শান্তা ক্লজ

জুয়েল আইচ

হুমায়ূন আহমেদ বছরে ৩৬৫ দিনের শান্তা ক্লজ। শিশুদের শান্তা ক্লজ বছরে মাত্র একটি দিন আনন্দ বিলাতে আসেন। পরনে লাল পোশাক, তুলোর মতো সাদা দাড়ি গোঁফে পুরো মুখ ঢাকা। মাত্র কয়েক মুহূর্ত আনন্দ দিয়ে পুরো বছরের জন্য অদৃশ্য হয়ে যান। কিন্তু আমাদের এই শান্তা ক্লজ বছরের প্রতিটি দিন ছেলে-বুড়ো চেনা-অচেনা সবাইকে সারাক্ষণ নানাভাবে আনন্দ বিলিয়ে চলতেন। অন্যকে আনন্দ বিলিয়েই তাঁর আনন্দ।

তাঁর পোশাক কেমন?

তিনি যেমন খুশি সাজোতে বিশ্বাসী। ঘরের মধ্যে খালি গায়ে লুঙ্গি পরে থাকতে পছন্দ করতেন। সন্ধ্যার পরে বন্ধুরা তাঁর সঙ্গ পেতে চলে এলে গায়ে একটা কিছু চাপাতেন, আর লুঙ্গি বদলে প্যান্টের মধ্যে ঢুকতেন। বেশি গরম পড়লে জামার বোতাম খোলাই থাকত। কাটা বুকের দীর্ঘ দাগ বাইপাস অপারেশনের কষ্টদায়ক ইতিহাসকে জানান দিতে থাকত। আর শীতের দিনে যে-কোনো কাপড়ের ওপর আরও একটা কাপড়। বসতেন কম্বল নিয়ে মেঝেতে। কখনো কখনো জাপানি অরিগামির মতো চেয়ারে শরীরের সঙ্গে পা ভাঁজ করে। চিঠির মতো কুচিমুচি হয়ে। অনর্গল কৌতুক করতে থাকতেন। এ শান্তা ক্লজ নিজেই যেন শিশু।

একবার রোটারী ক্লাব ইন্টারন্যাশনালের বার্ষিক কনভেনশন আয়োজন করেছে হোটেল সোনারগাঁও-এ। সেখানে সেবার হুমায়ূন ভাই এবং আমাকে ট্রফি দিয়ে সম্মানিত করা হবে। নির্দিষ্ট দিনে সময়মতো গিয়ে পৌঁছালাম। রোটারিয়ানরা বেশ সুশৃঙ্খল। তাঁরা সবাই স্যুট-টাই পরে এসেছেন। আমি হংস মাঝে বক যথা। শুধু সাদা শার্ট পরে গিয়েছি। অনুষ্ঠান চলছে। একপর্যায়ে ট্রফিতে ভূষিত করার পর্ব ঘোষণা করা হলো। অনিবার্য কারণবশত ড. হুমায়ূন আহমেদ উপস্থিত হতে পারেন নি। আমাকে একাই ট্রফি দিয়ে সে পর্ব শেষ করতে হলো। অন্যান্য অনুষ্ঠান যথারীতি চলছে। রোটারিয়ানরা মনোযোগ দিয়ে বক্তৃতা শুনছেন। বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলায় প্রথম গোলটি হলে স্টেডিয়াম ভর্তি দর্শক যেমন বোমা ফাটিয়ে চিৎকার করে, হঠাৎ সেইরকম এক কান ফাটানো চিৎকার! কী ঘটল বোঝার জন্য দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি বলরুমের সবচেয়ে পিছের দরজার দিক থেকে হুমায়ূন ভাই ছাপা ছাপা একটা হাফ শার্ট গায়ে ঢুকে পড়েছেন। প্রায় হাজার দেড়েক বিশিষ্টজন উঠে দাঁড়ালেন।

এই হলো আমাদের শান্তা ক্লজের বিশেষ সভার যেমন খুশি পোশাক এবং তাঁর সংস্পর্শে বিশিষ্টজনের শিশু হয়ে ওঠা।

দর্শককে অবাক করে দেওয়াই ম্যাজিকের প্রাথমিক কথা। আমার একটা জানা-ম্যাজিক যতবারই তাঁকে দেখাতে দেখেছি, আমি অবাক হয়েছি। ম্যাজিকটির রহস্য আমি জানি। জানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর উপস্থাপনও। তবুও প্রতিবার অবাক হয়েছি। এত সহজ কথা নয়! সংক্ষেপে ম্যাজিকটি হলো এরকম : দর্শক নিজ হাতের আঙুলে ছাইদানি থেকে সামান্য ছাই তুলে নিলেন। সেই ছাই নিজের অন্য হাতের পিঠে ঘষে ঘষে মিলিয়ে দিলেন। তাঁর সেই হাত ম্যাজিশিয়ান হুমায়ূন উল্টে দেখাতে বললেন। উপস্থিত সব দর্শক চিৎকার করে উঠলেন। কারণ পিঠের ছাই হাত ভেদ করে তালুতে চলে এসেছে!

এই ম্যাজিকে শুরুর বেশ আগে সামান্য প্রস্তুতি দরকার। হুমায়ূন ভাই সবার মধ্যে বসেই সেই প্রস্তুতির কাজ সারতেন। এই কাজটি কখন সারতেন আমার চোখে কোনোদিন তা পড়ে নি। আমার কাছে এটাই বড় ম্যাজিক।

মানুষকে নানাভাবে আনন্দ, হাসিতে, বিস্ময়ে উপহার দিয়ে, আপ্যায়ন করে, গল্প শুনিয়ে, সবসময় মশগুল রাখার অবিশ্বাস্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত কথা, টুকরো টুকরো ক্ষুদ্র গল্প, হাসির ফোয়ারা শুনে একদিন বলে উঠেছিলেন, "ওরে, তোমরা হুমায়ূন বচনামৃত সংরক্ষণ করো। এ জিনিস হারিয়ে যেতে দেওয়া যায় না।"

একবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে বেশ আয়োজন করে নুহাশপল্লীতে নেওয়া হচ্ছে। আমিও আমন্ত্রিত। তখন নুহাশপল্লীতে যেতে অনেকটা পথ নৌকায় যেতে হতো। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বজরায় উঠেই আমরা বিস্মিত। কারণ বজরার মধ্যে ফাইভ স্টার হোটেলের বিছানা পাতা।

AMARBOI.COM

পরে আরও একবার আমাদেরকে নিয়েছিলেন নুহাশপল্লীতে। নুহাশপল্লীর গেটে পৌঁছতেই শুরু হলো বিস্ময়। সুরেলা ব্যান্ড পার্টির সংবর্ধনায় মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। নানান আনন্দ অনুষঙ্গের আয়োজন। ইসলাম উদ্দিন বয়াতির গানের আসরে গিয়ে শুনি, তিনি জুয়েল আইচকে নিয়ে গান বেঁধেছেন। আচ্ছা, কেমন হাসি পায়! বুঝতে কি কারও বাকি থাকে কলকাঠি কে নাড়ছেন ?

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমরা গালগল্প হাসি-ঠাট্টায় সময় কাটাচ্ছি। হঠাৎ আমাদের অবাক করে দিয়ে নুহাশপল্লীর চারদিকের বিরাট বাউন্ডারি ওয়ালে হাজার হাজার মাটির প্রদীপ তারার মতো জ্বলে উঠল। পাঠক, মনে রাখতে হবে সেগুলো কিন্তু ইলেকট্রিক বাল্ব নয়। প্রদীপ। যা একটা একটা করে জ্বালাতে হয়। আমার সে বিস্ময় এতই মধুর যে আমি তার ব্যাখ্যা কোনোদিন শুনতে চাই নি।

আসলে তাঁর জাদুতে আমার মুগ্ধ না হয়ে কোনো উপায় ছিল না। আমি লক্ষ করেছি তাঁর ইচ্ছায় সমুদ্রে সাঁতার কেটেছি, পাহাড়ে চড়েছি, শহরে এসেছি, গ্রামে গিয়েছি, মহাকাশে ঘোরাফেরা করেছি। চরিত্র এবং গল্পের সঙ্গে এমন চৌম্বক শক্তিতে আটকে গিয়ে চলাফেরা করেছি যেন আমি ঘোরে পাওয়া মানুষ। এই তো সম্মোহন, এই তো ম্যাজিক। এই ম্যাজিক করতে তাঁর দরকার ছিল মাত্র একটা কলম। আর এর সামান্য ভগ্নাংশ তৈরিতে আমার দরকার দশ টন সরঞ্জাম। তাহলে কে বড় ম্যাজিশিয়ান ? অথচ কথায় কথায় হাসি তৈরি করার দুর্লভ ক্ষমতাসম্পন্ন এই মানুষটি চিরদিন রজনীকান্তের একটা গানকে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বলে এসেছেন—

"আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু
কম করে মোরে দাও নি।..."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন ভাই খুব জোর দিয়ে বলতেন, "আমি জানি, সামান্য গল্প তৈরি ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো কাজই আমি করতে পারি না।" আমি জানি কথাটা ঠিক নয়। তিনি মানুষকে এবং প্রকৃতিকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। এই ভালোবাসা যাদের থাকে তাঁরা সবই করতে পারেন। আর তা তিনি করেও গেছেন অবিরত। তা ছাড়া একজন লেখক যদি ভালো লিখতে পারেন তাহলে আর কী চাই ? নিজেকে তিনি সবসময় সামান্য লেখক, তুচ্ছ, অধম এইসমস্ত বিশেষণে বর্ণনা করতেন। ...তবে আনন্দের বিষয়, তাঁর সমস্ত লেখাকে তিনি ভালো লেখা বলে মনে করতেন। এই তৃপ্তি কিন্তু সীমাহীন। একই রকম আনন্দ তিনি তাঁর সিনেমা, নাটক, গান, ম্যাজিক, পেইন্টিং, টিভি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, আড্ডা, জোকস সবকিছু থেকেই পেতেন। এবং তাঁর পাঠক, দর্শক-শ্রোতারাও যে উপভোগ করেন, তাও তিনি জানতেন। তা না হলে পাঠকের দুর্ভিক্ষের দেশে হঠাৎ করে বই বিক্রির প্লাবন বয়ে চলবে কেন ? তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ফিল্ম দেখে বারবার মানুষ কাঁদবে কেন ? তাঁর ম্যাজিক দেখে অতিথিদের মাথা ঘুরে যাবে কেন ? তাঁর সঙ্গে আড্ডায় বসলে হাসিতে বাড়ির ছাদ ফেটে যেতে চাইত কেন ? যেখানে হুমায়ূন আহমেদ সেখানেই আনন্দ। এর চেয়ে সার্থক জীবন আর কী হতে পারে! তাঁর জীবনটা ছিল শুধু আনন্দ আর আনন্দে ভরা। অন্তত তিনি সেভাবে ভাবতে চাইতেন। তাঁর যত ব্যথা যন্ত্রণা সব নিয়ে মজা করতেন, কৌতুক করতেন। আর সে কৌতুকের এমনই জোর যে হেসে গড়িয়ে পড়তে হতো।

সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালের ডাক্তাররা তাঁকে পরীক্ষা করে খুব নিষ্ঠুরভাবে বললেন, 'তোমার প্যানক্রিয়াস, কোলন ও লিভারে ক্যান্সার বিস্তার করেছে। মৃত্যু তোমার সামনে দাঁড়িয়ে। বড়জোর এক বছর তোমার আয়ু।" কী ভয়ংকর কথা!

আমেরিকাতে চিকিৎসা করার উদ্দেশ্যে কদিন পরেই দেশে ফিরে এলেন। সব প্রস্তুতি সেরে আমেরিকা উড়াল দিতে চার দিন সময় লাগল। তাঁর গলার ওপর কী ভয়ংকর খাড়া ঝুলছে। কিন্তু তাতে কী হবে। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন নিয়ে প্রতিদিন গভীর রাত পর্যন্ত নিজের ক্যান্সার নিয়ে কী যে মশকরা। হাসি তৈরির যেন মহামজার একটি বিষয় পাওয়া গিয়েছে। এবারে হাসির তোড় যেন আরও তীব্র। প্রথম রাতে সবাইকে নিয়ে খাওয়াদাওয়ার পরে বললেন, 'সবাই লক্ষ করে শোনো। ১৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার আমি আমেরিকা যাচ্ছি। ওই সন্ধ্যায় আমার কুলখানি খেতে সবাই আসবে।' তাঁর বলার ভঙ্গি এমনই যে অনেকেই হেসে ফেললেন। ঢাকার ওই চার দিনের দ্বিতীয় দিন থেকে জনে জনে তিনি খুব খুশিতে বলতে লাগলেন, 'সব ভালোর যেমন খারাপ দিক থাকে, তেমনি সব খারাপেরও ভালো দিক থাকে।' স্বাভাবিকভাবেই সবাই জানতে চায়, 'খারাপের ভালো দিকটা কী ?' তিনি খুব খুশি হয়ে বলেন, 'আমাকে শীলা-নোভা দেখতে এসেছিল। আহারে জীবন!'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে পড়ে, রকি মাউনটেন হাই

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত

ডিসেম্বরে মাউন্ট রাশমোর যাওয়া বড় সহজ নয়। আমাদের শহর ডেনভার থেকে চার শ মাইল দূরে হলেও বড় কোনো তুষারপাত না হলে আন্তঃরাজ্যসড়ক কি প্রধান সব রাজ্যসড়ক খোলাই থাকে। যদিও প্রায় সাত হাজার ফুট উঁচু ব্ল্যাক হিলস অঞ্চলের মাউন্ট রাশমোরে ওঠার পথ কখনো কখনো নভেম্বরেও বন্ধ হয়ে যায় বরফের জন্য। তাই যে সপ্তাহান্তে হুমায়ূনকে নিয়ে চার প্রেসিডেন্টের মুখমণ্ডল দেখতে যাব ভেবেছিলাম, ফোন করে জানি ওই দিন ক'টিতেই তুষারপাতের সম্ভাবনা প্রচুর। মাউন্ট রাশমোর পার্ক রেঞ্জারের আবহাওয়াবার্তা অগ্রাহ্য করার কথা ভাবি না। দুটি কেমোথেরাপির মাঝখানে হুমায়ূন এসেছেন রকি মাউনটেইনে বেড়াতে। তাঁকে নিয়ে দূরপাহাড়ের কোনো সরাইখানায় রাত্রিবাসকালে যদি বরফে আটকে যাই সেটি সুখের হবে না। জরুরি প্রয়োজনে ওইসব অঞ্চলে উপযুক্ত চিকিৎসা পাওয়া বড় সহজ নয়। এইসব ভেবে মাউন্ট রাশমোর যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করে দিই। অবশ্য এও মনে এসেছিল, সাউথ ডাকোটায় মাউন্ট রাশমোরের সবচেয়ে কাছের শহর র‍্যাপিড সিটি থেকে নর্থ ডাকোটার ফার্গো শহর মাত্র পাঁচ শ মাইল দূরে। অনেক বছর হুমায়ূন ছিলেন সেখানে, তিনি কি যান নি কখনো ওয়াশিংটন-জেফারসন-লিংকন-রুজভেল্টের নাক-চোখ-মুখ দেখতে। তা ছাড়া ছবিতেও তো তিনি দেখেছেন, ওই জাতীয় স্মৃতি ভাস্কর্য-আলফ্রেড হিচককের ছবি 'নর্থ বাই নর্থওয়েস্ট'-এ। হুমায়ূনকে জিজ্ঞেস করে জানি, না, তিনি যান নি।

তবুও এক মাইল উঁচু আমাদের এই রকি মাউনটেইনের শহর থেকে আরও দু' হাজার ফুট উঠবার সাহস হয় না ওই তুষারপাতের কথা ভেবে। হিচককের শুটিং লোকেশনে হুমায়ূনকে নিয়ে যেতে পারব না বুঝে খারাপই লাগে। আর তখনই মনে পড়ে যায় স্ট্যানলি কুবরিকের ছবি 'দ্য শাইনিং'-এর কথা। জ্যাক নিকলসনের অমন অভিনয় হুমায়ূনের মতো ছবির মানুষের তো মনে রাখারই কথা।

হুমায়ূনকে বলি, ডেনভারের চারপাশে একদিনের মধ্যে ঘুরে আসা যায় এমন অনেক দর্শনীয় স্থান আছে। পশ্চিমে এ্যাসপেন কি ভেইলের স্কি-রিসোর্ট, দক্ষিণে কলোরাডো স্প্রিংসয়ে আছে 'গার্ডেন অব দ্য গডস'—লাল পাথরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আরও দক্ষিণে গেলে পাওয়া যাবে ডুরাংগো কি টাওস কি নিউ মেক্সিকো রাজ্যের রাজধানী সান্টা ফে। পূর্বে ক্যানসাস রাজ্য—দিগন্তের পরে দিগন্তছোঁয়া গমক্ষেতের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে শত মাইলের সোজা সড়ক আন্তঃরাজ্য হাইওয়ে ৭০। আর আমাদের শহরের পাশেই আছে, মাত্র পঁচিশ মাইলের মধ্যে, রেডরক অ্যাম্ফিথিয়েটার। লাল পাহাড়ের গা কেটে বানানো সহস্র মানুষের দশ বছরের শ্রমের ফসল—সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক স্টেডিয়াম বা প্রেক্ষাগার যার সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবে লাল পাথর কেটে বানানো রঙ্গমঞ্চে। গ্রীষ্মে সারা পৃথিবীর পরিচিত গাইয়ে-বাজিয়েরা আসে সেখানে—খোলা আকাশের নিচে তাদের পারদর্শিতা দেখাতে সত্তর-পঁচাত্তর হাজার দর্শকের সামনে। সবশেষে বলি, আর উত্তরে আছে ইউরোপীয় ধাঁচের শহর বৌল্ডার। যুক্তরাষ্ট্রের এক নম্বর বাসযোগ্য শহর বলা হয় সেটিকে। আর বোল্ডার পার হয়ে মাইল ত্রিশ-চল্লিশ গেলেই আছে এসটেস পার্ক—সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচুতে রকি মাউনটেইন স্টেট পার্কের শুরুতে অতি বিখ্যাত শৈলাবাসি। সেখানে দাঁড়িয়ে উত্তরে কী পশ্চিমে দেখা যাবে দশ থেকে ষোল-আঠার হাজার ফুট উঁচু পর্বতশৃঙ্গ। শেষে বলি আর আছে স্ট্যানলি হোটেল। বহু পুরনো রাজকীয় পান্থনিবাস, স্ট্যানলি কুবরিকের 'দ্য শাইনিং' ছবির লোকেশন। কিন্তু হুমায়ূন, এই শীতে ওই শহর তো প্রায় বন্ধই থাকে। তবুও বরফ না থাকলে যাওয়া যায় সেখানে। কোথায় যাবেন বলুন ? হুমায়ূন বলেন, সব কটিতেই যাব, কিন্তু প্রথমেই যাব স্ট্যানলি হোটেলে।

২

স্টিফেন কিংয়ের নাভিশ্বাস তোলা, শরীর শীতল করা, 'হরর' উপন্যাস 'দ্য শাইনিং' ছবির লোকেশন হিসেবে এসটেস পার্কের এই হোটেলটিকেই বেছে নিয়েছিলেন স্ট্যানলি কুবরিক। মহাআতঙ্ক, বিভীষিকা সৃষ্টির জন্য এই পুরনো দিনের সহস্র কক্ষের হোটেলটিকে কেন স্ট্যানলি পছন্দ করেছিলেন আমরা ভালো না বুঝলেও হুমায়ূন হয়তো ঠিকই বুঝেছিলেন, আর তাই অন্য কোথাও নয় স্ট্যানলি হোটেলেই তার আগে খাওয়া সেরে সাদা রঙের মিনিভ্যানে হুমায়ূন-শাওনের দুই শিশুপুত্র ও শাওনের মা-বোন ও পূরবীসহ আমরা আটজন পাহাড়ি নদীর পাশ দিয়ে পাথর কেটে বানানো রাস্তা ধরে ঘুরে ঘুরে নানা চড়াই উৎরাই পার হয়ে এসটেস পার্ক শহরে উঠে যাই।

চারপাশে পাহাড়ের মাঝখানে—কিছু দূরেই পর্বতশৃঙ্গের সারি, শহরটি যেন উপত্যকাই। ছোট একটি হ্রদও আছে। পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে বানানো ঘরবাড়ি, কিছু ছোট দালান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট—এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকালে সবই দেখা যায়। আর দেখা যায় শহরের শেষ মাথায় প্রায় সাদা রঙের সুবিশাল হর্ম্য, পাহাড়ের শেষ ধাপে দিগন্ত ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুরনো দিনের রাজপ্রাসাদই যেন, অমনি ডাইনে বাঁয়ে প্রসারিত, অমনি গম্বুজ, স্তম্ভাবলি, বারান্দা। শহরের মাঝ থেকে পাকা রাস্তা উঠে গেছে হোটেলের দিকে। হোটেলের পেছনে গাছপালার সারি আছে। আছে আশপাশেও। সামনে কোনো বড় গাছ নয় ফুল-লতা-পাতার বাগান। সুবিন্যস্ত ঝোপঝাড়। নানা আকারের নানা ছাঁদের। প্রশস্ত রাস্তা শহর থেকে ওপরে উঠে এসে হোটেলের আঙিনার শেষ মাথাতক চলে যায়। গাড়ি রাখবার জায়গা আছে বেশ। সেখানে নেমে গাড়ি রাখার জায়গায় গাড়ি পার্ক করে হেঁটে গেলেই বোঝা যায় অনেকটা ওপরে উঠে আসা হয়েছে। একটি চত্বরের সামনে তাকালে দেখা যায় সেই কেয়ারি করা বাগান, গোলকধাঁধার ঝোপঝাড়।

উত্তরের পর্বতশৃঙ্গ ক'টিকেও দেখা যায়। চত্বরের শেষে বুক সমান উঁচু হেলানো টেবিলের মতো পাথরে লেখা শৃঙ্গসমুদয়ের নাম। নয় থেকে আঠারো হাজার ফুট পর্যন্ত। সামনে পেছনে মেঘ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রীষ্মের শহর, শীতের শুরুতেই বিনোদনশেষে ভ্রামণিকরা ঘরে ফিরে গেছে। সামান্য স্থাপনা, কিছু দোকানপাট, গ্যাসস্টেশন, রেস্তোরাঁ খোলা আছে। ক'দিন আগের তুষারপাতের কিছু চিহ্নও আছে। তবুও কোনোমতেই আমি 'শাইনিং'য়ের সেই আদিগন্ত বরফে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা, শ্বেত তুষারের আভায় ঝলসাতে থাকা প্রায় অবাস্তব হর্ম্যটিকে মেলাতে পারি না। হুমায়ূন অনেক আগেই গাড়ি থেকে নেমে নানা দিক থেকে নানা দূরত্ব থেকে দালানটিকে দেখতে থাকেন। কুবরিকের ছবির বদৌলতেই সম্ভবত, দর্শনার্থীদের জন্য একটি মিউজিয়ামের মতো আছে। মরশুমি হোটেল, তাই বন্ধ, সংগ্রহশালাটিসহ। কাউকে দেখি না, ভবনটির সামনে দাঁড়ালে বোঝা যায় ভবনটি বহুতল না হলেও কিছু অংশে দ্বিতল-ত্রিতল অবশ্যই আছে। ভবনটিকে পেছনে রেখে দাঁড়ালে দেখা যায় সামনে নানা স্তরের শহর, দোকানপাট। ঝুঁকিপূর্ণ তুষারের কালে, ওই শহরের সব রাস্তা ঢেকে গেলে, সব স্থাপনার ছাদের রঙ চারপাশের রঙের সঙ্গে মিশে গেলে, ঢেউখেলানো সেই বিশাল প্রান্তর কেবল তুষারের আভায় ঝলসাতে থাকবে। তখন বুঝি কেন জনশূন্য ওই তুষার ভবনটি তদারকের জন্য একজন ক্ষমতাহীন ব্যর্থ লেখকের প্রয়োজন হয়েছিল। পরিবেশ, একাকীত্ব, হতাশা, ক্রোধ কেমন করে তাকে বোধহীন, জ্ঞানহীন, বিবেচনাশূন্য উন্মাদে পরিণত করে।

কিন্তু হুমায়ূন তো তাঁর ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক, সহস্র পাঠকের স্তুতিতে অভ্যস্ত, চিত্রপরিচালক, নাট্যকার—হতাশার কণামাত্রও কখনো তাকে স্পর্শ করেছে বলে ভাবা যায় না। সে তাহলে কেন আকৃষ্ট হবে নিকলসনের চরিত্রে কি ওই অলৌকিক পরিবেশে ? সে কি কেবলই সৃষ্টির উন্মাদনাটিকে বোঝার জন্যই! শিল্পসৃষ্টির পেছনে যে দুর্বোধ্য প্রক্রিয়া কাজ করে সেটিকে বোঝবার জন্যই ? সারা যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত নির্জন তুষারগ্রস্ত এলাকা খুঁজে কুবরিক বেছে নিয়েছিলেন স্ট্যানলি হোটেলকে। কেন ? সেটি শুধুই দর্শক আমরা যেমন বুঝি, হুমায়ূন তার চলচ্চিত্রনির্মাতার দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিল অন্যভাবে, নিঃসন্দেহে। সেজন্যই স্ট্যানলি হোটেলে যাওয়া তার।

AMARBOI.COM

৩

নিউইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটিতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্লাসে আমি *নন্দিত নরকে* পাঠ্য হিসেবে বেছে দিয়েছিলাম আমার ছাত্রছাত্রীদের জন্য—আধুনিক বাংলা সাহিতের শীর্ষস্থানীয় কবি-ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক ইত্যাদির নানা রচনার সঙ্গে। আরও দুটি উপন্যাসও তাদের পড়তে দিয়েছিলাম—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *দেবদাস* ও বুদ্ধদেব বসুর *রাত ভরে বৃষ্টি*। ক্ষীণকায় উপন্যাস বলেই ওই তিনটি বেছেছিলাম। হুমায়ূন আহমদের উপন্যাসটি ছিল সবচেয়ে ছোট। একটির মূল বিধ্বংসী প্রেম, অপরটির বিষয় নরনারীর মনোসমীক্ষণ ও সম্পর্ক। অন্যটির মূল আমাদের দুঃখ-শোক-যন্ত্রণার পৃথিবী প্রতিদিনের সংসার। পড়াশেষে পড়ুয়াদের জিজ্ঞেস করে জানি *দেবদাস* অবশ্যই তাদের প্রিয়, পছন্দেরও। কিন্তু *নন্দিত নরকে* তাদের সমস্ত আবেগের উৎস মুক্ত করে দিয়েছে। অনেকে চোখের জল মুছেছে, এ কথাও জানায়। যদিও উপন্যাসটির হৃদয়ে যে-কথা—এই আমার দুঃখ-শোক-যন্ত্রণার জীবন, এই যে আমার পৃথিবী, নরকই তো, তবুও এই জীবনকে, এই পৃথিবীকেই আমি ভালোবাসি, সবাই এটি প্রথম পাঠে সহজে বোঝে নি। তবুও তারা বলে, সামান্য এই ক'টি পৃষ্ঠার মধ্যে আমাদের জীবনকে তার সমস্ত ক্লেদ, বিষাদ, আশা, আনন্দ, যন্ত্রণাসহ ধরতে পারেন যিনি তিনি কত বড় শিল্পী। তাদের মনে করিয়ে দিই এটি হুমায়ূন আহমেদের প্রথম উপন্যাস।

নন্দিত নরকে-র পরে বহুকাল হুমায়ূনের কোনো রচনা আমার পড়া হয় নি—বাংলা লেখাপড়ার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাওয়ার জন্যই। মাঝখানে কেবল তার একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাসই—*একাত্তর* মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা, পড়েছিলাম। স্পষ্টতই হুমায়ূনের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার কথাই কেবল জানা ছিল, নিজে তার পাঠককূলের শামিল হই নি। মাত্র কিছুকাল আগে হুমায়ূন আমাকে তাঁর *বাদশাহ নামদার* ও *মাতাল হাওয়া* পড়তে দেয়। পরে *জোছনা ও জননীর গল্প* ও *মধ্যাহ্ন* পড়বার জন্য হাতে আসে। প্রায় একই সময়ে হুমায়ূনের বেশ ক'টি গ্রন্থই হাতে আসে আমার—তাঁর জীবনের শেষ কয়েক মাসেই। *মাতাল হাওয়া* শেষ করবার পরে মনে হয়, নিজ সময় ও জীবনকে এমন করে মেলাতে পারেন যিনি তার অনেক লেখাই আমার আগে পড়া উচিত ছিল। সম্ভবত *মাতাল হাওয়া* আমাকে *নন্দিত নরকে*-র কথাও বারবার মনে করিয়ে দেয়। *মাতাল হাওয়া*-র সময়, জীবন, মানুষ—ওই হাওয়ায় বিপর্যস্ত হয় যাদের জীবন, তার সবই আমাদের পরিচিত অথচ মনে হয় যেন প্রতিটি ঘটনার আড়ালে আরও কিছু ঘটনা আছে, প্রতিটি চরিত্র যেমন দেখা যায়, তেমন নয়—এক আলোআঁধারি জগৎ। অথচ কত অনায়াসে সব কথা বলা। অস্পষ্টতার ছায়াও যেন কোথাও নেই। পরক্ষণেই মনে হয়, সবই চোখের সামনে থেকে সরে যায়। যা দেখা যায় তার সবই অলীক। 'হিমু' ও 'মিসির আলি'র স্রষ্টার কথাই জানা ছিল, শুনেছি তিনি পাঠকপ্রিয়, *মাতাল হাওয়া* পড়ে বুঝি, অমন হাওয়া বইয়ে দিতে পারেন যিনি, পাঠক তাঁকে ভালোবাসবেই।

AMARBOI.COM

৪

প্রবাসজীবনের মাঝপথে একবার দেশে গেলে দূরপাল্লার বাসে হুমায়ূন আহমেদের নাটকের সঙ্গে পরিচয় হয়। বাসের যাত্রী সকলে অন্য কিছু নয় হুমায়ূনের নাটকই দেখতে চায়। টেলিভিশনের ক্রমিক নাটক 'এইসব দিনরাত্রি' কি 'অয়োময়'-এর কথা শোনা ছিল। কখনো টেলিভিশনের সামনে বসে দেখা হয় নি। দেশে ছিলাম না বলেই। ঘুম ভুলে বাসের যাত্রীদের হাসিকান্নার সঙ্গী হয়ে সহজেই বুঝি বাংলাদেশের কিছু শহরে কিছু গ্রামীণ জীবনের কথা 'অল ইন দ্য ফ্যামিলি' 'স্যানফোর্ড এন্ড সন' কি 'চিয়ার্স'-এর মতো সিটকমের জীবনগাথার চাইতে কোনো অংশে কম উপভোগ্য নয়।

৫

চিত্রপরিচালক হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে পরিচয় আমার সামান্যই ছিল—'শ্রাবণ মেঘের দিন'-এর মধ্যেই সীমিত। অথচ এই দীর্ঘ প্রবাসে আমার দেখা ইংরেজি, ফরাসি, জাপানি, স্প্যানিশ ইত্যাদি নানা ভাষার শত শত ছবির মধ্যে বাংলা-হিন্দি-উর্দু ছবিও ছিল প্রচুর। হুমায়ূন আহমেদের ছবি নয়। সম্ভবত তাঁর ছবির সংখ্যা অত বেশি নয় বলেই। তবুও 'শ্যামল ছায়া', 'আগুনের পরশমণি' কি 'চন্দ্রকথা' সম্পর্কে যা শুনেছি, যা জানি তার সঙ্গে স্টিফেন কিংয়ের উপন্যাস কি স্ট্যানলি কুবরিকের ছবিটি কোনোভাবে মেলাতে পারি না।

'দ্য শাইনিং'-এর প্রতি হুমায়ূনের আকর্ষণ কি তাই কেবলই একজন দর্শকের না চিত্রপরিচালকের বুঝে উঠতে পারি না। মহাআতঙ্ক কি বিভীষিকা সৃষ্টির কোনো ছবি অথবা মনোসমীক্ষণ, মনোবিকলনের কোনো চলচ্চিত্রও তিনি কখনো নির্মাণ করেছেন বলে শুনি নি। তার সব ছবিতেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই সমাজ ও সংসারের কথা। তাহলে স্ট্যানলি হোটেলের প্রতি এত আগ্রহ কিসের জন্য? ব্যর্থ ক্ষমতাহীন লেখকের মনোবিকলন কি অতিলৌকিক ঘটনা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবেশের জন্যই ? অথবা ওই পরিবেশই বাধা হয়ে দাঁড়ায় সৃষ্টিতে—এইটিই কি বোঝবার ছিল হুমায়ূনের! সরজমিনে সেটি না-দেখলে হয়তো সেটি বোঝা যেত না। সরল কি জটিল জীবন ও সংসারের নানা কথা হুমায়ূনের জানা ছিল, নিঃসংশয়ে বলা যায়। বলার একটি বিশেষ পথই হয়তো খুঁজে ফিরছিলেন তিনি। 'ঘেটুপুত্র কমলা'র কথা শুনে মনে হয়েছিল বুঝি এটি কোনো যাত্রা কি পালাগানের চিত্ররূপ। কী ভুলই না ছিল সেই ভাবনা। 'শ্রাবণ মেঘের দিন' থেকে কত দূরে চলে এসেছিলেন হুমায়ূন—মনে হয় 'শাইনিং'-এর কাছাকাছি। শিল্পসৃষ্টির নিরিখে। যেন বলা যায়, *নন্দিত নরক* থেকে বেরিয়ে যেমন হুমায়ূন চলে গিয়েছিলেন *মাতাল হাওয়া*-য় বাইরে, তেমনি নিশ্চিত চলে যেতেন 'শ্রাবণ মেঘের দিন'-এর শেষে শ্বেত তুষারের আলোয় ঝলসানো কোনো কালরাত্রিতে।

৬

এসটেস পার্কের পথে রওনা হওয়ার সময়ে গাড়িতে বিটলস্‌দের সঙ্গে জন ডেনভারকে নিয়েছিলাম আমি। বনজোভি কি ব্রুস স্প্রিংস্টিন নয়। মনে হয়েছিল রকি মাউনটেইন ওঠা-নামায় জন ডেনভারই ভালো সঙ্গী হবেন।

দিনের শেষে এসটেস পার্ক থেকে নামতে থাকি। এবারে ভিন্ন পথে। পাহাড় কাটা রাস্তার দু'পাশে আকাশছোঁয়া পাথরের দেয়াল যেন—খরস্রোতা পার্বত্য নদীটি পাশে পাশে চলে। এসটেস পার্কের বৃক্ষশীর্ষে কিছু ম্লান আলো দেখেছিলাম নামবার সময়ে। ক্রমে আলোটুকু মুছে যায়। আসন্ন সন্ধ্যায় রকি মাউনটেইনের খাদের গভীরে ডোবা পথ বেয়ে নামতে নামতে অন্ধকার গাঢ় হয় আর ঠিক তখনই যেন অতল সেই খাদ থেকে বেরিয়ে আসি। দেখি সরে গেছে পাথরের দেয়াল; সামনে ঢেউখেলানো প্রান্তর। আইপালার মাথার দিকে বিস্ময়ে তাকাই, তাকাই নীল আকাশের দিকে। দেখি পূর্ণচন্দ্র।

অনেকক্ষণ ধরেই জন ডেনভার তাঁর রকি মাউনটেনের স্বপ্নগাথা শোনাচ্ছিলেন, এবারে তার সঙ্গে আমরাও গলা মেলাই—হুমায়ূনের গলা সবচেয়ে উঁচুতে—'রকি মাউনটেন হাই'।

স্ট্যানলি কুবরিকের কথা, মনে হলো, হুমায়ূন বুঝেছেন এবারে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদ এবং আমাদের প্রচ্ছদ

ধ্রুব এষ

হুমায়ূন আহমেদের প্রথম প্রকাশিত বইয়ের প্রচ্ছদ হয়েছিল যৌথ যোজনায়। *নন্দিত নরকে*। প্রচ্ছদশিল্পী, মুহম্মদ জাফর ইকবাল এবং শ্যামা সিকদার (শামীম শিকদার বলে ভুল করেন অনেকে)। পরে এই বইয়ের প্রচ্ছদ করেন মহামান্য কাইয়ুম চৌধুরী। সেই প্রচ্ছদই আছে এখনো। হুমায়ূন আহমেদের পঞ্চাশতম জন্মদিন উপলক্ষে একটি বিশেষ সংস্করণ হয়েছিল বইটির। এই সংস্করণের প্রচ্ছদ আবার অন্য একজনের বানানো। বিশেষ সংস্করণ ফুরিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে সেই প্রচ্ছদও। ভালো হয়েছে। একদম মানোত্তীর্ণ ছিল না প্রচ্ছদটা। 'অন্যপ্রকাশ' *নন্দিত নরকে*র সর্বশেষ মুদ্রণের প্রকাশক। তারা কাইয়ুম চৌধুরীর প্রচ্ছদটা রেখেছেন। কত বছর ধরে প্রচ্ছদ করছেন, কত ভালো প্রচ্ছদ যে করেছেন কাইয়ুম চৌধুরী, *নন্দিত নরকে* তার একটি অবশ্যই।

কাইয়ুম চৌধুরীর পর আরেকজন প্রচ্ছদশিল্পীর কথা বলি। খালিদ আহসান। তার *একা একা, কোথাও কেউ নেই, অমানুষ*-এর প্রচ্ছদও ভোলা যাবে না। এই তিনটা বইও হুমায়ূন আহমেদের। তৎকালীন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার আর খালিদ আহসানের আইডিয়া! যারা দেখেছেন একিন করতে পারবেন, বিস্ময়কর কতটা!

এরপর সমর মজুমদার। *পেনসিলে আঁকা পরী, দরজার ওপাশে, ভয়, বিপদ* কিংবা *অনিল বাগচীর একদিন* হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের অনেক বিচিত্র প্রচ্ছদ করেছেন এই শিল্পী।

বলা হয় নি কাজী হাসান হাবিব, কালাম মাহমুদ, আফজাল হোসেন, মাসুক হেলাল, উত্তম সেনের কথা। এরাও তাদের বেস্ট এফোর্ট দিয়েছেন হুমায়ূন আহমেদের প্রচ্ছদে। রফিকুন নবী, হাশেম খান এবং মঈন আহমেদও আছেন এই তালিকায় এবং সুখেন দাস, ওবায়দুল ইসলাম। আফজাল হোসেনের আঁকা *বাসর*, সুখেন দাস কৃত *দারুচিনি দ্বীপ, গৌরীপুর জংশন*, এক্সট্রা অর্ডিনারি প্রচ্ছদ কিনা! কিংবা মঈন আহমেদের *দ্বৈরথ, হুমায়ূন আহমেদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*। এসব প্রচ্ছদ যারা দেখেছেন, অবশ্যই স্মরণে রাখবেন, বিস্মরণ ব্যাধিতে যদি আক্রান্ত না হন।

এখন বলি এত সব কথার মানে কী ? হুমায়ূন আহমেদের যে-কোনো বইয়ের প্রচ্ছদ দেখা যাচ্ছে ব্যতিক্রমী অনেক। কেন ? হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের প্রচ্ছদ কি একটু আলাদা যত্ন নিয়ে করেন আর্টিস্টরা ? উত্তর, করেন। কেন করবেন না ? এত ফ্রিডম দিচ্ছেন কে আর ? যে-কোনো রকম এক্সপেরিমেন্ট তো এই একজনের প্রচ্ছদ নিয়েই করা যায়। ভড়ং বা আদিখ্যেতার দিকে যাচ্ছি না। এই লেখা এখন যে পড়ছেন, তাকে শেয়ার করি খানিকটা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আমি তখন থাকি হোস্টেলে। পরবর্তীকালে হুমায়ূন আহমেদের বই পাইরেসির দায়ে অভিযুক্ত এবং প্রকাশ্যে কান ধরে উঠবোস শাস্তিপ্রাপ্ত এক প্রকাশকের কিছু কিছু বইয়ের প্রচ্ছদ করেছি। মিলন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইয়ের (ইমদাদুল হক মিলন) *সুন্দরী কমলা* এবং *মহাযুদ্ধ* আছে এর মধ্যে। মুহম্মদ জাফর ইকবালের *প্রেত*। সেই প্রকাশক একদিন বললেন, আপনি কি হুমায়ূন আহমেদের একটা বইয়ের প্রচ্ছদ করবেন ?

করব না মানে! বললাম, কী বই ?

উনিশ শ' একাত্তর। মঞ্চনাটক।

করব।

এই লোক কিন্তু খিটখিটে খুব। দুই-তিনটা প্রচ্ছদ করবেন।

করব।

করলাম। প্রথমে দুইটা। তারপর দুইটা। তারপর আরও দুইটা। একটাও পছন্দ হলো না 'এই লোক কিন্তু খিটখিটে খুব'-এর। প্রকাশক বললেন, আপনি কি একবার তার সঙ্গে দেখা করবেন ?

করব।

দেখা করতে গেলাম তাঁর সঙ্গে। ঢাকা গেটের লাগোয়া বিল্ডিংয়ে। খিটখিটে মানুষটা বললেন, শোনো ভাই, তোমার প্রচ্ছদগুলো আমি দেখেছি। একটাও পছন্দ হয় নি। তুমি কি আরও প্রচ্ছদ করবে ?

জি করব।

কিন্তু কয়টা ?

প্রকাশককে বললাম, একশ'টা। দরকার হলে একশ'টা প্রচ্ছদ আমি করব। তাও আমার প্রচ্ছদ স্যারকে পছন্দ করতেই হবে।

AMARBOI.COM

পছন্দ হয়ে গেল পরের দুটোর একটাই। পরের গল্প পরে শুনছি। গল্পটা বলব না, ঠাকুর স্মরণং, 'নিজেরে যেন না করি প্রচার... ।'

মঞ্চনাটকের প্রচ্ছদের পরে ছোটদের একটা বইয়ের প্রচ্ছদ। 'নুহাশ এবং আলাদীনের আশ্চর্য চেরাগ।' এরপর 'রুমিং হাউস'। প্রচ্ছদ ছাপা হয়েছিল কিন্তু বইটা আর ছাপা হয় নি। এই সময়ের টিপস, 'শোনো ভাই, আমার উপন্যাসের প্রচ্ছদ যখন করবে, কবিতার বইয়ের কথা চিন্তা করে করবে। আর ফিগার, মেয়ের মুখ এইসব ব্যবহার করতে হবে না।'

কীভাবে আর উস্কে দেওয়া যায় চিন্তাকে ? আর কি ফ্রিডম চায় কোনো গ্রাফিক ডিজাইনার ? সাক্ষ্য দেবেন মাসুম রহমান, সব্যসাচী হাজরা পর্যন্ত। মাসুম রহমানের *জোছনা ও জননীর গল্প*, *মাতাল হাওয়া* বা *কাঠপেনসিল*, সব্যসাচী হাজরার *উপন্যাসসমগ্র* (সম্ভবত দ্বাদশ খণ্ড), কতরকম এক্সপেরিমেন্ট। এত এক্সপেরিমেন্টের সুযোগ যিনি দিয়ে দেন, একটু খুঁতখুঁতে কি তিনি হবেন না ? পছন্দ না হলে আবার এবং আবার এবং আবার ডিজাইন পাল্টাতে বলবেন না ? বলবেন। কিন্তু খিটখিটে বা খুঁতখুঁতে না, মানুষটা আসলে উস্কানিমূলক। উস্কে দিতে পারেন এবং দিয়েছেন আমাদের প্রচ্ছদ-চিন্তার জগতকে। অনেক বদলে গেছে আমাদের প্রচ্ছদ। বাংলা বই যারা পড়েন, প্রচ্ছদ দেখেন, প্রচ্ছদ নিয়ে ভাবেন, কেউ কি দ্বিমত পোষণ করবেন এ কথায় ? না মনে হয়।

*নন্দিত নরকে*র প্রথম প্রচ্ছদটা নিয়ে আর একটু কথা বলি। এই প্রচ্ছদের বইটা যতদূর জানি কিন্তু স্যারের নিজের সংগ্রহেও নেই। আছে মিলন ভাই, ইমদাদুল হক মিলনের সংগ্রহে। দুর্লভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগ্রহ। মিলন ভাই-ই একদিন অনেক রহস্য করে দেখিয়েছিলেন। সাদামাটা প্রচ্ছদ। কয়টা মানুষের মুখ আর লেটারিং। মনে আছে শুধু এটা হুমায়ূন আহমেদের প্রথম বইয়ের প্রচ্ছদ বলেই। এবার বলি এখন পর্যন্ত প্রকাশিত স্যারের সর্বশেষ বইয়ের প্রচ্ছদের কথা। 'আমরা কেউ বাসায় নেই।' 'নন্দিত নরকে'র সবচেয়ে বাজে প্রচ্ছদটা করেছিল যে, সে-ই এই প্রচ্ছদটা করেছে। কে? 'আমরা কেউ বাসায় নেই'-এর প্রিন্টার্স লাইন দেখলেই হয়। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। এই নিয়ে স্যারের কতটা বইয়ের প্রচ্ছদ আমি করলাম? সমগ্র, সংগ্রহ, পুনর্মুদ্রণ মিলিয়ে কমসে কম দুই শতাধিক। বাংলা ভাষার সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখকের এত বইয়ের প্রচ্ছদ আর কেউ কি করেছেন? না। এ নিয়ে আমি একটু অহঙ্কার করতেই পারি নাকি? 'নিজেরে যেন না করি প্রচার...' এ ঈশ্বর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা। আমি কি আর রবীন্দ্রনাথ? তাও, 'পাপ' মোচন করার চেষ্টা করি একটু। বলি, হুমায়ূন আহমেদ যতদিন লিখবেন ততদিন নিশ্চিত আরও বদলাবে আমাদের প্রচ্ছদ। অনেক বদলাবে। লেখক হিসেবে প্রচ্ছদ শিল্পীদের জন্য, আগেই বলেছি, এই মানুষটা উস্কানিমূলক!

পুনশ্চ

এটা গত বছর একটা বইয়ের জন্য লেখা। স্যারের ৬৩তম জন্মদিন উপলক্ষে বইটা প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। 'অন্যপ্রকাশ' থেকে। মাতাল হাওয়ায় সব কিছু পাল্টে গেছে! সেই বই আর প্রকাশিত হয় নি।

'অন্যপ্রকাশ'-এর নাসের ভাই (আবদুল্লাহ্ নাসের) ফোন করে বললেন, *হুমায়ূন আহমেদ স্মারকগ্রন্থে*-এ তারা এই লেখাটা ছাপবেন। আমি কিছু পাল্টাতে চাই কি না?

আমার কাছে লেখার কপি ছিল না। নাসের ভাই কপি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি সসংকোচে আমার লেখা পড়েছি দুইবার। না, আমি কিছু পাল্টাতে চাই না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূনের প্রথম প্রহর...

নওয়াজীশ আলী খান

সময়টা সঠিক মনে নেই। ১৯৮৩ সালের গোড়ার দিকের কথা। অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ'র 'পাখির বিদায়' গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ। বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন নিয়ে ধারাবাহিক নাটক 'মণিহার'। নাটকটি চিত্রায়নের জন্য 'দখিন হাওয়া' নামের বাড়িতে যাওয়া। বাড়িটি অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ সাহেবের। ধানমণ্ডিতে অবস্থিত। নামটি এখনো আছে, চেহারা বদলেছে। বাড়িটি এখন অ্যাপার্টমেন্টে রূপান্তরিত।

'পাখির বিদায়' গল্পটি অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ-এর উত্তম পুরুষে বর্ণনা করেছেন। পাখি তাঁর বাসার কাজের মেয়ে। বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পের নাম 'পাখির বিদায়'। নাটকটির প্রধান পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অধ্যাপক মুজিবুর রহমান খান। যিনি ১৯৬৫ সালে ইন্দো-পাক যুদ্ধের সময় *পাঠক মুজিব* নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আর পাখি চরিত্রে অভিনয় করেন ফাল্গুনী হামিদ। অনবদ্য এই ছোটগল্পটি কলকাতার *প্রবাসী পাঠচক্র* নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সাহিত্য সংকলনে প্রথম ছাপা হয়। বহির্দৃশ্য চিত্রায়নের জন্য গল্পের 'দখিন হাওয়া' নামের বাড়িটিই নির্ধারণ করা হয়। তখন দখিন হাওয়ার সামনে, দক্ষিণ দিকে, সুন্দর একটি বাগান ছিল। সেই বাগানে পাখির বিদায় চিত্রায়ণ শুরু। ক্যামেরায় পাখি ও ইব্রাহীম খাঁ'র অংশগ্রহণে একটি দৃশ্য ধারণের জন্য নাটকের সহকারী পরিচালক মঞ্জুরুর রহমান কাউন্ট ডাউন শুরু করেন। কাউন্ট ডাউন হলো ১০ থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে নিচের দিকের সংখ্যাগুলোকে বলা, অর্থাৎ ১০.৯.৮.৭.৬.৫.৪.৩.২.১.০ অ্যাকশন। অ্যাকশন বলার সঙ্গে ক্যামেরায় ছবি ধারণ শুরু। মনিটরে ক্যামেরার ছবিতে ইব্রাহীম খান ও পাখি ছাড়া আরও একটি চিত্র দেখা গেল, সঙ্গে সঙ্গে পরিচালক হিসেবে আমি বললাম, কাট। চিত্রগ্রহণ বন্ধ। ক্যামেরার সামনে নাটকের চরিত্র ছাড়াও লাল টিশার্ট পরিহিত একজন যুবকের ছবি দেখা যায়। কোলে তাঁর একটি কন্যাশিশু। মঞ্জুরুর রহমান ক্যামেরা শট থেকে ওই যুবককে সরে যেতে বলেন। দু' চারটি শট গ্রহণ করা হলো। ইতোমধ্যে শুটিং স্থলে প্রচুর দর্শকের আগমন। মঞ্জুরুর রহমান এত দর্শক সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন। দর্শকদের উৎসাহ অপরিসীম। ক্যামেরা এঙ্গেল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের অন্যত্র সরিয়ে দিতে হয়। সে এক মহা ঝামেলা। এক পর্যায়ে চিত্রধারণের কাজ মোটামুটি নির্বিঘ্নে শেষ হলো। এবার চা-বিরতি।

দখিন হাওয়ায় থাকেন ইব্রাহীম খাঁ সাহেবের ছেলে। তিনি চিত্রধারণ দলকে চা পানে আপ্যায়নের আমন্ত্রণ জানান। সাদরে তা গ্রহণ করা হয়। অদূরেই তাঁর অফিস কক্ষ। অফিস কক্ষে অপেক্ষা করছে বহির্দৃশ্য ধারণ দল। সেখানে উপস্থিত কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন বাড়ির কর্তা। এর মধ্যে সেই লাল টিশার্ট পরিহিত যুবককে পরিচয় করিয়ে দিলেন যে, তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা হুমায়ূন আহমেদ। ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করে সদ্য ফিরে এসেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক। চকিতে তাকাতেই হয় তাঁর দিকে। কারণ এ নামের সঙ্গে পরিচয় আগে থেকেই। মাথা ভরা কোঁকড়ানো চুল। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। চোখে মুখে গভীর প্রত্যয়। আত্মবিশ্বাসী। কিঞ্চিৎ অহংকারী। মৃদুভাষী। প্রথম দর্শনে আকর্ষণ করার মতো বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এই যুবক। ইতিমধ্যে তাঁর অন্তত দুটি উপন্যাস বাজারে নাম করেছে। *নন্দিত নরকে* এবং *শঙ্খনীল কারাগার*। দুটি উপন্যাসেরই নাট্যরূপ দিয়েছে অন্যেরা। উপন্যাস অবলম্বনে বিটিভির জন্য নাটক নির্মাণ করেছেন স্বনামধন্য দুই নাট্যব্যক্তিত্ব, আতিকুল হক চৌধুরী (শঙ্খনীল কারাগার) এবং মোস্তফা কামাল সৈয়দ (নন্দিত নরকে)।

তাঁর উপন্যাস থেকে নাটক দুটি নির্মাণে যথা নিয়ম পালন করা হয় নি। অনুমতি ছাড়াই নাট্যরূপ দেওয়া ও নাটক নির্মাণ করায় বিষয়টিকে ভালোভাবে গ্রহণ করেন নি তিনি। খুব কড়া ভাষায় পত্র লেখেন এবং আর্থিক বিষয়টি তাঁর মা'র সঙ্গে মিটিয়ে নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট নির্মাতাদের তাগিদ দেন। সেভাবেই বিষয়টির সমাধান হয়। অতএব তাঁকে ঘিরে বিটিভিতে বেশ আলোচনা হয়।

গভীর আগ্রহ নিয়ে তাঁকে প্রস্তাব দেওয়া হলো বিটিভির জন্য নাটক নির্মাণের। স্বভাবসুলভ সরাসরি জবাব দিলেন, তিনি গল্প ও উপন্যাস লেখেন, নাটক তাঁর ক্ষেত্র নয়। তিনি আগ্রহীও নন। গল্পে উপন্যাসে যাঁর এমন হাত, নাটক লেখা তাঁর জন্য কঠিন নয়। আবারও অনুরোধ। তিনি রাজি হলেন না। আশপাশে কয়েকজন রমণীমূর্তির আবির্ভাব। তাঁদের মধ্যে একজন উচ্চারণ করলেন 'দুলাভাই লেখেন না টেলিভিশনের জন্য'। দুলাভাই সম্বোধনে বোঝা গেল তিনি হুমায়ূন আহমেদ-এর শ্যালিকা। প্রথম পরিচয় এভাবেই হুমায়ূন আহমেদ-এর সঙ্গে।

তিনি রাজি হন নি, তাই বলে এভাবে তো আর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া যায় না! তাঁর বাড়ির ঠিকানা নেওয়া হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিফোন নম্বর নেওয়া হলো। টেলিফোন করা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে। পাওয়া গেল না তাঁকে। যিনি টেলিফোন ধরলেন, পরে ফোন দিতে বললেন তিনি। এরপর কয়েকবার ফোন করার পর পাওয়া গেল। তিনি জানালেন, টেলিভিশনের নাটকের জন্য তিনি উৎসাহ বোধ করছেন না। অবশেষে সিদ্ধান্ত তাঁর বাসায় যাওয়ার।

তিনি থাকতেন শ্যামলীতে। বাংলাদেশের প্রধান কবি, শামসুর রাহমানের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে হয় হুমায়ূন আহমেদের বাসস্থলে। একটি পাকা, অপ্রশস্ত রাস্তা। দু'পাশে সবুজ ধানক্ষেত। গাছের গোড়ায় পানি। পানিতে ছোট ছোট মাছ দৌড়ে বেড়ায়। বাতাসে ধানগাছগুলো আন্দোলিত। দেখলে চোখ জুড়ায়। এরই একদিকে হুমায়ূন আহমেদের বাসস্থান। দোতলায় একটি ফ্ল্যাট। প্রথমে গিয়ে তাঁকে পাওয়া গেল না। কেউ একজন জানালেন 'আসতে দেরি নেই, অপেক্ষা করেন'। অপেক্ষার পালা। খুব বেশি দেরি হলো না। সস্ত্রীক হুমায়ূন এলেন। হুমায়ূন আহমেদের কোলে সেই ছোট্ট ফুটফুটে কন্যা, নাম তার নোভা। গুলতেকিন আহমেদ হুমায়ূন আহমেদের স্ত্রী। নামটি দাদা অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ'র দেওয়া। ফারসি নাম। গুল অর্থ ফুল। সেখান থেকেই গুলতেকিন—ফুলের বাগান! চমৎকার মহিলা। সুন্দরী, নম্রভাষী, সৎস্বভাবের হৃদয়বতী বাঙালি রমণী। সাদরে অনুরোধ জানালেন বসার জন্য এবং স্বামীকে অনুরোধ করলেন টেলিভিশনের জন্য যেন তিনি নাটক লেখেন। হুমায়ূন আহমেদ হয়তো বাধ্য হয়েই বললেন, চেষ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করব। কয়েক বারের অনুরোধের পরে তিনি চেষ্টা করবেন জেনে প্রায় নিশ্চিত হওয়া গেল, অনুরোধের ঢেকি তিনি গিলেছেন। এখন অপেক্ষা।

আবার টেলিফোন বিশ্ববিদ্যালয়ে। যথারীতি পাওয়া গেল না তাঁকে। যখন পাওয়া গেল তিনি জানালেন লিখেছেন। কখন আসতে পারেন টেলিভিশনে! ঠিক হলো পরের দিন পাণ্ডুলিপি নিয়ে টেলিভিশনে আসবেন।

নাটকের নাম 'প্রথম প্রহর'। সীমিত কয়েকটি চরিত্র। ছোট ছোট দৃশ্য। কথার পিঠে কথা। সাবলীল সংলাপ। তরতর করে এগিয়ে যাওয়া। সংলাপগুলো এমন, মনে হলো চরিত্রগুলো কথাবার্তা শুরু করলে আপনা আপনি এগিয়ে যাবে। সংলাপ মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই। অনায়াসে ঠোঁটে এসে যায়। এমনই সহজ, সরল, সংলাপ। বিস্ময়াবিষ্ট একটি শব্দ বেরিয়ে এলো মুখে 'অসাধারণ'। নাটকটি একটি মেসবাড়ি কেন্দ্রিক। নাটকের একটি অন্যতম চরিত্র মহিম। একজন হস্তরেখাবিদ। চরিত্রটি খুবই আকর্ষণীয়। অনবদ্য চরিত্র, সত্যিকার অর্থেই অনুকরণীয়। যে কটি চরিত্র নাটকে আনা হয়েছে, প্রত্যেকটি চরিত্রকেই নাট্যকার সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। যেটি সচরাচর নাটকে দেখা যায় না। নায়ক-নায়িকা থাকেন নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে। অন্যসব চরিত্র তাদেরকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। আলোড়িত হয়। নাটককে এগিয়ে নেয়। এটাই এযাবৎকালে দেখা নাটকের চিত্র। হুমায়ূনের লেখা নাটকটি একেবারেই ব্যতিক্রম। নাটকের কপি তৈরি হলো। কাস্টিং শেষ। মহড়া দু'একদিনের মধ্যে। তখন একটি নাটকের জন্য কমপক্ষে চার দিনের মহড়া ছিল অবধারিত।

এরই মধ্যে টেলিভিশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি নাটক প্রচার হলো। খুলনার একটি দলের প্রদর্শিত মঞ্চনাটক। প্রচার হলো টেলিভিশনে। যে রাতে নাটকটি প্রচার হলো, পরের দিন সকালে বেশ হইচই। তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী টেলিভিশনে এসে সংশ্লিষ্টদের উপর প্রচণ্ড হম্বিতম্বি। নাটকের সব চরিত্রই ধুতিপরা, অমুসলিম। এটি একটি অগ্রহণীয় কর্ম। বাংলাদেশ টেলিভিশনে এ সময় যিনি নাটকের দায়িত্বে ছিলেন, তাঁকে 'প্রথম প্রহর'-এর গল্প ও চরিত্র সম্পর্কে জানানো হলো। তিনি মহিম চরিত্রটি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আপত্তি জানালেন। কারণ জনাতে চাইলে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে বিপত্তির কথাটি বললেন। এ নাটকে মহিমকে যদি ধুতি পরানো না হয়, তাহলে নির্বিঘ্নে পাস করানো যায়। কী করা যেতে পারে! মহিমের তিন পকেটওয়ালা শার্টের সঙ্গে পাজামা, তাহলেই সমস্যার সমাধান। মেনে নিতে সমস্যা। কেন এমন করতে হবে! যেহেতু নাটকের সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে, এত কষ্ট করে নাটক সংগ্রহ করা হয়েছে! এই সামান্য কারণে নাটক হবে না! একথা মানা যায় না। বিষয়টি নিয়ে হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আলাপ হলো। চুপ করে শুনলেন তিনি। খানিক পরে গম্ভীর গলায় বললেন, 'পাণ্ডুলিপিটি দিন'। পাণ্ডুলিপিটি গোল করে হাতে নিলেন এবং কামরা পরিত্যাগ করার সময় বললেন, 'দেখি'। নাটক হবে না—এ বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত হয়ে মাথায় হাত। অসম্ভব রকম মন খারাপ। এত পরিশ্রম! সবই পণ্ডশ্রম! ধৈর্য পরীক্ষা।

পরের দিন সম্পূর্ণ নতুন একটি নাটক নিয়ে উপস্থিত। সেটি সম্পর্কে পরে বলা যাবে। এরও দু'একদিন পরে সম্পূর্ণ নতুন অন্য একটি নাটক নিয়ে এলেন তিনি। একই নাম, 'প্রথম প্রহর'। কাহিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন। নাটকটি খুব সম্ভব তিনি *অন্যদিন* উপন্যাস অবলম্বনে লিখে থাকবেন। তৃতীয় নাটকটি, যেটির কথা বলা হচ্ছে, 'প্রথম প্রহর' নাম হলেও ঘটনা ভিন্ন। তাঁর প্রকাশিত *প্রথম প্রহর*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাস এবং টেলিভিশনের 'প্রথম প্রহর' নাটক একেবারেই ভিন্ন কাহিনী সমৃদ্ধ। *প্রথম প্রহর* উপন্যাসটি টেলিভিশন থেকে প্রচারের পরে লেখা বলে প্রতীয়মান হয়। 'প্রথম প্রহর' নাটকটি লেখা হয় ১৯৮৩ সালের জুলাই/আগস্ট মাসে। আর *প্রথম প্রহর* উপন্যাসটি লেখা সম্ভবত ১৯৯০-এর দিকে। এই উপন্যাসটি হুমায়ূন আহমেদ নওয়াজীশ আলী খানকে উৎসর্গ করেন। টেলিভিশনের জন্য হুমায়ূন আহমেদের লেখা প্রথম নাটক কোনোদিনই প্রচার হয় নি।

টেলিভিশনের নাটক প্রচারের প্রায় তিন মাস আগে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ত্রৈ-মাসিক পত্রিকা টিভি গাইডে 'প্রথম প্রহর' গল্পের সারাংশ প্রকাশিত হয়। যেহেতু নামটি বইয়ে প্রকাশিত, নাম পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাহলে ঘটনাটা কী আসলে! সাধারণত টিভি গাইডে যে গল্পের সারাংশ দেওয়া হয়, তা যে-কোনো কাহিনির গল্পাংশ হতে পারে। এমন করে সাজানো থাকে, যে-কোনো নাটকের ক্ষেত্রেই ওই বক্তব্য প্রয়োগে অসুবিধা হয় না। অতএব একটা নামের তিনটা নাটক/তিনটা কাহিনি, কিন্তু গল্পের সারাংশ এক, শিরোনাম এক। দুটি টিভি নাটকের কথা বলা হলো। তিন নম্বরটি এল কোত্থেকে ? আছে। তিন নম্বরও আছে। ঘটনাটা এই, প্রথম নাটকটি হুমায়ূন আহমেদ নিয়ে গিয়েছিলেন। যেটি মহিম-এর চরিত্র নিয়ে সমস্যা। তার পর দুই নম্বর নাটকটি তিনি জমা দিয়েছেন যেটি, পাঠ করেও মনে হয়েছে 'অসাধারণ'। টেলিভিশনের তৎকালীন সুযোগ-সুবিধায় ওই নাটকটি নির্মাণ করা সম্ভব ছিল না। কাহিনিটি ছিল 'বনফায়ার' ঘিরে। নাটকের চরিত্রগুলো একটি ঘন জঙ্গলে 'বনফায়ার' করে উৎসবে নিমগ্ন। হঠাৎ পাশের একটি জলাশয়ে এক তরুণীর ভাসমান লাশ দেখতে পায় সদস্যদের একজন। তারপর শুরু হয় এই লাশ কার, কী করে এলো, ইত্যাদি...। এটিও টিভি নাটকে রূপান্তর করা সম্ভব হলো না। তিনি লিখলেন তৃতীয় নাটক, নাম তার 'প্রথম প্রহর'। কাহিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন। চরিত্র ভিন্ন। এবং সেই সময়কার টেলিভিশনের সুযোগ-সুবিধা দ্বারা সহজেই নির্মাণ সম্ভব। এই নাটকটি কোনো উপন্যাস থেকে নেওয়া কিনা তা জানা যায় নি। নাটকের বিষয় ছিল সততা। 'প্রথম প্রহর' ধারণ হয় ১৯৮৩ সালের ১১ আগস্ট। যাঁরা অভিনয় করেণ তাঁরা—মাসুদ আলী খান, সাজ্জাদ হোসেন (এখন আর টেলিভিশন নাটকে দেখা যায় না), রানী সরকার, লাকী ইনাম, শাহরিন খালেস লিটা (একসময়ে 'যদি কিছু মনে না করেন' অনুষ্ঠানে উপস্থাপক ফজলে লোহানীর সঙ্গে সহ উপস্থাপন করতেন। তিনি বিদেশে অবস্থান করছেন)। আশরাফ উদ্দিন এবং নওয়াজীশ আলী খানের সব নাটকে যিনি অভিনয় করেছেন সেই অসাধারণ নাট্যশিল্পী আবুল হায়াত। নাটকটি এ সপ্তাহের নাটক চাঙ্কে প্রচার হয়। সম্প্রচার শেষে কয়েকটি টেলিফোন আসে। এর মধ্যে একটি টেলিফোন করেন এক সময়কার অন্যতম মননশীল ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের কৃতী টেলিভিশন প্রযোজক বেলাল বেগ। তিনি জানান যে, বাংলাদেশে টেলিভিশন নাটকে একটি নতুন অধ্যায়ের শুরু হলো, এই নতুন নাট্যকারের আগমনে। সত্যিকার টেলিভিশন নাটক এমন হওয়ারই কথা। বক্তৃতা নয়, ক্লাসরুম নয়, বড় বড় কথার কপচানী নয়। সহজ, সরল, মধ্যবিত্তের কড়চা। বাংলাদেশ টেলিভিশনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। টেলিভিশনে এভাবেই যাত্রা শুরু হলো হুমায়ূন আহমেদ এবং তাঁর অকল্পনীয় জনপ্রিয় নাটকের।

টেলিভিশনে প্রচার হওয়া তাঁর দ্বিতীয় নাটক কোনটি মনে করা যাচ্ছে না। তবে বেশকিছু নাটকের নাম মনে পড়ে। এর মধ্যে 'অসময়', 'অযাত্রা', 'বিবাহ', 'এসো নীপবনে', 'ঐজাবোর্ড', 'মাটির ও পিঞ্জিরার মাঝে', 'মরণরে তুহুমম', 'নিমফুল' ইত্যাদি। এসব নাটকের নির্মাতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নওয়াজীশ আলী খান। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু টেলিফিল্ম যেমন—'কবি', 'গাছ মানুষ' ও 'জননী'। 'জননী' নাটকটি জাতিসংঘের একটি প্রতিযোগিতায় 'সার্টিফিকেট অব মেরিট' লাভ করে। জানা যায় পৃথিবীর বহু দেশের টেলিভিশনে এই নাটকটি নারীর ক্ষমতায়নের মডেল হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে। এ ছাড়া কয়েকটি চমৎকার পাবলিক সার্ভিস অ্যানাউন্সমেন্ট (পি.এস.এ) অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে। যেমন—*ঘুটা-ঘুটা, চোখ* এবং *আমরারে রক্ত দিবো কেডা*। হুমায়ূন আহমেদ রচিত ও নওয়াজীশ আলী খান প্রযোজিত শেষ নাটকের নাম 'ছায়াবৃত্ত'। নাটকটি ঈদুল আযহার বিশেষ নাটক। প্রযোজনা শেষ করতে পারেন নি নওয়াজীশ আলী খান। হাসপাতালে যেতে হয় অসুস্থ হয়ে। নাটক শেষ করেন রিয়াজউদ্দীন বাদশা। টেলিভিশনে সার্থক সিরিজ, সিরিয়াল রচনার প্রবর্তকও নিঃসন্দেহে হুমায়ূন আহমেদ। 'বহুব্রীহি', 'এইসব দিনরাত্রি', 'অয়োময়', 'কোথাও কেউ নেই'। বিভিন্ন পরিচালক নির্মাণ করলেও প্রধান শক্তি নাট্যকার হুমায়ূন আহমেদ। এর মধ্যে 'বহুব্রীহি' ও 'অয়োময়'-এর প্রযোজক নওয়াজীশ আলী খান। 'এইসব দিনরাত্রি' মুস্তাফিজুর রহমান এবং 'কোথাও কেউ নেই'-এর নির্মাতা বরকতউল্লাহ। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের আর কোনো টেলিভিশন এই মানের নাটক সম্প্রচারের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে নি। বাংলাদেশ টেলিভিশনে হুমায়ূন আহমেদের নাটক পরিচালনা করেছেন বেশ কয়েকজন সার্থক নাট্যনির্মাতা। তাঁরা—প্রয়াত আবদুল্লাহ আল মামুন, আতিকুল হক চৌধুরী, রিয়াজউদ্দীন শেখ বাদশা প্রমুখ।

হুমায়ূন আহমেদ তাঁর কোনো একটি লেখাতে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর নাটক পাঠান্তে নওয়াজীশ আলী খান সবসময়ই 'অসাধারণ' বলে মন্তব্য করত। কথাটি ঠিক। বলতে দ্বিধা নেই, তাঁর লেখা নাটক যেগুলো পাঠ করার সৌভাগ্য হয়েছে, সত্যিকার অর্থে তার সবই ছিল অসাধারণ। টেলিভিশন নাটকে এখন পর্যন্ত তার সমকক্ষ কোনো টিভি নাট্যকারের আবির্ভাব হয় নি। তাঁকে ছাড়িয়ে যাওয়া তো দূরের কথা! তাঁর টিভি নাটকের বৈশিষ্ট্য হলো, সহজ, সরল, স্বাভাবিক সংলাপ, যা অনায়াসে যে-কোনো অভিনয়শিল্পী উপস্থাপন করতে পারেন। কাহিনির সারল্য ও হৃদয়স্পর্শী করার ক্ষমতা। সৎগুণাবলি সম্পন্ন চরিত্রের সমাগম। প্রতিটি চরিত্রই নাটকে যেন অপরিহার্য। নায়ক যতটা প্রয়োজনীয়, কাজের মেয়ে বা বৃদ্ধা মহিলাটি একইভাবে প্রাধান্য প্রাপ্ত। এ দেশের নাটকে নায়ক-নায়িকারা সর্ব সৎগুণসম্পন্ন। আর একটি দল ভিলেন হিসেবে সমস্ত কিছুই নেতিবাচক চরিত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এই গতানুগতিক ধারার অপনোদন করেছেন হুমায়ূন আহমেদ। তাঁর প্রায় সব চরিত্রই ইতিবাচক, সৎগুণাবলিসম্পন্ন ও মানবিক গুণে সমৃদ্ধ। এ যেন তাঁরই নিজের চরিত্রের প্রতিফলন।

প্রায়শই একটা কথা শুনতে হয়। কথাটি—ওয়াজীশ আলী খান হুমায়ূন আহমেদকে নাট্যকার বানিয়েছেন। অত্যন্ত বিনয়, বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সংগে জানাতে চাই যে, হুমায়ূনদের মতো অসাধারণ ও শক্তিমান সৃষ্টিশীলদের কেউ তৈরি করতে পারে না, বানাতে পারে না। তাঁরা হন। স্রষ্টা তাঁদের তৈরি করেন। অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী এই আলোকছটা এই প্রদীপ দেশের যে কোনো স্থানেই থাকুন না কেন, তার দীপ্তি চোখে পড়বেই। সে আলো সর্বত্র ছড়িয়ে যাবেই। সে ঔজ্জ্বল্য সবকিছুকে আলোকিত করবেই। জনগণ ভালোবাসবে। দেশ সম্মান দেবে। যার প্রতিফলন ঘটেছে হুমায়ূন আহমেদের জীবনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝকঝকে রোদ শেকড়হীন চাঁদ আর হুমায়ূন আহমেদের গভীর মৃত্যুবোধ

নাসরীন জাহান

একটি বিস্তার করে থাকা গভীর গভীরতমায় যাঁর শেকড় প্রোথিত, তেমন কোনো বৃক্ষকে উঠিয়ে তার চিরচেনা আলোবাতাস জোছনা রোদ্দুরের বাইরে কোথাও গিয়ে রোপণ করলে যে দশা হতো, কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদকে তাঁর প্রিয় জগৎ থেকে নিউইয়র্কে নিয়ে ফেলার পর তাঁরও সেই দশাই হয়েছিল। *নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝক রোদ*-এর অনেক লেখাতেই কম-বেশি আছে সেই প্রকৃতিতে গিয়ে তাঁর সেখানে মানিয়ে চলার চেষ্টার সাথে সাথে জন্মমৃত্যুর সাথে যুদ্ধ অনুভবের বয়ান।

সাংঘাতিক ধৈর্য আর স্থৈর্যের সাথে তিনি প্রতিনিয়ত মুখটাকে সহজ-স্বাভাবিক রেখে ভেতরে বয়ে বেড়িয়েছেন ক্যান্সার নামক এক মৃত্যুঘাতী দৈত্যকে। মৃত্যুর সাথে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে পরিচয় তাঁর। আগেও কয়েকবার নিকটবর্তী মৃত্যুর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছে। কিন্তু এবার যেন তিনি তাঁর সহজাত অনেক ক্ষমতার জাদুবলে তাঁর নিঃসঙ্গ ছুটে যাওয়াকে অনেকাংশেই খেলে যাওয়া হিসেবে প্রকাশ করেছেন।

বই শিরোনাম রচনাতেই আছে এক ভয়ংকর অনুভবের প্রকাশ : "টুটুল কিছুদিন ধরেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গেয়ে ডলার কামাচ্ছে। সব অনুষ্ঠানের সব শেষের গান নাকি হুমায়ূন আহমেদের লেখা 'চান্নিপসর রাইতে যেন আমার মরণ হয়'। সঙ্গতকারণেই এই গানের শ্রোতারা খানিকটা বিচলিত হন। শ্রোতাদের এই বিচলিত অবস্থা টুটুল উপভোগ করে। আমি সুস্থ হয়ে দেশে ফিরলে টুটুল খানিকটা বেকায়দা অবস্থায় পড়বে। সে সবাইকে ধারণা দিয়ে রেখেছে, নিউইয়র্ক যাত্রা আমার অগস্ত্য যাত্রা"।

কী করে সম্ভব? এ বছর ফেব্রুয়ারিতে বই বেরোনোর আরও আগে আমরা সবাই জানি সফল থেরাপি হচ্ছে, তিনি সুস্থ আছেন। মৃত্যুর ছায়াচিত্র কারও মনে উঁকি দিলেও তাঁর দেহমনের অবস্থা শুনে তা বাতাসে উবে গেছে। কী করে টুটুল এই সর্বনাশা ভাবনা ভাববে? এটা হুমায়ূন আহমেদের কাছের মানুষদের কাছে মৃত্যু নিয়ে তাঁর এক ধরনের সহজাত মজার প্রকাশ। আমি নিশ্চিত জানি, এখন এই লাইন যতবার টুটুল পড়বেন, কাঁদবেন।

কিন্তু মজায় মজায়ও নিজের মৃত্যু নিয়ে এমন একটি বাক্য? ভেতরের ঘুন কি ফিসফিস বলছিল নিরন্তর তাঁকে কিছু? যার কাছ থেকে তিনি নিজেই তাচ্ছিল্যে পালিয়ে বেড়াতেন? তিনি ফিরে আসেন নি বলে তাঁর ভেতর থেকে উচ্চারিত এই বাক্য কী কঠিন করুণ বোধের মধ্যেই ফেলল লক্ষ লক্ষ বাঙালি পাঠককে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর আগেও তিনি বিদেশে গিয়ে আরও বেশি সময় থেকেছেন। বারবার এক একটি নতুন 'সংসার' সাজিয়েছেন। বাবার মৃত্যুর পর একবার, গুলতেকিনের সঙ্গে বিয়ের পর, বিয়ে ভাঙার পর একাকী জীবনে, শাওনের সাথে বিয়ের পর দখিন হাওয়ায় এসে... একের পর এক পাঁচ বার সংসার হওয়ার পর চিকিৎসার জন্য ফ্ল্যাট ভাড়া করে শাওন এবং দু'সন্তান নিয়ে ষষ্ঠ সংসারটার সময়টা যেন হুমায়ূন আহমেদের পারই হতে চাইছিল না। হাঁড়ি-বাসন কিনে পরম আপনজনদের সাথে কাটালেও একদিকে ক্যামোথেরাপির যন্ত্রণা, আরেক দিকে হয়তো বা কানের কাছে একাকী নিঃশব্দে শোনা ঘুন-এর ফিসফিসানির কারণে প্রতিনিয়ত তিনি দেশে ফেরার জন্য অস্থির থেকেছেন। এর মাঝেও বাংলার চাঁদ বৃষ্টি রোদ্দুরকে নিউইয়র্কে নিরন্তর খোঁজার কী আপ্রাণ আকুতিই না তাঁর মাঝে ছিল—"নিষাদ বলল, বাবা দেখো, বাংলাদেশের চাঁদটা এখানে চলে এসেছে। আকাশে কত বড় চাঁদ। তাকিয়ে দেখি মেপল গাছের কাছে নিউইয়র্ক নগরীতে সম্পূর্ণ বেমানান এক চাঁদ নির্লজ্জের মতো উঠে বসে আছে। তার তো থাকার কথা বাঁশবাগানের মাথায়।"

'নো ফ্রি লাঞ্চ' লেখাটায় আছে একদিকে একজন ব্যক্তিত্ববান লেখক হিসেবে বিদেশি দরিদ্র কোটায় চিকিৎসা না নেওয়ার দুর্মর সিদ্ধান্ত, আরেকদিকে অসুখ বা মৃত্যুকে অগ্রাহ্য না করে চিকিৎসাটা চালিয়ে যাওয়ার দুঃসহ কথন। লেখকরা উদাসীন বাউল পাগল... নানা জনের নানা আখ্যায়ন থাকে। অনেক লেখক নিজের অসুখকে তাচ্ছিল্য করে অদ্ভুত এক বোহেমিয়ান বোধে ঠিকমতো চিকিৎসা করার অবস্থা থাকলেও সেটাকে এড়িয়ে ডাক্তারের বর্ণিত নিষিদ্ধ খাদ্যকে, জীবনের অনিয়মকে ত্যাগ না করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন।

হুমায়ূন আহমেদের মধ্যে বাউল এবং বোহেমিয়ান বাস করলেও তিনি তাঁর এই রোগটিকে কখনো তাচ্ছিল্য করেন নি। বরং তাঁর ৩০ বছরের বন্ধু সিগ্রেটকে তিনি হামাগুড়ি দিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে থাকা কনিষ্ঠ পুত্র নিনিতকে দেখে ত্যাগ করেছেন। প্রগাঢ়ভাবে অনুভব করেছেন, 'ওর জন্য আমার আরও কিছুদিন বাঁচা দরকার'। তারপরও এই বইয়ের প্রতিটি লেখায় ঝকঝকে রোদের মুদ্রার ওপিঠের মতো আছে কমবেশি আঁধার মৃত্যু... পাদটিকায় কেন হুমায়ূন আহমেদ লিখবেন আব্রাহাম লিংকনের অল্প বয়সে মারা যাওয়া দুটি সন্তান নিয়ে তাদের পিতার বোধ—"গডের সৃষ্ট কোনো জিনিসকে ভালোবাসতে নেই। কারণ তিনি কখন তার সৃষ্টি মুছে ফেলবেন তা তিনি জানেন, আমরা জানি না।"

অনেক বেদনা ছিল হুমায়ূন আহমেদের। কিন্তু তাঁর পাশে যারা তাঁর জাদুকরী গল্পকথনে হাস্যরসে মত্ত থাকতেন তাদেরকে তিনি কখনো তাঁর সেই বেদনার আঁচটুকু টের পেতে দিতেন না। এই বইটিতেই কেন এল এমন বেদনাতুর দীর্ঘশ্বাস? আঁধারে ভয় পাওয়া শীলার পাশে সারা রাত কাঁধ পেতে রাখলেন বাবা হুমায়ূন আহমেদ। সে বলল, তুমি একজন ভালো মানুষ। তখন তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীতে খারাপ মানুষ আছে, খারাপ বাবা নেই।

সেই বাবারই দিনান্তে এসে এই অনুভূতির প্রকাশ, "এখন মনে হয় শীলা বুঝে গেছে পৃথিবীতে খারাপ বাবাও আছে। যেমন, তার বাবা।"

এই বইটিতে লেখকের নানারকম জীবনের অভিজ্ঞতার কথা আছে। বর্তমানের কথা লিখতে লিখতে ফিরে গেছেন অতীত স্মৃতিচারণে... বন্ধু-পরিবারদের নিয়ে নানা কথার প্রকাশ ছাড়াও আছে জীবন-জ্ঞান-দর্শন নিয়ে তাঁর ভাবনার প্রকাশ। 'কচ্ছপ কাহিনী' লেখাটা পড়লে বোঝা যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যান্সার নামক ব্যাধিটি কী মরণ কামড়ের মধ্যেই না রেখেছিল তাঁকে! তিনি যেন সেই কামড়ের জোরেই সশব্দে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিয়ে অনুভব করলেন, আমাদের দেশে একটা ক্যান্সার হাসপাতাল হওয়া দরকার এবং এজন্য তিনি সুস্থ হয়ে দেশে ফিরবেন এবং হাসপাতালটার জন্য প্রথমে তিনি একজন ভিক্ষুকের কাছে হাত পাতবেন। এই গ্রন্থের গল্পগুলোর মধ্যেও ছায়া বিস্তার করে আছে মৃত্যু।

এ বছরের মে মাসে তিনি এলেন সবাইকে তাজ্জব করে দিয়ে হাস্যফুলে পল্লবিত এক সুখী রাজপুত্রের মতো। ফের নিজ ক্ষমতাবলে নুহাশপল্লীতে নিজের আগের আসন বিস্তার করে ওখানকার ঘাস-মাটি রৌদ্র জোছনা বর্ষণে স্নাত হয়ে তিনি বালকের মতো ছুটতে শুরু করলেন। টিভি ইন্টারভিউ... ঘেটুপুত্র কমলার প্রিমিয়ার শো... কোথায় নেই তাঁর হাস্যোজ্জ্বল পদচারণা ? আশ্বস্ত হলো বাঙালি, ভয়ের কিছু নেই। জাস্ট সামনে একটা ছোট্ট সেতু, ওটা পার হলেই... ঘুন পোকাটার গলা কি চেপে ধরেছিলেন হুমায়ূন আহমেদ ? শুনতে চান নি মানতে চান নি একফোঁটা অশুভ কিছু ? ফিরে এসে কী করবেন। তাঁর আঁকা ছবি প্রদর্শনীতে তিনি কী করবেন ? ফেরার পর কী হবে, কতই না আয়োজন!

এইবার আজীবন যে এক শিশু-বালক জাদুকর বাস করে হুমায়ূন আহমেদের সত্তায়, তাকে দিয়ে নিজেই যেন তিনি নিজেকে জাদু দেখিয়ে মত্ত রাখলেন। যে মানুষ ইন্টারভিউয়ে রীতিমতো এলার্জি অনুভব করতেন, কয়দিন পরই যিনি সুস্থ হয়ে ফিরবেন, তিনি এত চ্যানেলে এত পত্রিকায় এত সাক্ষাৎকার দিলেন ? কেন ? আর সেসব সাক্ষাৎকারের অনেক কথাই তো ছিল মৃত্যুতে আচ্ছন্ন। আমরা কেন কেউ কিচ্ছুটি টের পেলাম না, আন্দাজ পর্যন্ত না ? তারাশংকরের মতো এই বইয়েও তিনি লিখেছেন, জীবন এত ছোট কেন ?

অনেক বড় মানুষ অনেক বড় ব্যাপার টের পান, হুমায়ূন আহমেদও পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আরও কিছু করার ছিল, কিছু কাজ অসমাপ্ত ছিল... নিনিতের ছুটে চলতে থাকা সত্তা দেখার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাই শেষদিকে নিজেকে ভোলাচ্ছিলেন নিজের জাদুতেই... আর পাঠক-বন্ধু-আত্মীয়দের তাঁর হজম করে হাসতে পারার সহজাত স্বভাবে।

তাই দীর্ঘ ন' মাস তিনি একটি মৃত্যুঘাতী রোগ নিয়ে দেশের বাইরে গেলেও কারও মনে তাঁর কোনো ক্ষতি হতে পারে এর স্বাভাবিক প্রস্তুতিও ছিল না। তাই তাঁর মৃত্যুতে 'আকস্মিক মৃত্যু'র বাজ পড়েছিল হাজার লক্ষ মানুষের মাথায়। এ দেশের বৃক্ষ পল্লবে, বর্ষণে, রোদে... জোছনায়, ঘাস মাটিতে।

যা মানতে পারা, সহ্যাতীত, দুঃসহ। লক্ষজনের নোনতাজলের প্রতিটি ফোঁটায় তা প্রতিফলিত। তাই তাঁর আত্মার সাথে যুক্ত মানুষেরা আশেপাশে প্রকৃতিতে নুহাশপল্লীতে পুবে-পশ্চিমে উত্তরে দখিন হাওয়ায়, নিজেদের সত্তায় তাঁর জীবন্ত পদচারণা অনুভব করেন। তাঁকে যেন আচমকা দেখতে পান—তিনি জোছনায়, পিঁড়িতে বসে নিরন্তর লিখে চলেছেন। কিন্তু তারপরও দুর্মর বেদনা, ব্যাপক শূন্যতা হাহাকারের লেশ পর্যন্ত পাঠকহৃদয় থেকে কিছুতেই যায় না; প্রকৃতি থেকেও না।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহস্যকার হুমায়ূন আহমেদ

নাসির আলী মামুন

ষাটের দশকের শুরুতে দৈনিক পত্রিকার খসখসে পৃষ্ঠায় চোখ রাখতাম ছবি দেখার জন্য। যদি বিখ্যাত কারও ফটোগ্রাফ ছাপা হতো চোখ আটকে যেত সেই ছবির মানুষটির মুখে। ওই আকর্ষণ আমাকে বিনিদ্র রাত কাটিয়েছে অনেক। পরে যখন ক্যামেরার ভিউ-ফাইন্ডারে অনুসন্ধানী চোখ ঢুকিয়ে দেখলাম শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, খেলাধুলা, রাজনীতি এবং অন্যান্য বিষয়ের মানুষদের—তখন কৌতূহলের অন্ত নেই। ১৯৭২ সালে খ্যাতিমানদের দিকে ক্যামেরা ফোকাস করি। আমি কি হুমায়ূন আহমেদকে '৭২ সালে পেয়ে যাই? না, তখন আমার সঙ্গে পরিচয় ছিল না। ওই সময়ে ক্যামেরা পাওয়াও ছিল দুঃসাধ্য বিষয়। এই দুরূহ পথযাত্রার শুরুতে আমি একটি তালিকা তৈরি করি যাদের ছবি তুলব। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যাদের কাছে যাই, তখন তাদের অনেককেই চিনি না। তাই আমি পাঁচজন বা দশজনের ছবি তোলার তালিকা করে ছবি তুলি। যাদের ছবি তুলি তারাই আমার তালিকায় নতুন নাম যুক্ত করে দেন। এরপর ১৯৭৭ সালের ১৬ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমীতে প্রথম পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফির প্রদর্শনী করি। সেই প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের অনেক বিখ্যাত লেখকের ছবি ছিল। প্রদর্শনীতে স্থান পায় ৬৬ জন লেখকের ছবি। তাঁরা বেশিরভাগই প্রবীণ এবং অনেকের জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীতে। সেই প্রদর্শনী দেখতে এসে একজন প্রতিষ্ঠিত কবি মন্তব্য খাতায় লিখলেন : 'ছবি দেখে ভালো লাগল, কিন্তু বেশির ভাগই মৃত ও মুমূর্ষু লেখক!' এটা আমাকে গভীর পীড়া দিল। তাহলে আমি কি কোনো ভুল করলাম! তালিকা আরও দীর্ঘ করা উচিত ছিল!

AMARBOI.COM

১৯৭৭ সালের পরে হুমায়ূন আহমেদ নামটিও আমার তালিকাভুক্ত হলো। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ হচ্ছিল না। ওই সময়ে আমি ইব্রাহীম খাঁ'র বাসায় যেতাম। বাড়িটির নাম ছিল 'দখিন হাওয়া'। দখিন হাওয়াতে শেষতক হুমায়ূন আহমেদও থেকেছেন।

ইব্রাহীম খাঁ সাহেব মারা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি ওই বাসায় নিয়মিত যেতাম। গল্প করতাম, টোস্ট বিস্কুট-মুড়ি-চা খেতাম। ১৯৭৩ সালে ইব্রাহীম খাঁ'র পরিবারে একটা বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর নাতনির বিয়ে। মানে গুলতেকিনের বিয়ে। তিনি আমাকে বলেন ছবি তুলে দিতে হবে। একটা বিশেষ কারণে বিয়েতে আমার যাওয়া হলো না। তাই বিয়ে কার সঙ্গে হচ্ছে তাও জানলাম না। ওই সময়ে হুমায়ূন আহমেদ নামে একজন লেখক আছেন জানতাম না। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে বিয়েতে যেতে পারলে ভালো হতো। আমার হাতে দুর্লভ কিছু ছবি থাকতে পারত!

১৯৮৩ সালে প্রথম হুমায়ূন আহমেদের বাসায় গেলাম। তখন তিনি থাকতেন আজিমপুরের কাছে নিউমার্কেটের পশ্চিম পাশে, সুফিয়া ভবনের চারতলায়। তাঁর নাটকগুলো অসাধারণ। আমাদের দেশে পরিবারের সবাই দেখেছে। সেই সময়ে নাটকে তিনি আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেমন মানুষ তিনি—ভেতরে এক ধরনের কৌতূহল কাজ করতে থাকে আমার। আমি একদিন তাঁকে ফোন করে বাসায় যাই। গিয়ে দেখি তিনি খালি গায়ে সোফায় বসে আছেন, লুঙ্গি পরা। এরপর অন্য রুমে গিয়ে একটি গেঞ্জি পরে চলে এলেন। আমি ধাক্কা খেলাম। কিন্তু তাঁর ভেতরে কোনো দ্বিধা কাজ করল না। কথা বলতে বলতে অনেক প্রসঙ্গ চলে আসে। কিছুক্ষণ পর ১৯৭৭ সালে লেখকদের নিয়ে আমার করা প্রদর্শনীর কথা বললাম। আরও অনেক কথা হলো। ততদিনে আমি জেনে যাই হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে গুলতেকিনের বিয়ের কথা। কিন্তু তাঁকে বলি নি যে কী কারণে তাঁর বিয়েতে আমি যেতে পারি নি। যা হোক, মনে হলো তিনি আমার সব কথা শুনে প্রীত হলেন।

যে সোফায় হুমায়ূন আহমেদ বসে ছিলেন ওটি ছিল বড় সোফা, মনে হচ্ছিল সেখানে যেন তিনি ঢুকে পড়ছেন। অবাক হলাম প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ'র মতো একজন বিখ্যাত লোকের নাতনিকে বিয়ে করেছেন এইরকম একজন লোক! আমি তাঁকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। তখন আমি গুলতেকিন আহমেদকে দেখি। হুমায়ূন আহমেদ পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, তিনি লেখকদের ছবি তোলেন। চলে আসার সময় হাতে লিখে তিনটি বই উপহার দিলেন তিনি। আমাকে বললেন, জানেন আমিও ছবি তুলি। ছবি তোলার প্রতি আমার দুর্বলতা আছে। তবে আপনার মতো এত সিরিয়াস না। আমার সন্তানদের ছবি তুলি, যা ভালো লাগে তা তুলে রাখি।

AMARBOI.COM

তখনো আমার কোনো নিজস্ব ক্যামেরা ছিল না। আমি প্রথম ক্যামেরা পেট্রি কিনি ১৯৭৩ সালে, ৬০০ টাকা দিয়ে। আবার কাওয়া কিনি ১৯৭৬ সালে, ৮০০ টাকা দিয়ে। এরপর ১২০ ইয়াসিকা বক্স ক্যামেরা কিনি ১৯৭৬ সালে। যদিও ওটা পরে চুরি হয়ে যায়। শুনে তিনি বলেন, এটা নিয়ে যান। বলে নিজের ক্যামেরা নিয়ে এসে আমার হাতে দিলেন। আমার ঠিকানা না জেনেই! বিস্মিত হই। এর মধ্যে তাঁর এক ছোট্ট মেয়ে বের হয়ে আসে। আমাকে হুমায়ূন আহমেদ বলেন, মেয়ের সঙ্গে ছবি তুলতে। মেয়েটি আমাকে বলে, গু খাবি! আমি মজা পেলাম এবং হাসতে লাগলাম। যা হোক, ছবি তোলার সময় অসুবিধা হচ্ছিল। কারণ তিনি ছিলেন অস্থির প্রকৃতির। আমি তাঁকে যুৎসই কোথাও বসাতে পারলাম না। একবার এখানে আরেকবার ওখানে, এই করতে থাকেন। প্রথম দিন, নতুন পরিচয়ে ছবি তুলছি, তাই আমি আর আমার মতো করে ছবি তুলতে পারলাম না। আমেরিকা থেকে নাইকন ৩৫ এমএম যে ক্যামেরা তিনি নিয়ে আসেন তা দেখিয়ে আমাকে বলেন, এটা দিয়ে তো চমৎকার ছবি ওঠে। বললেন প্রয়োজন হলে ক্যামেরাটা নিয়ে যাওয়ার জন্য। ওইদিন আমি ইতস্তত করি। একবার ভাবি বলব, ক্যামেরাটি ধার নিতে চাই। এত সুন্দর একটা ক্যামেরা! জাপানি নাইকন ক্যামেরা। মন চাইলেও আত্মসম্মানবোধ আমাকে সম্মতি জানায় না। অন্য একদিন ফোন করে তাঁর বাসায় যাই। প্রথম দিনের ছবি প্রিন্ট করে নিয়ে যাই। তিনি বাসায় ছিলেন না। বাজারে গেছেন জেনে বাইরে অপেক্ষা করতে থাকি। কিছুক্ষণ পর দেখি, হাতে বাজারের ব্যাগ, অন্য হাতে 'বিচিত্রা' এবং গায়ে শার্ট ও পরনে লুঙ্গি। চারটা ছবি নিয়ে গিয়েছিলাম, তার মধ্য থেকে তিনি একটা ছবি পছন্দ করেন। বলেন, আপনি তো চশমায় রিফ্লেকশন করে ছবি তোলেন। আমি তখন চট করে বলে ফেলি, না, আসলে আমি রিফ্লেকশন পছন্দ করি না। ছবিতে আলো-আঁধারের খেলার মাধ্যমে ছবি তুলি। যেমন ঘরের সব দরজা-জানালা বন্ধ রেখে শুধু একটা জানালা খোলা রেখে প্রাকৃতিক আলোতে ছবি তুলি। এটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুন্দর। চশমায় রিফ্লেকশন! এটা তো ছবির অলংকার। আমি খুশি করার জন্য কথাটা তাঁকে বললাম। কিন্তু আবারও অবাক হলাম যে, তিনি ছবির নান্দনিকতা বোঝেন। আমাকে বললেন, ক্যামেরা লাগবে ? আমি মাথা নাড়লাম। ভেতর থেকে ক্যামেরা নিয়ে এলেন তিনি। প্রিয় বস্তুটি আমার হাতে দিলেন। মনে হলো আমার প্রিয় এবং মহামূল্যবান কোনো জিনিস এইমাত্র পেলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি আমাকে একটা কাজ করার কথা বললেন। দুটি ফিল্ম দিলেন। গ্রীন রোডে স্টুডিও নেহারে আমি নিয়মিত যাই। এ কথা আমি তাঁকে আগে বলেছি। আমি ওই স্টুডিওতে তাঁর ফিল্ম দুটি দেই এবং ওইদিনই দাঁড়িয়ে থেকে কাজ সেরে নেই। কিন্তু পাওয়া গেল আনএক্সপোজড ফিল্ম, কোনো ছবি আসে নি। আমার ভেতর শঙ্কা কাজ করল যদি তিনি ক্যামেরাটা নিয়ে যান। কিন্তু তাঁকে না জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অফিসে চলে যাই। শুনে কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করলেন না। শুধু বললেন, আমার ছবি তো উঠে নাই তাহলে তো ভালো। বাহ! ভুতুড়ে কাণ্ড। আপনার কোনো দোষ নেই। সম্পর্ক নির্মিত হতে থাকে। অহেতুক ভয় থেকে রেহাই পাই আমি। তাঁর ক্যামেরা আনি আর ব্যবহার করে দিয়ে আসি।

১৯৮৫ সালের জানুয়ারিতে কবি সম্মেলনে গিয়েছি কলকাতায়। যদিও দলে আমি ছাড়া বাকি সবাই ছিলেন কবি। সঙ্গে কবি শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, রুবি রহমান, আবু হাসান শাহরিয়ার, ফরিদ কবির এবং আরও ক'জন। হুমায়ূন আহমেদকে না জানিয়ে তাঁর নাইকন ক্যামেরা নিয়ে কলকাতা চলে যাই। সঙ্গে আমার পুরনো ক্যামেরাও ছিল। শিয়ালদা রেলস্টেশনে আমাদের স্বাগত জানান কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। প্রথম আমি কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে দেখি। সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরায় ক্লিক করি। শামসুর রাহমান ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ছবি। অসাধারণ সে মুহূর্ত। হুমায়ূন আহমেদের ক্যামেরা মুহূর্তগুলোকে বন্দি করতে থাকে। সত্যজিৎ রায়, অমিয় চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সমরেশ বসুর ছবিও তুলে ফেলি। আমার সামনে উপমহাদেশের বিখ্যাত সব মানুষ! আমি ভাবতে থাকি—এটা আমার ক্যামেরা। আবার রাতে যখন ঘুমাই মনে হয়—না, এটা হুমায়ূন আহমেদের ক্যামেরা।

কলকাতা থেকে ফিরে আসি তাঁর ক্যামেরায় তোলা একবাক্স মুহূর্ত ও দুর্লভ স্মৃতি নিয়ে এবং প্রায় চার মাস হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে দেখা করি নি। একদিন ওই নেহার স্টুডিওর ঠিকানায় হুমায়ূন আহমেদের একটি চিঠি আসে, 'প্রিয়বরেষু, আমার ক্যামেরাটি একটু প্রয়োজন। তুমি কি এসে দিয়ে যাবে ?' সম্ভবত প্যাডে লেখা। মনে হলো তাঁর কোনো ছাত্রের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। চিঠি পাওয়ামাত্র আমি চলে যাই ক্যামেরা নিয়ে। ভয়ে ভয়ে গিয়ে বলি, অসাবধানবশত ক্যামেরার লেন্সকভারটি খুলে গেছে। তিনি বলেন, ভালোই তো। যাক, এতদিন পর আমার ক্যামেরাটা একটা ভালো কাজে লাগল। সমরেশ বসুর ছবি তুলেছি শুনে তিনি খুশি হলেন। বললেন, আপনি আমাকে ছবিগুলো দেখাবেন। আমি বললাম, হ্যাঁ দেখাব। আবার ক্যামেরার সামনের লেন্সক্যাপটা সুতা থেকে ছিঁড়ে যাওয়ার কথা বলি। বলেন, আরে ক্যামেরা চললেই হলো। ওইদিন চলে আসি ক্যামেরা দিয়ে। এরপর আস্তে আস্তে ছবিগুলো প্রিন্ট করি। একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে গিয়ে ছবিগুলো দেখাই। দেখে তিনি আনন্দে আত্মহারা। আমাকে বললেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছবি তুলেছেন ? আমি হ্যাঁ বললাম। জানেন তিনি হলেন রবীন্দ্র জীবনীকার। রবীন্দ্রনাথ কোন দিন কী করতেন খুটে খুটে তিনি লিখতেন। রবীন্দ্রনাথ কী করতেন, কার সঙ্গে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা করতেন, কখন কোথায় যেতেন—এককথায় প্রতিদিনের দিনলিপি তিনি লিখেছেন। নির্মোহভাবে। কত নিষ্ঠা এবং ত্যাগ থাকলে একজন মানুষ এটা করতে পারে। কোনো পারিশ্রমিক ছাড়া! বললাম, তাঁর চেহারাটা অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতো। আপনি রবীন্দ্রনাথের ছবি বলে চালিয়ে দিতে পারেন! হুমায়ূন আহমেদ ঠাট্টা করলেন। কথায় কথায় সমরেশ বসুর প্রসঙ্গ টেনে বলেন, জানেন তিনি ঢাকায় আসতেন। সুন্দরী মহিলার সঙ্গে পরিচয় হলে প্রেম করতে চাইতেন। মামুলি আলাপ শেষে ওইদিন চলে আসি।

হুমায়ূন আহমেদ যেমন জীবনযাপন করতেন তা আমাকে তখন থেকেই অবাক করত। আমাদের দেশে শিল্পী এসএম সুলতানের মতো তিনি একাই শুরু একাই শেষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অফিসের টেবিলে ফুলদানিতে রাখা পাতাসহ কাঁচা তেঁতুল দেখে লোকটির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপতে হয় আমাকে। এমন অদ্ভুত মানুষের দেখা পাই নি আগে। এই ঘরানার, এই ধরনের জীবন যাপনের অধিকারী আর কেউ ছিল না বলে আমার বিশ্বাস। এই ঘরানার মানুষ আমি আর পাই নি, যখন যেমন তখন তেমন! শুধু দুজনকে পেয়েছি। শিল্পী এসএম সুলতান আর হুমায়ূন আহমেদ। তিনি ছিলেন কাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অহংকারী। আবার অন্যের কাজের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল, ওয়াকিবহাল। তাঁর জীবন ছিল নাটকের মতো, উপন্যাসের মতো উথাল-পাথাল।

ধ্রুব সত্য এই যে, তিনি যা বিশ্বাস করতেন তা করে ছাড়তেন। যেমন উপন্যাসে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নারী চরিত্ররা সেরা। কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ বাঙালির সকল চরিত্র হজম করে ফেলেছেন এবং এরপরই লিখতে বসেছেন। বাংলা ভাষায় হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্য একসঙ্গে সকল বয়সের মানুষের মধ্যে সাড়া জাগাতে পেরেছে। বাঙালির চরিত্র কী রকম, সে কী চায়, সব রসায়নই দিতে পেরেছেন তিনি। এই জন্যই আমি তাঁকে কালজয়ী লেখক বলব। এটা আমার ধারণা নয়, আমার বিশ্বাস।

AMARBOI.COM

আশির দশকে তিনি 'বিচিত্রা' ও 'দৈনিক বাংলা'য় নিয়মিত যেতেন। 'বিচিত্রা' সম্পাদনা করতেন শাহাদত চৌধুরী। কবি শামসুর রাহমান *দৈনিক বাংলা* ছেড়ে দেওয়ার পর তখন সম্পাদক হলেন আহমেদ হুমায়ূন। ১৯৮৬ সালে তিন হুমায়ূন—আহমেদ হুমায়ূন, হুমায়ূন আহমেদ ও হুমায়ুন আজাদ এই তিনজনের ছবি তুললাম। তাদের সম্পর্ক তখন অটুট ছিল। পরে অবশ্য হুমায়ুন আজাদ হুমায়ূন আহমেদের সমালোচনা শুরু করেন। হুমায়ূন আহমেদ শেষের দিকে স্বেচ্ছায় একঘরে হয়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবত কাছের মানুষদের উপেক্ষার কারণে। শামসুর রাহমান দুঃখ করে বলতেন, জীবিত থাকতেও আমার বন্ধুরা মৃত। এটা রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও ব্যাপকভাবে ঘটেছে। হুমায়ূন আহমেদ এর বাইরে ছিলেন না।

১৯৮৭ সালে আবার দেখা হয় বিটিভিতে। আমার তোলা কিছু ছবি নিয়ে গেছি। একটা ইন্টারভিউ হবে আমার। অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেছেন কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী। বের হয়ে আসছি, এই সময় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর ছবি আছে কিনা। আমি বললাম, না, বেশিরভাগ বয়স্ক কবি ও লেখকদের ছবি। এবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, দেখাও তো ইব্রাহীম খাঁর ছবি আছে কিনা? আমি ভড়কে গেলাম। না থাকলে বিপদ। খুঁজতে লাগলাম, অবশেষে পেলাম। হ্যাঁ আছে। উনি দেখলেন। যাও সাত খুন মাফ, হাসতে হাসতে বললেন। ছবি দেখে বললেন, আরে বুড়া তো ছবিতে বেশ ভালোই অভিনয় করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপরে দেখা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার সামনে। তিনি অপরাজেয় বাংলার পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, চলো যাবে নীলক্ষেত ? বই কিনতে যাব। আমি তখন আহমদ ছফা ভাইয়ের হোস্টেলে যাচ্ছি। শুনে তিনি আর কিছু বললেন না। তাঁর প্রথম লেখা বই আহমদ ছফার উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল।

তিনি চলে গেলেন। আমিও ছফা ভাইয়ের হোস্টেলের দিকে এগিয়ে যাই। আগেই বলে গেছি আমি যে যাব। ওখানে গিয়ে দেখি আহমদ ছফা দুপুরের খাওয়া খাচ্ছেন। আমাকে খেতে বললেন না। ক্ষুধা পেয়েছিল আমারও। এসএম সুলতানের কাজে গিয়েছিলাম। তাঁর ঢাকায় থাকার অসুবিধা হচ্ছিল। ছফা ভাই বললেন, ঠিক আছে তাঁকে ধরে নিয়ে আস। রাজ্জাক সাহেব বলেছেন সমস্যা হবে না। ক্ষুধা নিয়ে চলে এলাম। এরপর সপ্তাহ দুই পরে হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, ক্যামেরা আছে ? আমি বললাম, হ্যাঁ আছে। ফিল্ম আছে ? কিনে দেব ? আছে, লাগবে না। আমি তাঁর সঙ্গে হেঁটে বাংলা একাডেমী পর্যন্ত এলাম। কোনো রিকশা পাচ্ছি না। তাঁকে চিন্তিত মনে হলো। সিগারেট ধরালেন আর কতক্ষণ পরপর টানতে লাগলেন। বাংলা একাডেমী পার হতেই তিনি বলেন, চলো ভিক্ষুক দেখতে যাই। হাইকোর্টের মাজারে। নূরা পাগলারে দেখেছো ? দেখেছি। নূরা পাগলা উলঙ্গ অবস্থায় নাচছে। ওকে দেখা ও কথা বলার খুব ইচ্ছা করছে। আমি বললাম, একদিন সে নাচতে-নাচতে দর্শকদের গায়ে গু ছিটিয়ে দিয়েছিল! দালাল আছে। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ওখানে যে বিকলাঙ্গদের এনে ব্যবসা করছে তা জানতে হবে। আমি বললাম, ওদের নিয়ে অনেক চাঁদাবাজি হয়। ততক্ষণে আমরা হাঁটতে হাঁটতে মাজারের সামনে চলে এসেছি।

আমি হুমায়ূন আহমেদকে বললাম, মাজারের ওখানে যারা দালাল তাঁদের কাছে অস্ত্র থাকে। তিনি বললেন, তাতে কী হয়েছে! আমরাও অস্ত্র নিয়ে যাব। কিন্তু মাজারের সামনে এসে তিনি ঢুকলেন না। আমরা পরে *দৈনিক বাংলায়* পৌঁছালাম। আমি কবি আহসান হাবীবের রুমে গিয়ে বসি। আহসান হাবীব খুব গম্ভীর মানুষ। হঠাৎ করে উদভ্রান্তের মতো শিল্পী অলকেশ ঘোষ এসে পড়েন। তিনি বলতে বলতে এলেন, এবার যদি না হয় তাহলে সব ফেলে দেব। আহসান হাবীব তার ছবি দেখে বললেন, ভালো হয়েছে। আমি অলকেশ ঘোষের সঙ্গে বের হয়ে তাঁর ছবি তুলতে চাইলাম। তিনি না না করলেন। তারপরও আমি দুটি ছবি তুললাম। অস্থির শিল্পীকে দেখে হুমায়ূন আহমেদ হাবীব ভাইয়ের রুমে না ঢুকে সোজা *বিচিত্রা* অফিসে চলে গেলেন এবং যাওয়ার সময় বলে গেলেন, আমাকে সঙ্গে করে হাইকোর্টের মাজারে যাবেন। কিছুক্ষণ পর আবিষ্কার করলাম, তিনি আমাকে না জানিয়ে চলে গেছেন। মনে মনে স্থির করি, আর হুমায়ূন ভাইয়ের সঙ্গে যাব না। অতঃপর আমি আহমদ ছফা ভাইয়ের কাছে যাই। তিনি আমাকে দেখে রেগেমেগে আগুন। হুমায়ূনের সঙ্গে থাকতে থাকতে তোমার মাথা গরম হয়ে গেছে! এসএম সুলতান কই ?

এমন ভঙ্গিতে কথা বললেন মনে হলো আমি এসএম সুলতানকে পকেটে করে নিয়ে আসতে পারি। আরও মনে হলো আমি তাঁর চাকরি করি। জানালাম বাসভাড়া নেই আমার পকেটে। জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক তখন বিশাল ব্যাপার। আমাকে নির্দেশের মতো বলা হলো রাজ্জাক সাহেবের সঙ্গে জরুরি দেখা করতে। সব ব্যবস্থা করা আছে। তিনি আমাকে একশ' টাকা দেন। তখন অপ্রকাশিত একজন মানুষ এসএম সুলতান। আল্লাহর উপর ভরসা করে নড়াইল

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলাম। ওখান থেকে এসে হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে দেখা করি। তাঁকে এসএম সুলতানের কথা বলি। তিনি বলেন, আরে সুলতান তো সাপ, বিড়াল... তুলি নাকি হাতুড়ির মতো, দাঁত নাকি এক-একটা তিন ইঞ্চির মতো! আমি বলি, আরে না। ওসব কিছু না। সুলতান সম্পর্কে আজগুবি মজার কথাগুলো বলে তিনি বেশ হাসতে লাগলেন।

একদিন বড় বেকায়দায় পড়ে যায় শিল্পী এসএম সুলতান। তাঁর প্রচণ্ড দাঁতে ব্যথা। কিন্তু আমার কাছে টাকা নেই, তাঁর কাছে তো টাকা থাকার কথাই না। আমার মনে পড়ে ডাঃ আবু হায়দার সাজেদুর রহমান সাহেবের কথা। তিনি পিজিতে বসেন, দাঁতের ডাক্তার। একদিন গিয়ে তাঁর ছবি তুলে আনলাম। ছবি তোলার পর বললাম, সুলতান নামে একজন শিল্পী আছেন, চিনেন ? তিনি যদি আপনার রোগী হতে চায় তাহলে! তিনি তখন কুয়াশা সিরিজ লিখেন। বললেন, নিয়ে আসেন, আমি দাঁত তুলে দেব আর দাঁত তোলার পর কিছু টাকাও দিয়ে দেব। আমি এসএম সুলতানকে নিয়ে যাই। তিনি গান গাইতে গাইতে দাঁত তোলা শুরু করেন। 'আমার এই দিলটারে চাক্কু মেরে হাইজাক করে...' গানটা ডাক্তারের লেখা। এরমধ্যে এসএম সুলতানের দাঁত তুললেন। আমি ওই দাঁত এখনো রেখে দিয়েছি। ওই দাঁত আমি জাদুঘরে রাখব। দাঁত তোলার ঘটনা হুমায়ূন আহমেদ বেশ আয়েশের সঙ্গে উপভোগ করলেন।

১৯৮৩ সালে তাঁকে দেখতাম বাংলাবাজারে। নওরোজ কিতাবিস্থানে। ইফতেখার রসুল জর্জ ওই প্রতিষ্ঠানের মালিক। ওখানে আড্ডা হতো। এখন আর ওসব দেখা যায় না বাংলাবাজারে। ওই সময়ে শওকত ওসমান স্যারকে যেতে দেখেছি। হুমায়ুন আজাদকে একবার দেখেছি। ইমদাদুল হক মিলন, রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহকেও দেখেছি। একদিন আমি বাংলাবাজারের নওরোজ কিতাবিস্থানে জর্জ ভাইয়ের রুমে ঢুকলাম। রুমে ইঁদুর ঢোকার জায়গাও নেই। কিন্তু দেখলাম হুমায়ূন আহমেদ খাচ্ছেন আর কিছু টেবিলের নিচে ফেলে দিচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার ? তিনি বললেন, বিড়াল আছে খেয়ে নেবে। আমি ভালো করে টেবিলের নিচের চারদিকে তাকিয়ে দেখি কিছু নেই। তিনি বলেন, তাহলে ইঁদুর আছে খেয়ে নেবে।

নওরোজ থেকে জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' বইটি বের হয় কয়েক বছর আগে। বইয়ের প্রচ্ছদে ছিল আমার তোলা ছবি। বিষয়টি হুমায়ূন আহমেদ জানতেন না। আমি সেটি বলার পরে জানলেন। বইটির প্রচ্ছদ দেখে বললেন, বাহ! সত্যি তো বনলতা সেন! জর্জ সাহেব বলেন, আরে এটা আমার বৌয়ের ছবি। আরও কয়েকদিন আমি তাঁকে দেখি বাংলাবাজারে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য কোনো ছবি তুলি নি।

একদিন শিল্পকলায় কবি আল মাহমুদের রুমে ঢুকলাম। বের হয়ে দেখি হুমায়ূন আহমেদ আসছেন। আমাকে আবার আল মাহমুদের রুমে নিয়ে গেলেন। আবার বসলাম আমি। আল মাহমুদ গল্প শুরু করেন। তিনি হুমায়ূনকে উদ্দেশ করে বলেন, আমি লিখেছি আব্বাসউদ্দীন কত বড় শিল্পী, কত দিগন্ত বিস্তারি শিল্পী। বাংলাদেশে আর কেউ লিখতে পারবে না। এই বলে দুজনে সিগারেট ধরালেন। তাঁরা গল্প করতে লাগলেন। আল মাহমুদ বলেন, আমি আরব দেশে গেলাম, তখন মরুভূমি দিয়ে যাচ্ছি, ড্রাইভার একটা গান ছাড়লেন। ওই গান আমাকে মুগ্ধ করে। গানটি আরবের বিখ্যাত গায়িকা আলিফ লায়লার। তখন আমার আব্বাসউদ্দীনের কথা মনে পড়ে গেল। শুনে হুমায়ূন ভাই বললেন, আপনি আব্বাসউদ্দীনকে নিয়ে একটা বই লেখেন না কেন ? আল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহমুদ বলেন, সব আছে আমার দর্পণে। লিখে দিতে পারি। আর কেউ পারবে না, কসম করে বলতে পারি। আব্বাসউদ্দীনকে নিয়ে দশ লাইন লেখার যোগ্যতা কারও নেই। এমন কথা শোনার পর হুমায়ূন ভাই বলে উঠেন, তাহলে আমি আর আপনার সামনে থাকতে পারছি না। উঠে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন হুমায়ূন আহমেদ।

আমিও আল মাহমুদের ঘর থেকে বেরিয়ে শিল্পকলার গেট পার হতেই হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আবার দেখা হয়। তাঁর হাতে দুই হালি চাঁপা কলা। দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিলেন, কিছুক্ষণ আগে রিকশা থেকে নেমে ভাড়া দিতে গিয়ে তিনি দেখলেন কোনো ভাংতি নেই পকেটে। বাধ্য হয়ে কলা কিনে টাকা ভাঙিয়ে রিকশাওয়ালার ভাড়া দিয়ে আল মাহমুদের কামরায় ঢোকেন। ইচ্ছে করেই কলাগুলো দোকানে ফেলে আসেন। কিন্তু বেরুবার সময় দোকানদার তাঁকে দেখে কলাগুলো হাতে সপে দিলে মুশকিলে পড়েন তিনি। কলাগুলো তাঁর হাত থেকে নিয়ে আপাতত তাকে সাহায্য করতে পারি কি না অনুরোধ করলেন আমাকে। কোনোকিছু না ভেবেই তাঁর হাত থেকে কলাগুলো নিলে ব্যস্ত রাস্তায় দ্রুত উধাও হয়ে গেলেন রহস্যকার হুমায়ূন আহমেদ!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের হৃদয়ে হুমায়ূন

নিয়াজ জামান

হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে এ বছর আমার সাক্ষাৎ হয়, যখন তিনি কয়েক সপ্তাহের জন্য ঢাকা এসেছিলেন, ক্যানসার চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাওয়ার আগে। এটাই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ। মাথার চুল ছোট করে কাটা, জনসমক্ষে তিনি হ্যাট পরে হাজির হতেন, কিন্তু বাসায় পরতেন না। এ ছাড়া তাঁকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে, তিনি ভালো নেই। বরং তাঁকে এতটাই অবিশ্বাস্য রকম সুস্থ দেখাচ্ছিল যে আমি নিশ্চিত ছিলাম, চিকিৎসা শেষ করে আবার তিনি তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনে ফিরে যাবেন পূর্ণোদ্যমে। দুঃখ, তা আর হলো না।

তাঁর খাদ্যানুরাগ এবং অতিথিপরায়ণতার কথা আমি শুনেছিলাম, এবার নিজেই তার অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। আমি তাঁর উপন্যাস 'মধ্যাহ্ন' ইংরেজি অনুবাদের কাজ করছি। এ বিষয়ে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল। আমার নোট থেকে সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পর তিনি আমাকে চা-নাস্তা আপ্যায়ন করলেন। একপ্লেট মন্ডা আনা হলো, এটি আমার প্রিয় মিষ্টি, কিন্তু কোনো কারণে আমি সবিনয়ে অপরাগতা জানালাম। তিনি জানতে চাইলেন স্বাস্থ্যগত কোনো কারণে মিষ্টি খেতে আমার অনিচ্ছা কি না! আমি যখন না বললাম, তখন তিনি আমাকে খেয়ে দেখতে অনুরোধ করলেন। বললেন, খুব ভালো মিষ্টি এটা। আমি একটা নিলাম, হ্যাঁ, সত্যি খুব ভালো।

ঘরে অনেক লোকজন ছিল এবং আমার মনে হলো অন্যদেরকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া উচিত, আমার যাওয়া উচিত। যখন আমি যাওয়ার জন্য উঠলাম, তিনি আমাকে তাঁর মিসির আলি নিয়ে লেখা গল্প সংকলন 'ভয়'-এর একটি কপি দিলেন। আপনার হয়তো ভালো লাগবে, তিনি বললেন।

এই আমার প্রথম ও শেষ দেখা হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে।

অবশ্যই বেশির ভাগ বাংলাদেশীর মতোই আমি তাঁর সম্পর্কে জানতাম। টেলিভিশনে তাঁর ধারাবাহিক নাটক আমি দেখেছি, কিছু ছোটগল্পও আমি পড়েছি। তাঁর কাছে বেশ কয়েকবার চিঠিও লিখেছি, কখনো তাঁর ছোটগল্পের অনুবাদের অনুমতি চেয়ে, কখনো অনূদিত গল্প কোনো সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়ে। সবসময়ে তাঁর সম্মতি পেয়েছি। গল্প সংকলনগুলোর বেশ কয়েকটি প্রকাশনা উৎসব হয়েছে, তিনি কখনো আসতে পারেন নি।

টিভি নাটক, নাকি তাঁর লেখা—কোনটার মাধ্যমে প্রথমে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি ঠিক মনে নেই। হয়তো একই সময়। যদিও তাঁর টিভি নাটক আমি খুব উপভোগ করেছি, তাঁর ছোটগল্প আমাকে তাঁর লেখার প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে। স্বীকার করতে হবে, তাঁর ছোটগল্পের প্রতি আমার আগ্রহ ঠিক সরাসরি হয় নি। আমার এক ননদ খুব পড়ুয়া এবং তাঁর পড়া বই নিয়ে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে গল্প করতে খুব পছন্দ করে। সে বলল, আমি হুমায়ূনের ছোটগল্প পড়লে আনন্দ পাব। আমি তাঁর শ্রেষ্ঠগল্পের একটা কপি পেয়ে গেলাম এবং আবিষ্কার করলাম হুমায়ূন আহমেদ ছোটগল্পের এক নিপুণ রূপকার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বলেছেন, ছোটগল্প হচ্ছে ছোট কথা, ছোট ছোট সুখ-দুঃখ যা মনের মধ্যে ছাপ ফেলে যায়। হুমায়ূনের ছোটগল্পগুলো রবীন্দ্রনাথের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়—

ছোট প্রাণ ছোট কথা
ছোট ছোট দুঃখ ব্যথা
নিতান্তই সহজ সরল
নাহি বর্ণনার ছটা
ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে
সাঙ্গ করে মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।

হুমায়ূন আমাদের লেখা যে ছোটগল্পটি আমি প্রথম পড়ি ও অনুবাদ করি তা হলো 'খাদক'—আমার মন থেকে কিছুতেই আমি খাদকের দৃশ্যকল্প অপসারণ করতে পারছিলাম না। এটা একজন লোকের গল্প, যে দর্শকদের আনন্দ দেওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে খাবার খায়। একজন বর্ণনাকারীর বর্ণনায় গল্পটি লিখেছেন লেখক, যে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নয় বরং একজন প্রত্যক্ষদর্শী। হুমায়ূন আহমেদের আরও অনেক গল্প এই ভঙ্গিতে লেখা (হয়তো সমারসেট মম দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাঁর উপন্যাস এই কায়দায় লেখা)। গল্প শেষ হয় খাদকের খাওয়া চলতে চলতে যখন তার ক্ষুধার্ত শিশুরা তার দিকে তাকিয়ে থাকে। বর্ণনাকারী প্রশ্ন করে, গল্পের শেষটা কি আনন্দদায়ক হবে? খাদক কি খাওয়া বন্ধ করে তার শিশুদের খেতে দিবে? কিন্তু না, সে খেতেই থাকে। গল্পের মধ্যে গভীর ভাব গাথা সামাজিক কটাক্ষ আছে। বাংলা একাডেমী জার্নালে গল্পের ইংরেজি অনুবাদ ছাপা হয়, পরে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাঙালিদের সাহিত্য প্রত্রিকা 'ভয়েসস'-এর সংকলনে এটি প্রকাশিত হয়।

তাঁর অন্য যে গল্পগুলো আমি পড়েছি এবং অনুবাদ করেছি বা অন্যদের করতে অনুরোধ করেছি গল্প সংকলনের জন্য, তার মধ্যে রয়েছে—'অয়োময়', '১৯৭১', 'জলিল সাহেবের পিটিশন' ও 'অপরাহ্ন'। 'অয়োময়'—যার সঙ্গে এই নামের টিভি সিরিয়ালের কোনো মিল নেই—একজন ধনী জমিদার ও একজন মুমূর্ষু মানুষের সম্পর্ক নিয়ে এই গল্প। রোজার মাস, জমিদার সাহেব অনেক কিছু নিয়ে ব্যস্ত। তার কাছে আশ্রয় নেওয়া গরিব ও অসুস্থ লোকটিকে নিয়ে সে সময় নষ্ট করতে চায় না। তাকে জানানো হয় লোকটিকে তওবা পড়ানো হলে সে তাড়াতাড়ি মারা যাবে। মসজিদের ইমাম সাহেবকে ডাকা হলো তওবা পড়ানোর জন্য—পড়ানোও হয় যথারীতি। লোকটি মরে না। সবার ধারণা লোকটি মরতে চায় না, এইজন্য তওবার ভান করেছে মাত্র। শেষ পর্যন্ত জমিদার সাহেবের মন বদলায়। লোকটা যদি বাঁচতেই চায়, তাহলে তাকে বাঁচতে দেওয়া উচিত। সে ঠিক করল তাকে শহরে নিয়ে যাবে, সেখানে তার ঠিকমতো চিকিৎসা ও সেবা দেওয়া যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েক পাতার গল্পে চিত্রিত হয় শ্রেণীবৈষম্য, ধর্মীয় আচার, কুসংস্কার, মানবিক সম্পর্ক এবং সর্বোপরি মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছা।

'১৯৭১' এবং 'জলিল সাহেবের পিটিশন' দুটো গল্পই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে। প্রথমটি যুদ্ধের ও পরেরটি যুদ্ধের কয়েক বছর পরের প্রেক্ষাপটে লেখা। দুটোই কালোত্তীর্ণ। '১৯৭১' একজন নিরস্ত্র সাধারণ বাঙালির পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সামনে অসীম সাহসিকতা দেখানোর গল্প। 'জলিল সাহেবের পিটিশন' একজন পিতার সংগ্রামের গল্প, যে তার দুই ছেলেকেই যুদ্ধে হারিয়েছে। জলিল সাহেবের চাওয়া এইটুকুই, তার ছেলে ও তাদের মতো যারা ১৯৭১-এ আত্মোৎসর্গ করেছে তাদেরকে সবাই স্বীকৃতি দিবে। তিনি একটা ফাইল হাতে নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরাঘুরি করেন। গল্পের শুরুতে বর্ণনাকারী তাকে একজন খ্যাপাটে উপদ্রব হিসেবে উপস্থাপন করে—পাঠকেরাও হয়তো একই রকম মনে করে। এরপর বর্ণনাকারী বিদেশে চলে যায়। ফিরে এসে দেখে লোকটি মারা গেছে। সে ভাবে জলিল সাহেবের অসমাপ্ত কাজ সে শুরু করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়, এই কাজটি আর করা হয়ে ওঠে না। এভাবে হুমায়ূন আহমেদ আমাদের সবাইকে অভিযুক্ত করেন, আমরা যারা মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আত্মত্যাগের সুফল ভোগ করছি অথচ তাদের ব্যাপারে নীরব অথবা নিরাবেগ থাকছি।

আরেকটি চিন্তাসঞ্চারী গল্প 'অপরাহ্ন', একজন রিকশাচালকের মৃত্যু নিয়ে লেখা। কিছুদিন হলো ঢাকার অনেক রাস্তায় রিকশা চলে না, কিন্তু একসময় রিকশাই ছিল সর্বত্র সাধারণ বাহন, রিকশাচালককে নিয়ে লেখা গল্পে আমরা যারা রিকশায় চড়ি বা কখনো চড়েছি সবাই নিজেদের অভিজ্ঞতাগুলো খুঁজে পাব। যেমন, আমরা ভাড়া কমানোর জন্য দরকষাকষি করি। তারপর যে লোকটা রিকশা চালাচ্ছে তার প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ উদাসীনতা—এগুলো দারুণভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। এটা একটা বিষাদময় গল্প। রিকশাচালকটি মারা যায়। অবশ্য এর মধ্যে কিছু হাস্যরসও আছে যেমন বর্ণনাকারী আরেকটি রিকশাচালক ঠিক করার সময় তাঁর নাম জিজ্ঞেস করে, জানতে চায় সে সুস্থ কি না ইত্যাদি। সে চায় না এই রিকশাচালকটিও আগেরজনের মতো তাকে নিয়ে মারা যাক।

AMARBOI.COM

বেশ কয়েক বছর আমি যখনই গল্প সংকলন করেছি, হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্প সেখানে রেখেছি। এরপর কোনো কারণে সেটা থেমে গেল। এরপর গত বছর আমাকে অনুরোধ করা হলো তার উপন্যাস 'মধ্যাহ্ন' অনুবাদ করার জন্য। আমি ইতস্তত করছিলাম। আমি ছোটগল্প অনুবাদ করেছি, কিন্তু কখনো উপন্যাস নিয়ে কাজ করি নি। চারশত পৃষ্ঠা অনুবাদ করার সময় কি আমার আছে ? কিন্তু আমি না বলতে পারলাম না। হুমায়ূন আহমেদ সবসময় তাঁর গল্প অনুবাদ করতে এবং সংকলন প্রকাশে আমাকে সম্মতি জানিয়েছেন। কাজেই আমিও সম্মত হলাম, এই শর্তে—আমি একা পুরো অনুবাদ করতে পারব না, আরেকজন অনুবাদককে সঙ্গে নিব।

হ্যাঁ, 'মধ্যাহ্নে'র অনুবাদের প্রথম খসড়াটির কাজ শেষ হয়েছে। এইজন্যই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে আমি সেটা নিয়ে আলাপ করার সুযোগ পেলাম।

আমার কিছু প্রশ্ন ছিল রচনাভঙ্গি নিয়ে। কিছু লেখার বিষয়বস্তু নিয়ে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলা উপন্যাস লেখা হয় বর্তমান কালে, ইংরেজি অতীত কালে। আমরা কোনটি ব্যবহার করলে তিনি পছন্দ করবেন ? তিনি বললেন, বর্তমান কাল। এরপর উদ্ধৃতিচিহ্ন, বাংলা সাহিত্যে এর ব্যবহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই, ইংরেজিতে আছে। তিনি বললেন, উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করতে। খসড়াটি পুনমার্জন করার সময় আমি এবং আমার সহঅনুবাদক এই পরিবর্তনগুলো করলাম। কিন্তু কিছু প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে গেল, যেগুলো তিনি ভেবে জানাতে চেয়েছিলেন।

আমি বিষণ্ন, তিনি আর নেই। বিষণ্ন, কারণ তাঁকে অনুবাদটির কাজ শেষ হওয়ার পর দিতে পারলাম না। বিষণ্ন, কারণ যে প্রশ্নগুলো নিয়ে তাঁর ভাবার কথা ছিল সেগুলোর উত্তর জানা হলো না। বিষণ্ন, বইটির নাম নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলা হলো না। কিন্তু আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই হুমায়ূন আহমেদ—আপনার ছোটগল্পের জন্য, আপনার নাটকের জন্য, আপনার সিনেমার জন্য, আমাকে বিংশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশক নিয়ে লেখা এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটি পড়ানোর জন্য।

আমার এই শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষ করতে চাই মার্কিন কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের একটি উক্তি দিয়ে, "একজন কবির প্রমাণ হলো তার দেশ তাকে ততটাই স্নেহার্দ হয়ে আপন করে নেয়, যতটা আপন সে তার দেশকে করে নেয়।" হুমায়ূন আহমেদকে বাংলাদেশ কতটা আপন করে নিয়েছে সেটা যদি কখনো মূল্যায়ন করার প্রয়োজন হয়, তাহলে শুধু তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে শহীদ মিনারে জড়ো হওয়া অসংখ্য মানুষের মিছিল স্মরণ করলেই হবে। তিনি চল্লিশ বছর ধরে তাদের আনন্দ দিয়েছেন, একটি পুরো প্রজন্মকে বাংলাদেশী বই পড়তে অনুপ্রাণিত করেছেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্যোৎস্না, বৃষ্টি আর অন্ধকারের গল্প

পূরবী বসু

'স্মৃতি সে সুখেরই হোক আর বেদনারই হোক, সব সময়েই করুণ।'

হুমায়ূন আহমেদ (*নন্দিত নরকে*, ১৩৭৯, পৃ. ৭১)

প্রকৃতির কাছাকাছি যেতে এবং থাকতে হুমায়ূন আহমেদের প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। তাই নানারকম গাছগাছালি, ফুলপাতা যেমন পছন্দ ছিল তার, তেমনই ভীষণভাবে তার পছন্দের ছিল জ্যোৎস্না আর বৃষ্টি।

গত জানুয়ারিতে দেশে যাওয়ার সময়, হুমায়ূন বিশেষভাবে বলে দিয়েছিল আমাদের, তার নুহাশপল্লী আর সেন্টমার্টিনে সমুদ্রের পাড়ে তৈরি রিসোর্টে অবশ্যই যেন বেড়িয়ে আসি। সেন্টমার্টিন যাওয়া আর হয় নি, মূলত সময়-স্বল্পতার কারণেই। কিন্তু নুহাশপল্লীতে গিয়েছিলাম একদিন সকালে প্রায় সারা দিনের জন্যেই। হুমায়ূনের পরিকল্পনামতো, অন্যপ্রকাশের অন্যতম স্বত্বাধিকারী কমল ও তার পরিবার নিয়ে গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে করে। নুহাশে গিয়ে দেখে এসেছি হুমায়ূনের সেই অভিনব নিরিবিলি স্বপ্নের রাজ্য, প্রকৃতির কোলে। দেখেছি তার দুষ্প্রাপ্য সব গাছের সংগ্রহ। চায়ের বাগান থেকে শুরু করে নানারকম ঔষধি গাছসহ কতরকম চেনা-অচেনা ফুল, ফলের গাছ, অথবা শুধুই বৃক্ষ, যারা তাদের ফল দিয়ে পরিচিত নয়। এসব অনেক গাছই নিজের উদ্যোগে সংগ্রহ করেছে হুমায়ূন বিভিন্ন জায়গা থেকে। নুহাশে গাছ ছাড়াও রয়েছে পুকুর, মাছ, পায়েচলা পথ, বাঁধাই করা ঘাট, নৌকা, সুইমিং পুল, দোলনা, ফোয়ারা। আরও আছে মাঝে মাঝেই সুন্দর করে কার্পেটঘাসের লন, আর লনের ওপর চেয়ার-টেবিল দিয়ে সাজানো মনোরম বসার আর আড্ডা দেওয়ার জায়গা। শুটিংয়ের জন্যে তৈরি করা রয়েছে ছই আর বেড়া দিয়ে বানানো মাটির ঘর, উঠান, হাতে-তৈরি মাটির উনুন, ঢেঁকি, কুয়া। একপাশে রয়েছে বিশাল ইনডোর স্টুডিও। এ ছাড়া ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে গরু, কুকুর, ছাগল, হাঁস, রাজহাঁস ও বিভিন্ন ধরনের পাখি। নানারকম সাপও নাকি আছে, তবে ভাগ্যিস, আমরা তাদের কারোর দেখা পাই নি সেদিন। সাপকে আমার আবার ভীষণ ভয়। এ ছাড়া ঢুকতে ডানদিকের প্রান্ত ঘেঁষে এবং পল্লীর শেষমাথায় পুকুরের পাড়ে ব্রিজের কাছে রয়েছে শহুরে মানুষদের থাকার জন্যে তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সব উপকরণসহ আধুনিক স্টাইলের ছোট ছোট বাঁধানো বাংলো।

শহর থেকে বেশ দূরে এই স্নিগ্ধ, শান্ত, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে, তার অতি প্রিয় নুহাশপল্লীতে—প্রচুর গাছগাছালি-আচ্ছাদিত প্রকৃতির কোলে, মৃদু হাওয়ায় তির তির করে কাঁপতে থাকা ঘন ঝাঁকড়ানো পাতার লিচুবাগানের প্রশান্তিতে, হুমায়ূনের দেহাবশেষ ঘুমিয়ে থাকবে চিরকাল। জ্যোৎস্নার প্লাবনে যখন ভেসে যাবে চরাচর, শ্রাবণের বারিধারায় যখন সিক্ত হয়ে উঠবে ভূমি আর কদমফুল, তখন ছাউনির নিচে সবাই গোল করে বসে হুমায়ূনের কথা বলবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলবে—এমন দিনে কত উচ্ছল-ই না হয়ে উঠত সে। কিন্তু তারপরেও আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠবে না হুমায়ূন, জ্যোৎস্নার ঔজ্জ্বল্য আর বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ উপভোগ করার জন্যে, যা এত বেশি প্রিয় ছিল তার।

নিউইয়র্ক শহরে বিশাল বিশাল গগনছোঁয়া সব দালান, কর্মব্যস্ত কোটি জনতা আর লাখ লাখ গাড়ির কানফাটা আওয়াজের মধ্যে বসেও গভীর রাতে পূর্ণিমার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য আবিষ্কার করা বা তা উপভোগ করা হয়তো কেবল হুমায়ূন আহমেদের পক্ষেই সম্ভব। সম্ভব এইজন্যে যে, আগেই বলেছি, হুমায়ূনের অত্যধিক এক দুর্বলতা ছিল জ্যোৎস্নার প্রতি। কিন্তু সেই জ্যোৎস্না সম্পূর্ণ নিখাদ ও প্রাকৃতিক হতে হবে। ফকফকে দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ জ্যোৎস্না থেকে শুরু করে মাঝারি রকমের জ্যোৎস্না, এমনকি ম্লান হালকা জ্যোৎস্না, সবরকম জ্যোৎস্নাকেই সে উপভোগ করত। ভালোবাসত। পছন্দ করত জ্যোৎস্নাভরা রাতকে। তাই চাঁদকে তার খুঁজে বের করতেই হতো এই শহরে, তা সে যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন। শত কোলাহলের ভেতরেও, প্রয়োজনে ছাদে বা বেলকনিতে যেতে হতো তাকে চাঁদ খুঁজে বের করতে। চারদিকের হাজারো দূষণে তৈরি গভীর স্মগের (smoke আর fog মিলিয়ে কী সুন্দর একটা শব্দ, স্মগ—বের করেছে এরা) আস্তরণের আড়ালে চাঁদ যদি লুকিয়েও থাকে, তা হলেও। পুত্র নিষাদ যে বলেছে হুমায়ূনকে, ঢাকা থেকে চুপি চুপি চাঁদটা নাকি তাদের প্লেনের পিছু পিছু নিউইয়র্ক পর্যন্ত ঠিক চলে এসেছে। ওকে এখন হারালে চলবে কেন? তাই ঘরে থাকলে প্রায় প্রতিরাতেই দুষ্টু চাঁদটিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে পিতাপুত্র।

জ্যোৎস্না নিয়ে বিলাসিতা করা আমেরিকায় এই প্রথম নয় হুমায়ূনের।

ঘটনাটি ঘটে যখন অনেক বছর আগে প্রথম স্ত্রী গুলতেকিন ও কন্যাদের নিয়ে সে নর্থ ডেকোটার ফার্গো শহরে থাকে এবং ডক্টরেটের জন্যে পড়াশোনা করে। সেই সময়েই একবার নিজ পরিবার ও দুজন বন্ধু মিলে দু গাড়িতে গাড়ি ড্রাইভ করে সিয়াটল, ওয়াশিংটন (আমেরিকার একেবারে উত্তর-পশ্চিমের কোণের স্টেটটি) যাচ্ছিল তারা এক রাতে। সন্ধ্যায় ফার্গো থেকে রওনা হয়ে মধ্যরাতে মন্টানার গভীর বনের ভেতর দিয়ে (নিশ্চয় ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের গা ঘেঁষে উত্তর দিক দিয়ে যাচ্ছিল ওরা) গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ হুমায়ূন চন্দ্রাহত (moon-stuck) হয়ে পড়ে। তখন হাইওয়ের পাশে গাড়িটা কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে হেডলাইট বন্ধ করে চুপচাপ এই গভীর জঙ্গলের অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে শুরু করে। জ্যোৎস্না জ্বলে ওঠে চারদিকে। হুমায়ূন হঠাৎ যেন শৈশবে ফিরে যায়। অবাক হয়ে শোনে পেঁচা ডাকছে। হুত্তুম হুট। হুত্তুম হুট। হুমায়ূনের বড় মেয়ে নোভা ভয় পেয়ে কেঁদে উঠল। হুমায়ূন জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে মা? ভয় লাগছে?

হুঁ। ভূতের ডাক শুনেছি।

মাগো! ভূতের ডাক নয়। পেঁচা ডাকছে।' (*পায়ের তলায় খড়ম*, পৃ. ৯৬)

হুমায়ূনের মনে পড়ে গেল ছোটবেলা বাবা ও পরিবারের আর সকলের সঙ্গে মহিষের গাড়িতে করে জগদ্দল থেকে পঞ্চগড়ে যাচ্ছিল এক রাতে। রাতের বেলায় যাতে দিনের রোদে ও গরমে কষ্ট না হয়। হুমায়ূনের ভাষায়, 'মহিষের দুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙল গভীর রাতে। আমরা ঘন জঙ্গলের ভেতর। গাড়ি চলছে না। আমি অবাক হয়ে দেখি, প্রবল জোছনায় বনভূমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্লাবিত। জঙ্গলে গাছপালার ভেতর দিয়ে জোছনার কী যে রহস্য! আমি মুগ্ধ হয়ে জোছনা দেখছি ও ডাক শুনছি। অদ্ভুত এবং খানিকটা ভয় জাগানিয়া শব্দ। হুত্‌তুম হুট। হুত্‌তুম হুট। অদ্ভুত শব্দ, জোছনা, বনভূমি—সব মিলিয়ে আমার মধ্যে প্রবল ঘোর তৈরি হলো। আমি শব্দ করে কেঁদে উঠলাম। বাবা অন্য গাড়িতে ছিলেন, কান্নার শব্দে ছুটে এলেন। আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, বাবা! কী হয়েছে?

আমি বললাম, ভয় পেয়েছি। কিসের শব্দ ওটা?

হুতুম পেঁচার শব্দ।

গাড়ি থেমে আছে কেন বাবা?

আমি থামিয়েছি। জোছনা দেখার জন্য থামিয়েছি।'

জোছনার প্রতি অনুরাগ হয়তো জিন্‌স বেয়ে নেমে আসে পরবর্তী প্রজন্মে। তা না হলে আইনপ্রয়োগকারী পুলিশ কর্মকর্তা হুমায়ূনের পিতার কাছে গভীর রাতে গহীন বনের ভেতর মহিষের গাড়ি থামিয়ে জ্যোৎস্না উপভোগ করার মতো রোমান্টিক চিন্তা বা শখ চেপে ওঠা তো সচরাচর দেখা বা শোনা যায় না। আর হুমায়ূনের ভাষায়, প্রকৃতি বা ঈশ্বর সর্বদাই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে। তার ছোটবেলার এই জ্যোৎস্না রাতে বনের ভেতরের অভিজ্ঞতা পরিণত বয়সে আরেকবার অবলোকনের সুযোগ এসেছিল।

এই ঘটনার ঠিক বত্রিশ বছর পরে, হুমায়ূন লিখেছে, 'প্রকৃতি ঠিক করল, বনভূমিতে আমার জোছনা দেখা ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে।' হুমায়ূনের কথা শুনে মনে হয় জীবদ্দশায় কোনো কোনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন থাকে অবধারিত—অনিবার্য। আর ঠিক তাই কেমন করে যেন ঘটে প্রায় হুবহু একই রকম ঘটনা, ছেলেবেলার অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি পরের প্রজন্মের মধ্য দিয়ে নতুন করে অনুভব করা। তবে সেটা উত্তরবঙ্গে নয়। মন্টানার কঠিন বনভূমিতে।

এর অন্তত দু'যুগ পরের কথা আবার। শাশুড়ি, শালি, স্ত্রী শাওন ও শিশু পুত্রদ্বয় নিয়ে হুমায়ূন পরিবারকে রকি মাউনটেইন দেখাতে নিয়ে গেছেন জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত ডিসেম্বরের এক কনকনে শীতের দিনে। সঙ্গে আমিও ছিলাম সেদিন। একই বড় ভ্যানের ভেতর আমরা সকলেই একত্রে বসে আছি। মানে এক গাড়িতেই সবাই। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে এল রকি মাউনটেইনে। চারদিকে বরফে ঢাকা সুউচ্চ রকি মাউনটেইনের সেই সৌন্দর্য হুমায়ূন বর্ণনা করেছে এভাবে, 'সন্ধ্যাবেলা আকাশে প্রকাণ্ড চাঁদ উঠল। চাঁদের আলো বরফে পড়ে বরফ হয়ে গেল হীরকখণ্ড। আলো বিকিরণ করা শুরু করল। চাঁদের আলো এমনিতেই ঠান্ডা। বরফ থেকে প্রতিফলিত হয়ে তা হয়ে গেল আরও কোমল। অলৌকিক এক দৃশ্যের অবতারণা হলো। যে দৃশ্যের সঙ্গে সচরাচর দেখা পৃথিবীর কোনো সাদৃশ্য নেই। বলতে ইচ্ছা হলো :

এমন চাঁদের আলো
মরি যদি তাও ভালো।
সে মরণ স্বর্গসম।

জ্যোৎস্নারাতের রহস্য যে হুমায়ূনকে ছেলেবেলা থেকে শুরু করে সারা জীবনই কতটা আন্দোলিত ও উত্তেজিত করেছে, জীবনসীমান্তে এসে রকি মাউনটেইনের ওপর জোছনার আলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যক্ষ করার এই বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাটি তার একটি আলামত মাত্র। বরফে-ঢাকা রকি মাউনটেইনের চারদিকে আবার দেখেন হুমায়ূন সেই পরিচিত 'ফিনিক ফোটা জোছনা'। (*পায়ের তলায় খড়ম*, পৃ. ৯৫-৯৬)।

জুনের উনিশ তারিখে, সফল অস্ত্রোপচারের এক সপ্তাহ পর, যেদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ঘরে ফিরল হুমায়ূন, সেদিন রাতে কিন্তু না ছিল জ্যোৎস্না, না ছিল বৃষ্টি। চারদিকে তাকিয়ে কোথাও চাঁদটিকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। আসলে সে-রাতে ছিল অমাবস্যা। কিন্তু ঘরে ফেরার আনন্দে হুমায়ূন এতটাই মগ্ন ছিল সেদিন, যে, সন্ধ্যার পর সে আকাশের দিকে তাকাতেও ভুলে গেছিল। নিষাদ আর নিনিত, তার অতি প্রিয় দুই ফুটফুটে সন্তানই চাঁদের টুকরো হয়ে তার চোখের সামনে বসে একমনে খেলা করছিল সে-রাতে। মুগ্ধ বিস্ময়ে, এক সপ্তাহ পরে ঘরে এসে, ওদের ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল হুমায়ূন।

সেদিন, ১৯ জুন, অতি ভোরেই অপ্রত্যাশিতভাবে সে জেনেছিল সেই সকালেই তাকে বাড়িতে চলে যাওয়ার ছাড়পত্র দিচ্ছে হাসপাতাল। মাত্র পরশু রাতেই ICU থেকে সাধারণ ওয়ার্ডে আনা হয়েছে তাকে। এ দেশে সার্জারি বা অসুখে হাসপাতালে ভর্তি হলে, প্রয়োজনের বেশি একটি দিনও আর সেখানে রাখা হয় না। এটা আমরা জানতাম বলেই খুব ভোরে মাজহারের ফোনে সংবাদটা পেয়ে (যে সেদিনই হুমায়ূনকে ছেড়ে দেওয়া হবে) খুব বিস্মিত হই নি। গেল বছরে জ্যোতির বাম পায়ের সম্পূর্ণ হাঁটু (চামড়া ও মাংস বাদে হাঁটুর জোড়ার কাছে সব হাড়গোড় ও চাকতি) ফেলে দিয়ে সেখানে স্টেইনলেস স্টিল ও প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি কৃত্রিম হাঁটু বসানো হয়েছিল (total knee replacement surgery)। এটি প্রচলিত হলেও এটিকে এখনো একটি মেজর সার্জারি বলেই গণ্য করা হয় এ দেশে। তারপরও ওঁকে সার্জারি হওয়ার ঠিক তিন দিনের মাথায় বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সার্জারির পরদিন সকাল থেকেই হাঁটিয়েছিল ওকে, শিখিয়েছিল সিঁড়ি ভাঙতে হাসপাতালে থাকতেই। আর যন্ত্রের মাধ্যমে ফিজিওথেরাপি তো শুরু হয়েছিল রিকোভারি রুমে জ্ঞান ফিরে আসার আগে থেকেই। হুমায়ূনের বেলাতেও সার্জারির পর সপ্তাহখানেক লাগবে হাসপাতালে থাকতে, আগে থেকেই বলেছিলেন ডাক্তার। গেল মঙ্গলবার ১২ তারিখে সার্জারি হয়েছে। পরের মঙ্গলবার ১৯ তারিখে বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে তাকে। আর সে কী খুশি তখন হুমায়ূন! মনে হচ্ছে বহুদিন কারাভোগ করা কয়েদি এইমাত্র জেলখানা থেকে মুক্তির পরোয়ানা পেয়েছে যেন। আমরা সকলেই জানি হাসপাতালে থাকতে কী পরিমাণ অপছন্দ করে সে। আর নিজের ঘরে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে সময় কাটাতে কী সাংঘাতিক পছন্দই না করে হুমায়ূন! ব্যক্তিগত জীবনে সে বড়ই ঘরোয়া ও নিভৃতচারী।

১৯ জুন থেকে ১৯ জুলাই। সময়ের হিসেবে মাত্র একটি মাস, কানায় কানায়। অথচ মাত্র এই একটি মাসে সবকিছু কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল। সম্পূর্ণ দৃশ্যপট বদলে গেল রাতারাতি। ১৯ জুন ঘরে ফিরে গেল হুমায়ূন সফল অস্ত্রোপচার শেষে। আর ১৯ জুলাই ঠিক এক মাস পরে মারা গেল সে। ক্যানসারে নয়, অপারেশন পরবর্তী জটিলতায়, যা এদেশে এরকম সার্জারিতে ঘটে মাত্র শতকরা ৫-এরও কম রোগীর বেলায়। ১৮ জুলাই হুমায়ূনের প্রধান সার্জন আমায় টেক্সট ম্যাসেজে জানিয়েছিলেন, আগের দিনের তুলনায় হুমায়ূন আজ একটু ভালো আছে। তাঁর বিবেচনায় হুমায়ূন বেশ কিছুটা 'stable'। এই 'stable' শব্দটার অনুরণন কমে নি, সুসংবাদটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাওন ও জাফর ইকবালকে জানাবার পরেও। তাকে যে ঘুম পাড়িয়ে রাখার ওষুধ দেওয়া হতো, তাও তুলে নেওয়া হয়েছে আজ (জুলাই ১৮)। হুমায়ূনের জেগে ওঠার আশায় আমরা প্রতীক্ষা করতে থাকি। কিন্তু প্রায় ২৪ ঘণ্টার ভেতরও যখন তার জ্ঞান ফিরে এল না, তখনো আমরা মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছি এই কিছুক্ষণের ভেতরেই নিশ্চয় জেগে উঠবে সে। কেননা ডাক্তার গতকাল সকালেই বলেছিলেন এরকম অবস্থায় রোগীর জেগে উঠতে একটু সময় লাগতে পারে। আমার আশঙ্কাকে নির্মূল করতে, ডাক্তার আবার সঙ্গে সঙ্গেই আশ্বাস দিয়েছিলেন, হুমায়ূনের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতায় কোনোরকম অসুবিধে বা ক্ষতি হয় নি। স্বাস্থ্যগত কারণে মাঝে মাঝে ভাইটাল সাইন কিছুটা ওঠানামার ভেতর দিয়ে গেলেও তার রক্ত চলাচলের গতি বা রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কখনো তেমন পর্যায়ে নামে নি যে মস্তিষ্কের কোনো ক্ষতি হতে পারে। আমি তখন ডাক্তারকে সেই একই কথা আজ আবার নতুন করে বললাম। ফোনে। হুমায়ূনের ছোটভাই জাফর ইকবাল ও তার স্ত্রী ইয়াসমিন দেশ থেকে এসেছে তাকে দেখতে। হুমায়ূন এখন পর্যন্ত হয়তো সেটা জানতেও পারে নি। কেননা, জেগে থাকলেই যেহেতু শরীরে টিউব, তার, নল ইত্যাদি লাগানো থাকার কারণে সে বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে সবকিছু খুলে ফেলার চেষ্টা করে। সেই কবে থেকে হুমায়ূনকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হচ্ছে। কিন্তু আমার অধৈর্য লাগছে এখন। কবে তাড়াতাড়ি জেগে উঠে হুমায়ূন জানতে পারবে, দেশ থেকে জাফর ও ইয়াসমিন এসেছে তাকে দেখতে! কতই না খুশি হবে সে শয্যাপাশে অনুজকে দেখতে পেলে! যখন অতি আগ্রহের সঙ্গে আমরা সবাই অপেক্ষা করছি, কখন হুমায়ূন চোখ খুলে তাকাবে, তখন আমাদের অজান্তেই তার শারীরিক অবস্থা ঠিক উল্টো দিকে মোড় নিতে শুরু করে, যা আমরা জানতাম না। রাত শেষে ভোর হয়। আসে সেই ভয়ংকর দিন—১৯ জুলাই। ১৯ জুনের ঠিক বিপরীত দিন ১৯ জুলাই।

গেল মাসে, মানে জুনের ১৯ তারিখে ভোরে যে সময়টায় সেই সুখবরটা পেয়েছিলাম, সফল অস্ত্রোপচারের পরে হুমায়ূন ঘরে ফিরে যাচ্ছে আজ, সেই প্রায় একই সময় ঠিক এক মাস পরে জুলাই ১৯ তারিখে ডাক্তারের কাছে খবর পেলাম তার অবস্থা মোটেও ভালো নয়, সম্ভাব্য উঁচু ডোজের ওষুধ দেওয়া সত্ত্বেও ব্লাড প্রেসার যথেষ্ট উঁচুতে ধরে রাখা যাচ্ছে না। তবু আশা করে থাকি এর আগে যেমন হয়েছে, এবারও তার শরীরের অবস্থা আবার পাল্টাবে, ভালোর দিকে যাবে আবার। কিন্তু আরও ঘণ্টা দুয়েক পরে ডাক্তার মিলারের টেক্সট ম্যাসেজে জানতে পাই হুমায়ূনের অবস্থা খুবই খারাপ। শাওনসহ ওখানকার সব আত্মীয়স্বজন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ডাক্তারের শেষ বাক্য ছিল, তিনি খুবই দুঃখিত। আমি জানতে চাই, 'এই কি তাহলে শেষ?' উত্তরে ডাক্তার মিলার লেখেন, 'সম্ভবত। তবে আমরা এখনো চেষ্টা করে যাচ্ছি।' হুমায়ূনের হাসপাতলের কক্ষটা চোখে ভাসে। সকলের সজাগ দৃষ্টির সামনে আস্তে আস্তে হুমায়ূনের ব্লাড প্রেসার, হার্টবিট কমতে শুরু করে। কারও ফোন থেকে আমার ফোনে একটি কল এলে হুমায়ূনের রুম থেকে কান্নার আওয়াজ পাই—পেছনে মৃদু কোলাহল। কান্নাঝরা কণ্ঠে টেলিফোনে ইয়াসমিন বলে, 'পূরবীদি সবকিছু নিচে নেমে যাচ্ছে। ব্লাড প্রেসার চল্লিশ থেকে এখন তিরিশ...'

না, সেদিনও, মানে ১৯ জুলাই রাতেও, পূর্ণিমা ছিল না। বৃষ্টিও হয় নি সে রাতে। তবে সে রাত ছিল নিকষ কালো অন্ধকারের রাত। কী আশ্চর্য, হুমায়ূনের অনন্তযাত্রার রাতটিতেও ছিল পূর্ণ অমাবস্যা। জ্যোৎস্নাপাগল-বৃষ্টিপ্রেমিক হুমায়ূনের মহাপ্রয়াণে যদি চাঁদ লজ্জায় মুখ ঢেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মগোপন না করে, করবে আর কোনদিন ? আকাশে চাঁদ নেই। ঘোর অন্ধকারে হুমায়ূন শুয়ে আছে এক অপরিচিত বাড়িতে। নিজের চেনা শোওয়ার ঘরে স্ত্রী-পুত্রদের পাশে নিয়ে বিশাল বড় খাটে নয়। অথচ যেখানে আজ রাতে শুয়ে আছে, সে জায়গাটা তার বাসা থেকে খুব দূরে নয়। কিন্তু একা, অপরিচিত এক বাড়িতে লম্বা বাক্সের মতো এক বিছানায় শুয়ে আছে হুমায়ূন। চিকিৎসার জন্যে এইবার নিউইয়র্ক আসার পরে হাসপাতাল ছাড়া এই বোধহয় প্রথমবারের মতো এই শহরে নিজের বাসার বাইরে রাত কাটাল হুমায়ূন। তাও এক অপরিচিত স্থানে, ফিউউনারেল হোমের ঠান্ডা নিস্পৃহ অচেনা এক ঘরে। ম্লান জ্যোৎস্না নয়, বৃষ্টি নয়, কেবল গুচ্ছ গুচ্ছ অন্ধকার সাক্ষী হয়ে রইল সেই মহাপ্রয়াণের। মনে পড়ে মৃত্যুকে নিয়ে—নিজের মৃত্যুকে নিয়েও—কতরকম তামাশা, রসিকতা (জোক) করত হুমায়ূন। আমরা সকলে মিলেই হাসতাম তখন। একসঙ্গে, জোরে জোরে। সবচেয়ে বেশি হাসত হুমায়ূন নিজে। যেন কী মজার একটা কথা বলে ফেলেছে সে। ফোনে যখনই তাকে জিজ্ঞেস করতাম, 'কেমন আছেন হুমায়ূন ?' হয় বলত, 'এখনো বেঁচে আছি' অথবা, 'এখনো মরি নি।' কেমোথেরাপির কষ্ট প্রায় অসহনীয়, বলত কখনো-সখনো। হাত-পায়ের চামড়া উঠে যাচ্ছে, আঙুলে ব্যথা, লিখতে কষ্ট হয়, কলম ধরে রাখা শক্ত, মুখমণ্ডলে চোখের পাশে কালো কালো দাগ, মুখে-জিহ্বায় ঘায়ের মতো ফোটার মতো কী উঠেছে, কোনো খাবারে রুচি নেই। তাই কি বেঁচে থাকা আর 'মরে যাওয়া' মাঝে মাঝে সমার্থক হয়ে যেত তার কাছে ? কিন্তু সে তো মুহূর্তের জন্যে। যতক্ষণ দেহে শক্তি ছিল তার, হুমায়ূন তার জীবন এবং বেঁচে থাকার ব্যাপারে কোনো কিছুতেই ছাড় দিতে রাজি ছিল না। সমস্ত শক্তি একত্রিত করে দুই কেমোর মাঝখানে পুরো পরিবার নিয়ে মাঝে মাঝেই বেরিয়ে পড়ত সে এখানে-ওখানে, দূর-দুরান্তে নানা জায়গায়। প্লেনে করে গেছে কলোরাডো, সেখান থেকে অনেক উঁচু পর্বত রকি মাউনটেইন ন্যাশনাল পার্কে গাড়ি করে। এ ছাড়া, সপরিবারে একাধিকবার বেড়াতে গিয়েছে ওয়াশিংটন ডিসি, বাল্টিমোর, আটলান্টিক সিটিতে। কেমোর কোর্স শেষ হওয়ার পরে গেছিল ঢাকায়, তার প্রাণপ্রিয় নুহাশপল্লীতে। তবে সবচেয়ে বড় যে কারণে সে দেশে গিয়েছিল এবার, সেটা হলো, মায়ের সঙ্গে দেখা করা। মায়ের সঙ্গে দেখা করতে দেশে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল হুমায়ূন। গত জানুয়ারি মাসে আমি যখন দেশে যাই তখনো তার মায়ের সঙ্গে যেন অবশ্যই দেখা করে আসি, বলেছিল হুমায়ূন। ঢাকায় গিয়ে খালাম্মাকে অবশ্য খুঁজে বের করতে হয় নি আমায়। পুত্রের খোঁজে নিজেই চলে এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে আলমগীরের বাসায়, দখিন হাওয়ায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছেলের কথা অনেক কিছু জানতে চেয়েছিলেন জননী। হাতব্যাগে পাসপোর্ট নিয়েই ঘুরছিলেন তিনি তখন। আলমগীর বলছিল, আমার সঙ্গেই নাকি ছেলেকে দেখতে আমেরিকায় যাওয়ার ইচ্ছা তাঁর। সেটা অবশ্য সম্ভব হয় নি প্রধানত তাঁর স্বাস্থ্যগত কারণেই। এ ছাড়া শুনেছি পাসপোর্টেও সম্ভবত কী তথ্যগত ভুল ছিল সামান্য। তবে তিনি বারবার তাঁর বাড়িতে আমাকে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, যেটা শেষ পর্যন্ত আর হয়ে ওঠে নি।

গত কয়েক মাসের ভেতর শেষ পূর্ণিমা দেখেছিলাম ৩ জুলাই, যেদিন নিউইয়র্ক থেকে ডেনভার ফিরে আসি। হুমায়ূন তখনো হাসপাতালে, ICU-তে। অনেকদিন আগে থেকেই কথা, আগামীকাল অর্থাৎ জুলাই ৪ (আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস) আমাদের বাসায় এক পুরনো বন্ধু-

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দম্পতি বেড়াতে আসবেন আটলান্টা থেকে। ফলে আমাদের নিউইয়র্ক ছেড়ে ৩ জুলাই ডেনভার ফিরে আসাটা আর পেছানো সম্ভব ছিল না। গ্রীষ্মে দিন অনেক বড় হয় এখানে। সমুদ্রের উপরের স্তর থেকে এক মাইল উঁচুতে অবস্থান ডেনভার শহরের, যার জন্য ডেনভার Mile High City বলে পরিচিত। অনেক উঁচুতে বলে আর গাছপালা কম থাকায় (বিশেষ করে লম্বা গাছ প্রায় নেই বললেই চলে) ডেনভারের দিগন্তটা সবসময়েই বিশাল বড় ও উন্মুক্ত মনে হয় আমার কাছে। রোদটাও খুব বেশি। একেবারে গায়ে বিঁধে যেন। সূর্য ডুবে গেলে ধপ করে তাপমাত্রা কমে যায় এখানে। দিনে ও রাতের তাপের পার্থক্য তিরিশ ডিগ্রিরও বেশি। সেদিন রাতে রান্না শেষে আমাদের বাড়ির ভেতরের দিকে খোলা ডেকে পেতে রাখা চেয়ারগুলোর একটাতে গিয়ে বসেছিলাম কিছুক্ষণের জন্যে। তখনই দেখেছিলাম আকাশে পূর্ণ চাঁদ। আমি জানি, এ চাঁদ হুমায়ূন সে রাতে দেখতে পায় নি। বেলভিউর ICU রুমের যেখানে তার বিছানা, সেখান থেকে আকাশ দেখা যায় বলে আমার মনে হয় না।

১৯ জুন, ১৯ জুলাই দু'রাতের এক রাতেও পূর্ণিমা ছিল না, তাই জ্যোৎস্নাও নয়। পূর্ণ চাঁদের জ্যোৎস্নায় ভেসে যায় নি যান্ত্রিক শহর নিউইয়র্ক। কী আশ্চর্য, পূর্ণিমা দূরে থাক, সেই দুই রাতেই ছিল ভরা অমাবস্যা। জুলাই ১৯, বৃহস্পতিবার রাত। সেই রাতে তরল জ্যোৎস্নায় চারিদিক প্লাবিত না হলেও, রিমঝিম বৃষ্টিতে আমেরিকার বৃহত্তম শহরটি অবগাহিত না হলেও, কান্না বুঝি জমেছিল ভাঙা কলসির মতো আকাশের কোনো এক কোণে।

আর তাই ঠিক পাঁচ দিন পরে ২৪ জুলাই আবার এল সেই মঙ্গলবার, (মঙ্গলবারেই হুমায়ূনের অস্ত্রোপচার হয়, মঙ্গলবারেই অপারেশনের পরে ঘরে ফেরে সে) শ্রাবণের ৮ তারিখ। অজস্র ধারায় গলে পড়ল আকাশ। চারদিক অন্ধকার করে তুমুল বৃষ্টি নামল। শ্রাবণের বৃষ্টি—একটানা ঝরে পড়তে শুরু করল দশ হাজার মাইল দূরে বাংলার মাটিতে। স্বজন, বান্ধব, ভক্ত, সাধারণ মানুষ সবার মিলিত কান্নার সঙ্গে আকাশও শরিক হয়েছিল সেদিন। চারদিকে আলোর অপ্রতুলতা। দিনের বেলা গভীর অন্ধকার করে আসছে বরষা। বৃষ্টি সেদিন সত্যি নেমেছিল অঝোরে, নুহাশপল্লীতেও, যেদিন হুমায়ূন তার অতি সাধের লিচুবাগানের মাটির নিচে স্থায়ী বাসস্থান করে নিয়েছিল। তার প্রাণপ্রিয় শ্রাবণ মেঘের ধারা অনবরত ভিজিয়ে দিচ্ছিল সদ্য খোঁড়া কবরের ঝুরঝুরে মাটিকে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বকালের সবচেয়ে জননন্দিত লেখক হুমায়ূন আহমেদ বহু গ্রন্থের রচয়িতা। কিন্তু তার প্রথম উপন্যাস, মাত্র ৭৭ পৃষ্ঠার (আজকের যুগে কম্পিউটার টাইপে কম্পোজ করলে পৃষ্ঠা সংখ্যা আরও কম হবে) চটি গ্রন্থ 'নন্দিত নরকে' লিখেই প্রথম সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল হুমায়ূন। হিমাংশু দত্তের সুরে গাওয়া গানের কথাগুলোর মতোই হুমায়ূনকেও বারবার আলোড়িত করেছে, বাংলার বৃষ্টি, জ্যোৎস্না, অন্ধকার, চাঁদ, গাছ, পাখি, নদী, ফুল। এসব প্রাকৃতিক উপাদান যে বড় কাছে থেকে নিবিড়ভাবে সে দেখেছে, আপন করে গেঁথে নিয়েছে বুকে, তা তার প্রথম গ্রন্থ *নন্দিত নরকের* পরতে পরতে ধরা পড়ে। *নন্দিত নরকেও* এক মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারকে ঘিরে আবর্তিত। বাবা-মা-ভাইবোন আর পাশাপাশি মাত্র কয়েকটি চরিত্র। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, সহজ-সরল ভালোবাসা, দুঃখ, সুখ, আর্থিক অনটন, মানবিক দুর্বলতা, আবেগ, স্খলন, ক্রোধ, খুন, মৃত্যু—এক কথায় সংক্ষেপে এবং নির্মোহভাবে পরিবেশিত এক পূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবজীবনগাথা, যার সমাপ্তি ঘটে একাধিক অস্বাভাবিক করুণ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। *নন্দিত নরকের* ভেতর ঘুরেফিরেই আসে বৃষ্টির কথা, বৃষ্টির রাতের কথা, বৃষ্টির রাতে 'ভূতের গল্প' শোনার কথা, আসে জ্যোৎস্নার কথা, আসে অন্ধকার, আর অন্ধকারে সেই দুঃসময়ের প্রতীক ঝাঁকে ঝাঁকে কালো পাখি উড়ে যাওয়ার কথা। হুমায়ূন লেখে,

"গাছের নিচে ঘন অন্ধকার। কী গাছ এটা ? বেশ ঝাঁকড়া! অসংখ্য পাখি বাসা বেঁধেছে। তাদের সাড়াশব্দ পাচ্ছি। পেছনের বিস্তীর্ণ মাঠে ম্লান জ্যোৎস্নার আলো। কিছুক্ষণের ভেতরেই চাঁদ ডুবে যাবে।" (পৃ. ৭৬)

বৃষ্টিপাগল হুমায়ূন আর এক জায়গায় লেখে, "সারা রাত ধরে বৃষ্টি হলো। আষাঢ়ের আগমনী বৃষ্টি। বৃষ্টিতে সব যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। রুনু বলল, মনে আছে দাদা, এক রাতে এমনি বৃষ্টি হয়েছিল, তুমি একটা ভূতের গল্প বলেছিলে!" (পৃ. ৭১)

নন্দিত নরকের শেষ দৃশ্যে উত্তম পুরুষে লেখা উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গভীর রাতে তার বাবার গা ঘেঁষে বসে আছে জেলখানার বাইরে, ছোটভাই মন্টুর ফাঁসি দেওয়া মৃত দেহখানা বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যে। হুমায়ূনের ভাষায় : "বাইরে ম্লান জ্যোৎস্না হয়েছে। কিছুক্ষণের ভেতর চাঁদ ডুবে যাবে। আমি আর বাবা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছি সিমেন্টের ঠান্ডা বেঞ্চিতে। মাথার উপর ঝাঁকড়া অন্ধকার গাছ।" (পৃ. ৭৬)

অবশেষে ঝাঁকড়া গাছ থেকে ভোররাতে কা কা ডেকে কালো পাখিরা উড়ে যেতে থাকে, যে অমাঙ্গলিক দৃশ্য থেকে পাঠকের আর বুঝতে বাকি থাকে না, জেলের ভেতরে মন্টুর ফাঁসি এতক্ষণে কার্যকর হলো। সবশেষে হুমায়ূন লেখে, "ভোর হয়ে আসছে। দেখলাম চাঁদ ডুবে গেছে। বিস্তীর্ণ মাঠের উপরে চাদরের মতো পড়ে থাকা ম্লান জ্যোৎস্নাটা আর নেই।" (পৃ. ৭৭)

হুমায়ূন নিজেও আর নেই। তাঁর এই অসময়োচিত অন্তর্ধানে বাঙালির সার্বিক অবস্থা হুমায়ূনের ভাষাতেই অতি সংক্ষেপে বলা চলে, "তিমিরময়ী দুঃখ। প্রগাঢ় অন্ধকার আমাদের গ্রাস করছে।" (*নন্দিত নরকে*, পৃ. ৭১)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনবাদী হুমায়ূন আহমেদ

ফরিদুর রেজা সাগর

হুমায়ূন আহমেদের জীবনদর্শন আর দশজন মানুষের মতো ছিল না। কাজের মাধ্যমেই তিনি জীবনের দর্শন খুঁজেছেন। আনন্দ খুঁজে নিয়েছেন। আর তাই তাঁর লেখা নাটক, চলচ্চিত্র ও উপন্যাসে জীবনের অনেক কঠিন সত্য সহজ-সরলভাবে উঠে এসেছে।

ক্যানসার ধরা পড়ার পর সিঙ্গাপুর থেকে যখন হুমায়ূন আহমেদ বাংলাদেশে ফিরে এলেন, আমি তখন এয়ারপোর্টে যাই তাঁকে রিসিভ করতে। তিনি আমাকে দেখে খুবই বিস্মিত হলেন। যদিও এর আগে সিঙ্গাপুরে যখন তাঁর বাইপাস হলো তখনো তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু এর আগে তিনি বহুবার বিদেশ থেকে দেশে ফিরেছেন কিন্তু এয়াপোর্টে কখনোই রিসিভ করতে যাই নি। এমনকি তাঁর সঙ্গে দলবলে কখনো কোথাও ঘুরতে যাওয়াও হয় নি। তাই হয়তো তিনি আমাকে এয়ারপোর্টে দেখে বললেন, কী ব্যাপার! তুমি কি এই আশা করেই এসেছো যে আমি আর জীবিত ফিরব না? আমি একটু অপ্রস্তুত হয়েই বললাম, না হুমায়ূন ভাই! আপনার শরীরটা একটু খারাপ, তাই এয়ারপোর্টে এসেছি আপনাকে রিসিভ করার জন্য। এদিকে কাস্টমসের লোক, পুলিশের লোক, কেউ হুমায়ূন ভাইয়ের ছাত্র, কেউ তাঁর ভক্ত, সবাই যখন জানল যে হুমায়ূন আহমেদ এসেছেন—সবমিলিয়ে বেশ বড়সড় একটা ভিড় লেগে গেল। এত মানুষ দেখে হুমায়ূন আহমেদ ভাবলেন, তিনি অসুস্থ এই খবর নিশ্চয়ই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং এই জন্যই সবাই তাঁকে দেখতে এসেছে। অথচ তাঁর অসুস্থতার খবর আমরা যারা ঘনিষ্ঠজন ছিলাম তারা ছাড়া আর কেউ জানতেন না। আসলে তিনি এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে, তাঁর আসার খবর শুনে তাঁকে একনজর দেখার লোভ কেউই সংবরণ করতে পারে নি। সবশেষে তিনি যখন তাঁর গাড়ির কাছে গেলেন সেখানেও বেশ কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই দলটাকে দেখে তিনি বললেন, তোমরা বোধহয় খুব আনন্দিত হতে আমি যদি না হেঁটে শুয়ে আসতাম। এই যে উপলব্ধি, তিনি দাঁড়িয়ে আসবেন নাকি শুয়ে আসবেন তিনি যেভাবে ভেবেছেন বা দেখেছেন আমরা সেভাবে ভাবি নি, দেখি নি। এই যে শুয়ে আসার ব্যাপারটা তিনি যতটা সহজভাবে উপস্থাপন করেছেন, আমরা সেটা কখনোই করতে পারতাম না। শুধু বলতে পারি তাঁর শুয়ে আসার দৃশ্য দেখে কেউই আনন্দিত হতে পারে নি, পুরো দেশ চোখের জলে ভেসেছে। তাঁর মৃত্যুতে যে জনসমুদ্র সৃষ্টি হয়েছিল তা বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরল। এটি শুধু তাঁর সৃষ্টিশীল সত্তার জন্য নয়, তাঁর মহৎ-বিশাল হৃদয়, মানবিক সত্তার জন্যও।

তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে টেলিভিশন নাটকের কারণে। ইমপ্রেস টেলিফিল্ম যখন বাংলাদেশে প্রথম যাত্রা শুরু করে ঢাকায়, সেই সময় সবচেয়ে বড় প্রোডাকশন হাউস ছিল 'ইনফ্রেম'। বাংলাদেশের খ্যাতিমান নির্মাতারা সবাই সেই সময় নাটক তৈরি করতেন সেখান

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকেই। সঙ্গতকারণেই তারা নতুন একটি জায়গা থেকে অনুষ্ঠান করতে রাজি ছিলেন না। নবীন পরিচালকেরাই শুধু সেই সময়ে ইমপ্রেসের কারিগরি সুবিধা নিয়ে নাটক নির্মাণ করছিলেন। সেই সময়েই শুনতে পেলাম বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ইমপ্রেস থেকে নাটক পরিচালনার জন্য। সে সংক্রান্ত আলোচনার জন্যই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। সেই সময়ে তিনি শান্তিনগরের সাসটেইন স্টুডিওতে একটি নাটকের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের কাজ করছিলেন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। তাঁর সঙ্গে আগে থেকেই কিছুটা আলাপ-পরিচয় থাকলেও ঘনিষ্ঠতার শুরু এখান থেকেই। বড় নির্মাতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম যোগ দিলেন ইমপ্রেস টেলিফিল্মে। একটি নতুন চ্যানেলের যাত্রা সময়ে হুমায়ূন আহমেদের মতো একজন বড় মাপের নির্মাতা চ্যানেল আইয়ের সঙ্গী হওয়ায় তাঁর সহযোগিতায় আমাদের বন্ধুর চলার পথ অনেকটাই মসৃণ হয়েছিল। তিনি ছিলেন চ্যানেল আই পরিবারের অন্যতম সদস্য, তাঁর শেষ সময় পর্যন্ত সঙ্গে থেকে তিনি চ্যানেল আই এবং এর সকল দর্শককে করেছেন নানাভাবে সমৃদ্ধ। তিনি এমন একজন সৃজনশীল মানুষ যিনি যেখানেই হাত দিয়েছেন সেখানেই সোনা ফলেছে। আর ইমপ্রেস টেলিফিল্মের সঙ্গে কাজ শুরু করার পর থেকেই নাট্যকার হুমায়ূন আহমেদ নাটকের বাইরেও বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

একসময় হুমায়ূন আহমেদ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান নির্মাণের চিন্তা করলেন। গতানুগতিক ধারার বাইরে একেবারে অন্যরকম একটি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শুরু হবে ঢোল বাজিয়ে। ঢোল বাজাবে একজন নয়, বেশ কয়েকজন ঢুলি। যেখানে ঢাকা শহরে একজন ঢুলি পাওয়াই ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার, সেখানে তিনি জোগাড় করলেন বেশ কয়েকজন। সেই সময় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান মানেই যেখানে ছিল বড় বড় সব শিল্পীর গান, সেখানে হুমায়ূন আহমেদ গাওয়ালেন প্রথমবারের মতো বারী সিদ্দিকীকে দিয়ে। অসাধারণ এই ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানটির নামটাও ছিল বেশ অদ্ভুত। 'রঙের বাড়ৈ'। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন প্রথিতযশা অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর।

হুমায়ূন আহমেদ তৈরি করেছিলেন সঙ্গীতানুষ্ঠানও, যেখানে ফিরোজা বেগমের মতো বড় মাপের শিল্পী শুধু অংশগ্রহণই করেন নি, বেশ কয়েকদিন পরিশ্রম করে অনুষ্ঠান ধারণে সহায়তাও করেছিলেন। দেশের প্রথম টেলিফিল্ম তৈরির কৃতিত্বও তাঁর। এটির নাম হলো 'নীতু তোমাকে ভালবাসি'। নিজের নাটক ও চলচ্চিত্রের অংশবিশেষ নিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি বিজ্ঞাপনও নির্মাণ করেছিলেন।

এমনকি বিচার-কর্মের প্রতি চরম অনীহা থাকা সত্ত্বেও চ্যানেল আইয়ের ক্ষুদে গানরাজের বিচারক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। অবশ্য এটা তাঁকে দিয়ে করানো সম্ভব হয়েছে গানের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার জন্য। আমরা জানি, তিনি বেশ কিছু গান রচনা করেছেন এবং প্রতিটি গানই ভীষণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যারা গান গায় কিংবা গানের সঙ্গে যাদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, তাদেরকে তিনি ভীষণ ভালোবাসতেন। তাই আমরা ভাবলাম যে মানুষটি গানকে এতটা ভালোবাসে, তাঁকে দিয়েই যদি আমাদের নতুন প্রজন্মের শিল্পী নির্বাচন করি তবে এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। এই চিন্তা থেকে তাঁকে বিচারক হওয়ার জন্য বলি। তিনি সানন্দেই রাজি হয়েছিলেন। শুধু ভালোবাসার টানে। এটাও তাঁর চরিত্রের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি যাকে কিংবা যা কিছু পছন্দ করতেন, ভালোবাসতেন, তার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতেও দ্বিধা করতেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর একটা ব্যাপার তাঁর মধ্যে ছিল, তিনি যা কিছু ভালো মনে করতেন, যা কিছু করণীয় মনে করতেন, তা-ই করতেন। কে কী বলল বা ভাবল সেটা নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা ছিল না। বেশিরভাগ সময় দেখতাম তাঁর চিন্তাটাই সঠিক। তাঁর নির্মিত সর্বশেষ চলচ্চিত্র 'ঘেটুপুত্র কমলা' নির্মাণের শুরু থেকেই আমার সংশয় ছিল—এই ধরনের গল্পের একটি ছবি আমাদের দেশের মানুষ, আমাদের দর্শক কীভাবে নেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, তিনি ছবিটি নির্মাণ করলেন এবং দর্শকও এটি খুব ভালোভাবে গ্রহণ করেছে। এমনকি দর্শক হিসেবে আমি নিজে ছবিটি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তিনি এতটাই গুণী নির্মাতা ছিলেন যে অতি সাধারণ বিষয়কেও অনন্যসাধারণ করে তুলতেন। তবে এত বড় একজন নির্মাতার কাজ করার আনন্দ আর অস্বস্তির ছোঁয়া দুটোই আমরা পেয়েছিলাম। সামান্য একটু অসঙ্গতি খুঁজে পেলেই ভীষণভাবে রেগে যেতেন তিনি। হয়তো বলেই বসতেন, এই কাজ আমি শেষ করব না। তখন ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে যেতাম সবাই। প্রথমদিকে সব সময় আতঙ্কগ্রস্ত থাকতাম আমরা। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সবাই বুঝে গেলাম, তাঁর রাগ অনেকটা শরতের প্রকৃতির মতোই। এই মেঘ এই রোদ্দুর। রাগ যেমন তিনি যুক্তিপূর্ণ কারণে করেন ঠিক তেমনি তাঁর সেই রাগ নেমে যেতেও সময় লাগে না।

তাঁর একটি অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি মানুষকে খুব সহজেই আপন করে নিতে পারতেন। মানুষকে অপ্রস্তুত করে, বিস্মিত করে কাছে টেনে নিতেন। তিনি যখন কোথাও যেতেন দেখা যেত তাঁর চারপাশে অজস্র মানুষের ভিড়। বলা যায় তাঁর সান্নিধ্যে ছিল সবার অবাধ বিচরণ।

AMARBOI.COM

দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অসামান্য। বিশেষ করে তরুণ সমাজ আর দেশের উন্নতি নিয়ে ভীষণভাবে ভাবতেন। তাঁর নানা সৃষ্টিকর্মেই এর প্রতিফলন দেখা গেছে। কখনো কখনো একটি ছোট্ট কথাও যে বুলেটের চেয়ে শক্তিশালী হয় তিনি তা প্রমাণ করেছেন। 'বহুব্রীহি' ধারাবাহিকে 'তুই রাজাকার'—মাত্র এই দুটি শব্দ দিয়ে তিনি যুদ্ধাপরাধ বিরোধী চেতনা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়াকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তরুণদেরকে সবসময় উদ্বুদ্ধ করতেন। একবার একটি চলচ্চিত্রের শুটিংয়ের সময় একটি ছেলে অনেক চেষ্টা-তদ্বির করে সুযোগ পেল হুমায়ূন ভাইয়ের সঙ্গে একটি ছবি তোলার। হঠাৎ তিনি ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী কর? সে বলল, বিএ পরীক্ষা দিয়েছিলাম, কিন্তু পাস করতে পারি নি। তখনই তিনি ছবি তোলা বন্ধ করে ছেলেটিকে বলেন, তুমি বিএ পাস করে আমার সঙ্গে দেখা করবে, তখন আমি তোমার সঙ্গে ছবি তুলব। পরে ছেলেটি বিএ পাস করেই তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিল এবং সেদিন হুমায়ূন ভাই ছেলেটির সঙ্গে ছবি তুলেছিলেন।

এমনকি 'লাক্স-চ্যানেল আই সুপার স্টার' আয়োজনের গ্রুমিংয়ে তিনি স্বেচ্ছায় গিয়েছেন। প্রতিযোগীদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেছেন, এমন কিছু কথা বলেছেন, যা তাদের অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। তারা অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয়েছে, মেধাবী হয়েছে।

এ বিষয়ে ব্যক্তিগত একটি ঘটনা যোগ করি। হুমায়ূন আহমেদের সব লেখাই ছিল অসাধারণ, খুবই জনপ্রিয়। ছোটদের নিয়ে আমার লেখা একটি বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন তিনি এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। বইটির প্রকাশক অন্যপ্রকাশের মাজহারুল ইসলাম হুমায়ূন আহমেদকে বইটি আগের রাতেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরে শুনেছি তিনি রাত তিনটা পর্যন্ত পড়ে বইটি শেষ করেছিলেন এবং শেষ করার একটাই কারণ ছিল পরদিন দুপুরে প্রকাশনা উৎসবে এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্কে তাঁকে কিছু বলতে হবে। তিনি বললেন, 'বইটি সম্পর্কে আমি না পড়েও বলতে পারতাম। যেহেতু আমি ছোটদের বই, ছোটদের নিয়ে লেখা বই পড়তে ভালোবাসি তাই আমি পুরো বইটি শেষ করেছি।' বইটির একটি চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্যও করলেন, যে চরিত্রটিকে অসম্পূর্ণ দেখানো হয়েছে; তার কোনো পরিণতি দেখানো হয় নি। অনেক বেশি মনোযোগ দিয়ে বইটি না পড়লে এমন মন্তব্য করা সম্ভব হতো না। তাঁর এই সততা, এই আন্তরিকতার কোনো তুলনা হয় না।

হুমায়ূন আহমেদের মতো একজন বড় মাপের মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তাঁকে আমি জানতাম, এটা আমার জন্য অনেক গর্বের অনেক অহংকারের। আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, মানুষ হুমায়ূনের সঙ্গে হয়তো আজও আমার পরিচয় হয় নি। এত বৈচিত্র্যময় তাঁর জীবন! তাঁর জীবনে এত বড় বড় সব ব্যাপার রয়েছে যে সেসবের সঙ্গে পরিচয় হতে আমার আরও অনেক সময় লাগবে, হয়তো আজীবন।

তাঁর কাছে আমরা ঋণী। তিনি আমাদের যা কিছু দিয়েছেন, এর প্রতিদান দেওয়ার সাধ্য আমাদের নেই। প্রতিদানে যে ক্ষুদ্রকণাটুকু তাঁকে দিতে চেয়েছি সে ক্ষেত্রেও রবি ঠাকুরের ওই লাইন দুটির কথা বারবার মনে হয়েছে—'তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারই দান/ গ্রহণ করেছো যত ঋণী তত করেছো আমায়।' আজকে আমার মনে হয় অনেক কিছুতে আমরা তাঁকে চমকে দিতে চেয়েছি, আনন্দ দিতে চেয়েছি। কিন্তু তিনি তো মানুষের মন পড়তে পারতেন। তিনি বুঝতে পারতেন আমরা কী চাইছি। আমরা যেটা করতে চেয়েছি সেটা উনি আগে থেকেই বুঝতে পেরেছেন এবং সেইভাবেই তিনি চমকিত হয়েছেন, বিস্মিত হয়েছেন।

শেষবারের মতো হুমায়ূন আহমেদ আমেরিকায় চিকিৎসার জন্য যখন যান, তখন আমি তাঁকে একটা জাদুর বাক্স উপহার দিয়েছিলাম যার মধ্যে কয়েন ফেললে কয়েনটি অদৃশ্য হয়ে যায়। তিনি এটা দেখে খুবই বিস্মিত হন। সবাইকে ডেকে বলেন, দেখো সাগর আমাকে কেমন বিস্ময়কর একটি জিনিস উপহার দিয়েছে! হঠাৎ আমার মনে হলো, এটা তো নতুন কিছু নয়। এই জিনিস হয়তো তিনি আগেও দেখেছেন। তারপরও তিনি এত বেশি বিস্মিত, চমকিত হয়ে আমাকে যে ভালো লাগা উপহার দিলেন তা সত্যিই অতুলনীয়। তাঁর মতো বড় মাপের মানুষেরা তো অন্যের তৃপ্তি দেখেই বেশি আনন্দ পান।

যেদিন থেকে তিনি ইমপ্রেস টেলিফিল্মে যোগ দেন সেই সময় থেকেই চ্যানেল আইয়ের বিশেষ আয়োজন মানেই হুমায়ূন আহমেদ। চ্যানেল আইয়ের জন্মদিন, দুই ঈদের দিন রাত ৭:৪৫ মিনিট উৎসর্গ করা হয়েছিল হুমায়ূন আহমেদকে। আগামীতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে। হুমায়ূন আহমেদ হয়তো আর কখনো নাটক-চলচ্চিত্র পরিচালনা করবেন না। কিন্তু তাঁর সৃষ্টি তো রয়ে গেছে। তিনি ছিলেন এক বিশাল সিন্ধু। সেখান থেকে মুক্তা তিনি একসময় নিজেই দান করতেন। এখন হয়তো সেগুলোকে কষ্ট করে আহরণ করতে হবে, এটুকুই পার্থক্য শুধু।

তাঁর সৃষ্টিকর্ম কখনোই পুরনো হবে না। তাঁর *নন্দিত নরক*কে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যারা পড়েছেন, সেই লেখার প্রতি ভালো লাগা আজও তাদের তেমনই আছে। আবার চল্লিশ বছর পরের এই প্রজন্মের কেউ যখন বইটি পড়ছে, তারও উপন্যাসটি ঠিক একই রকম ভালো লাগছে, সমানভাবে আলোড়িত হচ্ছে সে। অন্য কথায়, তাঁর ৪০ বছর আগের সৃষ্টিগুলোকে এখনো মনে হয় সমকালীন। আর একথা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি যে, আগামী অন্তত চল্লিশ বছর তাঁর সৃষ্টি নিয়ে আমরা অনুষ্ঠান নির্মাণ করতে পারব অনায়াসেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের চেষ্টা থাকবে হুমায়ূন আহমেদকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি আজীবন রক্ষা করতে। কারণ তাঁর চরিত্রের এটাই যে সবচেয়ে বড় গুণ ছিল– তিনি কাউকে কোনো কথা দিলে সেটি রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। 'ঘেটুপুত্র কমলা' তৈরি করার সময় তিনি বলেছিলেন, এটাই আমার শেষ ছবি। আমরা বারবার তাঁকে অনুরোধ করেছি যেন এটা তাঁর শেষ ছবি না হয়। তিনি যে তাঁর কথা রাখার জন্য এভাবে আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন ভাবতেও পারি নি। এটা যদি জানা থাকত তবে বলতাম, ঠিক আছে হুমায়ূন ভাই, এটাই আপনার শেষ ছবি, তবুও আপনি আমাদের মাঝে থাকুন।

হুমায়ূন আহমেদ যে আমাদের মাঝে নেই সে কথাই বা বলি কেন? তিনি তো আজীবন বেঁচে থাকবেন তাঁর সৃষ্টির মাঝে। আর তাঁর সৃষ্টিগুলোকে যদি ধরে রাখতে হয় তাহলে এখনই তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। তাঁর বইগুলোকে নেট-এ নিয়ে আসতে হবে। তাঁর অনেক বই আছে যা এখন আর পাওয়া যায় না। সেগুলো পুনর্মুদ্রণ করতে হবে। বারবার মুদ্রণ বা বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে মুদ্রণের কারণে তাঁর বইগুলোতে যে ভুল-ত্রুটি তৈরি হয়েছে সেগুলো সম্পাদনা করে নতুন করে প্রকাশ করতে হবে। তাঁর টেলিভিশনের জন্য নির্মিত অনুষ্ঠানগুলো আর্কাইভে সংরক্ষণ করতে হবে।

হুমায়ূন আহমেদ যে কত বড় মাপের স্রষ্টা, সৃষ্টিশীল মানুষ, তা সময়ই বিচার করবে। আর এ জন্যই তাঁর শিল্পকর্ম সংগ্রহ করতে হবে। আর এটা করতে হবে এখনই, নয়তো অনেক কিছুই আমরা হারিয়ে ফেলব।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যাহ্নের সমাজ

বিনায়ক সেন

কেন *মধ্যাহ্ন* উপন্যাসটি লিখতে হলো তাঁকে এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হুমায়ূন আহমেদ লিখেছেন, 'সময়কে' ধারণ করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। সচরাচর যেসব বিষয় নিয়ে তাঁর চরিত্রেরা মাথা ঘামায় না—রাজনীতি, কাল, সমাজ—সে সবকিছুকে আর গল্পের বাইরে রাখা গেল না। কেননা, গল্পটাই কতদূর এগুলো মানুষ—তা নিয়ে। ১৯০৫ সালের পর থেকে পূর্ববঙ্গের সমাজ কীভাবে বদলে যেতে থাকল এ রকম কোনো ইতিহাসবোধে তাঁকে পেয়ে বসেছিল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্প্রতি প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে সাজ্জাদ শরীফকে জানিয়েছিলেন যে, নিজের জীবন ভাঙিয়ে আর কত উপন্যাস লেখা যায়! সে জন্যেই নাকি তাঁকে *একা এবং কয়েকজন*, *সেই সময়*, *পূর্ব-পশ্চিম* ও *প্রথম আলোর* মতো ইতিহাসনির্ভর উপন্যাস লিখতে হয়েছিল। হুমায়ূন আহমেদের জন্য বিষয়টা এমন নয়। তিনি খুব সচেতন প্রয়োজনেই এই ইতিহাস-প্রকল্পে হাত দিয়েছিলেন বোধ করি। তাঁর নিজস্ব স্টাইলে ব্যাখ্যাটা এরকম : 'আমি লিখি নিজের খুশিতে। আমার লেখায় সমাজ, রাজনীতি, কাল, মহান বোধ [!] এই সব অতি প্রয়োজনীয় [!] বিষয়গুলি এসেছে কি আসে নি, তা নিয়ে কখনো মাথা ঘামাই নি। ইদানীং মনে হয়, আমার কোনো সমস্যা হয়েছে। হয়তো বা ব্রেনের কোথাও শর্ট সার্কিট হয়েছে। যে-কোনো বিষয়ে হাত দিলেই মনে হয়—চেষ্টা করে দেখি, সময়টাকে ধরা যায় কি না। *মধ্যাহ্নে*ও একই ব্যাপার হয়েছে। ১৯০৫ সালে কাহিনি শুরু করে এগুতে চেষ্টা করেছি। পাঠকরা চমকে উঠবেন না। আমি ইতিহাসের বই লিখছি না। গল্পকার হিসেবে গল্পই বলছি। তার পরেও'

AMARBOI.COM

এখানে প্রশ্ন উঠতেই পারে, 'তারপরেও' বলতে গল্প ছাড়াও ইতিহাস সম্পর্কে কোনো নতুন সচেতনতার প্রতি কি তিনি ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন ? আর ইতিহাস-গল্প মিলিয়ে যদি কিছু লিখবেন তাহলে ১৯০৫ সাল থেকেই তা শুরু করবেন কেন ? সময় ধরার ইচ্ছের কথা বলছেন, কিন্তু কোন কালপর্বে শুরু করে কোথায় তার যতি টানবেন, সেটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিশ্চয়ই। *মধ্যাহ্ন* উপন্যাসে যে-সময়কে অনুভব করা হয়েছে, তার ব্যাপ্তি ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৪৭-এর দেশভাগ অবধি। কেন এই বিশেষ সময়ের টানাপোড়েনের মধ্যে তাঁকে প্রবেশ করতে হলো—সেটা একটা প্রশ্ন। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, উপন্যাসটিতে যে সমাজকে তিনি এঁকেছেন, সেই সমাজচিত্র (সে সমাজ কল্পিত, না বাস্তব—সে প্রশ্নে পরে আসা হবে), এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, চিত্রটাকে তিনি কেন এত গুরুত্বের সঙ্গে আঁকলেন ? আজকের যুগের বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিচালিত সমাজের প্রেক্ষিতে *মধ্যাহ্নের* সমাজকে মনে হবে কোনো অচিনপুরের গল্প—এক আধুনিক ইউটোপিয়া। এই উপন্যাস ভর করে আছে আদর্শস্থানীয় দুই চরিত্রের ওপরে, যার একজন হরিচরণ সাহা এবং অন্যজন মওলানা ইদ্রিস। এই দুই শুভবোধসম্পন্ন মানুষ—বস্তুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ত এবাদতে রত সুফী-সন্তই বলা চলে তাদের—যারা সবসময়েই কী করে মানুষের উপকার করা যায় সেই চেষ্টায় নিয়োজিত, তারাই উপন্যাসের ঘটনাবলির ওপরে বৃক্ষের ছায়া হয়ে থাকেন শুরুর লাইন থেকে শেষ পর্যন্ত। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের শুরু হয় যে-পুকুরঘাটে, দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ হয় একই পুকুরঘাটে; কেবল শুরুর দৃশ্যে ছিলেন হরিচরণ, শেষের দৃশ্যে মওলানা ইদ্রিস। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র—ভালো স্বভাবের ও মন্দ স্বভাবের চরিত্ররা সবাই এদেরকে নিয়েই, এদেরকে পাশে রেখেই যার যার জীবন কাটায়, যার যার মতো করে মৃত্যুবরণ করে।

মধ্যাহ্নের সমাজের বড় শক্তি তার অন্তর্নিহিত নৈতিক শ্রেয়বোধ। এর প্রধান উৎস **হরিচরণ** ও মওলানা ইদ্রিসের মতো মানুষেরা হলেও অপেক্ষাকৃত খাটো মানুষ যারা, তারাও প্রবল মানবিকতায় আক্রান্ত। তারা পারতপক্ষে অন্যায় করেন না, বা করলেও পরিহার্য বলে আত্মগ্লানিতে ভুগতে থাকেন। জুলেখা, শরীফা, মনিশংকর, জীবনলাল, শিবশংকর, আতর—এরা সবাই পৃথিবীতে ভালোমানুষের পাল্লা ভারী করেছে। আর লাবুস তো জুলেখার পুত্রসন্তান হলেও আসলে হরিচরণ-মওলানা ইদ্রিসের আধ্যাত্মিক সন্তান। লাবুস শহরে এলে কটকটে হলুদ পাঞ্জাবি পরে খালি পায়ে রাস্তায় হাঁটত, খুবই স্বাভাবিক হতো তার হিমু-হওয়া! তার মানে এই নয় যে, এই সমাজে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থের সংঘাত ছিল না। সংঘাত-দ্বন্দ্ব-অনাচার ছিল যদিও, কিন্তু বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিকে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হতো না। হরিচরণের নিজের পাটের আড়ত রয়েছে, সে সময়ে 'সাহা'দের মধ্যে কৃষিপণ্য নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য তার উপার্জনের স্বাভাবিক উৎস ছিল। সুতরাং বাণিজ্য-বিরোধী ছিল না ওই সমাজ। যে অঞ্চল নিয়ে এই উপন্যাস তার হাওরেই সওদাগররা 'ময়মনসিংহ গীতিকা'য় তাদের নৌবাণিজ্যের নাও ভাসিয়েছিল। কিন্তু বাণিজ্যের ধারা থাকলেও এ ধরনের সমাজে টাকার শক্তিতে মানুষের ক্ষমতাকে মাপা হয় নি। শশাংক পালের মতো জমিদার বা ধনু শেখের মতো কুটিল ব্যবসায়ী মানুষও সমীহ করে চলেছে হরিচরণকে—সেটা তার অর্থের কারণে যতটা, তার চেয়েও বেশি তার নৈতিক স্বভাবের কারণে। আরেকটি দিক হচ্ছে, *মধ্যাহ্নের* সমাজে স্বার্থপরতাই ব্যক্তির একমাত্র প্রণোদনা নয়; এখানে পরার্থপরতার বোধ সহজাতভাবে ক্রিয়াশীল থাকে বিভিন্ন স্তরে। বলা বাহুল্য, একুশ শতকের আজকের এই অপরাহ্নের সমাজ বাণিজ্যিক বোধের সমাজ। উনিশ-বিশ শতকের [অন্তত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ও মোটা দাগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত পর্যন্ত] অপেক্ষাকৃত নির্দোষ পৃথিবীর মঙ্গল্যবোধের থেকে আজকের এই সমাজ মৌলিকভাবেই আলাদা। *মধ্যাহ্নে* অনায়াসে সমাজের বিভিন্ন স্তর, শ্রেণী ও ধর্মের মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক যাতায়াত চলে। এখানে বৃক্ষের অসুখ হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়, জুলেখা গায় উকিল মুন্সি ও রাধারমণের গান, রাধা-কৃষ্ণের বিচ্ছেদের হাহাকার হাওরের ঢেউয়ে বেজে ওঠে। সেটা যে কেবল নেত্রকোনার ভাটি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য—তা মনে করেন নি লেখক। ব্যাপক সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান আদান-প্রদানকে ধারণ করেছিল এই মধ্যাহ্নের সমাজ। সেখানে কোন চিহ্নটা কার, বা কোন গানের লাইনটা কোন সম্প্রদায়ের জীবনবোধ থেকে উঠে এসেছে—সেটা হিন্দুর নাকি মুসলমানের, মজুরের নাকি অবস্থাপন্ন কৃষকের—সেটা বের করাটা দুরূহ। ওই সমাজের অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে নি।

এ রকম সমাজের কাহিনি কি ইউটোপিয়ার মতো শোনাচ্ছে? হোক ইউটোপিয়া, কিন্তু **হুমায়ূন** আহমেদ এই কল্পকথা নির্মাণে [নাকি বাস্তবেই গল্পটা এভাবেই তিনি শুনেছিলেন] এত শ্রম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও মেধা ঢালবেন কেন ? আমার ধারণা, *মধ্যাহ্নের* ভূমিকায় পুরো কারণটা হুমায়ূন আহমেদ বলেন নি। শুধু 'সময়'কে ধরার জন্য ওই বিশেষ কালপর্বের প্রতি চোখ ফেরান নি তিনি; আরও কিছু উদ্দেশ্য ছিল তাঁর। কোনো অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা ছিল আমাদের মন ও মননকে নাড়া দেওয়ার জন্যে। হয়তো উদ্দেশ্য ছিল আমাদের সমাজের অন্তরাল প্রাণশক্তির উৎস কোথায়, তা দেখানো চোখে আঙুল দিয়ে।

২

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে; এ পাপ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোনো মতেই নিষ্কৃতি নাই।' জাত-পাতের বন্ধনে হিন্দুসমাজ নিজেরা ডুবেছে, আর মুসলমানকে হিন্দুরা গণ্যই করে নি নিজেদের ভেতরে। ধনু শেখের বড় অভিযোগ ছিল, হিন্দুরা মুসলমানদের মানুষই মনে করে না। *মধ্যাহ্ন* উপন্যাসে সেই পাপকে অবলীলাক্রমে তুলে ধরা হয়েছে। তবে এই পাপের মধ্যে সহাবস্থানকেই চূড়ান্ত মানে নি। শশাংক পালের মতো অত্যাচারী জমিদারেরা এতকাল নিরীহ রায়তের পেছনে লেগেছে। তার মৃত্যুর পরে ধনু শেখের মতো ব্যবসায়ীরা এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। শশাংক পালের যোগাযোগ ছিল কোলকাতার প্রশাসনের সাথে, ধনু শেখ নিয়েছে মুসলিম লীগের আশ্রয়। স্বদেশী আন্দোলনের তাড়া খাওয়া বিপ্লবীর হাতে আহত হতে হয় তাকে; শেষ পর্যন্ত এলাকার মানুষই দাঙ্গা ঘটানোর ষড়যন্ত্রী হিসেবে তাকে দায়ী করে এবং তার ক্ষমতার ভিত দুর্বল করে দেয়। আর শশাংক পালের মৃত্যু হয় কোনো অব্যাখ্যাত ব্যাধিতে। শশাংক পাল-ধনু শেখের প্ররোচনার কারণেই হোক, আর দুই যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ক্রমে বেড়ে যাওয়া ভেদবুদ্ধির কারণে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প *মধ্যাহ্নের* সমাজেও ঢুকতে থাকে। এটা যে কেবল দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে হয় তা নয়। একই ধর্মের নানা স্তরের মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব করতে থাকে। রাতের অন্ধকারে একদল আরেক দলের লঞ্চ ডুবিয়ে দেয়, একপক্ষ আরেক পক্ষের জাতিনাশ ধর্মনাশ করে, বাড়িতে আগুন লাগায়, পুলিশের কাছে মিথ্যে মামলা দিয়ে, হুমকি দিয়ে এলাকা পরিত্যাগে বাধ্য করে, নষ্ট মেয়ের অপবাদ দেয়, হাওরের নির্জনে এনে ধর্ষণ করে, জায়গা-জমি বসতবাড়ি দখল করে নেয়। এসবই হয়, কিন্তু এটা *মধ্যাহ্নের* সমাজের অন্দরমহলকে ছুঁতে পারে না। কোনো লৌকিক বা অলৌকিক কারণে এর মানুষগুলো পরস্পরের বিপদে এগিয়ে আসে।

পরস্পরের পাশে সহায়-সমর্থনের উদাহরণ অনেক এই উপন্যাসে। আমি এখানে দু'তিনটি উদাহরণ দেব। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ে মওলানা ইদ্রিস রওনা হয়েছেন বগুড়ার মহাস্থানগড়ের দিকে। পথ হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। বগুড়ার পরিবর্তে রংপুরে চলে গেছেন। একপর্যায়ে রাত হলে তাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এসেছে একটি হিন্দু পরিবার। লক্ষণ দাসের পরিবার কাছেরই এক মন্দিরের সেবায়েত। ওই বাড়িতেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তার। খাবারেরও ব্যবস্থা হয়েছে—অবশ্য রাখা হয়েছে উঠানেই। লোকটা তাকে বলেছে, 'মুসলমানকে বাড়িতে ঢুকাব না। এত বড় পাপ করতে পারব না।' মওলানা তাতেই খুশি। তিনি নামাজ শেষ করে মোনাজাত করে দোয়া চাইলেন যাতে এই পরোপকারী পরিবারটির প্রতি রহমত বর্ষিত হয়। এ সময়ে কপালে চওড়া করে সিন্দুর দেওয়া ঘোমটা পরা একটা মেয়ে মওলানার সামনে এসে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়াল প্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ থেকে। মওলানার হাতে একটি কাঁথা দিয়ে বলল চলে যেতে : 'দৌড় দিয়া তালগাছ পর্যন্ত যাবেন। সেখানে নদী পাবেন। নদীর নাম করতোয়া। নদী বরাবর দক্ষিণমুখী হাঁটবেন। থামবেন না। আমার স্বামী লোক খারাপ। আপনার সঙ্গে টাকাপয়সা আছে, আপনি তাকে বলেছেন। সে লোক আনতে গেছে। টাকাপয়সা কেড়ে নিবে। আপনাকে মেরেও ফেলতে পারে। এই কাজ সে আগেও কয়েকবার করেছে। দাঁড়ায়া আছেন কেন ? দৌড় দেন।'

রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে যে পাপ আছে তা অস্বীকার না করে স্বীকার করাই ভালো, স্বীকার করলে যদি আমরা পরিত্রাণের পথ পাই। হুমায়ূন আহমেদের চরিত্রেরা পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করেও, করার মাঝেই, থমকে দাঁড়িয়েছে অথবা স্পষ্ট করে প্রতিবাদ করেছে। পাকিস্তান আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন ধনু শেখ এলাকার মসজিদের ইমাম নিয়ামত হোসেনকে ডেকে নিয়ে বলেছে, 'জুম্মার নামাজের পরে তুমি সুন্দর কইরা ওয়াজ করবা। তুমি বলবা সব মুসলমানের দায়িত্ব নিজেদের রক্ষা করা। পরিবার রক্ষা করা এবং পাকিস্তান হাসেলের জন্য কাজ করা। ... তার জন্যে প্রয়োজনে রক্তপাত করতে হবে। শহীদ হতে হবে। বলতে পারবা না ?' আপাতত সম্মতি দিলেও চে'গুয়েভারার চেয়ে কোনো অংশে কম যান না ইমাম নিয়ামত হোসেন। রাতের অন্ধকারে মনিশংকরের কাছে গিয়ে বলে দিয়েছেন, কাল জুম্মার নামাজের পরে দাঙ্গা শুরু হবে। শুধু তা-ই নয়, পরদিন জুম্মার নামাজ শেষে ইমাম নিয়ামত মওলানা ইদ্রিসকে আমন্ত্রণ জানালেন কিছু বলার জন্যে। ইদ্রিসকে বহুদিন ধরে হরিচরণ সাহার বাসায় আশ্রয়ের পর থেকেই হিন্দুদের সঙ্গে উঠা বসা করার জন্যে একঘরে করে রেখেছে ধনু শেখ। মওলানা ইদ্রিস দাঙ্গা ঘটানোর পরিস্থিতি বদলাতে উঠে দাঁড়িয়ে 'সূরা হুজুরাত'-এর তের নম্বর আয়াতের স্মরণ করলেন, যেখানে পৃথিবীর সব মানুষকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করে পরে বিভক্ত করা হয়েছে বিভিন্ন জাতিতে ও গোত্রে, যাতে তারা 'একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে'। দোয়া পাঠের সময় ইমাম নিয়ামত হোসেন প্রার্থনা করলেন যেন বান্ধবপুরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা না হয়।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে প্রাত্যহিক আচার-অনুষ্ঠানের ধর্মীয় ব্যাখ্যা নিয়ে এক উদারনৈতিক আবহাওয়া বিরাজ করেছিল এলাকায়। অত্যাচারী শশাংক পাল মারা যাওয়ার পর তার মুখাগ্নি করতে তার স্বধর্মের কেউ রাজি হলো না। হয়তো তিনি সারা জীবন অবিশ্বাসী নাস্তিক ছিলেন বলে, হয়তো অত্যাচারী ছিলেন বলে। মুসলমান হয়ে মওলানা ইদ্রিস এগিয়ে এলেন এক্ষেত্রে। সমস্যা হলো পুরোহিতের সাথে তাকেও কিছু মন্ত্র পড়তে হলো শেষকৃত্যের প্রয়োজনে। এর জন্যে কাফের বলে ফতোয়া দেওয়া হলো তার বিরুদ্ধে। লাবুস এসে প্রতিবাদ করে বলল, 'লাশের মুখে আগুন দিয়েছে। লাশের আবার হিন্দু মুসলমান কী ? লাশ নামাজ কালাম পড়ে না। মন্দিরে ঘণ্টাও বাজায় না।' অন্যত্র, লাবুস ও ইদ্রিসের মধ্যে অন্য একটি ধর্মীয় আলাপের বিনিময় হয়। ইদ্রিসের শিশুবয়সী মেয়ে পুষ্পরাণীকে দুধ খাওয়ানোর কেউ নেই। তার স্ত্রী জুলেখা তাকে পরিত্যাগ করে গেছেন। এদিকে গ্রামের বাগদিপাড়ার মেয়ে ষোল সতেরো বয়সী কালী গতকালই তার মেয়েকে হারিয়েছে। পুষ্পরাণীকে পেয়ে সাগ্রহে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে সে। এরপর হুমায়ূন আহমেদের কণ্ঠেই শোনা যাক : 'মাওলানা ইদ্রিস লাবুসের কাছে হিন্দু-মেয়ের বুকের দুধ খাওয়া নিয়ে ক্ষীণ আপত্তি তুললেন। লাবুস বলল, দুধের কোনো হিন্দু-মুসলমান নাই। হিন্দু-মুসলমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের চিন্তায়। দুধের চিন্তার শক্তি নাই। লাবুসের কথায় মাওলানা হকচকিয়ে গেলেন। ধর্ম নিয়ে এইভাবে তিনি কোনোদিন চিন্তা করেন নি। এই দিকে চিন্তা করা যেতে পারে।' দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাত্যহিকের সাংস্কৃতিক ব্যবহারিক বিনিময়ের এ রকম অনেক উদাহরণ আরও ছড়িয়ে আছে। আজকের এই বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির যুগে ধর্ম-ধর্ম করে আমাদের নগর ও গ্রামের জীবন এখন ব্যতিব্যস্ত। লাবুস, মওলানা ইদ্রিস, হরিচরণের মতো চরিত্ররা কি আছে এখনো আমাদের আশপাশে কোথাও?

৩

তাহলে দাঁড়াচ্ছে, হিন্দু-মুসলমানে মিলে একটা যে অভিন্ন সংস্কৃতি, তলার দিকে গড়ে উঠেছিল, শত কংগ্রেসী লীগ রাজনীতির ডামাডোলেও যেটা পুরোপুরি ধসে যায় নি, সে রকম কোন শুভনীতিবোধসম্পন্ন অস্তিত্বকেই অমাদের 'মধ্যাহ্ন' অর্থাৎ 'স্বর্ণযুগ' বলছেন লেখক? আজ সেই মধ্যাহ্ন গড়িয়ে এই সমাজ—এই তিমিরবিলাসী সমাজ উপনীত হয়েছে তার অপরাহ্নে। 'অপরাহ্ন' কথাটা আমি 'লেইট ক্যাপিটেলিজম'-এর তাত্ত্বিক সাহিত্য-সমালোচক ফ্রেডেরিক জেমসনের কাছ থেকে ধার নিয়েছি। বাণিজ্যনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতিকে, শিল্পকে ও মানবসত্তাকে ক্রমাগত 'ব্যবহৃত-ব্যবহৃত' করে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে বর্জ্যের মতো পাগলদের লেগুনের মতো অন্ধকার কোণে। হুমায়ূন আহমেদ এই বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিনির্ভর সমাজকে হয়তো মন থেকে কখনো মেনে নিতে পারেন নি। হিমুকে দিয়েছেন এই বাণিজ্যিক সমাজকে বিদ্রূপ করার মনোমুগ্ধকর ক্ষমতা। র‍্যাব, পুলিশ, আমলা, রাজনীতিবিদ, আত্মদর্পী বুদ্ধিজীবী, লুটেরা ব্যবসায়ী, উঠতি ধনিক, আধ্যাত্মিক গুরু, যে-কেউ হিমুর পরিহাস-বিদ্রূপ থেকে অব্যাহতি পায় নি। 'অয়োময়'-এর মীর্জা হেরে গেছে উঠতি বণিক শ্রেণীর কাছে, যেভাবে ধর্ম শেখের কাছে হেরে গিয়েছিল শশাংক পাল বা শালনার জমিদাররা। তবু স্রষ্টার পক্ষপাতিত্ব সত্যজিতের দিকেই। সত্যজিতের 'জলসাঘর'-এর শেষ দৃশ্যে বিশ্বম্ভর কোথায় মিলিয়ে যান সে খবর আমাদের জানা নেই, কিন্তু আমাদের মনে থেকে যায় শেষ সঙ্গীত সভার নৃত্যগীতের রেশ। *মধ্যাহ্ন* উপন্যাসের শেষে আমরা জানতে পেরেছি ১৯৪৭-এর দেশবিভাগ আসন্ন, ভিটেমাটি ছাড়ছে দু'তরফেই, নতুন রাষ্ট্রজীবনের শুরু হবে সীমান্তের দু'দিকে। পাকিস্তান হচ্ছে 'কৃষকের ইউটোপিয়া' গবেষকরা রায় দিয়েছেন, শুধু কিছু মানুষের মনে শান্তি নেই। কোথাও গিয়ে দাঁড়ানোর জায়গা নেই তাদের। হরিচরণ সাহা মারা গেছেন, লাবুস মৃত্যুশয্যায়, মওলানা ইদ্রিস সবচেয়ে বেশি নিরাশ্রয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি; আমরা একই সুখ-দুঃখে মানুষ, তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই।' হরিচরণ ও মওলানা ইদ্রিস ছিলেন এই পাপবিদ্ধ সমাজের রক্ষাকবচ—তারা আঁকড়ে ছিলেন সমাজের ভালোত্বকে, শুভবোধকে, মঙ্গলকামনাকে। তারা সমাজকে অন্ধকার খাদের মধ্যে গড়িয়ে পড়তে দেন নি।

মধ্যাহ্ন উপন্যাসের শেষটা এ রকম। লাবুস, যে কি না আমাদের অসাম্প্রদায়িক ভবিষ্যতকে নায়কের মতো লালন করেছে, সে মারা যাচ্ছে। কোনো অব্যাখ্যাত অসুখ তাকে আক্রান্ত করেছে। ফকফকা জ্যোৎস্নার ভেতরে অনেক রাতে অসুখ নিয়েই সে এসেছে নির্জন পুকুরের ঘাটে এবং সেখানে হঠাৎই সে তার মৃত মাকে দেখতে পাচ্ছে কাছে। একপর্যায়ে মা'র কোলে মাথা রেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুমিয়ে পড়েছে সে। তার এই মৃত মার নাম জুলেখা, বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় নারীচরিত্রের একজন তিনি। বিচিত্র জীবন কাটাতে হয়েছে তাকে নানা চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তার চরিত্রের দৃঢ়তা, ভেতরের ক্ষমতায়ন ভোলার নয়। তিনি জীবিত থাকাকালে স্বয়ং উকিল মুন্সীকে গান শুনিয়েছেন এবং নজরুল তাকে দিয়ে কলকাতায় গান রেকর্ড করিয়েছেন। তিনি এবারে গুনগুন করে গান ধরেছেন। হুমায়ূন আহমেদ লিখেছেন বইটির শেষ দুটি লাইন, যা পড়তে থাকলে এখনো আমি এক অনির্বচনীয় শিহরণ অনুভব করি : 'মাওলানা ইদ্রিস ঘর থেকে বের হয়েছেন, হাদিস উদ্দিন বের হয়েছে। পুকুরঘাটটি থেকে যে সুরধ্বনি বের হয়ে আসছে, তার জন্ম এই পৃথিবীতে নয়। অন্য কোনোখানে।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হোসেন মিয়া ময়নাদ্বীপের সমতাবাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, হুমায়ূন আহমেদের বান্ধবপুর তেমনি একটি প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্র, সেখানে সব গোত্রের ও বর্ণের মানুষেরা মানবিক মমতায় পরস্পরের হাত আঁকড়ে ধরবে। তবে এই অপরাহ্নের সমাজের কাছে হুমায়ূনের এই ইতিহাসপাঠ কল্পজগতের ভাষ্য বলে মনে হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই গগনের দুই তারকা

বেলাল চৌধুরী

লেখক হুমায়ূন আহমেদের নাম, আশ্চর্য শোনালেও, প্রথম আমি শুনি স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখে। সত্তর দশকের প্রথমার্ধে। আমি তখনো কলকাতা নিবাসী। তিনি তখন সদ্য ঢাকা থেকে ফিরে গেছেন। হুমায়ূনের *শঙ্খনীল কারাগার*-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এখানে নিশ্চয় স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচিতির প্রয়োজন। তিনি খাস ঘটি মানে কলকাতার এক কুলীন পরিবারের মেয়ে। বিবাহসূত্রে খাস বাঙাল পোলা কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, গীতিকার বললে বলতে হয় কী নয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একমাত্র স্ত্রী। সারল্যের মূর্ত প্রতীক। কখনো কখনো অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড প্রফেসরকেও হার মানান। অবশ্য তিনি নিজেও একজন সুলেখক ও সাহিত্যানুরাগী। এ ছাড়া ফরাসি ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি প্রশ্নাতীত। এখানে অবশ্য সেটা কথা নয়। প্রসঙ্গক্রমে এলেন বলেই বলা।

এরপর গত চার দশক ধরে নাগাড়ে দেখে গেলাম সময় এবং হুমায়ূন আহমেদের মধ্যে ইঁদুরদৌড় কাকে বলে। হুমায়ূন সম্পর্কে নানান কিংবদন্তি শুনতে শুনতে যখন কিংবদন্তিকেও হারাতে চলেছেন তখন চর্মচক্ষে তাকে প্রথম চাক্ষুষ করা, পড়া এবং শোনা। আমার এমন একটা কী বলা যায় ফাটা কপাল, সবসময়ই আমি মনোরঞ্জনকারী পার্শ্বচর কিংবা অপরের গৌরবে গৌরবান্বিত কেউ-একজন। যার জন্য সবসময় সেরকম একজন কারও না কারও প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। কখন সুযোগ হয় বা ছপ্পড় ফুঁড়ে কী নেমে আসে তা দেখার অপেক্ষায়।

ব্যক্তি হুমায়ূনকে দেখে অকপটে বলছি, আমার মনে হয়েছে এমন নিপাট ভালো মানুষ আছে বলে পৃথিবীটা এখনো বসবাসযোগ্য। কোনো ভানভণিতাহীন একজন মানুষ, তদুপরি লেখক, তাও আবার জনপ্রিয়তার নিরিখে সর্বশীর্ষে যে কত সুন্দর হতে পারেন তা না দেখলে প্রত্যয় হতো না। অথচ এই মানুষটাকে নিয়েই কত না রটনা, ঘটনার ঘনঘটা। সম্পূর্ণ নিজস্ব ঘরানা, নিজস্ব ধ্যান-ধারণার বাইরে কদমও ফেলেন কি না কে জানে। একদা তার শ্রেষ্ঠাঙ্গিনী গুলতেকিনকে দেখেও আমার একই রকম মনে হয়েছে। এত অনাড়ম্বর সহজ-সরল মানুষ কী করে হয় বা হতে পারেন। এ ধরনের মানুষের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক পরিচয়ের দরকার হয় না। সবচেয়ে বড় কথা, গুলতেকিন-হুমায়ূন দম্পতি দুজনকে দুজনারই বলে মনে হয়েছে। এখন বললে বলতে হয় হয়েছিল। প্রত্যেক পর্বেই কারও না কারও সঙ্গে আমাকে হুমায়ূনের কাছে যেতে হয়েছে। হুমায়ূনও আমাকে দেখেছেন, কথা বলেছেন খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই। ব্যস, ওই পর্যন্তই। ডালপালা ছেঁটে এবার মূল কাণ্ডে আসা যাক। একসময় আমাকে একটা অকিঞ্চিৎকর কাগজে কাজ করতে হতো জীবিকার তাগিদে। যেখানে সে কাগজের জন্য একটা লেখা চাইতেও আমাকে হুমায়ূন-বলয়ের একজন দশাসইর সাহায্য নিতে হয়েছিল। হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে হঠাৎ কখনো দু-একবার দেখা বা আড্ডা দেওয়ার সুযোগ হলেও প্রথম তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ ঘটে *অন্যদিন*-এর সম্পাদক মাজহারের সুবাদে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার পূর্বতন কর্মস্থলের কারণে মাজহারের সঙ্গে আমার পরিচয় *অন্যদিন* বেরুনোর বহু আগে। সেই পরিচয় আরও একটু গাঢ় হলো—এখানেও সেই একই ব্যাপার, অন্যের কৃতিত্বে প্রতিভাত হওয়া। এবারের উপলক্ষ ছিল সুনীল-স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়ের বাংলাদেশে আগমন। তাও আবার চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, টেকনাফ, আমার গ্রামের বাড়ি শরিশাদি, কুমিল্লা, ময়নামতি হয়ে ঢাকায় আসা।

তারপর মাজহারের সেই প্রথম দরবার হলে নিজের রাজসিক বিয়েতে আমন্ত্রণ রক্ষা। তার কিছুদিন বাদেই আবার সেই দরবার হল। এবার গুলতেকিন ও হুমায়ূনের কন্যার বিয়ে (জানুয়ারি ২০০১) উপলক্ষে অতিথি হিসেবে আবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আগমন এবং বিবাহ-পরবর্তী অনুষ্ঠানে নুহাশপল্লীতে সুনীলের সাড়ম্বর ব্যান্ডপার্টি অভ্যর্থনা। বন্ধু বাস্তুশিল্পী ফজলুল করিমের করা সদ্য নির্মিত বিলাসবহুল সাত কুঠুরি আবার সেই সৌরজগতের পালা—বহু তারকার সমাবেশে গা ঢেলে অফুরন্ত আড্ডা। দিন গড়িয়ে সন্ধে রাতে ক্যাম্পফায়ার, আসক্তির নানারকম যার মধ্যে পরস্পরের স্বাস্থ্যপান সুরা, সুর সংগীতের প্রাধান্যই যে প্রধান থাকবে তাতে আর সন্দেহ কী।

পরদিন আবার হুমায়ূনি কায়দায় বর্ণাঢ্য ভোজনোৎসব, ফাঁকে ফাঁকে পান আর গান। একসময় সব উৎসবেরই সমাপ্তি টানতে হয়। ফেরার পথে সুনীল বিমানবন্দর থেকেই উড়ে গেলেন কলকাতা।

গেল বছর সেপ্টেম্বরে আবার হুমায়ূনের এত্তেলা অবশ্যই মাজহার মারফত। এবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে বিমানবন্দর থেকে তুলে নিয়ে সোজা নুহাশপল্লী। তবে এবার বাংলাদেশের চিরন্তন খালবিল আর আকস্মিক বৃষ্টি বাদলা মাথায় নিয়ে ঘুরঘুট্টি আঁধারের ভেতর গিয়ে নামতে হলো নুহাশপল্লীর পেছনের প্রান্তসীমায়। আসলে হুমায়ূনের নাম, খ্যাতি, প্রতিপত্তি আর তাকে ঘিরে যেসব কিংবদন্তির বাতাবরণ গড়ে উঠেছে সেটাকে ভেদ করে এগুতে আমার কুণ্ঠাই অনিষ্টের গোড়া। হুমায়ূনের সঙ্গ খুবই প্রীতিকর। কিন্তু তার নাগাল পাওয়া সহজ কর্ম নয়। কথার তোড়ে পঞ্চমকার বলতে যত সহজ আসলে কি চারটি অধিকের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়! মনে রাখতে হবে, কথাটা আবার তন্ত্র সাধনার অঙ্গ। হুমায়ূন যাদের পছন্দ করেন তাদের প্রীতি সান্নিধ্যের জন্য তিনি যা করতে পারেন সচরাচর তা হয়তো কোনো পাশ্চাত্যের ধনকুবেরের বা নটবরের পক্ষেই সম্ভব। যে যত কথা বলুন না কেন হুমায়ূন আহমেদ কিন্তু ঋণখেলাপি নন, শিশুখাদ্যে ভেজাল মেশানোর মতো ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত নন, সন্ত্রাসী পোষেন না, চোরাকারবারের সঙ্গে জড়িত নন। তাঁর শুধু একটাই কাজ লেখা আর লেখা। যখন লিখতে ভালো লাগছে না ডুবে যাচ্ছেন সংগীতে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে উদ্ধার করছেন সব হারামণি। জড়ো করছেন সবাইকে এক জায়গায়। চারপাশের ঘরোয়া মানুষগুলোকে নিয়ে তার কায়কারবার। এর মধ্যে যেমন আছে খ্যাপাটে, বাতিকগ্রস্ত, খেয়ালি, প্রেমিক তেমনি আছে রসেবশে নানা বিচিত্র চরিত্র। হত্যা, গুম ও খুন, তহবিল তসরুপ, ধর্ষণ, বলাৎকার এসবের ধারে কাছে না থেকেও হুমায়ূন নিজেকে কী করে এমন এক অতিমানবীয় উচ্চতায় নিয়ে গেছেন তা রীতিমতো আশ্চর্যের। সমালোচকদের কেউ কেউ যখন বলেন, তার লেখালেখি কালের ধোপে টিকবে না। তাতে তার কী এসে যায়। টিকল না তো বয়েই গেল। হুমায়ূন হয়তো তখন গান লেখায় মনোনিবেশ করেছেন। হুমায়ূনগীতি আমাদের লোক ঐতিহ্যনির্ভর। প্রতিটি শব্দ যেন মেপে মেপে বসানো। সেইসঙ্গে সম্মোহনী সুর। আগেই বলেছি হুমায়ূন যখন যা করেন তখন তার মধ্যে আলাদা এক দ্যুতি কাজ করে। কেউ যদি ব্যাখ্যা করে বিশদ বলতে বলেন আমি অপারগ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষাটের দশকে স্পেনের কবি গার্সিয়া লোরকা যিনি রাজনৈতিক শত্রুদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। পেঙ্গুইন থেকে তাঁর কবিতার যে চটি বইটি বেরিয়েছিল তাতে তাঁর কাব্যবিষয়ে ভাবনাচিন্তার প্রতিফলন ঘটেছিল নাতিবৃহৎ একটি সংক্ষিপ্ত রচনায়। তাতে 'দুয়েন্দে' বলে একটি শব্দ সেইসময় তুমুল আলোড়ন তুলেছিল। 'দুয়েন্দে' কথাটা এখন হলে একবাক্যে বলা যেত হুমায়ূন আহমেদের সমার্থবোধক শব্দ। অর্থাৎ যখন যেটা তিনি করেন সেটাই হয়ে উঠে দ্যুতিময়। হুমায়ূন আহমেদ একসময় লিখতে শুরু করলেন টেলিভিশন নাটক। একের পর এক। দেশব্যাপী সে এক তুলকালাম কাণ্ড। অন্যের আলোকে তিনি প্রতিভাত হতে চান না বলে নির্দেশনার কাজেও হাত লাগালেন। সেখানেও একই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি। পড়াশোনার ব্যাপারেও হুমায়ূন মূলাশ্রয়ী। আন্দাজে ঢিল ছুড়তে রাজি নন।

শোনা গেল নাটক ছেড়ে চলচ্চিত্রে মনোনিবেশ করেছেন। সেখানেও হুমায়ূনের ব্যাপক জয়জয়কার। দুর্ভাগ্য আমার এই যে, এত এত মাধ্যমে তাঁর সাফল্য, সিদ্ধি, খ্যাতি কোনোটাই দেখার সুযোগ আমার হয় নি। একমাত্র মাঝে মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ টেলিভিশনের দু-এক পর্ব নাটক দেখা ছাড়া তেমনভাবে আর কিছু দেখা হয়ে ওঠে নি। এমনিতেই টেলিভিশন দেখার সময় কোথায়! এমনকি নিজের কোনো অকিঞ্চিৎকর অনুষ্ঠানও আমার দেখা হয় নি। তবে হ্যাঁ, লোহানী ভাই মানে ফজলে লোহানীর অনুষ্ঠান বলতে গেলে প্রায় আমি নিয়মিতই দেখেছি। তার প্রধান কারণ লোহানী ভাইর নৈকট্য।

নুহাশপল্লীর কথা বলছিলাম। দেখা গেল, বরকন্দাজের মতো সাদাসিধে তহবন, হাওয়াই শার্ট তার ওপর মাথায় গামছা জড়ানো মাথায় হুমায়ূন আহমেদ নিজেই আলো হাতে দাঁড়িয়ে আছেন প্রিয় বন্ধুকে সাদর সংবর্ধনা জানাতে। একে তো কর্দমাক্ত, তার ওপর পিচ্ছিল এঁটেল মাটি আর বন্ধু সুনীলের আয়তনটিও নেহাৎ ছোট করে দেখবার নয়। সামান্য হড়কেছে তো পপাৎ ধরণী তলে। সুনীল গাঙ্গুলির মতো মজবুত মানুষকেও দেখা গেল সাবধানে পা টিপেটিপে এগুচ্ছেন। বেচারার পায়ে আবার ব্যথা বেদনা দেখা দেয় মাঝে মাঝে।

AMARBOI.COM

এরপর পুকুরপাড়, জুরাসিক পার্কের মতো জায়গাটা পেরিয়ে নুহাশপল্লীর খোলা মাঠে পা রাখতেই ভোজবাজির মতো পাল্টে গেল গোটা দৃশ্যটাই যেন। উভয় বাংলাতেই সমান খ্যাত ফেরদৌস, স্থলপথের অভিযাত্রী ও নাট্যাভিনেতা স্বাধীন, রুবেল, আর নুহাশপল্লীর প্রধান বাস্তুকলাবিদ হুমায়ূনসখা সদা হাসিমুখ রসিকপ্রবর ফজলুল করিম।

সেবার ছিল শীতকাল। উপলক্ষ প্রথমা কন্যা নোভার বিবাহোত্তর সংবর্ধনা। সে এক এলাহি কারবার। পারলে অকুস্থলে প্লেনই সরাসরি উড়িয়ে আনে। তার বদলে এয়ারপোর্ট থেকেই লাল কার্পেট সংবর্ধনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। শীতের হু হু কাটাতে তরল-গরলে গলা ভেজাতে ভেজাতে বিডিআর-এর দরবার হলে ভুঁড়িভোজ শেষে ঢাকা ক্লাবে রাত্তিরের বিরতি দিয়ে পরদিন গাড়িতে চেপে সোজা গাজীপুরের নুহাশপল্লী। রীতিমতন ব্যান্ডপার্টি সহযোগে রাজকীয় পদার্পণ। হুমায়ূন আহমেদের সবকিছুতেই তাঁর নিজস্বতার স্বাক্ষর। নুহাশপল্লীর সুবিশাল চত্বরে কলাগাছে ঝুলছে পাকা কলার কাঁদি। টেবিলে টেবিলে ফল ফলারির ছড়াছড়ি। অজস্র লোকজনের ভিড়। এসবের মাঝে শিশু-কিশোরেরাও আছে। তাদের অধিকাংশই আবার সুনীলের কাকাবাবু ভক্ত। দুপুরে কন্যা জামাতাসহ রাজসিক কমপক্ষে অন্তত পনেরো পদের চর্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ভোজন পর্ব শেষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবাহ সভার আমন্ত্রিতরা একে একে বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতের হ্রস্ব বেলাও ঝপ করে নিভে গেল।

শুরু হলো কন্যাকর্তা হুমায়ূন আহমেদের প্রিয় মানুষ বিশিষ্ট অতিথি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্মানে ক্যাম্পফায়ারের আয়োজন। সঙ্গে হাছন রাজা, রাধারমণ, সুনীল রচিত গান আর গান। অবশ্য তার আগেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শুভ আগমন উপলক্ষে হুমায়ূনবন্ধু বাস্তুকলাবিদ করিম সাহেবের করা এবং হুমায়ূন আহমেদেরই সাতটি উপন্যাসের নামে নামকরণকৃত নাতিপ্রশস্ত সাত প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট সর্বাধুনিক সাজসজ্জার অতিথিশালাটি উদ্বোধন করা হলো রঙিন ফিতে কেটে। শ্যাম্পেনের বোতলের ছিপি খোলার ফটাস শব্দ সে সন্ধ্যায় কতদূর অবধি শোনা গিয়েছিল বলা মুশকিল। হুমায়ূন আহমেদ বন্ধুবৎসল, সজ্জন এবং হৃদয়বান মানুষ। সবসময় তাঁকে ঘিরে কিছু-না-কিছু মানুষের ভিড়। বেশিরভাগই প্রায় এক পালকের পাখি—প্রকাশক, লেখক, শিল্পী, কাগজের সম্পাদক, স্তাবক, মোসাহেব। হুকুম তামিলে সদা তৎপর। আদেশ পেলে মনে হলো বাঘের দুধও সুলভ। অবশ্যই হুমায়ূনের। আসলে হুমায়ূনকে আমার মনে হয়েছে একজন কাল্ট লিডার। যখন যা খুশি তা-ই করতে পারেন। কোনো বাধার বিন্ধ্যাচল তাঁর কাছে নস্যিতুল্য।

ক্যাম্পফায়ারের জ্বলন্ত আগুন ঘিরে আড্ডা, রঙ্গরসিকতা, গান আর ঘ্রাণে নুহাশপল্লীর একান্ত নিভৃতে নেমে আসে রাত। খানাপিনা বলতে গরমাগরম ঝলসানো মাংসের কাবাব সহযোগে নান, তন্দুরি রুটি বড়ই উমদা লেগেছিল। ঢাকা থেকে এসে যোগ দিয়েছিলেন সদাহাস্যমুখ হুমায়ূনের পছন্দের নট আসাদুজ্জামান নূর। গলা ভিজিয়ে এক ফাঁকে চলেও গেলেন।

ন্যায্য কারণেই গভীর ঘুম শেষে কুয়াশাভেজা সকালে মাটির কলসি ভর্তি দু' রকমের খেজুর রস, হরেক কিসিমের পিঠেপুলি আর নুহাশপল্লীর হুমায়ূন-উম জড়ানো রোদ পিঠে নিয়ে নাশতা খেতে খেতে মনে হচ্ছিল অমৃতাস্বাদন হচ্ছে। রোদের তেজ একটু বাড়তে না বাড়তে এলেন হুমায়ূন-গীতির শিল্পী, 'আমার ভাঙা ঘরের ভাঙা বেড়ায় চাঁদের আলো' প্লাবিত করা তন্বী শিখর দশনা শাওন। গানে গানে দুপুরটি হয়ে উঠল তপ্ত কাঞ্চন বর্ণা। মাজহার ও তার স্ত্রী স্বর্ণা, মাসুম ও তার স্ত্রী এবং অন্যান্যরা বিশ্ব এস্তেমার ভিড় কাটিয়ে ঢাকা ফেরার পথে স্বাতী ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে বিদায় জানিয়ে যে যার ডেরায় ফিরে আসা হয়েছিল। নুহাশপল্লীর ভাঙা হাটে থাকার মতো একমাত্র থেকে গিয়েছিলেন স্বয়ং ভাবান্তরহীন কিন্তু দারুণভাবে অর্চিত পুরুষ হুমায়ূন।

আর এবার প্রথমে ছিল গুঞ্জন। ধীরে ধীরে পল্লবিত হতে হতে *অন্যদিন* সম্পাদক মাজহারের টেলিফোন, সুনীলদা আসছেন হুমায়ূন ভাইয়ের আমন্ত্রণে। এয়ারপোর্ট থেকে তাঁকে নিয়ে সরাসরি যেতে হবে সেই নুহাশপল্লী। হুমায়ূন ভাইয়ের অনুরোধ—আপনাকেও আমাদের সঙ্গী হতে হবে। অবশ্য নূরের মুখে এরকম একটা আভাস আগেই শোনা গিয়েছিল। যথাসময়ে মাজহারের গাড়ি চেপে ধানমণ্ডির দখিন হাওয়া হয়ে স্বর্ণা, জুয়েল আইচ, মাসুম, কমলসহ গাজীপুরের পথে সেবার যেখানে স্বাতী ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে ছাড়া হয়েছিল সেই এয়ারপোর্ট থেকেই আবার তাঁকে মানে সুনীলদাকে তুলে দিয়ে নুহাশপল্লীমুখী। এবার কিন্তু সোজা নুহাশপল্লীর গেটেও নয় ব্যান্ডপার্টির বাজনাও নয়, বরং ভটভটির বিরক্তিকর শব্দ তুলতে তুলতে শরতের মেঘাচ্ছন্ন গুমোটে মির্জাপুর বলে একটা অচেনা জায়গায় তুরাগ নদী তীরবর্তী বাজারের ঘাট থেকে নৌকোয় চেপে প্রায় নিশ্ছিদ্র নীরন্ধ্র অন্ধকারে পাড়ি জমিয়ে নুহাশপল্লীর প্রান্তে পৌঁছে দেখা গেল, গেলবার সেখানে খটখটে ডাঙায় একটি বজরা দেখেছিলাম শোনা গেল সেটা এখন বিধ্বস্ত কঙ্কালে পরিণত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সতর্ক পায়ে ঘাট বেয়ে পিচ্ছিল জলকাদা ভেঙে পুকুর পাড় হয়ে নুহাশপল্লীর আরাম আয়েশে গা ঢেলে হুমায়ূন আহমেদের সপ্রীতিপূর্ণ অভ্যর্থনা এবং তাঁর বহুল প্রচারিত চলচ্চিত্র 'চন্দ্রকথা'র সুদর্শন নায়ক ফেরদৌস এবং অন্যান্য সহশিল্পী, কর্মীদের সঙ্গে পরিচয়পর্ব শেষে যে আড্ডার শুরু মাঝে মাঝে তাতে বিরতি ঘটিয়ে, যেমন হুমায়ূন উধাও হয়ে যান কিংবা কোথায় গেলেন খোঁজের উত্তরে শোনা যায় শুটিংয়ের সেটে আছেন। একসময় আমাদেরও ডাক এল সেটে গিয়ে শুটিং দেখার। বাংলায় যে কটি শব্দের লাগসই প্রতিশব্দ নেই তার একটি এই 'শুটিং' দেখার মতো 'বোরিং' কাজ পৃথিবীতে আর কিছু আছে কি না সন্দেহ। দৃশ্যটিতে দেখা যায় মূল গল্প কী এখনো জানি না বলে হুমায়ূনের পছন্দের নায়িকা শাওন আগেরবার যখন তাকে দেখা গিয়েছিল, নানারকমের গান আর গল্পে হাসি-ঠাট্টায় বেশ দাগ কেটে যাওয়ার মতোই অনেকটা সময় কেটেছিল।

চিত্রায়িত হচ্ছিল একটি নাচের দৃশ্য। ওই দৃশ্য একবারের জায়গায় দুই কি তিনবার টেক করতে হলেও নর্তকীর বেশে শাওনকে বেশ সপ্রতিভই লাগছিল। এর আগে শাওনের খোলা গলার গান আর গল্প শুনলেও ওর অভিনয় দেখার সৌভাগ্য হয় নি, তাই মনে হলো এ যেন আরেক নতুন শাওন।

এবারেও দেখা গেল পানাহারের বন্দোবস্তে কোনো খুঁত নেই। তবে এবার সেবারের জবরদস্ত লেখক কাম সাংবাদিক কাম প্রকাশক ভাই আলমগীর অনুপস্থিত। কখন যে তার মেজাজ মর্জি কার ওপর খুশ থাকবে আর কার ওপর হঠাৎ বজ্রাঘাত তুল্য চটিতং হয়ে উঠবে, বলা বিষম মুশকিল। এবার দেখা গেল সে ভারটা যথানিয়মে বর্তেছে মাজহারের ওপর। যার যা প্রয়োজন বলামাত্র হুকুম হাজির। 'চন্দ্রকথা'র উপস্থিত শিল্পী, কুশলী ও কর্মীবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা প্রায় সকলেই জলপথ, স্থলপথ উভয় পথেই বেশ সড়গড়। সুতরাং সবই চলছিল তরতরিয়ে। কেবল লাঞ্চের লাঞ্ছনা সারতে সারতে হয়ে যাচ্ছিল সন্ধে, তেমনি আবার ডিনারের ঝক্কি সামাল দিতে হয়ে যাচ্ছিল সেহেরির বেলা।

এবার গানে গানে দুই বাংলা একাকার। গানের মধ্যে যথারীতি হাছন রাজা, রাধারমণ, উকিল মুনশি, সুনীল ছাড়াও হুমায়ূনের 'উড়ালপঙ্খী' ছিল এবারকার সুপার ডুপার হিট। আর এত কিছুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল থাকবে না কী করে হয়। মাঝে দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুল প্রসাদ, রজনীকান্তও শোনা গেল।

ভোর সকালে খুবই বিলাসী ভঙ্গিতে বসে বসে সিগারেট টানা হুমায়ূন কথা শুরু করতে গিয়ে উঠালেন নাসিকা গর্জন প্রসঙ্গ। ভুক্তভোগী একজন বললেন, প্রয়াত শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় যখন ঘুমোতেন তখন তাঁর নাক ডাকার বহরে শুধু অকুস্থল ও তার চারপাশই নয়, গোটা জাতিকে কালঘুম থেকে জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা ধারণ করতেন। একবার প্রসঙ্গক্রমে এ ধরনের গল্প শুরু হলে তার ট্যারাব্যাকা ডালপালা গজাতে গজাতে এমন একটা জায়গাতে গিয়ে পৌঁছায় যে সেখানে একটা গল্প চলতে থাকে—এই যেমন একজন বললেন, আমাদের স্থপতি এবং কবি রবিউল হুসাইনের নাক ডাকা তো নয় রীতিমতো ডাকাত পড়া হাঁকাহাঁকি দিয়ে শুরু হয়ে গল্পের গোরু গাছে চড়তে শুরু করে দেওয়ার মুহূর্তে এসে গেল নুহাশপল্লীর বহিরাঙ্গনে নাশতার ডাক।

মেন্যুতে কী নেই। এমনকি ঢাকাইয়াদের সবচেয়ে প্রিয় 'বাসি পোলাও' হলেও সঙ্গে একেবারে ষাট দিন বয়স্ক মুরগির বাচ্চার টানা ঝোল আর কচি পাঁঠার মাংস। খাদ্যরসিকদের মতে এর স্বাদই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাকি আলাদা। কথায় বলে না ভিন্নরুচির্হিলোক। এবার মান্যবর শেরিফকে দেখা গেল আবার তাঁর পুরনো ভূমিকায় যথাপূর্বং অর্থাৎ সিগারেটে ফিরে যেতে। মুখে বলা ছাড়াও অনেকবার কঠিন প্রতিজ্ঞা করা সত্ত্বেও এই একটা জায়গায় সুনীল গাঙ্গুলির মতো দৃঢ়চেতা এবং অটল মানুষও বারংবার কাবু হয়েছেন। হার স্বীকার করেছেনই বলা যায়। একবার এক নববর্ষের তুমুল হুল্লোড়ের রাতে সুনীল তাঁর ঢাকার বন্ধু গাজী শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শেষ সুখটান দিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন আর কখনো জীবনে এই অসভ্য নেশার দাসত্ব নয়। দিনে দুই থেকে তিন প্যাকেট অবধি 'রথম্যান' সিগারেটকে যিনি অবলীলায় বুকে টেনে ধোঁয়া বানিয়ে উড়িয়ে দিতেন সেই গাজী সাহেবও আজ এত বছর ধরে অটল অনড় থাকলেন, কিন্তু সুনীল বহু ঘোষণা বহু প্রতিজ্ঞা বহু প্রতিশ্রুতি এমনকি বিকল্প বিড়ি, চুরুট চুট্টা সবশেষে মাধুকরী করেও স্বভাব পাল্টাতে ব্যর্থ। এ জন্যেই কি বলা হয় স্বভাব যায় না মলে...। না অষ্টপ্রহর যাদের মাথার কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয় সেই সৃষ্টিশীল মানুষদের পক্ষে অন্তত কিছুটা সময়ের জন্য হলেও হাতে কলম থামিয়ে আড়মোড়া ভেঙে সিগারেট জ্বালিয়ে সুখটান মারতে মারতে জিরিয়ে নেওয়ার আনন্দ আর কোথায় পাবেন! আসলে এটা একটা অভ্যেস। যখন যার যে রকম। তবে এসব ব্যাপারে একমাত্র হুমায়ূন আহমেদকে দেখা গেল সুনীলের মতোই নির্বিকার, নিরাসক্ত এবং ধূম্রলোচন না হলেও প্রায় সর্বদাই সধূম।

এ বছরের সেপ্টেম্বরের ৭ তারিখ ছিল বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জ্যোতিষ্ক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ৬৮তম জন্মদিন। একটি ইংরেজি কাগজে তাঁর জন্মদিনের সঙ্গে অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ভারতের খ্যাতনামা মহিলা জ্যোতিষিণী শ্রীমতী কুসুম ভাণ্ডারি লিখেছেন, 'জনসমক্ষে কথা বলাটা জাতকের একটা পছন্দের অধিকার। ভ্রমণ প্রিয়। পারিবারিক। বিশ্বাসী। নমনীয় এবং বন্ধুসুলভ। নিজের বিনিয়োগ নিয়ে আরও ঢের রক্ষণশীল হতে হবে।' এইসব ভবিষ্যদ্বাণী যাঁর সম্পর্কে করা হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থান যে এসব থেকে যোজন দূরের তা কে না জানে! সম্ভবত জ্যোতিষিণী ছাড়া একটি কি দুটি ছাড়া আর অন্য কোনোটির সঙ্গেই যতদূর জানি সুনীলের অন্তত কোনো মিল নেই, কোনো কালে ছিলও না, ভবিষ্যতেও থাকা অসম্ভব। ভ্রমণসঙ্গী হিসেবে মহা অনিশ্চিত এবং সদা দোদুল্যমান সুনীলের জীবন সাথী স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় এবার ছিলেন না। পরিষ্কার জবাবে স্লামালায়কুমের প্রত্যুত্তরে ওয়ালাইকুম আসসালাম বেশ ভালোভাবেই রপ্ত করে এসেছিলেন সুনীল।

আগেরবার যা ছিল শুধুই গানের জোয়ারে গা ভাসিয়ে মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেওয়া আর হুমায়ূন-সাম্রাজ্যের বিস্তার দেখে আপ্লুত হওয়া। সেইসঙ্গে অখণ্ড অফুরন্ত সজল আড্ডা, গান আর গল্প, এবার সে জায়গায় কথা ছিল পুকুরে বড়শি ফেলে টপাটপ মাছ ধরা হবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে মাছ পুকুর পাড়েই ফ্রাই করে উদর বিভাগে চালান দেওয়া। এ ব্যাপারে যেমন নানারকমের ছিপ, মাছকে প্রলুব্ধ করার প্রয়োজনীয় চার ফেলা—আয়োজনে কোনো খামতি ছিল না, কিন্তু দুর্ভাগ্য, মাছেরা কথা রাখে নি। দুপুরের দিকে দেখা গেল *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমান, সাহিত্য সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ এবং কম্বাইন্ড হ্যান্ড কাঁধে-পিঠে ক্যামেরা টেপরেকর্ডার ঝুলিয়ে নাসির আলী মামুনরা পুকুর পাড়েই হাজির হলেন। হাতের লটবহর দেখে বোঝা গেল রণসজ্জায় সেজেই মাঠে নেমেছেন। মাইক্রোফোন হাতে শুরু হয়ে গেল মামুনের অনির্ধারিত সুনীল ভজনা। মাঝে মাঝে যোগ দিচ্ছিলেন উপস্থিত সবাই। মাছের নামে অষ্টরম্ভা হলেও তরঙ্গায়িত বুঁদবুঁদ তোলা ভালুক পান রসেবশে বেশ ভালোই কাটল এই পর্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপরই শুরু হলো সুইমিংপুল পর্ব, যার আর এক নাম হতে পারে তেজারতি। পত্রিকা সম্পাদকদের আসল কেরামতি। ফর্মার হিসেবে পুলে নামা না-নামা। এই পর্বে এসে যোগ দিলেন ঢাকা থেকে সদ্য আগত সদা সপ্রতিভ হিরো জাহিদ হাসান। যেমন প্রাণবন্ত তেমনই রঙ্গরসে টইটম্বুর। শুধু কথায় যে চিঁড়ে ভেজে না তা প্রমাণিত করতে লেগে গেলেন হুমায়ূন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যামেরার মামুন, বিশ্বজিৎ আর মহিলারা ছাড়া উপস্থিত প্রায় সবাই পুলের রঙিন পানিতে ঝুপঝুপ। জলকেলি কাকে বলে? মতিউর রহমান নিখাদ রুশপ্রেমী। তাও রেডি। হান্ড্রেড পার্সেন্ট খাঁটি স্টলিশনাইয়ার সাপ্লাই লাইন অফুরন্ত। রীতিমতো হলিউডি বিলাসিতা। এলাহি আড়ম্বর। টালমাটাল অবস্থা কমবেশি প্রায় সবারই। এবার আর আলো বিতরণকারী নূরকে আলো বিতরণ করতে দেখা গেল না একবারও। তার জায়গায় জাহিদ একাই এক শ'। ফেরদৌস আর স্বাধীন খসরু তো আছেই। হুমায়ূন আহমেদের চরিত্রদের সম্পর্কে কি বেশি কিছু, তাও আবার আগাম কিছু, বলা সম্ভব? আমাদের পড়ালেখার দৌড় তো খুবই সীমিত।

পরদিন ভোর ভোর ওয়ালিকুম আসসালাম বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে গোটা নুহাশপল্লীর চারপাশ ঘিরে দুই চক্কর। তারপর যথাক্রমে নাশতা এবং বিদায় পর্বের আগে মহামান্য অতিথির সঙ্গে নুহাশপল্লী ও নুহাশ চলচ্চিত্রের কর্মীদের ফোটোসেশন। এসব ব্যাপারে সচরাচর মহামান্য শেরিফ সাহেবেরও না নেই। এরপরেই অবধারিত মুষলধারে বৃষ্টি মাথায় নৌকায় আরোহণ। বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে একশা। ঢাকা অব্দি প্রায় খালি গায়েই আসতে হয়েছে। নৌকো না ছাড়া পর্যন্ত নুহাশপল্লীর একমেবাদ্বিতীয়ম অঝোরধারায় বৃষ্টিপাতের মধ্যেও হুমায়ূন এক পায়ে খাড়া। হুমায়ূনের ভদ্রতা আর সৌজন্যবোধ রীতিমতো আন্তরিক মনে হয়েছে। আবার সেই ভটভটিয়ার বিরক্তিকর শব্দ, বৃষ্টির ঝাপটা, নৌকোর ছৈয়ের ভেতর হাঁটু মুড়ে মাথা গুঁজে বসে বসে দিনের বেলায় বলে নাম মাত্র তুরাগ-এর দুরবস্থা নিরীক্ষণ করতে করতে ফিরে আসা হলো সেই আগের সন্ধ্যার বৃষ্টিস্নাত মির্জাপুর বাজারে। গাড়ি প্রস্তুত। তারপর ঝোড়ো গতিতে ঢাকার দিকে।

গন্তব্যস্থল ঢাকা ক্লাবের দিকে যাওয়ার মাঝপথে একটি পাঁচতারকা হোটেলে লেখক প্রণব ভট্টর সৌজন্যে মধ্যাহ্ন আশ সেরে নিয়ে যে যার পথে। ঢাকা ক্লাবের অতিথিশালার ঘরে পৌঁছুতে না পৌঁছুতে শুরু হয়ে গেল সুনীলভক্তদের টেলিফোন, আনাগোনা। খবরের কাগজে কাগজে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ঢাকা আগমনের খবরটা চাউর হয়ে যেতে আর রুখিবে কে? পরদিন দুপুরের মধ্যেই উড়ে গেলেন তাঁর নিজের প্রিয় শহরে কলকাতার শেরিফ। শরিফ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

সর্বসাকুল্যে দু'বার নুহাশপল্লী বা ঢাকায় বার কয়েক হুমায়ূনের বিভিন্ন ডেরায় যাতায়াতের সুবাদে বাইরে ভেতো এবং পরচর্চায় দড় অকারণ কৌতূহল প্রিয় কি নারী কি পুরুষ এমনকি বয়স নির্বিশেষে সবার কাছ থেকেই একটা অরুচিকর প্রশ্ন শুনতে হয়েছে, 'আচ্ছা শাওনের সঙ্গে হুমায়ূনের সম্পর্কটা কী দেখলেন? ওরা কি বিয়ে করেছে?' যেন ওদের হাঁড়ির খবর আমার জানা। উত্তরে বলতে বাধ্য হয়েছি, আমি ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো আমার স্বভাব নয়। দুঃখিত। দেখেছি অনেকে বেজার হয়েছেন।

সবকিছুরই একটা শেষ আছে। এই মুহূর্তে গোটা বাংলাদেশ যেমন হুমায়ূনকে নিয়ে আবর্তিত। সর্বত্রই হুমায়ূনের জয়জয়কার। শিল্পমাধ্যমের প্রায় সব ক'টিতেই হুমায়ূনের সাফল্য প্রশ্নাতীত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক ক্ষণজন্মা মানুষ হুমায়ূন আহমেদ

মকসুদ জামিল মিন্টু

প্রায় বিশ-একুশ বছর আগের কথা। বিটিভিতে ডাক পড়ল **'কোথাও কেউ নেই'** নাটকের আবহসঙ্গীত করার জন্য। হুমায়ূন ভাই আবহসঙ্গীত শুনতে এলেন সঙ্গে প্রয়াত অভিনেতা মোজাম্মেল ভাই। কেন জানি না সম্পূর্ণ বিনা কারণেই মোজাম্মেল ভাইয়ের উপর আমার ভীষণ রাগ হলো। আমি তাঁর অভিনীত দৃশ্যগুলো বাদ দিয়ে মিউজিক করতে লাগলাম। মোজাম্মেল ভাই বিষণ্ন মুখে বসে আছেন, হঠাৎ হুমায়ূন ভাই উঠে বললেন, 'আমরা যাই।' তারপর আস্তে করে বললেন, 'ভাই আমরা চলে গেলে তো উনার দৃশ্যগুলোর মিউজিক দিবেন, তাই না?' আমি বললাম, 'অবশ্যই দিব।' এভাবেই পরিচয় হলো অসাধারণ ব্যক্তিত্ব হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে।

হুমায়ূন ভাই তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র 'আগুনের পরশমণি'র সঙ্গীত পরিচালনা করার জন্য আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। কথা প্রায় চূড়ান্ত। পরে একটি বিশেষ কারণে কাজটি আর আমার করা হয় নি।

দীর্ঘদিন বিরতির পর আবার ডাক পড়ল 'নক্ষত্রের রাত' নাটকে কাজ করার জন্য। হুমায়ূন ভাই জিজ্ঞেস করলেন আমার ব্যস্ততা কেমন। আমি জানালাম। শুনে হুমায়ূন ভাই হাসিমুখে বললেন, 'ভাই দেশে কি মিউজিক ডিরেক্টরের আকাল পড়ল নাকি! প্রায় সবই দেখি আপনি করছেন। আমি আর বাদ যাই কেন? আমারটাও করেন, আল্লাহ ভরসা।' এভাবেই শুরু হয়ে গেল স্যারের সাথে আমার পথচলা; শত শত অসাধারণ নাটকে আবহসঙ্গীত রচনা।

'৯০-এর পর থেকে আমি খুব একটা সুর করতাম না, আবহসঙ্গীত নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ একদিন হুমায়ূন ভাই একটি গানের কথা আমাকে দিয়ে বললেন, 'দেখেন তো ভাই এটার মিটার ঠিক আছে কি না! সুর করা যাবে কি না! অসুবিধা হলে আমি ঠিক করে দেব।' আমি গম্ভীরভাবে বললাম, 'স্যার আমাকে যা দেবেন তাই সুর করে দেব, দৈনিক পত্রিকা দিলেও সুর করে দেব, অসুবিধা নাই।'

হুমায়ূন ভাই হাসতে হাসতে বললেন, 'ভাই এটা কি তা হলে গান হয় নি?' যা হোক, গানটি পড়লাম। এত সুন্দর গানের বাণী আমি খুব কমই পেয়েছি। তারপর হুমায়ূন ভাই আমাকে অসাধারণ সব গান লিখে দিয়েছেন। আমি কখনোই তাঁর কথার একটি শব্দও পরিবর্তন করতে বলি নি। প্রয়োজনে আমি সুর পরিবর্তন করেছি। হুমায়ূন ভাইয়ের লেখনী আমাকে আবার সুর করতে অনুপ্রাণিত করেছে। আর এভাবেই তৈরি হয়েছে কালোত্তীর্ণ কয়েকটি গান।

হুমায়ূন ভাই কখনোই গানের সুর কী হয়েছে তা আমার কাছে জানতে চান নি। ভয়েস ডাব-এর সময় এসে গান শুনে বলেছেন, 'ডান এ গুড জব, আল্লাহ ভরসা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর এই ভরসার ফসল হয়ে এসেছে—একটা ছিল সোনার কন্যা, ও আমার উড়াল পঙ্খী, আমার ভাঙা ঘরে ভাঙা চালা, চাঁদনী পসরে কে আমায় স্মরণ করে, বরষার প্রথম দিনের মতো—চমৎকার সব গান।

হুমায়ূন ভাই সূক্ষ্ম রসবোধ সম্পন্ন মানুষ। হঠাৎ একদিন আমাকে বললেন, 'ভাই কীভাবে গানে আপনি সুর করেন দেখতে চাই। যদি বাসায় এসে একটা গান সুর করতেন, খুশি হতাম।' আমি তাঁর বাসায় গেলাম। দেখলাম এলাহি ব্যাপার! প্রায় পঞ্চাশজনের মতো দর্শক আর খাওয়াদাওয়ার আয়োজন। প্রায় বিয়ে বাড়ি বলা চলে। যা হোক, চলচ্চিত্রের গান, তাই স্যার আমাকে দৃশ্যের বর্ণনা দিয়ে গানটি ধরিয়ে দিলেন। আমি সাধারণত খুব দ্রুত সুর করি। সেদিন সবাইকে বিস্মিত করে আরও দ্রুত প্রায় ২/৩ মিনিটেই গানটি সুর করে ফেললাম। সবাই সুরটি খুব পছন্দ করলেন। এরপর খাওয়ার পালা। চলে আসার সময় হুমায়ূন ভাই আমাকে বললেন, 'ভাই সুরটা কি মনে আছে?' সুরটা আমার মোটেও মনে ছিল না। হুমায়ূন ভাই বললেন, 'অসুবিধা নাই, পরে যে সুরটা করবেন তাতে একটু দুঃখের ছোঁয়া রাখলে মনে হয় আরও ভালো হবে।' আবার সুর করলাম। গানটি রেকর্ড হলো। হুমায়ূন ভাই যথারীতি বললেন, 'ডান এ গুড জব, আল্লাহ্ ভরসা।' এটি ছিল 'চন্দ্রকথা' ছবির গান। গেয়েছিলেন সুবীর নন্দী। গানটির জনপ্রিয়তা আমাকে বিস্মিত করে দিয়েছিল। গানটি ছিল 'ও আমার উড়াল পঙ্খীরে।'

'আজ রোববার' নাটকের জন্য হাছন রাজার ১০টি গানের সঙ্গীত আয়োজনের দায়িত্ব পেলাম। কাজ শেষ। যথারীতি হুমায়ূন ভাই গান শুনে অভিভূত। আমাকে বললেন, 'ভাই আমি এই কাজটার জন্য আপনার সাথে যে চুক্তি ছিল তারচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক দিতে চাই।' আমার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল। ভাবলাম বেশি দেওয়ার আনন্দ স্যারকে পেতে দেওয়া যাবে না। আমি বেশি পারিশ্রমিক নিলাম না। হুমায়ূন ভাইকে বেশি দেওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে বেশ তৃপ্তি অনুভব করলাম। কিন্তু এই তৃপ্তি আমি ধরে রাখতে পারলাম না। হঠাৎ একদিন স্যারের তৎকালীন সহকারী জীবন একটা বড় প্যাকেট নিয়ে হাজির। গম্ভীরভাবে বলল, 'স্যার আপনাকে এটা নিতে বলেছে।' জীবনের ভাব-ভঙ্গিতে ভয় পেয়ে গেলাম। স্যারের সহকারীরা সাধারণত অন্য কাউকে হিসাবে ধরে না। স্যারের কথাই ফাইনাল। প্যাকেট খুলে দেখলাম বেশ মূল্যবান একটা স্যুট পিস। যে বেশি দিতে চায় তাকে দেওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা যায় না। হুমায়ূন ভাই আমাকে অনেক বেশি দিয়েছেন। হঠাৎ করেই একদিন আমাকে নুহাশ চলচ্চিত্র পদকে ভূষিত করে দিলেন। আমার সঙ্গীত জীবনে প্রথম পাওয়া কোনো পুরস্কার। গাজীপুরের নুহাশপল্লীতে দিনভর বিশাল আয়োজন করে পুরস্কার দেওয়া হলো। আমি অভিভূত। জাদুকর জুয়েল আইচ আমার হাতে পদক তুলে দিলেন। আমার কাছে সব কিছু জাদু বলে মনে হচ্ছিল।

অতঃপর আমার জন্য পুরস্কারের দরজা খুলে গেল। একে একে পেয়ে গেলাম দেশ সেরা সব পুরস্কার। এমনকি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও। আমার অধিকাংশ পুরস্কারই এসেছে হুমায়ূন ভাইয়ের সাথে করা কাজগুলোর জন্য। হুমায়ূন ভাই আমাকে বেশি দিতে চেয়েছিলেন। তাই মনে হয় অনেক বেশিই পেয়েছি আমি।

হঠাৎ করেই স্যার একদিন জানালেন আমাকে, একটা নকল গান করতে হবে। নাটকের প্রয়োজনেই করতে হবে। নকল গান করার ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। বহু কষ্ট করে একটা গান তৈরি করলাম এবং ওই নাটকে আমাকে সঙ্গীত পরিচালকের ভূমিকায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিনয়ও করতে হলো। নাটকে আমার ডায়লগ ছিল 'পাবলিকরে যা-ই খাওয়াবেন, তা-ই খাবে।' আমি অবাক হয়ে দেখলাম, পাবলিক গানটি ভয়ঙ্করভাবে খেয়ে ফেলল। গায়ক সেলিম চৌধুরীর লাল স্যান্ডো গেঞ্জি পরা ছবি দিয়ে গানের ক্যাসেট বের হয়ে গেল। চারদিক থেকে এই গানটি আমার কানে বাজতে লাগল। হুমায়ূন ভাইয়ের লেখা গানটির কথা ছিল, 'মারো চিকা মারো।'

আরেকটি কথা, আগেই বলেছি সেই নাটকে আমি অভিনয়ও করেছিলাম। নাটকের একটি দৃশ্যে জাহিদ হাসান আমার পা ছুঁয়ে সালাম করেছিলেন। তারপর রাস্তাঘাটে অনেকেই আমার পা ছুঁয়ে সালাম করা শুরু করলেন। এই বিড়ম্বনা আমাকে দীর্ঘদিন ভোগ করতে হয়েছে।

'ঘেটুপুত্র কমলা' চলচ্চিত্রের কাজ শুরু হলো। ৩টি সংগৃহিত গানের সঙ্গীত আয়োজন করলাম। বহু দিন পর হুমায়ূন ভাইয়ের চলচ্চিত্রে কাজ করলাম। কিন্তু হুমায়ূন ভাই এই চলচ্চিত্রের জন্য কোনো গান লিখলেন না। তাই শান্তি পাচ্ছিলাম না। এই চলচ্চিত্রে হুমায়ূন ভাইয়ের লেখা, আমার সুর করা কোনো গান থাকবে না—এটা ভেবে ভালো লাগছিল না। হঠাৎ একদিন হুমায়ূন ভাইয়ের প্রধান সহকারী জুয়েল রানা এসে হাজির। হাতে একটি কাগজ। সেখানে শুধু একটি লাইন লেখা। ও আমাকে জানাল, এই এক লাইনই গান হবে এবং তা দৃশ্যের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে, আমি যেন সুর করে দেই। লেখাটি হাতে পেয়েই আমি সুর করে ফেললাম। মনে হলো, এটি এক লাইন না হয়ে সম্পূর্ণ হওয়া উচিত। আমি জুয়েলকে বললাম, 'স্যারকে বলো পুরোটা লিখে দিলে এটি একটি চমৎকার গান হবে।' জুয়েল বলল, 'স্যারের কথাই ফাইনাল। সুতরাং এটা এক লাইনই হবে। কত খরচ হবে বলেন, দিয়ে যাচ্ছি।' আমি বললাম, 'পুরো গানে যে খরচ এক লাইনেও সেই খরচ হবে।' জুয়েল গম্ভীরভাবে বলল, 'অসুবিধা নেই।' আমি তাড়াতাড়ি এক লাইন নিজে গেয়ে সিডি করে স্যারকে দিলাম। হুমায়ূন ভাই ওই এক লাইন শুনে পুরো গানটি লিখে আমাকে পাঠালেন। রেকর্ডিং করলাম। গাইলেন ফজলুর রহমান বাবু। গানটি হলো : 'বাজে বংশী/রাজহংশী নাচে দুলিয়া দুলিয়া।' আমার বিশ্বাস এই গানটিও একটি ভালো গান হিসেবে জনপ্রিয়তা পাবে।

AMARBOI.COM

শক্তিমান এই লেখক এত সহজেই কী করে আমাদের মনের গভীরে ঢুকে যান, আমাদের হৃদয়কে করে তোলেন সিক্ত, তা সে গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক যে মাধ্যমেই হোক না কেন—আজও বুঝে উঠতে পারি নি। তাঁর জাদুময় লেখনী আমাদের মুগ্ধ করে রেখেছে।

হুমায়ূন আহমেদরা যুগে যুগে নয় হয়তোবা শতবর্ষেও জন্মান না। এমন একজন ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্বের অনেক কাজের সঙ্গে আমিও জড়িত। এ আমার জন্য অনেক গৌরবের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূনের যুদ্ধ
মতিউর রহমান

সেদিনের সেই রাতের ঢাকার কথা আজও মনে পড়ে। সে রাতে ঢাকার রাস্তা হয়ে পড়েছিল প্রায় জনশূন্য। শহরের ব্যস্ত মানুষেরা বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত 'কোথাও কেউ নেই' ধারাবাহিক নাটকের শেষ পর্ব দেখতে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এসেছিলেন। দর্শক-শ্রোতা উন্মুখ ছিল নাটকের শেষে বাকের ভাইয়ের চূড়ান্ত পরিণতি দেখার জন্য।

আমাদের মনে আছে, *কোথাও কেউ নেই*-এর শেষ পর্বের সংবাদ আর ছবির জন্য আমরা *ভোরের কাগজ* থেকে রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফার পাঠিয়েছিলাম আসাদুজ্জামান নূরের বাসভবনে। নূর সপরিবারে বাসায় নাটকটির শেষ পর্ব দেখছিলেন। পরদিন আমরা সেই ছবিসহ খবরটা প্রথম পৃষ্ঠায় বড় করে ছেপেছিলাম।

AMARBOI.COM

শুধু ঢাকা শহর নয়, সারা দেশের মানুষ চমৎকৃত হয়েছিল নাটকটি দেখে। এ রকম আকর্ষণ, অভাবনীয় টান আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত কোনো নাটক বা সিনেমা নিয়ে ঘটেছে বলে মনে পড়ে না। আমাদের জন্য সে ছিল এক অদ্ভুত বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। সে নাটকটি লিখেছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। পরিচালনায় ছিলেন মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ। নাটকের প্রধান চরিত্র বাকের ভাইকে (এ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন আসাদুজ্জামান নূর) নিয়ে যে অদ্ভুত এক আবেগ তৈরি হয়েছিল, তা হুমায়ূন আহমেদের মতো লেখকের পক্ষেই কেবল সম্ভব।

হুমায়ূন আহমেদ এমন এক লেখক, যাঁর জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত। এর আগের তিন দশক ধরে তাঁর গল্প, উপন্যাস, রহস্যঘেরা লেখালেখি ও কিছু স্মৃতিকথা সবার কাছে প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর প্রধান গুণ ও কৃতিত্ব হলো, তিনি সহজ করে লেখেন। সব ধরনের পাঠক, বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করার জাদুকরী ক্ষমতা তাঁর আছে।

এখনো মনে পড়ে, ১৯৯৪ সালে মুক্তি পাওয়া হুমায়ূন আহমেদ পরিচালিত 'আগুনের পরশমণি' চলচ্চিত্রের কথা। এফডিসিতে তার একটি বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ছবির কলাকুশলীসহ অনেক বিশিষ্টজন সেদিন উপস্থিত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এই ছবির পরিচালনা, অভিনয় ও দৃশ্যায়ন দেখে আমি গভীরভাবে আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সেই রাতেই তাঁকে ফোন করে আমার ভালোলাগার অনেক কথা বলি।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, তাঁর সঙ্গে কথা বলে, দেখা করে দ্রুতই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূচনা ঘটেছিল। পরবর্তী সময়ে তা ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। সে সময় আমরা *ভোরের কাগজ*-এ তাঁর কাছ থেকে নানা রকমের সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি। ওই সময় শুধু উপন্যাস নয়, গল্প ও আত্মস্মৃতিসহ সমসাময়িক বিষয়নির্ভর বিভিন্ন লেখা দিয়েও তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। একসময় আমরা *ভোরের কাগজ*-এ ধারাবাহিকভাবে তাঁর উপন্যাস ছাপতে শুরু করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাঁর এ কাজটি ছিল অনেক বড় মাপের, *জোছনা ও জননীর গল্প*। এ সময়ে আমাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ প্রায় নিয়মিত হয়ে উঠেছিল।

২০০১ সালের ২৩ মার্চ মুক্তি পায় হুমায়ূন আহমেদ পরিচালিত চলচ্চিত্র *দুই দুয়ারী*। এর প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠিত হয় ২১ মার্চ এফডিসির ভিআইপি প্রজেকশন হলে। মনে পড়ে, *দুই দুয়ারী*র প্রিমিয়ার শোতে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

আমি *সংগীতা* থেকে প্রকাশিত এ ছবির গানের অ্যালবামের মোড়ক উন্মোচন করি। সেদিন বলেছিলাম, একটি পরিচ্ছন্ন ছবি *দুই দুয়ারী*। এ ছবিতে কিছু মানবিক ও হৃদয়স্পর্শী আবেদন রয়েছে। বাংলা চলচ্চিত্রে যে পরিবর্তনটা দরকার, তা সূচনা করেছেন হুমায়ূন আহমেদ।

তার আগে ২০০০ সালে জনপ্রিয় উপন্যাস *আমিই মিসির আলি*র একটি কপি তিনি আমার বাসায় পাঠিয়ে দেন। খুলে দেখি, উপন্যাসটা তিনি আমাকে উৎসর্গ করেছেন। লিখেছেন: 'প্রথম আলোর মতি ভাই/ জনাব মতিউর রহমান/ এই মানুষটাকে আমার মাঝে মাঝে মিসির আলি বলে মনে হয়।' এর পুরো কারণ বা ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। জানতে চেষ্টাও করি নি কোনো দিন। আমরা জানি, মিসির আলি তাঁর প্রিয় একটি চরিত্র। হিমুর মতোই যা জনপ্রিয় ও পাঠকনন্দিত। মিসির আলি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। অতিপ্রাকৃত রহস্য উদ্ঘাটনে পারদর্শী। মিসির আলি যা কিছু করেন, যুক্তি দিয়ে এবং ভীষণ রকম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। আমি তো সে রকম কেউ নই। হতে পারে তা ছিল আমার প্রতি এক ধরনের ভালোবাসার প্রকাশ।

হুমায়ূন আহমেদ কখনো রাজনীতির কিংবা রাজনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে জড়িত হন নি; যদিও আমরা জানি, তাঁর চিন্তা ও মত সবসময় মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্রের পক্ষে। দেশের মানুষের মঙ্গলচিন্তায় তিনি ছিলেন নিবেদিত। তাঁর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দৃঢ়ভাবে কাজ করে। তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন করেন এবং উপন্যাস, নাটক আর সিনেমায় তা যথাযথভাবে তুলে ধরেন। আমরা জানি, তাঁর বাবা ফয়জুর রহমান, যিনি চাকরিজীবনে একজন পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন। মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে হুমায়ূন আহমেদের কষ্ট, পারিবারিক দুঃখ-বেদনা, অভিজ্ঞতা তাঁর মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক লেখালেখিকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করেছে।

*প্রথমা*র বই *আমাদের কালের নায়কেরা* বইতে জাহানারা ইমামকে নিয়ে 'তিনি' শিরোনামে অসম্ভব আবেদনময় ও মর্মস্পর্শী একটা লেখা আছে। এই লেখাটি *প্রথম আলো*র জন্য লিখেছিলেন। দারুণ একটি লেখা।

২০০০ সালের শুরুতে সিলেটে মুহম্মদ জাফর ইকবাল জঙ্গিদের আক্রমণের শিকার হন। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন হুমায়ূন আহমেদ। ওই বছর ২৬ মার্চ তিনি ঢাকা থেকে ট্রেনে করে অনেক সুহৃদকে সঙ্গে নিয়ে সিলেট গিয়ে এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ ও অনশন কর্মসূচি পালন করেন। কর্মসূচিতে তাঁর সঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আনিসুজ্জামানসহ বিশিষ্টজনদের অনেকেই ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বেশ কয়েকটি লেখা আমাদের *প্রথম আলো*তে লেখেন। লেখাগুলো সে সময়ে অনেককেই ভীষণভাবে আলোড়িত করে। অবস্থান ধর্মঘট ও অনশন কর্মসূচির এই উদ্যোগ, সাহস ও প্রগতিপন্থা আমাদের ভীষণভাবে উৎসাহিত করেছিল। ট্রেন-যাত্রার আগে আমরা অনেকেই হুমায়ূনকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়েছিলাম।

২০০২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর আমরা এক ঝটিকা সফরে নুহাশপল্লীতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিলেন সাজ্জাদ শরিফ। সেদিন নুহাশপল্লীতে অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। মনে পড়ে, ভীষণ সুন্দর পরিবেশে আনন্দ-উল্লাসে দিনটি কেটেছিল। সকাল থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ধ্যা পর্যন্ত দীর্ঘ একটা সময় আমরা মহানন্দে হইচই করে কাটিয়ে দিই। একপর্যায়ে সবাই মিলে আমরা সুইমিং পুলেও নেমে পড়ি। হই-হুল্লোড়, হুটোপুটি আর নানা স্বাদের পানীয় আর খাবার খেয়ে কেটে যায় সকাল, দুপুর আর বিকেল। সেদিন কত না আনন্দ হয়েছিল! কলকাতায় ফিরে গিয়ে সুনীলদা *দেশ* পত্রিকায় বড় লেখা লিখেছিলেন ছবিসহ। যখন শহরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করি তখন প্রায় সন্ধ্যা, নুহাশপল্লী থেকে কিছুটা নৌকায়, তারপর গাড়ি করে ঢাকায় ফিরি। দীর্ঘপথ, অথচ কোন আনন্দে কীভাবে পৌঁছে গিয়েছিলাম অফিসে বুঝতেই পারি নি।

হুমায়ূন আহমেদ কিছুটা বিচ্ছিন্ন থাকার মানুষ হলেও মজলিশি আর রসিকতা তাঁর প্রিয়। তিনি ভণিতাবিহীন ছিলেন। ধানমণ্ডির বাসায় বিভিন্ন সময় অনুষ্ঠিত আড্ডায় তাঁর রসবোধ দেখে মুগ্ধ হয়েছি বারবার। সেসব আড্ডা থেকে গভীর রাতেও উঠে আসা বেশ কঠিন হতো। মাঝে কিছুদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি। আমাদের এক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর আচরণে দুঃখ পেয়েছিলাম। কিছুদিন পর তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী ফারুককে (ওষুধ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের বড় কর্মকর্তা) আমার কাছে পাঠান। সেসব দুঃখ-কষ্ট নিয়ে কথা হয়। আমি আবার তাঁর বাসায় যাই। অনেক গল্প, অনেক ভালোবাসা নিয়ে ফিরে আসি।

হুমায়ূনকে দেখেছি লেখালেখি আর নাটক-সিনেমায় বেশ হিসেবি। কিন্তু জীবনযাপনের দিক থেকে বেহিসেবি। সে জন্য বন্ধুদের মধ্যে, আমাদের মধ্যে একটা ভয় কাজ করত। সে ভয়ই এখন বাস্তব হলো। তাঁর রসবোধ, কৌতুকপ্রিয়তা, যে কাউকে মুগ্ধ করেছে। অদ্ভুত এক সম্মোহনী শক্তি কাজ করত তাঁর ভেতর। তবে সবকিছুর পর তাঁর লেখা আমাদের উৎসাহিত করে, আনন্দিত করে, শুভকর্মে আগ্রহ সৃষ্টি করে। হুমায়ূন আহমেদ স্বাধীন বাংলাদেশের একজন নায়ক, যাঁর পাঠক, দর্শক, শ্রোতা, ভক্ত আর শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা লাখ লাখ।

এ কথা তো সত্যি, মানুষের জীবন তো সবসময় সহজ আর সরল পথে চলে না। অভ্যুদয় বন্ধুর পথের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে থাকে মানুষের জীবন। কখনো কখনো তাতে বাঁক এসে পড়ে, সাময়িক ভ্রান্তিও আসে, আবার ঘুরে দাঁড়াতে হয়। হুমায়ূন আহমেদের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য।

হুমায়ূন আহমেদ ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে নিউইয়র্কে চিকিৎসাধীন ছিলেন। অগণিত মানুষের ভালোবাসা এই সময় তাঁকে শক্তি জুগিয়েছে। তাঁর প্রতি মানুষের ভালোবাসা দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। সে সময়ও তিনি লিখেছেন। চিকিৎসা নিয়ে, তাঁর নানা দুঃখ-কষ্ট-বেদনা নিয়ে তাঁর লেখালেখি আমাদের সাহসী করেছে। এসবের মধ্যে তাঁর বেদনার দিকটিও আমরা লক্ষ করি।

গত কয়েক মাসে *প্রথম আলো*-তেও তাঁর বেশ কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বিগত এক বছরে *প্রথম আলোতে* তিনি সবচেয়ে বেশি লিখেছেন। আমাদের প্রতি তাঁর এই ভালোবাসায় আমরা কৃতজ্ঞ। আমরাও তাঁর সঙ্গে থাকার চেষ্টা করেছি। তাঁর ভক্ত-শ্রোতা-দর্শকের মতো আমরাও তাঁর রোগমুক্তি কামনা করেছি। তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠার অপেক্ষায় ছিলাম। নিউইয়র্কে যাওয়ার আগে তাঁর ধানমণ্ডির বাসায় দেখা করতে গিয়েছিলাম। তখন নানা কথার মধ্যে ছোটবেলায় স্কুলে পড়া একটা বাক্য তাঁকে বলি, 'ফাইট লাইক এ হিরো' অর্থাৎ 'বীরের মতো যুদ্ধ করো'। বেরিয়ে আসার সময় আবারও এই কথারই পুনরাবৃত্তি করি। তিনি আমার কথা শুনে শুধু হেসেছেন। আর ক্লান্ত কণ্ঠে ক্ষমা চেয়ে একটু ঘুমোতে বাসার ভেতরে চলে যান। হুমায়ূন আহমেদ বীরের মতোই যুদ্ধ করেছেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপবদলের নায়ক হুমায়ূন আহমেদ

মফিদুল হক

হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন গণ্ডিভাঙা মানুষ, সাফল্যের যেসব সৌধ তিনি রচনা করেছিলেন, সেখানে আয়েশি জীবনযাপন সম্ভব হলেও সেই গণ্ডিতে তিনি বদ্ধ থাকেন নি, অনায়াসে তা অতিক্রম করে যান, বিপ্লবীর মতো নয়, সন্ন্যাসব্রতীর মতো নিস্পৃহভাবেও নয়, একান্ত নিজের মতো করে এমন এক সহজিয়া ধরনে যে তাঁর ভাঙচুর কখনোই তেমনভাবে দৃশ্যগোচর হয় না। ফলে তাঁকে কেউ কখনো বিপ্লবী বলবেন না, বিদ্রোহী তো নয়ই, কিন্তু প্রচলিত ছকে-বাঁধা জীবনের গণ্ডিতে তাঁর হাঁপিয়ে ওঠা এবং পরিণামে সেই ছক পেরিয়ে আরেক নতুন ছকবদ্ধতা গড়ে তোলা, এমন তাড়না তো তিনি সর্বদা বহন করেছেন। সমাজ দেখেছে হুমায়ূন আহমেদকে নানা রূপে, প্রায় যেন এক বহুরূপী তিনি, রূপবদলের খেলায় লাভ করেন অপার আনন্দ। এমন খেলা খেলবার যে শক্তি সেটা তাঁর ভেতরে ছিল অপরিমেয়ভাবে, ফলে ম্যাজিক দেখানোর মতোই বাঙালি সমাজকে তিনি ধন্দে ফেলেছেন তাঁর নানা চমকের মধ্য দিয়ে, সব মিলিয়ে বলা যায় বাঙালি মধ্যবিত্ত, অমন বিপুল আবেগময়তা ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ এবং উজাড় করা ভালোবাসা প্রদান সত্ত্বেও তাঁকে বুঝতে পারার ক্ষেত্রে বিপুল ঘাটতির পরিচয় দিয়ে চলেছে।

হুমায়ূন-চরিত অনুধাবনে ব্যর্থতার চোরাবালিতে তলিয়ে যাওয়ার এই ধন্দ হুমায়ূন স্বয়ং তৈরি করেছিলেন তাঁর সাফল্য ও অসাফল্য উভয়ের সম্মিলনে। আর এই ধোঁয়াশা সঞ্চারে অমন বিপুল জনপ্রিয়তাও তাঁর জন্য দায় হয়ে উঠেছিল। কোনো একক অভিধায়, কিংবা সমাজে প্রচলিত রীতি অনুসারে যে হুমায়ূন আহমেদকে চেনা-জানা সম্ভব নয় সেটা মানতে কেউ রাজি নন। সবাই ব্যস্ত ছিলেন তাঁর কপালে পরিচয়ের একটা নির্দিষ্ট ছোপ এঁকে দিতে। অথচ বিশেষ পরিচিতির তকমা ধারণ করলেও ললাট থেকে সেই পরিচিতি মুছে ফেলবার কাজ হুমায়ূন আহমেদ স্বয়ং বারবার করেছেন। তাঁকে গণমাধ্যম খুব জোর গলায় ও জোর কলমে চিহ্নিত করে আসছে 'নন্দিত লেখক', 'জনপ্রিয়তম সাহিত্যিক' ইত্যাদি অভিধায়। *নন্দিত নরকে* লিখে যৌবনের শুরুতে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন হুমায়ূন আহমেদ, অবশ্য সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশে সত্তরের দশকের সূচনায় লিখে আর কতটুকুই-বা হইচই বাধানো যেত! লেখক হুমায়ূন আহমেদ তুখোড় ছাত্র হিসেবে নিজের আরেক পরিচয় দাখিল করেছিলেন এবং রসায়নের পাঠ শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন নিজেরই বিভাগে। সত্তরের বাংলাদেশে একজন তরুণের জন্য যে-সাফল্য খুব উঁচুদরের হিসেবে বিবেচিত হতো সেটা তাঁর করায়ত্ত হয়েছিল। উচ্চশিক্ষার বৃত্তিলাভ এবং বিদেশে অধ্যয়নের তৎকালীন সীমিত সুযোগের পরিবেষ্টনে হুমায়ূন আহমেদ নিজ যোগ্যতাতেই আমেরিকায় পাঠগ্রহণের আমন্ত্রণ পেলেন এবং পলিমার কেমিস্ট্রির মতো আধুনিক বিষয়ে ডক্টরেট পদবি হাসিল করে যথারীতি দেশেও ফিরলেন। ইতিমধ্যে তাঁর কিছু কিছু লেখা গ্রন্থাকারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশিত হয়েছে এবং দেশে ফেরার পর লেখালেখির প্রবাহ দেখে বোঝা যাচ্ছিল এই মানুষটি সাহিত্যের সঙ্গে গভীর প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। তিনি যা-ই লিখছেন তা ভিন্ন এক রস সঞ্চার করছে এবং সেখানে সমকালীন জীবনের পটভূমিকায় সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের আনন্দ-বেদনা প্রাণছোঁয়া রূপ লাভ করছে। পেশায় তিনি বিজ্ঞানের অধ্যাপক, সে-ই তাঁর পরিচিতি, 'ডক্টরেট' পদবি তিনি বিশেষ ব্যবহার করেন নি, তবে যেহেতু এই পদবি ও অধ্যাপক পরিচিতি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাই লেখক হিসেবে স্বীকৃতি তাঁর গোড়াতে তেমনভাবে জোটে নি। তিনি লেখককুলের ভেতরমহলের কেউ নন, লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে তাঁর ছোটাছুটি নেই, লেখক সমাবেশে বিজ্ঞ আলোচনা ও বিতর্কের উদ্গাড়ণে তিনি অনুপস্থিত, তাঁকে বরং অধ্যাপক হিসেবেই বেশি গণ্য করা হয়েছিল, যে-ক্ষ্যাপাটে অধ্যাপক আবার লেখালেখি থেকেও বিরত থাকছেন না এবং তাঁর সেইসব লেখা এক আশ্চর্য সমীকরণ তৈরি করছিল পাঠকদের সঙ্গে, পাঠকেরা বিপুলভাবে তাঁকে বরণ করে নিচ্ছিল লেখক হিসেবে এবং এহেন সাফল্য ক্রমেই নিজেকে নিজে ছাপিয়ে যাওয়ার এমন পথ তৈরি করছিল যার বুঝি কোনো শেষ ছিল না। এই পাঠকদের এক বড় অংশ ছিল নতুন পাঠক, পড়ুয়া হিসেবে তাদের সুনাম ও স্বীকৃতি বিশেষ ছিল না; তবে হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের পাঠ তাদের প্রতিষ্ঠা দিল পাঠক হিসেবে, তারা গল্পপাঠের আনন্দস্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে স্বীকৃতি অর্জন করলেন বইপ্রেমী কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী রূপে। এক আশ্চর্য সমীকরণের মাধ্যমে হুমায়ূন আহমেদ জন্ম দিলেন বিশাল পাঠকগোষ্ঠীর এবং কেবল কলমের জোরেই তিনি এটা করেছিলেন, তাঁর পেছনে আর কোনো পৃষ্ঠপোষকতা অথবা প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন ছিল না।

এমনি যে জনপ্রিয় লেখক, যাঁর পাঠকপ্রিয়তার কোনো তুলনা নেই, তিনি দেশের সর্বাগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতমান অধ্যাপকও বটে, সেই মানুষটির ভীরু পদপাত ঘটল মিডিয়ার জগতে, টেলিভিশনের জন্য নাটক লিখতে শুরু করলেন প্রযোজকের অনুরোধে। ভিন্ন এই জগতে প্রবেশ করে হুমায়ূন আহমেদ অচিরেই আত্মপরিচয় পাল্টে ফেললেন, সেইসঙ্গে পাল্টে ফেললেন পেশা। অনায়াসে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা-পদ ছেড়ে দিলেন, কোনোরকম বাগাড়ম্বর অথবা সমালোচনা প্রকাশ না করে তিনি নিজেকে প্রায় নিঃশব্দে সরিয়ে নিলেন বঙ্গসমাজের আরাধ্য এক মোহনীয় ও সম্মানীয় পেশা থেকে। পারতেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় নাম রেখে আরও বেশ কিছুকাল বাইরের পছন্দসই কাজে ব্রতী থাকতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটিছাটার তো নানা সুযোগ রয়েছে, গ্রন্থরচনার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার ছুটিও বিভিন্নভাবে নেওয়া যায়, সামান্য কৌশলী হয়ে সেসবের পূর্ণ সদ্ব্যবহার ন্যায়সঙ্গতভাবেই করা যেত, কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ নিজের প্রতি সৎ রইলেন এবং নীরবেই আপন করণীয় সম্পাদন করলেন। ফল দাঁড়াল এই, দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করলেও তাঁর নাম কখনো অধ্যাপক হুমায়ূন আহমেদ হলো না, তিনি নিজেই ছাপিয়ে গিয়েছিলেন এই পরিচয়, মুছে দিয়েছিলেন নিজের এমন মোহনীয় পূর্ব-পরিচয়। অথচ আমাদের দেশে সামান্য কিছুকাল অধ্যাপনা করেও তো কত মানুষ আজীবন পরিচিত থেকে গেছেন অধ্যাপক হিসেবে, হতে পারে ওটুকু অর্জনের বাইরে পরে জীবনভর তাঁরা আর কোনো পরিচিতি ধারণ করতে পারেন নি।

ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে হুমায়ূন আহমেদের দাপুটে অবস্থান তো মিডিয়ার কল্যাণে প্রায় মিথে পরিণত হয়েছে। সিরিয়াল নাটক রচনাতে তিনি যখন বিপুলভাবে সফল তখন তিনি নিজেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাটক পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। মনে হতে পারে এ-তো মিডিয়াতেই অবস্থান বজায় রাখা; কিন্তু এ-যে কত বড়ভাবে ভূমিকা পাল্টে ফেলা সেটা ভেতরমহলের লোকেরা ভালোভাবে জানেন। এমনিভাবে হুমায়ূন আহমেদ আরও একবার নিজের পরিচয় পাল্টে ফেললেন, যদিও বাইরের সমাজ সেটা বুঝতে পারে নি তেমনভাবে। বুঝতে যে পারে নি তার এক বড় কারণ এবং হুমায়ূন আহমেদের নিজস্বতার এক বড় প্রতিফলন, তিনি মিডিয়া-স্বীকৃত প্রচলিত ব্যক্তিত্বের ভূমিকায় কখনো নামেন নি। সংবাদপত্র কিংবা টেলিভিশন তারকাদের ইমেজ তৈরি ও ইমেজ ব্যবহারের যে গৎ তৈরি করেছে তিনি ছিলেন তাঁর সম্পূর্ণ বাইরে। তিনি সাক্ষাৎকার দেওয়া থেকে শতহাত দূরে থাকতেন, চুটকি-চাটকা মন্তব্য প্রকাশ, ফোনে মিডিয়া সাংবাদিকের সঙ্গে লঘু আলাপ, বিনোদন পাতায় টুকিটাকি রঙিন খবর হয়ে ওঠার জন্য আকুতি এসব হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে ছিল অকল্পনীয়। মিডিয়ার পেছনে তিনি কখনো ছোটেন নি; বরং মিডিয়া ছুটেছে তাঁর পেছনে।

টেলিভিশন মিডিয়ার ওপর হুমায়ূন আহমদের প্রভাব গণমাধ্যমে ইতিহাস হয়ে আছে। বিনোদন মাধ্যম হিসেবেই টেলিভিশন বিবেচিত হয়ে থাকে এবং টেলিভিশনের সেই ভূমিকার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন হুমায়ূন, যার কোনো তুলনা কোথাও নেই। বুদ্ধিজীবী মহল বিনোদনের প্রতি এককালে যে তুচ্ছতা প্রকাশ করতে অভ্যস্ত ছিল সেই পরিস্থিতি এখন অনেক পাল্টেছে। বাংলাদেশে না হোক, বাইরে তো বটেই, সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বিনোদনের ভূমিকা সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে এখন আলাদা বিবেচনা লাভ করছে। টেলিভিশনের নিরিখে হুমায়ূনের ভূমিকা বহুল-আলোচিত, কিন্তু সেখানেও তিনি কিছুটা যেন বাইরের মানুষ হয়ে থেকেছেন। পপুলার কালচার নানা দিক দিয়ে গুরুত্ব বহন করে, একে হেয় বা শ্রেয় করবার কোনো প্রয়োজন নেই, দরকার এর নিবিড়তর ও গভীরতর বিশ্লেষণ যা সমাজমানসের বহুমাত্রিকতার রূপ মেলে ধরবে। হুমায়ূন আহমেদ লেখকসত্তা ছাপিয়ে কিংবা বলা যায় লেখকসত্তার পাশাপাশি এই যে নতুন পেশা ও পরিচিতি গ্রহণ করলেন, নিজেকে আবারও পাল্টে ফেললেন, তার মুখোমুখি হয়ে সমাজ কিছুটা বিহ্বল বটে, এমন চোখ-ধাঁধানো উত্থান ও অবস্থানের কোনো আলাদা পরিচিতি তারা দিয়ে উঠতে পারে নি। একজন সাহিত্যিকের এমন মিডিয়া-ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠা ছিল সবার অনুমান ও অনুধাবনের বাইরে। ফলে তাঁর টেলিভিশন নাটকের জনপ্রিয়তা নিয়ে হাজারো কথা হয়, কিন্তু এর রূপ-রস কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা কিছু নেই।

টেলিভিশন থেকে হুমায়ূন আহমেদ যখন চলচ্চিত্রের দিকে হাত বাড়ালেন, তখন সবার মনে হয়েছিল এ-আর এমন কি, ছোটপর্দা থেকে বড়পর্দায় তাঁর উত্থান ঘটল। অথচ ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা জানেন এই দুইয়ের মধ্যে ফারাক অপরিসীম, কেউ সেই ফারাক অনুধাবন করতে পারেন, কেউ পারেন না; তবে আমাদের সমাজ একেবারেই পারে না। চলচ্চিত্রে হুমায়ূন আহমেদের আগমন কোনো সৌখিন পদপাত ছিল না, একের পর এক চলচ্চিত্র নির্মাণ ও তার সাফল্য-ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে তিনি কঠিনভাবেই সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। এভাবেও হুমায়ূন আহমেদ আবার নিজেকে পাল্টে নিলেন, যা এতকাল করছিলেন সফলভাবে তা থেকে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু সেই প্রস্থানটুকু বরাবরের মতো করলেন একান্ত নিজস্বভাবে, সন্তর্পণে ও স্বাভাবিক চলনে।

হুমায়ূন আহমেদ এমনিভাবে রূপ থেকে রূপান্তরের যে-খেলা খেলছিলেন তার হদিস করতে পারে নি সারস্বত সমাজ। সবকিছুই তিনি করেছিলেন আপন শক্তিতে, কোনোরকম করপোরেট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্ভরতা অথবা সমাজকে যারা শাসন করে তেমন কোনো শক্তি-নির্ভরতা থেকে নয়। এমন এক সফল মানুষ জীবনের মধ্যগগনে যেন কেবল নগর থেকে নয়, নগর-সভ্যতা থেকে পালাতে চাইলেন, গাজীপুরের নিভৃত প্রান্তে গড়ে তুললেন মনোমতো আবাস। নুহাশপল্লী হয়ে উঠতে পারত বাগানবাড়ি, তেমন হয়ে-ওঠার সবরকম উপাদান হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও, তার কিছু কিছু প্রয়োগ ঘটলেও, শেষ পর্যন্ত নুহাশপল্লীরও রূপান্তর ঘটছিল ওষধি গাছের বিশাল লালনক্ষেত্র হিসেবে। এই লালনকর্তার মধ্যে একটি অস্থিরতা ছিল, কিসের সন্ধানে তিনি যেন আকুল ছিলেন, ফলে সব সাফল্যের পরও তার সেই আকুতি যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে নতুন ভূমিতে, যেখানে নতুন করে শুরু হয় তাঁর শিল্পের সংসার এবং নিজের সংসারও বটে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও এই রূপবদল যেন নিয়তির মতো ছায়াপাত ঘটিয়েছে এবং জন্ম দিয়েছে অনেক দ্বন্দ্ব ও বিতর্কের, বাঙালি সমাজ অস্থির হয়ে উঠেছে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে রায় প্রদানে।

আধুনিক জীবনবাদী লেখক হুমায়ূন আহমেদ, মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার হিসেবে টেলি-বন্দিত, তিনি যে-কোনো অবকাশে আবার হয়ে উঠেছিলেন গীতিকার সেটাও বিশেষভাবে আমরা লক্ষ করি নি। গানের মধ্য দিয়ে, খুব আশ্চর্যজনকভাবে আমরা পাই আরেক হুমায়ূনকে, যাঁকে বাংলার লোককবিদের কাতারে স্থান দেওয়া যায় এবং দেওয়া সঙ্গতই বটে। যে মরমিয়া চেতনা নিয়ে জীবনকে বড়ভাবে আলিঙ্গন করেন বাংলার বাউল শিল্পীরা সেই ঘরানাতে নিজেকে স্থাপন করেছিলেন হুমায়ূন আহমদ, বাংলার নাগরিক সমাজের পক্ষে এটা বুঝে-ওঠা কষ্টকর ছিল।

হুমায়ূন আহমেদের মধ্যে একটা ক্ষ্যাপামি নিশ্চয় ছিল, যেভাবে ক্ষ্যাপা খুঁজে ফিরে পরশপাথর, পাথরের সন্ধান তো মেলে কই, অথচ খোঁজারও থাকে না বিরাম। ফলে সাফল্য হুমায়ূন আহমেদ যতই লাভ করুন সেটি তাঁর উদ্দিষ্ট ছিল না, সাফল্যের মুকুট রাজসিংহাসনে রেখে তিনি আবার বেরিয়ে পড়তে পারেন পথে, নতুনের খোঁজে। এই যদি না হলো, তবে কীভাবে তিনি নির্মাণ করতে পারেন 'ঘেটুপুত্র কমলা'-র মতো ছায়াছবি। কেমনভাবে বাণিজ্যসফল তথাকথিত 'পরিচ্ছন্ন' ছবি নির্মাণ করতে হয়, সিনেমা-বিরাগ দর্শককে হলমুখী করতে আবেগের কোন্ তন্ত্রীতে কীভাবে আঘাত করতে হয়, তেমনটা নিশ্চয় হুমায়ূন আহমেদের চেয়ে ভালো কেউ বোঝেন নি। নিজের ইমেজ ও দক্ষতা ব্যবহার করে চলচ্চিত্রে তিনি করতে পারতেন অনেক কিছু, সমাজের প্রত্যাশিত চাহিদা পূরণ করে কীভাবে আরও জনপ্রিয়তা, আরও বিত্ত, আরও সফলতা অর্জন করা যায় সেই কুশলতা যার আয়ত্তে তিনি চোখ ফেরালেন সমাজের এমন এক বাস্তবতার দিকে যেদিকে আমরা তাকাতে চাই না, দৃষ্টি পড়লেও ফিরিয়ে নেই নজর।

ভাটি অঞ্চলের মানুষের জীবন নিবিড়ভাবে বাঁধা আছে জলের ছন্দের সঙ্গে, বর্ষার দুকূলপ্লাবী জলরাশি হাওড়ের জনপদসমূহ বিচ্ছিন্ন ও বন্দি করে ফেলে জলের অপার বিস্তারে, মৃত্তিকা-সংলগ্ন জীবন জলের সহচর হয়ে অবলম্বন করে ভিন্ন চাল, সেই জলছন্দে মানুষ গান বাঁধে, গায় এবং গানের সুররস উপভোগের সঙ্গে জীবনরস সম্ভোগের তাগিদ থেকে বিত্তবানের চাহিদা নেয় অন্যতর রূপ। কিশোর বালকদের বালিকা রূপে সাজিয়ে নৃত্যগীতে পারদর্শী করে নিবেদন করা হয় বিনোদনে। ঘেটু গানের এমন এক দুর্ভাগা কিশোরের কাহিনি ফুটিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে হুমায়ূন আহমেদ অনেক কথা বলতে চেয়েছিলেন। ছবি কেমন হয়েছে তার চেয়ে বড় কথা এমন ছবি তিনি কেন বানাতে চেয়েছিলেন, কী কথাই-বা বলতে চেয়েছিলেন এর মধ্য দিয়ে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদের নানা রূপবদলের খেলা যেমন আমরা বুঝে উঠতে পারি নি, তেমনি 'ঘেটুপুত্র কমলা' হয়ে রইবে তাঁর রহস্যময় আরেক কাজ, বাঙালি নাগরিক সমাজ এর মাত্রা বুঝে উঠতে পারবে কিনা সেই সন্দেহ থেকে যায়। মানুষের প্রতি যে তীব্র ভালোবাসা নিয়ে হুমায়ূন আহমেদ এমন ছবি নির্মাণ করেছিলেন সেই ভালোবাসাই তাঁকে পরিণত করেছিল অমন ব্যতিক্রমী সাহিত্যিকে। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল গল্পবলায় তাঁর দক্ষতা, যে-দক্ষতা ভাটি অঞ্চলের কথক বা বয়াতিরা বহন করছেন পরম্পরায়, হুমায়ূন আহমেদ যে সেই ঘরানারই মানুষ ছিলেন তা আমরা কতটুকু বুঝতে পেরেছি? অন্যদিকে মানবজীবনের ছন্দ যে প্রকৃতির সঙ্গে গভীরতর সম্পর্কে বাঁধা রয়েছে, সেটাই-বা আমরা কতটুকু বুঝেছি! সে-কারণেই 'ঘেটুপুত্র কমলা' থেকে যাবে আমাদের প্রচলিত ভাবনাবোধের বাইরে, ঠিক যেমনভাবে বোধের বাইরে রয়েছে হুমায়ূন আহমেদের অস্থির রূপবদল ও জীবনতাড়না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূনের জন্য অশ্রু আর ভালোবাসা

মহাদেব সাহা

হুমায়ূন, কী লিখব আপনাকে নিয়ে, আমি খুব ক্ষুদ্র নগণ্য মানুষ, আপনি কত কোটি আটলান্টিকের ওপারে, কী লেখা যায়, খুব বেশি মেলামেশা বাক্যালাপই তো ছিল না আপনার সঙ্গে আমার, দেখা হলে মিষ্টি হেসে ছোট একটি শব্দে আমাকে সম্বোধন করতেন। কবি, কেমন আছেন, এটুকুই, আপনাকে যারা জানে, এই বাংলাদেশ, নুহাশপল্লী, বইমেলা, তারাই বলতে পারে আপনার কথা। আমি খুব সামান্য জানি, মাত্র একবার আপনার গাড়িতে নেত্রকোনা থেকে বারহাট্টা গিয়েছিলাম কবি নির্মলেন্দু গুণের বাড়িতে। সেই একসঙ্গে অনেক সময় কাটানো, অনেক পথচলা। এরপর আরেকবার একটা মজার ঘটনা, আজিমপুর কবরস্থান মার্কেটের দোতলায় কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার একটা কম্পিউটার কম্পোজের প্রেস ছিল। আপনি এসেছিলেন সেখানে, আমি সন্ধ্যার দিকে সেখানে গেছি। গিয়ে দেখি এক তুমুল কাণ্ড। এক দাঁতের ডাক্তার একজন মহিলার খারাপ দাঁতটি রেখে ভালো দাঁতটি তুলে ফেলেছেন। মহিলা চিৎকার করে কাঁদছে, আপনি ভীষণ ক্ষেপে গেছেন ডাক্তারের ওপর, আপনার একই কথা, এই ভালো দাঁতটি যেমন করেই হোক লাগিয়ে দিতে হবে, অন্য কিছু বুঝি না। আপনার বলার ধরন, কথা বলা, সে-তো আপনারই মতো, এ একেবারেই আলাদা। তার মধ্যে যে জোর, তার মধ্যে যে শক্তি, তা শুনে ডাক্তার বেচারি হতভম্ব। আমাকে দেখেই সেই ডাক্তার যেন আশ্রয় খুঁজে পেল, দাদা আপনি তো কবি, আপনি তো জানেন আমার বাবাও কবি ছিলেন, দেখেন উনি কী বলে, এই তোলা দাঁত আমি আবার লাগাব কী করে? হুমায়ূন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কবি এই লোককে আমি ছাড়ব না। ওই দাঁতটা লাগাতেই হবে। আমি ডাক্তারের কাছে গিয়ে বললাম, ওনাকে চেনেন, উনি হচ্ছেন হুমায়ূন আহমেদ, ডাক্তারের চোখ তো কপালে উঠে গেছে, উনিই হুমায়ূন আহমেদ? আমি বললাম, জ্বি, আপনি এক্ষুণি উনার কাছে মাফ চান, না হলে আপনার রক্ষা নাই, হুমায়ূন আহমেদ আপনাকে নাটকের চরিত্র বানিয়ে দেবে, সর্বনাশ হয়ে যাবে আপনার। এই তো সামান্য পুঁজি, গভীর আড্ডা, পানাহার, দীর্ঘসময় গল্প, এসব কোনো কিছুই তেমন করে আপনার সঙ্গে আমার হয় নি। আপনি একবার এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে, আজিমপুরে। আপনি তখন থাকেন সম্ভবত, আজিমপুরের দিকেই সুফিয়া ভবনে, চারতলায়। আমার যা হয়, যাব যাব করে আর যাওয়াই হয় নি। অন্যপ্রকাশে কতবার আপনি এক দরজা দিয়ে ঢুকেছেন, আমি অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছি। আমি দেখেছি দূর থেকে, মেলায় ভক্ত পরিবেষ্টিত, আপনার একটা অটোগ্রাফের জন্য ব্যাকুল ছেলেমেয়েরা। আমি দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি, আপনি যখন আমাদের মধ্যে ছিলেন, তখন খুব কথা হয় নি আপনার সঙ্গে, অনেক কথা হয়তো রয়েই গেছে। কিন্তু কী হবে এখন বলে, আমার এই কথা, এই ডাক, সে কি পৌঁছাবে আপনার কাছে, আপনি কোথায় আছেন, 'দূরে কোথায় দূরে দূরে', সে কোন পৃথিবীতে, তার কোনো নাম নেই, মানচিত্র নেই, রোডম্যাপ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই, তবু সে অনন্তের কাছে আমি আমার সব না-বলা কথা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনার জন্য যত ভালোবাসা, যত অশ্রু, বাংলাদেশের সব অশ্রু আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার কাছে, এই অশ্রুর প্লাবন, এই অশ্রুর কাব্য, এই অশ্রুর অনন্ত পঙ্‌ক্তিমালা।

বাংলাদেশ আপনার জন্য কাঁদছে, কিন্তু আপনি সমস্ত বেদনা, সমস্ত অশ্রু, সমস্ত কান্নার ওপারে। মৃত্যু এক অন্তহীন শূন্যতা, সব আছে, আকাশ আছে, নক্ষত্র আছে, দিন রাত্রি আছে, ঘর-বাড়ি আছে, গাছপালা আছে, যেখানে যে জিনিসটি ছিল, সব আছে, ভাবা যায়, শুধু এত পরিচিত, এত কাছের, এত প্রিয় মানুষটি নেই, কোথায় সে, সে কোথায় চলে যায়, এই প্রশ্ন গত কদিন ধরে আমাকে অস্থির করে তুলেছে। পত্রিকা, টিভি চ্যানেল, সবাই আমাকে লিখতে বলে, বলতে বলে। কী বলব আমি, শোকের দুঃখের একমাত্র উচ্চারণ তো নীরবতা, মৌন হয়ে থাকা।

প্রিয় হুমায়ূন, আপনি আমাদের সময়ের সবচেয়ে খ্যাতিমান লেখক, খ্যাতি বলি আর জনপ্রিয়তাই বলি আপনি তার শীর্ষে। শুনেছি পাঠকপ্রিয়তায় শরৎচন্দ্রকেও নাকি ছাড়িয়ে গেছেন আপনি। আমরা একটু আগে-পরে, প্রায় একই সময়ে লেখালেখি শুরু করি। আমরা কবিতা, আপনি উপন্যাস, যদিও কবিতা দিয়েই নাকি আপনারও লেখার সূচনা। সে সময়ে কবিতারই প্রতাপ, কবিতার সে অপ্রতিহত আবেগের সময় উপন্যাস নিয়ে আপনার যাত্রা, 'নন্দিত নরকে'। তখন বা তার মাত্র কিছুদিন আগে আমাদের মতো তরুণ কবিদের একগুচ্ছ কবিতার বই বেরিয়েছে। কবিতার সে অপ্রতিরোধ্য কল্লোলের মুখে 'নন্দিত নরক'-ই ফিকশনের প্রথম প্রবল ধাক্কা। আপনার 'নন্দিত নরকে', 'শঙ্খনীল কারাগার' কবিতা অনুরাগীদের কাছে প্রথম ভিন্ন এক আকর্ষণ, এও যেন কিছুটা কবিতার মতো। কবিতার পাঠকেরা ধীরে ধীরে হাতে তুলে নিল উপন্যাস। ক্রমাগত তা বাড়তে থাকল, পরে আশির দশকের মাঝামাঝি এসে উপন্যাসের প্রতি এই আকর্ষণ ও আগ্রহ যেন দু'কূল ছাপিয়ে ভাসিয়ে নিতে শুরু করল সবকিছু। আপনি হয়ে উঠলেন এই গদ্য জাগরণের নতুন নায়ক, ক্রমাগত বাড়তে লাগল আপনার খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা, সে যেন শব্দের গতির চেয়েও দ্রুত। এই যে চললেন, আর পেছন ফিরে তাকাতে হলো না আপনার। আমাদের দেশে এরকম ঘটনা বোধহয় এই একটাই, আর সে ঘটনার রূপকার আপনি, বিজ্ঞানের ছাত্র, কিছুটা লাজুক ও গোটানো হুমায়ূনের হাতে বাংলা উপন্যাস পাঠকপ্রিয়তার এক নতুন মাত্রা পেল; সে ঘটনাও কম কৌতূহলোদ্দীপক, কম বিস্ময়কর নয়।

AMARBOI.COM

যতই দিন যেতে লাগল, পাঠক ততই লুফে নিতে লাগল আপনার উপন্যাস। হুমায়ূন, এই পাঠক সৃষ্টিতে আপনার অবদান অসামান্য, এখানে আপনি কিংবদন্তি। আমি শুনেছি, সুবোধ ঘোষের বেস্ট সেলার যে বইটি, 'ভারতপ্রেমকথা' তার সর্বোচ্চ বিক্রির পরিমাণ ছিল ষাট হাজার কপি, তখন অবশ্য লোকসংখ্যা ও শিক্ষিত মানুষের সংখ্যাও অনেক কম ছিল, আর আপনার এক মেলাতেই বিক্রি হয়েছে লক্ষাধিক। সারা বছরে কয়েক লক্ষ, কেউ কেউ একে বাঁকা চোখে দেখতেই পারেন, জনপ্রিয়তাকে বলতেই পারেন সস্তা ব্যাপার। না, জনপ্রিয়তামাত্রই সস্তা ব্যাপার নয়, এক অর্থে তো জনপ্রিয়তাই সব, লেখক জনপ্রিয়তার জন্যই লেখে, পাঠকের অন্তর স্পর্শ করার জন্যই লেখে। যারা চোখ কুঞ্চিত করে জেমস জয়েসের *ইউলিসিস*, বা কাফকার *মেটামরফসিস*-এর কথা বলবেন, তাদের বলতে চাই, তা হলে রবীন্দ্রনাথ কী। রবীন্দ্রনাথ তো সব থেকে জনপ্রিয়, গানে, গল্পে, কবিতায়, চার শ'-পাঁচ শ' বছর পরও শেক্সপিয়র অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকার, তিনি কী, তিনি কি পাঠকের অন্তর জুড়ে নেই!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন, বহু বছর পর লেখকের সম্মানের যে ভাবমূর্তি আপনি ফিরিয়ে এনেছিলেন, তার মূল্য অনেক। আমি বুঝি, বাংলা গদ্যের যে বহমানতা সৃষ্টি করেছেন আপনি, যে দুরন্ত গতিশীলতা, তা কাকে না মুগ্ধ করে। আপনার লেখা সরাসরি পাঠকের অন্তর স্পর্শ করে আন্দোলিত করে পাঠককে। বিশেষ করে তরুণ পাঠককে, ভীষণ কমিউনিকেটিভ, এই সম্মোহনী শক্তি আপনাকে এমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অসামান্য করে তুলেছে। আপনার লেখার স্বতঃস্ফূর্ততা, সাবলীলতা, গতিশীলতা ও অনায়াস ভঙ্গিতে গল্প বলে যাওয়ার জাদুকরী ক্ষমতা, এর তুলনা হয় না। একে ছোট করে দ্যাখার মধ্যে ঈর্ষা আছে, সংকীর্ণতা আছে, সততা নেই।

সাহিত্যের প্রতি সৎ থেকে একজন লেখকের এই শক্তিকে অস্বীকার করা অসম্ভব। আপনার লেখার আরেকটি বড় গুণ, এক অন্যরকম আবেদন, রসসৃষ্টি, আপনার এক্সপ্রেশনটাই কিছুটা আলাদা, পাঠককে একরকম আচ্ছন্ন করে, চারপাশের এত নিষ্ঠুরতার মধ্যে মানুষ একটু হাসি চায় আনন্দ চায়, মানুষের এই তৃষ্ণা আপনি পূরণ করেছেন। উপন্যাস লিখেও আপনি বারবার ফিরে গেছেন কবিতার কাছে। অশেষ ভালোবাসা আপনার কবিতার প্রতি, রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ যেন প্রায় জুড়ে আছে আপন অন্তর, আপনার উপন্যাসের নামকরণেও এই কবিতারই পঙ্‌ক্তি, 'চলে যায় বসন্তের দিন', 'শ্যামল ছায়া', 'আমার আছে জল', 'আগুনের পরশমণি', 'মেঘ বলেছে যাব যাব', 'সবাই গেছে বনে' কিংবা 'দারুচিনি দ্বীপ' বা 'ডুবে গেছে পঞ্চমীর চাঁদ'। এজন্যই এই রুক্ষতার মধ্যে মানুষের মনকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও এক ধরনের স্নিগ্ধ জলবায়ুর মধ্যে নিয়ে যায়; জ্যোৎস্না ও বর্ষা দুইই আপনার খুব প্রিয়, দুই-ই আপনাকে ব্যথিত, কাতর ও আবেগময় করে তোলে। আপনার পাঠকেরাও স্নিগ্ধ হয় এই বর্ষায়, এই জ্যোৎস্নায়। লোকগীতি, বাউল, মরমী গানের মধ্যে ডুবে থাকা এ এক অন্য জগতের লেখক যার রচনা অনিবার্যভাবেই মোহগ্রস্ত করে পাঠককে, তরুণ পাঠককে। না হলে এমন লক্ষ লক্ষ পাঠক তৈরি হতো না। আরও আছে, আছে রহস্যময়তা, আছে অতিপ্রাকৃতের কিছু কিছু হাতছানি, সেও তো কবিরই জগৎ। আপনার লেখার গাঁথুনি শক্ত, কিন্তু পাঠকদের কাছে সহজ, অন্তরস্পর্শী, কী সব অনন্য চরিত্র সৃষ্টি করেছেন আপনি 'হিমু', 'মিসির আলি', 'বাকের ভাই'; এই যে একই মানুষের মধ্যে দুইজন মানুষ একজন স্বাভাবিক, একজন অস্বাভাবিক, উদ্ভট, এলোমেলো, ভেতরের এই মানুষটিকে কীভাবে আবিষ্কার করেছেন আপনি, পাখির কণ্ঠে আপনি তুলে দিয়েছেন 'তুই রাজাকার', মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ অংশগুলিকে আপনি রূপ দিয়েছেন আপনার উপন্যাসে, এসবই খুব বড় কাজ। আপনি যেখানেই থাকেন, আমাদের মধ্যেই থাকবেন, এই বাংলার ঘাস, ফুল, লতা, বর্ষা, বৃষ্টি, জলধারা, আকাশ প্লাবিত জ্যোৎস্নার মধ্যে, আপনাকে কে ভোলে? বাংলার আকাশ, বাতাস, মাটি, জল আপনাকে **ভুলবে না, হুমায়ূন** আপনার জন্য আমার এই ভালোবাসা, অশ্রু, নিঃশব্দ হাহাকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন পিরিতি বাড়াইলারে বন্ধু ছেড়ে যাইবা যদি

মাজহারুল ইসলাম

চেয়ার টেনে নিয়ে তাতে দু'পা তুলে একান্ত নিজস্ব এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসলেন তিনি। পাশের চেয়ারগুলোতে আমাদের বসতে বললেন। তারপর একের পর এক প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন।

'টিভি নাটকের ক্ষেত্রে আপনি যতটা আগ্রহী, সে তুলনায় মঞ্চের ব্যাপারে আপনার আগ্রহ কম। এর কারণ কী ?' উত্তরে জানান, 'একটি হিসেব দেখলেই বোধহয় পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমাদের দেশে প্রায় তিন কোটি লোক টিভি দেখে। আর মঞ্চে প্রতি শো-তে গড়ে লোক হয় তিন শ'র মতো। ধরা যাক তিন শ'ই। সে ক্ষেত্রে মঞ্চের একটি নাটক তিন কোটি লোককে দেখাতে হলে এক লক্ষ শো করতে হবে। যদি প্রতিদিন নাটকের শো হয় তাহলে প্রায় তিন শ' বছর লেগে যাবে তিন কোটি লোককে দেখাতে। অন্যদিকে টিভি নাটক একদিনেই দেখছে তিন কোটি লোক। একজন বুদ্ধিমান লোক হিসাবে আমি কেন মঞ্চে আগ্রহী হব ? ব্রেখট, ইবসেন এঁদের সময় যদি টেলিভিশন থাকত আমার তো মনে হয় তাঁরা মঞ্চ বাদ দিয়ে টিভি নাটকই লিখতেন।'

আরেকটি প্রশ্ন : 'আপনি শুধু লিখতেন, কিন্তু এখন আপনি নাটক পরিচালনা করছেন। একসঙ্গে এ দুটো করতে অসুবিধা হয় না আপনার ?'

জবাবটা এরকম : 'আসলে একসঙ্গে দু'টো চালানো কিছুটা তো কঠিন বটেই। আমি ছবি পরিচালনাও করেছি। এত কিছু একসঙ্গে করা সম্ভবও না। মূলত লেখালেখিটাই আমার কাছে ভালো লাগে বেশি।'

যাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে তিনি কিংবদন্তি কথাসাহিত্যিক। টেলিভিশন নাটকের যুগস্রষ্টা। তাঁর কাহিনি, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্রটি আটটি বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছে ক'দিন আগে। সাক্ষাৎকার পাওয়াটা সহজ ছিল না। যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না তাঁর সঙ্গে। আর যোগাযোগ করা গেলেও কি তিনি সদ্য প্রকাশিত একটি পাক্ষিক পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হবেন ? না-হওয়ারই কথা।

১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাস। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে। এরই মাঝে ১৬ জানুয়ারি আত্মপ্রকাশ করল *অন্যদিন*। সুধীমহলের দৃষ্টি কাড়ে সূচনাসংখ্যাটি। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনের গুণীজনেরা ফোন করে অভিনন্দন জানান পত্রিকার সম্পাদককে।

সবার আগ্রহ ছিল দ্বিতীয় সংখ্যাটি কেমন হয়, প্রচ্ছদ রচনাটি কোন বিষয়ে হয়। সম্পাদকীয় বৈঠকে সাব্যস্ত হলো : এ সংখ্যার প্রচ্ছদ রচনা হবে 'নক্ষত্রের রাত-এর নক্ষত্রেরা'। প্যাকেজ নাটক

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসেবে নির্মিত হচ্ছে এই ধারাবাহিকটি। নাটকের শুটিং চলছে সার্কিট হাউজ রোডের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) স্টুডিওতে। হুমায়ূন আহমেদের রচনা ও পরিচালনায় প্রথম ধারাবাহিক নাটক এটি। ইতিমধ্যেই তাঁর রচিত বেশ কয়েকটি ধারাবাহিক নাটক জনপ্রিয়তার নতুন নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে। 'এইসব দিনরাত্রি', 'বহুব্রীহি', 'অয়োময়' ও 'কোথাও কেউ নেই'—ধারাবাহিক নাটকগুলো অসামান্য সাফল্য অর্জন করে। 'একদিন হঠাৎ', 'অযাত্রা' প্রভৃতি একপর্বের সাপ্তাহিক নাটকগুলোও দর্শকনন্দিত হয়। হুমায়ূন আহমেদ পান শ্রেষ্ঠ কাহিনিকারের পুরস্কার। এমনই প্রেক্ষাপটে নিজস্ব প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান 'নুহাশ চলচ্চিত্র'র ব্যানারে এই নাটকটি নির্মাণে হাত দেন তিনি। সংস্কৃতি অঙ্গনে তাঁর এই নতুন নাটক নিয়ে সৃষ্টি হয় তীব্র কৌতূহল। আর সেই কৌতূহল মেটাতেই *অন্যদিন* সিদ্ধান্ত নেয় এ বিষয়ে প্রচ্ছদ রচনা তৈরির।

কোনোভাবেই যখন হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না তখন মনে পড়ল ফরিদুর রেজা সাগরের কথা। ইমপ্রেস টেলিফিল্মে হুমায়ূন আহমেদ কাজ করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ভালো সম্পর্ক। ফরিদুর রেজা সাগর ইমপ্রেস টেলিফিল্মের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তাঁর সঙ্গে আমার বেশ-একটা আন্তরিক সম্পর্ক। সাগর ভাইকে আমাদের ইচ্ছার কথা জানালাম। এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি হুমায়ূন আহমেদের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দিলেন।

সন্ধ্যায় ডিএফপি-র স্টুডিওতে শুটিংয়ের বিরতিতে সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে। সাক্ষাৎকার নিচ্ছে মাসুম আর নাসের। মাসুম *অন্যদিন*-এর প্রধান সম্পাদক, নাসের নির্বাহী সম্পাদক। হঠাৎই হুমায়ূন আহমেদ প্রশ্ন করলেন, তোমাদের পত্রিকার সম্পাদক কে? আমি বিব্রত হয়ে মাসুম ও নাসেরের দিকে তাকাচ্ছি। মাসুম উত্তর দিল, মাজহারুল ইসলাম। আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন মাজহারুল ইসলাম? নাসের জানাল, সদ্য সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে পাস করা আমাদের বন্ধু।

আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। হুমায়ূন আহমেদের এই সাক্ষাৎকারের ছবি তোলার কথা ছিল বিটিভির স্থির চিত্রগ্রাহক রকিবুল ইসলামের। হঠাৎ বিটিভির জরুরি কাজ পড়ে যাওয়ায় ঘণ্টাখানেক আগে জানান, হুমায়ূন আহমেদের সাক্ষাৎকারের ছবি তোলার কাজটি তিনি করতে পারছেন না। *অন্যদিন*-এর তখন স্থায়ী কোনো ফটোগ্রাফার নেই। রকিবুল পার্টটাইম কাজ করেন। মাঝে মাঝে ইয়াসীন কবীর জয়। তাকেও পাওয়া গেল না। সাক্ষাৎকারের সময় ছবি তো তুলতেই হবে। কী করা যায় বুঝতে পারছি না। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিলাম আমিই ছবি তুলব, কিন্তু পরিচয় গোপন রাখা হবে। কারণ পত্রিকার সম্পাদক নিজেই ফটোগ্রাফার—শুনলে হুমায়ূন আহমেদ যদি সাক্ষাৎকার না দেন! পরে যখন তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তখন এই গল্প আমি তাঁকে বলেছি। তিনি খুবই মজা পেয়েছেন।

অন্যদিন-এর দ্বিতীয় সংখ্যাতে হুমায়ূন আহমেদের সাক্ষাৎকার ছাপা হলো ছয় পৃষ্ঠা জুড়ে। প্রচ্ছদে তাঁর ছবি। পত্রিকার কপি পাঠানো হলো তাঁকে। এভাবেই প্রথম তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ।

কথাশিল্পী মঈনুল আহসান সাবেরের মাধ্যমে হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে দ্বিতীয়বার আমাদের পরিচয় হয়। তিনি নিজেও হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের প্রকাশক ও তাঁর বন্ধুদের একজন। সেটা ১৯৯৮-এর মাঝামাঝি সময়ের কথা। *অন্যদিন*-এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান অন্যপ্রকাশ। 'সৃজনশীল প্রকাশনায় উৎকর্ষের সন্ধানে' স্লোগানে যাত্রা শুরু ১৯৯৭ সালের একুশের বইমেলায়। শুরু থেকেই নানাভাবে আমরা চেষ্টা করছিলাম কী করে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহমেদের বই প্রকাশ করা যায়। সাবের ভাইয়ের সহযোগিতায় আমাদের আগ্রহের কথা জানানো হলো হুমায়ূন আহমেদকে। বই প্রকাশের জন্য তিনি অগ্রিম রয়্যালটি হিসেবে দশ লাখ টাকা প্রদানের কথা বললেন। আসলে তাঁর বই দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না বলেই এরকম কঠিন শর্ত দিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন ওই পরিমাণ অর্থ সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় পেরুনো এই তরুণেরা দিতে পারবে না, তাই এদের বইও দিতে হবে না। পরে তিনি এ কথাটা বহুবার বলেছিলেন। কারণ তখনো তিনি কোনো প্রকাশকের কাছ থেকে একটা বইয়ের জন্য পাঁচ লাখ টাকার বেশি অগ্রিম নিতেন না। তিনি ভেবেছিলেন, দশ লাখ টাকার কথা বললে আমরা পিছিয়ে যাব এবং তাঁকে আর বিরক্ত করব না।

হুমায়ূন আহমেদ তখন কাকরাইলের আসিফ ম্যানশনে নুহাশ চলচ্চিত্রের অফিসে নিয়মিত বসতেন। আমরা দু'দিন পর ঠিকই চটের ব্যাগে করে ব্যাংক থেকে তোলা দশ লাখ টাকার নতুন নোট নিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হই। শুনেছি তিনি চেক পছন্দ করেন না। ক্যাশ টাকা এবং ব্যাংকের নতুন নোট তাঁর পছন্দ। সাবের ভাই আমাদের সঙ্গে ছিলেন। চটের ব্যাগভর্তি টাকা দেখে সত্যিই ওইদিন খুবই চমকিত হয়েছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। কথা হলো, *অন্যদিন*-এর জন্য তিনি একটা ধারাবাহিক উপন্যাস লিখবেন এবং পরে তা বই আকারে প্রকাশিত হবে। পরে অবশ্য এই সিদ্ধান্তের খানিকটা পরিবর্তন হলো আমাদের অনুরোধে। আমরা আসন্ন ঈদসংখ্যার জন্য তাঁর কাছে একটা উপন্যাস চাইলাম এবং জানালাম, এই উপন্যাসটি একুশের বইমেলায় গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে চাই।

সেসময় বেশ কয়েক বছর হুমায়ূন আহমেদ ঈদসংখ্যাগুলোতে লিখেন নি। যদিও ইতিপূর্বে অনেক বছর তিনি বিভিন্ন ঈদসংখ্যায় উপন্যাস লিখেছেন। তখন তিনি শুধু *দেশ* পত্রিকার জন্য উপন্যাস লিখতেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি আমাদের দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক। এদেশের কোনো ঈদসংখ্যায় লিখছেন না, অথচ *দেশ* পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় নিয়মিত লিখছেন। এটা কতটা যৌক্তিক? আমি মনে করি, বাংলাদেশের একটি ঈদসংখ্যায় অন্তত আপনার লেখা উচিত, সেটা *অন্যদিন* বা অন্য যে-কোনো ঈদসংখ্যা হোক না কেন। মনোযোগের সঙ্গে আমার কথা শুনলেন তিনি। তারপর সাবের ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি তো এ ছেলের যুক্তিতে পরাস্ত। আমি যুক্তি পছন্দ করি। একইসঙ্গে এও বললেন, এবছর তিনি ঈদসংখ্যার জন্য একটি উপন্যাস লিখবেন এবং সেটা *অন্যদিন*-এর জন্য। ঈদসংখ্যায় উপন্যাস না লেখার পেছনে তাঁর আরেকটি ভাবনা ছিল, ঈদসংখ্যায় ছাপা হওয়া উপন্যাসটি পরবর্তী সময়ে বই আকারে প্রকাশিত হলে হয়তো সেটির বিক্রি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

হুমায়ূন আহমেদ *অন্যদিন* ঈদসংখ্যার জন্য উপন্যাস লিখলেন। নাম 'রূপার পালঙ্ক'। ঈদসংখ্যাটি প্রকাশিত হলো ১৯৯৯ সালের জানুয়ারিতে। সেবছর পাঁচ শ' পৃষ্ঠার *অন্যদিন* ঈদসংখ্যার সেরা আকর্ষণ ছিল হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস। হুমায়ূন আহমেদের কোনো লেখা প্রথমবারের মতো *অন্যদিন*-এ ছাপা হলো। এর আগে ১৯৯৭ সালে *অন্যদিন* বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় কলেবরে (৪০০ পৃষ্ঠা, যার ৮০ পৃষ্ঠাই ছিল চার রঙে মুদ্রিত), বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ আধুনিক মুদ্রণ সৌকর্যের ঈদসংখ্যা প্রকাশ করে। ১৯৯৮ সালে আরও আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশিত হয় *অন্যদিন* ঈদসংখ্যা। যা হোক, হুমায়ূন আহমেদের লেখা উপন্যাস ছাড়াও ১৯৯৯ সালের *অন্যদিন* ঈদসংখ্যার আরেকটি বিশেষত্ব ছিল, প্যারিস প্রবাসী খ্যাতিমান শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদের করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচ্ছদ। শিল্পী শাহাবুদ্দিনও সেবারই প্রথম কোনো পত্রিকার জন্য প্রচ্ছদ আঁকলেন। এরপর থেকে *অন্যদিন*-এর সঙ্গে এই দুই গুণীর অচ্ছেদ্য হৃদয়ের বন্ধন।

১৯৯৯ থেকে ২০১১ পর্যন্ত প্রকাশিত চৌদ্দটি ঈদসংখ্যার প্রতিটিতেই ছিল হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস। বাংলাদেশের আর কোনো পত্রিকায় এতটা দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর লেখা ছাপা হয় নি। ঈদসংখ্যার জন্য তিনি একটি উপন্যাস লিখলেও সেটি ছাপা হতো *অন্যদিন*-এ। একাধিক লিখলে প্রথম উপন্যাসটি থাকত *অন্যদিন*-এর জন্য। এটা আমাদের জন্য বিশাল সৌভাগ্য আর আনন্দের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গের *দেশ* পত্রিকায় পর পর আটটি শারদীয় সংখ্যায় তাঁর উপন্যাস ছাপা হয়। বাংলা সাহিত্যের কোনো লেখকের লেখা শারদীয় *দেশ*-এ পরপর আট বছর ছাপা হয় নি।

অন্যদিন ঈদসংখ্যা দেখে হুমায়ূন আহমেদ মুগ্ধ হলেন। সে বছরই ফেব্রুয়ারির অমর একুশে গ্রন্থমেলায় উপন্যাসটি প্রকাশিত হলো বই আকারে। *রূপার পালঙ্ক* বইটি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হলে আরেক দফা তিনি মুগ্ধ হলেন। বইয়ের নান্দনিক মুদ্রণ সৌকর্য ও বাঁধাইয়ের তিনি প্রশংসা করলেন। বইমেলায় *রূপার পালঙ্ক*র বিক্রির পরিমাণ হুমায়ূন আহমেদের পূর্ববর্তী বইগুলোর বিক্রিকে ছাড়িয়ে গেল। এই যুগল ঘটনা হুমায়ূন আহমেদ আর অন্যদিন গ্রুপকে পরস্পরের আস্থা, বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের সম্পর্কের ভেতর নিয়ে এল।

হুমায়ূন আহমেদ মুগ্ধ হতে ভালোবাসতেন, তার চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন অন্যদের মুগ্ধতার আবেশে জড়িয়ে ফেলতে। অচিরেই তিনি জড়িয়ে ফেললেন *অন্যদিন* গ্রুপকে এক অদ্ভুত সম্মোহনে, যেন তিনি হ্যামিলনের সেই বাঁশিওয়ালা।

নুহাশপল্লীতে যে বাংলো বা কটেজগুলো এখন আমরা দেখি, একসময় এগুলো ছিল না। ছোট ছোট কিছু টিনের ঘর আর একটি সুন্দর বাংলো ছিল। বাংলোটি ছিল পাহাড়ি এলাকার আদিবাসীদের বাড়ির মতো, উঁচু মাচার ওপর। নুহাশপল্লীতে প্রথম যেবার আমরা (মাসুম, কমল, নাসের আর আমি) রাত্রি যাপন করলাম, শতবর্ষের প্রখরতম চাঁদের আলো ছিল সে রাতে, জোছনা উৎসব হলো সেখানে; স্যার আমাদের বাংলোয় নিয়ে গেলেন, বললেন, তোমরা এই বাংলোয় থাকবে। আমি খুবই ইতস্তত করে বললাম, স্যার এখানে আমরা থাকলে আপনি কোথায় থাকবেন ? তিনি বললেন, দেখো এই বাংলোয় আমি সাধারণত থাকি না। ঢাকা থেকে আমার বিশেষ মেহমানরা এলে তাদের এখানে থাকতে দেই। তোমরা আজ নুহাশপল্লীতে প্রথম রাত্রিযাপন করবে। আমি চাই, তোমরা এখানে থাকো। দূরে একটা দোচালা টিনের ঘর দেখিয়ে বললেন, আমি থাকি ওই ঘরটায়। এখন যেখানে পদ্মপুকুর ঠিক ওই জায়গাটায় ছিল স্যারের সেই ঘরটি। আমি জড়সড় হয়ে একরকম ভয়ে ভয়েই বললাম, স্যার সাবের ভাইরা কোথায় থাকবেন ? তারা এখানে থাক। উনি একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, সাবের আমার অনেক পুরনো বন্ধুদের একজন। ওদের থাকা নিয়ে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। আমি যেভাবে বলেছি সেভাবেই হবে। এরপর হুমায়ূন আহমেদ নিজে আমাদের বাংলোর ভেতরে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখালেন। পাশাপাশি দুটো ঘর। মাঝে একটি ছোট লাইব্রেরি। সেখানে দেশি-বিদেশি অসংখ্য বই সাজানো। সোলার সিস্টেমে শুধু এ বাংলোতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা। তখনো নুহাশপল্লীতে বিদ্যুতের আলো পৌঁছে নি। সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে হুমায়ূন আহমেদ চলে গেলেন।

বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে হুমায়ূন আহমেদের চলে যাওয়া দেখছিলাম। মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন তিনি। জোছনার আলো পড়েছে তাঁর গায়ে। ছোটখাটো মানুষটাকে যেন জোছনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধবল চাদর ঢেকে ফেলেছে। বলাই বাহুল্য, একইসঙ্গে বিব্রত ও সম্মানিত বোধ করেছিলাম ওই রাতে। তাঁর আতিথেয়তায় আমরা মুগ্ধ। এটা ১৯৯৯-এর ডিসেম্বর মাসের ঘটনা। এখন যেখানে স্যার চিরনিদ্রায় শায়িত সেই লিচুতলার কাছেই ছিল বাংলোটির অবস্থান। পরে এই বাংলোটি দুষ্কৃতকারীরা পুড়িয়ে দেয়। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের দাবিতে অনশন করতে যে রাতে হুমায়ূন আহমেদ সিলেটের উদ্দেশে যাত্রা করেন, সেই রাতেই এই অপকর্মটি ঘটে। সেই যাত্রায় আমিও তাঁর সঙ্গে অনশনে গিয়েছিলাম। বাংলো পোড়ানোর সংবাদে হুমায়ূন আহমেদের সাথে আমরাও খুব কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন।

দিন যায়, আমাদের সম্পর্ক আরও নিবিড় হতে থাকে। কখন যে লেখক-প্রকাশক কিংবা লেখক-সম্পাদকের সম্পর্ক চাপা পড়ে যায় গভীর এক হার্দিক সম্পর্কের আড়ালে।

২০০০ সালের ঘটনা। ৭২ ঘণ্টা হরতালের আগের দিন হুমায়ূন আহমেদ তাঁর কন্যা বিপাশা ও পুত্র নুহাশকে নিয়ে কক্সবাজার যাবেন। সঙ্গে আমাকেও যেতে বললেন। বিমানে যাবেন এবং আসবেন। থাকবেন হোটেল সায়মন-এ। সব ব্যবস্থাই আমি করে দিলাম। তাঁর সঙ্গে গেলাম না। হরতালের প্রথম দিন অফিসে এসে খারাপ লাগছিল এত বড় মাপের একজন লেখককে 'না' বলার জন্য। এর মধ্যেই তাঁর টেলিফোন। মাজহার, আমি খবর নিয়ে জেনেছি হরতালে বিমান চলাচল করছে। একটা টিকিট করে চলে এসো, একসঙ্গে আনন্দ করবো। এবার আর না করতে পারলাম না, শুধু বললাম, স্যার দেখি। সিদ্ধান্ত নিলাম কক্সবাজার যাব, কিন্তু বিমানে না। আজ রাতে গাড়ি নিয়ে সরাসরি চলে গেলে কেমন হয়? হুমায়ূন আহমেদ অন্যদের সারপ্রাইজ দিতে যেমন পছন্দ করেন, তেমনি সারপ্রাইজ পেতেও পছন্দ করেন। অভিনেতা চ্যালেঞ্জার ও মাসুমকে রাজি করালাম আমার সঙ্গে যেতে। পরিবারের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও রওনা হলাম রাত দশটায়। হরতালের রাত। রাস্তা ফাঁকা। চারদিকে অন্ধকার। হঠাৎ দু'একটা গাড়ি চলাচল করছে। মাঝে মাঝে কিছু জটলা। কোথাও কোথাও টায়ার পোড়ানো হয়েছে দিনের বেলায়। গাড়িতে সংবাদপত্র স্টিকার লাগানো থাকায় দু'একবার পুলিশের মুখোমুখি হলেও তেমন কোনো সমস্যা হলো না। ঢাকা থেকে কক্সবাজার আমি একা গাড়ি চালালাম।

ভোর সাড়ে পাঁচটায় কক্সবাজার পৌঁছলাম। আগেই ঠিক করা ছিল আমার হাতে থাকবে আজকের পত্রিকা, মাসুমের হাতে গরম চায়ের কাপ এবং চ্যালেঞ্জারের হাতে এক প্যাকেট সিগারেট। যত রাতেই ঘুমান না কেন, খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন হুমায়ূন আহমেদ এবং বসে যান দৈনিক পত্রিকা ও গরম চা নিয়ে। সঙ্গে সিগারেট। সকাল সাড়ে ৭টায় তাঁর হোটেল রুমের দরজায় টোকা দিতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। খুব স্বাভাবিক গলায় ঢাকার খবর কী জানতে চাইলেন। বারান্দায় বসে চা খেলেন, পত্রিকার পাতায় চোখ বুলালেন। দু'একটি সাধারণ কথাবার্তা হলো আমাদের মধ্যে। কাল রাতে রুমের এসি ঠিকমতো কাজ করে নি বলে ঘুমাতে সমস্যা হয়েছে। ছেলেমেয়ে দুজন সারা দিন সাগরের পানিতে লাফালাফি করেছে। দূর থেকে এ দৃশ্য দেখতে তাঁর খুব ভালো লেগেছে। একপর্যায়ে তিনি বললেন, তোমরা হাতমুখ ধুয়ে রেস্টুরেন্টে আসো। একসঙ্গে নাস্তা খাব। এরপর তিনি পত্রিকা নিয়ে রুমে ঢুকে গেলেন।

আমার খুব মন খারাপ হলো। এতটা ঝুঁকি নিয়ে হরতালের মধ্যে সারা রাত গাড়ি চালিয়ে এলাম। আর স্যার একটুও খুশি হলেন না? একবার মুখে বললেন না। আমরা যে আসব একথা তো উনি জানতেন না। গতকাল টেলিফোনে শুধু বলেছি, স্যার দেখি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাস্তার টেবিলে বসে বললেন, মাজহার, আমাদের বিমানের টিকিট বাতিল করার ব্যবস্থা করো। আমি তোমাদের সঙ্গে গাড়িতে করে ঢাকা ফিরব। আমি বললাম, স্যার, আপনার কষ্ট হবে, আপনি বিমানেই যান। উনি একরকম ধমক দিয়ে বললেন, তোমরা এত কষ্ট করে আমাকে আনন্দ দিতে এসেছ, আর আমি তোমাদের সঙ্গে না গিয়ে আলাদা যাব? এটা হতেই পারে না। শোনো, আমি অসম্ভব খুশি হয়েছি তোমাদের দেখে। আমি চিন্তাই করি নি হরতালের মধ্যে সারা রাত গাড়ি চালিয়ে তোমরা চলে আসবে। আমার আনন্দটা ইচ্ছা করে প্রকাশ করি নি তোমাদের রিঅ্যাকশন দেখব বলে। এটাই লেখকদের কাজ। যাও টিকিট বাতিল করে আসো।... এই হলেন হুমায়ূন আহমেদ।

নানাভাবে আমাকে তিনি মুগ্ধ করেছিলেন পরম মমতা ও ভালোবাসায়। খুব দ্রুত ঘনিষ্ঠতা বাড়ল, পারস্পরিক নির্ভরতা তৈরি হলো। বয়সের যথেষ্ট ফারাক থাকলেও তিনি পরিণত হলেন আমাদের বন্ধু, একান্ত আপনজনে। তাঁর যে-কোনো আয়োজনের দায়িত্বের সাথে যুক্ত হয়ে গেলাম আমরা। বড় মেয়ে নোভার বিয়ে। খাবারের দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর। কলকাতা থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে বিয়েতে এনে মেয়েকে চমকে দিতে চান তিনি। আমাকে দায়িত্ব দিলেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে ফোনে স্যারের ইচ্ছার কথা জানালাম। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলেন তিনি। একবারও বললেন না, হুমায়ূনের মেয়ের বিয়ে, কই হুমায়ূন তো ফোন করল না আমাকে!

সত্যিই আমার দেখা আরেকজন বড় মাপের মানুষ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সুনীলদা স্বাতী বৌদিসহ বিয়ের আসরে যোগ দিলেন। পরবর্তী সময়ে হুমায়ূন আহমেদের আমন্ত্রণে আরও একবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নুহাশপল্লীতে এসেছিলেন। এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি নুহাশপল্লী। সেটা ছিল 'দুই দুয়ারী' ছবির শুটিংয়ের সময়। স্যার একদিন আমাকে ডেকে বললেন, শুটিং শেষ উপলক্ষে একটা উৎসবের আয়োজন করা হবে। সুনীলদা-কে বলো ব্যস্ততা না-থাকলে নুহাশপল্লী চলে আসতে। দুই-তিনটা দিন উনার সঙ্গে সময় কাটাতে চাই। সেবারও আমি ফোন করে সুনীলদা-কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। স্বাতী বউদিসহ সন্ধ্যায় ঢাকা এয়ারপোর্টে পৌঁছালেন তিনি। সময়টা ছিল বর্ষাকাল। বর্ষাকালে ভাওয়াল মির্জাপুর ঘাট থেকে নৌকায় নুহাশপল্লী যাওয়া হতো। নৌকার মধ্যে আমরা কয়েকজন। বিল এলাকা। ভরা বর্ষায় চারদিকে অথৈই পানি। সে পানিতে ফকফকা জোছনার আলো। অসাধারণ এক নৈসর্গিক দৃশ্য।

AMARBOI.COM

আমি যখন বিয়ে করি ২০০০ সালে, সে-কী উচ্ছ্বাস তাঁর! এ কি পিতার উচ্ছ্বাস পুত্রের বিয়েতে? নাকি বড়ভাইয়ের উচ্ছ্বাস কনিষ্ঠের নতুন জীবনে? কিংবা 'বন্ধু তোর বারাত নিয়া আমি যাব'? বিয়ের এক সপ্তাহের ভেতর নতুন দম্পতির জন্য নুহাশপল্লীতে বিশাল ও জমকালো এক সংবর্ধনার আয়োজন করলেন তিনি। নববধূকে নিয়ে নুহাশপল্লীর ঘাটে স্যারের বজরা নৌকা থেকে আমি নেমে আসতেই বাদকদল সুরের মূর্ছনা তুলল। পালকিতে তোলা হলো নববধূকে। আর আমাকে তোলা হলো 'হাবলংয়ের বাজারে' নাটকের সেই হাতাওয়ালা চেয়ারে। চারজন তাদের কাঁধে করে বয়ে চলল চেয়ার। অনেকখানি পথ পেরিয়ে আমাদের দুজনকে নিয়ে আসা হলো সাজানো একটি বাংলোর সামনে। স্যার আমাদের উপহার দিলেন নুহাশপল্লীর চাবি। এই প্রথম কাউকে নুহাশপল্লীর চাবি উপহার দেওয়া হলো। আরও নানা আয়োজন ছিল সেবার।

২০০১-এ আমি ধানমণ্ডির 'দখিন হাওয়া'র ফ্ল্যাটে এসে উঠি। এই ফ্ল্যাট কিনতে তিনিই আমাকে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি তখন 'দখিন হাওয়া'য় একাকী জীবন যাপন করছেন। একই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্লোরে পাশাপাশি দু'টি ফ্ল্যাট—তাঁর আর আমার। দিনে-রাতে চব্বিশ ঘণ্টার প্রায় পুরোটা সময়ই উভয় ফ্ল্যাটের দরোজা খোলা। আমাদের ঠিক নিচের ফ্লোরেই আরেকটি ফ্ল্যাটে থাকেন প্রকাশক ও হুমায়ূন আহমেদের দীর্ঘদিনের বন্ধু আলমগীর রহমান। হুমায়ূন আহমেদের ফ্ল্যাটে তখনো গিজার লাগানো হয় নি। শীতের অনেক দিনে দেখেছি আলমগীর রহমান বালতিভর্তি গরম পানি পৌঁছে দিচ্ছেন বন্ধুর ফ্ল্যাটে। গৃহকর্মে সহায়তা করার জন্য অনেকদিন পর্যন্ত স্যারের কোনো লোক নেই। নুহাশ চলচ্চিত্রের এক কর্মী এসে মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে সেই শূন্য ফ্ল্যাটে রাত কাটায়। রাতে একাকী থাকতে তিনি ভয় পেতেন। 'বোবায় ধরা' সমস্যা ছিল তাঁর। অনেক রাতে স্যারের সঙ্গে আমিও থেকেছি ওই ফ্ল্যাটে। রান্নাবান্না আমার ফ্ল্যাটেই হতো।

আমার স্ত্রী স্বর্ণা সবসময় স্যারের খোঁজখবর রাখত। তিনি কখন নাশতা করবেন? কখন দুপুর কিংবা রাতের খাবার খাবেন? ওনার খাবার হওয়া চাই আগুনগরম। ঠান্ডা খাবার খেতে পারেন না তিনি। লেখার সময় প্রচুর চা খান। এইসব খুঁটিনাটি বিষয় স্বর্ণা লক্ষ রাখত। তিনিও ওকে স্নেহ করতেন। হুমায়ূন আহমেদ স্বর্ণাকে *অচিনপুর* বইটি উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেন, 'দ্বিতীয় মাতা (!) স্বর্ণা। এই মেয়েটির বয়স মাত্র বাইশ। কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে সে আমাকে দেখে সন্তানের মতো। নিজের মাকে ছাড়া কাউকে মা ডাকা আমার জন্য অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কী আশ্চর্য কাণ্ড, এখন ডাকতে পারছি।' প্রায়ই বিভিন্ন আড্ডায় তিনি স্বর্ণাকে দ্বিতীয় মাতা বলে পরিচয় করিয়ে দিতেন।

ওই একাকী জীবনে তাঁর তিনবার ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়। দুইবার জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউটে, আরেকবার শিকদার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। চিকিৎসায় সেরে ওঠেন তিনি। ইতিমধ্যে তাঁর মায়েরও হৃদরোগ দেখা দিলে মাতা-পুত্র উভয়কে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় সিংগাপুরে। এই দুই রোগীর সঙ্গী গুলতেকিন খান আর আমি। সেখানে মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে মাতা-পুত্রের হার্টের বাইপাস সার্জারি হয় একই দিনে—আগে পুত্র, পরে মাতা। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে দু'জনকে পাশাপাশি রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে একই ক্যাবিনে মা ও পুত্র। হাসপাতালে এ নিয়ে ব্যাপক আলোড়ন—মাতা-পুত্রের একসঙ্গে সার্জারির এরকম ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটে নি।

প্রিয়জনদের সঙ্গে নিয়ে দেশে বা বিদেশে বেড়াতে খুব পছন্দ করতেন হুমায়ূন আহমেদ। ১৯৯৯-এর জানুয়ারি থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দেশ-বিদেশে যেখানেই যতবার তিনি বেড়াতে গিয়েছেন, দু'চারবার ছাড়া প্রত্যেকবার একসঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি। ২০০২ সালে হুমায়ূন আহমেদ আর আমি—আমরা দু'জন ৯ দিন ঘুরে বেড়িয়েছি জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালিতে। জার্মানিতে একটা বইমেলায় অংশ নিতে আমরা গিয়েছিলাম। সেখান থেকে অন্য দুই দেশে যাওয়া। ওই বেড়ানোটা ছিল আমার জন্য স্মরণীয় একটি ঘটনা। বহু দেশ, অসংখ্য জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি একসঙ্গে। কিন্তু ওই বেড়ানো ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম এক অভিজ্ঞতা। কলকাতা ও দার্জিলিং ছাড়াও মেঘালয়, ত্রিপুরা, সিকিমের নানা শহর ও পর্যটনকেন্দ্র ঘুরে দেখেছি তাঁর সঙ্গে। নেপালে গিয়েছি কমপক্ষে দশবার। কখনো শুধু ব্যাচেলর, কখনো পরিবার পরিজনসহ। একবার শুধু স্যার, নুহাশ ও আমি গিয়েছিলাম। সিংগাপুর, হংকং, চীন আর থাইল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গা যুক্ত হয়েছে আমাদের যৌথ অভিজ্ঞতায়। যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর সফরের সঙ্গী হয়েছি বহুবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশের ভেতরে যেখানে তিনি গেছেন, সঙ্গে আমার যাওয়াটা ছিল অবধারিত। কয়েক শ' দিন ও রাত কাটিয়েছি তাঁর সান্নিধ্যে নুহাশপল্লীতে। জোছনা দেখা, শ্রাবণের বৃষ্টিতে ভেজা, চৈত্রের প্রচণ্ড দাবদাহে সুইমিংপুলের পানিতে ডুবে থাকা, গাছ থেকে লিচু পাড়া, পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরা, ক্ষেতের ধান কাটা ইত্যাদি নানা উৎসব। নাটক-সিনেমার শুটিং তো আছেই। এছাড়াও নতুন নতুন উপলক্ষ তৈরি করে সবসময় আনন্দ করতে পছন্দ করতেন হুমায়ূন আহমেদ।

১২ বছরের অধিক সময় পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকি আমরা। 'গর্তজীবী' হুমায়ূন আহমেদ সারা দিনই বাসায় থাকেন। সচরাচর কোথাও বের হন না, নুহাশপল্লী ছাড়া। প্রায়ই সকালে ঘুম থেকে উঠে একসঙ্গে চা খাওয়া অথবা অফিসে আসার পথে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে বের হওয়া অথবা সন্ধ্যায় বা রাতে যখনই দখিন হাওয়ায় ফিরি, নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার আগে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে দেখা করে ঘরে ফেরা। কখন কীভাবে এই অভ্যস্ততায় জড়িয়ে গেছি নিজেই জানি না।

প্রায় প্রতি রাতে একসঙ্গে খাওয়া ছিল নিয়মিত একটা বিষয়। মাঝে মাঝে হুমায়ূন আহমেদ বাজার করতে পছন্দ করতেন। কোনোদিন হয়তো বাজার থেকে একটা বড় চিতল বা পাবদা মাছ কিনে আনলেন। আমি হয়তো তখন অফিসে। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করতেন—মাজহার, নিউমার্কেট থেকে বড় একটা চিতল মাছ এনেছি। দুপুরে একসঙ্গে খাব, চলে এসো। কাজের ব্যস্ততায় কখনো যেতে পারতাম, কখনো পারতাম না। যেতে না পারলে রাতে অবশ্যই তাঁর সঙ্গে খেতে হতো। খেতে বসে দেখি সেই চিতল মাছ। বলতেন, তুমি চিতল পছন্দ করো। তাই বড় টুকরাটি রেখে দিয়েছি তোমার জন্য।... এরকম ঘটনা অসংখ্যবার ঘটেছে।

নিজের সন্তান ছাড়া অন্যকারও বাচ্চা তিনি কোলে নিতেন না। বলতেন, অন্যের বাচ্চা কোলে নিতে পারি না। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে আমি দেখেছি, আমার দুই শিশুসন্তান অমিয় ও অন্বয়কে তিনি কীভাবে আদর দিয়েছেন, অসংখ্যবার কোলে বা কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাদের কত শিশুতোষ জ্বালাতন হাসিমুখে সয়ে গেছেন। একবার কোনো-একটা পত্রিকায় তিনি ইন্টারভ্যু দিচ্ছেন। পাশে নিরীহ মুখ করে আমার পুত্র অমিয় বসে আছে। হঠাৎ স্যারের গালে প্রচণ্ড এক চড়। চড় দিয়েছে অমিয়। এরপর সে প্রশ্নকর্তার ক্যামেরার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্যামেরা নিয়ে টানাটানি শুরু করে। এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন হুমায়ূন আহমেদ তাঁর 'দেখা না-দেখা' গ্রন্থে। লিখেছেন, 'অমিয়'র চড় খেয়ে আমি তেমন কিছু মনে করি নি। তার কারণ সে আমাকে ডাকে—বুব বু। বুব বু'র অর্থ বন্ধু। বন্ধু বলতে পারে না, বলে বুব বু। একজন বন্ধু আরেক বন্ধুর গালে চড়-থাপ্পড় মারতেই পারে।'

হুমায়ূন আহমেদ আমাকে একটি বই উৎসর্গ করেন। বইটির নাম *কুহুরানী*। উৎসর্গপত্রে তিনি লেখেন, 'একজীবনে অনেক বই লিখেছি। প্রিয়-অপ্রিয় অনেককেই উৎসর্গ করা হয়েছে। প্রায়ই ভাবি, কেউ কি বাদ পড়ে গেল? অতি কাছের কোনো বস্তুকে ক্যামেরা ফোকাস করতে পারে না। মানুষও ক্যামেরার মতোই। অতি কাছের জন ফোকাসের বাইরে থাকে। ও আচ্ছা, পুত্রসম মাজহার বাদ পড়ছে।' বিভিন্ন সময় পরিচিত-অপরিচিত মানুষের সঙ্গে এভাবেই আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতেন।

আসলে তাঁর সঙ্গে আমার একটা বহুমাত্রিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কখনো ছিল ভ্রাতৃ-সম্পর্ক, কখনো পিতৃ-সম্পর্ক, আবার কখনো তা গভীর বন্ধুত্বের। তখনো ভেবেছি, এখন আরও বেশি করে ভাবি—কী অদ্ভুত সম্মোহনে তিনি আমায় কাছে টেনেছিলেন। সর্বঅর্থেই তিনি একজন যাদুকর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন বলে আমার বিশ্বাস। আমজনতা জানে তাঁকে গল্পের জাদুকর হিসেবে। কেউ কেউ এও জানেন, তিনি ইন্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড অব ম্যাজিশিয়ানস-এর সদস্য ছিলেন। বন্ধুদের আড্ডায় তিনি কখনো কখনো নানারকম জাদু দেখাতেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর জাদুতে জুয়েল আইচও মুগ্ধ হয়েছেন বহুবার। আর একটি জাদু জানতেন তিনি—কাউকে আপন করে নেওয়ার জাদু। সেই জাদুতেই আমি আচ্ছন্ন হই।

স্ত্রী মেহের আফরোজ শাওন, দুই পুত্র নিষাদ ও নিনিত এবং আমাকে নিয়ে হুমায়ূন আহমেদ তাঁর 'ষষ্ঠ সংসার' পেতেছিলেন নিউইয়র্কে। ক্যানসারের চিকিৎসার জন্য আমেরিকায় এসে শুরু হয়েছিল এই সংসার। তিন রুমের একটা আলাদা বাড়ি ভাড়া নেওয়া হলো। হাঁড়ি-পাতিল কেনা হলো। টিভি কেনা, বিছানা-বালিশ—সে এক বিরাট হইচই। বাড়ির ছাদঘরে বসে তিনি ছবি আঁকেন। জলরঙ ছবি। তাঁর ধারণা ছবি ভালো হচ্ছে না। রঙে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না। অথচ আমি দেখছি অসাধারণ সব ছবি এঁকে চলেছেন তিনি একের পর এক। তাঁর আরেকটা প্রিয় জায়গা বাড়ির পেছনের ব্যাকইয়ার্ড। প্রতি সন্ধ্যায় কিছুটা সময় এখানে কাটান। বাড়ির পাশেই একটা পাবলিক লাইব্রেরি। ওদের মেম্বার হলেন। নানারকম বই এনে পড়েন। কানাডার টরেন্টো থেকে সুমন রহমান একবার হারুকি মুরাকামির একটা বই পাঠালেন। বইটা পড়ে খুব আনন্দ পেলেন তিনি। একথা সুমনকে জানাতেই মুরাকামির একগাদা বই পাঠিয়ে দিলেন। চিকিৎসাকালে বইগুলো আগ্রহ নিয়ে পড়েছেন তিনি।

চিকিৎসা শুরুর বিষয়ে তিনি লিখেছেন, 'শাওন ও মাজহার দুজনেরই দেখি মুখ শুকনো। নিশ্চয়ই কোনো একটা সমস্যা হয়েছে। যেহেতু তারা আমাকে বলেছে টাকাপয়সার বিষয় নিয়ে আমি যেন চিন্তা না করি, আমি তাই চিন্তা করছি না।

কেমোথেরাপি দিতে এসেছি। কেমোথেরাপির ডাক পড়বে, ভেতরে যাব। ডাক পড়ছে না। একা বসে আছি। শাওন আমার সঙ্গে নেই। সে মাজহারের সঙ্গে ছোটাছুটি করছে। শাওন চোখ লাল করে কিছুক্ষণ পর পর আসছে, আবার চলে যাচ্ছে।

একটা পর্যায়ে শাওন ও মাজহার দু'জনকে ডেকে বললাম, মার্ফিস ল' বলে একটা অদ্ভুত আইন আছে। মার্ফিস ল বলে—If anything can go wrong, it will go wrong. আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, কোনো একটা সমস্যা হয়েছে। সমস্যাটা বলো। টাকা কম পড়েছে?' [*নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ*, পৃষ্ঠা ২০-২১।]

সমস্যার সমাধান হলো। তাঁর কেমোথেরাপি চলল। ১২টি কেমো দেওয়া হলো। তারপর অপারেশনের আগে তিন সপ্তাহের জন্য তিনি দেশ থেকে ঘুরে এলেন। ১২ জুন তাঁর অপারেশন হলো। ১৯ জুন ফিরে এলেন জ্যামাইকার বাসায়, তাঁর 'ষষ্ঠ সংসারে'। দু'দিন পর অপারেশন-পরবর্তী জটিলতায় আবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হলো তাঁকে। ২১ জুন হলো দ্বিতীয় অপারেশন। ২৯ জুন রাতে ডিলেরিয়াম হলে পরদিন থেকে ভেন্টিলেশন সাপোর্ট দেওয়া শুরু হলো। এ প্রক্রিয়াটি শারীরিকভাবে অস্বস্তিকর বলে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হতো। ১২ জুন থেকে ১৯ জুন এবং ২১ জুন থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত প্রতি রাতে একদিন আমি, একদিন শাওন ভাবি হাসপাতালে থাকতাম। অধিকাংশ রাতেই স্যার ঘুমাতে পারতেন না। কেমোর কারণে হাতপায়ের আঙুলে একধরনের অস্বস্তি বোধ করতেন। আঙুল টিপে দিলে কিছুটা আরাম পেতেন। প্রায় সারা রাতই হাত-পা-মাথা টিপে দিতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনো বলতেন, মাজহার, মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও। এই কাজটি কখনোই শাওন ভাবি ছাড়া কাউকে দিয়ে করাতেন না তিনি। শারীরিক অস্বস্তি, ঘুমের ওষুধ দেওয়ার পরও ঘুম না আসার কষ্ট অথবা মাজহার তো আমার পুত্রের মতোই, সেই বোধ থেকেই হয়তো আমাকে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াতে বলতেন। আমি চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব গভীর মমতা দিয়ে তাঁর অস্বস্তি দূর করতে। চোখ বন্ধ হয়ে ঘুমিয়ে গেলে হয়তো পাশের চেয়ারটায় বসেছি, দশ মিনিট না হতেই ঘুম ভেঙে যেত তাঁর। আবার সেই আকুল করা স্বর, মাজহার, ঘুম পাড়িয়ে দাও। সেই স্বরের মধ্যে কী যে স্নেহ, ভালোবাসা, মমতা আর আকুতি ছিল, আমার পক্ষে বোঝানো সম্ভব নয়। যে ভালোবাসা, স্নেহ ও মমতা আমি পেয়েছি তার ঋণ শোধ করার আগেই এল ১৯ জুলাই, সেই ভয়ংকর দিন। প্রচণ্ড ভয়াবহতায় দুলে উঠল আমার পৃথিবী।

'সপ্তম সংসারে' পাড়ি জমালেন হুমায়ূন আহমেদ। যে সংসারের কথা তিনি লিখেছেন এভাবে, 'সম্ভবত সপ্তম সংসার হবে আমার শেষ সংসার। সেখানে কি আমি একা থাকব, নাকি সুখ দুঃখের সব সাথীই থাকবে?' [*নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ*, পৃষ্ঠা-১৫।] সপ্তম সংসারে তিনি একা, অথবা একা নন। সেখানে আছে তাঁর পুত্র রাশেদ হুমায়ূন, কন্যা লীলাবতী; পিতৃস্নেহ পায় নি যারা একটি দিনের জন্যেও। আছেন পিতা ফয়জুর রহমান আহমেদ। বন্ধু আনিস সাবেত, প্রিয় লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বগুড়ার কলেজ জীবনের বন্ধু সেহেরী আর প্রিয় অভিনেতা চ্যালেঞ্জারও আছেন সেখানে। কোনো কোনো সংসারে এঁরাই তো ছিলেন তাঁর সুখ-দুঃখের সাথী।

একই গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, 'আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের দুটি ছেলে নিতান্ত অল্প বয়সে হোয়াইট হাউসেই মারা যায়। আব্রাহাম লিংকন তারপর হতাশ হয়ে লিখলেন, গডের সৃষ্টি কোনো জিনিসকে বেশি ভালোবাসতে নেই। কারণ তিনি কখন তাঁর সৃষ্টি মুছে ফেলবেন তা তিনি জানেন। আমরা জানি না।'

বিধাতা কেন এত অকরুণ!

নিউইয়র্ক থেকে ঢাকায় ফিরছি। তাঁর ষষ্ঠ সংসারের সবাই। বিমানের আসনে বসে আছি আমরা—শাওন ভাবি, তাঁর দুই পুত্র, মা তহুরা আলী, বোন সেজুতি আর আমি। একই ফ্লাইটে আছেন আমাদের প্রিয় মানুষটিও। আমাদের আশপাশের কোনো আসনে নয়। এখানে তাঁর জায়গা হয় নি। তিনি যে এখন তাঁর সপ্তম সংসারে। বাক্সবন্দি নিথর দেহ মালামাল রাখবার প্রকোষ্ঠে। নিউইয়র্ক থেকে ঢাকা—বহুবার যাতায়াত করেছি এই পথে। কিন্তু আজ কী করে এই দূরত্ব বেড়ে গেল বহুগুণে! নাকি নিঃসীম আকাশে স্থবির হয়ে আছে আমাদের আকাশযান! অনন্তকাল ধরে ভেসে আছি এই শূন্যতায়। মনে পড়ে, ১৯৯৬ সালেও একবার এরকম হয়েছিল। বিমানে কলকাতা থেকে ঢাকায় আসতে মিনিট চল্লিশেক লাগলেও সেবার কত সহস্র মিনিট যে পেরিয়ে গিয়েছিল তা ঘড়ির কাঁটায় ধরতে পারি নি। সে ফ্লাইটে বাক্সবন্দি ছিল আমার পিতার শবদেহ। আজ স্মৃতির সেই দুঃসহ বেদনা আর বর্তমানের দুঃসহতা আমাকে নিঃস্ব করে দেয়।

প্রিয়জন যদি চলেই যাবে চিরতরে, তবে কেন এই মিছে মায়ায় জড়ানো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবন ও মৃত্যু : হুমায়ূন আহমেদের বেঁচে থাকার লড়াই

মাহবুব আজীজ

হুমায়ূন আহমেদের লেখালেখির মতো তাঁর জীবনযাপনও তীব্র আকর্ষক ও নানা প্রশ্ন-কৌতূহলসঞ্চারী। লেখায় তিনি মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন পাঠকদের, তবে তাঁর গ্রন্থে স্পষ্ট গল্প থাকলেও বেশির ভাগই আকারে ক্ষীণতনু, গল্পের ডালপালা কম, বর্ণনা আরও কম কিন্তু সংলাপবহুল; তাই শুরু থেকে *নন্দিত নরকে* ও *শঙ্খনীল কারাগার* [১৯৭২]-এর অব্যবহিত পরপরই আমৃত্যু 'অগভীর' লেখক তকমার বিরুদ্ধে লেখক হিসেবে 'সাহিত্যের কঠিন মাটিতে' এক ধরনের বেঁচে থাকার লড়াই করতে হয়েছে হুমায়ূন আহমেদকে; তিনি 'জনপ্রিয়'—তাই তার লেখা পড়তে ভাবতে হয় না—এ ধরনের সরলীকরণও তার ব্যাপারে বরাবরই করা হয়েছে। অন্তত, 'কতদিন বেঁচে থাকবেন লেখক হুমায়ূন আহমেদ'—এই প্রশ্নের উত্তরের সামনে মৃত্যুর পর প্রাসঙ্গিকভাবেই দাঁড়াতে হচ্ছে হুমায়ূন আহমেদকে; এবং যতদিন আছে এই প্রশ্নের উত্তর 'এরই মধ্যে সমাপ্ত' রচনারাজির মধ্য দিয়েই দিতে হবে তাঁকে।

হুমায়ূনের লেখার সামর্থ্য, তাঁর চিন্তা-ভাবনা, তাঁর জীবনযাপন, তাঁর আত্মবিশ্বাস নিঃসন্দেহে জীবনের মতো মৃত্যুর পরও জানিয়ে দিচ্ছে, বেঁচে থাকার লড়াইয়ে সহজে হার মেনে নেওয়ার মতো লেখক নন হুমায়ূন আহমেদ।

AMARBOI.COM

২

হুমায়ূন আহমেদের লেখার গুণপনা সম্পর্কে এদেশের মোটামুটি শিক্ষিতজন থেকে শুরু করে উচ্চপর্যায়ের লেখক-বুদ্ধিজীবী পর্যন্ত সবাই কমবেশি জানেন না, এমন নয়। মুখে স্বীকার করুন আর না-ই করুন—কে না জানেন যে, হুমায়ূনের লেখায় আছে চুম্বক টান, একবার শুরু করলে শেষ না করে ওঠা যায় না; তাঁর ছোট ছোট বাক্যে থাকে হীরকদ্যুতি, আছে তুলনারহিত রসবোধ, কয়েকটিমাত্র বাক্যে তিনি চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারেন।

আবার এ-ও সত্য যে, লেখক জীবনের প্রায় শুরু থেকে মৃত্যুর পরও কিছু নাছোড় অভিযোগ হুমায়ূন আহমেদের পিছু ধাওয়া করছে। তিনি অগভীর, তাঁর লেখায় চিন্তার ছাপ কম, সাহিত্যকে তিনি বিনোদনে রূপান্তরিত করেছেন, একই চরিত্ররা ঘুরেফিরে তাঁর লেখায় বারবার আসে। বর্ণনার বদলে তিনি সংলাপ লিখেছেন, সাহিত্যকে তিনি টিভি-সিনেমার স্ক্রিপ্ট বানিয়েছেন! মধ্যবিত্তকে তিনি এক ধরনের ফ্যান্টাসি বা কাল্পনিক স্বপ্ন দেখিয়েছেন! নানা রঙের বুদ্ধিজীবী-সাহিত্যিক সুযোগ পেলেই তাঁর লেখাকে নিমেষে 'বালক পাঠ্য' হিসেবেও আখ্যা দিয়েছেন ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুর অনতিবিলম্বে পত্রপত্রিকায় আমরা তাঁকে নিয়ে বিস্তর আলোচনা পড়েছি। এসব আলোচনা দুই প্রকার : ক. হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে 'আবেগী' লেখালেখি [এরই সংখ্যা সিংহভাগ], খ. হুমায়ূনের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা [সংখ্যায় কম]। হুমায়ূনের সাহিত্য নিয়ে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত সমালোচনা গড় করলে তাঁর লেখালেখি সম্পর্কে কিছু সরল মন্তব্য এ রকম : 'তিনি বাংলাদেশে পাঠক সৃষ্টি করেছেন'; 'এ দেশের প্রকাশনা শিল্পকে তিনি একা দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন'; 'তাঁর টিভি নাটক ও চলচ্চিত্র মানুষকে বিনোদন দিয়েছে'। ... বিষয়টি অনেকটা এ রকম যে : হুমায়ূন যে-কোনোভাবেই হোক পাঠককে বিনোদিত করেছেন; অর্থাৎ সাহিত্যের মাপকাঠিতে তাঁর লেখালেখির সারবত্তা কমই বলা যায়! যদিও মৃত্যুর অব্যবহিত পরপর হুমায়ূনের 'সাহিত্যমান' প্রসঙ্গে সরাসরি এই রূঢ় সমাধানে না পৌঁছে 'প্রকাশনা শিল্পকে তিনি দাঁড় করিয়েছেন', 'তিনি পাঠক তৈরি করেছেন' বলে তাঁর লেখার মূল শক্তি ও দর্শনকে পাশ কাটিয়ে গেছেন বেশির ভাগ 'গম্ভীর' আলোচক। তিনি সমকালীন নন, এমনও বলেছেন অনেকে; জানিয়েছেন, *নন্দিত নরকে* যখন লেখা হয়; তখন ১৯৬৯-৭০; লেখাটি পড়ে বোঝারই উপায় নেই যে তখন গণঅভ্যুত্থানউন্মুখ হয়ে আছে একটি দেশ!

আপামর পাঠকের চূড়ান্ত অনুমোদনই হুমায়ূনকে বারবার সমালোচকদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে; মৃত্যুর পরও এই 'কাঠগড়া' থেকে রেহাই নেই তাঁর, বরং এখন তো এই প্রশ্ন আরও প্রাসঙ্গিক ও জোরালো—লেখক হুমায়ূন কতদিন টিকে থাকবেন ? জীবিত লেখকটি এত জনপ্রিয় ছিলেন; তবে নিশ্চয়ই এর মধ্যে সারবত্তাসংক্রান্ত ঝামেলা ছিল; লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর বই পড়েছে—জনরুচিকে যিনি সন্তুষ্ট করেন, তিনি উত্তম লেখক হন কী করে ? হুমায়ূনের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা বরাবর তাঁর এক শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন, মহাকালে স্থির ৬৪ বছরের এই লেখকের সাহিত্যিক ভবিতব্য নিয়ে [illegible] আলোচনা তাই জরুরি; কালই শেষ পর্যন্ত নির্ণয় করে প্রত্যেকের ভবিতব্য; লেখার উপাদান, দর্শন, কৌশল ও বলবার ভঙ্গিই শেষ পর্যন্ত কালজয়ী হয়।

AMARBOI.COM

৪

হুমায়ূন গভীরভাবে পাঠ করলে, প্রথম গ্রন্থ *নন্দিত নরকে* [১৯৭২] থেকে সর্বশেষ *নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ* [২০১২] তিন শ'রও অধিক গ্রন্থ, সংকলনসহ আরও পঞ্চাশ অধিক; পূর্ব কোনো রাগ-অনুরাগ না রেখে নিবিষ্টমনে কেবল পাঠ করলে এসব রচনারাজির যে-কোনোটিতে স্পষ্ট দেখা মেলে এমন এক লেখক যিনি জীবন সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবেন, জীবনের অন্বিষ্ট খোঁজেন, মানুষের চরিত্রের আলো-অন্ধকার সম্পর্কে যার ধারণা স্পষ্ট, মানুষের জীবনযাপনকে যিনি অসীম মমতা ও ভালোবাসায় নিজের কলমে ধারণ করেন। সত্য, হুমায়ূনের কিছু চরিত্র একাধিক গ্রন্থে পুনরাবৃত হয়েছে, তাঁর লেখায় সংলাপ সচরাচর প্রাধান্য পেয়েছে ; এও সত্য—তাঁর গল্পে মধ্যবিত্তের ফ্যান্টাসি বা কল্পনার জগৎ প্রায়ই উপস্থিত হয়েছে। এখন হুমায়ূন স্বয়ং বাঙালি চিরকেলে এক মধ্যবিত্ত সমাজউদ্ভূত; তিনি তার চেনা জগৎ নিয়ে লিখবেন, এ আর বিচিত্র কি ? কিন্তু বিভ্রাট হচ্ছে, হুমায়ূনের বিপুল রচনাসম্ভার যে কত বিচিত্রমুখী তার প্রকৃত সংবাদ 'সমালোচনাকারী'দের কেউই রাখেন না। সামান্য একটি পিপীলিকা থেকে মনুষ্য 'কবর', দুর্ধর্ষ খুনি কিংবা গড়পড়তা মানুষ—যাকে ভালো বা মন্দ বা নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণীর মধ্যেই আটকে রাখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায় না। উপন্যাস 'ফেরা', *এই বসন্তে*, ১৯৭১ কিংবা তাঁর বহু ছোটগল্পে প্রান্তিক মানুষ নানা রঙে উপস্থিত। আর মধ্যবিত্তের স্বপ্ন—'মৃত্যুর হাত ধরে স্বপ্ন ছাড়া কে বাঁচিতে পারে?' মহান লেখকেরাই তো পারেন কেবল স্বপ্ন দেখাতে। অবশ্য এই সত্য আমরা কজনই শনাক্ত করি যে, হুমায়ূন তাঁর প্রথম রচনাতেই জানিয়ে দিয়েছিলেন—নায়ক মাত্রই 'মহামানব' গোত্রের; সে পাপ-তাপের ঊর্ধ্বে, আর ভিলেন হবে সকল কুকর্মের হোতা—এ রকম সরল চলতি ধারণায় তিনি বিশ্বাস করেন না। হুমায়ূনের চরিত্রেরা 'মানুষ', ভালো-মন্দের মিশেলে 'মানুষ', পাপে-তাপে-পুণ্যে একাকার 'মানুষ'; তাই তাঁর প্রথম গ্রন্থ *নন্দিত নরকে*তে মন্টুকে খুন করে ফাঁসিতে যেতে হয়, পরবর্তীতে *দ্বৈরথ*-এর চরম প্রতারকটিও ব্যাকুল হয় দয়িতার জন্য, নিষ্ঠুর প্রতারকের জন্যও পাঠক হিসেবে আমাদের থমকে দাঁড়াতে হয়—পাঠক হিসেবে আমাদের কর্তব্য কী হবে—আমরা কি প্রতারকের পক্ষেই যাব তবে—আমাদের বড় বিপদে ফেলে দেন তিনি, সমাজে যে সত্য আমরা শিখেছি, তা যেন ভেঙে যেতে থাকে; 'একজন ক্রীতদাস' গল্পের উচ্চাভিলাষী মেয়েটিও ছুড়ে ফেলা প্রেমিকের জন্য থমকে দাঁড়ায়, স্বার্থের সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে চাওয়া নিষ্ঠুর মেয়েটির জন্যও কেমন যেন মন খারাপ হয়ে যায় আমাদের। মানুষ যে কেবল 'সাদা' আর 'কালো'তে দ্বিধাবিভক্ত নয়, এ দুয়ের মধ্যে মানুষের মধ্যেই আছে অনেক রঙ, ভালো-মন্দের এ এক আশ্চর্য মিশেল; হুমায়ূনের মতো এত নির্মোহ-নৈর্ব্যক্তিকভাবে আর কোন লেখক এ সত্য প্রকাশ করেছেন?

আর সমকালীনতা? *নন্দিত নরকে*-তে তিনি একটি মানবিক আখ্যান রচনা করেছেন। কিছু মানবিক সত্য অসামান্য পরিমিতির আশ্রয়ে প্রকাশ করেছেন, যে সত্য সুতীক্ষ্ণ ও চিরকালীন। সাহিত্য 'সংবাদপত্র' নয় যে, সময় ও সামাজিক প্রেক্ষিত এখানে থাকতেই হবে; তারপরও হুমায়ূনের সমকালীনতা বিবেচনায় নিতে গেলে অসংখ্য গ্রন্থের উদাহরণ দেওয়া যাবে। যেমন, *হলুদ হিমু কালো র‍্যাব* [২০০৬] উপন্যাসে হুমায়ূন যে সমকালীন দায়বদ্ধতা দেখিয়েছেন, তা দুর্লক্ষ্য। কোনো ভান নেই এই কথকতায়, সরাসরি ছবি আঁকেন তিনি :

> 'শুভ্রর বাবা বললেন, 'আপনি কি চান না ভয়ংকর অপরাধীরা শেষ হয়ে যাক? ক্যানসার সেলকে ধ্বংস করতেই হয়। ধ্বংস না করলে এই সেল সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।'
>
> আমি বললাম, 'স্যার, মানুষ ক্যানসার সেল না। প্রকৃতি মানুষকে অনেক যত্নে তৈরি করে। একটা ভ্রূণ মায়ের পেটে বড় হয়। তার জন্য প্রকৃতি কী বিপুল আয়োজনই না করে! তাকে রক্ত পাঠায়, অক্সিজেন পাঠায়। অতি যত্নে তার শরীরের একেকটা জিনিস তৈরি হয়। দুই মাস বয়সে হাড়, তিন মাসে চামড়া, পাঁচ মাস বয়সে ফুসফুস। এত যত্নে তৈরি একটি জিনিস বিনাবিচারে ক্রসফায়ারে মরে যাবে—এটা কি ঠিক?'

এ রকম অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে হুমায়ূনে।

আর হুমায়ূনের রহস্য জগৎ? *দেবী*, *নিশীথিনী* থেকে শুরু করে তাঁর রচনাবলির একটি বড় অংশ ভয়-ভূত-রহস্যের গা ছমছমানো অধ্যায়। মিসির আলির মতো তুখোড় মনস্তাত্ত্বিক মনের আলো-আঁধারির খোঁজই শুধু দেন না, একইসঙ্গে জানিয়ে দেন—এর লেখকও বাঙালির মন ও মনস্তত্ত্বের এক সুদক্ষ কারিগর। শিশু-কিশোরদের জন্য হুমায়ূন লিখেছেন গুচ্ছ গুচ্ছ হীরকদীপ্তিময় গ্রন্থাবলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর সায়েন্স ফিকশন, তাঁর পরাবাস্তবতার গল্পে হুমায়ূনের কল্পনাশক্তি আর গল্প বুননের দক্ষতার অসাধারণ প্রকাশ। স্মরণযোগ্য, হুমায়ূনের *অনন্ত নক্ষত্র বীথি* কিংবা *ইরিনা*; একটি মানুষ আয়ুর অসীমতার মধ্যে ঢুকে গিয়েছে কিংবা *ইরিনার* সেই অবিস্মরণীয় পৃথিবী ধ্বংসের পরবর্তী সময়ের গল্প। ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মানুষের সমাজ কাঠামো; মানুষের কাজ ও বেঁচে থাকার এক অসামান্য ব্যাখ্যা।

আর মুক্তিযুদ্ধ ? উপন্যাস *আগুনের পরশমণি*, *জ্যোৎস্না ও জননীর গল্প*, *সৌরভ*, *নির্বাসন* আর তার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্পের পর গল্পে ... এই অসামান্য কথক আমাদের সবচেয়ে সুখ আর তীব্র দুঃখের সময়কে তুলে ধরেন অসামান্য এক নৈর্ব্যক্তিক-মায়াময় দৃষ্টিতে।

৫

নিশ্চিত যে, হুমায়ূনের লেখার মধ্যেই তাঁর প্রখর বুদ্ধি, নিবিড় পাঠাভ্যাস আর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। হুমায়ূনকে আরও একটু নিবিড় পাঠে বোঝা যাবে, এতে আছে আশ্চর্য এক দার্শনিকতা, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে লেখক হুমায়ূনের নিজস্ব ব্যাখা। 'নিজের আনন্দের জন্যেই লিখি'—বারবার তিনি জানিয়েছেন পাঠকদের, বলেছেন—'ভেবে চিন্তে লিখি না'! মুশকিল হয়েছে, তাঁর অনবদ্য রসিকতার ফাঁদ অনেক সময়ই 'গম্ভীর' পাঠকদের চোখ ও মনন এড়িয়ে গেছে। হুমায়ূনের গ্রন্থমাত্রেই আছে বিবরণে আশ্চর্য এক নির্লিপ্তি, আছে এমন কোনো না কোনো চরিত্র যে জীবন ও জগতের ব্যাখ্যা দিচ্ছে, হয়তো রসিকতার ছলে, হয়তো তা কখনো মাত্রই একটি বাক্যে, হয়তো সেই গ্রন্থটির আয়তন নিতান্ত সামান্য, কিন্তু জীবনের গাঢ় আনন্দ যে মাত্র ৭০/৮০ পৃষ্ঠাতেই ধরে দিচ্ছেন হুমায়ূন প্রায়শ, সেখানেই থাকছে জীবন সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট একটি ধারণার বিবিধ প্রকাশ—একটিই জীবন, একে আনন্দের সঙ্গে যাপন করা উচিত! আর জীবনের এই আনন্দের খোঁজে তাঁর চরিত্রেরা কত না জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে পরস্পর!

আর প্রকৃতি ? বাঙলার প্রকৃতির প্রতি কবি জীবনানন্দ দাশের মতোই আসক্তি হুমায়ূন আহমেদের। জ্যোৎস্না, বৃষ্টি, রোদ ... ঋতুতে ঋতুতে উদ্বেল হয়েছেন তিনি। প্রখর রোদে তাঁর চরিত্রেরা খালি পায়ে হাঁটছে, এ শুধু মধ্যবিত্তের কল্পনাবিলাস নয়, বিপুলা এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আনন্দকে নিজের মতো উদ্‌যাপন করাও বটে; গম্ভীর পাঠকদের দৃষ্টিতে হুমায়ূনের এই দর্শন এড়িয়ে গেলেও বাঙালি সনাতন পাঠকদের মনের মুক্তিতে এই দর্শন জাদুর মতোই কাজ করেছে। তাই হিমুর প্রতি বাঙালির এই প্রেম। জীবনের খাঁচায় পোরা কোন মানুষ না চায় বন্ধন ভেঙে অপাপবিদ্ধ শৈশবে-তারুণ্যে ফিরতে বা নিজের ইচ্ছেমতো জীবনটি যাপন করতে ? হিমুসহ হুমায়ূনের অনেক চরিত্রই বাঙালিকে সেই অপাপবিদ্ধ আনন্দময় জীবনে নিয়ে যায়। এই ঘোর বেঁচে থাকার ঘোর। এর মধ্যে রয়েছে চূড়ান্ত এক দার্শনিকতা। যার মূল ভিত্তি আনন্দের সঙ্গে বাঁচা।

৬

হ্যাঁ, আনন্দের সঙ্গে বাঁচা; বাক্যটিতেই একটি হাহাকার উহ্য আছে—আমরা টের পাই—বাঁচবই না তো একদিন; তাই হাতে যে ক'টি দিন আছে আনন্দ নিয়ে বাঁচি। হুমায়ূন জানতেনই, মানুষের নিয়তি এই-ই ...নিঃশেষ হয়ে যাওয়া! তবে বরাবর তিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন; যেমন লেখায়, তেমন তাঁর জীবনযাপনে। অভিযোগের তীর ছুড়ে চলেছেন গম্ভীর বিদ্বানেরা; তিনি ভ্রূক্ষেপও

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন নি, লিখে গিয়েছেন রোজ সকাল ৭টা থেকে ১টা; নিজের মতো করে, যেমনটি তিনি চাইতেন সবসময়; প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের লেখার ইতিবাচকতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল তাঁর। তাই তাঁর যে-কোনো লেখায় জীবনের উত্তাপ পাওয়া যায়; নাক সিঁটকে, খুতখুত করে, জীবনের প্রতি নানা বিতৃষ্ণা-অভিযোগ প্রকাশ ও পেশ করে বেঁচে থাকতে চান না তিনি; সেটিও তাঁর লেখাতেই স্পষ্ট হয় গ্রন্থ থেকে গ্রন্থে। এই ধুলোময় পৃথিবীর সামান্য ধুলোকণাটিও অতি চমৎকার, ওতেও আছে বেঁচে থাকার স্বাদ—এমন স্বাস্থ্যবান আহ্বান হুমায়ূনের লেখার অন্তর্মূলে; এই আহ্বান আমাদের মর্মমূল ছুঁয়ে যায়।

৭

এমন যার লেখায় আহ্বান ও দার্শনিক ভিত্তি; ব্যক্তিজীবনে তিনি যে জীবনের আনন্দে পূর্ণ এক মানুষ হবেন, এ আর বিচিত্র কি! হুমায়ূন আহমেদ তাই ছিলেন, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা টগবগে এক মানুষ। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই বর্ণনা করি তবে।

গত দেড় দশক নানাভাবে ব্যক্তি হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ; তার আগে তো আশৈশব লেখক হিসেবে তিনি আর সবার মতো আমার কাছেও প্রিয় ও পরিচিত ছিলেন, তবে ব্যক্তি হুমায়ূনের সঙ্গে যোগাযোগের ধারাবাহিকতায় একপর্যায়ে সম্পর্কটি নিশ্চিত ব্যক্তিগত পর্যায়ে পৌঁছে।

হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন আপাত গম্ভীর, বেশ অহঙ্কারীও বটে। সহজে কারও সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ কথা বলেন না। কাটা কাটা কথা বলেন। 'হ্যাঁ', 'না', 'আচ্ছা', 'পরে আসো' ... বলা যায়, শুরুতে বেশ ভালো রকমের অহঙ্কারী মানুষ-ই মনে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু ক্রমশ ঘনিষ্ঠতার এক পর্যায়ে দেখি, লেখায় যেমন তিনি একপটি সুরসিক, কথাতেও তা-ই। আরও অনেকের মতো আমিও তাকে 'স্যার' বলেই ডাকতে শুরু করি। পছন্দমতো সঙ্গী পেলে হুমায়ূন স্যারের মতো অনর্গল রসিকতাময় কথা বলার অসামান্য ক্ষমতা এই জীবনে আমি আর দেখি নি। আর তাঁর আত্মবিশ্বাস। যেমন তাঁর লেখাপড়ার জোর, তেমন তাঁর মনের জোর। অবিশ্বাস্য তাঁর পড়াশোনার পরিধি। বলতেন, 'আমি যা পড়ি, খুব মন দিয়েই পড়ি। রবীন্দ্রনাথ পুরোটা আমার নিখুঁতভাবে পড়া। তাঁর প্রতিটি লাইন আমার পড়া।'

একবার স্যারকে ধরলাম—বড় একটা ইন্টারভিউ নেব। সময় দেন।

কী আবার ইন্টারভিউ নিবা! এতগুলি বই লিখলাম। আমার সব কথা ওতেই বলা আছে। পড়ে নাও। তারপর যা ইচ্ছা লিখে দাও।

স্যার, জীবনমরণ সমস্যা। ইন্টারভিউ লাগবেই ...

এরপর ঘুরতেই থাকি। তিনি এটা-ওটা অনেক কথা বলেন, কিন্তু ইন্টারভিউটি দেন না। আনুষ্ঠানিক কথা বলার চেষ্টা করলেই বলেন—বই পড়ে লিখে দাও।

তো এভাবে কিছুদিন চলার পর এক সন্ধ্যায় ধানমণ্ডির দখিন হাওয়ায় ডেকে নিয়ে বললেন—

তোমার সমস্যাটা কী ?

স্যার, কিছু প্রশ্ন ছিল।

আচ্ছা চলো আমার পড়ার ঘরে। দেখি কত প্রশ্ন করতে পারো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলাম তাঁর পড়ার ঘরে। সন্ধ্যা ৭টা বাজে। শুরু হলো তাঁর সঙ্গে কথা, **চলল রাত ১টা পর্যন্ত।** সেদিন অনর্গল কথা বলেছিলেন তিনি—লেখা নিয়ে, জীবনযাপন নিয়ে, বিশ্বাস নিয়ে। কথায় কথায় স্পষ্ট হচ্ছিল তাঁর আত্মবিশ্বাস, নিজের লেখার প্রতি নিবিড় শ্রম আর আনন্দময় জীবনযাপনের কথা।

দেখো ... আমি গতকাল নিয়ে বাঁচি না। আগামীকাল কী হবে, আমার মৃত্যুর পর আমার লেখা কে পড়ল কে পড়ল না, তা নিয়েও আমি ভাবি না। আমি আমার নিজের মতো করে লিখে যাচ্ছি। প্রবল আনন্দ নিয়েই লিখছি। জীবনটাও খুব আনন্দের সঙ্গেই কাটাতে চাইছি এবং আমি সুখী। কারণ, আমি জানি—কীভাবে সুখ খুঁজে নিতে হয়...

আত্মবিশ্বাসী হুমায়ূন বলে চলছিলেন ... একপর্যায়ে বললেন—

টেপরেকর্ডার বন্ধ করো। এখন যা বলব—তা ইন্টারভিউয়ের অংশ না।

আমি টেপরেকর্ডার বন্ধ করলাম।

শোনো, দেখে তো লেখক বলেই মনে হয়; আর যা-ই কর—নিজের সংসার ভেঙে কিছু কোরো না ...

এরপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। সমানে সিগারেট টেনে চলেন।

বলা যায়, সেই শুরু। সেই ৬ ঘণ্টার কথোপকথনের পর স্যারের সঙ্গে আমার এক ধারাবাহিক নিবিড় ও অনেকটাই 'নীরব' কথোপকথন ও মাঝেমধ্যেই 'দেখা হওয়া' শুরু হয়। কখনো দখিন হাওয়া, কখনো নুহাশপল্লী ... রোজ সন্ধ্যায় স্যারের নিজ ভুবনে আড্ডার তুমুল ঝড়। স্যার-ই মূলত কথক, অন্যরা শ্রোতা। মাঝে মাঝে নিজে ডেকে জানতে চাইতেন—তরুণ কে কী লিখছেন, ফেসবুক-অনলাইনে লেখালেখির ব্যাপারটা কী? নতুন গল্পকারের অবস্থা কী? কোনো-একটি লেখা তৈরি হলে নিজের ঘরে বসে সবাইকে পড়ে শোনানো, পড়তে পড়তে স্যারের কান্না-হাসি, আর কথা শেষে হাসি আর হাসি!

AMARBOI.COM

আমরা জানতাম এই শহরে এক রাজার মতো মানুষ আছেন, যিনি পারতপক্ষে কোথাও যান না, কিন্তু সব বার্তা, মানুষের সব অনুভূতির প্রথম খবরটিই যেন তাঁর কাছে কীভাবে পৌঁছে যায়। ব্যক্তি হুমায়ূন মানেই যেন একগুচ্ছ নির্মল আনন্দের সমষ্টি, ইচ্ছে হলো 'কিছু একটা করবেন'—আর তা যদি থাকে তাঁর সামর্থ্যের মধ্যে তা তিনি করেই ছাড়বেন।

তিনি ছিলেন প্রবলভাবে অকপট। কী লিখলে বা না লিখলে তাঁর ব্যক্তিগত বা সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রভাববলয় বাড়বে বা কমবে—এসব নিয়ে আদৌ চিন্তিত ছিলেন না তিনি। নিজের লেখার শক্তির ওপর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আর প্রচণ্ড পড়াশোনার জোর তাঁকে জাগতিক লাভ-ক্ষতির হিসাবের বাইরেই রেখেছে সবসময়। জনমতের প্রভাব তাঁর লেখায় পড়েছে, এ কথা তাই কেউই বলতে পারবেন না। তিনি গল্প বলতে চেয়েছেন, অনবদ্য গল্প-কথক হিসেবে তিনি মানুষের গল্প বলে গেছেন।

আমরা এ-ও জানতাম, আর সবার বয়স বাড়ে, হুমায়ূন আহমেদের বয়স বাড়ে না। চিরতরুণ বলে যে কথাটি বই-পুস্তকে আছে তার বাস্তব প্রমাণ হুমায়ূন আহমেদ। হয়তো জীবনের প্রতি তাঁর আকুলতা আর চিরতারুণ্যই তাঁকে সবার মতের বিরুদ্ধে বহুল বিতর্কিত দ্বিতীয় বিবাহের ঘটনায় জড়িয়েছে। শাওনকে গভীরভাবে ভালোবেসেই তিনি এই বিয়ে করেন; এর মাধ্যমে আরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার বোঝা যায়—জীবনের কাছ থেকে তিনি যা চান, তা বুঝেও নিতে পারেন। প্রবল নিয়তিও যেন তাঁর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। শেষবেলায় যারাই হুমায়ূন আহমেদকে কাছ থেকে দেখেছেন; তারা জেনেছেন—কী প্রবল আকুলতায় তিনি দুই শিশুপুত্র নিষাদ ও নিনিতকে আঁকড়ে ধরে রাখতেন! একই রকম আকুলতা বোধ করতেন প্রথম চার সন্তানের জন্যও; কিন্তু আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হুমায়ূন কারও কাছেই নিজের মনের দৈন্য প্রকাশ করতে চাইতেন না।

তাঁর পরিবারের মধ্যে বিভক্তি তাঁকে দুঃখ দিত, এর জন্য নিজের দায়ও ভালোই বুঝতেন তিনি, কিন্তু ওই যে নিয়তি—যার কথা নানাভাবে লিখেছেন নিজের রচনায় জীবনভর, নিয়তিই তাঁকে বারবার ঠেলে দিয়েছে নানা বিষাদময় অভিজ্ঞতার ভেতরে। অসম্ভব মনের জোরে শেষ কয়েকটি বছর নিজের গড়ে তোলা একান্ত ভুবনে লেখালেখি, গান, নাটক, সিনেমা, শাওন, নিষাদ, নিনিত, কয়েকজনমাত্র বন্ধু নিয়ে নিজের ভাষায় 'গর্তজীবী' ছিলেন তিনি। তবে এটা তাঁর ভালোই জানা ছিল যে, দেশের অযুত ভক্ত তাঁকে সর্বান্তকরণে ভালোবাসে। তাদের জন্য লিখতে হবে, কোনো লেখাই খারাপ হওয়া যাবে না, দারুণ সতর্ক ছিলেন তিনি এ ব্যাপারে।

আর তাঁর আপন ভুবন ছিল নুহাশপল্লী। গাজীপুরের হোতাপাড়া থেকে ৯ কিলোমিটার ভেতরে, এ নুহাশপল্লীর গোড়াপত্তন, তখনকার কথা ছেড়েই দিই। সেসময় যাতায়াতের জন্য ঘণ্টা দুয়েক মহিষের গাড়ি ও নৌকাও ব্যবহার করতে হতো, গত বছর ছয়েকেরও বেশি আর তা করতে হয় না; তবে গাড়িতেও যাতায়াত খুব সহজসাধ্য নয়। তবে একবার নুহাশপল্লীর সদর দরজা পেরুলেই চোখের সামনে যে আদিগন্ত বিস্তৃত সবুজ চোখে পড়বে, তাতেই বোঝা যাবে—এর নির্মাতার ভেতরটা কত সবুজ আর স্বপ্নময়!

হুমায়ূনের প্রবল আত্মবিশ্বাস, তারুণ্যদীপ্ত কথোপকথন আর আগামী কাজের প্রতি অসম্ভব আকর্ষণ—আশপাশের সবাইকে মোহিত বটেই, তাঁর অগণিত পাঠকদের বুঝিয়ে দিয়েছিল—ক্যানসারের কামড়ে সহজে মরবার পাত্র নন তিনি! বারবার বলেছেনও এই কথা। ১০ মে, ২০১২ যখন এলেন দেশে চিকিৎসার বিরতিতে তিন সপ্তাহের জন্য; বিমানবন্দর থেকে শুরু করে দখিন হাওয়া বা নুহাশপল্লী যেখানেই দেখা হয়েছে; দেখেছি—টগবগ করে ফুটছেন এক কথাশিল্পী, যিনি তরুণের প্রবল প্রতিযোগী, যিনি বেঁচে থাকতে চান, যিনি জ্যোৎস্নায় ভিজতে চান, বৃষ্টিতে অবগাহন করতে চান, সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরতে চান। কী দৃপ্ত তার কথার ভঙ্গি, কাউকে মন ভোলানোর জন্য যিনি বিন্দুমাত্র মিথ্যে বলতে রাজি নন! কী অকৃত্রিম স্পষ্ট, ঝকঝকে মুখ। আর কী তুলনারহিত রসিকতা... যিনি আসছেন, তিনিই তাঁকে জড়িয়ে দোয়া-দরুদ পড়ে ফুঁ দিচ্ছেন—বলছেন, 'ক্যানসারে তো মরবো না—তবে নিউমোনিয়ায় মরে যাব নির্ঘাৎ।'... তার সম্ভাব্য মৃত্যু নিয়েও সে-কি রসিকতা...

সব জোর, সব শুভকামনা, সব আর্তি পেরিয়ে নিয়তির সামনে থেমে যেতেই হয়েছে হুমায়ূন আহমেদকে। মানুষের আয়ুর একটি সীমা আছে, নিয়তি নির্ধারিত সেই সীমায় আমাদের সবাইকে থামতে হয়, থামতে হবে। তবে তাঁর ৩৬০টি গ্রন্থ আর নুহাশপল্লীর অবারিত সবুজ তাঁর মৃত্যুকে নিশ্চিতভাবেই ম্লান করে আগামীতেও তাঁকে এ দেশের মানুষের প্রিয় হুমায়ূন আহমেদ হিসেবেই বাঁচিয়ে রাখবে। আজকের যে নতুন লিখিয়ে তিনি জানবেন, এ দেশে লিখে, কেবল লিখেই একজন মানুষ তার অনেক স্বপ্ন পূরণ করতে পারে। হুমায়ূন আহমেদ, আপনি তারুণ্যের সামনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিবার্য এক উদাহরণ। আপনাকে পড়ে অনাদিকালের বাংলাভাষার তরুণ লেখক জানবেন—কলম হাতেই সমুদ্র সাঁতরে পার হওয়া যায়!... আপনার মতো আর কেউ নাই।

তারপরও কষ্ট হয়—নিয়তির এই অমোঘ কাণ্ডকারখানা দেখে! এমন প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর মানুষটিকে কেন এত আগেভাগে চলে যেতে হবে ? এ ক্ষেত্রে নিশ্চুপ নীরবতা পালন করা ছাড়া আমাদের আর উপায় থাকে না।

... প্রিয় হুমায়ূন আহমেদ, আপনার প্রিয় নুহাশপল্লীর বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তরে ঘুমান আপনি; এখানে পূর্ণিমার উথাল-পাথাল জোয়ার আসবে, আসবে শ্রাবণের ঘোর ধারা, প্রখর সূর্যালোক আপনাকে ঘিরে রাখবে কখনো কখনো, সুনসান নীরবতায় আপনি থাকবেন আপনার নিজের মতো; যেমনটি সারা জীবন চেয়েছেন—ঈষৎ হাস্যময় মুখে আপনি জীবনের দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসবেন ...আহা! মানুষেরা এমন করে কেন ?

... আমরা কতকিছুই না করব... প্রেমে-বিরহে-জীবনযাপনের নানা কষ্টে-আনন্দে আমাদের একজন ব্যাখ্যাকারের কথা মনে পড়বে। আমরাও আপনার মতো প্রবলভাবে জীবনকে ভালোবাসব, সন্তানকে বুকে চেপে ধরে বেঁচে থাকতে চাইব, কেউ কেউ মরে যাব, কেউ আবার প্রাণপণে বেঁচে থেকে জীবনের ছোট ছোট আনন্দগুলো দু'হাতে চেটেপুটে খাব। হুমায়ূন আহমেদ, আপনি সেই অতুল ব্যাখ্যাকার, আপনি বলেছিলেন—'দিতে পারো এক শ' ফানুস এনে/ আজন্ম সলজ্জ সাধ/ আকাশে কিছু ফানুস উড়াই...'

আমাদের সকল সলজ্জ সাধে আমরা আপনাকেই খুঁজে নেব।

আর, আপনাকে খুঁজে নেওয়ার পাথেয় হবে আপনার গ্রন্থের পর গ্রন্থ; যেখানে আছেন এমন এক লেখক যিনি জীবনকে ভালোবাসেন, জীবনকে উদ্‌যাপন করতে জানেন, যিনি জাদুকরী দক্ষতায় অনর্গল বলে যান জীবনেরই গল্প। আর এভাবে জীবনের মতো মৃত্যুর পরও আপনি বেঁচে থাকার লড়াইয়ে নিশ্চিত জিতে যাবেন, যত দিন আমরা—এইসব মানুষেরা 'মৃত্যুর হাত ধরে স্বপ্ন দেখতে চাইবো' ততদিন আপনি বেঁচে থাকবেন, প্রিয় হুমায়ূন আহমেদ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে কিছু কথা

মাহমুদ আল জামান

হুমায়ূন আহমেদ বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ভুবনে লোকপ্রিয় লেখক। খ্যাতির শীর্ষে তাঁর অবস্থান। বাংলাদেশের কোনো লেখকের বোধকরি এত অধিক পাঠক নেই। তাঁর যে-কোনো গ্রন্থই বহুল পঠিত ও আলোচিত হয়ে থাকে। বিশেষত নবীনদের মধ্যে তিনি ব্যাপকভাবে পঠিত হন। সেদিক থেকে তাঁর জনপ্রিয়তা ঈর্ষণীয়। একুশের বইমেলায় তিনি হয়ে ওঠেন প্রধান আকর্ষণ। নবীনরা খুঁজে পান নিজেকে। নিজেদের জগৎ, বেদনা ও দুঃখকষ্ট তাঁর লেখনীর মধ্যে পেয়ে যান বলে তিনিই হয়ে ওঠেন নবীনদের আইডল। বাংলাদেশের নবীনদের মধ্যে তাঁর এই জনপ্রিয়তা উপন্যাস পাঠের দিগন্তকে ও সাহিত্যের রুচি নির্মাণকে ত্বরান্বিত করেছে, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

তাঁর লেখনীর মধ্যে এক জাদুকরী বিষয় থাকে। তিনি তাঁর রচিত উপন্যাসের মধ্যে এমন এক পরিবেশ এবং চরিত্র নির্মাণ করে থাকেন, যা খুব চেনা [illegible] বটেই অনেক পাঠক এতে আশ্চর্য সাযুজ্যবোধ করেন।

বিশেষত মধ্যবিত্তের মনোজগৎ হুমায়ূনের নখদর্পণে বলে তিনি এই জগতের মানুষজনের দুঃখ ও বেদনাকে নিখুঁতভাবে রূপায়ণ করেন। বহুতর পাঠক এর মধ্যে নিজেকে বারবার আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারই তাঁকে এদেশের নন্দিত লেখক করে তুলেছে।

হুমায়ূন আহমেদের এই সাফল্য একদিনে অর্জিত হয় নি। তাঁকে নিরন্তর পরিশ্রম করতে হয়েছে। তাঁর সৃষ্ট বিপুল বৈচিত্র্যময় উদ্যানের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই খুব সহজেই উপলব্ধি করা যায় লেখনীর জন্য তিনি নিশ্চিতই এক শৃঙ্খলা মেনে চলতেন। যে-কোনো সৃষ্টিশীল মানুষ অন্তঃপ্রেরণা ও আনন্দের জন্য যে লেখনীর দায় স্কন্ধে নিয়ে নিরন্তর লেখালেখি করেন, হুমায়ূন আহমেদও ছিলেন সেই ধারারই লেখক। আমরা মুগ্ধ হয়েছি তাঁর ক্ষমতায়, স্বাচ্ছন্দ্যে, তাঁর জীবন রূপায়ণের কৌশলে। রীতিমতো সাধনা করে তিনি এ অর্জন করেছেন। সেজন্যই বোধকরি লেখালেখির ভুবনটি যখন তাঁর ব্যক্তিত্ব ও লেখক সত্তায় প্রধান হয়ে উঠল এবং নিজে অনুধাবন করলেন বৃহত্তর বোধ ও বুদ্ধির মধ্য দিয়ে সাহিত্যের জগতে তাঁর দেবার আছে তখনই শিক্ষকতার চাকরি থেকে সরে এসে সাহিত্যকেই ধ্যান-জ্ঞান করেছিলেন। মধ্যবিত্তের জীবন অনুষঙ্গী ঘটনাবলি তাঁকে দারুণভাবে আলোড়িত ও পীড়িত করে বলে তাঁর গল্প-উপন্যাসের উপজীব্য হয়ে ওঠে মধ্যবিত্তের ভুবন। উদীয়মান মধ্যবিত্তের দুঃখকষ্টকে আমরা দেখেছি পঞ্চাশের দশকের বাংলাদেশের সাহিত্যে। সে মধ্যবিত্ত বিকাশোন্মুখ ছিল। তাঁর ভাবনার স্বপ্নও সীমিত ছিল। গণ্ডির মধ্যে আর্থনীতিক কষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। আর ষাটের মধ্যবিত্ত সকল দিক থেকে হয়ে উঠেছিল আরো প্রসারিত। স্বাধীনতা-উত্তরকালে আশি ও নব্বইয়ের দশকে এই মধ্যবিত্তই রাষ্ট্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনুকূল্যে কেমন করে উচ্চবিত্তে পরিণত হয়েছিল এ কথা সকলের জানা। এই সময়ের মধ্যবিত্তের উঠতি সন্তানের উচ্চাশা, স্বপ্ন-বেদনা-কষ্টই আশ্চর্য এক সংবেদনে ধরা পড়েছে এই লেখকের নানা রচনায়। যেখানে দুঃখকষ্ট, হাসি-কান্নার সঙ্গে মিশে আছে আনন্দ-বেদনার আশ্চর্য এক জগৎ এবং নিত্যদিনের টানাপড়েন।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নন্দিত নরকে' পাঠ করবার পর আমাদের মানসদিগন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। মানবিকবোধের উজ্জ্বল প্রকাশে আমরা চমৎকৃত হয়েছিলাম। দ্বিতীয় উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে তাঁর মানসযাত্রা খর প্রবাহিনী হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে 'জোছনা ও জননীর গল্পে' তাঁর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত উপন্যাসে জীবনবোধ ও যুদ্ধকালীন দিনগুলোর অসহায়তা প্রত্যক্ষ করেছি। মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে বাংলাদেশে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প রচিত হলেও খুব বেশি উপন্যাস রচিত হয় নি। হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসটি সেদিক থেকে আমাদের সাহিত্যে উজ্জ্বল ও ব্যতিক্রমী সৃষ্টি বলে প্রতীয়মান হয়েছিল।

২

হুমায়ূন আহমেদ কত জনপ্রিয় লেখক ছিলেন এবং দুটি প্রজন্মের সদ্য যৌবনে পদার্পণ করেছেন এমন লাখ লাখ পাঠকের হৃদয়কে কীভাবে তাঁর অনুরাগী পাঠক করেছিলেন এ আমরা তাঁর মৃত্যুর পর নতুন করে অনুধাবন করেছি। বইমেলা কিংবা সমাবেশে তাঁর স্বাক্ষর সংগ্রহ এবং কখনো উপস্থিতির সময় নবীন-নবীনাদের উপচেপড়া ভিড় আমাদের অনেকের কাছে মনে হয়েছিল এ ক্ষণিক আবেগ, সাময়িক উত্তেজনা। কিন্তু আমরা তলিয়ে দেখতে চাই নি হুমায়ূন এই নবীন পাঠকদের স্বপ্নমঞ্জরি, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং দুঃখ-বেদনাকে নিয়ে যে জগৎ সৃষ্টি করছেন এ কত দিক থেকে ছিল প্রাণময় ও তাৎপর্যময়। তিনি সে-সময়ে তাঁর সৃজন নিয়ে এবং মধ্যবিত্তের যে স্বপ্নময় ভুবন নির্মাণ করেছেন তা এই নবীনদের মধ্যে এক চেতনা সঞ্চার করেছিল। হুমায়ূন-সমালোচক অনেকেই এমত ধারণা পোষণ করেন যে, তাঁর সৃষ্টজগৎ মায়াময়। প্রতিবাদ নেই এতটুকু, না, বিদ্রোহী করে তোলে না পাঠকের হৃদয়। বাস্তবের সঙ্গে এ ভুবনের এতটুকু মিল নেই। এ জগৎ সৃষ্টি করে হুমায়ূন তাঁর পাঠকদের স্বপ্নবিলাসী করে তুলেছিলেন। আমি এ প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলতে চাই। এই লেখক নবীনদের স্বপ্নবিলাসী করে তুলেছিলেন, সে কথা ঠিক। কিন্তু তিনি তাদের অনুভূতির জগতকে করেছিলেন মানবিক।

তাঁর সৃজনকালের উজ্জ্বল সময়ে নবীনদের মানবিকতার সাধনা খুবই প্রয়োজন ছিল। নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সমাজের এই নবীন পাঠক মানবিক চৈতন্যে বলীয়ান হয়েছে তাঁর বই পড়ে। একটু একটু করে উপলব্ধি করেছে সমাজের অসংগতি কোথায়। সমাজের সর্বগ্রাসী হতাশা, বেকারত্ব, গণতন্ত্রহীনতা, বঞ্চনা, স্বৈরাচারীর উত্থানপীড়ন, যুব সমাজের এই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার আকুলতার পটভূমিতে হুমায়ূন আহমেদের সৃজন। তাঁর সৃজন এই সময়ে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়েছিল। এই সময়ের কোনো উজ্জ্বল ছাপ বা প্রতিবাদ ছিল না বটে তাঁর সৃষ্টিতে, তা কিন্তু তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। উচ্চবিত্তের অন্তঃসারশূন্যতায় হুমায়ূন আহমেদ কখনো যে কষাঘাত করেন নি তা নয়। বেশ তীব্র ও জোরালোভাবে আক্রমণ করেছেন। আবেগ ছিল মানুষের জন্য, সহমর্মিতা নবীন বোধে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। পাঠক একাত্মতাবোধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে। এই অনুষঙ্গই তাঁর সৃজনে নতুন মাত্রা দান করেছিল। মানুষের দুঃখকষ্ট, বেদনা ও স্বপ্নের সম্মিলনে তিনি পাঠকদের যে অনুভূতির জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, এই জগতই তাঁকে লোকপ্রিয় করে তুলেছিল। উপন্যাস ও গল্প রচনার পর তিনি এমন কিছু নাটক রচনা করেন যেখানে পাঠক সাযুজ্যবোধ করেছেন সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে, যে চরিত্র কিছুটা খাপছাড়া দিশাহীন নিঃসঙ্গতাড়িত। হুমায়ূন আহমেদ আমাদের এই চেনা জগতকে এমন এক ভাষায় তুলে এনেছিলেন, যে ভাষা হয়ে উঠেছিল পাঠকের নিজস্ব। ছোট ছোট বাক্য ও শব্দবন্ধ, সংলাপের প্রত্যুৎপন্নমতিতা, কথার পিঠে কথা বলার ধরন এই সাহিত্যিককে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। এক বৈঠকে গ্রন্থটি পাঠ শেষ হওয়ার পর কিছুক্ষণ এক ঘোরলাগা হাহাকার ওঠে বুকে। আমার একটি প্রিয় গ্রন্থ *মধ্যাহ্ন*।

এই সময়ের এমন কিছু তরুণ-তরুণীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে আমরা জেনেছি, কেমন করে হুমায়ূন পাঠের পর একটু একটু করে বই পড়ার অভ্যাস তাঁদের গড়ে উঠেছিল। না, এই সময়ের রাজনীতি তাঁদের আকৃষ্ট করে নি। কোনো আদর্শিক প্রতিষ্ঠান ছিল না বলে তাঁরা ছিলেন হতাশাগ্রস্ত। এই পাঠই তাঁদের ক্রমে সাহিত্যের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে প্রবেশে সহায়তা করেছে। বাংলা সাহিত্যিকদের স্বপ্ন জাগানিয়া গল্প-উপন্যাস পাঠ করতে বা রস গ্রহণ করতে তাঁদের কোনো অসুবিধা হয় না।

এই একটি গ্রন্থ 'মধ্যাহ্ন' পাঠ করে তাঁর সৃজনধারা যে কত তাৎপর্যসঞ্চারী এবং জীবন-অনুষঙ্গী হয়ে উঠছে আমরা নতুন করে তা উপলব্ধি করেছি। এ যে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে লেখা এবং অখণ্ড মনোযোগসহকারে তা *মধ্যাহ্নের* ঘটনাপ্রবাহ থেকে উপলব্ধি করা যায়। সময় তার হাতে কীভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এ যেন তারই মনোগ্রাহী রূপায়ণ। ইতিহাস নয়, ইতিহাস-আশ্রিত প্রভাব ও অভিঘাত, কখনো পরিপার্শ্ব এবং একটি জনপদ যেন জেগে উঠল তাঁর হাতে। বাঙালির জীবনযুদ্ধ ও স্বপ্নকে বৃহৎ ক্যানভাসে তুলে ধরবার জন্য তিনি হয়ে উঠলেন শ্রদ্ধেয়। তিনি যে শুধু মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার নন, বৃহত্তর জীবন-অনুষঙ্গী ভাবনাও যে তাঁকে হনন করেছে এই উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের বিশ্বস্ত রূপায়ণে তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

হুমায়ূন উপন্যাসে বর্ণিত একটি অঞ্চলের বাঙালির জীবন পরিধির শাশ্বত ও চিরায়ত ধারাকে বৃহত্তর ও মহত্তর অনুষঙ্গে ধরতে চেয়েছেন। কাল পরিধির দিক থেকে বিবেচনা করলে শতবর্ষের অধিক সময়কে তিনি ধরেছেন অখণ্ড *মধ্যাহ্নে*। একটি জনপদের মানুষজনের জীবনের দুঃখ-বেদনা উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। এই জনপদের দুই সম্প্রদায়ের সমন্বিত ধারার যেমন সন্ধান পাই, তাঁর রচিত ক্যানভাসের চরিত্র চিত্রণে তেমনি আছে শতবর্ষের রাজনৈতিক ঘটনাবলির স্পর্শে জেগে ওঠা মানুষজনের মনোভঙ্গি। ব্রিটিশ রাজত্বে তৎকালীন বৃহত্তর বাংলার রাজনীতি ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক, গ্রামীণ সমাজের বাস্তবতা, জমিদারি ব্যবস্থায় গ্রামীণ মানুষের দুরবস্থা এবং মুসলমানদের অন্তঃপুরে নারীর অবস্থান। তালাক ও বহুবিবাহের ফলে তৎকালে নারীর জীবন হয়ে উঠত নরকতুল্য। এও বর্ণনায় উঠে এসেছে। আবার কখনো দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার মানবিক সম্পর্কও আমরা দেখতে পাই। হিন্দু-মুসলমানদের সম্পর্কের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমন্বিত প্রবহমান ধারার সন্ধান পাই। এই উপন্যাসটি পাঠ করবার পর ধনু শেখ, শশাঙ্ক, হরিচরণ, লাবুস, জুলেখা, মওলানা ইদ্রিস, বিপ্লবী জীবনলালের মতো অসাধারণ চরিত্র পাঠকের চেতনার দিগন্তকে প্রসারিত করবে বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে।

এই উপন্যাসে হুমায়ূন আহমেদ অনিন্দ্যসুন্দরী, সুধা কণ্ঠের অধিকারী গ্রামীণ রমণী জুলেখা চরিত্রটি আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে নির্মাণ করেছেন। বিসংবাদী দুটি চরিত্রের দাম্পত্যজীবন সুখের হয় নি। ভেঙে গেছে আকস্মিক তার সংসার। যে-কোনো পাঠক খেয়ালি অথচ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে দৃঢ় এই চরিত্রটির সঙ্গে একাত্মবোধ করেন। আকস্মিক সংসার বিতাড়িত বঙ্গের বহু নারীর বঞ্চিত বিড়ম্বিত জীবনের শেষ ঠাঁই হতো নিষিদ্ধ পল্লীতে। বেঁচে থাকার জন্যও গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র উপায় ছিল দেহ। বহু গুণের অধিকারী সরল অথচ বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল গ্রামীণ রমণী জুলেখার ঠাঁই হলো জনপদ সংলগ্ন পতিতালয়ে। আমরা বিস্মিত হয়ে লক্ষ করি, পতিতালয়ে সে হারিয়ে যায় নি, বিলীন হয় নি।

হিন্দু ও মুসলমানের জীবনদৃষ্টি, কুসংস্কার ও জীবনাচরণের অনুপুঙ্খ এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাবলি, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও স্বাধীনতার স্বপ্ন, স্বদেশি আন্দোলনের কোনো কোনো ঘটনাও 'মধ্যাহ্নে' অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে। হুমায়ূন আহমেদ একটি জনপদের মানুষজনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরার পাশাপাশি একটি কালি পরিধিকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর সময়-চেতনা এবং কাল-চেতনাও ভিন্নমাত্রা সঞ্চার করেছে। উপন্যাসটি শেষ হয়েছে '৪৬-এর ভয়াবহ দাঙ্গা ও দেশভাগের অনিবার্য আভাস দিয়ে। তিনি সার্থকতা অর্জন করেছেন বৃহৎ কলেবরের এই উপন্যাসে। এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমরা হুমায়ূনের শক্তিমত্তা, উদ্ভাবনী কৌশল, জীবনের বৃহত্তর পরিসরকে ধরবার আকাঙ্ক্ষার নব রূপায়ণ দেখেছি। এতদিন তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত জীবনের অতলস্পর্শী বোধকে ছুঁয়ে গেছেন। এই উপন্যাসে স্বপ্ন দেখতে দেখেছি একটি জনপদের লোকসাধারণকে। তিনি জীবনের জটিলতাকে যেমন ধরেছেন, তেমনি উন্মোচন করেছেন বৃহত্তর জীবনবোধ। যেখানে একটি অঞ্চলের মানুষজনের জীবনসংগ্রাম নতুন মাত্রা পেয়েছে। অমোঘ ও নিবিড়ভাবে ধরা পড়েছে 'মধ্যাহ্নে'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি পূর্ণিমার চাঁদ ছুঁয়েছি

মুনিয়া মাহমুদ

মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে ওয়াশিংটন ডিসিতে চেরি ব্লজম ফেস্টিভল শুরু হয়। তখন সেখানে প্রায় চৌদ্দ হাজার চেরি গাছ সাদা, নীল, গোলাপি নানা বর্ণের গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলে ঢেকে গিয়ে অভাবনীয় এক স্বর্গীয় দৃশ্যের অবতারণা হয়। নানা দেশ থেকে হাজার হাজার পর্যটকের মুখরিত পদচারণা চলে। ফেসবুকও চেরিফুলের ছবিতে সয়লাব হয়। আমার দুই ছেলের স্কুল কয়েকদিনের জন্য বন্ধ, তাই ঠিক করলাম এই ফাঁকে চেরি ব্লজম ফেস্টিভল দেখে আসব।

যাওয়ার দুদিন আগে এক সন্ধ্যায় হুমায়ূন পরিবারের বাসায় উপস্থিত হলাম। ওঁরা আমাদের এলাকাতেই থাকেন। গাড়িতে পাঁচ মিনিটও লাগে না। হুমায়ূন আহমেদ আমাদের এলাকা জ্যামাইকাতে উঠেছেন শুনে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারি নি। কারণ এই এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকজন বাঙালি এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর।

৯০ এভিনিউয়ের ১৪৮ নম্বর দোতলা বাড়ির দ্বিতীয় তলায় হুমায়ূন আহমেদ সপরিবারে থাকেন। আমরা দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজার সামনে দাঁড়ালাম। দরজা সবসময়ের মতো খোলা। দরজায় একটু ধাক্কা দিয়ে 'নিনিত বাসায় আছে নাকি' হাঁক দিতেই ওকে দেখা গেল। আমার স্বামী নূর ওকে কোলে তুলে নিল। এরপর ড্রইংরুমের কালো সোফার ওপর বসে আলাপের ফাঁকে আমরা চেরি ব্লজম ফেস্টিভলের কথা তুললাম। হুমায়ূন ভাই (সবাই তাঁকে স্যার বললেও আমি ভাই বলে ডাকতাম) সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আমরা তো মেরীল্যান্ড যাচ্ছি। তোমরাও আমাদের সঙ্গে চলো। সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে গেল। শাওন জানাল, ওদের প্রোগ্রামে ওয়াশিংটন ডিসিতে চেরিব্লজম ফেস্টিভল অন্তর্ভুক্ত আছে। যাই হোক, শাওন বসে গেল ফোন নিয়ে হোটেলে আমাদের চারজনের বুকিং দেওয়ার জন্য। মেরীল্যান্ডে হুমায়ূন আহমেদের কয়েকজন ভক্ত এই ভ্রমণের আয়োজন করছে তখন। বুকিং দেওয়া শেষ। পড়লাম একটা ছোট্ট ঝামেলায়। আমাদের আগের প্রোগ্রামে একজন বন্ধুর যাওয়ার কথা। তাকে কীভাবে না করি এ নিয়ে একটু চিন্তিত হলাম। শাওনকে অন্য রুমে নিয়ে এই বিষয়টা জানাতেই ও বলল, কোনো চিন্তা নাই, ওকে জিজ্ঞেস করি। ও ভালো বুদ্ধি দিতে পারে।

যথারীতি ড্রইংরুমে বসে শাওন অতি সিরিয়াসভাবে হুমায়ূন ভাইকে আমার সমস্যার কথা জানাল। তিনি এক মুহূর্ত নিলেন না জবাব দিতে। বললেন, তাকে বলো একা একা বাসে চেপে চলে যেতে।

আমরা সবাই তাঁর কথায় হাসলাম। কারণ তিনি প্রতি মুহূর্তে রসিকতা করতেন। তখন আমাদের পরিবারের সঙ্গে ওদের পরিচয় মাত্র পাঁচ মাসের, মাজহার (মাজহারুল ইসলাম)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইয়ের মাধ্যমে। তিনি তখন দেশে। আমরা হুমায়ূন পরিবারের সঙ্গে ঘুরব, এটা তো একটা স্বপ্নের মতো লাগছে আমার কাছে। তবে হুমায়ূন ভাইকে যখন কাছ থেকে দেখতাম তখন বিশ্বাস হতো না যে এই ব্যক্তি সেই বিখ্যাত আকাশছোঁয়া জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদ। একদিন তো সেটা বলেই বসলাম। বললাম, আমার কাছে মনে হয় লেখক হুমায়ূন আহমেদ নুহাশপল্লীতে আছেন। আর আপনি নকল হুমায়ূন আহমেদ। আমার এরকম অনুভূতির অনেক কারণও ছিল। উনাকে সবসময় অতি সাধারণ বেশে দেখেছি। দেখেছি সাধারণ স্বামীদের মতো একটুতেই 'কুসুম কুসুম' (শাওনকে কুসুম বলে ডাকতেন) করছেন, আর নিনিত কিছুক্ষণ পর পর উনার কোলে উঠছে আর নামছে, নিষাদ কিছু না কিছু বলছে। আমার চোখের সামনে ভাসত অতি সাধারণ এক সুখী পরিবারের ছবি। অসম্ভব ছিল তাঁর মনের শক্তি। অসুস্থতার কোনো লক্ষণ দেখা যেত না। অথচ তখনো তিনি কেমো নিচ্ছেন।

নির্ধারিত দিন ৬ এপ্রিল সকাল ন'টায় আমরা রওনা হলাম। শাওনরা যাচ্ছে হুমায়ূন ভাইয়ের ছেলেবেলার বন্ধু ফাংশু মণ্ডলের গাড়িতে। ফাংশু ভাইয়ের সঙ্গে স্বপ্না ভাবিও আছেন। আমাদের গাড়িতে আমাদের দুই ছেলে ও আমরা। গাড়িতে আমার ও শাওনের মধ্যে সেল ফোনে একটু পর পর কথা হচ্ছে। ঠিক করা হলো নিউ জার্সিতে গিয়ে রেস্ট এরিয়াতে আমরা থামব। সেদিনের আবহাওয়া ছিল চমৎকার। পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ। কথামতো রেস্ট এরিয়াতে আমাদের গাড়ি ঢুকতেই দেখলাম, হুমায়ূন ভাই দেড় বছরের নিনিতকে হাতে ধরে নিয়ে পার্কিং লট পার হচ্ছেন। আমরা সবাই ভেতরে ঢুকে দুটো টেবিল জুড়ে বসলাম। স্বপ্না ভাবি, শাওন ও নুর খাবার আনতে গেল। নিনিত তখনো বাবাকে ছাড়ছে না। বাবার কোলে ঘাপটি মেরে বসে আছে। আমি বাপ-ছেলের একটা ছবি তুললাম। সবার খাবার হাজির হলো। সবসময় দেখেছি খাওয়া নিয়ে নিষাদ বেশি ঝামেলা করে। শাওনের নাভিশ্বাস উঠে যায় এই দুই পুত্রকে খাওয়াতে। হুমায়ূন ভাই আবার পুত্রদ্বয়ের স্বাধীনতায় অতি বিশ্বাসী। যা হোক, কথায় কথায় জানলাম ওনার বন্ধু ফাংশু মণ্ডলের আসল নাম নুরুজ্জামান মণ্ডল। আমি তখনই বলে উঠলাম, আমার বাবার নামও তো নুরুজ্জামান। হুমায়ূন ভাই বলে বসলেন, তুমি তাহলে ওকে বাবা বলে ডাকো। আমি বললাম, না, অবশ্যই ডাকব না। আমার বাবা আমি কারও সঙ্গে শেয়ার করব না। এ নিয়ে আরেক প্রস্থ হাসাহাসি চলল। সবাই বাথরুম সেরে ও টেবিল পরিষ্কার করে রওনা হলাম। আমাদের সবার মনে খুশির জোয়ার বইছে। ঠিক হলো আরেক রেস্ট এরিয়ার পর আর থামা হবে না। সোজা মেরীল্যান্ডে। আমরা প্রায় দু'ঘণ্টা পর ডেলোয়ারের ভিজিটর সেন্টারে থামলাম। খুবই সুন্দর রেস্ট এরিয়া। অনেক খাবারের দোকান। শাওনদের খোঁজে ফোন করলাম। ও জানাল ওরা ডেলোয়ারে ছাড়িয়ে গেছে। শুনে ভাবলাম, এত তাড়াতাড়ি কীভাবে ওরা আমাদের ক্রস করল! যাই হোক, এরপর বাল্টিমোর টার্ণপাইক থেকে শুরু হলো ভয়াবহ জ্যাম। গাড়ি চলে না, নড়েও না। পাঁচ-দশ মিনিট পরপর এক কদম চলছে। প্রায় তিন ঘণ্টা এভাবেই কাটল। ভাবছি হুমায়ূন ভাই ও বাচ্চাদের না জানি কত কষ্ট হচ্ছে। শাওনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না। সিগন্যাল মিসিং। যাহোক, জ্যামের ভয়াবহ জট খুলতেই গাড়ি ছুটে চলল। এরপর শাওনকে পাওয়া গেল। ওরা প্রায়-দু'ঘণ্টা পেছনে আমাদের। জিজ্ঞেস করলাম, কোথাও অপেক্ষা করব নাকি। ও বলল, না, সোজা হোটেলে উঠে যান। জানলাম কাজল ও নজরুল ইসলাম নামে দুজন হুমায়ূন-ভক্ত সেখানে আছে। ওদের ফোন নম্বর নিলাম।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকেল ছয়টার সময় হোটেল শেরাটনের পার্কিং লটে পৌঁছালাম। সেখানে দেখলাম অতি সজ্জন, হাস্যমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন যুবক বয়সী কাজল ও নজরুল ইসলাম। আমাদের রুমে পৌঁছে দিয়ে ওরা চলে গেল হুমায়ূন ভাইদের আনার জন্য। হুমায়ূন ভাইদের জন্য তখনো রুম ঠিক করা হয় নি। কারণ তিনি কোন রুম পছন্দ করবেন সেটা তো ওরা জানে না। যাওয়ার আগে ওরা বলে গেল রাতে নজরুল ভাইয়ের বাসায় ডিনার খাওয়ার কথা। রুম দেখে আমি ভীষণ আনন্দিত। কারণ রুমের বিশাল কাচের জানালা দিয়ে একদিকে ঘন সবুজ জঙ্গল ও আরেকদিকে সুইমিংপুল দেখা যাচ্ছে। মনোরম দৃশ্য। কিছুক্ষণ পর আমার আনন্দে একটু ভাটা পড়ল। কেননা আমার নয় বছরের ছোট ছেলে আয়ানের মাথাটা গরম লাগছে। ও সাধারণত শুয়ে থাকার ছেলে না। বিছানায় গা এলিয়ে পড়ে আছে। থার্মোমিটার দিয়ে দেখতেই দেখা গেল এক শ তিন ডিগ্রি জ্বর। ওকে দুটো এডভিল খাইয়ে তাড়াতাড়ি হোটেল রুমের বাথরুমের দুধসাদা ছোট তোয়ালে ভিজিয়ে জলপট্টি দেওয়া শুরু করলাম। মনে মনে দোয়াদরুদ পড়ছি। হে আল্লাহ, একি বিপদে ফেলেছ আমায়!

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ওরা হোটেলে প্রবেশ করল। আমি তো নিশ্চিত হুমায়ূন পরিবার হোটেলের লাক্সারি স্যুইটে উঠবে। আমি আশ্চর্য হলাম, দেখি ওরা সবাই আমাদের রুমের পাশে এসে হাজির হয়েছে। আমাদের উল্টোদিকের রুমে ফাংশু ভাবী এবং পাশের একটা রুম পরে শাওনদের জন্য রুম ঠিক করা হলো। পরে জেনেছিলাম, হুমায়ূন ভাইকে অনেক সাধাসাধি করা হয়েছিল লাক্সারি স্যুইটে থাকার জন্য। তিনি রাজি হন নি। বলেছেন আমাদের সবার সঙ্গে থাকবেন।

কিছুক্ষণ পর কাজল-নজরুল গ্রুপের সঙ্গে কবির মামা এসে যুক্ত হলেন। তিনি যে ভীষণ অমায়িক বিনয়ী একজন ভদ্রলোক তা একটু কথাতেই বুঝলাম। দেখলাম তিনি হালকা নীল রঙের পোস্টঅফিসের শার্ট পরে আছেন। বুঝলাম কাজের জায়গা থেকে সরাসরি এখানে হাজির হয়েছেন। ওরা এরুম ওরুম ছড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে আমাদের সবার সঙ্গে। কিছুক্ষণ পর কিছু মহিলা এসে শাওনের হাতে ফুলের তোড়া উপহার দিল। পরে অবশ্য ওদের সবার সঙ্গে ভালোমতো পরিচয় হয়েছে।

তিন ঘণ্টা জ্যামের পরেও হুমায়ূন ভাইয়ের চেহারায় ভ্রমণের ক্লান্তির কোনো চিহ্ন নেই। আমি ভেবেছিলাম হোটেল রুমে তিনি হয়তো একটু রেস্ট নেবেন। কিন্তু তাঁকে রেস্ট নিতে দেখলাম না। তিনি যে একজন ক্যানসার রোগী না বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। রাত ন'টার দিকে আমরা সবাই নজরুল ভাইয়ের বিশাল প্রাসাদের মতো বাড়িতে উপস্থিত হলাম। হুমায়ূন ভাইয়ের চেহারা তখন আনন্দে উদ্ভাসিত। নিনিত, নিষাদ, শাওন সবাই আমরা হইচই করতে করতে ওদের বিশাল ড্রইংরুমে প্রবেশ করলাম। হুমায়ূন ভাই সোফায় বসলেন না। সোজা গিয়ে ফায়ার প্লেসের সামনে কার্পেটের ওপর বসলেন। সবার সঙ্গে সমানে গল্প চালিয়ে গেলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সবাই তাঁর কথা শুনছে। ভিডিও ও ক্যামেরার ফ্লাশ ক্ষণে ক্ষণে জ্বলছে। তিনি এতে মোটেও বিরক্তি প্রকাশ করছেন না।

খাওয়ার জন্য ডাইনিং টেবিলে যখন ডাক পড়ল তখন টেবিল দেখে আমি হতভম্ব। আমার মনে হচ্ছিল আলাউদ্দিনের চেরাগ ঘষার পর দৈত্য এসে টেবিল খাবারে পরিপূর্ণ করে দিয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল ভাইয়ের স্ত্রী তানিয়া অতিথিদের মিষ্টি হাসি দিয়ে অতি আন্তরিকতার সঙ্গে **খাবার তদারকি** করল। কাজল ও নজরুলও টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। আজ হুমায়ূন ভাইয়ের মুখের রুচির সমস্যা হলো না। তিনি সব খাবারই একটু একটু করে খেলেন। গল্প আর খাওয়াদাওয়া একসঙ্গেই চলল। হোম থিয়েটারে মুভি দেখে এবং অনেক গল্পগুজব করে আমরা রাত একটার দিকে হোটেলে ফিরলাম।

হোটেলে ফিরেই দেখি আয়ানের জ্বর ফিরে এসেছে। ওদের নিয়ে এত জায়গায় ঘুরেছি কখনো এমন হয় নি। মনে মনে ভাগ্যকেই দোষ দিচ্ছি। ওকে ওষুধ খাইয়ে দিলাম।

পরদিন সকালে দরজায় নক। দরজা খুলে দেখি ফাংশু ভাই একটা প্লেটে ফল নিয়ে এসেছেন। বললেন, হুমায়ূন দিয়েছে। জানলাম তিনি সকালে উঠে আপেল, আঙুর, পেঁপেসহ নানা ফল কেটে আমাদের দু'রুমে পাঠিয়েছেন। আয়ানের জ্বরের খবরও নিলেন।

আমরা সবাই নাস্তা সেরে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়াতে লুরে ক্যাভার্ন গুহা দেখতে বের হলাম। নজরুল ভাইয়ের গাড়িতে হুমায়ূন ভাইরা। আর আমাদের গাড়িতে অন্যরা সবাই। কারণ তিনটা গাড়ির দরকার নেই। প্রায় দু'ঘণ্টা লাগল পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে সেখানে পৌঁছাতে। মাঝখানে অবশ্য একটা রেস্ট এরিয়ায় কিছুক্ষণের জন্য থামা হলো। সেখানে হুমায়ূন ভাই বাচ্চাদের জন্য চিপস্ কিনলেন। দোকান থেকে বের হয়ে কিছুক্ষণ ঘুরলেন। আমাদের সবার সঙ্গে ছবি তুললেন। আমরা লুরে ক্যাভার্নে পৌঁছে টিকিটের জন্য অপেক্ষা করছি। এদিকে হুমায়ূন ভাই ও শাওন গিফটশপে গেছে। আমি একটু পরে দেখি দাড়িওয়ালা একটা লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমি চিনতে পারছি না। মুহূর্তেই জোরে হেসে দিলাম। হুমায়ূন ভাই জানালেন তিনি আব্রাহাম লিংকন হয়েছেন। আমরা সবাই তাঁর এই কাণ্ড দেখে সেদিন ভীষণ হেসেছি।

ক্যাভার্নের ভেতরে ঢুকে স্ত্রী শাওনের ভারী ক্যামেরা দিয়ে তিনি একের পর এক ছবি তুলেই গেলেন। এদিকে উনার মুখের ছবিও সমানে নজরুল ভাইদের ভিডিও ক্যামেরা চলছে। আমিও কিছু কিছু ছবি তুলছি। ভয়াবহ সুন্দর গুহা দেখে আমরা সবাই মুগ্ধ। হাঁটতে হাঁটতে আমার দু'পা ভারী হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে কোথাও ধপাস করে বসে পড়ি। এত ক্লান্ত লাগছে। অথচ তখনো হুমায়ূন ভাই আনন্দচিত্তে হাঁটছেন।

দিনটা ভীষণ আনন্দে কাটল। একটা ম্যাক্সিকান রেস্টুরেন্টে আমরা খেতে বসলাম। আমাদের টেবিলের কোনাকুনি অবস্থানে হুমায়ূন ভাই ও শাওন বসেছে। সব টেবিলে বেয়ারা প্লেটভর্তি করে নাচো দিয়ে গেছে। আমরা সস দিয়ে খাচ্ছি। হুমায়ূন ভাই আমার দিকে ইশারা করে শাওনকে বলল, দেখো লেখিকা সব খেয়ে শেষ করে ফেলল।

পাঠক ক্ষমা করবেন। এই মুহূর্তে আর লিখতে পারছি না। মন ভার হয়ে গেছে। পরে হয়তো বাকিটুকু লিখব। কিংবা হয়তো কোনোদিনই আর লেখা হয়ে উঠবে না। শুধু এটুকু বলে শেষ করছি, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় আমি আমার অতি প্রিয় লেখকের সঙ্গে কাটিয়েছি। মাত্র নয় মাসে পূর্ণিমার চাঁদকে স্পর্শ করতে পারা এমন সৌভাগ্যবতী মহিলা আমি ছাড়া এই পৃথিবীতে আর কে আছে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদ ও যত কথা

মুনীর আহমেদ

হালকা-পাতলা গড়ন, গায়ে হাওয়াই শার্ট, পায়ে স্যান্ডেল, চোখে পুরু চশমা। তরুণটিকে সঙ্গে নিয়ে এক বন্ধু আমার হলের রুমে এল। সঙ্গের তরুণটির পরিচয় দিতে গিয়ে বলল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগের ছাত্র। দুর্দান্ত ম্যাজিশিয়ান, হাতের তালুতে নিমিষে পয়সা চালাচালিতে ওস্তাদ। নাম হুমায়ূন আহমেদ।

যাকে উদ্দেশ করে বলা সে মিটিমিটি হাসছে। চালচলনে সপ্রতিভ, বুদ্ধিদীপ্ত। জাফর আলম একই বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত্তিকা বিজ্ঞানের ছাত্র, চট্টগ্রাম কলেজে আমার সহপাঠী। আমি থাকি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান তিতুমীর হলে। সময়টা ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ। তিনজন একসঙ্গে হলের ক্যান্টিনে গেলাম। হুমায়ূন আহমেদ চায়ের জন্য একচামচ চিনি বেশি চেয়ে নিল। হাতে সিগারেট।

পরে আরও দেখা হলো। একবার তাদের দুজনকে হলের মাসিক ফিস্টে খেতে বললাম। তখনকার সময়ে এটি ছিল এক আকর্ষণীয় কর্মকাণ্ড। প্রতিদিনের বাজার থেকে টাকা বাঁচিয়ে মাসের শেষে এ আয়োজন। সন্ধ্যায় আলোকসজ্জা, টেবিল সাজিয়ে সবাই একসঙ্গে খাওয়া, আস্ত রোস্ট। এরপর দেখা হলে হুমায়ূন রসিকতা করে বলত, কী ভাই, হলের ইমপ্রুভড ডায়েট আবার কবে হবে?

প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই সদা বিনয়ী হুমায়ূন আহমেদ আমাকে ভাই ডাকত, আমি ডাকতাম হুমায়ূন। তবে পারস্পরিক আন্তরিক সম্পর্কটি থেকেই যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে যে যার গণ্ডিতে অবস্থান ও ব্যস্ততার ফাঁকেও যোগাযোগ সূত্র ছিল নিরবিচ্ছিন্ন।

ঊনসত্তরের আগে পরের সময়ে গভর্নর মোনায়েম খানের সরকারি মদদপুষ্ট ছাত্রসংগঠন এনএসএফের ছাত্রনামধারী পেশিশক্তি বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় ও হল ক্যাম্পাসে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। ছাত্রদের মিছিলে হামলা চালাত। পাচপাত্তুর, খোকা এরা ছিল সন্ত্রাসের প্রতিমূর্তি। খোকা কাঁধে ও গলায় একটি জীবন্ত সাপ জড়িয়ে রাখত। পকেটে পিস্তল। তাদের হুমকিতে নিরীহ ছাত্ররা থাকত শঙ্কিত আর প্রশাসন ও শিক্ষকদের একাংশ থাকত নতজানু।

সলিমুল্লাহ হলে এক সন্ধ্যায় ডাইনিং হলে উত্তেজনা। হলের দোতলার একটি রুমে শোরগোল ও আর্তচিৎকার। পাচপাত্তুরের তলপেটে কারা যেন ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। তাকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য কেউ ছিল না। সাঙ্গপাঙ্গরা সব পালিয়েছে। নিজের হাতে পেট চেপে ধরে পাচপাত্তুর ঢাকা মেডিকেল কলেজের দিকে পায়ে ভর করেই দৌড়ে যায়। পৌঁছাতে পারে নি। এ রাতে জাফর আলম আমার হলে এসে থাকে। হুমায়ূনের খোঁজখবরও নিয়ে এসেছে।

মুহসীন হলে এনএসএফের ছাত্রদের উৎপাত। হুমায়ূন নিজেই ভুক্তভোগী। নতুন হলে তারা আগেই জায়গা করে নিয়েছে। এমনকি হাউস টিউটরের বাসাটায়ও। হুমায়ূন ঠাট্টার সুরে বলত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিগগিরই বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন কিছু ডিপার্টমেন্ট খুলবে। সিলেবাসে থাকবে হকিস্টিক, চাকু, পিস্তল চালানোর ব্যবহারিক ক্লাস, লাঠিপেটা করে আর সাইকেলের চেন দিয়ে মিছিল ছত্রভঙ্গ করা, পতিতাদের ধরে এনে হলের রুমে পুনর্বাসন করার মতো কর্মকাণ্ড।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘোষিত এগার দফা আন্দোলন সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। ১৪৪ ধারা ভেঙে মিটিং মিছিল। ছাত্রসমাজ অগ্রণী ভূমিকায়। আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে জনরোষ বাড়ছে। পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান শহীদ হয়। তার রক্তমাখা শার্ট নিয়ে মিছিলের পর মিছিল। তিন দিন পর মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় দশম শ্রেণীর ছাত্র মতিউর রহমান। উনসত্তরের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর শামসুজ্জোহাকে পাক আর্মি বুলেট ও বেয়নেট দিয়ে হত্যা করে। আন্দোলনে শিক্ষকসমাজও নেমে পড়ে।

উনসত্তরের পনেরই ফেব্রুয়ারি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে বন্দিদশায় গুলি করে হত্যার পর ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ প্রতিবাদ ও মিছিল করে তার লাশ নিয়ে আসে ইকবাল হলের গাড়ি-বারান্দায়। জাফর আলমকে সেদিন উত্তেজিত দেখাচ্ছিল, চোয়ালে কাঠিন্যের আভাস।

একাত্তরের ২৫ মার্চের কালোরাত্রিতে ইকবাল হলেরই [illegible]৩ নম্বর কক্ষে জাফর আলমকে গুলি করে হত্যা করে হানাদার পাকিস্তানি সেনারা। রাত পোহালে হলের সব লাশ জড়ো করে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। দক্ষিণ পাশে গর্ত করে মাটিচাপা দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বাসভবনের প্রবেশ গেইটের ডানদিকে সবুজ চত্বরে পঁচিশে মার্চের কালোরাত্রিতে যাঁরা শহীদ হয়েছে তাঁদের নাম ২৪তম স্বাধীনতা দিবসে পাথরে খোদাই করা হয়েছে। শহীদদের নামফলকে খোদিত শহীদ এটিএম জাফর আলমের নাম চির অক্ষয় অম্লান থাকুক।

আমরা জানতাম, সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে জাফর আলম সিএসপি কর্মকর্তা হবে। সাধারণ জ্ঞান ও বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বই জোগাড় করে পড়ত। হুমায়ূন ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিল। নীলক্ষেতের ফুটপাতে স্বল্পদামে পুরাতন বই-ম্যাগাজিনের খোঁজখবর রাখত। কেনা হতো, হাতবদল হতো।

হুমায়ূন একবার হস্তরেখার ওপর পুরাতন একটি বই খুঁজে পেল। মহা উৎসাহে বই পড়ে একে অপরের হাতের রেখা দেখে নানান ধরনের ব্যাখ্যা। হুমায়ূন বইয়ের বর্ণনা ও রেখার সঙ্গে নিজের হাতের রেখা নিজেই মিলিয়ে দেখত। আর দাবি করত বড় ম্যাজিশিয়ান হবে। হস্তরেখার এই অল্পবিদ্যা পরে আরও কিছুদিন আমিও অন্যের ওপর চালিয়েছি। ডর্টমুন্ডে জার্মান ভাষা ক্লাশের ফাঁকে হস্তরেখা দেখতে গিয়ে একবার ধরা খেয়েছি। থাক সে কথা।

এক সন্ধ্যায় মুহসীন হলের মাঠে তিনজন বসে আছি। জাফর আলম বলল, যার যার পকেটে যত টাকা আছে সব বের করে গুনতে। টাকা, আনা, আধুলি মিলিয়ে মোট ছাব্বিশ টাকার মতো। হেঁটে আসা-যাওয়া করলে গুলিস্তানের চৌ-চিন চৌতে চাইনিজ খাবার খাওয়া যাবে। হুমায়ূনের মহা উৎসাহ। রওনা দিলাম।

একাত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারির আবহ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। নির্বাচনোত্তর অনিশ্চয়তা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা ও ষড়যন্ত্র। সারা দেশে প্রতিবাদ মিছিল ও আন্দোলন। পত্রিকার পাতায় পুলিশের গুলিতে সারা দেশে নিহতদের খবর। জনরোষ ফুলে ফেঁপে উঠছে। শহীদ দিবসকে কেন্দ্র করে গণমানুষের চিন্তাচেতনা বৃহত্তর সংগ্রামের দিকে ধাবিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছিল। উনসত্তর-সত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারির ধারাবাহিকতায় শোককে প্রতিবাদের ভাষায় পরিণত করে স্বাধিকারের বজ্রমুষ্টি প্রত্যয় স্বাধীনতা শপথের রূপ নিচ্ছে। চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীদের রাজপথে আঁকা আলপনা, ভিন্নমাত্রার পোস্টার, দেয়ালের লিখন, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী ও ছায়ানটের তরুণ-তরুণীদের পরিবেশিত সঙ্গীতের মূর্ছনা যেন চরম আত্মত্যাগের ডাক দিয়ে যাচ্ছে। ছাত্রজনতার দুর্বার আন্দোলনের চাপে উনসত্তরের শহীদ দিবসের পরদিন আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয়। মার্চের শেষের দিকে ঘটে রাওয়ালপিণ্ডিতে ক্ষমতার পটপরিবর্তন।

সত্তরের জলোচ্ছ্বাসে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অগণিত মানুষের করুণ মৃত্যু, ব্যাপক ধ্বংসলীলার পরেও কেন্দ্রীয় সরকারের নিষ্ক্রিয়তায় জনমনে ক্ষোভের দানা বেঁধে ওঠে। এসময় মাওলানা ভাসানীর প্রতিবাদী কণ্ঠে ছিল পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ও স্বাধিকার আদায়ের অঙ্গীকার। জাতীয় নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ও টালবাহানার একপর্যায়ে পহেলা মার্চ জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়।

৭ মার্চ, ১৯৭১। রেসকোর্সের ময়দান লোকে লোকারণ্য। প্রতিবাদমুখী এত লোকের সমাবেশ আগে কখনো হয় নাই। মাথার উপর সামরিক হেলিকপ্টার চক্কর দিচ্ছে। প্রতিবাদী জনতা লাঠি ও বাঁশ উঁচিয়ে প্রতিরোধের প্রত্যয় ব্যক্ত করছে।

শেখ মুজিবুর রহমান মঞ্চে এলেন। সেই ঐতিহাসিক ভাষণে বজ্রকণ্ঠে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিলেন। শুরু হয়ে গেল অসহযোগ আন্দোলন।

রাজনৈতিক আলোচনার আড়ালে শক্তি বৃদ্ধি করে পাকসেনারা ২৫ মার্চের কালোরাত্রিতে ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা চালাল। স্বদেশের জনগণ রুখে দাঁড়াল। যুদ্ধ করে দখলদার পাকবাহিনীর কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে।

দেশ স্বাধীন হয়েছে। বুয়েটে ফাইনাল পরীক্ষার বাকি একটা বিষয়ের পরীক্ষা শেষ। এর মধ্যে একদিন মুহসীন হলে খোঁজ নিতে গিয়ে হুমায়ূনের সঙ্গে দেখা। শুনলাম, তার বাবা ফয়জুর রহমান আহমেদের শহীদ হওয়ার মর্মস্পর্শী বিবরণ। পাকিস্তানি মিলিটারির অন্যদের সঙ্গে হুমায়ূনকেও হল থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করেছে সেই কাহিনি।

AMARBOI.COM

আমরা স্মরণ করতে চেষ্টা করলাম আমাদের হারানো বন্ধুদের। তাদের জীবনের স্বপ্ন নিয়ে কথা বললাম। জাফর আলমের প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে আসে। বললাম, জহুরুল হক হলে একা গিয়েছিলাম। চলেন, আবার যাই।

হুমায়ূন বলল, ওদিকে যেতে মন চায় না। একদিন গিয়ে খুবই খারাপ লেগেছে। পরে যাব।

হুমায়ূনকে জানালাম আহসান হাবীবের কথা। তিতুমীর হলের দক্ষিণ ব্লকের ৪০৫ নম্বর কক্ষে আমার দীর্ঘদিনের রুমমেট। একেবারে নির্বিবাদী এবং শান্ত প্রকৃতির। মোটা ফ্রেমের চশমা পরত, চুপচাপ থাকত, পড়াশোনার ফাঁকে বারান্দার পিলারের গায়ে হেলান দিয়ে সিগারেট টানত আর উদাসীনভাবে আকাশের দিকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়ত। রাজনীতি প্রসঙ্গে তাকে কখনো আলোচনা করতে দেখি নি। মিটিং-মিছিলে ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাবনা-সিরাজগঞ্জ এলাকায় কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধ করে। চূড়ান্ত বিজয়ের লগ্নে দখলদার পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে শহীদ হয়।

জিজ্ঞেস করলাম, মনে আছে? একই হলের ছাত্র তুখোড় দাবা খেলোয়াড় মুফতি কাসেদের কথা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন একদিন আগ্রহ নিয়ে তার সঙ্গে দাবা খেলায় বসেছিল। কয়েক চালের মাথায় হেরেছিল। মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে এক অসতর্ক মুহূর্তে বাঙ্কার থেকে মাথা তুলে চারদিক দেখে নিচ্ছিল মুফতি। দখলদার শত্রুসেনার রাইফেলের গুলি সরাসরি মাথায় এসে লাগল।

হুমায়ূনের মুখমণ্ডলে নির্বাক বেদনার ছাপ। বলল, আমরা ক'জনকেই বা চিনি! এ তালিকা তো অনেক দীর্ঘ। তাদের রক্তঋণে আমরা বেঁচে আছি।

মুক্তিযুদ্ধে অগণিত জানা-অজানা মানুষের আত্মত্যাগ, নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার সঠিক তথ্যাদি কখনো পাওয়া যাবে না। একাত্তরের বিজয় দিবসের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বিভিন্ন স্থানে খননকৃত গণকবর, মিরপুর রায়েরবাজারের বধ্যভূমি, সারা দেশে অসংখ্য গণকবর থেকে উদ্ধার করা নরকঙ্কাল ইতিহাসে জঘন্যতম গণহত্যার নজির হয়ে থাকবে।

পুলিশ কর্মকর্তা, গুলিবিদ্ধ হুমায়ূনের বাবার লাশ তিনদিন পর বলেশ্বর নদী থেকে উদ্ধার করে প্রাণের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে ছেলেরা কবর দিয়েছিল। সদ্য বিধবা আয়েশা ফয়েজ এতিম সন্তানদের নিয়ে কপর্দকহীন অবস্থায় অপরিচিত নৌকার মাঝির দয়ার ওপর ভরসা করে এক অনিশ্চয়তার নদীপথে যাত্রা করেছিলেন। যে-কোনো মূল্যে সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। টুপি, লুঙ্গি, পাঞ্জাবি পরেও শর্শীনার মাদ্রাসায় দুই সন্তানের আশ্রয় মিলেছে। মা পালিয়ে পালিয়ে জান বাঁচাতে হয়েছে। হানাদার পাক আর্মিকে তুষ্ট রাখার কী এক অমানবিক দৃষ্টান্ত। ইসলাম ধর্মের প্রচারক মহানবী (দ.)-এর দেশে আশ্রয়প্রার্থীকে একবার আশ্রয়দান করলে তার জানের হেফাজতকারী আশ্রয়দাতা, এ আচার অতি প্রাচীনকাল থেকেই।

হুমায়ূনের মা ও ভাইবোনেরা শান্তিনগরের একটি ভাড়া বাসায় থাকে। যাওয়ার আগ্রহ দেখালে হুমায়ূন বলে, শহীদ পরিবার হিসেবে বাবর রোডে আম্মা একটি বাসা বরাদ্দ পেয়েছেন। ছেড়াবেড়া অবস্থা। একদিন নিয়ে যাবে।

AMARBOI.COM

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে হুমায়ূনের আরেকটি গণ্ডি ছিল। আহমদ ছফা ও আনিস সাবেতকে ঘিরে। একদিন জানাল, ছফা ভাইয়ের কাছে যাচ্ছে। একটি উপন্যাস লিখেছে, কোনো-এক সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। বই হিসেবে ছাপাতে চায়। কোনো প্রকাশক নিচ্ছে না। লেখক আহমদ ছফা এক প্রকাশককে বলে দিয়েছে।

এই প্রথম জানলাম হুমায়ূন লেখালেখিতে হাত দিয়েছে।

নন্দিত নরকে প্রকাশিত হলো। হুমায়ূন উপন্যাসের একটি কপি দিল। নাম এবং প্রচ্ছদ দুটোই এক নান্দনিক অনুভূতি জাগিয়ে দেয়। চরিত্রগুলো এবং তাদের নাম যেন চেনা পরিচিত। অবাক হলাম, এতদিনের চেনা হুমায়ূনের মাঝে লেখক হুমায়ূন আহমেদের দেখা পেলাম না কেন?

হুমায়ূনের কাছে জানলাম, প্রকাশের অপেক্ষায় আরেকটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি আছে। *শঙ্খনীল কারাগার*। এটা আগেই লেখা। শহীদ পিতা ফয়জুর রহমান ছেলের লেখা প্রথম উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়েছেন।

ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে হুমায়ূন শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে চলে গেল। টেকনিকেল টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ইলেকট্রনিক্স-এর শিক্ষক হিসেবে আমিও চাকরিতে যোগ দিলাম। কলেজের অদূরে শিক্ষক ডরমেটরিতে থাকার জন্য একটি রুম বরাদ্দ হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফেরার পর কলেজে আমার সহপাঠী ও রুমমেন্ট মহিউদ্দিন আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে শিক্ষক পদে যোগ দিল। হুমায়ূনের সাথে আগেই পরিচয় ছিল। আমার সঙ্গে থাকার জন্য মহিউদ্দিন শিক্ষক ডরমেটরিতে চলে এল। তার কাছে একদিন জানলাম, হুমায়ূন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একই বিভাগে যোগদান করেছে। আবার দেখা-সাক্ষাতের পালা। আরেকজন শিক্ষক ছিল নূরুল আমিন। 'কিটি হক'-এর মালিক। যখন-তখন তার হোন্ডায় চড়া যেত।

হুমায়ূন আর মহিউদ্দিনসহ আমরা তিনজন বিকেলে বেশিরভাগ সময় একত্র হতাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীলক্ষেত এলাকার শিক্ষক ক্লাবে। ঘটনাবহুল বিশ্ববিদ্যালয় জীবন কেটেছে ওই এলাকায়। স্বাভাবিকভাবে বুয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা সবসময়ই কাছে টানে। ক্লাবের চা-শিঙ্গাড়া ছিল প্রিয় খাবার। একদিন প্রায় ফাঁকা ক্লাবঘরে টেবিলের ওপর দাবার বোর্ড বিছিয়ে সেই বিখ্যাত রাজ্জাক স্যার ডাকাডাকি করছেন, তার সঙ্গে দাবা খেলার জন্য। হুমায়ূন দাবার বোর্ডের অন্য পাশে বসে গেল। রাজ্জাক স্যার প্রথম থেকেই উল্টাপাল্টা চাল দিচ্ছিলেন। হেরে গেলেন। হুমায়ূন বিব্রত। আরেকবার খেলতে চাইলে হুমায়ূন কাজের অজুহাতে অপারগতা প্রকাশ করল। অন্য একজনকে নিয়ে স্যার বসে গেলেন।

হুমায়ূন বলল, জানেন, উনি দিনদুপুরেও বাসায় ঘরের মাঝখানে মশারি খাটিয়ে বই পড়েন? ছফা ভাই নিজে দেখে এসেছেন।

মনে হলো রসিকতা, কিন্তু আসলে সত্যি।

প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক ছিলেন এক বিচিত্র এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ক্লাব রুমে ঢুকলে সবাই নড়েচড়ে বসত। বয়স কম হওয়ার কারণে আমরা কখনো কাছ থেকে কখনো দূর থেকে তাঁর আশপাশে থাকতে চেষ্টা করতাম। চলমান রাজনীতি সম্পর্কে অনেক কথা বলতেন। সিনিয়র শিক্ষকদের কোনো কোনো নেতিবাচক বক্তব্যে বলতেন, আরে মিয়া দেশে হাজারো সমস্যা, সময় দেন, সময় দেন। দেশি-বিদেশি চক্রান্তের শিকার স্বাধীন বাংলাদেশে পরাশক্তির রাজনৈতিক মারপ্যাঁচের খেলায় সমস্যার অন্ত নাই।

AMARBOI.COM

১৯৭২ সালের শেষের দিকে সরকারি চাকরিতে যোগদানের কয়েক মাস পরে তেজগাঁয়ে টেলিসেন্টার হোস্টেলে চলে আসি। নতুন টিনের ঘরে গব্দা ধরনের কাঠের চৌকি ফেলে প্রশিক্ষণরত কর্মকর্তাদের থাকার জায়গা। গ্রীষ্মের এক বিকেলে ঘর্মাক্ত হুমায়ূন হোস্টেলে এসে হাজির। রসায়ন বিভাগে দিনের শেষ ক্লাস নিয়ে কার্জন হল থেকে মগবাজার চৌরাস্তা হয়ে তেজগাঁও লিংক রোড। তখন কাঁচা রাস্তা। রোদের মধ্যে হেঁটে এসেছে। উদ্দেশ্য, একজনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা। তখন সম্পর্কের আদান-প্রদান মাত্র শুরু। টেলিফোনটা বড় জরুরি। মেয়ে না বলে তরুণী বলাই ভালো। নাম গুলতেকিন। ক্লাস টেনে পড়ে। উদীয়মান তরুণ লেখকের একজন ভক্ত হিসেবে প্রথম পরিচয়। ওই বয়সের একটি তরুণীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক পর্যন্ত সরাসরি পৌঁছে যাওয়া কম সাহসের কথা নয়। হুমায়ূন বলল, চিঠির মাধ্যমে প্রথম যোগাযোগ। তারপর সরাসরি ডিপার্টমেন্টে হাজির। নিজেকে বড়সড় করে দেখানোর জন্য তরুণীটি একদিন গায়ে শাড়ি প্যাঁচিয়ে আঁচলভর্তি গোলাপ ফুল নিয়ে কার্জন হলের বাগানে হাজির। আঁচল পেতে ফুলগুলি হুমায়ূনের হাতে দিতে গিয়ে শাড়ির প্যাঁচ খুলে পড়ে। ফুল ধরবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাকি অপ্রস্তুত প্রেয়সীর শাড়ি গুছিয়ে দেবে—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হুমায়ূনের বেহাল দশা। বুদ্ধিমান হুমায়ূন অনুঘটকের কাজে লাগিয়েছিল তরুণীটির ফুফু খালেদা হাবীবকে। হুমায়ূন তাঁর সমস্ত সাহিত্য প্রতিভা ঢেলে দিয়ে তাঁকে এক দীর্ঘ চিঠি লিখে বসল। উত্তর এল সংক্ষিপ্ত—চিঠিতে এত বানান ভুল কেন ?

হোস্টেল থেকে বেরিয়ে ফার্মগেটের দিকে গেলে আনজুম কাবাব ঘর। উপাদেয় রুটি কাবাব। হুমায়ূন ওখান থেকে বিদায় নিয়ে মোহাম্মদপুরের বাসায় চলে যেত। বাসে চড়ার চেয়ে হাঁটাই পছন্দ করত। ভবিষ্যৎ হিমু চরিত্রের হন্টন পূর্বাভাস ? বেতনের প্রায় পুরোটাই মা আয়েশা ফয়েজের হাতে তুলে দিত। ভাইবোন মিলিয়ে বড় সংসার। শহীদ পিতার চাকরির পেনশান যৎসামান্য।

মহিউদ্দিন ও আমাকে হুমায়ূন বাসায় দাওয়াত করল। দুপুরের খাওয়ার টেবিলে কাঁচামরিচ আর সর্ষেবাটা দিয়ে ইলিশ মাছ রান্না। রান্না করেছেন খালাম্মা—আয়েশা ফয়েজ। এক মজাদার ভিন্ন স্বাদ। এ রান্নার জন্য পরে কতবার আবদার। সেদিন দেখা হলো হুমায়ূনের ভাইবোনদের সঙ্গে। শেফু, শিখু, আহসান হাবীব, মনি। জাফর ইকবাল বাইরে।

এরই মধ্যে একদিন হুমায়ূন ঘোষণা করল, গুলতেকিনের সঙ্গে তার বিয়ে। দিনক্ষণ নির্ধারণ হয়ে গিয়েছে। পরিবারের ভাইবোন স্বজনদের সঙ্গে আমরাও বরযাত্রী।

AMARBOI.COM

একসময় হুমায়ূন চলে গেল আমেরিকায় পড়াশোনার জন্য। মহিউদ্দিন চলে গেল যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমি যাই জার্মানি, স্বল্প বিরতিতে বেলজিয়ামে। পরস্পরের দেখা-সাক্ষাতে দীর্ঘ বিরতি।

আশির দশকের প্রথমদিকে এক ছুটির দিনের সকালবেলা। ঢাকা নিউমার্কেটের বইয়ের দোকান ঘুরে সময় কাটাচ্ছি। কাঁধে লম্বা ঝোলানো ব্যাগ, গায়ে পাঞ্জাবি, পায়ে স্যান্ডেল পরা হুমায়ূন একেবারে সামনাসামনি। চোখাচোখি হতেই এক রাজ্যের বিস্ময় ও আনন্দ।

কিছুদিন আগে দেশে ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে যোগদান করেছে। মোহাম্মদপুরের বাসায় মায়ের সঙ্গে থাকে। বলল, দীর্ঘদিন পরে দেশে ফিরেছি। যোগাযোগের সূত্র কম। আপনার খোঁজে শ্যালককে লাগিয়েছি। তাকে চায়নিজ খাবারের লোভও দেখিয়েছি।

রমজান মাসের একদিন রসায়ন বিভাগে টেলিফোন করে হুমায়ূনকে সপরিবারে বাসায় ইফতারে যোগ দিতে বললাম। সানন্দে রাজি হলো। ইফতারের সময় পার হয়ে গেল। তাদের দেখা নেই। এল অনেক রাতে। তিন কন্যাসহ গুলতেকিন ভাবিও এসেছে। প্রাণোচ্ছল, রুচিশীল তরুণী। আমার স্ত্রী রুবার সঙ্গে পরিচয় হলো। হুমায়ূন পরিবার সম্বন্ধে আগেই অনেক কিছু জানত। অল্পদিনেই দুজনের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠল যা স্থায়ী হয়ে গেল। অনেক পরে হুমায়ূনের সংসারে টানাপড়েন ভাঙাগড়ার সকল পর্যায়ে গুলতেকিন ভাবির পাশেই থেকেছে। এ লেখার সময় আশি দশক পরবর্তী অনেক স্মৃতির খেই ধরিয়ে দিয়েছে। কোনটা রেখে কোনটা লিখব ? সে-রাতে নতুনভাবে রান্না করা রাতের খাবার হুমায়ূন তৃপ্তিসহকারে খেল। ঠান্ডা খাবার কখনো পছন্দ করত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একসময়ে হাউস টিউটর হিসেবে শহীদুল্লাহ হলে হুমায়ূন বাসা স্থানান্তর করে। খোলামেলা জায়গা। লেখালেখি, অধ্যাপনা, আড্ডা আর বেড়ানো সমানতালে চলছে। যে-কোনো উপলক্ষে ডাক পড়ত, সপরিবারে হাজির হতাম। না গেলে অনুযোগ করত। উপলক্ষের অভাব হতো না। এক উপলক্ষে এলে আর এক উপলক্ষের ডাক।

গুলতেকিন ভাবি, নোভা, শিলা আর বিপাশা কেন্দ্রিক হুমায়ূনের পারিবারিক জীবন। হুমায়ূন লিখছে, গুলতেকিন ভাবি রাত জেগে বসে সঙ্গ দিচ্ছে আর বেশি বেশি চিনি দিয়ে দুধ চা বানিয়ে দিচ্ছে। সংসার সামলিয়ে ইংরেজির ছাত্রী হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে যাচ্ছে, মেয়েরা স্কুলে আসা-যাওয়া করছে।

এক সন্ধ্যায় হুমায়ূনের বইয়ের র‍্যাকে বই খুঁজতে গিয়ে দেখি, ফাঁকা ফাঁকা। হুমায়ূনের লেখা একটি বইও নেই।

হুমায়ূনকে জিজ্ঞেস করলাম। ও চুপচাপ। গুলতেকিন ভাবি মুচকি হেসে বলল, থাকবে কী করে! একনাগাড়ে একরাত একদিনে নিজের লেখা সমস্ত বই পাতায় পাতায় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। এতে করে নাকি আমার ওপর ওর রাগ কমেছে।

নাটকের কাজে গিয়ে ময়মনসিংহ থেকে ফিরে একদিন গেরুয়া রঙের কাপড় পরে হুমায়ূন ঘোষণা করল, এখন থেকে খাবার হিসেবে শুধু ফলাহার ও মৌনব্রত পালন করবে। কন্যারা খুব মজা পেয়েছে। গেরুয়া বসন আগে বোধহয় দেখে নি। গুলতেকিন ভাবিও আরেক কাঠি সরেস। বাজারে গিয়ে দেশি-বিদেশি সব ফল কিনে টেবিল ভর্তি করে ফেলল। আমাদেরও ডাক পড়ল। গিয়ে দেখি বাড়িতে উৎসব উৎসব ভাব। উঁচু গলায় কথা বলা মানা। হুমায়ূন গেরুয়া বসনে অন্ধকার রুমে মৌনব্রত পালন করছে। মাঝে মধ্যে সবাই উঁকিঝুঁকি মেরে দেখছে। সকাল, দুপুর, রাতে খাবার টেবিলে হুমায়ূন টক, মিষ্টি বিস্বাদের হরেকরকমের ফলাহার চেখে চেখে দেখছে। চোখেমুখে বিচিত্র ভঙ্গি ও বিরক্তি সতর্কভাবে চেপে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আর আড়চোখে টেবিলে রাখা তার প্রিয় খাসির গোস্তের রেজালার বাটির দিকে তাকাচ্ছে। অন্যদের দম ফাটা হাসি। দ্বিতীয় দিন খাবার টেবিলেই হুমায়ূন রণেভঙ্গ দিল।

আয়েশা ফয়েজ আমেরিকায় যাবেন, জাফর ইকবালের ওখানে বেড়াতে। প্রথম বিদেশযাত্রা। হুমায়ূনের মস্তবড় আয়োজন। মানপত্র, চাইনিজ রেস্টুরেন্টে পারিবারিক সংবর্ধনা, বক্তৃতা, কেনাকাটা, আরও কত কী! যাওয়ার সময় এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে কারও কারও চোখে পানি।

আত্মার সম্পর্ক যে কত গভীর ও নিঃশর্ত হতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ হুমায়ূন ও মা আয়েশা ফয়েজ। সকল প্রতিকূলতায়ও আয়েশা ফয়েজ ছেলে হুমায়ূনের কাছ থেকে কখনো দূরে সরে আসেন নি। সর্বাবস্থায় তার পাশে ছিলেন। পরিবারের সবাই শেষ পর্যন্ত এ অবস্থা মেনে নিয়েছিল। শিখু বলত, দাদাভাইয়ের জন্য আম্মার ৯৫ আর সবার জন্য পাঁচ। হুমায়ূনের শেষ ভরসা ছিল মা। তাঁর চিকিৎসা ও ভালোমন্দ বিষয়ে হুমায়ূন ছিল ঈর্ষণীয় তৎপর। যে-কোনো সমস্যা হলে হুমায়ূন তাঁকে বাসায় আনিয়ে নিত। তিনি বাসায় এসে শুয়ে বসে থাকলেও তা যথেষ্ট।

শহীদ পিতাকে হুমায়ূন আজীবন লালন করেছে তার লেখালেখির মাধ্যমে। সংসারে বাজার খরচের যোগান নাই, অথচ গিটার কেনা, ঘোড়া কিনে নিয়ে আসা, নিজের ক্যামেরায় তোলা ছবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেভেলপ করা—পিতার এসব খেয়ালিপনা, বাউলা মন, বৃষ্টি, জোছনা সবই যেন পুত্র হুমায়ূন ধারণ করে নিয়েছে।

শহীদুল্লাহ হল ছেড়ে দিয়ে হুমায়ূন এলিফেন্ট রোডে নিজের ফ্ল্যাটে উঠে এল। এ সময় লেখালেখি ও নাটক নিয়ে হুমায়ূনের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। হুমায়ূন সিদ্ধান্ত নিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে দেবে। শহীদুল্লাহ হলে থাকতেই প্রফেসর পদে পদোন্নীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ছাড়তে চাচ্ছিল না। হুমায়ূনের যুক্তি, নিজের ব্যস্ততার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব হচ্ছে না। পদ আঁকড়ে থাকতে তার বিবেকে লাগছে।

হুমায়ূন তার *জনম জনম* উপন্যাসটির উৎসর্গ পাতায় ছাপিয়েছে আমার ও আমার স্ত্রীর নাম। সে অনেক আগে, আশির দশকের মাঝামাঝি। বছর তিনেক আগে *বলপয়েন্ট* গ্রন্থের একটি কপি আমার হাতে তুলে দেয়, ভেতরের পাতায় হাতে লেখা : 'একসময়ের প্রিয় দুজন'। যেন একটু সূক্ষ্ম খোঁচা। বছর দুই আগে 'মাতাল হাওয়া'য় লিখে পাঠিয়ে দেয়—'মুনীর ভাই প্রিয়জনেষু'। হঠাৎ হঠাৎ এ ধরনের বই পেলে ছুটে না গিয়ে পারতাম না। হুমায়ূন যেন বলতে চাচ্ছে—আসেন না কেন?

হুমায়ূনের জীবনের শেষ সাত-আট বছরে বিভিন্ন কারণ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার সঙ্গে দেখা হতো দীর্ঘ বিরতিতে, যা হুমায়ূন ভালোভাবে নেয় নি। অভিমান করত এবং পরোক্ষভাবে প্রকাশও করত। তবে যখনই দেখা হতো আন্তরিকতায় কোনো ছেদ পড়ে নি। নিজ হাতে খুঁজে বের করত পছন্দের বই। খুঁটে খুঁটে অনেক কিছু জানতে চাইত, বলত নিজের অনেক না-বলা কথা।

হুমায়ূন বিভিন্নভাবে ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজখবর পেত। নুহাশের আসা-যাওয়া তো ছিলই। তবু দেখা হলে তাদের প্রসঙ্গ টেনে আনত। এ যেন আরেক হুমায়ূন। সন্তানদের ব্যাপারে হুমায়ূন একদিকে যেমন ছিল স্পর্শকাতর, অন্যদিকে তাদের প্রতি ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম। নিজের বয়স এবং ছোট দুই ছেলে, নিষাদ ও নিনিতের ভবিষ্যৎ নিয়েও আশঙ্কা। শেষের দিকে লেখা বইয়ের উৎসর্গ পাতায়ও এ ভাবনা এসে গেছে।

বড় সন্তানদের প্রসঙ্গে আক্ষেপ ও অনুযোগের জবাবে মাঝেমধ্যে বলতাম, বেশির ভাগ দায় তো আপনারই, এখন অভিমান কেন?

সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা যুক্তি খাড়া করত। অতীতের বিভিন্ন ঘটনার উদাহরণ টানত। আর হুমায়ূনের যুক্তিতর্ক খণ্ডানো কঠিন। এটা বুঝতে চাইত না যে বাস্তব ঘটনাপ্রবাহে তাদেরও অভিমান হতে পারে।

সন্তানদের নিয়ে হুমায়ূনের প্রচ্ছন্ন গর্ব তার লেখালেখিতে প্রতিফলিত হয়েছে। নুহাশের আমেরিকায় পড়াশোনার জন্য টাকাপয়সার যোগানে তার আন্তরিকতার অভাব ছিল না। কীভাবে টাকা যোগাড় হয়েছে, বলেছে।

হার্টের বাইপাস অপারেশন, সংসার ভাঙা গড়ার টানাপড়েন হুমায়ূনের মতো সংবেদনশীল ব্যক্তির ওপর কেমন প্রভাব ফেলেছিল, তা পাঠকের মূল্যায়নের বিষয়। তবে লেখক হুমায়ূন আহমেদ ছিল লেখালেখির ব্যাপারে বরাবর কঠোর পরিশ্রমী। নিউইয়র্কের মেমোরিয়াল স্লোন ক্যাটারিং ক্যানসার সেন্টারে কেমোর পর কেমো নেওয়ার যাতনায় অস্থির হয়েছে। কিন্তু লেখালেখিতে ছেদ পড়ে নি। লেখালেখিই ছিল তার জীবনীশক্তির মূল উৎস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূনের জীবনের শেষের দিকে কালের বৃহত্তর পটভূমিকায় লেখা কয়েকটি উপন্যাস সবার দৃষ্টি কেড়েছে। পাঠক আবিষ্কার করতে শুরু করেছিল এক পরিণত নতুন হুমায়ূন আহমেদকে, যার শৈল্পিক কলমের আঁচড়ে ফুটে উঠছিল ভিন্নমাত্রার জীবনদর্শন। অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতকে একই সূত্রে গ্রথিত করে সময়কে পাঠকের কাছে উপস্থাপন। লেখক হিসেবে আরও পরিণত এবং শক্তিমান হুমায়ূন আহমেদ তার পুনর্জন্মলগ্নেই চলে গেল। চার দশক ধরে পাঠকহৃদয়ে পরম মমতায় লালিত হুমায়ূন আহমেদের আরও অনেক কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। জীবনের শেষ দিনগুলোতে নিজেও সেই প্রত্যয় লালন করত। বলত, সুস্থ হয়ে ফিরে আসবে। অনেক কিছু করার ও লেখার আছে।

. . .

হুমায়ূন সিঙ্গাপুর থেকে ফিরেছে। ফোন পেয়ে বাসায় গেলাম। লেখার টেবিলে উপুড় হয়ে লিখছে।

কেমন আছেন?

জবাবে মাথা তুলে সরাসরি বলল, ভালো নাই, ক্যানসার হয়েছে।

শূন্যদৃষ্টিতে হুমায়ূনের মুখের দিকে তাকালাম। হুমায়ূন লেখার টেবিল থেকে উঠে অপেক্ষারত বন্ধুদের সঙ্গে বসল। ডাঃ করিম বলল, ঘটনা সত্য। কোলন ক্যানসার লিভারেও ছড়িয়েছে। ফোর্থ স্টেজ। চিকিৎসার জন্য আমেরিকা যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে হুমায়ূন গল্প জুড়ে দিল। যেন কোনো কিছুই হয় নি। মেয়েরা কারা কারা দেখতে এসেছে, ভাবভঙ্গি কেমন ছিল, একেকজনকে রসিকতার ভঙ্গিতে সবিস্তারে বর্ণনা করল। কিছু অনুযোগ, কিছু আক্ষেপ।

চিকিৎসার জন্য প্রথমবার নিউইয়র্ক থাকতে হুমায়ূনকে একটি বই পড়তে টেলিফোনে বলেছিলাম। বইটির নামও লিখে নিল। ২০১১ সালের পুলিৎজার পুরস্কার পাওয়া বই। The Empheror of all Maladies, A Biography of Cancer. ক্যানসার রোগের ওপর সাধারণ পাঠকের জন্য এক অসাধারণ গবেষণাধর্মী বই।

AMARBOI.COM

নিউইয়র্ক থেকে ঢাকায় আসার পর হুমায়ূন জিজ্ঞেস করল, ক্যানসারের উপর বইটি আমার কাছে আছে কি না। যাওয়ার আগে নিয়ে আসতে বলল।

শেষবারের মতো নিউইয়র্ক যাত্রার আগের দিন বিকেলে বইটি নিয়ে ধানমণ্ডির দখিন হাওয়ার ফ্ল্যাটে গেলাম। কেউ বাসায় নেই।

পল্লবীতে ফোন করে জানলাম, ওরা সবাই গুলশান চলে গেছে। সেখান থেকে পরদিন রওনা হয়ে যাবে।

নম্বর নিয়ে গুলশানে ফোন করলাম। ওপ্রান্তে শাওন। বলল, চাচা চলে আসেন। ঠিকানা দিল। বুয়েটের পূর্বসূরি মোহাম্মদ আলীর বাসা। স্ত্রী তহুরা আলী। দু'জনই পূর্বপরিচিত এবং বরাবরই আন্তরিক।

শোবার ঘরে খাটের পাশে ফ্লোরের ওপর বিছানো জাজিমে হুমায়ূন বসে আছে। একজন থেরাপিস্ট পা ম্যাসেজ করে দিচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন বলল, পায়ের আঙুলগুলো শক্ত হয়ে যায়।

শারীরিক অবস্থা জানার কোনো প্রশ্ন করতে বিব্রতবোধ করছিলাম। হুমায়ূন নিজেই বলল, কেমো শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে একেবারেই দুর্বল করে ফেলেছে। বড় কষ্ট। আমার প্রার্থনা, কোনো শত্রুরও যেন এ রোগ না হয়।

ক্যানসারের ওপর লেখা বইটার পাতা উল্টাতে উল্টাতে হুমায়ূন বলল, দীর্ঘ প্লেন যাত্রা, সময় কাটবে। বলার মতো কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বিদায় নিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম। হুমায়ূন বলল, থেকে যান। একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করা যাবে।

এ-কথা সে-কথার ফাঁকে হুমায়ূন হাসতে হাসতে বলে, আম্মার কাণ্ড দেখেছেন? আমার কাছে বড় একটি টাকার পুঁটলি পাঠিয়ে দিয়েছেন। এত টাকা কোথায় পেয়েছেন, খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারলাম, আম্মা নানার দেশের বাড়িতে গিয়ে ভাইদের ধরে বললেন, আমার বড় বিপদ, পাওনা সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা দিতে হবে।

হুমায়ূন জিজ্ঞেস করল, সব টাকাপয়সা এভাবে দিয়ে দিচ্ছেন, আপনার বিপদে আপদে টাকা পাবেন কোথায়?

জবাবে বললেন, আমার এর থেকে বড় বিপদ আর কী হবে? আর কিছু হলে তো তোরা দেখবি।

সাফ জবাব।

জীবনের সংকটময় মুহূর্তে, হুমায়ূনের ক্যানসারের অসুখ মেনে নিতে পারছেন না, তখন তাঁকে প্রায়ই বলতে শুনি আমার এতদিন বেঁচে থাকার দরকার কী? নিজের কাছে নিজের প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন। এত দোয়া দরূদ উপরে কি পৌছবে না?

এ যেন লেখক হুমায়ূন আহমেদের *বাদশাহ নামদার* উপন্যাসের বাবর-হুমায়ূন আখ্যান। খেয়ালি রাজপুত্র হুমায়ূনের সকল ন্যায়-অন্যায় আবদারেও সদা ক্ষমাশীল মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাদশা বাবর নিজের জীবনের বিনিময়ে হুমায়ূনের জীবন ভিক্ষায় মগ্ন।

শেষবারের মতো নিউইয়র্ক যাওয়ার আগের দিন রাতের খাবার হুমায়ূন সবার সঙ্গে টেবিলে খেল। তাঁর সব পছন্দের খাবার। ডেকে পাশের চেয়ারে বসাল। হুমায়ূনের বিশ্রাম দরকার। মেঝের জাজিমের ওপর একটু কাত হয়ে শোয়া। দু'হাঁটু মোড়ানো। শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা যারা এসেছিল একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

একসময় বললাম, হুমায়ূন যাই। ভালো থাকেন।

উঠতে যাচ্ছিলাম। কাত হয়ে শোয়া অবস্থায় বলল, বিদায় দিলেন না? একটু থমকে গিয়ে এগিয়ে গিয়ে মাথার কাছে জাজিমের উপর বসলাম। চুপচাপ। কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। খালাম্মার সঙ্গে কখন দেখা হবে জানতে চাইলাম।

আগামীকাল দুপুরে আসবেন।

আবার চুপচাপ।

কপালে হাত রেখে বললাম, হুমায়ূন ভালো হয়ে আসেন। আবার দেখা হবে।

গলার স্বর ভারী। হুমায়ূন লক্ষ করল কি না জানি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখে শুধু বলল, রাত হয়ে গেছে, যান।

এক অজানা আশঙ্কায় মনটা ভারী হয়ে গেল। আজ হুমায়ূন বিদায় চাইল কেন ?

বারডেমের হিমঘর থেকে সকালের দিকে হুমায়ূনের লাশবাহী গাড়ি পুলিশের সহায়তায় নুহাশপল্লীর দিকে রওনা হয়ে গেছে। নুহাশপল্লী থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে তীব্র যানজট। একটি গাড়ি কালভার্টে আটকে গেছে। লাশবাহী গাড়ি আগেই পৌঁছে গেছে। অঝোর ধারায় শ্রাবণের বৃষ্টি নেমেছে। গাড়ি ছেড়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ভেজা চপচপে কাপড়চোপড়ে কর্দমাক্ত রাস্তার পাশ দিয়ে এগুনো যাচ্ছে না। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। রাস্তার পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে মোটরসাইকেলে দু'জন তরুণ পেছন দিক থেকে এগিয়ে আসছে। হাত তুলে জিজ্ঞেস করলাম পেছনে বসে যাওয়া যায় কি না। আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে চালকের আসনে বসা তরুণটি বলল, তিনজন বসতে পারবেন কি না দেখেন। শক্ত করে ধরবেন। তারাও নুহাশপল্লী যাচ্ছে। চালকের চালানোর গতি ভঙ্গি দেখে একবার ভাবলাম নেমে পড়াটাই বোধ হয় নিরাপদ।

মোটর সাইকেলের পেছনে কসরত করে বসে যেতে যেতে মনে পড়ল তিয়াত্তর সালের আরেকটি মটরসাইকেলে ভ্রমণের স্মৃতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক নূরুল আমিনের হোন্ডার পিছনে চড়ে হুমায়ূন আর আমি ফুলার রোড ব্রিটিশ কাউন্সিলে রওনা হলাম। দারুণ ফুর্তিবাজ শিক্ষক হোন্ডায় চড়েই উড়তে চায়। দ্রুত গতির হোন্ডা ক্যাঁচ শব্দ করে থামল। ভয়ে আমাদের দুজনের মুখ সাদা। হুমায়ূন হোন্ডাটির নাম দিয়েছিল–কিটি হক। বোধহয় আমেরিকান নেভির যুদ্ধ বিমান বহনকারী প্রথম দিককার কোনো রণতরী হবে।

অবিরাম শ্রাবণ মেঘের ধারার মাঝে নুহাশপল্লীতে এসে পৌছলাম। লোকে লোকারণ্য। কেউ গাড়িতে, কেউ পায়ে হেঁটে, বৃষ্টিতে ভিজে। জোহরের নামাজের পর শেষ জানাজা হবে। ত্রিপল দিয়ে শামিয়ানা টানানো কবর। জানাজার পর হুমায়ূনের লাশকে নুহাশ, শাহীন, শহিদ আর নূরুন্নবী হাতে তুলে কবরে শুইয়ে দিল। মুঠোমুঠো মাটিতে কবর ঢেকে যাচ্ছে।

দাদাভাইয়ের কবরের পায়ের দিকে দুহাতে কোষবদ্ধ মাটি রেখে মাথা ঠেকিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল নিউইয়র্কের ভেলিভিউ হাসপাতালে অন্তিম মুহূর্তে পাশে থাকা সহোদর মুহম্মদ জাফর ইকবাল।

মুনাজাত হলো–হে আল্লাহ, দুনিয়াতে এ বান্দা তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সবাইকে আনন্দ দিয়েছে। পরজগতে তাঁর জন্য তোমার সর্বোত্তম রহমতের দরজা খুলে দাও।

আশপাশের গ্রাম থেকে আসা নানা বয়সী অচেনা কয়েকজন কবরে বিছিয়ে দিল বাদল দিনের তাজা কদমফুল। শ্রাবণের অঝোর ধারা কান্নার মতো ঝরছে।

আশ্রয় দরকার। অনেকেই অদূরে বৃষ্টি বিলাসের দিকে এগিয়ে গেল। ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি।

ওখানে নিষাদ একটুকরা কাগজে লাল-নীল পেন্সিলে আপন মনে নীল আকাশে তারা আর রকেট আঁকছে। তাদের বাবা রকেটে চড়ে আকাশে গেছে। শিগগিরই ফিরে আসবে।

মেঘলা দিনের পড়ন্ত বিকেলের আগেই যেন সন্ধ্যা নেমেছে। রমজানের শেষ বেলা। সূর্য চলে গেছে মেঘের আড়ালে। কিছু লোক ইতস্তত ঘোরাফেরা করছে। লিচুবাগানে উঁচু করা কবরে মাটির নিচে হুমায়ূন শায়িত। কবরে কোনো ঘের নাই। অদূরে ওষধি বাগান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদ স্মারকগ্রন্থ

নিজের মনের মাধুর্যে তিলে তিলে গড়ে তোলা নুহাশপল্লীর মাটি পরম মমতায় ধারণ করে নিয়েছে হুমায়ূনের দেহকে। মাটিতে মিশে যাবে। নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ বেঁচে থাকবে তার বইতে।

চার দশকের কিছু সময় আগে বলেশ্বর নদী থেকে বাবার লাশ তুলে দাফনের পর কবরে হুমায়ূন লিখে দিয়েছিল—'নয়ন তোমায় পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে।' সে কথামালার চেয়ে মানানসই আর কী হতে পারে হুমায়ূনের কবরের শ্বেতপাথরের জন্য?

তুরস্কের নোবেল বিজয়ী লেখক ওরহান পামুকের ভাষায়, 'প্রতিটি মানুষের মৃত্যু শুরু হয় তার পিতার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।' পিতার স্মৃতিকে হুমায়ূন জীবন্ত রেখেছে তার লেখালেখিতে। হুমায়ূন বেঁচে থাকার জন্য তার লেখালেখিই যথেষ্ট।

"বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এক সুনিপুণ শিল্পীর এক দক্ষ রূপকারের এক প্রজ্ঞাবান দ্রষ্টার জন্মলগ্ন যেন অনুভব করলাম।" *নন্দিত নরক* উপন্যাসের ভূমিকায় আহমদ শরীফ এ কথাগুলো লিখেছিলেন। সেই প্রজ্ঞাবান দ্রষ্টা হুমায়ূন আহমেদ এলেন, জীবনশিল্পীর লেখনীতে জীবনের গল্প শোনালেন, আরও অনেক কিছু দেওয়ার অঙ্গীকারকে পেছনে রেখে নিয়তির হাত ধরে না-ফেরার দেশে চলে গেলেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়াবী গল্পের মানবিক জাদুকর

মুম রহমান

খ্রিষ্টের জন্মেরও পাঁচশত বছর আগে এসকাইলাস যখন *প্রমিথিউস বাউন্ড* নাটক রচনা করেন, তখন সেখানে দেখতে পাই, স্বয়ং দেবতা প্রমিথিউস মানুষের জন্য আগুন চুরি করে আনেন দেবরাজ জিউসের কাছ থেকে। চরম শাস্তি পেলেও সে একবারও অনুশোচনা বা ক্ষমা প্রার্থনা করে না। কারণ দেবতা হয়েও সে বুঝেছিল, মানুষের বিকাশে কেবল একটু আগুনের দরকার, একবার আগুনের স্পর্শ পেলে সে সভ্যতার চাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ধ্রুপদী সাহিত্যের সূচনাকালেই যখন কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে দেব-দেবীর আবির্ভাব, নিয়তি আর অলৌকিকের হাতে বন্দি সবকিছু তখনও নাট্যকার-কবিরা মানবতারই জয়গান গেয়েছেন। এসকাইলাসেরও আগে অন্ধ কবি হোমার তার *ইলিয়াড* আর *অডেসি*'র মহাকাব্যিক জয়যাত্রায় মানুষকে বড় করে দেখেছেন। প্রাচ্যে তথা প্রাচীন ভারতে মানবতা আরও প্রকট। কেননা, *রামায়ণে* দেখি স্বয়ং ভগবান মানুষরূপে রাম হয়ে পৃথিবীতে নেমে আসেন। *মহাভারত* কিংবা *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* ভগবান কৃষ্ণও মানব অবতার হয়ে পৃথিবীতে আসেন। তাই বাংলার সাধক গানেও মানবতার জয়গান বেজে ওঠে, "এমন মানব জনম আর কী হবে, মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে।"

টিকে থাকার সংগ্রাম, বেঁচে থাকার উদ্যম, সৃষ্টিশীলতার ভাঙচুর, ভালোবাসার আনন্দ-বেদনা—এইসব নিয়েই মানুষ নিজেকে করে তুলেছে মানবিক। মানবিকতার চারটি চরিত্রের কথা বলেছেন ই এম ফর্স্টার। তার মতে কৌতূহল, খোলা মন, সুরুচিতে আস্থা আর মানুষ জাতির ওপর বিশ্বাস—এই হলো মানবিকতার চারটি দিক। মানুষের বিজয়যাত্রা আর আবিষ্কারের আড়ালে আছে কৌতূহল, নতুনকে বরণ করে নেওয়ার খোলামন, সুরুচি দিয়ে মানুষ হয়ে ওঠে সুকুমার ও সভ্য আর বিশ্বাস গড়ে তোলে মানবসভ্যতা। মানবিকতার এইসব গুণাবলি আমরা দেখি, সাহিত্যের নবীনতর শাখা ছোটগল্পসমূহে। বিশ্বব্যাপী সেরা ছোটগল্পকারদের গল্পে মানবিকতা সবচেয়ে বড় বিষয়। ফরাসি ছোটগল্পের রাজা মোঁপাসার 'নেকলেস'-এ আমরা মানুষের আস্থা-বিশ্বাসের চিত্র যেমন দেখি তেমনি আন্তন চেখভের 'চুম্বন' গল্পে দেখি মানুষের ভালোবাসা আর বেদনার যুগলবন্দি। ছোটগল্পে চেখভ-মোঁপাসা'র সমমান দেওয়া হয় রবীন্দ্রনাথকে, যার হাতে শুধু বাংলা ছোটগল্প সৃষ্টিই হয় নি, লালিত-পালিতও হয়েছে স্বগৌরবে। *কাবুলিওয়ালা*, *পোস্টমাস্টার*, *অনধিকার প্রবেশের* মতো গল্পে রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা সুস্পষ্ট। বিভূতিভূষণের 'পুঁইমাচা' গল্পে মানবিক সুখ-দুঃখ, জীবন মৃত্যুর আকুতি দেখি, দারিদ্র্য আর শ্রেণী বৈষম্যের বিরাট বেদনাভার দেখি 'তাল নবমী' গল্পে। তারাশঙ্করের 'তারিণীমাঝি' বেঁচে থাকার তীব্র আকুতি এবং সব কিছুর পরে সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ মেনে নিয়েই বেঁচে থাকার জন্য প্রিয়তম স্ত্রীকেও হত্যা করে। মানিকের 'প্রাগৈতিহাসিক' মানুষকে আদিম আর বন্য যুগে নিয়ে যায়। মোদ্দা কথায়, বিশ্বসাহিত্য এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলা সাহিত্যে মানবিকতার নানা বহু বর্ণিল চিত্র এঁকেছেন গল্পকাররা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ছোটগল্পের যে যাত্রা কালক্রমে মানিক, বিভূতি, তারাশঙ্কর—এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়িয়ে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জগদীশ গুপ্ত, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, সৈয়দ শামসুল হক প্রমুখ হয়ে হুমায়ূন আহমেদের হাতে ঠাঁই পেয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ছোটগল্পের মানচিত্রে তিনি একাই একটি বিশাল ভূ-খণ্ড দখলের দাবিদার হতে পারেন। এ প্রসঙ্গে অগ্রজ সৈয়দ শামসুল হকের উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য, "হুমায়ূন আহমেদ আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দীর্ঘ জীবন লাভ করবেন তার ছোটগল্পের জন্য। তার কিছু ছোটগল্প কেবল বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে তো বটেই, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষিতেও অসাধারণ। জীবনের ছবি তিনি এঁকেছেন অনবদ্যভাবে।"

একদা রবীন্দ্রনাথের গল্প সম্পর্কে মোতাহার হোসেন সূফী বলেছেন, 'নর-নারীর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, পাওয়া না পাওয়ার মর্ম' ফুটে উঠেছে তার গল্পে, অন্যদিকে হুমায়ূন আহমেদের গল্প সম্পর্কে গবেষক চঞ্চল কুমার বোসের মন্তব্য 'মানুষের ক্ষুদ্র চাওয়া পাওয়া, সুখ-দুঃখ, মিলন ও বিষাদই তার গল্পের উপজীব্য।' প্রকৃতই মহৎ লেখা সদাই মানুষের আনন্দ-বেদনা, চাওয়া-পাওয়াকে ঘিরেই গল্পের বিষয় নির্মাণ করেন বলে প্রতীয়মান হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ ও হুমায়ূন আহমেদ উভয়েই মানবিকতা ও প্রকৃতির সন্তান হয়ে ওঠেন গল্পের বিষয় নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে।

'সোয়া শ'র মতো ছোটগল্প' রচনা করেছেন তিনি। এরমধ্যে মধ্যবিত্ত জীবন, দারিদ্র্য, মুক্তিযুদ্ধ, প্রেম, রহস্য, অদ্ভুত রস, অতিপ্রাকৃত, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি, প্রহসন, শিশুতোষ, ভূতের গল্প ইত্যাদি নানা ধরনের গল্প আছে। কিন্তু গল্পের ধরন বা বিষয় যাই হোক না কেন তারই অধিকাংশ গল্পেই মানবিকতা প্রখরভাবে ফুটে উঠেছে। হুমায়ূন আহমেদের গল্পের অন্যতম বিষয়বস্তু মানবিকতা। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান তাদের *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*গ্রন্থে দাবি করেছেন, "হুমায়ূন জীবন ও জগতকে দেখেছেন এক মায়াবী দৃষ্টিকোণ থেকে। জীবনের ছোটখাটো সুখ-দুঃখ ও নিতান্ত তুচ্ছ ঘটনাও তাঁর এই মায়াবী দৃষ্টির ছোঁয়ায় হয়ে উঠেছে অসামান্য হৃদয়গ্রাহী।" তার মানবিক গল্পগুলোয় মূলত মানুষের ছোটখাটো অনুভূতিকে দরদি ছোঁয়ায় তুলে আনা হয়েছে।

'অপরাহ্ন' গল্পটির কথা ভাবা যাক। আবু ইসহাক সাহেব রিকশায় উঠেছেন ঝিকাতলা যাবার জন্য, কিন্তু রিকশাওয়ালার বাবরি চুল এবং চড়া রোদে কম ভাড়ায় যেতে চাওয়ায় চিন্তিত হয়ে পড়েন। তার ধারণা হয়, এই রিকশাওয়া নিশ্চয়ই মেয়ের বিয়ে কিংবা এই ধরনের অজুহাত দেখিয়ে পরে বেশি টাকার জন্য আবদার করবে। রিকশাওয়ালার সঙ্গে গল্প জমানোর চেষ্টা করতেই তিনি বিস্মিত হয়ে জানলেন তার নামও ইসহাক। শুধু তাই নয়, তার মতো রিকশাওয়ালারও দুই মেয়ে। কথাবার্তার এই পর্যায়ে রিকশাওয়ালা রাস্তার পাশে হঠাৎ রিকশা দাঁড় করিয়ে দিলো। সে অসুস্থ হয়ে গেল, মুহূর্তেই রক্ত বমি শুরু করল। রিকশাওয়ালার এক কথা, "সাব আপনে আমার রিকশাটা দেখবেন। গরিব মানুষ রিকশা গেলে সর্বনাশ।" রিকশাওয়ালার শরীর ক্রমশ খারাপ হতে লাগল। অনেকেই উৎসাহ দেখালেও আবু ইসহাক কাউকে রিকশার দায়িত্ব দিলেন না, নিজে রিকশা টেনে টেনে নিয়ে গেলেন সায়েন্স ল্যাবরেটরির পুলিশ ফাঁড়িতে। রিকশাওয়ালাকে দুই তরুণ নিয়ে গেল পিজি হাসপাতাল। আবু ইসহাক হাসপাতালে এসে দেখলেন ইমার্জেন্সির বেঞ্চির ওপর রিকশাওয়ালাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে, সে মৃত। তিনি কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবেন বুঝতে পারছেন না। নির্লিপ্ত ডাক্তারকে প্রশ্ন করলেন, "ওর রিকশাটি আমি থানায় দিয়েছি। এখন কী করব ? কাকে খবর দেব ?" তিনি কোনো উত্তর পেলেন না। এদিকে তার বাড়ি ফিরতে হবে। মেয়ে ইন্দ্রানীর দাঁতে ব্যথা, তাকে নিয়ে যেতে হবে ডেনটিস্টের কাছে। তিনি এক বোতল ঠান্ডা পেপসি খেলেন। ছটা বাজতে দেরি নেই। অতএব আরেকটা রিকশায় উঠলেন। এবারের রিকশাওয়ালাটি বয়সে তরুণ। তার নাম সামসু। "ইসহাক সাহেব কোমল স্বরে বললেন, তুমি কেমন আছ সামসু ?"

গল্পের শেষে অংশে এসে লেখক বর্ণনা দিচ্ছেন, "সামসু অবাক হয়ে পেছনে তাকাল। কোনো জবাব না দিয়ে দ্রুত প্যাডেল চাপতে লাগল। সামনেই ট্রাফিক সিগন্যাল। অনেকক্ষণ সবুজ বাতি জ্বলছে। ওটি লাল হবার আগেই তাকে পার হয়ে যেতে হবে। যাত্রীদের আজেবাজে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সময় নেই।"

এই একটি গল্পের মধ্যে লেখক মানব জীবনের গুণাগুণ, দায়বদ্ধতা, মানবিকতা, সাফল্য, ব্যর্থতা ইত্যাদি তুলে ধরেছেন অতি সুচারু ভঙ্গিতে। সামনের ট্রাফিক সিগন্যালের মতো মানুষ দ্রুতই এগিয়ে যেতে চায় সব বাধা পেরিয়ে। পেছনে একটি লাশ রেখে, একজন রিকশাওয়ালার সর্বস্ব রিকশাটিকে রেখে আবু ইসহাক ছটার মধ্যে মেয়েকে নিয়ে ডেনটিস্টের কাছে পৌঁছতে চান। রিকশাওয়ালা লাল সিগন্যালের আগেই পৌঁছাতে চায় তার গন্তব্যে। তবুও এই তাড়াহুড়া, প্রতিযোগিতা কিংবা স্বার্থপরতার জীবনে অচেনা রিকশাওয়ালার রিকশাটি টেনে নিয়ে যান আবু ইসহাক, তার জন্য হাসপাতালে যান, মানুষের জন্যে ক্ষণিকের তরে হলেও মানুষের পথচলা থামে। মানুষ দাঁড়ায় মানুষের পাশে। একজন আরোহী আরেকজন রিকশাচালক—দুজনেরই নাম আবু ইসহাক, দুজনেরই দুটো কন্যা সন্তান আছে, কিন্তু ভিন্ন শ্রেণী, পেশা কিংবা জগতের দুটো মানুষকে ক্ষণিকের মানবিকতায় একটানে এক সুতোয় গেঁথে ফেলেন হুমায়ূন আহমেদ।

মানুষ ধ্বংস হয়ে যায় কিন্তু পরাজয় মানে না। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের *দ্য ওল্ড ম্যান এণ্ড দ্য সি* উপন্যাসে আমরা বুড়ো সান্তিয়াগোকে শেষ শক্তি দিয়ে বিশাল মাছটিকে তীরে আনতে দেখি। "A man is not made for defeat...a man can be destroyed but not defeated." হাঙরের আক্রমণ থেকে শেষপর্যন্ত মাছটিকে অক্ষত না-রাখতে পারলেও সে মাছটি নিয়ে তীরে ফিরে আসে এবং সবাই বুঝতে পারে সান্তিয়াগো কত বড় মাছ ধরেছিল। হুমায়ূন আহমেদের 'খেলা' গল্পটি যেন মানুষের এই অপরাজেয় শক্তি আর স্পৃহার কথাই বলে। "খায়রুন্নেসা গার্লস হাই স্কুলের থার্ড স্যার, বাবু নলিনি রঞ্জন একদিন দুপুরবেলা দাবা খেলা শিখে ফেললেন।" বন্ধু জালাল সাহেবের অনুরোধে নিজের অপছন্দের এই খেলাটি শিখেই তিনি জালাল সাহেবকে পরপর তিনবার হারিয়ে দিলেন। এরপর থেকে শুরু হলো তার নিরবচ্ছিন্ন জয়যাত্রা। "তাঁর বিদায় উপলক্ষে মানপত্রে লেখা হলো—বাবু নলিনি রঞ্জন দাবার জগতের এক মুকুটহীন সম্রাট। তিনি বাংলাদেশে দাবার চ্যাম্পিয়ন জনাব আসাদ খাঁকে পরপর তিনবার পরাজিত করে দাবার জগতে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।" স্কুল কমিটির সেক্রেটারি ও পৌরসভার চেয়ারম্যান সুরুজ মিয়া তার বিদায় অনুষ্ঠানে স্কুল কমিটিকে একটি পনের হাজার টাকার চেক তুলে দেন। কিন্তু শর্ত দেন, 'যদি কেউ নলিনি বাবুকে হারাতে পারে তাকে এই টাকা দেওয়া হবে। আর যদি কেউ হারাতে না পারে, তাহলে স্কুল ফান্ড নলিনি বাবুর মৃত্যুর পর এই টাকাটা পাবে।' কিন্তু আশ্বিনের এক সন্ধ্যায় প্রবল হাঁপানির টান নিয়ে নলিনি বাবু তাঁর জীবনের শেষ দাবা খেলাটি খেলতে বসলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীর্ঘদিনের বন্ধু জালাল সাহেবের সঙ্গে। জালাল সাহেব বহু কষ্টে তাকে রাজি করিয়েছেন এ খেলায় হারার জন্য, কারণ হারলে জালাল সাহেব পনের হাজার টাকা পাবেন, যা দিয়ে হতদরিদ্র নলিনি বাবুর চিকিৎসা করাবেন, শীতের জন্য কিছু গরম কাপড় কিনে দেবেন। নলিনি বাবু হারার জন্যই খেলতে বসলেন। কিন্তু খেলতে খেলতেই তিনি যেন হুঁশ হারিয়ে ফেললেন। 'জীবনের শেষ খেলাটিতে বহু চেষ্টা করেও তিনি হারতে পারলেন না। সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় প্রায় বিনা চিকিৎসায় নিয়ামতপুরের গৌরবের মৃত্যু হলো—১২ নভেম্বর ১৯৭৫ সাল। রোজ মঙ্গলবার। খায়রুন্নেসা গার্লস স্কুলে সে উপলক্ষে দুদিন ছুটি থাকল।' নলিনি বাবু মৃত্যুবরণ করলেন, কিন্তু একটাবারের জন্যও দাবা খেলায় হার মানলেন না। এই একবার পরাজিত হলে তিনি হয়তো বেঁচে থাকতেন, কিন্তু সে বেঁচে থাকা হতো তেলাপোকাটির মতো, ধুকে ধুকে বিবর্তনের তালে তাল মিলিয়েই টিকে থাকা। কেবল টিকে থাকা মানুষের ধর্ম নয় বলেই, মরণশীল মানুষও অমর হয়, হুমায়ূন মানুষের সেই অমরত্বের সন্ধান করেছেন সাধারণ মানুষের সংগ্রামের মধ্যে। কোথাকার কোন এক নলিনি বাবু, তিনি এক মহাকাব্যিক বীর হয়ে ওঠেন 'পরাজয়' নয়, 'মৃত্যু'কে বরণ করে।

'উনিশ শ' একাত্তর' গল্পে আমরা দেখতে পাই দুর্বল নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর পাকিস্তানিদের নির্যাতনের চিত্র। হানাদার বাহিনী একটি গ্রাম দখল করে। গ্রামের শিক্ষক আজিজ মাস্টার পালাতে পারে না তার অন্তঃসত্ত্বা ছোটবোনকে রেখে। সে তবু বোনকে টেনে নিয়ে যেতে চায়, আজিজ মাস্টারের মা এতে করে তার কাপুরুষতা নিয়ে গালি দেয়। এই ভীতু আজিজ মাস্টারের কাছে নীলগঞ্জের মুরব্বিরা আসে। সে যেহেতু শিক্ষিত, ইংরেজি জানে, তাকে যেতে বলে মিলিটারিদের কাছে। আজিজ মাস্টার মেজরের সামনে যায়। মেজর তাকে প্রশ্ন করে, জবাবে খুশি না হয়ে চড় মারে, জানতে চায়, সবাই কোথায় লুকিয়েছে। আজিজ মাস্টার তার বউকে লুকিয়েছে কিনা জানতে চাইলে সে জানায়, সে বিয়েই করে নি। চল্লিশ বছরেও বিয়ে করে নি শুনে মেজর তার সঙ্গে মজা করে, তার 'যন্ত্রপাতি' ঠিক আছে কিনা জানতে চায়, এক পর্যায়ে তার পায়জামা খুলে ফেলা হয়। শুরুতে আজিজ মাস্টার মিথ্যা করে বলে সে পাকিস্তান ভালোবাসে, পাকিস্তানিদের ভালোবাসে, কিন্তু মেজর বলে, সত্যি কথা বললে তাকে ছেড়ে দেবে। সে তখন জানায়, সে পাকিস্তানিদের অপছন্দ করে, সে বাংলাদেশ চায়। মেজর দেশদ্রোহী হিসেবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চায়। আজিজ কিছু বলে না। মেজর অবশেষে তাকে কাপড় পরে বিদায় হতে বলে। গল্পটি এখানে এসেই মোড় পাল্টে ফেলে। আজীজ মাস্টার কাপড় পরে না, হঠাৎ একদলা থুথু মেজরের গায়ে মারে। আবার এগিয়ে এসে আরেক দলা থুথু ফেলে মেজরের শার্টে। কিন্তু মেজর কিছু বলে না, সে শান্ত স্বরে সবাইকে বলে, অনেক বিশ্রাম হয়েছে, এবার রওনা হওয়া যাক। গল্পের শেষ হয় এভাবে—'সৈন্যদল মার্চ করে এগুচ্ছে। মেজর সাহেবের মুখ অসম্ভব বিবর্ণ। পেছনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একজন নগ্ন মানুষ।' বর্বর পাকিস্তানি সৈনিকদের উদ্ধত অহং ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিবাদী চেতনার প্রতীকি প্রকাশ ঘটেছে আজিজ মাস্টার চরিত্রের মধ্য দিয়ে। সশস্ত্র মেজরের গায়ে নির্ভয়ে থুথু ছুড়ে মারে নগ্ন আজিজ মাস্টার। মৃত্যুর ভয়কে উপেক্ষা করে সে তার ঘৃণা প্রকাশ করে। সবচেয়ে ভীরু মানুষটিও যে দেশমাতৃকার অপমানে প্রয়োজনে সাহসী হয়ে উঠতে পারে, মৃত্যু ভয়কে তুচ্ছ করে তীব্র ঘৃণার প্রকাশ করতে পারে এ গল্পে তার নজির বিদ্যমান। হুমায়ূন আহমেদ এই গল্পের মধ্যে শুধু স্বাধীন দেশ নয়, সামগ্রিক অর্থে মানুষের স্বাধীনতার স্বাদ তুলে ধরেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বসভ্যতায় টিকে থাকার সংগ্রামে মানুষ সবচেয়ে এগিয়ে, কারণ সে পরাজয় মানতে জানে না। পরাজয় নিশ্চিত জেনেও মানুষ হাল ছাড়ে না, সবচেয়ে প্রান্তিক মানুষটিও জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যায় বীরের বেশে। এমনি এক বীর বক শিকারি আজরফ। 'শিকার' গল্পের নায়ক আজরফ। ভাটি অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে এ গল্প। "ধান আর গানের দেশ আমাদের ভাটি অঞ্চল। ভূপ্রকৃতি যেমন, তেমনই এর জীবন ধারা, আর শখ-সৌখিনতাও দেশের অন্য এলাকা থেকে ভিন্ন। আলাদা আলাদা কৌশলে পাখি ধরা এই এলাকার মানুষের প্রিয় ব্যসন। পোষা বক দিয়ে প্রলুব্ধ করে জংলি বক ধরা তার একটি। পাখি শিকারের এই কৌশল বিপজ্জনক বলেই হয়তো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অনেকের কাছে অতি প্রিয়। বক শিকারের এই ধারা প্রায় বিলীয়মান। এতে জংলি বকের তীক্ষ্ণ ঠোঁটের আঘাতে চোখ হারানো এক সাধারণ ঘটনা। শিকারি কিন্তু এতে দমিত হয় না। বক শিকারি আজরফ আর তার পোষা বক আনুফাকে নিয়ে হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্প 'শিকার'। গাল্পিকের মুন্সিয়ানায় ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরও পাঠককে এত অচেনা জগতে মুগ্ধ করে রাখার জন্য অপর্যাপ্ত মনে হয় না।

ভাটি এলাকার এমন আকর্ষণীয় ও বিশ্বস্ত ছবি আমরা এর আগে কেবল *জিবরাইলের ডানা* খ্যাত শাহেদ আলীর কিছু গল্পে প্রত্যক্ষ করেছি।

AMARBOI.COM

পিতা মতি মিয়ার কথা "পাখি-মারারা চোখ না যাওয়া পর্যন্ত ফিরতে পারে না"—শুনেই হয়তো শেষ মুহূর্তে আজরফ তার পোষা বক আনুফাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু আনুফা যায় না; বরং সে ডাকতে থাকে আর ঝাঁকে ঝাঁকে বক নেমে আসতে থাকে। গল্পের শেষাংশে লেখক টানটান উত্তেজনার সৃষ্টি করেছেন, "মাথার উপর উড়তে থাকা বকগুলো দ্রুত নিচে নেমে আসছে। আজরফ হাত বাড়াল। আসছে ওরা নেমে আসছে। এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত কাঁপিয়ে তারা ডাকল—কক কক।" শিকারি আজরফ জানে এই ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসা বকদের একটিই হয়তো আজ তার চোখ খুবলে নেবে। সে তবু নড়ে না। তাকিয়ে থাকে। মানুষের আদিম শিকারের মগ্ন নেশায় সে বুদ। শিকার ও শিকারির অদল-বদল হতে পারে যে-কোনো মুহূর্তে, বক শিকারি আজরফের চোখদুটো হতে পারে বকের ঠোঁটের শিকার। তবু নির্ভীক, নির্বিকার, অথবা কে জানে নিয়তি তাড়িত।

নিয়তি, দারিদ্র্য কিংবা প্রকৃতির কাছে মানুষ কখনো বা অসহায়। কখনো কখনো পরিস্থিতি আর পরিবেশের কাছে হার মেনে যায় মানুষ। জ্যাঁ জ্যাক রুশো বলেন, "It is too difficult to think nobly when one thinks only of earning a living." জীবন সংগ্রামের কাছে আপাতভাবে মানুষ বিপর্যস্ত হয়। তবু তার ভেতরের মানবিকতা মরে না। 'সুলেখার বাবা' গল্পটি দারিদ্র্যের সঙ্গে মানবিক স্নেহ-মমতার নিরন্তর লড়াইয়ের এক করুণ চিত্র। অভাবের তাড়নায় নাম পরিচয়হীন লোকটা নিজের সন্তানকে বিক্রি করে দিয়েছিল। তাকে যথেষ্ট টাকা দেওয়া হলেও সন্তানের জন্য তার মন টানে। সন্তানকে দেখতে আসে সে। পরিচ্ছন্ন, উচ্চবিত্ত, সুসংস্কৃত ঘরের সন্তান সুলেখা জানে না, সামনে বসে থাকা নোংরা লোকটি আসলে তার বাবা। সুলেখার মা তার হাত দিয়ে টাকা পাঠিয়ে লোকটিকে বিদায় হতে বলে। লোকটি টাকা নেয় না। সুলেখা তার মাকে প্রশ্ন করে "ওই লোকটি কে মা? তাকে তুমি বকছ কেন?"

সুলেখার মা তার জবাব দিলেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দারিদ্র্য আর অভাবের কাছে মানবিক মায়া যখন পরাজিত হয় তখন হয়তো কারও কাছেই কোনো জবাব থাকে না। জবাবহীনতা দিয়েই 'সুলেখার বাবা'র গল্পটি শেষ হলেও পিতৃস্নেহ শেষ হয় না। বেঁচে থাকার জন্য, পরিবারের আর সদস্যদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে নাম না-জানা যে লোকটি একসময় নিজের সন্তানকেই বিক্রি করে দিয়ে ছিল সে আজ আর মেয়েকে দেখতে এসে টাকা নিতে পারে না, নিষেধ সত্ত্বেও, আরও সন্তান থাকা সত্ত্বেও মেয়েকে সে ভুলতে পারে না। তার জন্য কেবল মন টানে।

'জুয়া' গল্পের দরিদ্র শিক্ষক প্রণব বাবুও অভাবের কাছে অসহায়। পুত্র সুবল মানুষ হয় নি, কন্যাকে কলকাতায় বিয়ে দিয়েছেন। সুবল বাবার কাছে এসে কিছু টাকা চায়, নইলে তার বিপদ হবে বলে। তিনমাস ধরে প্রণব বাবুর স্কুলে বেতন হয় না। হেডস্যার কমিশনের লোভে সব শিক্ষককে দিয়ে পাঁচটি করে লটারির টিকিট কিনিয়েছেন। প্রণব বাবু হঠাৎ করেই সেই লটারির টিকিট জিতে যান। পকেটে দুই লাখ টাকার টিকিট, অথচ এদিকে সুবল তিনশ টাকার জন্য হাত পাতে, বাজারের করিম মিয়া দুইশ এগার টাকার পাওনার তাগাদা দেয়, তবু তিনি কাউকে কিছু বলতে পারেন না। দীর্ঘদিনের দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত প্রণব বাবু আকস্মিক এত অর্থ প্রাপ্তিও যেন তাকে কোনো ভরসা দেয় না। এক পর্যায়ে প্রবাসী মেয়েটার কথা ভেবে তিনি কাঁদতে থাকেন। ছেলে আশ্বাস দেয়, সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রণব বাবু ধরা গলায় বললেন, 'কিছুই ঠিক হয় না।'

তার কথাকে সমর্থন করেই যেন ঘরের ভেতর থেকে তক্ষক ডেকে উঠল। বাইরে মাছের চোখের মতো মরা জ্যোৎস্না।

গল্পের শেষে এসে, প্রকৃতি আর পরিবেশ যেন চিরকালের মানব আবেগের সঙ্গী হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের মতো হুমায়ূনের কোনো কোনো গল্পেও প্রকৃতি আর মানব জীবন অবিচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে। তিনি একাধিক গল্প-উপন্যাসের নাম গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে। তার একাধিক ব্যক্তিগত লেখা, স্মৃতিচারণ, গ্রন্থ উৎসর্গে রবীন্দ্র স্তুতির অভাব নেই। রবীন্দ্র প্রভাব তার ছোটগল্পে থাকাও তাই স্বাভাবিক। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেছেন, "শুধু উপন্যাস নয়, ছোটগল্পের তার সিদ্ধি ছিল ঈর্ষণীয়। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো তার প্রতিটি গল্পে প্রতিফলিত এবং প্রতিটি গল্পের শেষে রবীন্দ্রনাথের না শেষ হওয়ার বিষয়টি ছিল যেন মুখ্য।"

ভয়াবহ দারিদ্র্যের কাছে মানবিকতার স্খলনের আরেকটি বিস্ময়কর গল্প 'খাদক'। গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেলে লেখকের সামনে হাজির করা হয় খাদক মতিকে। মতি এই এলাকার গর্ব, সে একাধিক মেডেল পেয়েছে, সে এক বসায় আস্ত গরু খেয়ে ফেলার খেলা দেখায়। মতি রেকর্ড গড়ার জন্য আস্ত গরু খেতে থাকে। অথচ তার অভুক্ত সন্তানেরা না-খেয়ে থাকে। লেখক যখন প্রশ্ন করেন, তার সন্তানেরাও খাদক কি-না, মতি জবাব দেয়, "জি-না। তারা না-খাওন্তির দল। খাইতে পায় না। কাজকাম তো কিছু করি না, খাওয়ামু কী? তারা হইল গিয়ে আফনের দেখক।"

'খাদক' অতিশয়োক্তি আর জীবন নিয়ে প্রহসনের গল্প। মানুষের বাজির কাছে মানবিক গুণও তুচ্ছ। *খাদক* গল্পে হুমায়ূন সেই স্বাক্ষরই এঁকেছেন। একটি লোক জীবিকার প্রয়োজনে, অন্যকে মুগ্ধ করে অর্থ উপার্জনের জন্য আস্ত গরু খেতে বসে, পাশেই তার অভুক্ত সন্তানেরা তাকিয়ে তাকিয়ে মাংসের স্তূপ নিঃশেষ হতে দেখে— এমন গল্পের প্রেক্ষাপট বিশ্বসাহিত্যে যথার্থই দুর্লভ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পিশাচ' গল্পে উঠেছে মানবিকতার এক দুর্লভ ছবি। মকবুল নির্বিবাদে মানুষ হত্যা করতে পারবে, মামাতো বোন কইতবীর স্বামীকে হত্যা করে ভালোবাসার পাত্রীকে ছিনিয়ে আনতে পারবে বলেই পিশাচ-সাধনায় মত্ত হয়েছে। সিদ্ধির জন্য আটটি কাক পানিতে চুবিয়ে মারতে হবে। খাঁচায় করে কাক নিয়ে ঘুরছে মাসের পর মাস। কিন্তু একটা কাক মারার নির্মমতাও আয়ত্ত করতে পারছে না। মকবুলের এই ব্যর্থতা মানবিক মূল্যবোধেরই জয়গাথা।

নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জীবনের ছোটখাটো ঘটনার চিত্রায়নে হুমায়ূন এক কুশলী। 'ফেরা' নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের ছোট্ট এক মানবিক দলিল। এ গল্পে আসলে তেমন কোনো ঘটনাই নেই, একরাতে এক পরিবারের ভাত খাওয়ার সাধারণ চিত্র। এই পরিবারটি ভালো মতো খেতে পায় না। জরী, পরী, দিপুকে নিয়ে হাসিনার সংসার। জরী প্রতিদিন এক জিনিস দিয়ে ভাত খেতে চায় না, একটা ডিম ভাজি হলেও সে খুশি, তার সঙ্গে ছোটভাই দিপুও খেতে চায় না। ভাত নিয়ে রাগ করে। অন্যদিকে অসুস্থ পরী মরিচ দিয়ে হলেও একটু ভাত খেতে চায়। কিন্তু তাকে দুধ দেওয়া হয়। এরমধ্যে ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দিপুর বাবা সুখবর নিয়ে আসে, তার বেতন বেড়েছে চল্লিশ টাকা। সেই খুশিতে সে একটি মাছ নিয়ে এসেছে।

নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে একটি মাত্র রুইমাছ আনন্দধারা বইয়ে দেয়, এক মুহূর্তে দারিদ্র্য ও বেদনা কাটিয়ে জোছনার আলো প্রকটিত হয়ে ওঠে। একটু আগেও হাসিনার কাছে অভাব জর্জরিত যে জীবন বিষাদময় ছিল সে হাসিনা এখন চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়। "বাসন-কোসন কলতলায় রাখতে গিয়ে হাসিনা অবাক হয়ে দেখে মেঘ কেটে অপরূপ জোছনা উঠেছে। বৃষ্টিভেজা গাছপালায় ফুটফুটে জোছনা। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সেদিকেই। অকারণেই তার চোখে জল এসে যায়।" মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে প্রকৃতির এ এক নিদারুণ বন্ধন। *গল্পগুচ্ছ* প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যটি 'মানব জীবন বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিকায় প্রসারিত'—এ গল্পের সঙ্গেও মিলে যায়।

'জলছবি' গল্পটিতেও মধ্যবিত্ত জীবনে একটি চাকরি ও প্রমোশনের প্রভাব ও প্রত্যাশা ফুটে উঠেছে নিবিড়ভাবে। কেরানি জলিল সাহেব অফিসে আলু ভাজা রুটি দিয়ে লাঞ্চ সারেন, তাকে সবাই মিস্টার পটেটু ভাজা বলে। সেকশন অফিসার নাজমুল হুদা তাকে পছন্দ করেন না। প্রায়ই হেনস্থা করেন। ডেসপাস সেকশনের মিষ্টি মেয়েটিও তার সঙ্গে আলু ভাজি নিয়ে রসিকতা করে। প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা উঠিয়ে বাবার শেষ চিকিৎসা করেছেন। বাবা বাঁচে নি, কিন্তু জলিল সাহেব সদাই এক অনিশ্চয়তা আর ভয়ের মধ্যে জীবনযাপন করেন। এই অবস্থায় একদিন অফিস যেতে গিয়ে বাসে ওঠার সময় তার জুতার তলা খুলে যায়। জুতা ঠিক করে অফিসে আসতে তার দেরি হয়ে যায়। এরমধ্যে বড় সাহেব তাকে খোঁজ করেছে শুনেই তিনি ঘামতে থাকেন। তার মনে হলো, নিশ্চয়ই তার চাকরি চলে গেছে। অথচ বড় সাহেব তাকে প্রমোশনের খবর দিলেন। দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তা, দারিদ্র্য তাকে এতটাই কাবু করে ফেলেছে যে সে এ খবর হজম করতে পারে না। স্যার হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়ালে সে কিছুই বুঝতে পারে না। "যখন পারলেন তখন তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। তিনি ধরা গলায় বললেন, 'স্যার জুতাটা ঠিকমতো সেলাই করে নি। একটা পেরেক উঁচা হয়ে আছে। খুব ব্যথা লাগছে।" দীর্ঘদিনের কেরানি হঠাৎ অফিসার গ্রেডে প্রমোশন পেয়ে আত্মস্থ হতে সময় নেন। এরপর সবাই বিরিয়ানি আর টিকিয়া দিয়ে লাঞ্চ করে। জলিল সাহেবের তখন ইচ্ছা করে ডেসপাস সেকশনের মেয়েটিকে ডেকে দেখাতে চায় যে, আজ তার টিফিন বাটিতে আলুভাজি, রুটির সঙ্গে একটি গুড়ের সন্দেশ আছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটি দিয়ে দিয়েছে। "মেয়ে জাতটা হচ্ছে মায়াবতীর জাত। শুধু শুধু মায়া দেখায়। জলিল সাহেবের চোখ আবার ভিজে উঠল। ডেসপাস সেকশনের মেয়েটি বলল, স্যার আপনার কষ্ট হচ্ছে। আপনি বরং জুতাটা খুলে রাখুন।"

এই গল্পে বাম পায়ের জুতার তলা খুলে পরা, জুতা সারাতে গিয়ে অফিসে দেরি হওয়া, অফিসে বড় স্যারের সামনে প্রমোশনের কথা শুনে জুতার পেরেকের কথা বলা, পছন্দের মেয়েটির মুখে জুতা খুলে রাখা এই সবই যেন দরিদ্র, সাধারণ মানুষের জীবনের এক প্রতীকী উপস্থাপন। লেখক নিম্নমধ্যবিত্ত কেরানি জীবনকে জুতার সঙ্গে সুচতুরভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন। মানবিকতা এখানে জুতার তলা আর বেরিয়ে থাকা পেরেকের মধ্যে আটকে আছে।

একদিকে মানুষের অমিত সম্ভাবনা, অন্যদিকে পরিবেশ ও পরিস্থিতির সামনে অসহায়ত্ব—মানবিকতার শক্তি ও দুর্বলতা দুটোই ফুটে উঠেছে হুমায়ূন আহমেদের গল্পে। তবু শেষ পর্যন্ত এইসব গল্পের মধ্যে 'মানুষ মরে যাবে তবু পরাজিত হবে না' হেমিংওয়ের সেই বাণীই প্রমাণিত হয়।

'জলছবি', 'সুলেখার বাবা', 'জুয়া' 'ফেরা' গল্পসমূহের মধ্যে মানবিকতার আরেকটি দিক আমরা লক্ষ করি, সেটি বাৎসল্য রস। লক্ষণীয় এই সবগুলো গল্পেই পিতৃস্নেহ প্রকটিত। হুমায়ূনের গল্পের অন্যতম আরেকটি দিক এই বাৎসল্য রস। নুন আনতে যাদের পান্তা ফুরায় তাদের হৃদয়েও ভালোবাসার কোনো অভাব হয় না। নিম্নবিত্ত অথবা মধ্যবিত্ত, যেই প্রেক্ষিতেই গল্প রচনা করুন না কেন, মানবিক মায়া, বাৎসল্য, স্নেহ, করুণা প্রভৃতিতে ভরে ওঠে তার প্রতিটি গল্প।

'সৌরভ' গল্পে নিম্নমধ্যবিত্তের আয় নিয়ে আজহার খাঁ সংসারের খরচ চালিয়ে ছেলেমেয়েদের কোনো শখই প্রায় পূরণ করতে পারেন না। বড় মেয়ে লিলি একটা জিনিস এনে দেওয়ার জন্য পিতাকে অনেক দিন ধরেই বলছে। পিতার আয়ের কথা জেনেও মেয়ের এই অহেতুক আবদার তাকে বিরক্ত করে। অভিমানী মেয়ে একদিন তার জমানো তিনটা দশ টাকার নোট দিয়ে পিতাকে জিনিসটা এনে দেওয়ার জন্য বলল। লজ্জা ও হতাশার এক মিশ্র অনুভূতি নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। তাঁর মনে হলো লিলি যেন তাঁকে লজ্জা দেওয়ার জন্যেই তিনটা দশ টাকার নোট দিয়ে জিনিসটা এনে দিতে বলল। তাঁর আরও মনে হলো তিনি কুকুরের জীবন অতিবাহিত করছেন। তখন ঝপ্ ঝপ্ করে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টির ধারা ঝরছে। এক দোকানে গিয়ে মেয়ের আবদার করা 'ইভিনিং ইন প্যারিস' নামের সেন্টের শিশিটা খুঁজে পান, কিন্তু ছাব্বিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা দাম দিতে গিয়ে দেখেন তাঁর পকেটে লিলির দেওয়া টাকাগুলো নেই, পড়ে গেছে, অন্য পকেটে মাত্র আড়াই টাকা আছে। নির্বিকার দোকানি যথাস্থানে জিনিসটা রেখে দেয়। আজহার খাঁ খুবই ব্যথিত হন। মেয়ে শখ করে একটা জিনিস চেয়েছে, তার দেওয়ার সামর্থ্য নেই, মেয়ে টাকা জমিয়ে দিয়েছে, সে টাকা তিনি হারিয়ে ফেললেন। উদ্‌ভ্রান্তের মতো তিনি রাতের রাজপথ বেয়ে ছুটে চলেছেন। পিতার বেদনার সঙ্গে মিলিয়ে তখন প্রবল বৃষ্টি ঝরছে। বৃষ্টিতে ভিজে তিনি বন্ধু রফিকের কাছে টাকা ধার করার জন্য গেলেন। যেমন করেই হোক মেয়ের জন্য জিনিসটা কিনতেই হবে। তিনি তখন অনুভব করলেন তাঁর জ্বর এসে গেছে। বন্ধুর সহানুভূতি ও টাকা নিয়ে তিনি দোকানির ঘুম ভাঙিয়ে সেন্টের শিশিটা যখন জোগাড় করলেন তখন রাত সাড়ে বারোটা বাজে। রিকশায় করে বাসার কাছে আসতেই তিনি লক্ষ করেন, হারিকেন জ্বালিয়ে লিলি আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিলির মা তাঁর জন্যে উৎকণ্ঠিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। রিকশা থেকে নামতে গিয়ে আজহার খাঁ হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। সেইসঙ্গে শিশিটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। চারদিকে সুবাস ছড়িয়ে পড়ে।

"তিনি ধরা গলায় বললেন, লিলি তোর শিশিটা ভেঙে গেছে রে। লিলি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, "আমার শিশি লাগবে না। তোমার কী হয়েছে বাবা ?"

বাবা ঘরে ঢুকলেন। গভীর রাতে তিনি জ্বরে আচ্ছন্ন। হারিকেনের রহস্যময় আলো জ্বেলে উৎকণ্ঠিত মেয়ে লিলি আর লিলির মা জেগে আছেন। জানালা দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া আসছে। "আর সেই হাওয়া সেন্টের ভাঙা শিশি থেকে কিছু অপরূপ সৌরভ উড়িয়ে আনল।"

গল্প এখানে শেষ হলেও, এই সৌরভ পাঠকের মনে ছড়িয়ে থাকে দীর্ঘকাল। সেন্টের শিশির এই সৌরভ যেন প্রকারান্তরে পিতা ও কন্যার ভালোবাসার সৌরভ, দরিদ্র পরিবারে ভালোবাসার সৌরভ।

সমালোচক আজহার ইসলাম লিখেছেন, "সংসারের অনেক যন্ত্রণার মধ্যেও বাৎসল্যের এই ছোঁয়াটুকু না থাকলে তো পুরো সংসারটিই মিছে হয়ে যায়। হুমায়ুন আহমেদ অদ্ভুত কৌশলে কন্যার প্রতি যেমন পিতার বাৎসল্যের ছবি অঙ্কন করেছেন তেমনি সংসারের ভারে ন্যুব্জ পিতার প্রতিও উৎকণ্ঠিত কন্যার, যেন ছেলের প্রতি এক মায়ের, বাৎসল্য সঞ্চার করে মায়া আর মমতার এক অপরূপ ছবি পাঠককে উপহার দিয়েছেন।"

'অঙ্কশ্লোক' গল্পের জালালুদ্দিন বি.এ.বি.টি অঙ্ক নিয়ে নানা রকম শ্লোক তৈরি করেন। তাকে সবাই পাগলা মাস্টার নামেই চেনে। এককালে অঙ্কের মুসলমান যাদব, অঙ্কের জাহাজ বলা হতো। পাটীগণিতের যে-কোনো অঙ্ক তিনি মুখে মুখে করতে পারতেন। কিন্তু এখন প্রায় পাগল হয়ে গেছেন। "দিনরাত কবিতা-টবিতা লেখেন আর অঙ্কশ্লোক। মেয়েটা মারা যাবার পর মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। খুব আদরের ছিল মেয়েটি। নাইনে পড়ত। অঙ্কে কাঁচা ছিল বলে বাবার কাছে খুব বকা খেতো। মেয়েটা বাবাকে অসম্ভব ভয় করত। মেয়েটা মরবার আগে বাবাকে বলল, এখন তোমাকে কেন জানি ভয় লাগছে না বাবা। আগে ভয় লাগত। অঙ্ক ভয় লাগত, সেই সঙ্গে তোমাকেও লাগত। এখন একটুও ভয় লাগছে না।

মেয়েটার মৃত্যু স্যারকে খুবই অ্যাফেক্ট করে। মাথায় একটা চিন্তা ঢুকে যায়—কী করে ছাত্রদের অঙ্ক ভীতি দূর করা যায়। আস্তে আস্তে মাথাটাই খারাপ হয়ে যায়।"

বর্তমানে তিনি বিশাল খাতায় অঙ্ক শ্লোক লিখছেন, যেগুলো দিয়ে বই করবেন, বইয়ের নাম রেখেছেন 'নুরুন্ন নাহার', তার কন্যার নামে নাম। দশ হাজার শ্লোক সম্পন্ন হলেই তিনি পুস্তক প্রকাশ করবেন। তার দুঃখ, এই বইটা আরও পনের বছর আগে লিখতে পারলে তার কন্যার কাজে লাগত। গল্পের শেষ লাইনে এসে তিনি লেখকের কাছে প্রার্থনা করেন, 'একটু দোয়া রাখবেন। কাজটা যেন শেষ করতে পারি।'

পিতৃস্নেহের এমনি ফল্গুধারা ঝরে পড়েছে তার আরেক গল্প 'আনন্দ-বেদনার কাব্য'-তে। *রিক্তশ্রী পৃথিবী* নামের একটি কাব্যগ্রন্থ ও কবিকে নিয়ে এই গল্প তৈরি হয়েছে। লেখক গ্রন্থটির ভূমিকা পড়েন "দীর্ঘ পাঁচ বছর পূর্বে রিক্তশ্রী পৃথিবীর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করি। সেই সময় আমার অতি আদরের জ্যেষ্ঠ কন্যা মোসাম্মৎ নুরন্নাহার খানম (বেনু) উক্ত গ্রন্থের জন্য প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কন করে। অর্থাভাবে তখন গ্রন্থটি প্রকাশ করিতে পারি নাই। আজ প্রকাশিত হইল। কিন্তু হায়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বেনু মা দেখিতে পাইলো না।" এই গ্রন্থ এবং গ্রন্থের কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতা নিয়েই লেখক গল্পটি লিখেছেন। *রিক্তশ্রী পৃথিবী* কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো তেমন মান সম্পন্ন নয়। "রিক্তশ্রী পৃথিবীতে মোট এক শ' তেরটি কবিতা আছে। প্রতিটি কবিতার নীচে রচনার স্থান, তারিখ এবং সময় দেওয়া আছে। অনেকগুলোর সঙ্গে বিস্তৃত ফুটনোট।" সেই সব ফুটনোটে কোথাও লেখা আছে বড় শ্যালকের বাড়িতে খরস্রোতা নদী দেখে কবিতাটি মনে মনে রচিত, কোথাও বাসর রাতে লেখা কবিতার কথা আছে। লেখক এই কাব্যগ্রন্থ পড়ার অভিজ্ঞতা এভাবে বর্ণনা করছেন, "কবি কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে কত আজেবাজে জিনিসই না লিখেছেন। ইরানের শাহকে নিয়ে পর্যন্ত একটা কবিতা আছে। কী আছে এই স্বৈরাচারী রাজার মধ্যে যে তাকে নিয়ে পর্যন্ত একটা কবিতা লিখতে হলো ? তিনটি কবিতা আছে মহাসাগর নিয়ে। কিন্তু কবি সাগর-মহাসাগর কিছুই দেখেন নি।" পুরো কবিতার বইটি নিয়েই লেখক হালকা চালে কথা বলেছেন এবং এর কাব্য সৌন্দর্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শেষ কবিতাটির কথা দিয়ে লেখক গল্পটি শেষ করেছেন এভাবে—"শেষ কবিতাটির নাম 'মাগো'। কবিতাটি নুরুন্নাহার খানমকে নিয়ে লেখা। ফুটনোট থেকে জানতে পারি, মৃত্যুর আগের রাতে সে যখন রোগ যন্ত্রণায় ছটফট করছিল তখন তার অসহায় বাবা এই কবিতাটি লিখে এনেছিলেন মেয়েকে কিঞ্চিৎ 'উপশম' দেওয়ার জন্য। কবিতাটি ক্ষুদ্র এবং রচনাভঙ্গি অন্য কবিতার মতোই কাঁচা। কিন্তু প্রতিটি শব্দ চোখের গহীন জলে লেখা বলেই বোধ করি কবিতাটি দুঃখী বাবার মতোই হাহাকার করে ওঠে। সেই হাহাকার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়ে চলে যায় অদেখা সব ভুবনের দিকে। একটিমাত্র কবিতা লিখেও কেউ-কেউ কবি হতে পারেন। অল্প কিছু পঙক্তিমালাতেও ধরা দিতে পারে কোনো এক মহান বোধ, মহান আনন্দ, জগতের গভীরতম ক্রন্দন। সেই অর্থে আমাদের 'রিক্তশ্রী'র কবি একজন কবি।"

AMARBOI.COM

যে মহান বোধ, যে মহান আনন্দ ও জগতের গভীরতম যে ক্রন্দনের কারণে রিক্তশ্রী'র কবি একজন কবি হয়ে ওঠেন সে বোধ, সে আনন্দ ও বেদনা কন্যা হারানো এক পিতার হৃদয় নিঃসৃত। পিতৃস্নেহের এমন সরল প্রকাশ বিশ্ব সাহিত্যে যথার্থই দুর্লভ বিবেচনা করি।

'কবি' গল্পেও একজন আত্মভোলা কবি জোবেদ আলীর কথা জানা যায়, যার কন্যা জ্বরাক্রান্ত। জোবেদ আলী একটা প্রেসে প্রুফ রিডারের কাজ করে। সারা রাত কাজ করে বাসায় ফিরে দেখে কন্যার জ্বর কমে গেছে, কিন্তু কন্যার আবদারের সামান্য সাগর কলাটি সে আনতে পারে নি। কিন্ত সে নিয়ে তার কোনো আক্ষেপ নেই, বরং ঝড়-বৃষ্টির রাতে আত্মভোলা কবি খাতাকলম নিয়ে কবিতা লিখতে বসে যান। এদিকে মেয়ের জ্বর বাড়ে, অসুস্থ মেয়ের 'বাবা' ডাক তার কানে পৌঁছায় না। মেয়েটি দেখে তার কবি বাবার চোখ দিয়ে আবেগে পানি পড়ছে। কিন্তু কবির এই আবেগকে সে বোঝে না। "শিশুরা অনেক কিছুই বুঝতে পারে, আবার অনেক কিছুই বুঝতে পারে না।" এই একটি বাক্য দিয়ে হুমায়ূন আহমেদ তার গল্প শেষ করেন। কিন্তু পাঠকের বোধের আরেকটি নতুন দিগন্ত খুলে যায় এ গল্পে। আবেগাপ্লুত কবি পিতার প্রতি অসুস্থ কন্যার দরদি ডাক না পৌঁছালেও পাঠকের হৃদয়ে তা পৌঁছে যায়।

'সুলেখার বাবা', 'সৌরভ' 'অঙ্ক শ্লোক', 'আনন্দ-বেদনার কাব্য'—সবগুলো গল্পের কেন্দ্র জুড়ে রয়েছে পিতা ও কন্যার মধুর সম্পর্ক। গল্পকারের অন্তর নিঙড়ানো পিতৃস্নেহের পরিচয় এই গল্পগুলোর পরতে পরতে বিদ্যমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বুড়ি' গল্পেও বাৎসল্য রসের প্রকাশ দেখি, অবশ্য ভিন্নতর প্রেক্ষিত ও পটভূমিতে। আমেরিকার নিঃসঙ্গ এক বৃদ্ধা এলিজাবেথ গ্যারাজ সেল থেকে ব্যাগ পাইপ কিনে নিয়ে আসে এবং মাঝরাতে তা বাজাতে থাকে। তার সঙ্গী বোর্ডাররা এতে মহা বিরক্ত। কিন্তু এলিজাবেথ নির্বিকার। এলিজাবেথ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে সবাই তাকে কার্ড নিয়ে দেখতে যায়। বুড়ি তখন লেখকের কাছে স্বীকারোক্তি দেয়, "ব্যাগ পাইপ কেন বাজাতাম জানো? একা একা থাকতে এত খারাপ লাগত! কুৎসিত বাজনাটা বাজালেই তোমরা কেউ না কেউ আসতে—খানিকক্ষণ কথা বলতে পারতাম। স্যরি! তোমাদের কষ্ট দিয়েছি।" এই একটি স্বীকারোক্তির মাধ্যমে পুরো মার্কিন সমাজে বৃদ্ধদের নিঃসঙ্গতা, অসহায়ত্ব এবং তাদের অন্তরে লুকানো ভালোবাসার পিপাসা বড় জ্বলন্ত আর প্রকট হয়ে প্রকাশিত হয়। আর সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশের প্রেক্ষাপটে লেখক এলিজাবেথকে আমাদের চেনা মাতৃস্নেহের আদলে গড়ে তোলেন। সুদূর আমেরিকার এক বৃদ্ধা যেন বাংলাদেশের শাশ্বত জননী হয়ে ওঠেন।

এইসব স্নেহধারা আর করুণা ও মায়ার আবরণে হুমায়ূন আহমেদ তার গল্পে মানবিকতার এক ভিন্ন জগৎ তুলে ধরেন। "ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরে তিনি আলো ফেলেছেন জগত ও জীবনের এদিক ওদিক। আর প্রতিটি আলোকপাতেই উঠে এসেছে এই জীবনের, তা সে যত নিরানন্দই হোক, অনিন্দ সৌন্দর্য কিংবা শাশ্বত সত্যের ছবি।"

AMARBOI.COM

'গোপন কথা' গল্পটি বেদনা বিধূর প্রেমের গল্প হলেও এর আড়ালেও রয়েছে মানুষের মহত্ত্ব ও ভালোবাসার ক্ষমতার প্রকাশ। খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেল মঞ্জুর। তখন চারদিকে আলো আঁধারের এক অদ্ভুত পরিবেশ। সে মুগ্ধচিত্তে ভাবছে, আজ কিছুতেই মন খারাপ করবে না, রাগ করবে না। ঠিক তখনি দেখা গেল পাশের চৌকিটাতে বাকের সাহেব কুৎসিত ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন। মশারির মধ্যেই তিনি নাক ঝাড়লেন। মঞ্জু তাকে বলল, আজ এই এগারই বৈশাখ তাঁর জন্মদিন। বাকের সাহেব বললেন, 'আমি কাঁঠালের সিজনে জন্মেছেন।' জন্মদিনের সকালটা একটা শুভেচ্ছা দিয়ে শুরু করতে পারল না মঞ্জু। তবু এই সুন্দর সকালটি বিফল হতে দেবে না মঞ্জু। সে ভাবল, আজ সন্ধেবেলা নীলুর বাসায় যাবে, বহুদিনের জমানো গোপন কথাটি আজ বলবে। আর ঠিক তখনই বাকের সাহেব বাথরুম থেকে ফিরে এসে বললেন, 'পায়খানা কষা হয়ে গেছে ভাই।' জন্মদিনের চমৎকার সকালটি যেন ক্রমাগত অসুন্দরে ভরে যেতে থাকল। তবু মঞ্জু নাখোশ হয় না। কেননা, তখন আকাশে হালকা নীলের ছোপ ধরেছে। পাখিরা কলরব করছে। কথক মঞ্জু ভাবলো, 'গোপন কথা বলার জন্য এরচে, সুন্দর দিন আর হবে না।' সে ছুটে গেল নীলুদের বাড়িতে। কিন্তু নীলুর তার দিকে মনই নেই। সে ব্যস্ত ভূতের গল্প শুনতে। নীলুর ছোটবোন বিলুর মাস্টার দু'বোনকে ভূতের গল্প শোনাচ্ছেন। সেই ভূতের গল্পতেই মশগুল নীলু। মঞ্জু বারবার চেষ্টা করেও নীলুর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেল না। মনমরা হয়ে সে ঘরে ফিরে এল। গোপন কথাটি গোপনই রয়ে গেল। কিন্তু ঘরে ফিরেও কী শান্তি আছে! সে ঘরে ফিরে দেখে অন্ধকারে বাকের সাহেব শুয়ে আছে। তাকে ঢুকতে দেখেই ক্লান্ত স্বরে বলল, 'শরীরটা খারাপ করছে ভাই। বমি হয়েছে কয়েকবার। একটু সাবধানে আসেন, পরিষ্কার করা হয় নাই।' মঞ্জু অনেক রাত পর্যন্ত নোংরা পরিষ্কার করল। অনেক রাতে শুতে গেলে জানতে পারে দরিদ্র বাকের সাহেব এই অসুস্থতার মধ্যেও তার জন্মদিনের উপহার হিসেবে এক প্যাকেট সিগারেট উপহার হিসেবে এনে রেখেছে। নীলুকে না-বলা প্রেমের বেদনা মুহূর্তে বাকের সাহেব আর মঞ্জুর সম্পর্কের উজ্জ্বলতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারিয়ে যায়। মঞ্জু তাই বাকের সাহেবকে প্রশ্ন করে, একটা গোপন কথা শুনবেন ভাই ? "বাকের সাহেব বিছানায় উঠে বসলেন। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। আজ বোধহয় পৃথিবী ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যে গোপন কথাটি বলা হয় নি সেটি আমি বলতে শুরু করলাম। আমার ভালোই লাগল।" এবং শেষ পর্যন্ত এই ভালো লাগার বোধ পাঠকের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। মঞ্জু'র অব্যক্ত প্রেমের গোপন কথাটির সঙ্গী হয়ে উঠেন পাঠক। আর সাধারণ একটি প্রেমের গল্পকে মানবিক সম্পর্কের উচ্চতায় নিয়ে যান হুমায়ূন অনায়াসেই। গোপন কথাটি আর গোপন থাকে না। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা কোনো না কোনোভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে হুমায়ূন আহমেদের একটি ভিন্নতর গল্প 'শীত'। উল্লেখ্য, শীতকে উপজীব্য করে বিশ্বসাহিত্যে একাধিক মানবিক গল্প রচিত হয়েছে। টলস্টয়ের 'হোয়াট ম্যান লিভ বাই' গল্পে কিংবা চার্লস ডিকেন্সের 'আ ক্রিসমাস ক্যারল' উপন্যাসে শীত এসেছে প্রতীকিভাবে। হুমায়ূনের গল্পেও শীত এসেছে দারিদ্র্য, গ্লানি আর বেদনার নগ্ন প্রকাশ নিয়ে। গল্পের অসহায় বৃদ্ধ মতি মিয়া শীতের কষ্ট সইতে পারে না। তাই সোহাগীর সি.ও রেভিন্যু রশীদ সাহেবের কাছে শহীদ পুত্রের দোহাই দিয়ে কম্বল আনতে যায়। পুত্র হারানো মতি মিয়া শহীদের জনক হিসেবে গর্ব করে আবার শহীদ পুত্রের নাম ভাঙিয়ে শীতের প্রকোপ কাটাতে কম্বল ভিক্ষা করে আনে। শীত তো কেবল একটু অজুহাত আসলে মতি মিয়ার এই পরাজয় রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার কাছে। শহীদ সন্তানের পিতা ভিক্ষা কম্বলের ওমে উষ্ণ হয় আর নাতি ফরিদকেও কম্বলের নিচে ডেকে নেয়। কিন্তু শহীদ মেছের আলীর বিধবা স্ত্রী এ লজ্জা, গ্লানির অন্তঃদহনে দগ্ধ হয়।

www.amarboi.com

মানুষ চায়, চিরকালই তার ভাবনা, বোধ, অভিজ্ঞতা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ুক। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে 'জনক' গল্পে হুমায়ূন মানব ইতিহাস, ঐতিহ্য বিস্তারের কাহিনি তুলে ধরেছেন ঘরোয়া ভঙ্গিতেই। মুক্তিযোদ্ধা মতি পঞ্চাশ বছর বয়সে এসে পুত্রের জনক হয়েছে। সন্তান জন্মদানের ধকলে স্ত্রী জয়গুন কাতর, মরার মতো ঘুমায়। রাতে পুত্র মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেনের ঘুম ভেঙে গেলে সে-ই ভেজা কাথা পাল্টে দেয়। পুত্রের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলে, 'কি রে ব্যাটা কান্দ কেন ? নটি বয়। ভেরী নটি বয় ?' 'ঠোঁট বাঁকা কেন ব্যাটা ? ক্ষুধা লাগছে ? হাঙ্গার ?' যুদ্ধের সময় সে কিছু ইংরেজি শিখেছিল। ছেলেকে এইসব ইংরেজি শোনায়। ঘুম থেকে উঠিয়ে বউ জয়গুনকে মুরাদখালীর যুদ্ধে সে কীভাবে এসেছে রাত জেগে জেগে তা শোনাতে চায়। সে চায়, তার মৃত্যুর পর এইসব গল্প যেন ছেলেকে তার মা বলতে পারে। ছেলে স্বাধীন দেশে জন্মেছে এই জন্য মতি খুব গর্ব বোধ করে। ক্লান্ত জয়গুন ঘুমিয়ে পড়লেও দুধের শিশুকে কোলে নিয়ে মতি যুদ্ধের নানা অপারেশনের গল্প শোনায়। "গল্প বলতে বলতে মতি মিয়ার চোখ জলে ভর্তি হয়ে আসে। চোখভর্তি অশ্রুর কারণেই বোধহয় শিশু পুত্রটিকে তার অন্যরকম মনে হয়। তার বড় মায়া লাগে। মতি মিয়ার শিশুপুত্র চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে। মনে হয় বাবার গল্পটা সে বুঝতে পারছে।" এ যেন গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি হস্তান্তরের এক ব্যক্তিগত দলিল। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে ছেলের অন্তরে গেঁথে দিতে চায় মতি। তাই ছেলের নামও রেখেছে শহীদ সহযোদ্ধার নামে। মানুষ এইভাবেই তার প্রজন্মকে, তথা সমগ্র মানব জাতিকে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা ধরিয়ে দেয়।

হুমায়ূন আহমেদের রহস্য ও অতিপ্রাকৃত গল্পগুলো অ্যালান পো'র রহস্য জগতের কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে অ্যালান পো'র মতো তার জগৎ রহস্যময় হলেও অন্ধকার আর বিকৃত নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই কবর থেকে জেগে ওঠা কিশোরের গল্প 'ছায়াসঙ্গী'-তেও আমরা মানবিকতা দেখি। শীতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেলে লেখকের সঙ্গে পরিচয় হয় মন্তাজ মিয়ার। সে ছোটখাট চুরি করে। লেখকের একটি কলম চুরি করলে তাকে প্রচণ্ড মার দেওয়া হয়, কিন্তু লেখক বলেন, এই কলমটি তিনিই তাকে দিয়েছেন। এতে মন্তাজ মিয়া বিস্মিত হয়। এই মন্তাজ মিয়ার সঙ্গে লেখকের সুসম্পর্ক হয়। কিন্তু সে যখন বুঝতে পারে, মন্তাজ তাকে কবরে থাকার অভিজ্ঞতা, সেখান থেকে বেঁচে আসার অদ্ভুত রহস্য প্রকাশ করবে না তখন জোর করে না; বরং এই শিশুটির প্রতি এক মানবিক মায়া বোধ করে। হুমায়ূন আহমেদের অদ্ভুত রসের গল্পের জগতে প্রাণীদের একটা বিশেষ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। 'কুকুর' গল্পে একজন আলীমুজ্জামানের কথা জানতে পারি। যৌবনে তিনি একটি কুকুর ছানাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন। একদল পথশিশু কুকুর ছানাটির গলায় ঘুঙুর বেঁধে, গায়ে কেরোসিন ঢেলে সেটিকে আগুনে ফেলে দেয়, কুকুরটি পুড়বে, ঘণ্টি বাজবে, খুব আনন্দ হবে। কুকুরটির গায়ে আগুন দেওয়ার পর আলীমুজ্জামান ছুটে যান। কুকুরটিকে বাঁচাতে পারেন নি, নিজেও ভয়াবহ আহত হন। গল্পের রহস্যময় দিকটি শুরু হয় এর পর থেকেই। মাঝে মাঝেই রাত-বিরাতে শওকত সাহেবের বাসার সামনে অসংখ্য কুকুর দেখা যায়। তার বোন মজা করে বলে, তিনি কুকুরকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন বলে কুকুররা কৃতজ্ঞতা জানাতে আসে, কুকুরদের রাজা সে। কিন্তু বিস্ময়কর হলো এইসব কুকুরের মধ্যে আগুনে পোড়া প্রায় কয়লা হয়ে যাওয়া কুকুরটিও থাকে। অবশ্য সে কুকুরটিকে শওকত সাহেব ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না। এই গল্পের মধ্যে শিশুদের অযৌক্তিক নিষ্ঠুরতা যেমন মানব চরিত্রের একটি দিক তুলে ধরে অন্যদিকে শওকত সাহেবের মহত্ত্বও প্রকাশিত হয়।

১৯৭৩ সালে বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশিত 'তোমাদের জন্য ভালোবাসা' হুমায়ূন আহমেদ রচিত প্রথম সায়েন্স ফিকশনই শুধু নয়, এটি বাংলাদেশে প্রকাশিত প্রথম সায়েন্স ফিকশন। বাংলা সাহিত্যের ম্রিয়মাণ এই ধারাটিতে তিনি নতুন প্রাণ দিয়েছেন। *শীত ও অন্যান্য গল্প* গ্রন্থে সংকলিত 'যন্ত্র' গল্পটি তার প্রথম সায়েন্স ফিকশন। আজকের বাংলাদেশে প্রকাশক ও পাঠকের কাছে সায়েন্স ফিকশন একটি স্বীকৃত ঘরানা। বলা যায়, হুমায়ূন একক চেষ্টাতেই এটি শুরু করেছিলেন। আজকের তরুণ প্রতিশ্রুতিশীল সাহিত্যিক আহমাদ মোস্তফা কামাল তার এই রচনাগুলো সম্পর্কে বলেন, "তিনি যখন সায়েন্স ফিকশন লিখেছেন সেগুলোকে নিয়ে গেছেন এক ভিন্ন উচ্চতায়। সেগুলো শুধু বিজ্ঞান বা ফিকশন থাকে নি, তাঁর হাতের ছোঁয়ায় হয়ে উঠেছে মূল্যবান মানবিক দলিল। তাঁর রচিত সায়েন্স ফিকশন এই একটি জায়গায় পৃথিবীর অন্য সব সায়েন্স ফিকশন থেকে আলাদা।"

'যন্ত্র' গল্পটিতে দেখা যায়, মানুষ অমরত্বের পর্যায়ে চলে গেছে। পৃথিবীতে এখন জনসংখ্যা ভয়াবহভাবে নিবারণ করা হচ্ছে। মানুষের কোনো কাজ নেই, সব কাজ রোবট করে। এক বৃদ্ধ ব্যক্তি তার সঞ্চিত সব টাকা দিয়ে একটি যন্ত্র কিনে আনেন। পি থার্টি টু নামের এই যন্ত্র প্রতিদিন এক ঘণ্টার বেশি ব্যবহার করে যন্ত্র কেনার কথা জানালে স্ত্রী তাকে শুভেচ্ছা জানায়। বলে, 'আচ্ছা, তোমার যন্ত্র তোমার জীবনকে আনন্দময় করে তুলুক। আমাদের মতো দম্পতিদের যন্ত্রের আনন্দের প্রয়োজন আছে।' লেখক জানাচ্ছেন, 'তাদের মতো দম্পতি পৃথিবীতে অসংখ্য আছে যাঁরা সন্তান জন্মাবার অধিকার পান নি। মানব জাতির স্বার্থে তা করা হচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে পৃথিবীর জনসংখ্যা কমিয়ে আনার একটি শর্তই হচ্ছে একদল সন্তানহীন দম্পতি।' ভদ্রলোক তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাতানব্বই তলার সাজানো ফ্ল্যাটে পি থার্টি টু যন্ত্রটি চালু করেন। "পি থার্টি টু যন্ত্রটি বেশ কিছু শ্বাপদ জন্তুর মস্তিষ্কের স্মৃতি ধরে রেখেছে। এই স্মৃতি বায়ো কারেন্টের মাধ্যমে মানুষের মাথায় সঞ্চারিত হয়।" গল্পের শেষে লেখক জানাচ্ছেন, "অমর মানুষেরা এখন দিনরাত ঘরেই বসে থাকে। তাদের কাজ করার প্রয়োজন নেই। কাজের জন্য আছে রোবট শ্রেণী। চিন্তাভাবনারও কিছু নেই। অমরত্বের বেশি আর কিছু তো মানুষের চাইবারও নেই। এখনকার মানুষ দিনের পর দিন একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে বসে থাকে। পি থার্টি টু যন্ত্র লাগিয়ে পশুদের জীবনের অংশ বিশেষ যাপন করতে তাঁদের বড় ভালো লাগে। এই তাঁদের একমাত্র আনন্দ।" মানুষের জীবন থেকে আশা-আকাঙ্ক্ষা চাওয়া-পাওয়া, আনন্দ-বেদনা এইসব মানবিক বোধ হারিয়ে গেলে মানুষ যে পশু হয়ে উঠবে, যন্ত্রই হয়ে উঠবে মানুষের পাশবিক আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু এই গল্প তাই প্রকাশ করে।

'অঁহক' বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিতে হুমায়ূন বিজ্ঞানের বহু তথ্য আর কল্পনার অবাধ সম্মিলন ঘটিয়েছেন। কিন্তু সাধারণ বৈজ্ঞানিক কাহিনি থেকে এটি আলাদা হয়ে ওঠে অঁহকদের আলোচনায়। তারা মানুষ সম্পর্কে বলে, "এরা অতি নিম্নশ্রেণীর বুদ্ধিহীন প্রাণীদের মতোই খাদ্য থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। কাজেই তারা চিন্তা বা শিক্ষার সময় পায় না। তারা তাদের সময়ের একটি বড় অংশ ব্যয় করে খাদ্য সংগ্রহ, খাদ্য পরিপাক ও খাদ্য বর্জনে।

ভালো বলেছ, এদের আর কী ত্রুটি আছে?

এদের সভ্যতা যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা। এরা আমাদের মতো যন্ত্রমুক্ত না। মহান শিক্ষক আপনি বলেছেন যন্ত্রনির্ভর সভ্যতাই নিম্ন সভ্যতা।

এই সত্যটি সবসময় মনে রাখবে।

এই কয়েকটি মন্তব্যে মানব সভ্যতার বিকাশের দুর্বলতা যেমন প্রকাশিত হয়ে পড়ে তেমনি উন্নত প্রাণী হিসেবে আমাদের আত্মশ্লাঘাতেও ঘা লাগে। গল্পকার এখানেই অন্য দশজন বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিকারদের থেকে ভিন্ন, স্বকীয়।

সরসতা হুমায়ূনের সমগ্র লেখনীর একটি বড় বৈশিষ্ট্য। হাস্যরস, কৌতুক তার বহু গল্পের পরতে বিদ্যমান। "তার গল্পের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হাস্যরস ও ব্যঙ্গরূপ। খুব কঠিন কথাও হাস্যরস ও ব্যঙ্গরূপের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।" তবে সরাসরি তিনি শ্লেষ, কৌতুক, প্রহসনের আঙ্গিকও ব্যবহার করেছেন দুয়েকটি গল্পে। এ প্রসঙ্গে 'মন্ত্রীর হেলিকপ্টার' ও 'ফজলুল করিম সাহেবের ত্রাণকার্য' গল্প দুটি উল্লেখযোগ্য।

'মন্ত্রীর হেলিকপ্টার' গল্পের ফর্মটি স্যাটায়ারিক। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠ হয়ে একজন মন্ত্রীর আত্মম্ভরিতা এবং নিজের গ্রামের মানুষের সামনে তার ঐশ্বর্য এবং ক্ষমতা প্রদর্শনের অভিলাষ ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে। শুধু চটুল জনপ্রিয়তার লোভে মন্ত্রী হেলিকপ্টারে একজন অসুস্থ রোগীকে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য, পথিমধ্যে তার অবস্থার আরও অবনতি, পুনরায় তাকে নিয়ে গ্রামে প্রত্যাবর্তন। কিছু সময় পর রোগীটির মৃত্যু এবং জানাজায় অংশ নিয়ে মন্ত্রীর রাজধানী যাত্রার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রনেতাদের ভণ্ডামি, শঠতা ও অমানবিকতাকে তীব্রভাবে বিদ্রূপ করা হয়েছে।" ক্ষমতার লোভ, প্রচারমুখিতা আর রাজনীতির কূটিলতায় মানবিক মূল্যবোধ কীভাবে ভূলুণ্ঠিত হয় এ গল্প তার নজির হয়ে থাকবে। 'মন্ত্রীর হেলিকপ্টার' রাজনৈতিক দূরদর্শিতার আড়ালে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের গল্প। যাদের ভোটে মন্ত্রীরা ক্ষমতার শিখরে ওঠেন, সময়ে তাদেরকে মনে করেন না, রাজনীতিবিদরা বক্তৃতার তোড়ে শ্রোতার মন ভোলান, কিন্তু তাদের দুঃখ-কষ্ট শোনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় তাদের কখনোই হয় না। পলিটিক্যাল স্যাটায়ার হিসেবে বাংলা সাহিত্যে শুধু নয় বিশ্ব সাহিত্যে এটি একটি উজ্জ্বল সংযোজন।

হুমায়ূনের 'ফজলুল করিম সাহেবের ত্রাণকার্য' গল্পটি কোথায় যেন আবুল মনসুর আহমেদের 'রিলিফওয়ার্ক' গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়। দুটি গল্পেই বিদ্যমান তীব্র শ্লেষ হয়তো এর অন্যতম কারণ। বন্যা কবলিত স্থানে প্রতিমন্ত্রী ফজলুল করিম সাহেব ত্রাণ দিতে যাবেন। কিন্তু দুপুর বারোটা পর্যন্ত সারেংয়ের খোঁজ পাওয়া গেল না। একটা দশ মিনিটে লঞ্চ ছাড়া হলো। বায়ান্নটা তাঁবু, এক হাজার কৌটা কনসানট্রেটেড টমেটো জুস যা ইতোমধ্যে গুদামে থেকে পচে গেছে, পাঁচশ বোতল ডিস্টিল ওয়াটার, মেডিক্যাল সাপ্লাই, রান্না করা খিচুড়ি, প্রায় পাঁচ হাজার টাকা, লুঙ্গি, গামছা, শাড়ি ইত্যাদি নিয়ে তিনি একটু গভীরের দিকে যেতে চান। কারণ সবাই কাছাকাছি জায়গা থেকে ত্রাণ দিয়ে ফিরে যায়, তিনি এইজন্য দূরে যেতে চান, যারা ত্রাণ পায় নি এখনো তাদের কাছে পৌঁছাতে চান। কিন্তু দীর্ঘ যাত্রার পর তারা কোনো শুকনো জায়গা খুঁজে পেল না। ইতোমধ্যেই সকাল সাতটায় রান্না করা খিচুড়ি টক হয়ে গেছে। ফজলুল করিম সাহেব নোনতা বিস্কিট আর চা দিয়ে লাঞ্চ সারলেন। বিকেল হয়ে গেছে। টক খিচুড়ি নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সাহায্য করার মতো কাউকে পাওয়া যায় নি। রাতে ডাকাতির ভয় আছে, অতএব লঞ্চ ঘুরাতে বলা হলো। ফজলুল করিম সাহেবের পিএস হামিদ জামাল, সারেংয়ের খরচ, লঞ্চের তেলের খরচ, ভিডিও ম্যান ভাড়া করা, চা, বিস্কিট, কলা ইত্যাদি বাবদ চার হাজার সাতান্ন টাকা খরচ হয়ে গেছে, সাহায্য দেওয়ার জন্য আছে সাতাশি টাকা তেপ্পান্ন পয়সা। ফেরার সময় কলার ভেলায় ভাসা একটা পরিবার পাওয়া গেল। তাদেরকে সাতাশি টাকা তেপ্পান্ন পয়সার পুরোটা দেওয়া হলো, একটা করে শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা দেওয়া হলো। তাঁবু দিতে চাইলে তারা নিল না, কারণ তাঁবুর ভারে তাদের ভেলা ডুবে যাবে। তারা ভেলা থেকে লঞ্চে উঠে এল, একটি বাচ্চা মেয়ে বমি করতে লাগল। ফজলুল করিম সাহেব কলেরার ভয়ে ক্যাবিনে গিয়ে দরজা দিলেন। তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। পরদিন পত্রিকায় ছাপা হলো—"অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় জনশক্তি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জনাব ফজলুল করিম একটি ত্রাণদল পরিচালনা করে বন্যা মোকাবেলায় বর্তমান সরকারের অঙ্গীকারকেই স্পষ্ট করে তুলেন। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় পুরো চব্বিশ ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রম করে তিনি নিজেই অসুস্থ হয়ে বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন। জনশক্তি মন্ত্রী জনাব এখলাস উদ্দিন হাসপাতালে তাঁকে মাল্যভূষিত করে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের ফজলুল করিম সাহেবের মতো মানুষ দরকার। পরের জন্য যাঁরা নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পিছপা হন না। এই প্রসঙ্গে তিনি রবি ঠাকুরের একটি কবিতার চরণও আবেগজড়িত কণ্ঠে আবৃত্তি করেন—কেবা আগে প্রাণ করিবে দান, তার লাগি কাড়াকাড়ি।" আমাদের দেশের ত্রাণ তৎপরতা, সরকারি আমলা, মন্ত্রীদের ভণ্ডামিকে তীক্ষ্ণ পরিহাসে তুলে ধরেছেন হুমায়ূন।

মধ্যবিত্ত জীবন নিয়েও তার রয়েছে কিছু চমৎকার গল্প। সত্যি কথা বলতে কী, হুমায়ূনের লেখায়ই আমরা প্রথমবারের মতো মধ্যবিত্ত জীবনের মানবিক সমস্যা-সংকট-আনন্দ-বেদনা-হাসি-কান্না'র রূপায়ণ দেখতে পাই। "বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের স্পর্শকাতর বিন্দুগুলো হুমায়ূনের মতো এত ভালো করে আর কেউ চেনেন নি। এইখানটায় আমি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মিল খুঁজে পাই। শরৎচন্দ্র যেমন বাঙালি জাতির আবেগপ্রধান স্পর্শকাতর বিন্দুগুলোকে চিনতেন, হুমায়ূন আহমেদ অতখানি না হলেও বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের হাসি-কান্নার বিন্দুগুলো চেনেন এবং অনায়াসসাধ্য দক্ষতায় তিনি তাঁর পাঠক-দর্শকদের হাসিয়ে-কাঁদিয়ে চলেছেন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নিশিকাব্য' নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের এক সরল দলিল। আপাত নিরাভরণ এই গল্পের মধ্যে হুমায়ূন আহমেদ মধ্যবিত্ত জীবনের মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নকে গেঁথে দিয়েছেন একটি রাতের ঘটনা দিয়ে। শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ-ভাশুর-দেবর পরিবেষ্টিত পরী তার শিশু মেয়েকে নিয়ে নিম্নমধ্যবিত্তের এই সংসারে বাস করে। গরিব স্বামী আনিস শহরে একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করে। কোম্পানির প্রতিনিধি হয়ে তাকে কখনো কখনো ট্যুরে যেতে হয়। এবার ট্যুরের কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ হওয়ায় সে এক রাত্রির সময় হাতে নিয়ে স্ত্রী-পরিজনের সঙ্গে মিলিত হতে গ্রামের বাড়িতে আসে। সবাই তাকে পেয়ে খুব খুশি। সুখের কী দুঃখের যে কোনো ঘটনাই ঘটুক না কেন, আনিসের মায়ের স্বভাব কিছুক্ষণ কাঁদা। পুত্রের আগমনে অতএব তিনি কাঁদতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত আনিসের ধমক খেয়ে তিনি স্বাভাবিক হন। তারপর পরিবারের অন্যান্য সদস্যের মতো ছেলের কুশলাদি নেন। ছোট বোন রুনুর বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। খবরটা আনিসকে দেওয়া হলো। আনিস বলল, রুনুর পছন্দ হলে তার কোনো আপত্তি নেই। খাওয়াদাওয়ার পর সবাই গোল হয়ে বসে কিছুক্ষণ গল্পস্বল্প করে। তারপর যে যার ঘরে চলে যায়। খুব সকালে আনিসের ট্রেন ধরতে হবে। ঘরে গিয়ে আনিস ঘুমন্ত মেয়েকে চুমু দেয়। আনিস পরীর জন্য একটি শাড়ি এনেছে। কিন্তু শাড়িটা পরী ননদের জন্য রেখে দেয়। তারপর তার বিয়ের লাল রঙের শাড়িটা পরে স্বামীর মনের সাধ পূরণ করে। সকালবেলা আনিসের যাবার ক্ষণে রুনু মাকে জিজ্ঞেস করে, ভাবি আজ বিয়ের শাড়ি পরেছে কেন? এই অহেতুক শাড়ি পরার মধ্যে হয়তো কোনো লজ্জা লুকিয়ে আছে। তাই—"কেউ তার কথার কোনো জবাব দিল না। মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী আকাশের চাঁদ, পরীকে অহেতুক লজ্জা থেকে বাঁচানোর জন্যই হয়তো একখণ্ড বিশাল মেঘের আড়ালে তার সকল জ্যোৎস্না লুকিয়ে ফেলল।"

এই শেষ অংশে মানুষের জীবনের একটি অর্থ খোঁজার প্রয়াস লক্ষ করি। হুমায়ূন আহমেদ অত্যন্ত সহজভাবে চলমান জীবনের অনেক অসঙ্গতির মধ্যেও একটি সঙ্গতি যোজনা করে জীবনের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি ও মমতা আকর্ষণের প্রয়াস পান।

এই গল্পে হুমায়ূন আহমেদকে আমরা চেখভের রূপে দেখি। "জীবনের ছোটখাটো জিনিসের শোচনীয় রূপটিকে চেখভের মতো এত স্পষ্ট করে সহজাতভাবে আর কেউ কোনোদিন বুঝতে পারে নি, মধ্যবিত্ত জীবনের বিশৃঙ্খল মলিনতার মধ্যে যা কিছু লজ্জাকর শোকাবহ তার এমন নিষ্ঠুর বিশ্বস্ত ছবি তার আগে অন্য কোনো লেখক মানুষের সামনে তুলে ধরে নি।"

হুমায়ূন আহমেদ তার গল্পে নিটোল কিছু চিত্র এঁকেছেন। "গল্পকে তিনি তত্ত্বভারাক্রান্ত করেন না। কোনো বিশেষ জীবন দর্শনের দ্বারাও তিনি তার আচ্ছাদন তৈরি করেন না। ফলে আদ্যন্ত গল্পটিতে নিটোল ছন্দের খেলা কথকতার এক অন্তরঙ্গ সুর।" চঞ্চল কুমার বোস বলেছেন, "এ কারণে তার গল্পের প্রকরণ জটিলতা বর্জিত। কিন্তু সরল প্রকরণে বর্ণিত তার গল্পগুলোতে জীবন কখনোই লঘু বা তরল নয়; বরং সে জীবন বহুমাত্রায় উন্নীত, এক ব্যঞ্জনাময় গভীর জীবন সত্যের ইঙ্গিতবাহী, ছোটগল্পকার হিসেবে এখানেই তার বিশেষত্ব।"

পারিবারিক খুনসুটি ও সামাজিক স্তর বিন্যাস এবং মানুষের অসহায়ত্ব, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, ঘৃণা, অনুরাগের মিথস্ক্রিয়ায় লিখেছেন 'জীবনযাপন'। এ গল্পে অসম বয়সী দম্পতির আর অসহায় স্ত্রীর ছোটভাইয়ের জীবন যাপন চিত্রায়িত। বোনের সংসার টেকানো, আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের একটুখানি আশ্রয়ের জন্য দুলাভাইয়ের যে-কোনো ধরনের নিপীড়ন মুখ বুজে সহ্য করে কথক। তাই গভীর রাতে বৃষ্টির মধ্যে দুলাভাইয়ের জন্য সিগারেট এনে যখন কথক বোন বিন্দুর সামনে দাঁড়ায়, বিনু জানতে চায়, 'সিগারেট ভিজে যায় নি!' তখন অসহায় কথককে গাঢ় স্বরে বলতে শুনি, 'আমি ভিজেছি, সিগারেট ভিজে নি।'

এমনি সরলতায় গভীর জীবন দর্শন তিনি তুলে ধরেন অবলীলায়। মানুষের সূক্ষ্মতম অনুভূতি, মহত্ত্ব ও অসহায়ত্ব তার লেখায় একান্তই অন্তরঙ্গভাবে উঠে এসেছে।

হামীম কামরুল হক যথার্থই আমাদের মনে করিয়ে দেন, "বোধ করি অনেকেই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে তাঁর ছোটগল্পই হলো সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের সেরা কীর্তি। সেলিম আল দীনকে প্রশ্ন করেছিলাম, শরৎচন্দ্র আপনাকে কী দিয়েছেন ? তিনি বলেছিলেন, অনুভূতি, মানুষ সম্পর্কে অনুভূতি, দেখা ও অনুভব করার চোখ; হুমায়ূন আহমেদ থেকেও সেই মানুষের প্রতি, জীবনের প্রতি ভালোবাসা, একইসঙ্গে জীবনের ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতাগুলোকে চিনে নেওয়ার নতুন একটি চোখ তিনি সৃষ্টি করে যেতে পেরেছেন।"

আর জীবনকে সূক্ষ্ম চোখে দেখার অন্যতম উপাদানই হলো মানবিক গুণ। হুমায়ূন তার গল্পে সাধারণ মানুষকে তুলে ধরেছেন মানুষের অসীম সম্ভাবনা আর নিহিত সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী রূপে। তার প্রকাশ ভঙ্গিটি কখনোই উচ্চকিত নয়। খুব মৃদু কিন্তু জোরালোভাবেই তিনি মানুষের জয়গান গেয়েছেন তার গল্পমালায়।

মানবিক মূল্যবোধকে তিনি দেখেছেন বহু দিক থেকে, বহু রঙে আর রেখায়। 'চোখ' শিরোনামের গল্পে আমরা দেখি, ডাকাত মতি মিয়ার চোখ উৎপাটনের আয়োজন চলছে। খেজুর কাঁটা দিয়ে এই ভয়াবহ ডাকাতের চোখ তুলে নেওয়া হবে। অথচ ভয়ংকর এই ডাকাতটি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা করে হয়তো কোনো মানুষের মনে দয়া হবে, সে মুক্তি পেয়ে যাবে। সে আকাঙ্ক্ষা করে, অপেক্ষা করে কোনো এক মায়াবতী তার চোখ দুটো রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে।

কোনো কোনো বিপর্যয়ে মানুষকে রক্ষা করতে হয়তো কেউ এগিয়ে আসে না। 'একজন শৌখিনদার মানুষ' গল্পে আসমানীর সুদর্শন পুত্র'র জন্যও কোনো রক্ষাকবচ নেই। তার বাবা তাকে দু'হাজার টাকা বায়নায় ঘেটু দলে দিয়েছে। ঘরে আরও টাকা আসবে। সুলেমান চলে যায় হাশেম মিয়ার কাছে। ডান্স মাস্টার তাকে শাড়ি, লিপস্টিক আর নারকেলের মালা পরিয়ে মেয়ে সাজিয়ে পাঠিয়ে দেয় হাশেমের ঘরে। হাশেমের স্ত্রী সন্ধ্যা থেকেই কাঁদতে বসে। কিন্তু হাশেম নির্বিকার। ঘেটু দলের বালকদের সঙ্গে রাত্রি যাপন শৌখিন হাশেম মিয়ার বিলাসিতা। কিন্তু এই বিলাসিতার আড়ালের মানবিক বিপর্যয় একমাত্র হুমায়ূনের গল্পেই ফুটে ওঠে।

'শৃঙ্খলা' গল্পে পাগল নসু'র প্রতি হুমায়ূনের দরদ সুস্পষ্ট। পাগল নসু পাশে শুয়ে থাকা কুণ্ডুলি পাকানো কুকুরটিকে নিয়ে জীবন কাটায়। গভীর রাতে 'নিউ ঢাকা কাবাব হাউস'-এর সামনে দাঁড়ালে সে আর তার কুকুর পরিত্যক্ত খাবার পায়। কিন্তু হোটেলের মালিক তাকে নিয়ে নিষ্ঠুরতা রসিকতা করতে ছাড়ে না। নসুর বউয়ের নাম জানতে চায়, কিন্তু নসু পরিবারের নাম বলে না। পরিবার তাকে একদিন ঢাকা শহরে এসে ছেড়ে দিয়ে গেছে, সে বিশ্বাস করে সুস্থ হয়ে গেলে পরিবার তাকে আবার ফিরিয়ে নেবে। কিন্তু পরিবারের নাম সে কাউকে বলে না। সে খুব শৃঙ্খলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পছন্দ করে, ট্রাফিকের কাজ লক্ষ করে, কেউ শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে তার অস্বস্তি হয়। সে কাউকে বোঝাতে পারে না, শৃঙ্খলা ব্যাপারটা কত গুরুত্বপূর্ণ। পাগলের মতো জগৎ নিয়ে এই দরদি গল্পে হুমায়ূন তার মানবিকতার ভিন্ন মাত্রা দেখিয়েছেন।

বিষয়বস্তুর অবিরাম বৈচিত্র্যে হুমায়ূন আহমেদ বাংলা সাহিত্যেকে নিঃসন্দেহে নতুন মাত্রা দিয়েছেন। তার মতো এত ব্যাপক বিষয় নিয়ে খুব কম লেখকই কাজ করেছেন। সেলিনা হোসেনের মতে, "তার গল্পের মুগ্ধতা, কাহিনি বিন্যাস, নির্মাণশৈলীর মাধ্যমে একইসঙ্গে সব বয়েসী পাঠকের কাছে একটা আশ্চর্যরকম গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিলেন। সেইসঙ্গে তার লেখার স্নিগ্ধতা, ভাষার গতিশীলতা, সারল্য পাঠকের কাছে ছিল দারুণ আকর্ষণীয়। দ্বিতীয়, তার এইসব কিছুর ভেতরে মানুষকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার বিষয় ছিল, সমাজকাঠামো নির্মাণের পটভূমিতে যে মানুষেরা আমাদের জীবনে অহরহ আনাগোনা করে—তাদেরকে তুলে আনার একটা বিষয় ছিল।"

মানবিক মূল্যবোধ এবং তার বিচিত্র প্রকাশভঙ্গিতে হুমায়ূন যথার্থই অনন্য ও শক্তিশালী। অন্তত এই দিক থেকে বিবেচনা করে হলেও আমরা ছোটগল্পকার হিসেবে হুমায়ূন আহমেদকে বাংলা সাহিত্যের একজন অনন্য অংশীদারি দাবি করতে পারি। হামীম কামরুলের ভাষ্যমতেই বলতে পারি, "তাঁর ছোটগল্প বাদ দিয়ে অন্তত বাংলাদেশের সাহিত্যের ছোটগল্পের ইতিহাস লেখাটা ভুল হবে সেটি জোর দিয়েই বলা যেতে পারে।"

AMARBOI.COM

তথ্যসূত্র

১. হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা, সৈয়দ শামসুল হক, *দৈনিক সমকাল*, ২১ জুলাই ২০১২।

২. *বাছাই গল্প*, হুমায়ূন আহমেদ, ভূমিকা ও সম্পাদনা : সালেহ চৌধুরী, একুশের বইমেলা ২০১২, ঢাকা, অন্যপ্রকাশ।

৩. হুমায়ূন আহমেদ সাহিত্যের নতুন যুগের চর্চা করেছিলেন, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, *দৈনিক যুগান্তর*, ২১ জুলাই ২০১২।

৪. হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্প : জটিল জীবনের সহজ গাথা, মোহাম্মদ নূরুল হক, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ নভেম্বর ২০১২।

৫. *বাংলাদেশের ছোট গল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, আজহার ইসলাম, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী।

৬. *শিল্পের শক্তি, শিল্পীর দায়*, আহমাদ মোস্তফা কামাল, অ্যার্ডর্ন পাবলিকেশন, ফেব্রুয়ারি ২০১০।

৭. *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, চঞ্চল কুমার বোস, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৯, বাংলা একাডেমী।

৮. *চেখভ গল্প সমগ্র*, অনুবাদ : অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্ত, বইমেলা ১৪০০, তুলি-কলম, কলকাতা।

৯. *কথাসাহিত্য সমীক্ষণ*, সরদার আবদুস সাত্তার, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, বই প্রকাশনী।

১০. হুমায়ূন আহমেদ: শূন্যতার শিক্ষা, হামীম কামরুল হক, *সাপ্তাহিক*, সম্পাদক গোলাম মোর্তোজা, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১২।

১১. তিনি আমাদের, সেলিনা হোসেন, *দৈনিক সমকাল*, ২১ জুলাই ২০১২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদের গান

মুস্তাফা জামান আব্বাসী

হুমায়ূন আহমেদ চলে গেলেন। রেখে গেলেন স্থাবর অস্থাবর কিছু সম্পত্তি, যা পরিবারের। বৃহত্তর পরিবার অর্থাৎ আমাদের জন্যে কালো অক্ষরের মায়ায় বন্দি কিছু লেখা, সেলুলয়েডে কয়েকটি চলচ্চিত্র ও কিছু গান। দিন চলে গেলে পড়বেন তারা যারা লেখা পড়েন নি। নতুন প্রজন্ম নতুন করে পাবেন তাঁকে। যারা তাঁর গান শোনেন নি, নতুন করে উপলব্ধি করবেন তাঁকে।

তাঁর লেখা গানের বেশ কয়েকটি সিডি। প্রকাশ করেছেন সংগীতা কমপ্লেক্স, লেজার ভিশন, জি-সিরিজ এবং ফাহিম মিউজিক। গ্রামীণফোণ ওয়েলকাম টিউনস, রবি গুনগুন ও বাংলালিংক আমার টিউনস গানগুলোকে মুঠোফোনে পৌঁছে দেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। এক লাইন বা দু'লাইনের গান সিরিয়াস মিউজিকের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে না সত্যি, তবু সমসাময়িক গানের প্রতিনিধিত্ব করে। সংগীতের আরোহী অবরোহী যেমন একদিন আশ্রয় পেত গ্রামোফোন পিনের মাধ্যমে, লাউড স্পিকারের চোঙায় নৌকার ছইয়ের ফাঁকে বাজতে হতো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, পরবর্তীতে ইথার তরঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যেত গ্রামের মেঠোপথে, ধানের ক্ষেতে, আলের ফাঁকে, ছোট ছোট ট্রানজিস্টারে। টেলিভিশনের যুগ বিটিভি ও পরে বিশটি চ্যানেল পেরিয়ে আজ দিনে রাতে জানান দেয় নতুনদের পদচারণা, নতুন সুর, নতুন কথা, নতুন শিল্পীদের নতুন উচ্চারণ।

নাট্যকার-ঔপন্যাসিক-ছোটগল্পকার হুমায়ূন আহমেদের যে পরিচয় প্রকাশিত কয়েকটি চলচ্চিত্র ও নাটকের গানে, ঘরে ঘরে গানগুলো বেজে উঠছে অডিও ক্যাসেটে ও মোবাইল ফোনের কল্যাণে। কয়েকটি গান আমার আগেই শোনা ছিল, বিশেষ করে সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে 'আমার ভাঙা ঘরে', 'বরষার প্রথম দিনে', সুবীর নন্দীর কণ্ঠে 'একটা ছিল সোনার কন্যা'। মকসুদ জামাল মিন্টুর সুরে 'ঘুমিয়ে পড়েছে চাঁদ', 'হাবলঙ্গের বাজারে', 'যে থাকে আঁখি পল্লবে' ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে অনেকের কাছে।

২

শোনা গল্প। হুমায়ূন আহমেদ একজন গীতিকারকে তার বাসায় ডেকে আনলেন। জানতে চাইলেন কীভাবে গান লিখতে হয়। বাসায় গিয়ে গীতিকার দেখেন সেখানে আরও অনেকে উপস্থিত। হুমায়ূন বললেন, লিখুন, আমি শিখব। গীতিকার অবাক। সবার সামনে কি গান লেখা যায়? গীতিকার কিছু একটা লিখলেন, হুমায়ূন কিছু একটা শিখলেন। যে গানটি তার সবচেয়ে পপুলার সেটি রূপায়ণ করেছেন বাংলাদেশের ও ভারতের কোটি মানুষের নায়ক ফেরদৌস। আর গানটিতে পুকুরের পাশে তরুণী নায়িকার রূপসজ্জায় শাওন। গানটির রূপায়ণ অনেকবার দেখলাম এবং বোঝার চেষ্টা করলাম হুমায়ূনের সবচেয়ে পপুলার গানটির মধ্যে কী কী আছে, যা গানটিকে তার লেখা গানের শ্রেষ্ঠ গানের মর্যাদা দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন যে উড়ালপঙ্খী, বাসা বাঁধতে চায় নদী ও মেঘের ভেলায়। প্রতি মানুষের মনই যে বেজায় কষ্ট দিয়ে মোড়ান। কিসের কষ্ট, কেন কষ্ট নিজেই জানে না। গান রেখে যায় সে কষ্টের রেশ। হুমায়ূনের মনেও হাহাকার। কার মনে নেই ? হোক গীতিকার, সুরকার, শিল্পী, বাজিয়ে, শ্রোতা সবার। যে গানের পিঞ্জরায় যত হাহাকার, সে গান উড়বে তত। ছবিটিতে গীদাল ফেরদৌস। লাটাই ঘুরিয়ে ঘুড়ি আকাশে উড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা, পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েরাও সবুজ গাঁয়ের ক্ষেতে ঘুড়ি নিয়ে দৌড়াচ্ছে। তাদের মনেও ওড়ার স্বপ্ন। আকাশ ছুঁতে চায় সকলেই। কী সুন্দর চিত্রায়ন! ঘুড়িটির তেমন করে ওড়া হয় নি, গীদাল সুতা কেটে দিল ঘুড়ির। গীদালের হলুদ চাদর যেন ওড়া পঙ্খীর দুই পাখা। উড়াল পঙ্খীর ওড়া থেমে গেল। পুকুরেই ঝাঁপ দেয় যেখানে কিছুক্ষণ আগেও ছিল কলসি কাঁখে নায়িকার স্বপ্ন। লেখক, চিত্রনির্মাতা, গীতিকার সব একাকার। এরই নাম হুমায়ূন। এবার শোনা যাক গানটি পুরোপুরি সুবীর নন্দীর সুমিষ্ট কণ্ঠে :

ও আমার উড়ালপঙ্খীরে
যা যা তুই, উড়াল দিয়া যা
আমি থাকব মাটির ঘরে
আমার চোক্ষে বৃষ্টি পড়ে
তোর হইল মেঘের উপরে বাসা ॥

আমার মনে বেজায় কষ্ট
সেই কষ্ট হইল পষ্ট
দুই চোক্ষে ভর করিল আঁধার নিরাশা
তোর হইল মেঘের উপরে বাসা ॥

মেঘবতী মেঘকুমারী মেঘের উপরে থাকো
সুখদুঃখ দুই বোনেরে কোলের উপরে রাখো
মাঝে মইধ্যে কান্দন করা মাঝে মধ্যে হাসা
মেঘবতী আজ নিয়াছে মেঘের উপরে বাসা ॥
তোর হইল মেঘের উপরে বাসা ॥

৩

হুমায়ূন প্রচলিত অর্থে নন গীতিকার। নাটক ও সিনেমার প্রয়োজনে লিখেছেন, সুরকারের হাতে পড়ে গান। পরবর্তীকালে আলোচকরা মন দিয়ে গানগুলো শুনবেন ও চমৎকৃত হবেন এই ভেবে যে সংগীত কত সহজেই একজন শিল্পীর মনে এসে ধরা দেয়। যদি তিনি সুর রচনা করতে পারতেন তাহলে সহজেই সেগুলো বড় কবিদের রচনার মতো সবার অন্তরে স্থান করে নিত, যেমনটি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত। তবে এ কথাও ঠিক যে নতুন মিডিয়ার কল্যাণে সহজেই গানগুলো পৌঁছে যায় প্রজন্মের শ্রোতাদের কাছে, যা আগের কবিদের ক্ষেত্রে ঘটে নি। সে কারণেই গানগুলো নিয়ে আজ এত নাড়াচাড়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদের পাঠকদের মধ্যে আহমদ শরিফ, ইমদাদুল হক মিলনের মতো দুয়েকজন ছাড়া বড় মাপের বোদ্ধা পাঠক কিছুই বলেন নি। লেখেন নি যারা তাদের মধ্যে হয়তো প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা। হুমায়ূনের সহজ সাবলিল ভঙ্গি তাদের উন্নাসিক মার্গলোকে আঘাত হেনেছিল। গানের ক্ষেত্রেও তাই। বারি সিদ্দিকী সহজেই তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিলেন এবং তাঁর সুরের মধ্যেই ইচ্ছে করলে হুমায়ূন আহমেদ আরও পঞ্চাশটি গান প্রবিষ্ট করাতে পারতেন। গান সবাই লিখতে পারে না, কারণ গানের মধ্যে শুধু ছন্দ আর কথার কারিগরি নেই, আছে কবির কিছু কথা, যা না হলে গানগুলো স্থায়ী হবে না। নজরুল যখন একটি গান লেখেন, তখন তা স্থায়ী হয় ভাবের, সুরের ও গায়কির কারণে। এক শ' বছর পরে গানগুলো যেন শক্ত সমর্থ হয়। রবীন্দ্রনাথের গান দিনে দিনে এত ভারী হয়ে উঠবে কে ভেবেছিল! যত দিন যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে একেকটি গানে কত কথা এসে জমা হয়েছে।

'রবীন্দ্রনাথ : প্রেমের গান' বইটি যখন লিখি, কবির ফেলে যাওয়া বেশ কয়েকটি প্রেমের গান গাইতে থাকি এবং তা আমার মনে যে রেখাপাত করে তাই বইতে লেখার চেষ্টা করেছি। সবার ক্ষেত্রে তেমনটি হবে না। গানগুলোকে হৃদয়ে স্থাপন করেছেন তারা ও পরে লিখেছেন দু'য়েকটি কথা। পেশাদার সমালোচকের আলোচনার সঙ্গে এক করে দেখা যুক্তিযুক্ত নয়।

সাহিত্যিকদের মধ্যেই আছেন জীবনের অন্ধকার দিকটার দিকে যারা নজর দিতে ভালোবাসেন, অন্ধকার সময়ে মানুষ কোন অন্ধকার নিয়ে খেলা করে তারই কথা। অপরপারে কিছু মানুষ ওটি ভুলে যেতে চান। 'নিহিলিজম' কাজের কথা নয়, ভালো কি আছে তা বার কর, ওটুকু নিয়েই জীবন কেটে যাক, ওই ভালো লাগার স্পর্শটুকু তারা দিয়ে যান লাখ লাখ মানুষকে তাদের কাব্যে উপন্যাসে গানে। হুমায়ূন আহমেদের যে ক'টা বই পড়েছি তার মধ্যে খুঁজে পাই আলো, যা আমাকে আলোকিত করে, যে গান ক'টি শুনেছি চোখ বন্ধ করে পৌঁছে যাই প্রতীক্ষিত প্রেমের গহীনে, যে প্রেম ছাড়া জীবন অর্থহীন। জীবনের কোনো মানে নেই। রোমান্টিক হুমায়ূনের স্বপ্নসহচর আমি, গানের ক্ষেত্রেও তাই।

যে ক'টি গান হুমায়ূন আহমেদের লেখা তার মধ্যে আছে : আমার ভাঙা ঘরের, একটা ছিল সোনার কন্যা, বরষার প্রথম দিনে, কন্যা নাচিল রে, মাথায় পরেছি সাদা ক্যাপ, সোহাগপুর গ্রামে, আমার কুসুম রাণীর, আমার শ্যাম যদি, হাবলঙ্গের বাজারে, যে থাকে আঁখি পল্লবে, ঘুমিয়ে পড়েছে চাঁদ, ওগো ভাবিজান।

ইংরেজি ভাষায় লেখা তার গান আছে সেগুলো হলো : We must believe in magic, Such a feeling, Down the way.

৪

চার বছর সেন্সর বোর্ডে কাজ করায় সময় শ'দু'য়েক ভালো-মন্দ ছবি দেখেছি। ছ'সাতটি গানের কোথায় কোথায় সুরারোপে অন্য সুরের প্রতিফলন তা যে-কোনো বালক নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। তাই সংগীত পরিচালকদের অনেকের গান নাকোচ করে দি'। আবার তাদের অনুরোধের ঢেকি গিলে ছবি পাশ করতে হয়েছে। পল্লীগ্রাম থেকে এসে যারা টেলিভিশনে কাজ করেন তাদের মধ্যে গুণীশিল্পীর অভাব নেই। এর মধ্যে স্থান করে নেন বাঁশিয়াল, দোতরাওলা, ঢোলশিল্পী সবাই। এরা গুণি হলেও ঠিক বোঝেন না কোথায় থামতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকগুলো সিডির সঙ্গে সংযুক্ত, যা হুমায়ূন আহমেদের লেখা নয়। টিভি নাটক ও সিনেমায় ব্যবহৃত। এগুলো অবশ্যই হুমায়ূন আহমেদের পছন্দের গান। এর মধ্যে আছে গিয়াসউদ্দিনের : 'মরিলে কান্দিস না আমার দায়', হাসন রাজার : 'লোকে বলে রে', 'নিশা লাগিল রে', 'একদিন তোর হইব রে মরণ', রাধারমণ দত্তের : 'ভ্রমর কইও গিয়া', শাহ আবদুল করিমের : 'আমি কুল হারা কলঙ্কিনী', 'তুই যদি আমার হইতি', সৈয়দ শাহনূরের লেখা : 'বন্ধু তোর লাইগা রে'।

টেলিভিশনে দীর্ঘকাল বাজাতেন বাঁশি, তার বাদনের প্রশংসা না করে পারা যায় না। বড় মার্কিন অফিসারের বাসায় গানের জলসা। গানের মধ্যে বাঁশির ফ্যাস ফ্যাসে আওয়াজ এসে জানান দিল দুই কারুকার্যই বাতাসের। কবি নজরুল তাঁর প্রথম জীবনে বাঁশি বাজাতেন। এতে কণ্ঠটির সর্বনাশ সাধিত হয়, চেষ্টাতেও কণ্ঠটিকে পরে আর বশে আনতে পারেন নি। [পঠিতব্য : আমার লেখা 'পুড়িব একাকী']। এ ক্ষেত্রেও তাই। বাঁশির সঙ্গে কারণবারি। শিল্পীকে উপস্থিত করা হলে এল নানা বাদ্যযন্ত্র, সবগুলোই পাশ্চাত্যের, একোর্ডিয়ান, স্প্যানিশ গিটার, প্যাডিং সবই। এর সঙ্গে আমার দ্বিমত। যেন শুনতে পেলাম লোকসংগীতের অন্তিম কান্না। বেদারউদ্দিন আহমেদ, মমতাজ আলী খান, আবদুল মজিদ তালুকদার, সোহরাব হোসেন, শেখ লুৎফর রহমান, শেখ মুহিতুল হক, নূরুদ্দিন আহমেদ, সাবদার আলী, আবদুল হক, শেখ গোলাম মোস্তফা পিতার সঙ্গে গান করতেন। আমার সঙ্গের সাথী আজিজুল ইসলাম, [illegible] আবু বকর সিদ্দিক, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, কিরণচন্দ্র রায়, মলয় কুমার গাঙ্গুলী। কারণবারি ও পাশ্চাত্য যন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হন নি কেউই। কণ্ঠযন্ত্রের সঙ্গে কারণবারির তুঙ্গ বিবাদের কারণে সুকণ্ঠ আবু বকর খান, আবদুল আলিম অল্প সময়েই বিদায় নিতে বাধ্য হন। হুমায়ূন নিভৃত পল্লীর অনেককেই যেমন বারি সিদ্দিকী, শাহনাজ বেলী, কুদ্দুস বয়াতি ও অন্যান্যকে তাঁর ছবিতে সুযোগ দিয়েছিলেন। সুন্দর সুন্দর সুর সংযোজিত হয়েছে যাদের কল্যাণে, এদের অবদানকে আমি স্বীকার করি।

AMARBOI.COM

৫

সুর নিয়ে কয়েকটি কথা। তাঁর সবচেয়ে পপুলার গান কোনটি ? 'একটা ছিল সোনার কন্যা'। সুবীর নন্দী জানাচ্ছেন যত অনুষ্ঠানে তিনি গান গেয়েছেন মকসুদ জামিল মিন্টুর সুর দেওয়া এই গানটির কথাই সবাই বলেছে। অনেকেই জানেন না যে এটি হুমায়ূন আহমেদের লেখা। বাংলার হাটে মাঠে বাটে গানটি তুঙ্গ জনপ্রিয়তার শীর্ষে। কারণ কী ? সবাই খুঁজছে মনের কন্যাকে। যে যেভাবে কন্যাকে খুঁজেছেন সেভাবেই সুষমা এঁকেছেন। আর নজরুল এঁকেছিলেন আমার পিতাকে আশ্রয় করে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গানটি, ভাওয়াইয়া-ভাটিয়ালিতে মিশ্রিত অপরূপ প্রেমসংগীত :

> 'কুঁচবরণ কন্যারে তার মেঘবরণ কেশ
> আমায় নিয়ে যাওরে কন্যা, সেই সে নদীর দেশ রে ...'

হুমায়ূনের গানটির কিছু অংশ :

> একটা ছিল সোনার কন্যা মেঘবরণ কেশ
> ভাটি অঞ্চলে ছিল সেই কন্যার দেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই চোখে আহারে কী মায়া
নদীর জলে পড়ল কন্যার ছায়া ॥

তাহার কথা বলি
তাহার কথা বলতে বলতে
নাও দৌড়াইয়া চলি ॥

কন্যার চিরল বিরল চুল
মাথার কেশে জবা ফুল
সেই ফুল পানিতে ফেইল্যা
কন্যা করল ভুল
কন্যা ভুল করিস না
ও কন্যা ভুল করিস না
আমি ভুল করা কন্যার লগে কথা বলব না।

হাত খালি গলা খালি
কন্যার নাকে নাক ফুল
সেই ফুল পানিতে ফেইল্যা
কন্যা করল ভুল
ও কন্যা ভুল করিস না
আমি ভুল করা কন্যার লগে
কথা বলব না ॥...

AMARBOI.COM

দু'টি ভার্সন, দু'টোই সুন্দর। সুবীরকে বললাম এক অনুষ্ঠানের শেষে : কুঁচবরণ কন্যাকে পরিস্ফুট করতে এখন আর সুর ও কথায় কুলোচ্ছে না, প্রয়োজন হল কন্যাটিকে সনাক্ত করে চোখের সামনে হাজির করা, গাত্রবর্ণ যার স্বর্ণরেণু, তন্বী নয়নে বিদ্যুৎ বহ্নি, দু'বেণীর কেশগুচ্ছে হাজার ফুলের রেণু। যদি তিনি হন নির্মাতার চয়ন মেহের আফরোজ শাওন, শ্রোতা ও দর্শক একমুহূর্তে সনাক্ত করে ফেলবেন। অডিও ভিজ্যুয়াল মিডিয়া এভাবে সাঙ্গীতিক কারুকার্যকে দর্শকশ্রোতার চোখের সামনে এনে মূর্ত করে তোলেন তাদের স্বপ্নমেঘ।

মকসুদ জামিল মিন্টু এ সময়ের সবচেয়ে মিষ্টি গানের সুরকার। সহজেই মানুষ তার সুর দেওয়া গানগুলো গাইতে পারে। এখানেই তার কৃতিত্ব। সবচেয়ে ভালো লাগে যখন মিন্টু ব্যবহার করে পরিচিত অনুষঙ্গে অন্য দু'য়েকটি গানের সুর। যেমনটি করেছিলেন সলিল চৌধুরী। তার সবচেয়ে নামকরা সংগীত পরিচালনা 'মধুমতি'-তে নৃত্যপটিয়সী বৈজন্তীমালার নৃত্যগীতের সঙ্গে পরিচিত একটি গান। সেখানে ছাড়ের সময় একটি মিউজিক রাতারাতি সবার মনে স্থান করে নেয়। এটি হলো 'হলুদ গাঁদার ফুল দে এনে দে, নইলে বাঁধব না বাঁধব না চুল', ছাড়ের সময় এই গানটির সুর সমস্ত ভারতে পৌঁছে যায়। এখনো যদি গানটি শোনা যায় বোঝা যাবে কত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুন্দরভাবে লোকসুর বাসা বাঁধে একটি সুসংগীতে। মিন্টুর ক্ষেত্রেও তাই। 'দুই চোখে আহারে কী মায়া, নদীর জলে পড়ল কন্যার ছায়া' সুরটি অপরূপ লালিত্যে পরিপূর্ণ। সুবীর নন্দী এত সুন্দর করে গেয়েছেন এ দু'টি লাইন, যা বারবার শুনতে ইচ্ছে করবে।

৬

হুমায়ূন আহমেদের লেখা ১২টি গানের সিডি 'আমার আছে জল' নামে প্রকাশিত। সুর ও সংগীত : এস. আই. টুটুল ও হাবিব ওয়াহিদের নামে, ফাহিম মিউজিক সিডিটি প্রকাশ করেছে। এর গানগুলোর মধ্যে একটি আধুনিক। গেয়েছেন শাওন।

আমার আছে জল
সেই জল যেন পদ্ম পুকুর
মেঘলা আকাশে মধ্য দুপুর
অচেনা এক বনবাসী সুর
আমার আছে জল ॥

আমার একার সেই কালো দীঘি
একাই আমি জলে নামি
কেউ নেইতো কাছে ও দূরে
অন্য ভুবনে থাকো তুমি
আমার একার সেই দীঘিতে
ফোটাই নীল কমল
আমার আছে জল॥...

AMARBOI.COM

গানটি শাওনের কণ্ঠে গীত এবং একই সঙ্গে জিপি এক্টেল সিটিসেল বাংলালিংকে এক সেকেন্ডের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। 'আমার আছে জল' রবীন্দ্রনাথের একটি গানের পরের লাইন। প্রথম লাইন : 'আমার হল শুরু তোমার হলো সারা'। গানটির মধ্যে যা পাওয়া যাবে তা হল : উল্লাস, নৃত্য ও একলা মানুষের বৃষ্টির উৎসবে অবগাহন। সুর দিয়েছেন সম্ভবত এস. আই. টুটুল ও হাবিব ওয়াহিদ। মলাটে একটি মেয়ের পানির মধ্যে ভেসে থাকা। সম্ভবত সে ডুবে গিয়ে আবার ভেসে উঠেছে।

শাওনের কণ্ঠ মন দিয়ে শুনলে তার মধ্যে পাওয়া যাবে অনেক কিছু। তা কী ? সারল্য, স্বচ্ছন্দ গতি ও কণ্ঠের মধ্যে অন্তঃলিলা প্রেম মাধুর্য। এটি বোঝানোর জন্যে যেতে হয় হৈমন্তী শুক্লার কাছে। তাকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি জান তোমার কণ্ঠের কোন কোন পার্টস শ্রোতাদের মন ছুঁয়ে যায় ? হৈমন্তী আমার প্রশ্নের উত্তর জানে। সে বলল, গা থেকে নি পর্যন্ত। যারা সুরকার তারাও এটি জানেন। হৈমন্তীর সবগুলো গানে যখন এই নোট ছুঁয়ে যায় তখন তা হয় সবচেয়ে বেশি হৃদয়গ্রাহী। শাওনের গান সামনা সামনি শুনি নি। এ গানটি এস.আই. টুটুলের ও হাবিব ওয়াহিদের যৌথ সুর অত্যন্ত মধুর করে কণ্ঠ প্রক্ষেপ করেছেন শাওন। মনোযোগী না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলেও গানটি হৃদয়ের তীরে এসে আছড়ে পড়তে বাধ্য। বাঁশির আলাপ সুন্দর। তার পরে শাওন এলেন। তার গলা মিষ্টি। এখানে মনে পড়বে জীবনানন্দ দাশের কবিতাটি : 'জলের থেকে ছিঁড়ে গিয়েও জল, মেশে যেমন আবার জলে গিয়ে'। শাওনের কণ্ঠে আছে বিদ্যুতের ধার।

'চল বৃষ্টিতে ভিজি' কণ্ঠে গীত। সবচেয়ে সুন্দর কণ্ঠ কণার। শুধু বেহালার ছড়ে ও পিয়ানোর টুংটাংয়ে গানটি ভরান। তার কণ্ঠটি যন্ত্র। 'চোখে চোখ রাখা, জলছবি আঁকা' সারাক্ষণ কণার সঙ্গে। একটি সুন্দর গান।

বাদলা দিনে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এলো বান
যদি ডেকে বলি, এসো হাত ধরো
চলো ভিজি আজ বৃষ্টিতে
এসো গান করি মেঘমাল্লারে
করুণাধারা দৃষ্টিতে

আসবে না তুমি, জানি আমি জানি
অকারণে তবু কেন কাছে ডাকি?
কেন মরে যাই তৃষ্ণাতে?
এই এসো না চলো জলে ভিজি
শ্রাবণ রাতের বৃষ্টিতে।

কত না প্রণয় ভালোবাসাবাসি
অশ্রুসজল কত হাসিহাসি
চোখে চোখ রাখা
জলছবি আঁকা
বকুলগন্ধা রাতে।
কাছে থেকেও তুমি কত দূরে
আমি মরে যাই তৃষ্ণাতে

চলো ভিজি আজ বৃষ্টিতে।

শেষ লাইনটি অর্থবহ : কাছে থেকেও তুমি কত দূরে, আমি মরে যাই তৃষ্ণাতে। এখানে লালন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

তৃতীয় গান 'নদীর নাম ময়ূরাক্ষী'। গেয়েছেন এস. আই. টুটুল। এখানে বলতেই হয় অধমের প্রথম উপন্যাসের নাম 'হরিণাক্ষি', ময়ূরাক্ষীর কাছাকাছি। আমার রচিত উপন্যাসের সঙ্গে এই গানের কোনো মিল থাকার কথা নয়। অথচ আজ ভেবে অবাক হচ্ছি যে নদীটির কথা ভেবেছিলাম তারও ছিল কালো জল, ভালোবাসার ডুবুরি সেই নদীর তলদেশ খুঁজে পায় নি। হুমায়ূন আহমেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেঁচে থাকলে তাকে আমার বইটি পড়তে দিতাম। গানটির কথার মধ্যে আছে অদেখা ভালোবাসার অতল আহ্বান, ময়ূরাক্ষীর আবরণে।

নদীর নামটি ময়ূরাক্ষী
কাক-কালো তার জল
কোন ডুবুরি সেই নদীটির
পায় নি খুঁজে তল ॥

তুমি যাবে কি ময়ূরাক্ষীতে
হাতে হাত রেখে জলে নাওয়া
যে ভালোবাসার রং জ্বলে গেছে
সেই রংটুকু খুঁজে পাওয়া ॥

সখী ভালোবাসা কারে কয়
নদীর জলে ভালোবাসা খোঁজার
কোনো অর্থ কি হয়...

AMARBOI.COM

এই গানে সবচেয়ে সুন্দর কথা হলো : ভালোবাসা থাকে চোখের মাঝে। রবীন্দ্রনাথের ছায়া আছে যেখানে কবি গাইছেন : 'সখী ভালোবাসা কারে কয়'। পরের লাইন : 'নদীর জলে ভালোবাসা খোঁজার কোনো অর্থ কি হয়'। সুরের গানটি গেয়েছেন সাবিনা ইয়াসমিন তার মিষ্টি গলায়। গানটি যিনি একবার শুনবেন তাকে বেশ কয়েকবার শুনতে হবে এবং ভিজতে হবে কবির সাথে বৃষ্টিতে। কারণ কবি আহ্বান জানাচ্ছেন : চলো ভিজি আজ বৃষ্টিতে। সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠ প্রসঙ্গে এইটুকু বলতে চাই যে-কোনো গানই তার কণ্ঠের আবেদনে নতুন মাত্রা পায়। হয়তো সুর সবসময়ই তার কণ্ঠপোযোগী হয় না, অথবা সুরকার সবসময় মনে রাখতে পারেন না—কোন পর্দাগুলোতে সাবিনার কণ্ঠ হয়ে উঠে হৃদয় জাগান, কোথায় মীড়সন্ধানী, কোথায় হৃদয়সমুদ্রের তলদেশে, সাজুয্য নিয়ে গবেষণা চলতে পারে। এই মুহূর্তে একটির কথা বলি।

সুরকার সলিল চৌধুরী স্ত্রীকে নিয়ে ট্যাক্সিতে করে কোথাও যাবেন। ট্যাক্সিতে চড়েই তার মধ্যে গুঞ্জরিত গানের দু'টি কলি। আর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন লতা মঙ্গেশকার। স্ত্রীকে বললেন, খানিকক্ষণ অপেক্ষা কর, ঘরে গিয়ে গানটির দু'লাইনের স্বরলিপি করে ফিরছি। গানটি : 'না যেয়ো না'। গানটি লতা ছাড়া আর কেউ গাইতে পারতেন না, আর ওই মুহূর্তে সুরটিকে বেঁধে না রাখলে সে পালিয়ে যেত কি না। এবার আমার অনুরোধ, হুমায়ূনকে যারা ভালোবাসেন সাবিনার গানটি মন দিয়ে শুনুন। নিশ্চিত জানি গানটিতে আছে হুমায়ূনের মনের কথা।

আসবে না তুমি, জানি আমি জানি
অকারণে তবু কেন কাছে ডাকি ?
কেন মরে যাই তৃষ্ণাতে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই এসো না চলো জলে ভিজি
শ্রাবণ রাতের বৃষ্টিতে।

কত না প্রণয় ভালোবাসাবাসি
অশ্রুসজল কত হাসাহাসি
চোখে চোখ রাখা
জলছবি আঁকা
বকুলগন্ধা রাতে।
কাছে থেকেও তুমি কত দূরে
আমি মরে যাই তৃষ্ণাতে

যদি ডেকে বলি, এসো হাত ধরো
চলো ভিজি আজ বৃষ্টিতে
এসো গান করি মেঘমাল্লারে
করুণাধারা দৃষ্টিতে ॥

AMARBOI.COM

বৃষ্টিতে ভিজতে হুমায়ূনের কী যে ভালো লাগত তা তাঁর পাঠক মাত্রই উপলব্ধি করেছেন নানা লেখায়। তাঁর লেখা 'ছবি বানানোর গল্প' আমার হাতের কাছেই। অনেকে জানেন না, বইটিতে এক জায়গায় আছে আমার প্রশংসা, কিন্তু এখন জানাচ্ছি হুমায়ূনের বৃষ্টির প্রতি ভালোবাসার কথা।

"সর্বশেষ শুটিং হলো মতিনউদ্দিন সাহেবের বাড়ির উঠোনে। দৃশ্যটা এরকম—হঠাৎ বৃষ্টি নেমেছে। রাত্রির খুব বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করছে। সে উঠোনে নেমে গেল। বৃষ্টিতে ভিজছে। একা ভিজে সে তেমন আনন্দ পাচ্ছে না। ছোটবোন অপলাকেও ডাকল। অপলা টিয়া পাখির খাঁচা হাতে উঠোনে নেমে গেল। সে নিজেও স্নান করবে, টিয়া পাখিকেও স্নান করাবে। তাদের সঙ্গে যুক্ত হলো কাজের মেয়ে বিন্তি। তারা মহানন্দে বৃষ্টিতে ভিজছে ব্যাকগ্রাউন্ডে গান হচ্ছে।

শেষ দৃশ্যের জন্যে যতটুকু বৃষ্টি প্রয়োজন তারচেয়ে অনেক বেশি বৃষ্টির ব্যবস্থা আমি করে রেখেছিলাম।

পরিকল্পনা হলো—দৃশ্যগ্রহণ শেষ হবে কিন্তু বৃষ্টিপাত থামবে না। বৃষ্টি পড়তেই থাকবে—আমি সবাইকে নিয়ে সেই বৃষ্টিতে নেমে পড়ব।

দৃশ্যগ্রহণ শেষ হলো। আমি বৃষ্টিতে নেমে পড়লাম। বললাম, আসুন আপনারাও আসুন। সকলেই হতভম্ব। ভালো কাপড়চোপড় পরে সবাই এসেছে—বৃষ্টিতে ভিজলে উপায় হবে কি ? আমার আহ্বানের সাড়া জাগল না। কেউ নামল না। আমি একাই ভিজছি। সম্ভবত আমাকে একা ভিজতে দেখে আমার ছোট মেয়ে বিপাশার মায়া লাগল। সে বৃষ্টিতে নেমে এসে আমার হাত ধরল।

নেমে এলেন আমার বন্ধু আর্কিটেক্ট করিম। কেউ একজন ধাক্কা দিয়ে মোজাম্মেল সাহেবকে পানিতে ফেলে দিলেন। তিনি জাপ্টে ধরে নামালেন ক্যামেরাম্যান আখতার হোসেনকে। তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একে একে সবাই বৃষ্টিতে নেমে এলেন। নকল বৃষ্টি আমাদের মাথায় মুষল ধারে পড়ছে। মহিলারা শুরুতে ইতস্তত করছিলেন—তারা তাদের দ্বিধা কাটিয়ে পানিতে নামলেন। আনন্দিত গলায় বলতে লাগলেন—আরও বৃষ্টি। আরও বৃষ্টি। একজন অতিথি স্যুট পরে এসেছিলেন, তিনিও গম্ভীর মুখে নেমে পড়লেন। দু'টি বড় বড় স্পীকারে গান হচ্ছে—

এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে
এসো করো স্নান নবধারা জলে

উঠোনে সবাই নাচতে নাচতে ভিজছে। তাদের উল্লাসে গানের কথা চাপা পড়ে যাচ্ছে।

একসময় আমার চোখে পানি এসে গেল। বিরাট একটা দায়িত্ব হাতে নিয়েছিলাম, সেই দায়িত্ব শেষ করেছি। প্রবল বৃষ্টিতে আমার চোখের পানি কেউ দেখল না। না দেখাই ভালো।

আমার ছোট মেয়ে আমার হাত ধরে গানের তালে তালে খুব নাচছে। তার মা দাঁড়িয়ে ডাকছে, বিপাশা উঠে এসো। সে উঠবে না।

আমি মুগ্ধ হয়ে আমার কন্যার নাচ দেখতে দেখতে মনে মনে বললাম—

আমি অকৃতি অধম বলেও তো তুমি
কম করে কিছু দাও নি।
যা দিয়েছ তার অযোগ্য ভাবিয়া
কেড়েও তো কিছু নাও নি।
তব আশিষ কুসুম ধরিয়া এ শিরে
পায়ে দলে গেছি চাহি নাই ফিরে,
তবু দয়া করে কেবলি দিয়েছ
প্রতিদান কিছু চাও নি..."
[হুমায়ূন আহমেদের 'ছবি বানানোর গল্প' থেকে]

AMARBOI.COM

কবির মূল কথাটি এই গানেও আছে। তা হলো : কাছে থেকেও তুমি কত দূরে, আমি মরে যাই তৃষ্ণাতে

৭

গান গেয়েছেন এস. আই. টুটুল। গানটির নাম হলো : আঁধারি রাত ছিল

আঁধারি রাত ছিল
বইছিল পৌষের পাগলা বাতাস
আমরা কয়েকটি প্রাণী অকারণে অভিমানী
কিছুটা হতাশ ॥
ওহো ওহো ওহো ওহো ॥
আগুনের ভিতর পাখি নিস্তব্ধ নীরব
তাকে নিয়ে আমাদের মৃত্যু উৎসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু আগুনের ছোঁয়া বুনকা বুনকা ধোঁয়া
সেই ধোঁয়া মিশিতেই আকাশেরও গায় ॥

আগুনের ভেতরে পাখি
নেই তার ডাকাডাকি
ঝলসানো পাখি কাঁপে গাঢ় বেদনায় ॥

কিছু গল্প কথা অর্থহীন কথকতা
টুংটাং গিটারের সব, নাচিতেছে মৃত পাখি

পরের গান গেয়েছেন কণা। গানটির নাম : চলো বৃষ্টিতে ভিজি। একই গান গেয়েছিলেন সাবিনা ইয়াসমিন। গানটি দ্বৈত কণ্ঠে আবার গীত হয় সাবিনা ইয়াসমিন ও হাবিবের কণ্ঠে। তেমনি 'আমার আছে জল' আরেকবার গেয়েছেন সুমনা বর্ধন। 'আমরা যাব বহুদূরে' একটি সুন্দর গান, গেয়েছেন আগুন। এটি একটি আধুনিক রচনা, যার মধ্যে আছে অচেনার আহ্বান। সবচেয়ে ভালো লাগে যেখানে ছেলে ভুলান ছড়া এসে আশ্রয় নেয় : 'রেলগাড়ি ঝমাঝম পা পিছলে আলুর দম'। সুরের মধ্যে আর একটি বৈচিত্র্য এলে রেলগাড়িতে গতি আরও আকর্ষণীয় হত। আগুনের সুন্দর আগুন-ঝরা কণ্ঠ গানটিকে আরও স্ফুর্তি দিতে পেরেছে।

এখানেই মনে পড়ে যায় মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কথা। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আবদুল আহাদের সঙ্গে সময় দিয়েছেন। তাই শত শত গানের মাধ্যমে হতে পেরেছিলেন শ্রেষ্ঠ গীতিকারদের একজন। শামসুর রাহমান তাঁকেও সময় দেন নি, যদিও দীর্ঘকাল রেডিওতে কাজ করেছেন। সমর দাস, আবদুল আহাদ তাঁর কাছ থেকে জোর করে গান আদায় করতেন ঠিকই, কিন্তু গীতিকার-সুরকারের সাজুয্য হয় নি। ফররুখ আহমদ ছিলেন এদিক থেকে খুবই ব্যতিক্রমী। আবদুল আহাদের সঙ্গে বসে তিনি সেই সময়ে রচনা করেছেন শ্রেষ্ঠ কিছু গান।

হুমায়ূন আহমেদ সে সময় পান নি। তিনি ব্যস্ত ঔপন্যাসিক, ব্যস্ত গল্পকার, ব্যস্ত নাট্যকার, ব্যস্ত চিত্রনির্মাতা। তা সত্ত্বেও যখন নতুন প্রজন্মের শ্রোতা তার সামনে এসে দাঁড়ান এবং ভালো ভালো শিল্পীরা এ গানগুলো পরিবেশন করেন, তখন গানগুলো পায় নতুন মাত্রা। এখন শুনুন আগুনের গাওয়া গান।

আমরা যাব বহুদূরে যাব
অচেনায় দেব পাড়ি
শহর নগর কিছু বন্দর
পিছু ফেলে রেলগাড়ি ॥

হেই ছুটছে ছুটছে চাকা ঘুরছে
খুঁজছে ইস্টিশন আমরা হাসছি
কী মজা পাচ্ছি উষ্টু দুষ্টু মন
অচেনা ইস্টিশন, অচেনা ইস্টিশন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অচেনা ইস্টিশন
রেলগাড়ি ঝমাঝম পা পিছলে আলুর দম
ইস্টিশনের মিষ্টি কুল
শখের বাগান গোলাপ ফুল ॥

ছোটে রেলগাড়ি ঝম ঝমা ঝম ঝম
গতি তার মনে প্রাণে
আমরা যাচ্ছি দূরে বহুদূরে
অচেনা ইস্টিশনে ॥

আমরা যাব বহুদূরে যাব
অচেনায় দেব পাড়ি
বন, জঙ্গল, খাল, জল
পিছু ফেলে রেলগাড়ি।

আমরা হাসছি এবং কাঁদছি
মন উদাসী মন
অচেনা ইস্টিশন ॥

AMARBOI.COM

৮

গানের পুরনো ফরম বদলে ফেলেছেন হুমায়ূন। যদি নিজে সুরকার হতেন তাহলে হতো এক রকম, সেটি হতো তার একক সৃষ্টি। সুরকার হয়তো তাঁরই ইচ্ছেমতো সুর ফেঁদেছেন। তা কখনো শ্রোতার মনে এসে আঘাত করেছে, আবার কখনো পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবিতে নিজেই সংগীত পরিচালকের ভূমিকায়। এই কারণে যে তাতে সিনেমার চরিত্রের মধ্যে যে নাটকীয়তা তা আরও খানিকটা এগিয়ে গেছে গানের তালে তালে এবং সুরে সুরে। তাঁর বেশ কয়েকটি ছবিতে তাঁর সাংগীতিক মুন্সীয়ানা পরিস্ফুট। এক্ষেত্রে 'আমরা যাব বহুদূরে' গানটিতে আগুন যেভাবে শুরু করেছে গানটি সেভাবে শেষ হয় নি। রেলগাড়ির ছুটে চলা তার মধ্যে অচেনা স্টেশনগুলো ছুটে চলা এবং তার সঙ্গে 'রেলগাড়ি ঝমাঝম পা পিছলে আলুর দম' ছন্দটি মেলানোর যে সুন্দর প্রচেষ্টা তা সুরে ছন্দে তেমনটি খেলে নি। তাই শেষ কথায় যখন কণ্ঠশিল্পী গাইছেন : 'আমরা হাসছি এবং কাঁদছি, মন উদাসী মন, অচেনা স্টেশন', তখন তা অচেনা স্টেশনের গন্তব্যে নিয়ে যায় না।

হুমায়ূন আহমেদের গান নিয়ে ইস্পাহানী মির্জাপুর চা নিবেদন করেছেন 'যে থাকে আঁখি পল্লবে'। এর প্রচ্ছদে যিনি ছবি এঁকেছেন তিনি সম্ভবত হুমায়ূন আহমেদ নিজেই। প্রথম : চান্নি পসর রাইতে যেন আমার মরণ হয়। মরণের কথা হুমায়ূনের কেন মনে হল চন্দ্রালোকিত রজনীতে তা তিনিই জানেন। দয়ার কারিগরের কাছে তাঁর আকুতি চান্নিপসর রাত্রে যেন তাঁর মৃত্যু হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চান্নিপসর শব্দ এই গানটিকে দিয়েছে এক নতুন মহিমা। শুনুন :

ও কারিগর দয়ার সাগর
ওগো দয়াময়।
চান্নিপসর রাইতে যেন
আমার মরণ হয়।

চান্নি পসর চান্নি পসর
আহারে আলো।
কে বেসেছে কে বেসেছে
তাহারে ভালো?
কে দিয়েছে নিশি রাইতে
দুধের চাদর গায়?
কে খেলেছে চন্দ্র খেলা
ধবল ছায়ায়?

এখন খেলা থেমে গেছে
মুছে গেছে রঙ,
অনেক দূরে বাজছে ঘণ্টা
ঢং ঢং ঢং।
এখন যাবো অচিন দেশে
অচিন কোন গাঁয়
চন্দ্র কারিগরের কাছে
ধবলপঙ্খী নায়।

AMARBOI.COM

৯

এর পরের গানটি এক বরষায়। রবীন্দ্রনাথের ছায়া পড়লেও রোমান্টিক এ গানটি আধুনিক মনস্করা গাইবেন বলে আমার ধারণা। এটির একটি ভিডিও প্রস্তুত হয়েছে এবং ইন্টারনেটে তা জনপ্রিয়। গানটি হলো :

যদি মন কাঁদে
তুমি চলে এসো এক বরষায়।
এসো ঝরঝর বৃষ্টিতে,
জলভরা দৃষ্টিতে
এসো কোমল শ্যামল ছায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদিও তখন আকাশ থাকবে বৈরী,
কদমগুচ্ছ হাতে নিয়ে আমি তৈরি।
উতলা আকাশ মেঘে মেঘে হবে কালো,
ঝলকে ঝলকে নাচিবে বিজলী আলো।

নামিবে আঁধার বেলা ফুরাবার ক্ষণে,
মেঘলার বৃষ্টির মনে মনে।
কদমগুচ্ছ খোঁপায় জড়ায়ে দিয়ে,
জলভরা মাঠে নাচিবো তোমায় নিয়ে।

এর মধ্যে হুমায়ূনের রোমান্টিক ভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার ধারণা। বজ্রধ্বনি, বৃষ্টির ধ্বনির সঙ্গে গানটি মিশে আছে। 'ফেইসবুক'-এ বন্ধুদের একজন নাদিয়া নাতাশা লিখছেন :

'আমার অনেক পছন্দের গানটি। বৃষ্টি হলেও শুনি। অদ্ভুত এক মাদকতা গানটিতে'। দেলোয়ার হোসেন লিখছেন : 'ক্ষণিকের জন্যে ভালো লাগে, কারণ গানের কথা'। রওশান আরা লিখছেন : 'আমার ভালো লাগা গানের একটি'। রূপকথার পরী, অসীম ভৌমিক, আফরোজা খন্দকার লিখছেন : 'অপরূপ'। ৩৩ জন শ্রোতার মধ্যে কয়েকজনের কথা বললাম।

সম্পাদক তাগাদা দিচ্ছে। তাই এখানেই শেষ করতে হলো। আমার ধারণা হুমায়ূনের গান নিয়ে অনেক হইচই হবে। হয়তো আমরা পঁচাত্তরতম জন্ম দিবসে গাইব : 'আমরা হাসছি এবং কাঁদছি, মন উদাসী মন অচেনা ইস্টিশন'। এখানে সুর দিয়েছি আমি নিজে। জয়তু হুমায়ূন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূননামা-র জন্যে

মুহম্মদ নূরুল হুদা

স্বাভাবিক হয়ে আসছে সবকিছু, স্বাভাবিক হয়ে যাবে সবকিছু। ব্যাপারটা কেবল সময়ের। আর সব রোগশোক, তর্কবিতর্ক কিংবা জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে হুমায়ূন এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে তার সাধের নুহাশপল্লীর ছায়াসুশীতল লিচুতলায়। আসলে যা হওয়ার কথা ছিল তা-ই হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সাময়িক মতভেদের পরে তার আকাঙ্ক্ষিত নুহাশপল্লীতেই চিরকালের জন্যে শয্যা পেতেছে হুমায়ূন। এখানেই সে শুয়ে থাকবে অনন্তকাল। এখান থেকেই ছড়িয়ে যাবে তার সৃষ্টিবীজ। এখানেই চর্চিত হবে তার কীর্তি। হয়তো এখানেই একদিন বাস্তবায়িত হবে তার স্বপ্নধৃত ক্যানসার হাসপাতাল। তবে... । হ্যাঁ, কিছু 'তবে', আর 'কিন্তু'র অস্তিত্ব আছে এখনো। হয়তো থাকবে আরও কিছুকাল। ঠিক কতকাল থাকবে তা বলা মুশকিল। তবে এটুকু বলা যায়, যতকাল তাকে নিয়ে তার নিকটতম স্বজন ও বৈধ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মতানৈক্য থাকবে, ততদিন এই প্রক্রিয়া বিলম্বিত হবে। আমার মনে হয়, যে শুভবোধ তার স্বজনকে তার সমাহিত হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্যে এনেছে, সেই শুভবোধই তাদের মধ্যে আবার প্রার্থিত ঐক্য রচনা করবে। তা যদি হয়, হুমায়ূনচর্চার পথ অচিরেই সুপ্রশস্ত হবে। এই ঐক্যের জন্যে যেমন শুভবোধের ও সুনীতিচর্চার প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন কিছু আইনি সদাচার। সহজ কথায় বলা যায়, তার বৈধ উত্তরাধিকারী সনাক্তকরণ ও তাদের মতামত গ্রহণ। ইতিমধ্যেই কোনো কোনো পত্রপত্রিকায় তার রচনার রয়্যালটি প্রাপ্তির অধিকার নিয়ে প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। কপিরাইট আইন অনুযায়ী তার বৈধ উত্তরাধিকারীরাই সাধারণভাবে আরো ষাট বছর পর্যন্ত তার রয়্যালটি সুবিধা আনুপাতিক হারে পাবেন ও ভোগ করবেন। তার জন্যে প্রথমেই প্রয়োজন সাকসেসন সার্টিফিকেট তৈরি। এই আইনি ডকুমেন্টই চূড়ান্ত করবে তার বৈধ উত্তরাধিকারীর তালিকা ও তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ। গ্রন্থের বা চলচ্চিত্রের সম্মানী থেকে শুরু করে হুমায়ূনের তাবৎ স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, যা তার নামে আছে, এই সব-কিছুর ক্ষেত্রে এই সাকসেসন সার্টিফিকেট মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়াবে। আসলে কিছুটা অপ্রিয় হলেও বৈষয়িক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এর কোনো বিকল্প নেই। তবে হ্যাঁ, তার যে সব গ্রন্থ বা জমি বা সম্পত্তি তার কোনো সন্তান বা অন্য কোনো প্রিয়জনের নামে আইনসম্মতভাবে প্রদান করা হয়েছে বা হস্তান্তর করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে অন্য উত্তরাধিকারীরা সহজ অধিকার পাবে না। এই ক্ষেত্রে যাকে প্রদান বা হস্তান্তর করা হয়েছে তার সদিচ্ছাই মুখ্য হয়ে দাঁড়াবে। তবে কোনো বিতর্ক সৃষ্টি হলে আইনি মীমাংসা প্রয়োজন হবে। এই আপাত-অপ্রিয় বিষয়টির এখানেই ইতি টানতে চাই, কেননা আমরা শতভাগ বিশ্বাস করতে চাই যে, তার রয়্যালটি বা বিষয় সম্পত্তির বিষয়ে তার বৈধ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কোনো অবাঞ্ছিত ঘটনার উদ্ভব হবে না। বরং হুমায়ূনের সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখা আর তার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্যে তার স্বজনরা দৃষ্টান্তমূলক ঐক্য ও সখ্যের সূচনা করবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেননা শহীদ মুক্তিযোদ্ধার এই পরিবারে রয়েছে এমন কিছু মানুষ, যারা আমাদের সমাজে তাদের সদাচার ও সুনীতির জন্যে বিশেষভাবে সমাদৃত। হুমায়ূনকে নিয়ে যা-কিছু করা হবে তা যেন পরিবারের সকলের সম্মতিতে করা যায় এই ব্যবস্থাই জরুরি। যতই অসম্ভব মনে হোক, এটি যদি সম্পন্ন করা যায়, তাহলে বাংলাদেশের মতো অনৈতিক ও বিভাজনমুখী সমাজে তা হয়ে দাঁড়াবে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। হুমায়ূনের মহিয়সী জননী ও তার অনুজ মুহম্মদ জাফর ইকবাল এইক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেবেন, এটিই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

এখন কেমন আছে হুমায়ূন ?

না, এই উত্তর আর হুমায়ূনের কাছ থেকে পাওয়ার কোনো উপায় নেই। সম্ভব হয়তো স্বপ্নে। তার প্রিয়জনদের কাছে স্বপ্নে ধরা দিতে পারে সে, বলতে পারে তার ভালো থাকা-না থাকার কথা। আরেকভাবেও হয়তো সম্ভব। সেটি হচ্ছে হুমায়ূনের একটি প্রিয় পদ্ধতি, প্লানচেট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হলে থাকাকালে হুমায়ূন প্রায়ই রাত জেগে জেগে কখনো একা, কখনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে, যৌথভাবে প্লানচেট করতো। হাজির করত প্রয়াত বড় বড় মানুষের আত্মা। রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন থেকে শুরু করে অজানা অচেনা কত মানুষের আত্মা। তাদের সঙ্গে কথা বলতো সে, কুশল বিনিময় করত, এমনকি সমাজ ও সভ্যতার সঙ্কট ও সম্ভাবনা সম্পর্কেও মত বিনিময় করত। আমি নিজেও এই ব্যাপারে কিঞ্চিৎ এগিয়েছিলাম। আমার বন্ধু জামশেদুজ্জামান লাকী (শিশুসাহিত্যিক, অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক) ও আমি বহু রাত জেগে জেগে এই প্লানচেট করেছি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, তেমন একটি প্লানচেটে একজন অচেনা আত্মার কাছ থেকে আমরা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কথা জেনেছিলাম সেই '৬৯-৭০ সালেই। কোনো নির্দিষ্ট আত্মাকে আনতে হলে যে রকম নিষ্ঠা ও গভীরতর মনো-সংযোগ দরকার তা আমরা পারি নি। কিন্তু প্রায়ই শুনতাম হুমায়ূন তার প্রার্থিত অনেক আত্মাকেই হাজির করেছে। এক্ষেত্রে তার সাধনা ও সিদ্ধি আমাদের চেয়ে বহুগুণ বেশি ছিল অবশ্যই। আজ কি আমরা তার ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করব ? আমি এর উত্তরে হ্যাঁ-না কিছুই বলব না। তবে আমি নিজে এই পদ্ধতি আর প্রয়োগ করতে চাই না। কেননা পরলোকগত আত্মার ভালো-মন্দ জানার কৌতূহল এই বয়সে এসে আমার তিরোহিত হয়েছে। আমি শুধু জানতে চাই ও বিশ্বাস করতে চাই, যে-জগতে হুমায়ূন গেছে সেখানে সে ভালো আছে, সেখানে সে ভালো থাকবে অনন্তকাল। তার জন্যে আমাদের শুভকামনা ও সদর্থক প্রার্থনাই বড় কথা।

AMARBOI.COM

ব্যক্তিগত তর্কাতর্কির পর এই সময়ের মধ্যেই শুরু হয়েছে হুমায়ূনকে নিয়ে ব্যক্তি-পর্যায়ে মূল্যায়নের পালাও। কথা শুরু হয়েছে পক্ষে আর বিপক্ষেও। জানি, জীবিত হুমায়ূন হয়তো এ নিয়ে আলোড়িত হতো, কিন্তু লোকান্তরিত হুমায়ূনকে এইসব পার্থিব নিন্দা-ভালোবাসা স্পর্শ করবে না। স্পর্শ করবে তার স্বজনদের, তার অনুরাগীদের আর সমকাল ও উত্তরকালের পাঠক-পাঠিকাদের। এই ধরনের কিছু আলোচনায় আমরাও যৎসামান্য যোগ করতে চাই। প্রথম কথাটি হচ্ছে, হুমায়ূনের জনপ্রিয়তা ও স্থায়িতা। হুমায়ূন যে বাংলা ভাষার সর্বকালের একজন জনপ্রিয়তম লেখক এটা কমবেশি সবাই স্বীকার করেছেন। তবে কেউ কেউ, যেমন তসলিমা নাসরিন মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গে হুমায়ূনের তেমন জনপ্রিয়তা নেই। তার প্রকাশকরা শত চেষ্টা করেও পশ্চিমবঙ্গে তাকে জনপ্রিয় করতে পারেন নি। সে কারণে বাংলাভাষাভাষী সব অঞ্চলে হুমায়ূন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমান জনপ্রিয় নয়। এর কারণ কি? নাসরিন এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বাংলাদেশের জনগণ যদি এত বিপুল পরিমাণে অশিক্ষিত আর অর্ধশিক্ষিত না হতো, হুমায়ূন আহমদের পক্ষে এত বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন সম্ভব হতো না।' একবারে ঢালাও মন্তব্য, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণকেই অপমান করা হয়েছে। তারপরেই নাসরিন বলেছেন, 'আমিও জনপ্রিয় লেখক ছিলাম এককালে।' প্রশ্ন হচ্ছে তখন কি তার মধ্যেও হুমায়ূন আহমেদের বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল, যা বাংলাদেশের তথাকথিত 'অশিক্ষিত আর অর্ধশিক্ষিত' জনগণকে তার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল? আর এখন কি তিনি নতুন ও উন্নতর কোনো সাহিত্যিক গুণাবলীর অধিকারী হয়েছেন যা বাংলাদেশের সেই 'অশিক্ষিত আর অর্ধশিক্ষিত' জনগণের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব হচ্ছে না? বিষয়টি আসলে তা নয়। বাংলাদেশের জনগণ, তথা প্রত্যেক দেশের জনগণের মধ্যে মোটা দাগে দুধরনের পাঠক-পাঠিকা থাকেন। এক. সরস, ব্যঙ্গপ্রবণ, পরিহাসপ্রবণ, সহজপাঠ্য, কাহিনিমূলক, নাট্যগুণসম্পন্ন ও একপাঠে শেষ করা যায় এমন গল্প-কাহিনির পাঠক; যারা শুধু পড়তে চায়, উপভোগ করতে চায়, আর এ নিয়ে আর দীর্ঘাশ্রয়ী কোনো চিন্তা-ভাবনা করতে চায় না। এরা যে আবশ্যকীয়ভাবে অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত হবেন এমন কথা নেই, বরং এরা সবাই বেশ শিক্ষিত ও পাঠাভ্যাসসম্পন্ন। আমি নাসরিনের যুক্তিটিকে পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিতে চাই। কেননা একজন অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত পাঠকের তো যোগ্যতাই নেই হুমায়ূনের কোনো বই পাঠ করার। শুধু হুমায়ূনের কেন, অন্য কোনো লেখক, এমনকি নাসরিনের বই পাঠ করার যোগ্যতাও তার বা তাদের নেই। আসলে 'অশিক্ষিত আর অর্ধশিক্ষিত' যা বলে বলা উচিত পাঠ-রুচির কথা। যাদের রুচি চিন্তা-উদ্রেককারী গল্প বা অন্য রচনা পাঠের অনুবর্তী নয়, তারাই প্রধানত হুমায়ূনের পাঠক। আর বেশ কয়েক দশকের সাধনায় হুমায়ূন এই পাঠক-পাঠিকাদের নিজের দিকে নিয়ে এসেছেন তার অদ্ভুত গল্প বলার ক্ষমতার জন্যে স্বয়ং নাসরিন নিজেও শিকার করেছেন। আর জীবদ্দশায় হুমায়ূন নিজেই বলেছে, সে বাংলা সাহিত্যের পাঠকবৃদ্ধি করে নি, সে করেছে তার বইয়ের পাঠকবৃদ্ধি। অত্যন্ত খাঁটি কথা। হুমায়ূনের পাঠকরা অন্য কোনো লেখকের প্রতি ঝুঁকেছেন এমন ঘটনা বিরল। হয়তো ঘটতে শুরু করবে এখন, যখন বাজারে হুমায়ূনের নতুন বই থাকবে না। কে জানে, হয়তো হুমায়ূনের তৈরি ছাঁচকে ব্যবহার করে অন্য কোনো লেখক তার পাঠক-পাঠিকার চিত্ত হরণ করবে। তবে সেই লেখককে অবশ্যই হুমায়ূনের মতো নতুন নতুন চমক সৃষ্টি করতে হবে। বলা বাহুল্য, চমক সৃষ্টি করা, চমকে দেওয়া যে তার মূল কৌশল, হুমায়ূন নিজে তা বহুবার বহু সাক্ষাৎকারে বলেছে। তার বই কেন পড়েন সে সম্পর্কে একজন সচেতন পাঠকের বক্তব্য শুনুন, তার উপন্যাস বা গল্প পড়ে খুব বেশি মনে থাকে না। সেগুলোর প্রতিপাদ্য বাস্তব জীবনে খুব কাজে লাগে না। কিন্তু তার গল্প উপন্যাসে যে ভালো লাগাটুকু, সেটাই বা কম কিসে? (প্রিয় যে কারণে/ আশিকুর রহমান/ ১৯ আগস্ট ২০১২)। আমার নিজের অভিজ্ঞতাও তার অধিকাংশ বইয়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ। তবে সবগুলো গ্রন্থের ক্ষেত্রে নয়। ৩২২টি গ্রন্থের সবগুলোই সমমানের হতে পারে না, অধিকাংশই পাঠরঞ্জনমূলক, কিন্তু 'নন্দিত নরকে', 'শঙ্খনীল কারাগার', 'অচিনপুর', 'জোছনা ও জননীর গল্প'সহ তাঁর অন্তত এককুড়ি গ্রন্থ আছে যা বিষয়ে ও বুননে সমকালীন কথাসাহিত্যে তাৎপর্যপূর্ণ আসনের দাবিদার। কার চেয়ে ভালো কার চেয়ে খারাপ সেই তুলনায় যাওয়ার আগে আমাদের কোনো সতর্ক কাব্যসমালোচককে তার কথাসাহিত্যের একটি সতর্ক পাঠ-সমীক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে। তার জন্যে চাই হুমায়ূন চর্চা কেন্দ্র। আর সেটি প্রতিষ্ঠিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতে পারে নুহাশপল্লী বা অন্যত্র। এই চর্চা কেন্দ্র না থাকলে কোনো ব্যক্তিগবেষকের উদ্যোগে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এ কাজটি সম্পন্ন হতে পারে।

দ্বিতীয় যে শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার কথা আমরা বলতে চাই, তারা অবশ্য মননশীল, চিন্তাশীল, বিচক্ষণশীল; এবং একটি রচনা পাঠের পর তার ভেতর এমন সব বিষয় অন্বেষণ করেন যাতে গ্রন্থটি পরবর্তীবার বা বারবার পাঠ করতে হয়। এই শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা সবদেশে সব কালেই অঙ্গুলিমেয়। হুমায়ূন তাদের জন্যে যতটা লিখেছে, তার চেয়ে বেশি লিখেছে সাধারণ পাঠকের জন্যে, যারা একপাঠে বইটি থেকে প্রার্থিত বিনোদন কুড়িয়ে অন্যকে তা হস্তান্তর করতে পারে। একবার আমারও তেমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। হুমায়ূনের সদ্যপ্রকাশিত একটি গ্রন্থ হাতে আমি কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে উঠে চট্টগ্রাম যাওয়া পর্যন্ত একপাঠে বইটি শেষ করলাম। আজ এতদিন পরে সেই বইয়ে নাম ও কাহিনি আমার মনে নেই। কিন্তু যেগুলোর কাহিনি ও ব্যঞ্জনা এখনো মনের ভেতর গুনগুন করছে সেগুলোকে ভুলবো কী করে? একজন লেখকের শ্রেষ্ঠত্ব তার শ্রেষ্ঠ রচনা দিয়ে, তার নিকৃষ্ট খসড়া দিয়ে নয়। নিকৃষ্ট বা সাধারণ মানের রচনাবলি একজন লেখকের অনুশীলনমূলক রচনা বা লেখকত্ব বজায় রাখার ধারাবাহিকতা হিসেবে গণ্য। হুমায়ূনের ক্ষেত্রেও অন্যথা হওয়ার জো নেই।

আমাদের মতে, একজন লেখক কতখানি পুরুষতান্ত্রিক বা নারীতান্ত্রিক, ব্যক্তিজীবনে সে কতখানি সদাচারী বা ব্যভিচারী, কতখানি ধার্মিক বা পাপিষ্ঠ, তার ধনসম্পদের পরিমাণ কত, সে কতখানি লোভী বা নির্লোভ, এগুলো তার জীবন পর্যালোচনায় জরুরি বিবেচিত হলেও তার রচনার নান্দনিক মূল্যায়নে প্রয়োজনীয় নয়। জুয়াড়ি বলে একজন দস্তয়ভস্কিকে আমরা লেখক হিসেবে বাতিল করতে পারি না। আমি হুমায়ূনকে আমাদের কালের একজন তাৎপর্যপূর্ণ কথাসাহিত্যিক মনে করি তার উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিল্পসফল রচনার জন্যে। সে কার চেয়ে বড় বা ছোট সেটি পরে বিবেচ্য। এ নিয়ে সময় সুযোগমতো আরও বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছে রইল। আর যে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বাঁকবদলময় জীবনযাপন করেছে হুমায়ূন, তাকে মনে করি একটি অভিনব উপন্যাসের বিষয়। হয়তো নতুন প্রজন্মের কারও হাতে রচিত হবে সেই হুমায়ূননামা।

আমরা তার জন্যে অপেক্ষমাণ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদের বৃক্ষ-ভুবন

মোকারম হোসেন

হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুসংবাদের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। ভেবেছিলাম তিনি সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে আসবেন। কিন্তু মানুষের ভাবনার মতো তো সব কিছু হয় না। মৃত্যু নিয়ে তিনি যথেচ্ছ মজা করলেও মৃত্যু বেদনাদায়ক বিষয়। সাধারণত মানুষের পক্ষে এর সংশ্লিষ্টতা এড়িয়ে চলা কঠিন। তাঁর মৃত্যুতে গোটা দেশ শোকের সাগরে নিমজ্জিত হলো। অপেক্ষা শুধু তাঁর মরদেহর জন্য। ভাবতে থাকি কীভাবে তাঁকে পাওয়া যায়, তাঁর কাছাকাছি যাওয়া যায়। তখন বারবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে নুহাশপল্লীর সবুজ-শ্যামল আঙিনা। সেখানেই হয়তো নিবিড়ভাবে পাওয়া যাবে তাঁকে। যেখানে তিনি পরম মমতায় রেখেছেন সন্তানসম বৃক্ষগুলো। তাদের সঙ্গে কথা বলে কাটিয়েছেন অনেকগুলো প্রিয় মুহূর্ত। ঢাকার বিশাল যানজট পেরিয়ে জুলাই মাসের তুমুল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে হাজির হলাম সেখানে। প্রকৃতিতে তখন তাঁর প্রিয় ঋতু বর্ষাকাল। মাত্র কয়েকদিন আগে কদম ফুটেছিল। চারপাশে যেন এক বিরাট শূন্যতা। অঝোর শ্রাবণ আর নির্জনতায় সেদিন এই বাড়িটি যেন আক্ষরিক অর্থেই কাঁদছিল। তাঁর সন্তানতুল্য বৃক্ষগুলোও যেন বুঝতে পেরেছিল ওদের প্রিয় মানুষটি আর ফিরে আসবে না কখনো। আর কখনো মাথায় হাত বুলিয়ে দিবে না, ডাল ছুঁয়ে একটু আদর করে দিবে না। বিড়বিড় করে কুশলাদি জিজ্ঞেস করবে না, না আর কখনো না...

২০০৫ সালে নুহাশপল্লীতে হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে বৃক্ষ নিয়ে প্রথম আলাপচারিতা। আলোচনার মূল বিষয় সেখানকার ওষুধি বাগান। তারপর অনেকগুলো বছর। নুহাশপল্লীর অনেক পরিবর্তন দেখেছি স্বচক্ষে। মূলত নুহাশপল্লীকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে তাঁর সবুজ-ভাবনা। ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর সকল চেতনায়। জীবনের শেষ দিকে এসে প্রায় প্রতিটি গল্প-উপন্যাসেই কোনো না কোনোভাবে নিয়ে এসেছেন বৃক্ষ-প্রসঙ্গ।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে একজন সফল, জননন্দিত কথাশিল্পী, নাট্যকার ও চলচ্চিত্রকার হিসেবে তাঁর অবস্থান গগনস্পর্শী। আমি সে প্রসঙ্গে না গিয়ে শুধু তাঁর বৃক্ষভাবনা নিয়ে দু'চারটি কথা বলতে চাই। এখানে যা কিছু বলা হলো তা কেবল হাতেগোনা কয়েকটি গ্রন্থের বৃক্ষভুবন। তাঁর সুবিশাল রচনা-নিচয় থেকে মাত্র সামান্য কিছু। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি শুধু ওষুধি বাগান করেই দায়িত্ব শেষ করতে চান নি। তাঁর এই ভালোবাসার জগতটি পাঠকের কাছেও তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। একারণে ১৬ মে ২০০৭ সাল থেকে *অন্যদিন* পত্রিকায় *বৃক্ষকথা* শিরোনামে নিয়মিত লেখালেখিও শুরু করেন।

এই লেখাগুলো পড়ে খুব সহজেই ভিন্ন এক হুমায়ূন আহমেদকে আবিষ্কার করা যায়। সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের এই লেখাগুলো পাঠ করে লেখকের আলাদা একটি সত্তাও অনুভব করা যায়। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখাগুলোতে আছে লেখকের নিজস্ব ভাবনা, অনুসন্ধান, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং কোথাও কোথাও গভীর দর্শন। লেখকের সবচেয়ে বড় সফলতা তাঁর উপস্থাপনার কৌশল। আমরা জানি সাধারণত নিরস কিংবা ভারি বিষয়ের ওপর লেখা অনেক পাঠকেরই অপছন্দ। বৃক্ষবিষয়ক লেখাও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তিনি শুধু নিজ যোগ্যতায় এই প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে গেছেন। লেখাগুলো গতানুগতিক ধারায় না রেখে সর্বজন পাঠ্য করেছেন। তাঁর ভালোবাসা ও আন্তরিকতার কারণে লেখাগুলো বরাবরই স্বাদু হয়ে উঠেছে।

কাজটি অবশ্য তাঁর জন্য খুব একটা সহজ হয় নি। বৃক্ষ-বিষয়ক অসংখ্য বই তিনি গোগ্রাসে পড়েছেন। প্রতিটি লেখায় তার ছাপ সুস্পষ্ট। আমাদের অজানা অনেক তত্ত্ব-তথ্য হাজির করেছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লেখা লোকগল্পগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। বিখ্যাত কবিতাগুলোর অংশবিশেষ তুলে এনেছেন। সেই কালিদাসের *মেঘদূত*, রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। কিছু অভিনব তথ্য তিনি বেশ মজাদারভাবেই উপস্থাপন করেছেন। কদমফুল নিয়ে লিখতে গিয়ে বলেছেন, 'কদম ফল যে রান্না করে খাওয়া হয়—এই তথ্য কি জানেন ? আমি জানতাম না। নলিনীকান্ত চক্রবর্তী ত্রিপুরার গাছপালায় লিখেছেন, কদমের ফল রান্না করে খাওয়া হয়, তবে সহজে হজম হয় না। যারা বিচিত্র রান্নায় উৎসাহী, তারা রান্না করে দেখতে পারেন। হজমের দায়দায়িত্ব আপনাদের।' এখানে কদম প্রসঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত মতামতও উদ্ধৃত হলো; আমার মতে কদম্বের সবচেয়ে বড় ভেষজ গুণ মন ভালো করে দেয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা। পূর্ণ বর্ষায় এই গাছের নিচে দাঁড়ালে মনে হয়—আহারে! বেঁচে থাকাই আনন্দের। এই গাছের রোগ সারাবার কোনো প্রয়োজন নেই সে তার সৌন্দর্য নিয়েই ঝলমল করুক। আবার অসময়ে যে কদম ফোটে তাও লেখক জানাতে ভোলেন নি। এটা তাঁর নিজস্ব অনুসন্ধান। বই থেকে ধার করা কোনো জ্ঞান নয়। সত্যিকার অর্থেও তাঁর কদমপ্রীতি ছিল। নুহাশপল্লীতে কয়েকটি কদম গাছ আছে। এসব লেখায় তিনি অনেক সাবলীলভাবে ভেষজ গাছগুলোর লৌকিক ব্যবহারের কথা বলেছেন। যদিও এসব ব্যবহারের কথা অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু এখানে সহজভাবে উপস্থাপনের গুণে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

AMARBOI.COM

এ বিষয়ে তাঁর পড়ার পরিধি দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। বেলের শরবত প্রসঙ্গে তিনি তিব্বিয়া হাবিবিয়া ইউনানী কলেজের হেকিম মাওলানা মোঃ মোস্তফার একটি রেসিপি দিয়েছেন। এই লেখাগুলো পড়লে বোঝা যায় যে কাজগুলো মোটেই আরোপিত নয়, নিজের আগ্রহ ও ভালোবাসা থেকেই তিনি করেছেন।

বর্ণনার ক্ষেত্রে লেখকের নিজের অভিজ্ঞতা একটি বড় স্থান দখল করে আছে। হিং প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, গাছপালা-বিষয়ক শুকনা (?) বিষয় নিয়ে আমার লেখাগুলি পাঠক-পাঠিকারা পড়ছেন বলে মনে হয় না। যারা পড়েছেন তাদের হয়তো ইতোমধ্যে ধারণা হয়েছে, ভেষজ বৃক্ষের ওষুধি গুণের উপর আমার অসম্ভব আস্থা। তা কিন্তু না।...একটা উদাহরণ দেই। ভেষজবিদদের সবাই আনারস খাবার পরে দুধ খাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ করেছেন।...আমি অনেকবার ভরপেট আনারস খেয়ে দুধ খেয়ে প্রমাণ করেছি তথ্যটা মিথ্যা। কোনো কোনো লেখায় তিনি অন্যদের লেখার কিছু ভুল বর্ণনার প্রকৃত তথ্য তুলে আনার চেষ্টা করেছেন। এধরনের লেখাগুলোতে নিজে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করেছেন। ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের কথাও লিখেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজনা গাছ নিয়ে লিখেছেন—'গাছের নাম বাজনা। গাজীপুর অঞ্চলে এই গাছ প্রচুর দেখা যায়। গা-ভর্তি বড় বড় কাঁটা। দেখতে কিম্ভূতকিমাকার। নুহাশপল্লীতে বড় বড় বেশ কয়েকটা বাজনা গাছ ছিল। গাছের কোনোরকম গুণাগুণ কোথাও খুঁজে পাই নি বলে একটা গাছ রেখে বাকিগুলো কেটে ফেলতে বললাম। কর্মচারীদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তারা বলল এই গাছের বীজ ভাঙলে অতি সুঘ্রাণের তেল তৈরি হয়। ওই তেলে মুড়ি মেখে খাওয়া আর অমৃত খাওয়া নাকি একই। আমি খেয়ে দেখেছি। ওয়াক থু'র কাছাকাছি।' এই হচ্ছেন হুমায়ূন আহমেদ। সরাসরি স্বাদটা চেখে নিয়েই মতামত লিখেছেন।

হুমায়ূন আহমেদ যেখানেই হাত দিয়েছেন, সেখানেই সোনা ফলেছে। ভেষজ বাগান তৈরি কিংবা ভেষজ গাছগাছালি নিয়ে লেখালেখিও তাঁর আরেকটি ক্ষেত্র। এবিষয়ে তাঁর কাজ চলমান ছিল। বাগানের সংগ্রহ যেমন ক্রমবর্ধমান ছিল তেমনি এবিষয়ে লেখালেখিও অব্যাহত রেখেছিলেন। বাংলাসাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। বৃক্ষ এবং প্রকৃতি সাহিত্যেও তাঁর অবদান কোনো অংশে কম নয়। এই জগতের মোহমায়া ত্যাগ করার আগেই তিনি 'বৃক্ষকথা' শিরোনামে বৃক্ষ-বিষয়ক একটি গ্রন্থ আমাদের উপহার দিয়েছেন। সমৃদ্ধ হলো আমাদের বৃক্ষসাহিত্যের ভাণ্ডার।

হুমায়ূন আহমেদের হিমু সিরিজের বিখ্যাত গ্রন্থ 'চলে যায় বসন্তের দিন'। এখানে গল্পের মূল নায়ক হিমু রাধাচূড়া নামে একটি বৃক্ষকে ভালোবাসে। হিমু স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে একদিন একটি বিপন্ন রাধাচূড়া গাছকে আবিষ্কার করে। তারপর এই গাছটির রোগমুক্তির জন্য নানান উপায় খুঁজতে থাকে। ঘটতে থাকে নানা ঘটনা। উপন্যাসের শেষ দিকে এই বৃক্ষ নিয়ে অনেক আলাপচারিতা রয়েছে। হিমু রাধাচূড়া বৃক্ষের রোগমুক্তির জন্য নিকটবর্তী মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে যায় এবং প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করে। চলতে থাকে প্রার্থনা। সে তার কথার সম্মোহনীতে একজন বাদককেও গাছটির ভক্ত বানিয়ে ফেলে। তিনিও নিয়মিত গাছটির কাছে যেতে থাকেন। এই যাতায়াত কতটা নিয়মিত, গ্রন্থের আলাপচারিতা থেকেই তা বোঝা যাবে। 'আমি খাঁ সাহেবকে রেখে চলে এলাম। গাছ নিয়ে খাঁ সাহেবের সঙ্গে পরে আর কোনো কথা হয় নি। তবে আমি মোটামুটি নিশ্চিত মৃত্যুপথ যাত্রী গাছটা তাঁর মাথায় ঢুকে গেছে। সুযোগ পেলেই তিনি একা একা গাছটির কাছে চলে আসেন।' উপন্যাসের ৭৬ পৃষ্ঠায় লেখক মৃত্যুপথ যাত্রী রাধাচূড়া গাছটির প্রসঙ্গ আরো মানবিক ও গভীর বোধের জায়গায় নিয়ে এসেছেন। হিমু পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগে শেষবারের মতো রাধাচূড়া গাছটিকে দেখতে চায়। সেখানেই সেই বাদকের সঙ্গে দেখা হয়। বাদক সম্রাট বাবর এবং তাঁর পুত্র হুমায়ূনের মতো নিজের জীবন দিয়ে হলেও গাছটিকে রক্ষা করতে চান।

গল্পের শেষ দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই একটি মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হিমুকে ফাঁসিতে ঝোলানোর ব্যবস্থা হয়েছে। মৃত্যুর আগে হিমুর শেষ ইচ্ছা গাছটিকে একবার দেখে আসা। তার শেষ ইচ্ছা পূরণ করা হয়েছে। বাকিটা হিমুর মুখ থেকেই শোনা যাক—'আমি রাধাচূড়া গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছি। গাছের রোগমুক্তি ঘটেছে। পত্রে পুষ্পে সে ঝলমল করছে। বিকেলে পড়ন্ত আলো পড়েছে। মনে হচ্ছে গাছের পাতায় আগুন ধরে গেছে। অপার্থিব কোনো আগুন।... আমি গাছের গায়ে হাত রেখে বললাম, বৃক্ষ তুমি ভালো থেকো। বৃক্ষ নরম কিন্তু স্পষ্ট স্বরে বলল, হিমু তুমিও ভালো থেকো। ভালো থাকুক তোমার বন্ধুরা। ভালো থাকুক সমগ্র মানবজাতি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাতাল হাওয়া উপন্যাসেও লেখক বারবার আমাদের বৃক্ষের কাছে নিয়ে গেছেন। ইতিহাসভিত্তিক দীর্ঘ পটভূমির এই উপন্যাসে কয়েকটি কেন্দ্রীয় চরিত্রের মধ্যে অন্যতম নাদিয়া। তার পছন্দের বৃক্ষ কদম। লেখক এই উপন্যাসের অনেক অনুসঙ্গই নুহাশপল্লী থেকে নিয়েছেন। নুহাশপল্লীর দিঘি লীলাবতী, তার পাশেই কদম গাছ। উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাসেও আমরা দেখি নাদিয়া মন খারাপ হলেই কদম গাছটির নিচে বসে থাকে। আর সেই দিঘিতেই পাওয়া যায় তার লাশ। ১৫১ পৃষ্ঠায় আছে ছাতিম আর শাপলা ফুলের কথা। এখানে ছাতিমের সৌন্দর্য ও তার তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধের কথা বিবৃত হয়েছে। লেখক অত্যন্ত সচেতনভাবেই এসব বৃক্ষের প্রসঙ্গ এনেছেন। উপন্যাসের ১৭৫ পৃষ্ঠায় শাপলা ফুলের অনবদ্য বর্ণনা পাওয়া যায়। 'দিঘির ঘাটে হোসনা এবং নাদিয়া বসে আছে। তাদের গায়ে চাঁদের আলো পড়েছে। দিঘির এক কোনায় অনেকগুলি শাপলা ফুল ফুটেছে। এই ফুলগুলি বড় বড়। চাঁদের আলোয় ফুলের প্রতিবিম্ব পড়েছে পানিতে। বাতাসে ফুল কাঁপছে, প্রতিবিম্বও কাঁপছে।...'

উপন্যাসের শেষ দিকে আমরা একজন শঙ্কিত হিন্দুকে খুঁজে পাই। যিনি জীবন ও সম্পদ নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে ভারতে পাড়ি জমানোর সিদ্ধান্ত নেন। বাড়িটি বিক্রি করে দেন আইনজীবী হাবীব খানের কাছে। তার আগেই তার যুবতী মেয়েটি সর্বস্ব হারিয়ে নির্বাক-নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। হিন্দু লোকটি মেয়েকে কিছু দিনের জন্য রেখে যান হাবিব খানের বাড়িতে। নাদিয়া হাবীব খানের মেয়ে। সে অনেক চেষ্টা করেও মেয়েটিকে কথা বলাতে পারে না। নাদিয়া তার পুরনো শিক্ষক বিদ্যুৎ বাবুকে খবর দেয়। বিদ্যুৎ বাবু এলেন, পদ্ম নামের মেয়েটিকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন—তোমার যা কিছু সর্বনাশ করেছে তা মানুষই করেছে। তাহলে তুমি বৃক্ষের সাথে কথা বললে তো কোনো ক্ষতি নেই। বৃক্ষ তো কখনো তোমার কোনো ক্ষতি করে নি। তুমি গাছগুলোকে তোমার দুর্ঘটনার কথা বলবে, গাছ কিন্তু মানুষের কথা শুনতে পায়। বিদ্যুৎ বাবু শেষমেষ বললেন, 'এখন চলো আমার সঙ্গে, একটা গাছের সামনে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেই। নাদিয়াদের বাগানে একটা বকুল গাছ আছে। ওই গাছটা হোক তোমার প্রথম বন্ধু।...' লেখক এভাবেই বৃক্ষকে অত্যন্ত সাবলীলভাবে গল্পের পরতে পরতে সাজিয়েছেন। পাশাপাশি মানুষের সঙ্গে বৃক্ষের যে নিবিড় সংযোগ তা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসের একেবারে শেষ দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই হাবীব খানের মা হাজেরা বিবি মারা গেছেন। নাদিয়ার মন খারাপ। সে বাবার কাঁধে হাত রেখে শান্ত ভঙ্গিতে বলল, আমি সারারাত কদম গাছটির নিচে বসে থাকব, কেউ যেন সেখানে না যায়। নাদিয়া তাই করল। লেখকের বর্ণনা থেকেই শোনা যাক বাকিটুকু, 'নাদিয়া কদম গাছের নিচের বেদিতে বসে আছে। কাছেই বকুল গাছে ফুল ফুটেছে। ফুলের গন্ধে চারপাশ আমোদিত। ঝাঁক বেঁধে জোনাকি বের হয়েছে। নাদিয়া তার দাদির কথা ভাবছে না। সে তার ছোট মামার কথা ভাবছে।...' কারণ কদম গাছ ছোট মামারও খুব প্রিয় ছিল।

AMARBOI.COM

'অচিন বৃক্ষ' গল্পটি হুমায়ূন আহমেদের বৃক্ষ ভুবনে একটি অন্যতম সংযোজন। গল্পের শিরোনাম থেকে খুব সহজেই অনুমান করা যায় একটি অচেনা গাছকে ঘিরেই গল্পের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। এই একটি বিষয়কে সামনে রেখেই লেখক অনেকগুলো প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। লোকমুখে খোঁজ পেয়ে লেখক এক নিভৃত গ্রামে গেলেন একটি অচিন বৃক্ষ দেখতে। বর্ষায় হাঁটুকাদা ভেঙ্গে অনেক কষ্টেশিষ্টে তিনি গাছটির কাছে উপস্থিত হন। কিন্তু গাছটি তাঁর কাছেও অচেনা। এদিকে গ্রামের মানুষের কিন্তু উৎসাহের কোনো কমতি নেই। গাছটি কেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখলেন, সুর্দশন কিনা, চিনতে পারলেন কিনা—এমন অনেক প্রশ্নে জর্জরিত হতে থাকেন লেখক। গল্পে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে অচিন বৃক্ষকে নিয়ে গ্রামের মানুষের একধরনের বিনোদন, আশাবাদ এবং প্রত্যাশা। অচিন বৃক্ষ দেখার জন্য মাঝে মাঝে শহর থেকে যখন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা আসে তখন তারা বিষয়টি বেশ উপভোগ করে। অতিথিকে খুশি করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। পিছিয়ে পড়া অবহেলিত এই গ্রামের হেডমাস্টার মুহম্মদ কুদ্দুস অতিথির জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন। এই গাছ নিয়ে গ্রামে একটি আজগুবি গল্পও প্রচলিত আছে। গ্রামের প্রায় সবাই কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তারা সবাই স্বপ্ন দেখে যেদিন অচিন বৃক্ষে ফুল ফুটবে সেদিন পুরো গ্রামের চেহারা বদলে যাবে। বদলে যাবে সবার জীবন-জীবিকার চিত্র। এমনকি হেডমাস্টারের অসুস্থ স্ত্রীও সুস্থ হয়ে উঠবে। গল্পের খানিকটা অংশ এখানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

'এই মানুষটা পরিবারের জন্যে পাগল। সারা রাইত ঘুমায় না। স্ত্রীর ধারে বইস্যা থাকে। আর দিনের মধ্যে দশটা চক্কর দেয় অচিন বৃক্ষের কাছে।

কেন?

ফুল ফুটেছে কি না দেখে। অচিন বৃক্ষের ফুল হইল অখন শেষ ভরসা।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম।'

গল্পের শেষদৃশ্যে আমরা দেখি গ্রামের প্রায় প্রতিটি মানুষই অচিন বৃক্ষের ফুলের জন্য প্রতীক্ষা করে। এখানে লেখক তাদের বিশ্বাস এবং প্রত্যাশাকে ভিন্ন একটি মাত্রায় নিয়ে গেছেন। প্রকৃত অর্থে মানুষের স্বপ্ন এবং বিশ্বাসই মূলত তাকে বাঁচিয়ে রাখে। আর সে কথাই এখানে বারবার মূর্ত হয়ে উঠেছে।

'হেডমাস্টারের চোখ চকচক করতে লাগল। আমি বললাম, আপনি ভাববেন না। আপনার স্ত্রী আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন।

তিনি জড়ানো গলায় বললেন, একটু দোয়া করবেন স্যার। ফুলটা যেন তাড়াতাড়ি ফুটে।

পড়ন্ত বেলায় খেয়ানৌকায় উঠলাম। হেডমাস্টার সাহেব মূর্তির মতো ওপারে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেই একধরনের প্রতীক্ষার ভঙ্গি আছে। সেই প্রতীক্ষা অচিন বৃক্ষের অচিন ফুলের জন্যে। যে প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে হতদরিদ্র গ্রামের অন্যসব মানুষও।'

গল্পে অচিন বৃক্ষ নিয়ে লেখক তেমন কোনো কথা না বললেও প্রতীকি হিসেবে একটি উপলক্ষ ঘিরে আবর্তিত হয়েছে কাহিনি। আমাদের একটি পিছিয়ে পড়া গ্রাম, সমাজ ব্যবস্থা, সাধারণ মানুষদের জীবনযাপন, তাদের স্বপ্ন, প্রেম, মানবতাবোধ, কুসংস্কার ইত্যাদি বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।

২০০৭ সালের দিকে প্রকাশিত ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস 'মধ্যাহ্ন'। এই উপন্যাসের দীর্ঘ পটভূমি ঐতিহাসিক গল্পের আদলেই বর্ণিত। এখানেও বাদ যায় নি বৃক্ষপ্রসঙ্গ। হুমায়ূন আহমেদ অত্যন্ত সচেতনভাবে বৃক্ষের কথা বলেছেন। সবচেয়ে বেশি বলেছেন শিউলি গাছের কথা। সচেতন বা অবচেতন যে ভাবেই হোক, একটি শিউলি গাছের প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। উপন্যাসের নাম *মধ্যাহ্ন* হলেও শিউলি বা শেফালি নিশিপুষ্প। এমনও হতে পারে কাহিনির শেষ দিকের রচনাকাল ছিল শরৎ। অথবা লেখক তখন তাঁর লেখার টেবিল থেকে সরাসরি যে গাছটিকে দেখতে পেতেন তার নাম শিউলি। ১৩৮ পৃষ্ঠায় শিমুল তুলার একটি নান্দনিক বর্ণনা পাওয়া যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন এক অচেনা যুবক এসেছে বান্ধবপুর গ্রামে বেড়াতে। নৌকা থেকে ঘাটে নামার আগেই সে গোলাগুলির শব্দ শুনে চমকে উঠে মাঝিকে জিজ্ঞেস করলো এটা কিসের শব্দ। 'মাঝি বলল, শিমুল ফুলের বিচি ফাটতাছে। এই অঞ্চলে শিমুল গাছ বেশি।... যুবাপুরুষ ব্যাগ হাতে নৌকার ছইয়ের ভেতর থেকে বের হয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। গাছ থেকে মেঘের ছোট ছোট খণ্ডের মতো শিমুল তুলা বিচি ফেটে বের হচ্ছে, বাতাসে উড়ে উড়ে যাচ্ছে।...'

১৬২ পৃষ্ঠায় শিউলি গাছকে নিয়ে কিছুটা রহস্যময়তা সৃষ্টি হয়েছে। একসময়ের ডাকসাইটে জমিদার হরিচরণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মাথা ঠিকমতো কাজ করে না। প্রায়ই দুঃসপ্ন দেখেন। আর দেখেন অসময়ে হারিয়ে যাওয়া কিশোরী মেয়েটাকে। 'হরিচরণ তাকালেন শিউলি গাছের দিকে। হঠাৎ তাঁর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। তিনি স্পষ্ট দেখলেন—শিউলি গাছের নিচে ফ্রক পরা এক মেয়ে। মেয়েটার দৃষ্টি তার দিকে।... তিনি আবার তাকালেন শিউলি গাছের দিকে। হ্যাঁ মেয়েটাকে আবার দেখা যাচ্ছে। সে এখন গাছে হেলান দিয়ে আছে।'... আলোচ্য গ্রন্থে গভীর বৃক্ষ দর্শনের কথাও আছে। আমরা দেখি অসুস্থ শশাংক পালকে জীবনলাল যে চিকিৎসা পদ্ধতি বাতলে দেন তা হচ্ছে একটি বৃক্ষের কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ। প্রাচীনকালে পিগমী মানবগোষ্ঠীর কেউ কেউ এই চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করতেন। একটি বৃক্ষকে আঁকড়ে ধরে বলতে হবে 'হে বৃক্ষ, তুমি আমার রোগ গ্রহণ করে আমাকে রোগমুক্ত কর।' কাহিনির শেষ দৃশ্যে তারই প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। 'শশাংক পাল নগ্ন হয়ে হরিচরণের বাড়ির সামনের শিউলি গাছ জড়িয়ে ধরে বসে আছেন। তিনঘণ্টা পার হয়ে গেছে।... সাহস করে কেউ কাছে আসছে না। শশাংক পাল সবাইকে ধমকাচ্ছেন—ভাগো। ভাগো।'

এভাবেই হুমায়ূন আহমেদ তার লেখকশৈলীতে নির্মাণ করেছেন অচেনা এক বৃক্ষ ভুবন। যে ভুবন ছিল তাঁর একান্ত আপন। তিনি যেমন উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে আগে নিজে নিজে কথা বলে নিতেন তেমনি উপন্যাসের বৃক্ষগুলোর সঙ্গেও আলাপচারিতা সেরে নিতেন। একারণেই উপন্যাসের বৃক্ষগুলোও বেশ সজীব ও প্রাণবন্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদ : চলচ্চিত্রের বিষয়আশয়

মোমিন রহমান

একজন লেখক, কবি কিংবা শিল্পী লুকিয়ে থাকেন তাঁর সৃষ্টির মাঝেই। তাঁর জীবন, পছন্দ, রুচি, মননশীলতা, দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শ, মূল্যবোধ—সবই প্রচ্ছন্ন থাকে সৃষ্টির নানা অনুষঙ্গে। এই কথার সূত্রে বলা যায়, কিংবদন্তি লেখক হুমায়ূন আহমেদকেও পাওয়া যাবে তাঁর নানা সৃষ্টির মাঝে। স্বয়ং হুমায়ূন আহমেদ তাঁর 'দূরে কোথায়' উপন্যাসের ভূমিকাতে লিখছেন : 'লক্ষ করলাম এই উপন্যাসে আমি নিজের কথাই বলতে শুরু করেছি। সব লেখাতেই লেখক খানিকটা ধরা দেন, কিন্তু এরকম নির্লজ্জভাবে দেন না।'

হুমায়ূন আহমেদের চলচ্চিত্রকেও বলা যায় তাঁর গল্প-উপন্যাসের সম্প্রসারণ। তাঁর যে সব প্রবণতা মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্য-নাটকে, চলচ্চিত্রেও সেগুলোর উপস্থিতি লক্ষ করি। এ ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয়ও বিভিন্ন চলচ্চিত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এইসবের ওপরই আলো ফেলা হলো এখানে।

AMARBOI.COM

জোছনাপ্রীতি

হুমায়ূন আহমেদের মধ্যে জোছনার প্রতি প্রবল ভালোবাসা লক্ষ করা যায়। বলা যায়, ছোটবেলা থেকেই জোছনার রূপে মুগ্ধ তিনি। এ সম্পর্কে তিনি বলছেন : 'আজ থেকে তিরিশ বছর আগে সিলেটের মীরা বাজারের বাসায় এক গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। দেখি মশারির ভেতর ঠিক আমার চোখের সামনে আলোর একটা ফুল ফুটে আছে। বিস্ময়, ভয় ও আনন্দে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম– এটা কী ?... বাবা জেগে উঠলেন, মা জাগলেন, ভাইবোনেরা জাগল। বাবা আমার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, জোছনার আলো ঘরের ভেন্টিলেটর দিয়ে মশারির গায়ে পড়েছে। ভেন্টিলেটরটা ফুলের মতো নকশাকাটা। কাজেই তোমার কাছে মনে হচ্ছে মশারির ভেতর আলোর ফুল। ভয়ের কিছু নেই, হাত বাড়িয়ে ফুলটা ধরো...।' (*আমার ছেলেবেলা*, পৃ. ৯৫)। পরে মামার সঙ্গে হাওরের মাঝখানে নৌকার ওপর দাঁড়িয়ে আকাশ ও চারপাশে চেয়ে উপভোগ করেছেন জোছনার রূপ। এভাবেই জোছনা হুমায়ূন আহমেদের মাথায় ঢুকে যায় এবং আমৃত্যু তাঁকে তাড়িয়ে বেড়ায়।

হুমায়ূন আহমেদের প্রথম রচিত উপন্যাস 'শঙ্খনীল কারাগার' ও প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'নন্দিত নরকে'-এ লক্ষ করা যায় জোছনার উপস্থিতি। 'নন্দিত নরকে'র শেষ পর্যায়ে, যখন ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত মন্টুর লাশ ফেরত পাওয়ার প্রতীক্ষায় জেলের বাইরে অপেক্ষা করছে খোকা ও তাঁর বাবা, তখন চারপাশের পরিবেশটা ছিল ম্লান জোছনার আলোয় প্লাবিত। একসময় ভোর হয়। খোকা দেখে—'চাঁদ ডুবে গেছে। বিস্তীর্ণ মাঠের উপরে চাদরের মতো পড়ে থাকা ম্লান জ্যোৎস্নাটা আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই।' (*নন্দিত নরকে*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৭৮) এমনভাবে নানা উপন্যাস, গল্প ও নাটকে হুমায়ূনের জোছনা-প্রীতি লক্ষ করা যায়। এমনকি তিনি মরতেও চেয়েছেন জোছনা রাতে। গানের মাঝে সেই আকুতি ধরা পড়েছে : 'ও কারিগর দয়ার সাগর ওগো দয়াময়/ চান্নি পসর রাইতে যেন আমার মরণ হয়।'

চলচ্চিত্রেও লক্ষ করা যায় হুমায়ূন আহমেদের এই জোছনা-প্রীতি। তাঁর পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র 'আগুনের পরশমণি'-তে দেখা যায়– স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রে 'চরমপত্র' শোনে মতিন সাহেব এবং রাত্রি ও অপলা –বাবা ও দুই মেয়ে, এই সময় বিদ্যুৎ চলে যায়। তখনই জোছনার উপস্থিতি লক্ষ করে বাবা ও দুই মেয়ে। রাত্রি গান গায়। চিত্রনাট্য থেকে দৃশ্যটি তুলে ধরা যাক।

সিকোয়েন্স ২৬

রাত। বারান্দায় বাবা এবং দুই কন্যা খবর শুনছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। চরমপত্র হচ্ছে। চরমপত্রে ঢাকা নগরীতে গেরিলা তৎপরতার কথা বলা হলো। বাবা দারুণ উত্তেজিত।

বাবা : তোদের বলি নি–গেরিলা ফাইটিং শুরু হয়েছে। মিলিটারিগুলিকে মেরে শেষ করে দিচ্ছে। টেলিফোন লাইন, ইলেকট্রিক সাপ্লাই সব শেষ করে দেবে। এইগুলা বাঘের বাচ্চা। সাক্ষাৎ আজদহা।

[কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রচণ্ড শব্দ হলো। ইলেকট্রিসিটি চলে গেল।]

বাবা : কথা বলতে না বলতে চলে গেল। দিয়েছে ইলেকট্রিক সাপ্লাই শেষ করে। গুড! ভেরি গুড!

[ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বারান্দা আলোকিত হয়ে গেল চাঁদের আলোয়।]

রাত্রি : কী সুন্দর চাঁদ দেখেছ বাবা?

বাবা : স্বাধীন দেশের চাঁদ–সুন্দর হবে না? দেশ স্বাধীন হওয়ার বেশি বাকি নেই। হাতেগোনা কয়েকটা দিন। তারপর দেখবি–চাঁদের আলোয় বসে আমরা গলা খুলে গান গাইব–চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে।

রাত্রি : ভুল সুরে গান গেও না বাবা। রাগ লাগে–

[নিজে গান শুরু করবে–]

(গান)

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে

উছলে পড়ে আলো।

ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধ সুধা ঢালো।

মতিন সাহেব ও রাত্রির গানের মাঝে মুক্তিযোদ্ধা বদিউল আলমের ঘুম ভেঙে যায়। সে অবাক হয়ে গান শোনে। বিছানা থেকে উঠে এসে জানালার পাশে দাঁড়ায়। দেখে জোছনায় বাবা-মেয়ে বসে আছে। গান গাইছে। দৃশ্যটি তার কাছে অদ্ভুত লাগে। সে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই রাত্রি গান থামিয়ে দেয়। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বদিউল আবার বিছানায় ফিরে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্য কুসুমে কীটের মতো 'আগুনের পরশমণি'তে যে চাঁদ দেখা গেছে, তা নকল চাঁদ। এ প্রসঙ্গে হুমায়ূন আহমেদের ভাষ্য : "পূর্ণিমার চাঁদ দেখানোর জন্যে আমি আসল চাঁদ ব্যবহার না করে নকল চাঁদ ব্যবহার করেছি। পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি এফডিসিতে চাঁদ তৈরির একটা যন্ত্র আছে। যন্ত্রটা দেখতে মীর জুমলার কামানের মতো। এই যন্ত্রে নানান ধরনের চাঁদ তৈরি করে পর্দায় ফেলা হয়। ভাড়া এক শিফটের জন্যে এক হাজার টাকা। আমি এক হাজার টাকায় নকল চাঁদ তৈরি করে সেই দৃশ্য ধারণ করলাম। কুৎসিত একটা মেকি চাঁদ। অথচ পূর্ণিমার জন্যে অপেক্ষা করলেই আমরা পারতাম। তাড়াহুড়ার জন্যে এই কাজটা করা হলো না। পবিত্র কোরান শরীফে এই কারণেই হয়তো বলা হয়েছে, 'হে মানব সম্প্রদায়, তোমাদের বড়ই তাড়াহুড়া।'...।" (*ছবি বানানোর গল্প*/ হুমায়ূন আহমেদ, সুবর্ণ প্রকাশনী, ১৯৯৬, ঢাকা, পৃ. ৭১)

'শ্রাবণ মেঘের দিন'-এ দেখা যায়, জোছনা প্লাবিত রাতে বাড়ির উঠানে দড়ি পাকাচ্ছে সুরুজ। এ সময় তার কাছে আসে কুসুম। নানা কথা বলে বিয়ে ভাঙার খুব চেষ্টা করে। কুসুম বলে, 'জ্বিনে ধরা মাইয়া আমি। এইজন্য আমার বিবাহ হয় না। কত সম্বন্ধ এল, কত সম্বন্ধ গেল।' সুরুজ বিশ্বাস করে না। বলে, 'তোমারে আমার বড়ই মনে ধরছে।'

সেই চান্নিপসরের রাতে কুসুম অতঃপর মতির কাছে ছুটে যায়। মতি তখন শুয়ে ছিল। কুসুমকে দেখে উঠে বসে। বলে, 'এত রাতে আইসছ কুসুম? কামটা ঠিক করিস নাই। বাড়িত যা কুসুম, কাল তোর বিবাহ।'

কুসুম : আপনি আমারে একটু আদর কইরা দেন?

মতি : তুই এইসব কী কস !

কুসুম : আমি হইলাম জ্বিনে ধরা মাইয়া। কখন কী বলি ঠিক নাই। ভুল হইলে মাফ কইরা দিয়েন।

কুসুম বিয়ের কথা বলে। মতি বলে, 'আমার ওস্তাদ বলেছেন, সংসার আর গান একলগে হয় না।'

কুসুম : আপনার ওস্তাদ কিন্তু বিবাহ করেছিলেন।

মতি : এই জন্যেই তাঁর গলায় গান বসে নাই। আমার গলায় বসছে। কি বসে নাই ?

কুসুম : বসছে।

আকাশে পূর্ণ চাঁদ। সেই দিকে চেয়ে কুসুম বলে, 'দেখছেন কী সুন্দর চাঁদনী! মাইনষে যেমন বৃষ্টির মধ্যে গোসল করে, আমারও চাঁদনী পসরের মধ্যে গোসল করতে ইচ্ছা করে। চলেন পুকুর পাড়ে বইসা চান্নিপসরে গোসল করি।'

মতি তার কথায় সায় না দিয়ে বলে, 'কুসুম, তুই বাড়িত যা।'

কুসুম বাড়িতে যায় না। চাঁদের দিকে চেয়ে গান গায়, 'আমার ভাঙা ঘরে ভাঙা চালা ভাঙা বেড়ার ফাঁকে/অবাক জোছনা ঢুইকা পড়ে, হাত বাড়াইয়া রাখে/হাত ইশারায় ডাকে কিন্তু মুখে বলে না,/ আমার কাছে আইলে বন্ধু, আমারে পাইবে না।'

'চন্দ্রকথা' চলচ্চিত্রে জোছনার প্রবল প্রতাপ লক্ষ করা যায়। এমনকি সংলাপেও জোছনার প্রসঙ্গ। যেমন, সরকার সাহেব আমিনকে বলে, 'এমন এক দিনে বিবাহ করো, যেদিন আকাশে চন্দ্র। পূর্ণ চন্দ্র। ঘরে চন্দ্র, আকাশেও চন্দ্র।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জহির গান গায় 'ও আমার উড়ালপঙ্খীরে... ।' গানের এক পর্যায়ে দেখা যায় আকাশে চাঁদ। কাট-টু-জহির গাইছে: 'মেঘবতী মেঘকুমারী মেঘের উপর থাকো/সুখ-দুঃখ দুই বোনেরে কোলের উপর রাখো... ।'

সেই জোছনাপ্লাবিত রাতে জহিরের গায়ে জোছনা ঝরে পড়ে। সে পুকুরে ঝাঁপ দেয়।

আবার দেখা যায়, জহির গ্রাম থেকে চলে যাচ্ছে। জোছনার আলো পড়েছে ওর গায়ে।

অন্য এক দৃশ্যে দেখা যায়, চন্দ্রের জন্যে গ্রামে সালিশ বসেছে। আড়াল থেকে তা দেখে আমিন। চাঁদের আলোয় প্লাবিত তার দেহ।

চান্নিপসরের রাতে সরকার বাড়ির ছাদে গানের আসর বসে। শুভপুরের মুসলেম মিয়া গান গায়—'চাঁদনী পসরে কে আমায় স্মরণ করে/কে আইসা দাঁড়াইছে গো আমার দুয়ারে ?'

আমিন সরকার সাহেবের বেডরুমে উঁকি দেয়। তার মুখে চাঁদের আলো। কাট-টু শয্যায় শুয়ে আছে সরকার সাহেব ও চন্দ্র। তাদের গায়ে জানালা দিয়ে ঝরে পড়া জোছনা। সরকার সাহেব হাত রাখে চন্দ্রের গায়ে। কাট-টু আমিন শুয়ে আছে তার ঘরে। তার মুখে জোছনা।

আরেকদিন সরকার ও চন্দ্র শুয়ে আছে। তাদের গায়ে ঝরে পড়া জোছনা। এ সময় কাক এবং তারপরই কোকিলের ডাক শোনা যায়। চন্দ্র বিছানা থেকে উঠে বসে। সরকার সাহেব বলে উঠেন, 'অসময়ে কাক ডাকে, কোকিল ডাকে। বড়ই অদ্ভুত, তাই না চন্দ্র ?' কাট-টু-সরকার বাড়ির জংলায় দাঁড়িয়ে আছে জহির। তার গায়ে চাঁদের আলো পড়েছে। আমিন এসে জহিরকে চলে যেতে বলে। জহির চলে যায়। আমিন সরকার সাহেবের বেডরুমের দিকে তাকায়। তাঁর মুখে জোছনা।

'শ্যামল ছায়া'-য় দেখা যায়, জোছনা প্লাবিত রাতে নৌকার ওপর বসে/শুয়ে আছে সবাই। আশালতা তার স্বামীর সঙ্গে বসে আছে। এই সময় করিম সাহেব মাওলানার সঙ্গে কথা বলেন। আশালতা গান গায়, 'ভ্রমর কইও গিয়া... ।'

'নয় নম্বর বিপদ সংকেত'-এ দেখা যায়, জোছনা রাতে পুকুর পাড়ের ছাউনিতে বসে কথা বলছে ম্যানেজার, লাইলী ও সামছু। এক পর্যায়ে লাইলী গান গায়। তার গানেও জোছনার প্রসঙ্গ : 'আসমানের রঙিলা চাঁদ আমার ঘরে নাই/রঙিলা বন্ধুরে আমি কেমনে কাছে পাই ?'

কাজের মেয়ে রহিমা কল্পনা করে, জোছনা রাতে হাতির পিঠে কনে সেজে বসে আছে সে, পাশে বর বেশে সোভাহান সাহেব। ব্যান্ড পার্টিসহ বরযাত্রীরা এগিয়ে চলে।

জোছনা রাতে গানের আসর বসেছে। রঞ্জনা গেয়ে ওঠে, 'ফাগুন রজনী ফুরায়ে যায়'।

'আমার আছে জল'-এ লক্ষ করি, জোছনা রাতে দূরবিন দিয়ে আকাশের তারা দেখে দিলশাদ। সাব্বির গান গায়, 'নদীর নাম ময়ূরাক্ষী।'

বৃষ্টিবিলাস

বাঙালির মননে বর্ষার প্রভাব প্রবল। তাই তো বাংলা সাহিত্যের নানা রচনায় এই ঋতু ও বৃষ্টির বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায়। হুমায়ূন আহমেদের মনের আয়নাতেও বর্ষা তথা বৃষ্টির প্রবল প্রভাব লক্ষ করা যায়। এ সম্পর্কে তিনি বলছেন: '... বৃষ্টির ব্যাপারটাও ছোটবেলা থেকেই পছন্দ করা শুরু। থাকতাম সিলেটে। প্রচুর বৃষ্টি হতো। বৃষ্টি হলেই ছুটে বাইরে চলে যেতাম। বৃষ্টির মধ্যেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝাপাঝাপি করা, দৌড়াদৌড়ি করা। মা ডাকলেও ফিরে তাকাতাম না। সবচেয়ে বড় কথা, বাংলাদেশে কেউ বাস করবে আর বৃষ্টি দেখে পাগল হবে না, তা হতে পারে না।' (অন্যদিন-এর মুখোমুখি হুমায়ূন আহমেদ, পাক্ষিক *অন্যদিন*, বর্ষ-৬, সংখ্যা ২০, ১-১৫ নভেম্বর ২০০১)।

হুমায়ূন আহমেদের বহু ছোটগল্প ও উপন্যাসেও বৃষ্টি ও বর্ষার নান্দনিক বর্ণনা রয়েছে। বিশেষত হাওড়ে ঘেরা গ্রামে বর্ষা যেন জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়। উদাহরণ হিসেবে 'ফেরা' উপন্যাসটির কথা বলা যায়। বাঙালি জীবনের ছয়টি ঋতুর প্রকৃতি ও মেজাজই এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এমনিভাবে নাটক ও সাহিত্যে বৃষ্টি ও বর্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে অপূর্ব ব্যঞ্জনায়।

হুমায়ূন আহমেদের চলচ্চিত্রে বৃষ্টি কীভাবে ধরা দিয়েছে, সেটা এবার দেখা যাক।... 'আগুনের পরশমণি' ছবিতে বৃষ্টির সঙ্গে অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করেছে রবীন্দ্রসঙ্গীত। এখানে 'এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে' এই রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে বৃষ্টির প্রবল বর্ষণ, প্রচণ্ড বাতাসে গাছের শাখা-প্রশাখার নড়াচড়া, পিচঢালা পথে বদিউল আলমের এগিয়ে আসা, বাড়ির উঠানে রাত্রি-অপলাদের আনন্দমুখর ভেজা, মিলিটারি জিপে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর এক সদস্যের সিগারেট খাওয়া, রক্তাক্ত লাশ ও মৃত কুকুরের ওপর বৃষ্টিপাত—এসবের মধ্য দিয়ে কি হুমায়ূন জীবনের বৃহত্তর ব্যঞ্জনাকে ছুঁতে চেয়েছেন, জীবনের প্রবহমানতাকে নির্দেশ করেছেন ? কিংবা ঝলমলমুখর দিনে রাত্রি-অপলাদের উচ্ছল আনন্দের পাশাপাশি পাক সেনা, রক্তাক্ত লাশ—এসবের মধ্য দিয়ে কি চলচ্চিত্রকার বদি'র মর্মান্তিক পরিণতির কোনো পূর্বাভাস রাখতে চেয়েছেন ? বৃষ্টির মধ্যে কি লুকানো রয়েছে আনন্দ আর বেদনার দ্বৈত অনুভূতি ?

যখন পাকবাহিনী একটি গর্তে কয়েকজনের রক্তাক্ত লাশ মাটিচাপা দিয়ে চলে যায়, গোরখোদকেরা নীরবে কাঁদতে থাকে, সেই সময় আবার বৃষ্টি নামে এবং কচুপাতা অবনত হয়। এখানে হুমায়ূন বৃষ্টিকে করুণ রস সৃষ্টিতে ব্যবহার করেছেন।

AMARBOI.COM

হুমায়ূনের 'শ্রাবণ মেঘের দিন'-এও আমরা খুঁজে পাই বৃষ্টির মধ্যে আনন্দ ও বেদনার দ্বৈত অনুভূতি। যখন শাহানার নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে তাদের বাড়ি গিয়ে ইরতাজুদ্দিন কর্তৃক অপমানিত হয়ে ফিরে আসে মতি, পরান ঢুলির বাড়িতে গানের মাঝে সান্ত্বনা খোঁজে সে—'আমার গায়ে যত দুঃখ সয়/ বন্ধুয়ারে, করো তোমার মনে যাহা লয়...।' এই সময় অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামে।...মতির গান শুনে হাসির ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে ছুটে আসে কুসুম। এদিকে ইরতাজুদ্দিনের অট্টালিকার দোতলার ঘরের জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জল স্পর্শ করে শাহানা। মুখে আনন্দের ছটা।... গান গেয়ে চলেছে মতি। কাঁদছে সে। বাইরে খোলা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে কুসুমও। বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে তার চোখের জল। বৃষ্টি যেমন আনন্দের, বৃষ্টি তেমনই দুঃখের—এটিই মূর্ত হয়ে উঠেছে এখানে।

'দুই দুয়ারী' চলচ্চিত্রেও লক্ষ করি বৃষ্টির প্রতি হুমায়ূনের অসীম ভালোবাসা। তরুর ভেতর যখন দ্বন্দ্বমুখর বেদনা ঠিক তখনই এ ছবিতে বৃষ্টি নামে। অঝোর বৃষ্টিতে একটানা ভিজতে দেখা যায় রহস্যমানবরূপী রিয়াজকে। তরু ছাতা হাতে এগিয়ে যায় তাকে তুলে আনার জন্যে। রহস্যমানব জানায়, বৃষ্টির গান শুনতে পাওয়ার জন্যেই তার এই আয়োজন। তরুকে সে বৃষ্টির সঙ্গে একাকার হয়ে যাওয়ার জন্যে আহ্বান করে। প্রথম অবস্থায় তরু তা এড়িয়ে গেলেও কয়েক পা এগিয়ে হাতের ছাতাটি দূরে ছুড়ে ফেলে দেয়। বৃষ্টির নির্যাস গায়ে মেখে ঘুরপাক খায়। বর্ষণধারায় যেন মিশে যায় তার দুঃখবেদনা। এমনিভাবে 'বর্ষার প্রথম দিনে/ঘন কালো মেঘ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখে' এই গানের সিকোয়েন্সেও তরু ও শফিকের উচ্ছল আনন্দের মাঝে বর্ষার প্রকৃতি ও বৃষ্টি মূর্ত হয়ে ওঠে।

'চন্দ্রকথা' ছবিতেও রয়েছে বৃষ্টির চমৎকার প্রয়োগ।

ঝুম বৃষ্টি। আমিন বসে আছে ছাদে। সরকার সাহেব রেকর্ডে গান শোনেন –'কত না ঢঙ্গে কত না রঙ্গে...।' বৃষ্টিতে ঘুরে ঘুরে নাচে জইতরি। সরকার সাহেব জলতরঙ্গ বাজান। মেয়ের সঙ্গে বৃষ্টিতে ভেজে জইতরির মা-ও।

সরকারের আদেশে চন্দ্রকে চাবুকের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করার পর আমিন নিজের ঘরে বসে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। ঠিক এমন সময় আমিনের সঙ্গে একাত্ম হতেই যেন আকাশ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি নামে। এই বৃষ্টির মাঝেই অপরপ্রান্তে দেখা যায়, সরকার সাহেব গ্রামোফোনে গান বাজাচ্ছেন—'পথহারা পাখি কেঁদে ফিরে একা...।' চন্দ্র অবিকল রেকর্ডের মতো কণ্ঠে একই গান গায়। বৃষ্টির মধ্যেই সেই গান শোনে আমিন ও সাদেক। জংলায় দাঁড়িয়ে জহির এইসময় অঝোর বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে। এভাবেই 'চন্দ্রকথা'-য় বৃষ্টি হয়ে ওঠে দুঃখবোধ প্রকাশের অনন্য মাধ্যম।

'শ্যামল ছায়া'য় দেখা যায়, রাজাকার কমান্ডারকে ছেড়ে দেওয়ার পর আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। বৃষ্টি নামে। আশালতা বসে আছে; পাশে পাখির খাঁচা। সে বৃষ্টিতে ভিজছে। ছাতা হাতে স্ত্রীর দিকে এগিয়ে যায় গৌরাঙ্গ, আবার মায়ের কাছে ফিরে আসে। বৃষ্টিতে ভিজতেই থাকে আশালতা। তার মনে পড়ে বিয়ের দিনের কথা; সাত পাকের কথা।

'নয় নম্বর বিপদ সংকেত'-এ বৃষ্টি নামে। রঞ্জনা গান গায় 'আজি ঝর ঝর মুখর বাদল দিনে'। তার আহ্বানে বৃষ্টিতে ভিজে এবং নাচতে থাকে শিশুর দল। পরে যোগ দেন সোভাহান সাহেব, তার দুই মেয়ের স্বামী, ম্যানেজার এবং মামিছু। বৃষ্টি যেন এখানে সবাইকে উজ্জীবিত করে; আনন্দ সাগরে ভাসায়।

'আমার আছে জল'-এ বৃষ্টির মাঝে গান গায় দিলশাদ। তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, 'ঝুম বরষায় ঘন কালো মেঘে উল্লাসে নাচি একা আমি...।' পরে 'যদি ডেকে বলো, এসো হাত ধরো' গানের মাঝে মূর্ত হয়ে ওঠে নিশাত-জামিল-দিলশাদের ত্রিভুজ প্রেম, ভালোবাসার টানাপোড়েন।

'ঘেটুপুত্র কমলা'য় বৃষ্টির মাঝে ভিজে হামিদা। কমলার চোখে ভাসে ঝুম বৃষ্টিতে কলার ভেলার ওপর দাঁড়িয়ে ছোট বোনের সাথে লাঠি নিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার ছবি। বর্তমানে ফিরে এসে সে আর্টিস্ট কুদ্দুসের সঙ্গে বৃষ্টির মধ্যে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা খেলে।

মৃত্যুর রূপায়ণ

মৃত্যুর প্রতিফলন বারবার হুমায়ূন আহমেদের শিল্পকর্মে দেখা যায়। এর কারণ কী? একাত্তরের অগ্নিঝরা দিনগুলোতে তিনি তাঁর বাবাকে হারিয়েছেন; পাকসেনাদের হাতে তাঁর বাবা নিহত হয়েছেন। এই বিষয়টি কি তাঁকে সারা জীবন তাড়িয়ে বেড়িয়েছে? হতে পারে। আরেকটি বিষয়, ১৯৭১ সালে বেশ কয়েকদিন হুমায়ূন আহমেদ বন্দি ছিলেন পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পে। সেখানে অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হন তিনি। তখনকার অনুভূতি সম্পর্কে হুমায়ূন আহমেদ বলছেন : 'কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি মারা যাব, নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচব–এই বোধটাই তখন প্রবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল।' (*অন্যদিন*-এর মুখোমুখি হুমায়ূন আহমেদ/*অন্যদিন*, বর্ষ ৬ সংখ্যা ২০, ১-১৫ নভেম্বর ২০০১) বলা যায়, একাত্তরে মৃত্যুর অতি কাছ থেকে হুমায়ূন ফিরে এসেছিলেন। তাই মৃত্যুচিন্তা তাঁর চেতনায় ঘুরপাক খেত। সঙ্গতকারণেই তাঁর গল্প-উপন্যাসে মৃত্যুর বারবার প্রতিফলন দেখা যায়। টিভি নাটক ও চলচ্চিত্রও এর ব্যতিক্রম নয়।

হুমায়ূন আহমেদের অভিষেক চলচ্চিত্র 'আগুনের পরশমণি'-তে দেখা যায়—মৃত্যুপথযাত্রী বদিউল আলম রাত্রির কথায় ভোর দেখার জন্যে তাকাল। ভোরের আলোকে ছোঁয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল। কাট টু মুক্ত আকাশে একঝাঁক পায়রা ডানা মেলে দিল। রক্তাক্ত সূর্য। নেপথ্যে বেজে ওঠে 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' এই রবীন্দ্রসঙ্গীতটি। চিত্রনাট্য থেকে দৃশ্য দুটি তুলে ধরা যাক—

সিকোয়েন্স-৯০

বদির ঘর। রাত্রি ঢুকেছে।

রাত্রি : ভোর হয়েছে।

[বদি তাকিয়ে ছিল। এখন খুব ক্লান্ত। চোখ বন্ধ করে ফেলেছে।]

রাত্রি : চোখ বন্ধ করলে হবে না। আপনাকে তাকাতে হবে। আপনাকে ভোর দেখতে হবে।

[রাত্রি ছুটে গিয়ে জানালার পর্দা সরালে আলো এসে ঢুকল ঘরে।]

রাত্রি : আপনি তাকান।—আপনি দয়া করে তাকান।

[বদি তাকাল। ভোরের আলো দেখল। একটা হাত অনেক কষ্টে বাড়াল সেই ভোরের পবিত্র আলো স্পর্শ করবার জন্যে। বদির চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। পাখি ডাকছে।]

সিকোয়েন্স-৯১

আকাশময় ভোরের আলো। পাখির ঝাঁক উড়ছে আকাশে। লাল সূর্য।

[নেপথ্যে গান : 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে/ এ জীবন পূর্ণ করো দহন দানে...।']

চলচ্চিত্রমনস্ক দর্শকদের অবশ্য বদিউল আলমের এই মৃত্যুদৃশ্য দেখে বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের 'অপরাজিত' ছবিতে হরিহরের মৃত্যুর কথা মনে পড়ে যেতে পারে। সেখানে দেখা যায়—ভোররাতে গঙ্গার জল নিয়ে অপু ঘরে ঢোকে। সর্বজয়া সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাজল নিয়ে স্বামীর মুখে ঢেলে দেয়, কষ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে জল—হরিহরের চোখ দুটি ঠেলে বেরিয়ে আসছে—তার মাথাটি ধপ করে বালিশের ওপর পড়ে যায়। সর্বজয়ার আর্তনাদ : 'এ কী হলো ?' কাট-টু কাশীর ঘাট থেকে একঝাঁক পায়রা অসীম আকাশে বিলীন হয়, রেখে যায় সীমাহীন শূন্যতা। নেপথ্যে সর্বজয়ার কান্না : 'এ কী হলো—এ কী হলো।'

অবশ্য 'আগুনের পরশমণি'-তে বদিউল আলমের মৃত্যুর সিকোয়েন্সে ভোরের আলো, রক্তাক্ত সূর্য—এইসব উপাদানের সংযুক্তি ঘটিয়ে হুমায়ূন নতুন মাত্রা যোগ করেছেন; ভিন্ন ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেছেন সিকোয়েন্সটিকে। দর্শক-চেতনায় এই বোধ সঞ্চারিত করেছেন তিনি যে, বদিউল আলমের এই মৃত্যু গতানুগতিক কোনো মৃত্যু নয়। একটি স্বাধীন জাতির একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূর্যসন্তান দেশের স্বাধীনতার জন্যে জীবন উৎসর্গ করল; না-ফেরার দেশে চলে গেল। এইসব মানুষের জন্যেই স্বাধীনতার লাল সূর্যকে আমরা লাভ করেছি। উল্লেখ্য, বিন্তির মৃত্যুতে ফেড আউটের ব্যবহার নান্দনিক ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত হয়।

'শ্রাবণ মেঘের দিন'-এ দেখা যায়, মতিকে নিয়ে সংসার বাঁধার স্বপ্ন পূরণ সম্ভব নয় বুঝতে পেরে আশাহত কুসুম বিষ খায়। তাকে নৌকায় করে শহরপানে ছুটে চলে সুরুজ, মতি ও কুসুমের মা। কুসুম যন্ত্রণায় কাতরে ওঠে। নদীর জলে তার পা দাপাদাপি করে স্থির হয়ে যায়; নদীর পানি লাল হয়ে ওঠে তার পায়ের আলতায়। মতি গেয়ে ওঠে: 'সুয়াচান পাখি'/আমি ডাকি তুমি ঘুমাইছো নাকি...।' একপর্যায়ে মতিকে নৌকার গতিপথ পরিবর্তন করতে বলে কুসুমের মা। শ্রাবণের ভরা নদীতে ভেসে চলে নৌকা। উল্লেখ্য, শেষে টপ শটের ব্যবহার দৃশ্যটিকে অর্থবহ করে তোলে; পশ্চিমাকাশে অস্ত যাওয়া সূর্যের লাল আভায় মানব জীবনের অনিত্যতা উদ্ভাসিত হয় চলচ্চিত্রিক ব্যঞ্জনায়।

'চন্দ্রকথা' ছবিতে জহির চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে এসেছে বিচ্ছেদ ও করুণ মৃত্যু। এখানে আমিন তার পছন্দের পাত্রীকে বিয়ে করতে না পারায় সবশেষে প্রভুকে হত্যা করতেও পিছপা হয় না। এ ছাড়া 'চন্দ্রকথা' চলচ্চিত্রে দেখা যায়, চন্দ্রের মা'র কাছে আমিনের বিয়ের প্রস্তাব যায়। বিয়ের ব্যাপারে মা চন্দ্রের মত জানতে চাইলে চন্দ্র বলে: 'বাপজানের মৃত্যুর পর তুমি অনেক কষ্ট কইরা আমারে পালছ। আমারে যে একা পালছ তা না। তোমার বইনের ছেলেরেও পালছ। তুমি জীবন কাটাইছ দুঃখে দুঃখে। তোমার সুখের জন্যে আমি জীবন দিয়া দিব। তুমি যদি একটা কলাগাছ আইন্যা বলো, এরে বিবাহ কর। আমি অবশ্যই বিবাহ করব।'... অন্য আরেকটা দৃশ্যে মৃত্যু-প্রসঙ্গ এসেছে এভাবে : ঘটনা পরম্পরায় গভীর রাতে বাড়ি ফিরে চন্দ্র এবং জহির, ঘরে পা দিতেই তারা দেখে সিলিং থেকে ফাঁসির দড়ি ঝুলছে। চন্দ্রের মা ফাঁসিতে ঝুলবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাদেরকে দেখে বলেন, 'দড়ি ঝুলাইছি দেখছস চন্দ্র? নয়ন ভইরা দেখ। আমি এই দড়িত ফাঁসি নিব।'... এ ছবির শেষ পর্যায়ে জহির শহর থেকে ফিরে আসে। প্রবঞ্চিত হওয়ার বেদনা সে সইতে পারে না। ধুঁকে ধুঁকে এগিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে।

রাত্রির ছেলে ও স্বামী নিহত হয়েছে—এই বিষয়টি 'শ্যামল ছায়া'তে মূর্ত হয়ে উঠেছে সংলাপে। গুলির শব্দ, আগুন আর নদীর তীর ধরে মানুষের দৌড়ানোতেও মৃত্যুর আভাস মেলে। নদীর জলে ভেসে ওঠা লাশও মৃত্যুর নিদর্শন। ফুলির মা আশালতাকে জানায়, মিলিটারি কর্তৃক তার স্বামীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার কথা। সে তখন ঝুম বৃষ্টিতে জঙ্গলের মধ্যে বসে ছিল।...মিশাখালির বাজারে নৌকার ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ কিনতে যায় মাওলানা ও কাল্লু। সেখানে তারা দেখে পুড়ে যাওয়া বাজার ও রক্তাক্ত লাশ।... মিলিটারিরা আবার আক্রমণ করে। কাল্লু পালিয়ে আসে, মাওলানাকে মিলিটারা ধরে নিয়ে যায়। সেখানে নদীর ধারে গড়ে ওঠা ক্যাম্পে মাওলানা প্রত্যক্ষ করে একের পর এক মানুষকে গুলি করে নিহত করার মর্মান্তিক দৃশ্য।

'আমার আছে জল'-এ কিশোরী দিলশাদ আত্মহত্যা করে। ছবিতে দেখা যায়, রাতেরবেলা পুকুরঘাটে বড়বোন নিশাতের সঙ্গে গল্প করে দিলশাদ। সে জানতে পারে, নিশাত বিয়ে করবে জামিলকে (যাকে মনে মনে ভালোবাসে দিলশাদ)। টর্চ হাতে জামিল আসে। জামিলকে নিশাতের কাছে রেখে তার কাছ থেকে টর্চ নিয়ে বেরিয়ে আসে দিলশাদ। বাবার কাছে গিয়ে তাকে জানায় যে, তার খুবই কষ্ট। সে এখন কী করবে?... মা শুতে যাচ্ছেন। দিলশাদ ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে, আচ্ছা মা, জামিল ভাইয়ের সঙ্গে আপার বিয়ে হলে চমৎকার হয় না ?... দিলশাদ বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। সাব্বির তার কাছে আসে। দিলশাদ বলে, 'সাব্বির ভাই, আমার একটা ছবি তুলতে চেয়েছিলেন না ? লাল স্কার্ট পরা। কাল তুলতে পারবেন। ছবিটা যেন সুন্দর হয়।' পরদিন মাঝ পুকুরে দিলশাদ ভাসতে থাকে। ক্যামেরা হাতে সাব্বির পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে।

হুমায়ূন আহমেদের শেষ চলচ্চিত্রকর্ম 'ঘেটুপুত্র কমলা'তে দেখা যায় চৌধুরী হেকমত সাহেবের বাড়ির দাসী ময়না ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে কমলাকে নিচে ফেলে মেরে ফেলে। চিত্রনাট্য থেকে সিকোয়েন্সটি তুলে ধরা যাক।

সিকোয়েন্স ৮৯

দিন। আচারের বৈয়ম নিয়ে ময়না ছাদে উঠল। রোদে দিচ্ছে। রেলিংয়ে কমলা।

ময়না : আচার খাবি ?

কমলা : না।

ময়না : আচার মুখে দিয়া একটা চক্কর দে দেহি।

[জহির মজা করে আচার খায়।]

জহির : আপনারে আমি খারাপ ভাবতাম। আসলে আপনি খুবই ভালা।

[জহির রেলিংয়ের উপরে হাঁটছে। ময়না তাকে ধাক্কা দিল।]

কাট-টু

সিকোয়েন্স-৯০

দিন। আর্টিস্ট জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিল। দুই হাতে মুখ ঢাকল।

আর্টিস্ট : কী সর্বনাশ! কী সবনাশ!

[ঢুকল ময়না।]

ময়না : আপনি কি কিছু দেখেছেন ?

আর্টিস্ট : আমি কিছু দেখি নাই। আমি কিছু দেখি নাই।

মৃত্যুর নানারূপ। নানাভাবে মৃত্যু মানবজীবনে আসে। হুমায়ূন আহমেদের চলচ্চিত্রেও মৃত্যুর নানা রূপ দেখা যায়।

মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধ হুমায়ূন আহমেদের চিন্তা-চেতনায় প্রবল প্রভাব ফেলেছিল। তাই তো তাঁর গল্প-উপন্যাস-নাটকে মুক্তিযুদ্ধ কিংবা মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে '১৯৭১' এবং 'জোছনা ও জননীর গল্প' অন্যতম। শেষোক্ত উপন্যাসটি তাঁর দীর্ঘদিনের চিন্তার ফসল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদের চলচ্চিত্রেও ছায়া ফেলেছে মুক্তিযুদ্ধ। তাঁর প্রথম পরিচালিত চলচ্চিত্র 'আগুনের পরশমণি'-ই মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র। এদেশের সত্যিকার অর্থে হাতেগোনা মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রের একটি।... ১৯৭১ সালের অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীতে মুক্তিযোদ্ধারা যে অপারেশন পরিচালনা করে, তারই চলচ্চিত্রায়ণ 'আগুনের পরশমণি'। উল্লেখ্য, ছবিটি হুমায়ূন আহমেদের বহুল পঠিত একটি উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপ।

'আগুনের পরশমণি'র প্রধান চরিত্র মুক্তিযোদ্ধা বদিউল আলম। ঢাকায় সে আশ্রয় নেয় মতিন সাহেবের পরিবারে। মধ্যবিত্ত এই পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচজন—মতিন সাহেব, তার স্ত্রী সুরমা, দুই কন্যা রাত্রি ও অপলা এবং কাজের মেয়ে বিন্তি। এই পরিবারের আশ্রয়ে থেকে বদি ঢাকা শহরে অপারেশন পরিচালনা করে। গেরিলা অপারেশনে বদি'র সহযোদ্ধারা কেউ নিহত হয়, কেউ পাকসেনাদের হাতে ধরা পড়ে মৃত্যুবরণ করে।

একাত্তরের অবরুদ্ধ ঢাকা শহর এবং সেই শহরে গেরিলাদের তৎপরতা—'আগুনের পরশমণি'-তে মূর্ত হয়ে উঠেছে। যেমন, এদেশের মানুষদের পাকিস্তানি সেনারা নানাভাবে হেনস্থা করত এবং কখনো কখনো তা কুৎসিত আকার ধারণ করত। বলাই বাহুল্য, এতে এদেশের মানুষ লজ্জিত এবং অপমানিত বোধ করত। অন্যদিকে পাকিস্তানি সেনারা মজা পেত। এমনি একটি ঘটনা হুমায়ূন আহমেদের প্রথম ছবিতে ফুটে উঠেছে—

AMARBOI.COM

সিকোয়েন্স-৬১

দিন। মতিন সাহেব হেঁটে অফিসে যাচ্ছেন। হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন।

সিকোয়েন্স-৬২

দিন। রাস্তার পাশে দুজন মিলিশিয়া। তারা মহানন্দে হো হো করে হাসছে। তাদের সামনে চশমাপরা ভীত চেহারার সুদর্শন একজন তরুণ। সম্পূর্ণ নগ্ন। কানে ধরে উঠ-বোস করছে। এক কোনায় তার খোলা প্যান্ট, শার্ট। মিলিশিয়ারা পাশের আরেকজনের দিকে তাকাল। ইশারা করল। সেও তার শার্ট খুলছে। মিলিশিয়ারা মজা পেয়ে হাসছে। মতিন সাহেব পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। মাথা নিচু। আড়চোখে একবার দেখলেন। মিলিশিয়া দুজনের হো হো হাসির শব্দ কানে আসছে।

মিলিশিয়াদের কাণ্ডকারখানা অবশ্য কিছুক্ষণ পরেই সাঙ্গ হয়। তাদের আক্রমণ করে মুক্তিযোদ্ধারা। বদিউল আলম গাড়ির ভেতর থেকে স্টেইনগানের গুলিতে তাদের হত্যা করে দ্রুত গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যায়।

এ দৃশ্যটি দেখার পর দর্শক হাততালি দিয়েছিল, মধুমিতা সিনেমাহলে ছবিটি দেখার সময় এই লেখার রচয়িতা নিজেই তা প্রত্যক্ষ করেছিল। কিন্তু তারপরও আমার মনে হয়েছিল, দৃশ্যটি আরও বেশি হৃদয়গ্রাহী হতে পারত। কী যেন নেই—এমন এক অতৃপ্তি আমাকে কুরে কুরে খেয়েছিল। ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো, স্বয়ং হুমায়ূন আহমেদও পরিপূর্ণ তৃপ্তি পান নি ওই দৃশ্যটি ধারণের পর। তিনি লিখছেন : 'দৃশ্যটি যেভাবে লেখা হয়েছে ঠিক সেভাবেই নেওয়া হয়েছে। তারপরেও আমার কাছে দৃশ্যটি অসম্পূর্ণ মনে হয়েছে। মানবিক আবেগ নিয়ে যে খেলাটি খেলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারতাম তা আমি খেলতে পারি নি। বদির গাড়ি চলে গেল দৃশ্যটি শেষ হয়ে গেল। উচিত ছিল মুহূর্তের জন্যে হলেও বদি চলে যাওয়ার পর উলঙ্গ মানুষ দুটির প্রতিক্রিয়া দেখানো। তাঁদের আনন্দ, উল্লাস ও বিজয়ের ছবি পর্দায় ধরে রাখা। এই শটটি নিয়ে রাখলে বদি'র চলে যাওয়ার পরপরই আমরা দৃশ্যটি ভুলে যেতাম না। দৃশ্যটি অনেকক্ষণ মাথার ভেতর গানের সুরের রেশের মতো গুনগুন করত। শেষ হয়েও শেষ হত না।' (*ছবি বানানোর গল্প*/হুমায়ূন আহমেদ, ঐ. পৃ. ৭০-৭১)

পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে মুক্তিযোদ্ধাদের নির্যাতিত হওয়ার দৃশ্যও 'আগুনের পরশমণি'-তে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে দুটি সিকোয়েন্স উল্লেখ করা যাক।

সিকোয়েন্স ৬৮

রাত। হলঘরের মতো জায়গা–ইনটারোগেশন রুম। বুড়োকে ঘরে ঢোকানো হচ্ছে। সে দেখছে, একজন মিলিটারি বসে আছে সামনে। বুড়োকে সামনে এগিয়ে দেওয়া হলো। সে সামনে এগিয়ে এসে দেখে, পোকা বসে আছে চেয়ারে। মারের চোটে তার মুখ ফুলে গেছে। দাঁত ভেঙে গেছে।

পোকা : মাইর সহ্য করতে পারি নাই। আপনার নাম ঠিকানা বলে দিয়েছি। মাফ করে দিবেন।

বুড়ো : ঠিক আছে। ঠিক আছে। আমারটা বলছ ভালো করছ, আর বলবা না।

মিলিটারি : You got to say more news young man.

[মিলিটারির পাশে রাখা একটা পেপার কাটার। বুড়োর আঙুল রাখা হলো পেপার কাটারের ব্লেডে। ক্যাঁচ করে নেমে এল পেপার কাটার। তীব্র আর্তনাদ। দুটা আঙুল কেটে পড়ে গেছে। মিলিটারির ঠোঁটে সিগারেট। একজন সিগারেট ধরিয়ে দিল। কাটা আঙুল দুটা দেখা যাচ্ছে।]

AMARBOI.COM

সিকোয়েন্স-৭৬

বুড়া প্রচণ্ড মা'র খেয়েছে। তার হাত কাটারটার নিচে।

মিলিটারি : লাস্ট চান্স। কুছ বাতায়গা ?

বুড়ো : হ্যাঁ বাতায়গা।

মিলিটারি : হাঁ বাতাও।

বুড়ো : You son of a bitch.

ঘ্যাঁচ করে কাটার নেমে এল। বুড়ো কোনো শব্দ করল না। অনেক কষ্টে থু করে থুথু ফেলল।

একাত্তরে পথের এক ভিখিরির মধ্যেও দেশপ্রেম কত তীব্র ছিল তা দুটি সিকোয়েন্সে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন, একটি দৃশ্যে পাড়ার স্টলের পান-বিড়ি-চা-বিক্রেতা মতিন সাহেবের কাছে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি এড়িয়ে যাওয়া গোছের উত্তর দিয়ে পথের ভিখিরির উদ্দেশে পয়সা ছুড়ে দেন। ভিখিরিটি হাসিমুখে বলে, 'দ্যাশের অবস্থা ভালা।' অর্থাৎ এখানে ভিখারিটি দেশের পরিস্থিতিকে বিবেচনা করছে ব্যক্তিগত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। আরেকটি দৃশ্যে দেখা যায়—ঢাকা শান্তি কমিটির ট্রাক মিছিল (ট্রাকের ওপর দাঁড়ানো অংশগ্রহণকারীদের হাতে পোস্টার। পোস্টারে লেখা : গুজবে কান দেবেন না, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, দুষ্কৃতিকারীদের ধরিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিন ইত্যাদি। চাঁদ-তারা খচিত পাকিস্তানি পতাকাও দেখা যায় সেই মিছিলে) ভিখারিটির সামনে দিয়ে এগিয়ে গেলে এবং সেই সময়ে পাজামা-পাঞ্জাবি গায়ে শশ্রুমণ্ডিত মুক্তিযোদ্ধা বদিউল আলম ভিক্ষা দিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে 'কি ভালো তো' বলে চলে গেলে সে তাকে বুঝতে ভুল করে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে : 'দূর হ পাকিস্তানি!' এখানে কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তির চেয়েও ভিখারির কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছে দেশপ্রেম।

'শ্রাবণ মেঘের দিন'-এ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ নেই। এখানে মুক্তিযুদ্ধ এসেছে পরোক্ষভাবে। সামান্য কয়েকটি সংলাপের মাধ্যমে হুমায়ূন মুক্তিযুদ্ধের সময়টিকে আবার মনে করিয়ে দিয়েছেন; মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকে তুলে ধরেছেন। বড় নাতনি শাহানার সঙ্গে ইরতাজুদ্দিনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে '৭১-এ যারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল তাদের ঔদ্ধত্য, সেই সময়ে কোনো ভুল করেন নি এমন বক্তব্য উচ্চারণে ইরতাজুদ্দিন এ ছবিতে সেইসব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে। হুমায়ূন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইরতাজুদ্দিনকে দিয়ে ক্ষমা চাওয়ান গ্রামের মানুষদের কাছে '৭১-এ তাঁর কৃতকর্মের জন্যে। আমরা লক্ষ করি, নদীর ধারে গ্রামের মানুষেরা জড়ো হয়েছে, শাহানা-নীতুকে বিদায় জানাতে। এ সময় মোবারককে সঙ্গে নিয়ে ইরতাজুদ্দিনও আসেন সেখানে এবং জানান যে, তিনিও ঢাকায় চলে যাবেন। তাঁর বিষয়সম্পত্তি ও বাড়ি তিনি দান করে দিচ্ছেন গ্রামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। তারপরেই তিনি গ্রামবাসীদের দিকে চেয়ে করজোড়ে ক্ষমা চান : 'মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি বড় একটা অন্যায় করেছিলাম। সেই অন্যায়ের জন্যে আমি মহান আল্লাহতালার কাছে, দেশের মানুষের কাছে এবং আপনাদের সকলের কাছে ক্ষমা চাই।' ইরতাজুদ্দিনের এই ক্ষমা শুধু বড় নাতনি শাহানার কথায় নয়, তাঁর আত্মোপলব্ধি ঘটে '৭১-এ তিনি ভুল করেছিলেন।

হুমায়ূন আহমেদের 'শ্যামল ছায়া' আরেকটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র। এখানে দেখা যায়, একটি নৌকায় করে কয়েকটি পরিবার রওনা দেয় নিরাপদ স্থানের উদ্দেশে। এইসব মানুষ হলেন—পীতাম্বর, তার অন্ধ বাবা যাদব, করিম সাহেব, তাঁর পুত্রবধূ রাত্রি; ফুলির মা ও ফুলি, মাওলানা মুনসি মুসলেম ও তার স্ত্রী বেগম; গৌরাঙ্গ, তার স্ত্রী আশালতা ও মা পার্বতী। এ ছাড়া জহির, মাঝি বজলু, অ্যাসিসটেন্ট কাল্লু এবং বাচ্চাসহ আরেকজন মহিলাও এই নৌকার যাত্রী। যাত্রাপথে নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে একসময় তারা নিরাপদ স্থানে পৌছায়—যেখানে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। সেই সময়ে তাদের যে আনন্দ, অবশ্য এর মধ্যে বেদনাও মিশ্রিত আছে—এই আনন্দ-বেদনার কাব্য রচিত হয়েছে সেলুলয়েডে।

'শ্যামল ছায়া' হলো একটি নৌকাভ্রমণের গল্প। তবে খুবই রোমাঞ্চকর এই ভ্রমণ। পদে পদে বিপদ ও মৃত্যুর হাতছানি। যেহেতু একাত্তরের অগ্নিঝরা দিনে এই ভ্রমণ, সেহেতু এমনটি হতেই পারে। তাই তো এক রাতে একটি নৌকায় করে আসে রাজাকারের দল। ওরা গহনা, ছাগল লুটপাট করে। ওদের কমান্ডার মজিদের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে আশালতার ওপর। সে আশালতাকে নিয়ে যেতে চায়। বাধা দেয় মাওলানা। রাত্রি ও ফুলির মা'ও। বন্দি হয় মজিদ। তার সাথিরা তাকে ফেলে পালিয়ে যায়। মাঝি বজলু ও তার অ্যাসিসটেন্ট কাল্লু বস্তায় ভরে মজিদকে নদীতে ফেলে দেয়। মাওলানা ঝাঁপ দিয়ে পানিতে পড়ে। বস্তা আবার নৌকায় তোলা হয়। বের করা হয় অর্ধমৃত মজিদকে। পরে ছেড়ে দেওয়া হয় মজিদকে।... রাত কেটে ভোর হয়। দেখা যায় পাকিস্তান পতাকাবাহী রাজাকার ভর্তি নৌকায় দাঁড়িয়ে আছে মজিদ। সে নৌকায় উঠে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে, 'আপনাদের ভয় নেই। আপনারা যান। নিশ্চিন্ত মনে যান।' মজিদ নৌকায় উঠে চলে যায়। উল্লেখ্য, কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ মানুষের অন্ধকার দিকের চেয়ে আলোকিত দিকের প্রতিই আলো ফেলতে ভালোবাসতেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসে দেখা যায় ক্রুর-নিষ্ঠুর খল চরিত্রের মানুষের মাঝেও মানবিক নানা বৈশিষ্ট্য। 'শ্যামল ছায়া' চলচ্চিত্রে যেমন রাজাকার কমান্ডার মজিদের অন্যরূপ দেখা যায়। অবশ্য এক্ষেত্রে তার প্রতি যে মাওলানা সদয় আচরণ করেছে, তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে–এইসব বিষয়ও ক্রিয়াশীল।

'শ্যামল ছায়া'-তে মুক্তিযোদ্ধাদের অ্যাকশনের মাঝে ভিন্নতা দেখা যায়। তারা গায়কের ছদ্মবেশে নৌকায় ওঠে। চারজনের একটি গানের দল। তাদের দলপতি অর্থাৎ গাতক বলে, গান-বাজনা করতে করতে সে এবং তার সঙ্গীরাও এই নৌকায় যাবে। তারা সত্যি সত্যি গান গাইতে থাকে। কিন্তু পীতাম্বরের একটি চড়ে গায়কের গান গাওয়া বন্ধ হয়। নৌকার ইঞ্জিন গর্জন করে ওঠে। সবাই যাত্রা শুরু করবে—এ সময় দূরে একটি ডিঙ্গি নৌকাতে করে মাওলানাকে আসতে দেখা যায়। সবাই আনন্দে উদ্বেলিত। এই সময় রাত্রি হারানো স্বামী-সন্তানের শোকে কেঁদে ওঠে। হঠাৎ সামনে মিলিটারিদের লঞ্চ দেখা যায়। গাতক মাঝিকে বলে নৌকা পাড়ে ভিড়াতে। মাঝি তর্ক করায় গাতক চাদর খুলে ফেলে। দেখা যায়, তার কাঁধে রাইফেল ঝুলছে। গাতকের এক সঙ্গী বলে, উনি আমরার মুক্তি কমান্ডার। সবাই হতবাক। গাতক বলে, নৌকা পাড়ে ভিড়ার পর সবাই নেমে যাবে। সে তার দল নিয়ে থাকবে। আর মাঝি তার দলকে মিলিটারি লঞ্চের কাছে নিয়ে যাবে। মাঝি আপত্তি জানায়। গাতকের নির্দেশে তার এক সাথি প্রচণ্ড চড় বসায় মাঝির গালে। এ সময় আশালতা হেসে উঠলে গাতক বলে যে, তার দলে একজন মেয়ে থাকলে ভালো হয়। আশালতা কি তাদের সঙ্গে যাবে? আশালতা রাজি হয়। দেখা যায়, পীতাম্বরও মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। এমনকি মাতৃভক্ত [illegible]ও মায়ের নিষেধ অমান্য মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে রওনা দেয়। অন্যরা পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ছদ্মবেশী মুক্তিবাহিনীর দল গান-বাজনা করতে করতে এগোতে থাকে মিলিটারি লঞ্চের দিকে। আশালতা দাঁড়িয়ে হাত-পা নাড়িয়ে নাচতে থাকে। মিলিটারি লঞ্চটির কাছাকাছি আসতেই গাতকবেশী মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার গ্রেনেডের পিন খুলে ফেলে। ইশারা করে আশালতাকে শুয়ে পড়তে। আশালতা বুঝতে পারে না। প্রচণ্ড শব্দে গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয়। গুলি করে মুক্তিযোদ্ধারা। মিলিটারিদের লঞ্চে আগুন ধরে যায়। ডুবে যায় লঞ্চ।

AMARBOI.COM

'শ্যামল ছায়া'-র চমৎকার দিক হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে মানবিক সম্পর্ককে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং তা সুন্দরভাবে সেলুলয়েডে ফুটে উঠেছে। আরেকটি বিষয় হলো, 'শ্যামল ছায়া'র আগে মুক্তিপ্রাপ্ত মুক্তিযুদ্ধের ছবিগুলো দেখলে মনে হয় যে, দাড়িওয়ালা মানুষ মানেই যেন একাত্তরের বিতর্কিত চরিত্র; রাজাকার-আলবদর ইত্যাদি। এই ভুল ধারণা থেকেও 'শ্যামল ছায়া' মুক্ত। এখানে যে মাওলানা চরিত্রটি রয়েছে, তার আচার-আচরণ ও কথাবার্তা ভিন্ন ধরনের। এমনকি শেষ পর্যায়ে সে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেয়। তাদের সঙ্গে চলে যায়।

প্রেম

হুমায়ূন আহমেদের গল্প-উপন্যাসের অন্যতম বিষয়—প্রেম। বলাই বাহুল্য, প্রেমের বিচিত্র রূপ ও মানব-মনের গহীনে লুকায়িত নানা অনুভব তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে। হুমায়ূনের চলচ্চিত্রেও প্রেম উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে আপন মহিমায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আগুনের পরশমণি'র মতো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রেও মানবিক ভালোবাসা, প্রেম মূর্ত হয়ে উঠেছে। এখানে দেখা যায়, মুক্তিযোদ্ধা বদিউল আলম ঢাকায় যে বাড়িতে আশ্রয় নেয়, সেখানকার গৃহকর্তা মতিন সাহেবের বড় মেয়ে রাত্রি তার সঙ্গে প্রথমে দুর্ব্যবহার করে, তপ্ত কথা শোনায়। পরে যখন রাত্রি ওর মা সুরমার কাছে রক্ষিত বদিউল আলমের স্টেইনগান দেখে ফেলে এবং এই সূত্রে সে আবিষ্কার করে যে, বদিউল আলম মুক্তিযোদ্ধা। তখন রাত্রির মধ্যে পরিবর্তন আসে; ধীরে ধীরে সে ভালোবেসে ফেলে বদিউল আলমকে। রাত্রির গাওয়া 'নিশা লাগিল রে/বাঁকা দুই নয়নে নিশা লাগিলরে/ হাছন রাজা পিয়ারীর প্রেমে মজিলরে'—এই গানেই তা ফুটে উঠেছে। তবে এই ভালোবাসা কামনা-বাসনার জালে আবদ্ধ থাকে না; মুক্ত আকাশের মতোই তা বন্ধনহীন ও বিস্তৃত। এমনকি রাত্রির মুখেও কখনো উচ্চারিত হয় না বদিউল আলমের প্রতি অনুরাগের বিষয়টি। এই ভালোবাসার পরিণতিতে রক্তাক্ত হয় হৃদয় এবং রাত্রি চিরকালের মতো হারায় বদিউল আলমকে।

'শ্রাবণ মেঘের দিন'-এ কুসুমের স্বপ্নও পূরণ হয় নি। গ্রামের এই ভয়ঙ্কর জেদি, আত্মকেন্দ্রিক ও চঞ্চল মেয়েটি ভালোবাসে গাতক মতিকে। তার স্বপ্ন—তারা দুজনে মিলে একটি গানের দল গড়ে তুলবে আর গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়াবে। কুসুম কিন্তু তাঁর এই স্বপ্নের কথা মতিকে বলতে পারে না; বলতে পারে না তার হৃদয়ের বার্তা। তার মুখে এক মনে আরেক। সে হেঁয়ালি করে কথা বলে। সেই হেঁয়ালি বুঝতে পারে না মতি। এমনকি সুরুজের সঙ্গে যখন কুসুমের বিয়ে ঠিক হয়, গায়েহলুদ হয়, সেদিন রাতে কুসুম আসে মতির চালাঘরে, সে বুঝতে চায় তার সম্পর্কে মতির মনোভাব। মতি কিন্তু কুসুমকে বুঝতে পারে না। সে বলে, 'কুসুম তুই বাড়িত যা।' ভালোবাসার এই টানাপোড়েনে দেখা যায়, বিয়ের দিন বিষ খেয়েছে কুসুম। তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। কুসুম চলে যায় না-ফেরার দেশে। তখন মতি উপলব্ধি করতে পারে তার প্রতি কুসুমের গভীর ভালোবাসাকে। সে কুসুমেরই প্রিয় একটি গান গেয়ে ওঠে : 'সুয়াচান পাখি/ আমি ডাকিতাছি তুমি ঘুমাইছ নাকি...।'

'দুই দুয়ারী'-তে তরু ভালোবাসে শফিককে। কিন্তু প্রেমিকের পূর্বপুরুষ একসময় ভিক্ষুক ছিলেন—এই ব্যাপারটি তার সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে বিরোধ তৈরি করে। সে ভালোবাসার মানুষ শফিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে গিয়েও পারে না। তার 'হৃদয়ের একূল ওকূল দু'কূল ভেসে যায়'। এই টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত হয় তার জীবন। এ সময় তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়ায় রহস্যমানব। ছবির শেষ পর্যায়ে দেখা যায়, ভালোবাসার জয় হয়েছে। অসুস্থ শফিককে ফিরিয়ে আনার জন্যে তরু গ্রামে গিয়ে হাজির হয়।

'চন্দ্রকথা'য় দেখা যায় প্রেম-প্রীতির ত্রিভুজ ফ্রেম। আমিন-চন্দ্র-জহির—এই তিনজনকে ঘিরে ঘুরপাক খায় এই ত্রিভুজ।... ছবিতে দেখা যায় সরকার বাড়িতে দুধ দিতে যায় চন্দ্র, তাকে দেখে সরকার সাহেবের হুকুমদাস আমিনের মধ্যে ভালোবাসার জন্ম নেয়। এই ভালোবাসা সম্পূর্ণ একপাক্ষিক। আমিন চন্দ্রকে বিয়ে করতে চায়। আমিনের সঙ্গে চন্দ্রের বিয়ের সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ার পর চন্দ্রের প্রতি জহিরের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। জহিরের ভালোবাসা বন্দি ছিল 'না বলা কথা'-র প্রাচীরে। চন্দ্রের মনেও ছিল জহিরের প্রতি গভীর না-বলা অনুভূতি। চন্দ্র ও জহিরের প্রেম শাশ্বত। কিন্তু তাদের দুই জীবন কখনো একবিন্দুতে মিলিত হতে পারে না। এর পরিণতিতে জহির ধুকে ধুকে নিঃশেষ হয়ে যায়। অন্যদিকে, ভালোবাসার মানুষ চন্দ্রের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সইতে না পেরে প্রভুকে হত্যা করতেও দ্বিধা করে না আমিন। তবু চন্দ্র আমিনের কাছে রয়ে যায় আগের মতোই অধরা। চলচ্চিত্রে ত্রিভুজ প্রেমের পরিণতি রূপান্তরিত হয়েছে ট্রাজেডিতে।

'শ্যামল ছায়া'র আশালতা ও গৌরাঙ্গ দম্পতির মাঝে প্রেম আছে, ভালোবাসা আছে। আশালতা তার স্বামীর 'সোনাবউ' ডাকটি শুনতে খুব ভালোবাসে। তাই তো ময়না'র কণ্ঠে ওই সম্বোধন শুনতে সে ব্যাকুল হয়। স্বামী খায় নি দেখে সেও দুপুরের খাবার খায় না। পাশাপাশি আবার দেখা যায় যে, গৌরাঙ্গ ভীষণ মাতৃভক্ত। যখন রাজাকার কমান্ডার মজিদ তুলে নিয়ে যেতে উদ্যত হয় আশালতাকে, তখন সে মায়ের কথায় কাপুরুষের মতো আচরণ করে। মজিদকে বাধা দেয় না, প্রতিবাদ করে না। তবে স্ত্রীকে যে সে ভালোবাসে না, সেটাও ঠিক নয়। এ ছবিতে আরেক দম্পতি রয়েছে মাওলানা মুনসি মুসলেম ও তার স্ত্রী বেগম। অন্তঃস্বত্ত্বা স্ত্রীর প্রতি মাওলানা বড়ই যত্নবান। এতেই তার অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশ পায়। অন্যদিকে নৌকা ঠেলায় ব্যস্ত স্বামীর হাতকে স্পর্শ কিংবা মিলিটারিদের কাছে মাওলানার ধরা পড়ার কথা শুনে বেগমের স্তব্ধ হয়ে বসে থাকার মাঝে মূর্ত হয়ে ওঠে স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা।

'নয় নম্বর বিপদসংকেত'-এ দেখা যায় সোভাহান সাহেবের ছেলে টগর বইয়ের পোকা। বইয়ের মাঝেই যেন তার সমস্ত পৃথিবী লুকায়িত। এই ছেলেটিকে ভালোবাসে রঞ্জনা। যদিও তাদের মধ্যে বয়সের ব্যবধান রয়েছে। রঞ্জনা এই ভালোবাসার প্রতিদান ঠিকই পায়। তার ভালোবাসার মানুষটিকে সে আপন করে পায়। অন্যদিকে কাজের মেয়ে লাইলী ভালোবাসে ম্যানেজারকে। সে-ও তার ভালোবাসার মানুষকে ভালোবাসার বন্ধনে বাঁধে একসময়।

'আমার আছে জল'-এ দেখা যায় প্রেমের আরেক ত্রিভুজ। নিশাত, জামিল এবং দিলশাদ এই ত্রিভুজের তিনটি বাহু। শেষে একটি বাহু বিচ্যুত হয়ে পড়ে অর্থাৎ দিলশাদ আত্মহত্যা করে।

AMARBOI.COM

শ্রেণীবৈষম্য

হুমায়ূন আহমেদ এই সমাজের শ্রেণীবৈষম্যের বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র 'আগুনের পরশমণি'-তে দেখা যায়, রাত্রি-অপলা কাজের মেয়ে বিন্তিকে পছন্দ করে ঠিকই, একই ঘরে তারা থাকেও, কিন্তু বিন্তির স্থান মেঝেতে আর রাত্রি-অপলা শোয় খাটে। 'শ্রাবণ মেঘের দিন'-এ কাজের মেয়ে পুষ্পের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় নীতু গ্রামের এখানে-সেখানে, পছন্দও করে; কিন্তু শোবার সময় সে বিরাট খাটে একাকী শোয়, আর মেঝেতে ঘুমায় পুষ্প। ক্যামেরার ভাষায়ও মূর্ত হয়ে ওঠে এই শ্রেণীবৈষম্য। জমিদার বাড়ির বিশাল দালান কাট-টু-ভাঙনপ্রবণ নদীর ধারে মাচার ওপরে মতির ঘর। শ্রেণীগত এই বৈষম্য মানে না শাহানা। সে মতিকে রাতেরবেলা খাওয়ার জন্যে দাওয়াত দেয়। কিন্তু তার দাদা ইরতাজুদ্দিন বিষয়টি পছন্দ করেন না। তাই তো শাহানার সঙ্গে খাওয়ার সুযোগ হয় না মতির। তাকে চাকরদের তত্ত্বাবধানে নিচতলায় সিঁড়ির উপর বসিয়ে খেতে দেওয়া হয়। খাবার অবশ্য বেশ ভালো—পোলাও, আস্ত মুরগির রোস্ট। কিন্তু খাবারের চেয়েও মান বড়। তাই মতি এই খাবার খায় না। সমাজের নিচুতলার এইসব মানুষ যে আবহমানকাল ধরে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত, তারা যে ধনী ও শক্তিমানদের কাছে নতজানু ও অপমানিত হয় তা ইরতাজুদ্দিনের সংলাপে ফুটে উঠেছে : 'রাজা নাই কিন্তু রাজবাড়ি তো আছে। রাজা চলে যায় কিন্তু বাড়ি থাকে।' উত্তরে শাহানা বলে, 'আপনি এমনভাবে বলছেন যেন ওরা এখনো আপনার প্রজা। ব্যাপারটা সেরকম নয়, দাদাজান। আপনি আগের জায়গায় বসে আছেন, কিন্তু পৃথিবী বদলে গেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইরতাজুদ্দিন বলে, 'কিছুই বদলায় না রে বেটি, কিছুই বদলায় না।' শাহানা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় এটা মধ্যযুগ না। তখন ইরজাতুদ্দিনের ভাষ্য হলো : 'যুগ আবার কি রে বেটি! যুগ কিছু না। মানুষই যুগ তৈরি করে। আমি আমার চারপাশে মধ্যযুগ সৃষ্টি করে রেখেছি এবং এটি থাকবে।'...

'দুই দুয়ারী' ছবিতেও দেখা যায় যে, ভালোবাসার মানুষ শফিককে তরু এড়িয়ে চলতে শুরু করে—যখন জানতে পারে তার দাদা ছিল ভিখারি।

'চন্দ্রকথা'-য় একদিকে শক্তিমান ও ক্ষয়িষ্ণু ধনীর প্রতিনিধি সরকার সাহেব অন্যদিকে হতদরিদ্র চন্দ্রদের পরিবার। যাদের সংসার চলে দুধ ও মোয়া বিক্রি করে।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'শ্যামল ছায়া'-য়ও দেখা যায় জহির যেন আলাদা মানুষ। সে এলিটদের প্রতিনিধি। যুদ্ধে সে তার পুরো পরিবারকে হারিয়েছে। সে সব ইনফরমেশন রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু তা অন্যদের জানায় না। অন্যদের চেয়ে আলাদা হয়ে মাস্তলের ওপর বসে থাকে।

'আমার আছে জল'-এ দিলশাদের পরিবারের পাশাপাশি দেখানো হয়েছে মজনু ও ফুলিদের পরিবারকে। অবশ্য দ্বিতীয় পরিবারটি দরিদ্র হলেও ভালোবাসার সম্পদে তারা ধনী।

'ঘেটুপুত্র কমলা'য় চৌধুরী হেকমত সাহেবের বাড়ির বিত্তের ঝলকানির মধ্যে আঁধারও কম নয়। এখানে একই শ্রেণীর মানুষের মধ্যেও বৈষম্য লক্ষণীয়। একটি টপ শটে তা প্রকটভাবে উপস্থাপিত হয়—প্রধান কাজের মেয়ে ময়না উঁচু খাটে শুয়ে আছে, অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত নিচু খাটে ঘুমিয়ে আছে বাকি দুজন কাজের মেয়ে। ছবিতে দেখা যায়, ঘেটুপুত্র কমলাকে চড় দিয়ে হাত ধোয় ময়না। কমলাদের অবস্থান যে সমাজে কোথায় তা এখানেই মূর্ত হয়ে ওঠে। একজন মা কোন পরিস্থিতিতে সন্তানকে ঘেটুপুত্র (ঘেটুগান পরিবেশন করা এবং ধনীদের যৌনসঙ্গী হিসেবে ব্যবহৃত হওয়াই যাদের কাজ ছিল) হিসেবে কাজ করতে সম্মতি দেয় তা কমলার মা'র সংলাপে ফুটে উঠেছে : 'ভাতের অভাব বড় কঠিন অভাব বাপধন। ভাতের অভাবে এই কাজে মত দিছি। তোর কাছে মাফ চাই। আমারে মাফ দে।'

নারীর অবস্থা ও অবস্থান

এদেশ ও সমাজে নারীদের অবস্থা কেমন এবং তাদের অবস্থানই বা কোন পর্যায়ে তা হুমায়ূন আহমেদের চলচ্চিত্রে ফুটে উঠেছে।

'শ্রাবণ মেঘের দিন'-এ দেখা যায় যে, গ্রামের অন্তঃস্বত্ত্বা নারীরা আয়রনের অভাবে ভোগে এবং ওই অবস্থায় তাদের চলাফেরা কেমন হওয়া উচিত—এ বিষয়ে তারা সচেতন নয়। সঠিক চিকিৎসার অভাবে তরুণী এক গৃহবধূর (দিহান) শিশুসন্তান মারা গেছে, সেই দুঃখ তিনি ভুলতে পারেন না; ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদেন।

সামাজিক বাস্তবতা এবং নারীদের অবস্থানের চিত্র গ্রামবাংলায় কীরূপ তা সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে 'চন্দ্রকথা' ছবিতে। যুগের পর যুগ আমাদের এই সমাজে নারীরা ঘরে-বাইরে নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। নারী নির্যাতন ও গ্রাম সালিশের কিছু চালচিত্র তুলে ধরা হয়েছে 'চন্দ্রকথা' ছবিতে। এ ছবিতে দেখা যায় নারী নির্যাতনের নানা ঘটনা। সরকারের পঙ্গুপুত্র সাদেকের স্ত্রীকে মারধর করা, চন্দ্রকে চাবুকপেটা করা, ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার অপরাধে চন্দ্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঙুল কেটে ফেলা ইত্যাদিতে প্রকাশিত হয়েছে নারী নির্যাতনের সময়নির্ভর বাস্তবতা। বিয়ের আসর থেকে জহিরের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার অপরাধে সালিশে চন্দ্রের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়, মাথা কামিয়ে ২০০ জুতার বাড়ি দেওয়া হবে—এই প্রবণতা সমাজ বাস্তবতায় আগে যেমন দেখা গেছে, এখনো তা দুর্লভ নয়। যার আইনগত কোনো ভিত্তি নেই। 'চন্দ্রকথা' চলচ্চিত্রে এই সামাজিক অনাচার চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন হুমায়ূন আহমেদ।

হুমায়ূন আহমেদের শেষ চলচ্চিত্র 'ঘেটুপুত্র কমলা'-য় দেখা যায়, হাওর অঞ্চলের সৌখিনদার মানুষ চৌধুরী হেকমত সাহেব জলবন্দি সময়টায় একজন ঘেটুপুত্র ও ঘেটু গানের দলকে আমন্ত্রণ দিয়ে বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। বলাই বাহুল্য, হেকমত সাহেব শুধু ঘেটুপুত্রের নাচ-গানই উপভোগ করবেন না, তিনি ওকে যৌনসঙ্গী হিসেবেও ব্যবহার করবেন। বিষয়টি জানার পর তার স্ত্রী হামিদা বেশ অসন্তুষ্ট হন। তিনি স্বামীকে বলেন, তাকে যেন বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি ঘেটুপুত্রের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকবেন না। হেকমত সাহেব জানান, তিনি এখন কিছুক্ষণ ঘুমাবেন। ঘুমের পরে এই বিষয়ে আলোচনা হবে। তারপরে কী হলো? চিত্রনাট্য থেকে উল্লেখ করা যাক।

সিকোয়েন্স-২২

AMARBOI.COM

বিকাল। হেকমতের ঘুম ভেঙেছে। নুরু ট্রেতে শরবত নিয়ে এসেছে। বড় বাটিতে পানি। পানিতে গামছা। নুরু গামছা দিয়ে হেকমতের মুখ মুছে চলে গেল। হেকমত শরবত হাতে নিলেন। ঘরে ঢুকল হামিদা।

হামিদা : ঘুম ভাঙছে। এখন আলাপ করেন।

হেকমত : কী আলাপ?

হামিদা : ঘেটুপুত্র এইখানে থাকলে আমি থাকব না।

হেকমত : আমি একজন সৌখিনদার মানুষ। আমোদ ফুর্তির আমার প্রয়োজন আছে। তিন মাস সমুদ্রের মধ্যে বাস করব। আমার করার কী আছে?

হামিদা : আমারে বাপের বাড়ি পাঠায়ে দেন। ঘাটু চলে গেলে আসব।

হেকমত : যাওয়া আসার মধ্যে থাকার প্রয়োজন কী! পুরোপুরি যাও। নুরু! নুরু! মাওলানারে খবর দাও। তালাকের মাসালা জিজ্ঞাসা করি। আমি শান্তিপ্রিয় লোক। শান্তি চাই, অশান্তি চাই না। স্ত্রীলোক হলো কইতর, ধান ছিটাইলেই আসে।

[মাওলানার গলা খাকাড়ি]

মাওলানা : জনাব, আসব?

হামিদা : উনারে চলে যেতে বলেন। আমি থাকব।

অন্য আরেকটি দৃশ্যে দেখা যায়, কমলাকে সাজাতে গিয়ে হামিদা একপর্যায়ে বড় করে হা করতে বলে, কমলা হা করলে হামিদা তার হা করা মুখে থুথু দেয়। এভাবে সে তার আক্রোশ ও ঘৃণা প্রকাশ করে (পরে হামিদার কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে ময়না ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে কমলাকে মেরে ফেলে)। কমলা চলে গেলে ঘরে প্রবেশ করে ফুলরানী, হামিদার মেয়ে। সে আবদার করে তাকেও সাজিয়ে দিতে হবে। হামিদা তখন হাতভর্তি কাজল নিয়ে ফুলরানীর সারা মুখে মাখিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে বলে, 'মেয়েছেলের এইটাই আসল সাজ। সারা জীবন মুখে কালি।' হামিদার এই কথার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে তার ভেতরের বেদনা ও কষ্ট।... কমলার মর্মন্তুদ পরিণতির পর ঘেটুর গানের দল চলে যায়। তখন অবশ্য হাওরও শুকিয়ে গেছে। চৌধুরী হেকমত সাহেব আবার স্ত্রীর প্রতি মনোযোগী হন। রাতের বেলা হামিদা সাজগোজ করে শয়ন কক্ষে ঢোকে। স্বামীর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে শয্যায় শায়িত স্বামীর পাশে বসে।... প্রায় দেড়শ বছর আগে, যখন এদেশে ঘেটুগান প্রচলিত ছিল, তখন একশ্রেণীর বিত্তবানদের সঙ্গে তাদের স্ত্রীদের সম্পর্ক ছিল এমনই। বলাই বাহুল্য, এই সম্পর্ক সুস্থ ও সুন্দর ছিল না।

প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য

হুমায়ূন আহমেদের নানা চলচ্চিত্রে এদেশের অপরূপ সৌন্দর্য মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিষয়টি সচেতনভাবেই চলচ্চিত্রকার করেছেন এবং এর সূত্রপাত 'শ্রাবণ মেঘের দিন'-এর মাধ্যমে। তখন এই প্রাবন্ধিক তাঁর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিল এবং একপর্যায়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ছবিতে ভিন্ন কিছু আছে কিনা। উত্তরে তিনি বলেছিলেন : 'না, খুব বেশি স্বাতন্ত্রিক কিছু দিয়েছি এটা আমি বলতে পারছি না। তবে একটা জিনিস আমি দিয়েছি যে বাংলাদেশ কী এবং বাংলাদেশের বিউটিটা যে কী এটি আমি ছবিতে অবশ্যই দেখিয়েছি। এই ছবি যে দেখবে—বিদেশের মানুষ যদি দেখে তবে ভাববে যে, হাউ সুইট বাংলাদেশ ইজ, হাউ বিউটিফুল ইট ইজ।' (*অন্যদিন*, বর্ষ-৬, সংখ্যা-২, ১-১৫ মার্চ ২০০০)।

'শ্রাবণ মেঘের দিন'-এ দেখা যায়, লাল শাপলায় পরিপূর্ণ পুকুরে শাপলা তুলছে, কুসুম ও পুষ্প।... সবুজ ধানক্ষেত। মাঝখানের আলপথ দিয়ে হেঁটে যায় কুসুম।...হাওরে কলার ভেলার উপরে নীতু ও পুষ্প। দূরবিন দিয়ে বিদেশিদের দেখে নীতু। এমনি অপরূপ বাংলাদেশের নানা রূপ দেখা যায় 'চন্দ্রকথা', 'শ্যামল ছায়া', 'আমার আছে জল' এবং 'ঘেটুপুত্র কমলা'-য়।

ফোক গানের ব্যবহার

হুমায়ূন আহমেদ তাঁর বিভিন্ন ছবিতে এদেশের প্রচলিত এবং অপ্রচলিত ফোক গান ব্যবহার করেছেন। যেমন, 'শ্রাবণ মেঘের দিন'-এ 'পূবালী বাতাসে আশা আইস্যা বাসা বাঁধেরে', 'আমার গায়ে যত দুঃখ সয়', 'সুয়াচান পাখি' (উকিল মুন্সি), 'মানুষ ধরো মানুষ ভজো' (রশিদ উদ্দিন); 'দুই দুয়ারী'-তে 'লীলাবালী লীলাবালী' (আঞ্চলিক বিয়ের গান)। 'শ্যামল ছায়া'-তে চারটি গানের অংশবিশেষ ব্যবহৃত হয়েছে—'ভ্রমণ কইও গিয়া' 'ঘুমায়ে ছিলাম, ছিলাম ভালো', 'যমুনার জল দেখতে কালো' এবং 'সোহাগ চাঁদ বদনি'...। হুমায়ূন আহমেদের শেষ চলচ্চিত্র 'ঘেটুপুত্র কমলা'-তে ব্যবহৃত হয়েছে এইসব গান : 'শুয়া উড়িল উড়িল/জীবেরও জীবন', 'যমুনার জল দেখতে কালো।/ছান করিতে লাগে ভালো', 'ভাইসাবরে জলে ভাসা সাবান আইন্যা দিলি না।'

আত্মজৈবনিক উপাদান

হুমায়ূন আহমেদকে খুঁজতে হবে তাঁর সৃষ্টির মাঝে। যেমন তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাসের মাঝে, তেমনি চলচ্চিত্রে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চন্দ্রকথা' চলচ্চিত্রের কথাই ধরা যাক। এ ছবির বৃদ্ধ সরকার সাহেবের মাঝে হুমায়ূন আহমেদের ছায়া আছে। তবে অবশ্যই হুবহু নয়। একটু ভিন্নভাবে তা প্রতিভাত হয়েছে। যেমন, সরকার সাহেব গান শুনতে ভালোবাসেন। ব্যক্তিগত জীবনে হুমায়ূন আহমেদও গান শুনতে ভালোবাসতেন। ছবির একপর্যায়ে আমরা লক্ষ করি, বিশ্বস্ত ভৃত্য আমিন যখন জানায় সে বিয়ে করতে যাচ্ছে, তখন সরকার সাহেব জানতে চান মেয়ে দেখতে কেমন। উত্তরে আমিন জানায়, সুন্দর না, মোটামুটি। শুনে সরকার সাহেব বলেন, 'তুই সুন্দরের বুঝস কী ? এই দুনিয়ার কম মানুষ সুন্দর বুঝে। আমার জীবন কাইট্যা গেল, এখনো সুন্দর বুঝলাম না।' এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায়, ছেলেবেলায় জোছনার ফুল দেখে হুমায়ূন আহমেদ মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেই ফুলকে তিনি ধরতে চেয়েছেন, সারা জীবন চেষ্টা করেছেন। তাঁর ভাষ্য হলো : '...কতবার সেই ফুল ধরতে চেষ্টা করলাম—পারলাম না। সৌন্দর্যকে ধরতে না পারার বেদনায় কাটল আমার শৈশব, কৈশোর ও যৌবন।' (*আমার ছেলেবেলা*, পৃ. ৯৬)। আবার আমরা লক্ষ করি, সরকার সাহেব জানাচ্ছেন চন্দ্রকে কেন তিনি তাকে বিয়ে করেছেন। না, বিপদ থেকে তাকে উদ্ধারের জন্যে চন্দ্রকে তিনি বিয়ে করেন নি। তিনি বিয়ে করেছেন অন্য কারণে। সেই কারণটি অবশ্য সেদিন তিনি বলেন না, বলেন আরেক দিন। তাঁর ভাষ্য হলো : 'তোমাকে বিয়ে করার একটা জটিল কারণ আছে। মানুষ খুবই জটিল জিনিস। সে চলে জটিল কারণে। আমার যখন পাঁচ-ছয় বছর বয়স তখন থেকে দেখেছি আমাদের বাড়িতে একজন বাইজি থাকত। সে কারও সঙ্গে কথা বলত না। মাঝে মাঝে বাপজানরে নাচ দেখাত। আমি ছোটবেলায় গোপনে তার নাচ দেখতাম। সে বাইজির নাম ছিল মধুরা। তার এই বাড়িতেই মৃত্যু হয়েছিল। বাড়ির পেছনে তার কবর আছে। তার চেহারার সঙ্গে তোমার চেহারার অস্বাভাবিক মিল আছে। একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের এত মিল হয় না।' সরকার সাহেবের এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে হুমায়ূন আহমেদের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার। তাঁর বড় মামা শেখ ফজলুল করিমের লেখা নানা গানে থাকত ভাটি অঞ্চলের এক মেয়ের কথা। তাঁর বড় মামার কোনো বাসনা পূরণ না হলেও একটি বাসনা কিন্তু পূরণ হয়েছিল। পুরোপুরি পূরণ অবশ্য হয় নি। হুমায়ূন আহমেদ বলছেন : 'ভাটি অঞ্চলের রূপসী এক কন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হলো। পুরোপুরি বিয়ে না, আকদ অনুষ্ঠান। বিয়ের লেখাপড়া। শুভদিন দেখে বউ উঠিয়ে আনা হবে।

ভাটি অঞ্চলের এই মেয়েকে দেখতে অনেকের সঙ্গে আমিও গেলাম। বড়মামা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে দিলেন, নজর করে মেয়ে দেখবে। শুনেছি মেয়ে কালো। এটা তো ঠিক না। কালো মেয়ে তো আমি বিবাহ করব না। উজ্জ্বল শ্যামলা পর্যন্ত চলে। তার নিচে চলে না।

মেয়েটিকে দেখার দৃশ্যটি এখনো আমার চোখে ছবির মতো ভাসছে। আমাকে একটি বিশাল বড় ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। পাকা দালান। মেয়েটি পুরনো আমলের খাটের উপর বসে আছে। মেয়েটির পেছনে প্রকাণ্ড জানালা। জানালা দিয়ে হাওর দেখা যাচ্ছে। হাওর থেকে হাওয়া আসছে। হাওয়ায় মেয়েটির চুল উড়ছে। মেয়েটি হাত দিয়ে বারবার তার চুল ঠিক করছে। মেয়েটির একপাশে সবুজ রুমালে কী যেন বাঁধা। সে হাত ইশারা করে আমাকে ডাকল [আমি তখন ক্লাস ফোরে পড়ি]। আমি অস্বস্তিতে মরে যাচ্ছি। কেন জানি খুব লজ্জাও লাগছে। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মেয়েটি সবুজ সিল্কের রুমাল আমার হাতে তুলে দিয়ে মিষ্টি করে হাসল। আমার কাছে মনে হলো, মেয়েটার গায়ের রঙ কালো কিন্তু মেয়েটা তো খুবই রূপবতী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি রুমাল নিয়ে ফিরে এলাম। রুমাল খুলে সবাই হকচকিয়ে গেল। রুমালে আছে বিশটা রুপার টাকা। তখন রুপার টাকার প্রচলন ছিল। নজরানা ও সালামি হিসেবে রুপার টাকা দেওয়া হতো। অনেকেই টাকাগুলি আমার কাছ থেকে নিয়ে সাবধানে রাখতে চাইল। আমি কিছুতেই রাজি হলাম না। প্যান্টের পকেটে সব টাকা থাকত। যেখানে যেতাম টাকার ঝনঝন শব্দ হতো।

একসময় জোর করে টাকাগুলি আমার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিয়েতে কিছু একটা সমস্যা হয়। সমস্যার ধরন আমার কাছে পরিষ্কার না। আমার ধারণা যৌতুক-বিষয়ক সমস্যা। এই লেখাটি শুরু করার সময় মা'র কাছে ঘটনা জানতে চেয়েছিলাম। তিনি এড়িয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, ঘটনা দুঃখজনক। যারা ঘটনার সঙ্গে জড়িত তারা কেউ বেঁচে নেই। কেন আর পুরনো কষ্ট খুঁজে বের করা!

পুরনো কষ্ট আমার খুঁজে বের করতে ইচ্ছা করছে। এই কষ্টের সঙ্গে আমার আনন্দও জড়িত। ভাটি অঞ্চলের কিশোরী একটি মেয়ে আমার হাতে সবুজ সিল্কের রুমাল তুলে দিয়েছিল। রুমালভর্তি ঝকঝকে রুপার টাকা। আমি আরেকটি তথ্য বের করেছি। মেয়ে দেখতে কার মতো। মেয়েটি অবিকল অভিনেত্রী শাওনের মতো।' (*কিছু শৈশব*/হুমায়ূন আহমেদ, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৫০-৫১)

'নয় নম্বর বিপদ সংকেত'-এ দেখা যায়, একাকিত্বে ভুগছেন সোভাহান সাহেব। বাইনোকুলার দিয়ে তিনি শূন্য বাড়িঘর দেখেন। ছেলেমেয়েদের জন্যে আকুল হন। তিনি বলেন, 'আমার দুটো মেয়ে। তিনজন নাতি-নাতনি। কেউ এখানে আসে না। স্বর্গ বানিয়ে রেখেছি। তারপরেও এখানে কেউ আসে না।' এখন কীভাবে ছেলেমেয়েদের আনা যায়? সোভাহান সাহেবের ম্যানেজার জানান, তিনি মারা গেছেন শুনে তার ছেলেমেয়েরা আসবে। সত্যিই তাই, বাবার মৃত্যুর কথা শুনে ছেলেমেয়েরা হাজির হয়। বড় মেয়ে বাবার খাটিয়ার পাশে গিয়ে বলে, 'ও বাবাগো ও বাবা। তুমি কীভাবে চলে গেলে? এখন কাকে আমি বাবা ডাকব?' তখন সোভাহান সাহেব খাটিয়া থেকে উঠে বসে বলেন, 'থাপরায়ে দাঁত ফেলে দিব। তিন বছরে একবার খোঁজ নিয়েছিস ফাজিল মেয়ে! বলে কাকে আমি বাবা ডাকব!'

হাসির ছবির এই দৃশ্যের সঙ্গে হুমায়ূন আহমেদের ব্যক্তিগত জীবনের কী অদ্ভুত মিলই না আমরা খুঁজে পেলাম! তিনি তাঁর তিন মেয়ের সঙ্গ কামনায় আকুল ছিলেন। কিন্তু তারা অভিমানে বাবার কাছে আসে নি। তারা হৃদয়ের আকুলতা প্রকাশ করল বাবার মৃত্যুর পর। কিন্তু আফসোস, তাদের এই আকুলতা তিনি বেঁচে থাকতে দেখতে পেলেন না।

আবার অন্য একটি দৃশ্যে দেখা যায় সোভাহান সাহেব বলছেন : 'বাড়ির নাম বৃষ্টি বিলাস রেখেছি কেন? কেন টিনের বাড়ি। যেন বৃষ্টির শব্দ শুনতে পাই।' আর আমরা তো সবাই জানি যে, বৃষ্টির শব্দ শুনতে কত ভালোবাসতেন হুমায়ূন আহমেদ। জীবনে বৃষ্টিতে ভিজেছেনও তিনি বহুবার।

নতুনত্ব

হুমায়ূন আহমেদের চলচ্চিত্রে কিছু নতুনত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, 'শ্যামল ছায়া' ছবিতে দাড়িওয়ালা মানুষ মাত্রই যে একাত্তর সালে স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল—এমন ভুল ধারণা তিনি ভেঙে দিয়েছেন। মাওলানা রূপী রিয়াজের মুখে দাড়ি থাকলেও সে সত্যিকারের দেশপ্রেমিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষে সে মুক্তিযোদ্ধাদের দলে যোগ দেয়। আরেকটি কথা, 'আগুনের পরশমণি'-তে মূলত ক্যামেরা ঘোরাফেরা করেছে একটি বাড়িতে। বলা যায়, একটি বাড়ির বাসিন্দাদের যাপিত জীবনের মাধ্যমেই হুমায়ূন একাত্তরের আগুনঝরা দিনের উত্তাপকে তুলে ধরতে পেরেছেন। অন্যদিকে 'শ্যামল ছায়া' প্রায় আউটডোর ভিত্তিক একটি চলচ্চিত্র। একটি নৌকার যাত্রীদের যাত্রার গল্প এটি।

তবে সত্যিকার অর্থে নতুনত্ব দেখতে পাই 'নয় নম্বর বিপদ সংকেত'-এ। ছবিতে টগর (রূপক) ও রঞ্জনার (তানিয়া আহমেদ) মধ্যে অসম প্রেম দেখানো হয়েছে। দুজনের মধ্যেই রয়েছে বয়সের বেশ ফারাক। এছাড়া শেষে দেখা যাবে যে, টগর ও রঞ্জনার বিয়ে হচ্ছে। বিষয়টি দেশীয় চলচ্চিত্রে অভিনব একটি বিষয়।

কোনো চলচ্চিত্রে পুরো একটি গানের চিত্রায়ন কি গাছের ওপরে হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তরে নেতিবাচক জবাবই শোনা যাবে অথচ 'নয় নম্বর বিপদ সংকেত'-এ এমনটিই দেখা গেছে। ছবির 'চলো যাই বসি নিরিবিলি' গানটি চিত্রায়িত হয়েছে গাছের ওপরে। এটি দারুণ এক চমক সন্দেহ নেই।

এদেশের কোনো ছবির শুটিং কি এক লোকেশনে হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তরেও নেতিবাচক জবাব শোনা যাবে। সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রেও 'নয় নম্বর বিপদ সংকেত' একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। কেননা পুরো ছবির শুটিং হয়েছে গাজীপুরের নুহাশপল্লীতে।

সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত হুমায়ূন আহমেদের 'ঘেটুপুত্র কমলা'-য় সমকামের বিষয়টি উঠে এসেছে এবং অত্যন্ত নান্দনিকভাবে চলচ্চিত্রে তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। এমনটি আগে কখনো দেখা যায় নি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদের ধর্মচেতনা

মোহাম্মদ হাননান

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে হুমায়ূন আহমেদ ইতোমধ্যেই প্রবাদপুরুষতম এবং এক জীবন্ত কিংবদন্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই যে এই স্বীকৃতি এসেছে এমনটা নয়, বরং জীবিত থাকাকালীনই দুই বাংলার কথাসাহিত্যে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী হিসেবে তাঁর আবির্ভাবকে সকলেই বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেছেন।

হুমায়ূন আহমেদ বাংলা সাহিত্যে এমন একটা স্তরে প্রবেশ করেছিলেন যে, তাঁর সৃষ্টি-জগৎ নিয়ে বহুবিধ তত্ত্বালোচনা ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে। বিশেষ করে ধর্মাদর্শ ও স্রষ্টা চেতনা তাঁর সৃজনশীল রচনাসমগ্রের অন্যতম স্পর্শকাতর বিষয় হিসেবে সমালোচকদের সামনে চলে এসেছে।

সকল সৃষ্টিশীল মানুষের জন্যই অবশ্য সব সময় একটা সমস্যা এসে দাঁড়ায় যে, পাঠক স্রষ্টা অথবা ধর্মমতে শিল্পীর অবস্থান কোথায় তা পরখ করে দেখতে চায়। সৃজনশীলদের জন্য এ সমস্যা দুনিয়া জোড়া। সাধারণ মানুষ অনেক সময় সরাসরি এ সম্পর্কে শিল্পীর মতামত প্রত্যাশা করে। আবার কখনো কখনো তাঁর লেখালেখি বা দর্শন থেকে এর উত্তর খুঁজে নেয়। সেজন্য দেখা যায়, লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী কিংবা সংস্কৃতিসেবী অথবা সমাজনেতা তাঁর সব কাজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন ধর্ম সম্পর্কে তাঁর নীতিবাদিতার প্রসঙ্গটিতে। মানুষ অনেক সময় এমনিতেই তার প্রিয় লেখক, শিল্পী অথবা বিজ্ঞানীকে ধর্ম সম্পর্কে সন্দেহ করে থাকে অথবা তাঁর সম্পর্কে প্রচারিত তথ্যে বিভ্রান্ত থাকে। অনেক সময় শিল্পী নিজেও তাঁর ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে পর্যন্ত এ থেকে মুক্তি পেতে দেখি না। এই বিজ্ঞানী মনীষীকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন? আইনস্টাইন উত্তর দিচ্ছেন, 'আমি নিরীশ্বরবাদী নই। কিন্তু সমস্যাটা এতই জটিল যে আমাদের সীমিত বুদ্ধিতে তা কুলায় না।'

তবে হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত ভাবনা ও ধর্মানুভূতি অন্যরকম। এখানে কোনো রাখঢাক নেই। আলাদা কোনো দর্শন নেই। একেবারেই চিরপ্রচলিত 'ট্রাডিশনাল' সৃষ্টিকর্তাকেই তিনি সামনে রেখেছেন। তবে তাঁর সৃষ্টিকর্তা ও ধর্ম সম্পর্কিত চেতনা খানিকটা বুদ্ধিবৃত্তিক ও উদার জাগতিক মানুষের। স্রষ্টার প্রতি তাঁর ভালোবাসা চিরসবুজ এবং অনেকটা লোকজ আন্তরিকতায় পূর্ণ।

হুমায়ূন আহমেদের ধর্মচেতনা বিষয়ের এই নিবন্ধে তাঁর কথাসাহিত্যকে বাদ রাখা হয়েছে এই জন্য যে, লেখক-কবির মানস চেতনা তাঁর সৃজনশীল কর্মে কখনো কখনো আবেগ ও কাহিনির পরিবেশকে মূর্ত করতে ফুটে উঠে। লেখক-কবির একান্ত ব্যক্তিগত চেতনা প্রকৃতপক্ষে এখানে প্রতিফলিত হয় না। বরং চরিত্রগুলোর স্বতঃস্ফূর্ত প্রণোদনাই এক্ষেত্রে বেশি ক্রিয়াশীল থাকে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ ব্যাপারে লেখক-শিল্পীদের মধ্যে মতদ্বৈধতা আছে। কেউ মনে করেন, লেখকেরা বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের নানারকম কথাকে উপস্থাপন করেন। এ ব্যাপারে কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন বলেন,

> একজনের লেখা পড়ে আমরা কি বুঝতে পারব না, সে কোন ধরনের মানুষ...
>
> একজন লেখক জীবনের নানা রকম কথা তাঁর লেখার বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে বলেন।
>
> [শিলালিপি (*দৈনিক কালের কণ্ঠ*), ঢাকা, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১১]

অন্যদিকে হুমায়ূন আহমেদ মনে করেন না, লেখকের লেখা থেকে তাঁর প্রকৃত মানসচেতনা বোঝা যেতে পারে। লেখালেখিতে জীবনবাদী হয়েও অনেক লেখক-কবি নিজেরাই আত্মহত্যা করেছেন। এ ব্যাপারে হুমায়ূন আহমেদ বলেন,

> হেমিংওয়ের লেখা পড়ে আমরা কখনোই বুঝতে পারি না যে, হেমিংওয়ে নিজেকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারেন। তিনি অসম্ভব জীবনবাদী একজন লেখক। তাঁর লেখা পড়ে যদি তাঁকে আমরা বিচার করতে যাই, তাহলে কিন্তু আমরা একটা ধাক্কা খাব। মায়কোভস্কি পড়ে কখনোই বুঝতে পারব না যে, মায়কোভস্কি আত্মহত্যা করার মানুষ। আমরা কাওয়াবাতা পড়ে কখনো বুঝতে পারব না যে, কাওয়াবাতা হারিকিরি করে নিজেকে মেরে ফেলবেন। এঁরা প্রত্যেকেই জীবনবাদী লেখক। জীবনবাদী লেখকদের পরিণতি দেখা গেল ভয়ংকর। তার মানে কী? তার মানে কী দাঁড়ায়? লেখকরা কি সত্যি সত্যি তাঁদের লেখায় নিজেকে প্রতিফলিত করেন? নাকি তাঁদের শুদ্ধ কল্পনাকে প্রতিফলিত করেন।
>
> [শিলালিপি (*দৈনিক কালের কণ্ঠ*), ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১১]

AMARBOI.COM

তবে লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা, ডায়েরি, চিঠিপত্র এবং এ জাতীয় গদ্যরচনা যা লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতিজাত হয়ে থাকে তা লেখক বা কবির প্রকৃত মানসচেতনাকে খুঁজে পেতে সাহায্য করে। হুমায়ূন আহমেদের এরকম ৫টি গদ্যগ্রন্থ, যাতে কিছুটা স্মৃতিকথামূলক রচনার প্রাধান্য রয়েছে এবং রয়েছে সামাজিক কর্মকাণ্ডের ছবি, এখানে তাঁর মানস চেতনার ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এই নিবন্ধ রচনায় তাই এ গ্রন্থগুলোকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থগুলো নিম্নরূপ :

১. *বলপয়েন্ট*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা ২০০৯
২. *কাঠপেন্সিল*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা ২০১০
৩. *রঙপেন্সিল*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা ২০১১
৪. *ফাউন্টেনপেন*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা ২০১১
৫. *নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা ২০১২।

উপরিউক্ত গ্রন্থগুলোতে হুমায়ূন আহমেদের স্রষ্টা কল্পনা ও ধর্মভাবনা অত্যন্ত আন্তরিক ও ভক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হৃদয়ের। কোথাও এ চেতনা সংযত ও পরিশীলিত, আবার কোথাও তা বিমুগ্ধ দৃষ্টির। স্রষ্টা এবং তাঁর প্রতিনিধির বাণী তিনি নির্বিবাদে ব্যবহার করেছেন তাঁর (হুমায়ূনের) অন্তর্নিহিত বিশ্বাস থেকে। এ পটভূমিতে তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থগুলিতে তাঁর ধর্মচেতনা নিম্নোক্তভাবে ধরা পড়ে :

১. শৈশবে-কৈশোরের পরিবেশ পরিমণ্ডলে লেখকের ধর্মানুভূতির উন্মেষ
২. বয়োজ্যেষ্ঠদের আচার-আচরণে প্রকাশিত ধর্মবোধ লেখকের পর্যবেক্ষণ
৩. বহিরাগত ধর্মবোধ থেকে নিজের অভিব্যক্তি
৪. স্রষ্টা সম্পর্কে সরাসরি তার আকুতি
৫. কোরান-হাদিস থেকে সরাসরি তত্ত্বকথা ব্যবহার
৬. ইসলামের সুফিবাদে তাঁর আগ্রহ
৭. ধর্মীয় বিষয় নিয়ে হাস্যরস
৮. বেহেশত নিয়ে অনুভূতি
৯. জ্বিন-ভূত সম্পর্কিত ধর্মীয় দলিল ব্যবহার
১০. মাজার ও মন্দির নিয়ে উদার উচ্ছ্বাস
১১. দোয়ায় আস্থা
১২. দুনিয়া-আখেরাত সম্পর্কে উপলব্ধি
১৩. কবরস্থান প্রীতি
১৪. বিভিন্ন ধর্মের উদার-অনুদার নীতি প্রসঙ্গ
১৫. আস্তিক্য-নাস্তিক্যবাদ প্রসঙ্গ।

AMARBOI.COM

হুমায়ূন আহমেদের বিশাল রচনাসমগ্রের আত্মস্মৃতিমূলক গদ্যরচনা থেকে উপরিউক্ত বিষয়সমূহের একটি অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ অপেক্ষিত। এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে, বাংলাদেশে ফতোয়ার রাজনৈতিক ব্যবহারের শিকার একসময় হুমায়ূন আহমেদও হয়েছিলেন। তাঁকে রাজনৈতিক-আলেমরা 'মুরতাদ' খেতাবও দিয়েছিল। এ নিয়ে তাঁর মধ্যে একটা কষ্টবোধ দেখতে পাই,

> ...এমন কিছু লিখে ফেললাম যা ধর্মগ্রন্থ স্বীকার করে না তাহলে মহাবিপদ। ... আমাকে মুরতাদ ঘোষণা করা হতে পারে। অতীতে আমাকে একবার মুরতাদ ঘোষণা করা হয়েছে। বারবার মুরতাদ হওয়া কোনো কাজের কথা না।

[*রঙপেন্সিল*, পৃষ্ঠা-৭৫]

শৈশব-কৈশোরের পরিবেশে ধর্মানুভূতির উন্মেষ

হুমায়ূন আহমেদের ধর্মীয় চেতনার বিকাশের পটভূমিতে রয়েছে তাঁর কৈশোর-শৈশবের পরিবেশ। এ পরিবেশের বেড়াজালে প্রোথিত রয়েছে তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনার শেকড়। তাঁর নিজস্ব বয়ানে শোনা যেতে পারে :

> আসলে আমি মানুষ হয়েছি অদ্ভুত পরিবেশে। একা একটি বাড়ির অগুনতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> রহস্যময় কোঠা। বাড়ির পেছনে জড়াজড়ি করা বাঁশবন। দিনমানেই শেয়াল ডাকছে চারদিকে। সন্ধ্যা হব-হব সময়ে বাঁশবনের এখানে-ওখানে জ্বলে উঠছে ভূতের আগুন। দোতলার বারান্দায় পা ছড়িয়ে বিচিত্র সুরে কোরআন পড়তে শুরু করেছে কানাবিবি। সমস্তই অবিমিশ্র ভয়ের।

এখানে 'বিচিত্র সুরে কোরআন' এবং 'দুলে দুলে কোরআন-পাঠ শুনলেই বুকের ভেতর ধক্ করে' উঠার বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। লেখকের শিশুমনে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। কোরআনের পর কালেমা পড়ার বিষয়টিও তাঁর শৈশবের ঘটনাবলিতে দাগ কেটেছিল,

> আমি এসেছি অতি কঠিন গোড়া মুসলিম পরিবেশ থেকে। আমার দাদা মাওলানা আজিমুদ্দিন আহমেদ ছিলেন মাদ্রাসা শিক্ষক। তাঁর বাবা জাহাঙ্গির মুনশি ছিলেন পীর মানুষ। আমার দাদার বাড়ি 'মৌলবিবাড়ি' নামে এখনো পরিচিত।
>
> একবার বড় ঈদ উপলক্ষে দাদার বাড়িতে গিয়েছি। আমার বয়স ছয় কিংবা সাত। দাদাজান ডেকে পাঠালেন। বললেন, কলেমা তৈয়ব পড়। আমি বললাম, জানি না তো। দাদাজানের মুখ গম্ভীর হলো। দাদিজান আমার তাৎক্ষণিক শাস্তির পক্ষে। তিনি বললেন, একে শাস্তি দেন। শাস্তি দেন। ধামড়া পুলা, কলেমা জানে না।
>
> দাদাজান বিরক্তমুখে বললেন, সে ছোট মানুষ। শাস্তি তার প্রাপ্য না। শাস্তি তার বাবা-মা'র প্রাপ্য।
>
> [ফাউন্টেনপেন, পৃষ্ঠা-১৯]

AMARBOI.COM

বোঝা যায়, 'অতি কঠিন গোড়া মুসলিম পরিবেশ' থেকেই তিনি এসেছিলেন। কিন্তু পেয়েছিলেন উদার পরিবেশ। কারণ 'কালেমা' না বলতে পারায় তাঁর কোনো শাস্তি হয় নি। বরং বলা হয়েছে, সে ছোট মানুষ। শাস্তি তার প্রাপ্য না।

নানারকম ধর্মবোধের মানুষ থেকে সতর্ক মন

এই ধর্মীয় চেতনাসমৃদ্ধ জ্ঞানী পরিবেশ হুমায়ূন আহমেদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল এবং ধর্মের প্রকৃত ভাব ও চেতনা সম্পর্কেও তিনি পূর্ব থেকেই জ্ঞানসমৃদ্ধ ছিলেন। তার রেখাপাতটি দেখতে পাই, যখন কেউ তাকে ধর্মীয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে এসেছে, তখন তিনি কখনো বিব্রত, কখনো দ্বিধা-সংকোচে ভুগেছেন,

> প্রতি রবিবার আরেক যন্ত্রণা। বুড়ি আমাকে চার্চে নিয়ে যাবে।
>
> আমি বললাম, আমি মুসলিম। আমি কেন চার্চে যাব?
>
> বুড়ি বলল, গডের চার্চে সব ধর্মের লোক যেতে পারে।
>
> আমি বললাম, আমি যাব না।
>
> [বলপয়েন্ট, পৃষ্ঠা-৬৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু এতেই নন, ব্যথিত হয়েছে তাঁর মন, যখন দেখেছেন ধর্ম নিয়ে সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষমূলক কর্মসূচি হচ্ছে :

> শুক্রবার মুসলমানদের জন্যে পবিত্র একটি দিন। খ্রিষ্টানদের রবিবার, ইহুদিদের শনিবার। সপ্তাহের তিন দিন, তিন ধর্মাবলম্বীরা নিয়ে নিয়েছে।
>
> শুক্রবার মুসলমানদের পবিত্র দিন বলেই কি আমেরিকানরা 'কালো শুক্রবার' আবিষ্কার করল ?
>
> [*নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ*, পৃষ্ঠা-৫২]

তাঁর বেদনাটা এখানে আস্তিক মানুষ হিসেবে। আমেরিকানরা সমগ্র দুনিয়াকে গণতন্ত্রের বুলি শেখায় এবং কে কতখানি ধর্মীয় ঔদার্য দেখাতে পেরেছে, দেশ বার্ষিক সনদ বিবরণী ধরে ধরে তৈরি করে তারা। অথচ তাদের ভেতরে কী গরল অবস্থা। হুমায়ূন আহমেদ তা পর্যবেক্ষণ করেছেন গভীর বেদনার সঙ্গে।

কোনো বিষয়ে লক্ষ করা যায়, তা যদি হয় ইসলাম ধর্মের মধ্যেই যা তাঁর কাছে যখন খটকা লেগেছে, তখন তিনি তাঁর ঔচিত্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু প্রশ্নটি তুলেছেন ইতিবাচকভাবে,

> আমাদের অতি পবিত্র স্থান মক্কা শরীফে অমুসলমানদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। আমাদের নবীজি (দঃ)-র জীবদ্দশায় অনেক অমুসলমান সেখানে বাস করতেন। কাবার কাছে যেতেন। তাদের উপর কোনোরকম বিধিনিষেধ ছিল বলে আমি বইপত্রে পড়ি নি। ধর্ম আমাদের উদার করবে। অনুদার করবে কেন ?
>
> [*ফাউন্টেনপেন*, পৃষ্ঠা-২৩-২৪]

AMARBOI.COM

এখানে 'অতি পবিত্র স্থান মক্কা শরীফ' এবং 'নবীজি (দ.)' শব্দ ও বাক্য দু'টি একনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণের দাবি রাখে। গভীর মমত্ববোধ থেকেই তিনি 'অতিপবিত্র' এবং 'নবীজি' উচ্চারণ করেন। যে বিষয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, সে বিষয়ে তাঁর জানার ঘাটতি থাকতে পারে, এর হয়তো একটি ইসলামি-ব্যাখ্যাও আছে, কিন্তু তাঁর প্রশ্নের মধ্যে ধৃষ্টতা নেই। বরং তিনি মনে করেছেন, ধর্ম মানুষকে উদারই করার কথা, অনুদার নয়।

স্রষ্টার প্রতি অগাধ আস্থা

হুমায়ূন রচনাবলী অনুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ধর্ম এবং স্রষ্টার প্রতি তাঁর ছিল বরাবর অগাধ আস্থা। সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর মহত্ত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। বিভিন্ন রচনার ফাঁকে ফাঁকে এসেছে এমন অনেক বাক্য :

> আমার সেই মহান ম্যাজিশিয়ানের স্বরূপ জানতে ইচ্ছা করে, যিনি আমাদের সবাইকে অন্তহীন ম্যাজিকে ডুবিয়ে রেখেছেন।
>
> [*বলপয়েন্ট*, পৃষ্ঠা-৯৫]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব মন্তব্য ও সংলাপে রয়েছে স্রষ্টার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা। এতে তাঁর ধর্মপ্রাণতার প্রবণতাকে প্রকাশ করে। সকল ক্ষেত্রেই এরকম একজন আস্তিক মানুষের ছায়া ঘুরে বেড়ায় হুমায়ূন রচনাবলীর পরতে পরতে।

কোরআন-হাদিসের তত্ত্বকথা প্রচার

পবিত্র কোরআন ও হাদিস সম্পর্কে হুমায়ূন আহমেদের অগাধ পাণ্ডিত্য যে-কোনো ধর্মবেত্তাকে বিস্মিত করবে। তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখায় কোরআন-হাদিসের বিভিন্ন উদ্ধৃতি অকাতরে ব্যবহার করেছেন। এই অকাতর ব্যবহারের আধিক্য দেখে অনুমিত হয়, কোরআন ও হাদিসের সুন্দর সুন্দর বাক্যাবলী তিনি মানবসমাজে এবং তাঁর পাঠকমহলে প্রচার করার চেষ্টা করেছেন। এতে তাঁর ধর্মপ্রাণতার দ্বায়ী (দ্বীনের কথার প্রচারক অথবা তবলিগ) চরিত্র উদ্ঘাটিত হয়। এটা তিনি করেছেন স্বচ্ছন্দে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে। যেমন, একটি গদ্য রচনায় 'বিগ ব্যাং' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি কোরআনের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন,

> আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন শরিফে সৃষ্টির শুরুর ঘটনা ঠিক এভাবেই উল্লেখ করা আছে। সূরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছে—'অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, সকল আকাশ এবং ভূমণ্ডল একটি একক পিণ্ড এবং আমরা তাকে বিচ্ছিন্ন করলাম ?' (২১:৩০)।
>
> [*রঙপেন্সিল*, পৃষ্ঠা-৪১]

গাছপালা ও বৃক্ষরাজি সম্পর্কে হুমায়ূন আহমেদের আগ্রহ বহুল প্রচারিত। বৃক্ষ দিয়ে বিশাল বনমালা গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও বাস্তব জীবনে তিনি করে দেখিয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁর একটি বিশেষ আগ্রহ লক্ষণীয় :

> গাছপালা বিষয়ে নবিজী (দঃ)-র একটি চমৎকার হাদিস আছে। তিনি বলছেন, মনে করো তোমার হাতে গাছের একটি চারা আছে। যে-কোনোভাবেই হোক তুমি জেনে ফেলেছ পরদিন রোজ কেয়ামত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপরেও গাছের চারাটি তুমি মাটিতে লাগিয়ো।
>
> [*ফাউন্টেনপেন*, পৃষ্ঠা-৩০]

এ প্রসঙ্গে প্রচলিত নানারকম 'ভ্রান্তিমূলক হাদিস' সম্পর্কেও তাঁর সতর্কতা লক্ষ করি এবং সেগুলো সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করতেও তিনি ভুলেন না :

নবিজী (দঃ) বলেছেন, 'বিদ্যাশিক্ষার জন্যে সুদূর চীনে যাও।' আমি বলছি, ভাষা শিক্ষার জন্যে শিশুদের কাছে যাওয়া যেতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, ইসলামের কিছু জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, 'বিদ্যাশিক্ষার জন্যে সুদূর চীনে যাও'—এই কথা নবিজী কখনো বলেন নি।

এখানে বিদ্যাশিক্ষার জন্য সুদূর চীনে যাওয়া প্রসঙ্গের হাদিসটি সম্পর্কে ওলামা হযরতদের মন্তব্য স্মর্তব্য। এ প্রসঙ্গে মুফতি মাহমুদুল আমীন বলেন,

> হুমায়ূন আহমেদের এ বিষয়ক অনুসন্ধানটি সঠিক। এটি আসলে একটি ভুয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাদিস। সহি হাদিস গ্রন্থগুলোতে এ রকম কোনো হাদিসের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

[সাক্ষাৎকার মুফতি মাহমুদুল আমীন, পরিচালক, মাহাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া উচ্চতর ইসলামি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, চরওয়াশপুর, বসিলা, ঢাকা]

বেহেশত প্রসঙ্গে তাঁর আগ্রহ ও ধারণা

জান্নাত অথবা বেহেশত প্রসঙ্গে হুমায়ূন আহমেদের আগ্রহকে আমরা লক্ষ করি। তবে এ ব্যাপারে তার ধারণায় একটা নিজস্ব দর্শন আছে, কিন্তু ধর্মের সঙ্গে তা সাংঘর্ষিক হয় নি,

> পবিত্র কোরআন শরিফের একটি আয়াতে আল্লাহপাক বলছেন, 'এবং বেহেশতে তোমরা প্রবেশ করবে ঈর্ষামুক্ত অবস্থায়।'
>
> এর সরল অর্থ, শুধু বেহেশতেই মানুষ ঈর্ষামুক্ত, ধুলা-কাদার পৃথিবীতে নয়। বিস্ময়কর হলেও সত্যি, ঈর্ষা এক অর্থে আমাদের চালিকাশক্তি। মানব সভ্যতার বিকাশের জন্যে ঈর্ষার প্রয়োজন আছে। বেহেশতে যেহেতু সভ্যতা বিকাশের কিছু নেই, ঈর্ষার প্রয়োজন নেই।
>
> [*রঙপেন্সিল*, পৃষ্ঠা-৯৩]

বেহেশতে গিয়েও তিনি বই পড়তে চেয়েছেন,

> আমি নানা ধর্মগ্রন্থ ঘেঁটেছি একটা বিষয় জানার জন্যে—বেহেশত বা স্বর্গে কি কোনো লাইব্রেরি থাকবে? সুখাদ্যের বর্ণনা আছে, অপূর্ব দালানের কথা আছে, উৎকৃষ্ট মদ্যের কথা আছে, রূপবতী তরুণীর কথা আছে, বহুমূল্য পোশাকের কথা আছে, সঙ্গীতের কথা আছে। লাইব্রেরির কথা নেই।
>
> লাইব্রেরি হচ্ছে মানুষের চিন্তা এবং জ্ঞানের ফসল। বেহেশতে হয়তো মানুষের চিন্তা এবং জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। সেখানকার চিন্তা অন্য, জ্ঞান অন্য। বিশুদ্ধ চিন্তা, বিশুদ্ধ জ্ঞান।
>
> [*ফাউন্টেনপেন*, পৃষ্ঠা ৬৯]

অনেক সময় দেশের প্রতি প্রবল ভালোবাসায় তিনি নিজ দেশকে বেহেশতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এটা এক ধরনের আবেগ থেকে জাত। প্রকৃতপক্ষে বেহেশতের সঙ্গে তুলনা নয়—

> নোভা চোখ বড় করে শোনে। একদিন সে বলল, আমাদের দেশটা a piece of paradise, তাই না বাবা?
>
> আমি বললাম, অবশ্যই তাই। তবে একটু ভুল করেছ। আমি নিশ্চিত, paradise এত সুন্দর না।
>
> আমি অতি ভাগ্যবান, আমি আমার জীবন paradise-এ কাটিয়ে দিতে পারছি। আমার মেয়েটা ভাগ্যবতী না। তার জীবন কাটছে আমেরিকায়। সে এবং তার স্বামী নাকি ঐ দেশের নাগরিকত্বও পেয়েছে।...
>
> [*বলপয়েন্ট*, পৃষ্ঠা-৭৩]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরকম আরও দেখি জ্যোৎস্নারাত নিয়েও। তাঁর প্রিয় ছিল জ্যোৎস্নারাত। এখানে এই নিয়ে বেহেশতের প্রসঙ্গও এসেছে। ব্যাপারটা এই নয় যে, বেহেশতেও এটা পাওয়া যাবে না, আসলে রাতের মাধুর্য বড় করে তুলতেই এই ব্যজোক্তি অলংকারের ব্যবহার,

> এক সন্ধ্যায় হাসিমুখে আমাকে বলল, ও ভাইগ্না ব্যাটা, আইজ যে পুরা চান্নি হেই খিয়াল আছে ? চান্নি দেখতে যাবা না ? যত পার দেইখ্যা লও। এই জিনিস বেহেশতেও পাইবা না।

[*বলপয়েন্ট*, পৃষ্ঠা-১১৪]

কবরস্থানপ্রীতি

মানুষের স্থায়ী ঠিকানা হলো কবরস্থান। এ নিয়ে মানুষের কৌতূহল কম, ভীতি বেশি। মানুষ কবর নিয়ে, মৃত্যু নিয়ে বেশি ভাবতে চায় না। হুমায়ূন আহমেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে দেখি ঠিক এর বিপরীত। তিনি কারণে-অকারণে কবরস্থানে গিয়ে হাজির হয়েছেন :

> আমার বৈকালিক ভ্রমণে পিরোজপুর গোরস্থান একটি বিশেষ জায়গা দখল করে ফেলল। প্রায়ই সেখানে যাই, কবরের গায়ে লেখা নামগুলি পড়ি। বৃদ্ধ কেয়ারটেকারকে দেখি কবর পরিষ্কার করছেন। ঝোপঝাড় কাটছেন। তিনি আর কখনো নামাজ পড়তে ডাকেন নি। তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা তেমন হতো না। একদিন শুধু বললেন, আপনার কোনো আত্মীয়স্বজন কি এখানে আছেন?
>
> আমি বললাম, না।
>
> তাহলে রোজ আসেন কেন ?
>
> আমি চুপ করে রইলাম। জবাব দিতে পারলাম না। বৃদ্ধ বিড়বিড় করে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাপাকের কোনো ইশারা আছে বইল্যাই আপনে আসেন।

[*বলপয়েন্ট*, পৃষ্ঠা-২২]

AMARBOI.COM

আখেরাত উপলব্ধি

হতে পারে এই যে, দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয়ে তাঁর চিন্তা-চেতনা জীবনসায়াহ্নে এসে একটা পরিণতি লাভ করেছে। তবে বরাবরই তিনি একজন বিশ্বাসী। শেষ-জীবনে দুনিয়ার প্রতি তাঁর মোহ একটা প্রবল ধাক্কাই খেয়েছিল,

> মজার ব্যাপার হলো, আমরা মানুষেরাও প্রবল বিভ্রমে বাস করি। আমাদের সবার বাস্তবতাই আলাদা। মানুষ হিসেবে আমরা আলাদা। আমাদের রিয়েলিটিও আলাদা।

[*নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ*, পৃষ্ঠা-৩৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর এই উপলব্ধির ফলে দুনিয়া ছেড়ে যে মানুষকে খালি হাতে চলে যেতে হবে সেই চরম সত্যটি উদ্ঘাটিত হতে দেখি তাঁর কলমে,

> বিত্তবানদের মনে রাখা উচিত, কাড়ি কাড়ি টাকা ব্যাংকে জমা রেখে তাঁদের একদিন শূন্যহাতেই চলে যেতে হবে।
>
> [*নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ*, পৃষ্ঠা-২১-২২]

এই উপলব্ধি হুমায়ূন আহমেদের লেখালেখির জীবনে একটি বড় অর্জন। আর তা প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন নি তিনি।

প্রসঙ্গ : আস্তিক্য-নাস্তিক্য, বিজ্ঞান ও ধর্ম

হুমায়ূন আহমেদের ব্যক্তিমানসে ধর্মচেতনার স্বরূপ উদ্ঘাটনে গবেষক-পাঠকের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থা হচ্ছে এই যে, তিনি নিজেই এসব বিষয়ে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে সরাসরি মন্তব্য করেছেন। প্রথমে বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর একটি অভিযোগ :

> বিজ্ঞানের ছাত্র বলেই হয়তো বিজ্ঞানের প্রতি আমার আস্থা ও ভরসা সীমাহীন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। তার যাত্রা Abstract-এর দিকে। কোয়ান্টাম থিওরি, স্ট্রিং থিওরি সবকিছু আমার মতো সাধারণ মানুষের বোধের বাইরে চলে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা চলে যাচ্ছে ফিলসফির দিকে। সুফিরা যেমন বলেন, সবই মায়া; বিজ্ঞানও বলা শুরু করেছে, সবই মায়া। . .
>
> [*ফাউন্টেনপেন*, পৃষ্ঠা-২৯]

অভিযোগটি তিনি আরও গাঢ় করেছেন এভাবে,

> বিজ্ঞান কিছু প্রশ্নের উত্তর দেবে। যেমন, আমরা কে ? পৃথিবীতে কেন জন্ম নিয়েছি ? আমরা কী উদ্দেশ্যে এসেছি ?
>
> সৃষ্টির মূল রহস্য বিজ্ঞানই ভেদ করবে। আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ বিজ্ঞান করবে। ফিলসফি না।
>
> [*ফাউন্টেনপেন*, পৃষ্ঠা-২৯]

এসব অভিযোগের পর তাঁর একটা অবস্থান বিষয়ে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হয়ে আসে। তিনি নিজেও এ নিয়ে আবার বিব্রত, অথবা পাঠকের কাছে স্পষ্ট করতে চান তাঁর ধর্মচেতনার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কটি :

> আমার লেখায় আস্তিক আস্তিক কি গন্ধ পাওয়া যায় ? অতি বড় নাস্তিকের ভেতরেও একজন আস্তিক বাস করেন। মৃত্যুর পরে সব শেষ হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না—এই সত্য মানতে কষ্ট হয় বলেই আস্তিকতার খড়কুটো আঁকড়ে ধরা। আমি শেষ হয়ে যাব—এই হাহাকার থেকেই আস্তিকতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবী ঈশ্বরের বিশেষ কোনো সৃষ্টি না—এই বিষয়ে ফিজিক্সে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী Wegner-এর একটি যুক্তি আছে। তিনি বলছেন, সৌরজগতে সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণনে কিছু Ugliness (অসৌন্দর্য) আছে।

পৃথিবী চক্রাকারে ঘুরছে না। Elliptic ঘূর্ণন। ঈশ্বর পৃথিবীর ঘূর্ণন ঠিক করলে পৃথিবীকে চক্রাকারে ঘুরাতেন। ঈশ্বর Ugliness-এ থাকতেন না।

পাঠকদের কাছে কি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এই বিজ্ঞানীর যুক্তি গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে ? আমার কাছে মনে হচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে, প্রয়োজন ছিল বলেই পৃথিবীকে এই ধরনের গতিপথে ঘুরানো হচ্ছে। তবে আমার কথায় কী যায় আসে ? আমি কোনো Cosmologist না। আমি এক অভাজন লেখক।

[*কাঠপেন্সিল*, পৃষ্ঠা ১১৬]

এখানে তিনি সরাসরি নিরীশ্বরবাদী বিজ্ঞানীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছেন। জানিয়ে দিচ্ছেন, ঈশ্বরের খেয়ালের প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা।

তবে তিনি ধর্ম ও বিজ্ঞানকে আলাদা আলাদা রাখতেই চান। এজন্য তাঁর অভিমতটি হচ্ছে, 'ধর্ম থাকবে ধর্মের মতো, বিজ্ঞান বিজ্ঞানের মতো'। তিনি মনে করেন দুটোর মধ্যে তুলনাও দরকার নেই, মিল খোঁজারও দরকার নেই।

আমার মতে ধর্ম থাকবে ধর্মের মতো, বিজ্ঞান বিজ্ঞানের মতো। তেল-জলকে ঝাঁকিয়ে এক করার প্রয়োজন নেই। এমন একদিন হয়তোবা আসবে যেদিন থিওসফি ও Physics এক হয়ে যাবে। দাড়িপাল্লায় মৃত্যুপথযাত্রী পশু ও মানুষ না মেপে সেই দিনের প্রতীক্ষায় থাকাই যুক্তিযুক্ত।

[*রঙপেন্সিল*, পৃষ্ঠা ১৩-১৫]

অন্যত্র, আরও একটু স্পষ্ট করে বলেছেন,

বিজ্ঞান একদিকে থাকুক, ধর্ম অন্যদিকে থাকুক। এই মুহূর্তে দুটিকে মেলানোর কিছু নেই।

[*রঙপেন্সিল*, পৃষ্ঠা-৪৯]

যুগে যুগে বিজ্ঞান ও ধর্মের বিরোধ নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে তাঁর উষ্মা তিনি সরাসরিই উল্লেখ করেছেন। স্টিফেন হকিং-এর সাম্প্রতিক 'ঈশ্বর নেই' তত্ত্ব নিয়ে সারাবিশ্বের নাস্তিক্যবাদীদের মাতামাতি প্রসঙ্গে হুমায়ূন আহমেদ মন্তব্য করেন, হকিং-এর উক্তিতে ঈশ্বর ধ্বংস হয়ে গেছে মনে করার কোনো কারণ নেই। তিনি খুব জোরালো যুক্তি দিয়ে বলছেন, 'মানুষ কোনো কারণ ছাড়াই সৃষ্টি হয়ে গেল' '...সূত্রগুলি আপনাআপনি হয়ে গেছে', 'এর পেছনে কোনো পবিত্র আদেশ নেই'?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আল্লাহপাকের অস্তিত্ব ও ধর্মীয় প্রত্যাদেশ ইত্যাদির পক্ষে হুমায়ূন আহমেদের দৃঢ় অবস্থান এবং যুক্তি প্রতিষ্ঠা তাঁর ধর্মচেতনার আস্তিক্যবাদকে স্পষ্ট করে। এখানে তিনি কোনো লুকুছাপা করেন নি :

> সম্প্রতি পত্রিকায় দেখলাম কঠিন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং বলেছেন, ঈশ্বর এবং আত্মা বলে কিছু নেই। স্বর্গ-নরক নেই। সবই মানুষের কল্পনা। মানব মস্তিষ্ক হলো একটা কম্পিউটার। কারেন্ট চলে গেলে কম্পিউটার বন্ধ হয়ে যায়। মৃত্যু হলো মানব মস্তিষ্ক নামক কম্পিউটারের কারেন্ট চলে যাওয়া।...
>
> স্টিফেন হকিংয়ের এক উক্তিতে ঈশ্বর ধ্বংস হয়ে গেছে মনে করার কারণ নেই। আবার অনেক নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থবিদের ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়ে জোরালো বক্তব্যে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা হয় না। ঈশ্বর অধরাই থেকে গেছেন।
>
> আমি সামান্য বিপদে পড়েছি। স্টিফেন হকিংয়ের মন্তব্যে আমার কী বলার আছে, তা অনেকেই জানতে চাচ্ছেন। এই রকম জটিল বিষয়ে আমি নিতান্তই অভাজন। তার পরেও বিচিত্র কারণে কিছু বলার লোভ সামলাতে পারছি না।
>
> বিজ্ঞানীদের একটি শর্ত হকিং সাহেব পালন করেন নি। তারা পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলেন না। যখন পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারেন না তখন বলেন, তিনি অনুমান করছেন বা তাঁর ধারণা। হকিং সরাসরি বলে বসলেন, ঈশ্বর নেই। তিনি নিজেও কিন্তু পদার্থবিদ্যায় তাঁর থিওরি একাধিকবার প্রত্যাহার করেছেন।
>
> হকিং সাহেবের ধারণা, অমরত্ব বলে কিছু নেই। তিনি সম্ভবত ভুলে গেছেন, DNA অণু অমর।...
>
> এই রহস্যময় DNA কি বলে দিচ্ছে না ?—'হে মানব জাতি, তোমরা ঈশ্বরের অনুসন্ধান করো।' এই কারণেই কি মানুষ নিজের জন্যে ঘর বানানোর আগে প্রার্থনার ঘর তৈরি করে ?...
>
> মানুষ নিজেও মহা মহা শক্তিধর। সেই মানুষ কোনো কারণ ছাড়াই সৃষ্টি হয়ে গেল ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। তাকে কঠিন শৃঙ্খলার মধ্যে রাখা হয়েছে। তাকে পদার্থবিদ্যার প্রতিটি সূত্র মেনে চলতে হচ্ছে। এই সূত্রগুলি আপনাআপনি হয়ে গেছে ? এর পেছনে কি কোনো পবিত্র আদেশ (Devine order) নেই ?
>
> [*রঙপেন্সিল*, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৯]

এখানে নাস্তিক স্টেফিন হকিং-কে হুমায়ূন আহমেদ যেভাবে সমালোচনা করেছেন তাতে তার আস্তিক অবস্থান স্পষ্ট। তিনি কোরানের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'হে মানবজাতি, তোমরা ঈশ্বরের অনুসন্ধান কর'। এর তাফসির করে তিনি আরও বলেছেন, এ কারণে মানুষ নিজের ঘর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বানানোর আগে প্রার্থনার ঘর তৈরি করে। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেছেন, শক্তিধর মানুষ কোনো কারণ ছাড়া সৃষ্টি হয় নি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে চলছে তার পেছনে অবশ্যই আল্লাহর পবিত্র আদেশ রয়েছে।

আস্তিক্য-নাস্তিক্য প্রসঙ্গে নিচের এই উদ্ধৃতি তাঁর সম্পর্কে বহু অজ্ঞাত তথ্যই পরিস্ফুটিত হয়। তারপরও এ প্রশ্নেরও তিনি সরাসরি একটি উত্তর রেখে গেছেন :

> অপারেশন হবে ভোর ন'টায়। আগের রাতে আমার কাছে হাসপাতালের একজন কাউন্সিলর এলেন। তিনি বললেন, তুমি কি মুসলিম ?
>
> হ্যাঁ।
>
> কাল ভোরে তোমার অপারেশন। তুমি কি চাও তোমার জন্যে তোমার ধর্মমতে প্রার্থনা করা হোক ?...
>
> আমি প্রার্থনা করাব না। অর্থের বিনিময়ে প্রার্থনায় আমার বিশ্বাস নেই।
>
> তোমার অপারেশনটি জটিল। তুমি যদি চাও আমি ডিসকাউন্টে প্রার্থনার জন্যে সুপারিশ করতে পারি। একজন মুসলমান আলেম প্রার্থনা করবেন।
>
> ডিসকাউন্টের প্রার্থনাতেও আমার বিশ্বাস নেই।
>
> তুমি কি নাস্তিক ?
>
> আমি নাস্তিক না বলেই ডিসকাউন্টের প্রার্থনায় বিশ্বাসী না।
>
> [*ফাউন্টেনপেন*, পৃষ্ঠা ৪৬]

AMARBOI.COM

বিভিন্ন সময়ে আল্লাহতাআলার অস্তিত্ব সংক্রান্ত অনেক প্রশ্নেরই উত্তর তাঁকে দিতে হয়েছে। অনেক সময় তাঁকে বিব্রত করতেই এসব প্রশ্ন করা হয়েছিল। কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি তাঁর ঈশ্বর বিশ্বাসকে প্রকাশ করেছেন। তিনি এই অবস্থা থেকে কখনোই বিচ্যুত হন নি, বরং কেউ ইসলামকে আক্রমণ করলে তিনি শান্ত মনে তাকে যুক্তি দিয়েই মোকাবিলা করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে চল্লিশ বছর আগের এক ঘটনা স্মরণ করে তিনি বলছেন,

> আমি যখন পিএইচডির শেষ পর্যায়ে, তখন আমার কাছে খ্রিষ্টান পাদ্রিরা আসতে শুরু করল। তারা মনে করল, একজন বিধর্মীকে ওদের ধর্মে নিয়ে গেলে ওদের জন্য সুবিধা। আমি দেখলাম, ওরা প্রচুর পড়াশুনা করে, জানে। ওদের ধর্ম বিষয়ে যেমন ওরা প্রচুর জানে, আমাদের ধর্ম নিয়ে তেমনি। আমি আমাদের প্রফেটকে হাইলাইট করার জন্য এক পাদ্রিকে বললাম যে, শোনো, আমাদের প্রফেট ছিলেন এমনই একজন মানুষ, তিনি যখন কারও সঙ্গে কথা বলতেন, তখন সরাসরি তার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতেন। তিনি যার সঙ্গে কথা বলতেন, তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে বলতেন না, তিনি পুরো বডিকে তার দিকে টার্ন করতেন, যাতে সে মনে করে তাকে ফুল অ্যাটেনশন দেওয়া হচ্ছে।
>
> শুনে পাদ্রি বললেন, দেখুন, স্পন্ডিলাইটিস বলে একটা ডিজিজ আছে, যে ডিজিজে ঘাড়ের চামড়া শক্ত হয়ে যায়, আপনাদের প্রফেটের ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> স্পন্ডিলাইটিস ডিজিজ। উনি ঘাড় ফেরাতে পারতেন না বলে পুরো শরীর অন্যের দিকে ফেরাতেন। তাহলে তোমরা একটা ডিজিজকে হাইলাইট করছ কোন দুঃখে ?
>
> হঠাৎ করে আমরা এমনই মনটা খারাপ হলো যে ভাবলাম, আসলেই তো, একটা ডিজিজের জন্য তিনি এটা করতেন বলে আমরা এটাকে মানছি! তখন গড আমাকে হেল্প করল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একটা লজিক দিয়ে দিলেন এবং লজিকটা আমার তাৎক্ষণিকভাবে আসা। পাদ্রি তখনো বসা ওখানে, চা খাওয়া শেষ করেন নি, আমি বললাম, আপনার কথাটা ভুল। আমাদের নামাজ পড়ার একটা সিস্টেম আছে, সিস্টেমে মাথা ফেরাতে হয়। আমাদের প্রফেটের যদি স্পন্ডিলাইটিস ডিজিজ থাকত, তাহলে তিনি পুরো শরীর ফেরাতেন, উনি তো তা করেন না। তার এই ডিজিজ ছিল না, তিনি যেটা করতেন তা শ্রদ্ধার জায়গা থেকে করতেন। তারপর আমি তাকে বললাম, আমি কিন্তু ঈসা (আ.) সম্পর্কে এজাতীয় কথা বলি নি। তিনি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং বললেন, তোমার লজিক খুব পরিষ্কার, আসলেই তো তোমরা নামাজের সময় দুই দিকে মাথা ফেরাও।
>
> [শিলালিপি (*দৈনিক কালের কণ্ঠ*), ২৭ জুলাই ২০১২]

এখানে দেখা যাচ্ছে, কোনো অবস্থাতেই তিনি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে এতটুকু ছাড় দেন নি। বরং সাহসিকতার সঙ্গে তা মোকাবিলা করেছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে তিনি মহান আল্লাহর কাছেই শোকরিয়া করে বলেছেন, 'তখন গড আমাকে হেল্প করল'।

এরকম পরিস্থিতি তাঁকে প্রায়ই মোকাবিলা করতে হতো, বোঝা যায় তাঁর কাহিনি পড়ে। ইসলামের ব্যাপারে কারও খোঁচা বা আঘাতকে তাঁর যুক্তিবাদী মন কখনেই মেনে নিতে পারত না। আরেকটি ঘটনা উদ্ধৃত করে তিনি বলছেন,

> আরেকবার এভাবেই আমি জয়ী হয়েছিলাম নিউইয়র্কে। সেখানে আমাকে একজন বলল, তোমরা তোমাদের মেয়েদের বোরকার ভেতর ঢুকিয়ে হিজাব-টিজাব পরিয়ে ছেড়ে দিয়েছ, সভ্য জাতি হিসেবে নিজেদের তৈরি করতে পারো নি। আমি বললাম, তোমরা যখন তোমাদের মেয়েগুলোকে হিজাব পরিয়ে বাইরে পাঠাও তাদের অত্যন্ত সম্মান করো। আর আমাদের মেয়েগুলো হিজাব পরলে এত রাগ করো কেন ? সে রেগে গেল—আমরা আমাদের মেয়েদের হিজাব পরিয়ে পাঠাই মানে! আমি বললাম, কেন, তোমাদের নানদের দিকে তাকিয়ে দেখো। তাদের ড্রেস আর আমাদের হিজাব পরা মেয়েদের ড্রেসের মধ্যে কোনো বেশকম আছে ? তাকে একমত হতে হলো যে, নানদের ড্রেসের সঙ্গে হিজাব পরা মেয়েদের ড্রেসের কোনো পার্থক্য নেই।
>
> [শিলালিপি (*দৈনিক কালের কণ্ঠ*), ২৭ জুলাই ২০১২]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর আস্তিক্যবাদী মন এখানেই থেমে থাকে নি। তিনি যত জায়গায় পেরেছেন একটা নামাজঘর বানিয়েছেন যাতে প্রার্থনা করাটা সহজ হয়। তাঁর সরল মন তাঁকে সতত একাজ করতে উৎসাহ জোগাতো। তবে এর একটা পটভূমিও তিনি বর্ণনা করেছেন :

> নামাজঘর করার চিন্তাটা ধর্মীয় ভাব থেকে যতটা না এসেছে, তার চেয়ে বেশি এসেছে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের বই পড়ে। তাঁদের বইয়ে দেখি তাঁদের একটা ঠাকুরঘর আছে, পূজাঘর আছে। তাঁরা প্রতিটি বাড়িতে একটা অংশ আলাদা করে রাখেন উপাসনার জন্য। এই কাজটা আমরা করি না। আমাদের প্রার্থনার জন্য আলাদা জায়গা রাখি না। নামাজঘর বানাই না। আমি বানাতে চেয়েছি। আর নুহাশপল্লীতে আমি নামাজের জায়গাটা করেছি আমার মায়ের জন্য। একটা খোলা মাঠ, লোকজন নেই, একটা গাছের নিচে বসে নামাজ পড়তে হয়তো বা তাঁর ভালো লাগবে—একথা মনে করেই শ্বেতপাথর বসিয়ে একটা জায়গা আলাদা করে দিয়েছি।
>
> [শিলালিপি (*দৈনিক কালের কণ্ঠ*), ২১ অক্টোবর ২০১১]

সমকালীন বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে কোনো লেখক-শিল্পীর আস্তিক্যবাদী অবস্থানের এমন সহজ-সরল, অথচ দৃঢ় ও ঋজু উত্তর বিরল।

বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবস্থানটি নানা কারণেই তুলনারহিত এক আসনে গ্রথিত হয়ে থাকবে। এটা তাঁর লেখনি শক্তি, শিল্পনৈপুণ্য, সরল অথচ ঋজু এক গদ্য পরিচালনার জন্য যেমন, তেমনি আস্তিক্যবাদী অথচ সৃজনশীল এক ধর্মচেতনার জন্যও। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর আগমন ছিল অপেক্ষিত, তিনি তাঁর সৃষ্টিশীলতার এই উদ্যমকে পূর্ণোদ্যমে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর মহাযাত্রাও তাঁকে মহিমান্বিত করেছে স্রষ্টার প্রতি তাঁর আবেগকে পূর্ণতা দান করেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাকে হারালাম

রাবেয়া খাতুন

হুমায়ূনের সঙ্গে প্রথম দেখা কবে কোথায় হয়েছিল আজ আর মনে নেই। তবে আশির দশকের শুরু বা সত্তর দশকের শেষ দিকে সম্ভবত। জাতীয় চলচ্চিত্রের পুরস্কারের জন্য সদস্য কমিটির আমরা ক'জন। সবাই বলতে গেলে সিনেমার সঙ্গে সংযুক্ত মানুষ। বাইরে থেকে এসেছে বাংলা একাডেমীর তখনকার মহাপরিচালক কবি আবু হেনা মোস্তফা কামাল, হুমায়ূন আহমেদ ও আমি। প্রতিদিন একটা করে ছবি দেখতে হতো একটানা এক মাস।

কাজ করতে গিয়ে দেখলাম নিজেদেরও অজান্তে কেমন করে যেন একটি দল দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। আমাদের দিকে যেন আউট সাইডার, আউট সাইডার ইশারা-ইঙ্গিত। সেটা আমরা খেয়াল করতাম এমন নয়। ছবি দেখতে দেখতে হেনা একটু-আধটু বিভেদ বিষয় নিয়ে সবার মধ্যে মন্তব্য ঝারত।

দলপ্রধান সৈয়দ আলী আহসান নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতেন। হুমায়ূন সম্পর্কে সব সময় বলতেন 'লারনেডম্যান'।

হেনা সপ্তাহের চারদিনই অনুপস্থিত থাকত। বিরক্তিও প্রকাশ করত মাঝে মাঝে—এসব অখাদ্য রোজ রোজ গিলতে কেন যে আসি!

দেশীয় এই সময়ের ছবি, আইডিয়া তো কিছু পাওয়া যাচ্ছে।

হুমায়ূনের কথায় কখনো শোনা যেত এমনি মন্তব্য। এ ব্যাপারে রাবেয়া আপার অভিজ্ঞতা বেশি। যিনি বিদেশি সিনেমা, এখনকার সিনেমার দর্শক প্রথম প্রহর থেকে।

আদি থেকে সব দেখেছি বলতে পারব না। তবে কোয়ালিটি সম্পর্কে বলতে পারব।

আমি, হুমায়ূন এমনিতে স্বল্পভাষী। আমরা বসতামও পাশাপাশি। হেনা, আমি ও হুমায়ূন।

যেদিন হেনা আসত তিনজনের বেশ জমো। ও না এলে আমি হুমায়ূনের সঙ্গে ছবি সম্পর্কে মতবিনিময় করতাম। মজার বিষয়, হুমায়ূনও মাঝে মাঝে আসত না।

আমি আবার কোনো ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ কাজে থাকতাম না। সপ্তাহে সব দিন যাওয়া চাই। দেখতে আনন্দের নয় তার ভেতর থেকেই যেটুকু ভালোর সন্ধান। পরদিন ও এলে তা নিয়ে আলোচনা। হেনা হাসতে হাসতে কাত, সব দেখলে চোখ দুটো আর কাজে লাগাতে পারব না। আমার ভরসা তোমরাই। একটাই তো মাস, দেখতে দেখতে চলে যাবে। আমিও অবশ্যি অনুপস্থিত থাকি মাঝে মাঝে। এতে বাঁকা চোখদের জোর বাড়ছে।

আমরা তো নিরপেক্ষ। কোনো ছবির দিকে আঙুল তুলে বসে নেই।

তবু আপনারা এলে ঠিক বিচার পাচ্ছে ছবি। এ ব্যাপারে আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকি।

সৈয়দ আলী আহসান হাসতে হাসতে (সম্ভবত) অপর পক্ষের কান বাঁচিয়ে কথাটা বলতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক, দুই করে কেটে গেল একমাস। হুমায়ূন ও আমি শরৎচন্দ্রের *পরিণীতার* পক্ষে। ছবি তৈরি, নায়ক-নায়িকার অভিনয় ভালো। অন্যান্য দিক দিয়ে খুব একটা এগুই নি আমরা। হেনা শেষের দিকে প্রায় নিয়মিত আসত। সেও আমাদের সঙ্গে একমত হলো।

কিন্তু ও পক্ষ থেকে বলা হলো, বেস্ট ছবি হবে শরৎচন্দ্রের *শুভদা* এবং নায়ক-নায়িকা গোলাম মুস্তাফা ও আনোয়ারা।

আলী আহসান সাহেব দু'দলকেই সমর্থন করছেন। হেনা বলল, আপনারাই যান। আমি বললাম, তুমি গেলে আর একটু জোরালো হতে পারত আমাদের যুক্তিগুলো। হেনা ম্লান হেসে বলল, কেমন অপরাধবোধ কাজ করছে একটুও তাই।

বাকি কথাটা শেষ করল হুমায়ূন, তাই যেতে চাইছেন না! ঠিক আছে। আমরাই যাই। আমি বললাম, আর কিছু নয় চলচ্চিত্রের সবকটা আমি দেখেছি। *পরিণীতা* এর মধ্যে অবশ্য শ্রেষ্ঠ। আমি সৈয়দ আলী আহসানকেও তেমনি বললাম। হুমায়ূনকে আস্তে করে বললাম, এবার যুক্তিগুলো স্পষ্ট করে তুমি বলো।

নিশ্চয়।

হুমায়ূন আস্তেআস্তে একটার পর একটার জট ভাঙতে শুরু করল। পর্দার পাত্রপাত্রী এবং সেকালের জন্য কঠিন বাস্তবভিত্তিক কাহিনি ও যেন কথার জাদুতে চোখের ওপর টেনে নিয়ে এল; নায়ক-নায়িকা ললিতা এবং শেখর এসে সামনে দাঁড়াল এবং সেই সঙ্গে সামাজিক অবস্থাও।

সবদিক থেকে আমরা সঠিক থাকলেও দেখা গেল প্রাইজ পেয়েছে দুই জোড়া নায়ক-নায়িকা। দল না করেও দলাদলি করা যায়। এক হাতেও তালি বাজে।

আগে কি পরে মনে নেই আমরা আবার যুক্ত হলাম বাংলা একাডেমীর সদস্য পদে। একদল বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে। মহাপরিচালক হারুন-উর-রশীদ। সতের কি আঠারজন সদস্যের মাঝে হুমায়ূন আর আমি কম কথা বলি। তিন বছর একটানা নয়, থেমে থেমে বৈঠক বসত। আমরা ইলেকশনে আসি নি। এসে আমরাই সেটা দিলাম। এই নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক আমাদের নিয়ে নানারকম মন্তব্য করতেন। অন্যরা সরাসরি কেউ কিছু বলতেন না। কিন্তু বিষয়টা ভালো চোখেও কেউ দেখতেন না। প্রফেসর শমসের আলী সবদিন আসতেন না। প্রথম যেদিন এলেন সোজা দাঁড়িয়ে যুক্তি তর্কে অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিলেন। তারপর থেকে সেই ভদ্রলোক আর গলা তোলেন নি।

হুমায়ূন বলেছিল, এসব লোক ইলেকটেড হয়ে আসে। আননেসেসারি গণ্ডগোলের জন্য। ঝগড়া এরা পছন্দ করে। শান্তির ব্যাপার অশান্ত করে রাখে মানুষকে।

এই তিন বছরে আমি তিনমাস থাকি নি অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার জন্য। তবে হুমায়ূনের পাঠানো বই পাঠের মাধ্যমে তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

হুমায়ূন এমনিতে স্বল্পবাক মানুষ। তবে প্রিয়জনদের মাঝে বোঝা যেত কতটা মাতিয়ে রাখা লোক। এবং কতটা প্রাণবন্ত।

তার বাসায় বিভিন্ন সময় যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। কোনো ছবি তৈরির আগে সে ডেকে পাঠাত আমাদের। শৃঙ্খলার সঙ্গে সবাইকে সব ব্যাপারে বোঝাত। তারপর টেবিল ভর্তি শাহিখানা।

এই রকমারি বৈঠকগুলো বসত সাধারণত তার শোবার ঘরে। অতবড় গুণী ও সৌখিন মানুষ, তার শোবার ঘরটা যেন প্রশ্নের মতো। বড়ঘর। একদিকে শোবার খাট। তারপর কাঠের মেঝে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন সেই মেঝেতে বসে টুলের ওপর লিখত। ঘরে থাকার মধ্যে বড় একটা টিভি, কিছু বই আর অডিও, ভিডিও ক্যাসেট।

বাইরের ঘরে যখন কিছু নিয়ে আলোচনা চলত, তখন আসর জমজমাট।

তার বাড়ির নানান অনুষ্ঠানে ছোট ছোট আমন্ত্রণপত্র আসত। সেগুলো ছেলেদের জন্মদিনেই বেশি। হুমায়ূনের নিজের লেখা আরও ছোট ছোট চিঠি আসত। একটা থেকে আরেকটা সম্পূর্ণ আলাদা। বিষয় হয়তো এক। কিন্তু ভাষা বিচিত্র। সেগুলো এতই চিত্তাকর্ষক হতো, আমার কাছে এলেই বাড়ির তরুণরা নিয়ে যেত। জমাতো।

হুমায়ূন ব্যবহারেও মিষ্টি ভাষী এবং স্পষ্টবাদী ছিল। তার কথার ধরনই ছিল আলাদা। একেবারে স্পষ্ট। সেই তার বৈশিষ্ট্য। এমনিতে ছোটখাটো মানুষ। কিন্তু তার মেলামেশা এবং কথাবার্তা ছিল ভীষণ আকর্ষক। সাধারণত একটি ব্যাপারে তাকে মনে হতো বিলাসী। তা হলো গায়ে খুব দামি গেঞ্জি।

হুমায়ূন তার লেখা আমাকে যে বইটি উৎসর্গ করেছে তাতে লিখল : 'তিনি সব সময় হাসেন। যতবার তাকে দেখেছি হাসিমুখে দেখেছি। আমার জানতে ইচ্ছে করে জীবনের কঠিন দুঃসময়ে তিনি যখন কলম হাতে নিয়েছিলেন তখনও কি তাঁর মুখে হাসি ছিল ?'

ফোনে কথা হলো এ ব্যাপারে। আমি বললাম, জবাবে তোমাকে বই উৎসর্গ করেই দিব।

তাই দিয়েছিলাম। আমার 'সমুদ্র বন ও প্রণয়পর্ব' বইয়ের উৎসর্গপত্রে লিখেছিলাম : 'হুমায়ূন আহমেদকে, তোমার উৎসর্গিত বইতে প্রশ্ন রেখেছিলে, কঠিন দুঃসময়েও কি মুখে হাসি ছিল ? ছিল। এখনো আছে। কারণ সম্ভবত পরিবারের অভ্যাস। কিংবা জীবন যখন নানাদিক থেকে আক্রান্ত, তখন হাসিই বোধহয় আত্মবিশ্বাসের কাজ করে।'

এই তো গত রোজার শুরু দিকে আমি অসুস্থ ছিলাম। হঠাৎ এক বিকেলে *অন্যদিন*-এর সম্পাদক মাজহারের সঙ্গে হুমায়ূন এসে হাজির। ওর কাছে গোমরা মুখ করে থাকা যায় না। যতক্ষণ থাকল ততক্ষণ শুধু কথায় মাতিয়ে রাখল। যাওয়ার আগে বলল, শুয়ে থাকবেন কী! উঠে বসুন। সামনে ঈদ। কলম ধরুন।

তখনও ওর অসুখের খবর জানা যায় নি। অসুখের কথা শুনলাম। মনে হলো এ রোগ ভয়ঙ্কর সন্দেহ নেই। আমার কিছু আত্মীয়স্বজন ভালো হয়ে গেছে। বিশ্বাস ছিল হুমায়ূনও তেমনি আবার ভালো হবে, উঠে দাঁড়াবে। ওর মতো প্রাণবন্ত শিল্পীরা আত্মবিশ্বাসে সেরে ওঠে। ওর মধ্যে প্রচুর আত্মবিশ্বাস ছিল। বিশ্বাস করতে এখন মন চায় না আমাকে অসুস্থতা থেকে উঠতে বলে সে-ই বিছানায় পড়ে গেল।

চিকিৎসার মাঝখানে দেশে ফিরে নুহাশপল্লীতে যখন এসেছিল আমি যেতে পারি নি। কিন্তু কেমন বিশ্বাস ছিল ও আবার ফিরে আসবে।

মানুষের মন কেমন ছলনাময়। কিংবা মানুষ চিন্তার গভীরে যেতে পারে না অথবা যেতে চায় না। তবে নিয়তি তার নিজের কাজ করেই যায়। আমরা নিরুপায় দর্শকমাত্র।

আমরা হুমায়ূনকে হারিয়েছি। কিন্তু হারাই নি তার মূল্যবান স্মৃতি এবং বিশাল সাহিত্যকর্মকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন-বহুজন হুমায়ূন

রিজিয়া রহমান

একবার হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে আমাকে লিখতে হয়েছিল, নব্বই দশকের প্রথমদিকে। এতদিন পরে আবার কলম ধরতে হলো। হুমায়ূনের জন্যই। শেষের এই কলম ধরাটা নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক, সেইসঙ্গে গৌরবেরও বটে, অসময়ে চলে যাওয়া একজন প্রিয়পাত্রের অসাধারণ সৃজনক্ষমতার কথা বলবার সুযোগটি কম কথা নয়।

গত প্রায় এক দশকে হুমায়ূনের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ বা ফোনে কথা বোধহয় কমই হয়েছে। একটা সময় ছিল, যখন হুমায়ূনের সঙ্গে মাঝে মাঝেই ফোনে কথা হতো আমার। অসুস্থ আমি যখন একবার হাসপাতালে শয্যাশায়ী, গুলতেকিনসহ হুমায়ূন চলে এসেছিল আমাকে দেখতে, তখন সে খুবই ব্যস্ত লেখক এবং নাট্যকার, তবুও। শেষ দেখাটিও হয় প্রায় সাত-আট বছর আগে, ও তখন হার্ট অপারেশনের পরে ফিরেছে, আমাকে দেখে ওর প্রথম কথাটি ছিল—রিজিয়া আপা, আপনাকে আমার নুহাশপল্লীতে নিয়ে যাব। আপনাকে যেতেই হবে। কিন্তু এরপর ওর পারিবারিক জীবনে জটিলতা নেমে আসে, সেই সময়ে ফোনেই জানি না কেন, বলেছিল—রিজিয়া আপা, সাত দিনের মধ্যেই আমি আপনার বাসায় আসছি, সব বলব আপনাকে।

সাত দিনের মধ্যে সে আসতে পারে নি, তার পরেও নয়, আর কোনোদিন সে আসে নি বা আসতে পারে নি। জীবনে তখন তার বড় একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে।

আমিও আর কখনো ওকে ফোন করি নি। তবু নানাজনের কাছে শুনতাম, হুমায়ূন বলে, রিজিয়া আপাকে নুহাশপল্লীতে আনবই একবার। আপাকে বড়বোনের মতো সম্মান করি। পুরনো এই কথাগুলো লিখতে গিয়ে দু'চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হচ্ছে বারবার। বারবারই মনে হচ্ছে কেন ওকে একবার ফোন করে বললাম না—হুমায়ূন, তোমার নুহাশপল্লী দেখতে আসব আমি। (অবশ্য আমি না গেলেও হয়তো কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হতো না।) অকপটে স্বীকার করি, হুমায়ূনের জন্য আমার হৃদয়ে স্নেহের ঘাটতি কখনো হয় নি, এখনো হয় না।

আমাদের সাহিত্যজগতে আমার অনুজ কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক রয়েছেন, যারা আমার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র, হুমায়ূনও ছিল তাদেরই একজন। ছোট ভাই-বোনের মতোই ওদের স্নেহ দিয়েছি। ওরাও আমাকে বড় বোনের শ্রদ্ধা-সম্মান দিতে কখনো কার্পণ্য করে নি। তবে এদের প্রত্যেকের প্রতিভা ও অবদানকে অবশ্যই আমি সম্মান করি ও গুরুত্ব দিই।

হুমায়ূনের অসময়ে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রয়াণের পর পত্র-পত্রিকায় তার সম্পর্কে অজস্র লেখা প্রকাশিত হচ্ছে, টিভি চ্যানেলগুলোতেও তার সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে প্রচুর, আমার এই লেখাটি তার কলেবর বৃদ্ধির জন্য নিশ্চয়ই নয়, বরং এটি লেখকের সঙ্গে লেখকের সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ এবং সেইসঙ্গে এ দেশের একজন জনপ্রিয় বহুল আলোচিত লেখকের সাহিত্য অবদানের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন প্রচেষ্টা মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি লেখক হুমায়ূনকেই চিনতাম, চিনতাম তার বিনয়ী ব্যক্তিত্ব ও লেখার কারণেই। স্বীকার করি, নাট্যকার বা চলচ্চিত্র নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদ আমার ভালো করে চেনা নয়।

হুমায়ূনের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় সম্ভবত সত্তর দশকের দিকে। ততদিনে সে হয়ে উঠেছে *নন্দিত নরকে* ও *শঙ্খনীল কারাগার*-এর লেখক। বই দুটির কথা আমাকে প্রথম বলেছিল শাহরিয়ার কবির, তার বক্তব্য ছিল 'আপা, হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস দুটো পড়বেন, অসাধারণ লেখা।'

বাংলাদেশ বেতারের এক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গিয়ে প্রযোজক-কবি আবু তাহেরের কাছেই পেয়ে গেলাম হুমায়ূনের উপন্যাস। তাহেরই দিল পড়তে, বলল, এমন লেখা বাংলা সাহিত্যে এর আগে কেউ লেখেন নি।

বাড়িতে ফিরেই পড়ে ফেললাম উপন্যাস দুটি। পড়া শেষে আবেগে মুগ্ধতায় এবং ভালো লাগায় আমি স্তব্ধ। লেখকের শিল্পিত বেদনাবোধ আমাকে আশ্চর্য বিষণ্নতায় আচ্ছন্ন করল।

মনে হয়েছিল, যেন চমৎকার একটি কবিতা পড়ে উঠলাম।

হুমায়ূনের আত্মপ্রকাশের আগে আমাদের সাহিত্য অঙ্গনটি হৃতদরিদ্র ছিল—এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন সাহিত্যের দিকেই যে আমরা ভিক্ষার হাত পেতে বসে ছিলাম, এমনও নয়।

বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের পর থেকেই বাংলাদেশের সাহিত্য নিজের ঘরটি ঘুছিয়ে নিতে আত্মনিয়োগ করেছিল। '৪৭-এর পর থেকে পঞ্চাশের দশক অবধি এ দেশের সাহিত্যিকরা অবিভক্ত বাংলা সাহিত্যের প্রভাবমুক্ত হয়ে ওঠেন নি। কিন্তু ষাটের দশকে এসেই এ দেশের সাহিত্যের গতিপথ একেবারেই ভিন্নমুখী হলো। নিবেদিত হলো নিজ দেশ, পরিবেশ, প্রকৃতি ও নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-ইতিহাস এবং রাজনীতি সম্পৃক্ততায়। এদেশের আঞ্চলিক মানুষেরা তাদের সংগ্রামী চেতনাবোধ নিয়ে হয়ে উঠল সাহিত্যের মানুষ।

কারোই অবিদিত নেই যে, সাহিত্যের বাহন হচ্ছে ভাষা। আমাদের বাংলা সাহিত্যের সেই বাহনটি পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রযন্ত্রটির জন্মের পর থেকেই নিগৃহীত হচ্ছিল। তাকে শবাগারে পাঠাবার সব রকম ষড়যন্ত্রই অব্যাহত ছিল। বাহান্নর ভাষার লড়াইয়ে প্রাণে বেঁচে গেলেও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ অবধি সে ছিল প্রায় পরাধীন। তাকে শৃঙ্খলমুক্ত করবার জন্য বাহান্নর পর থেকেই কলম নামক অস্ত্রটিকে হাতে তুলে নিয়েছিলেন সে সময়ের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সাহিত্যিকেরা। বিমুখ তাঁরা আমাদের করেন নি। আমাদের জাতীয়তা সৃষ্টির প্রধান উপাদান বাংলা ভাষাকে যেমন তাঁরা সম্মানের আসনে তুলে এনেছিলেন, তেমনি বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্যের ভিতটি দক্ষ হাতে গড়ে দিয়েছিলেন। আমরা যারা ষাটের দশকে এই মজবুত ভিতের ওপরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, সাহিত্যসৃষ্টিকে নিয়েছিলাম বাঙালির আত্মপরিচয় বা 'আইডেনটিটি' প্রকাশের উচ্চকণ্ঠ দাবির মাধ্যম হিসেবে। বলা বাহুল্য, ষাটের দশক বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এক গৌরবের অধ্যায়, এরই প্রভাবে জাতীয়তার আত্মপ্রকাশে, স্বাধীনতার স্পৃহায়, আত্মপরিচয়ের দৃঢ়তায় জেগে উঠেছিল মধ্যবিত্ত। গড়ে উঠেছিল আত্মসচেতন, বুদ্ধিদীপ্ত, দেশপ্রেমিক পাঠক তথা নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বাহান্ন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত, রাজনৈতিক চিন্তাধারা, অর্থনৈতিক ভাবনা ও জাতীয় স্বার্থের জাগরণে সাহিত্য তার যথার্থ ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হয়েছিল। স্বাধীনতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তরকালে আমাদের সাহিত্যের সমৃদ্ধিই পাঠক আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়। এ সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য আর এ দেশের একক সাহিত্য হিসেবে বিবেচিত হয় নি।

মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল, শীর্ষেন্দু, সমরেশ বসু, সমরেশ মজুমদার, শংকর প্রমুখের লেখা এ দেশে বহুল পঠিত হলেও এর বিপরীতে তখন বাংলাদেশের সাহিত্য উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পাঠক সৃষ্টি করে ফেলেছে। তৈরি করে ফেলেছে নিজস্ব সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আবির্ভূত লেখকেরা যখন নিজস্ব পাঠকচক্র সৃষ্টি করে ফেলেছেন এবং বাংলাদেশের সাহিত্যের যখন বলিষ্ঠ ধারা সৃষ্টি হয়ে গেছে, তখনই (সত্তর দশকের শুরুতে) আবির্ভূত হন হুমায়ূন আহমেদ, সাহিত্যের মজবুত ভিতের ওপরে এসে দাঁড়ালেন ব্যতিক্রমী ধারা নিয়ে। (তখনো তার জনপ্রিয় ধারাটি উন্মোচিত করেন নি তিনি।) হুমায়ূনের সাহিত্য সৃষ্টির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল যে দুটি উপন্যাস নিয়ে ('নন্দিত নরকে' ও 'শঙ্খনীল কারাগার'), বহুল প্রশংসিত ও আলোচিত হলেও উপন্যাস দুটি সম্পর্কে আমার উপলব্ধিটি বিবৃত করা প্রয়োজন বোধ করি।

দুটি উপন্যাসের বিষয় একান্তই মধ্যবিত্ত পারিবারিক কাহিনি। এমন বিষয় নিয়ে আগেও যে লেখা হয় নি, তা নয়। তবুও কেন বই দুটি পাঠকের মনে গভীর দাগ কাটতে সমর্থ হয়েছে, ভেবে দেখতে হয় বৈকি।

AMARBOI.COM

আমার মনে হয়, সবচেয়ে আকর্ষণীয় হচ্ছে এর ভাষা। এমন কাটছাঁট শাণিত ভাষার এমন শৈল্পিক ব্যবহার এর আগে আমরা কমই পেয়েছি। (যদিও ভাষার মাধুর্য ও চিত্রকল্পে আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্প জাদুকরী মোহ বিস্তার করে) ভাষার ব্যবহার ও কাহিনি বর্ণনায় হুমায়ূন আহমেদের কলমের আশ্চর্য সংযম তার দুটি উপন্যাসেই অপূর্ব শিল্পমাত্রা দিয়েছে। সর্বোপরি উপন্যাসের চরিত্রগুলো আমাদের চেনা মানুষ হলেও ব্যতিক্রমী। আচার-আচরণ ভাবনা-চিন্তা নিয়ে তারা একেবারেই অন্যরকম নতুন মানুষ। উপন্যাসের সংলাপ সম্পূর্ণ নতুনত্ব বহন করে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এসবই ছিল হুমায়ূন আহমেদের পাঠক আকর্ষণের চুম্বকী গুণাবলি।

ক্রমে উল্লেখ্য যে, ভাষার শিল্পিত ব্যবহার আমাদের আর একজন কথাসাহিত্যিককে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে, তিনি মাহমুদুল হক। ভাষার মোহনীয় চমক, ভাষাকে প্রয়োজনমতো ভেঙেচুরে তৈরি করে নেওয়া তাঁর অসাধারণ কাহিনি বিন্যাসকে আরও অসাধারণত্ব দিয়েছে। নিভৃতে আত্মগোপনকারী বিরল ব্যক্তিত্বের লেখক মাহমুদুল হকের সাহিত্যকর্ম বাংলাদেশের সাহিত্যকে ভিন্নমাত্রা দান করেছে অস্বীকার করা যায় না।

বাংলা সাহিত্যের পাঠক ও বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ মাহমুদুল হকের সাহিত্যকর্মের যথার্থ মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়েছেন বলেই মনে হয়। তাঁর নিঃশব্দে চিরপ্রয়াণটিও ছিল বেদনাদায়ক। বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে যখন তাঁর মরদেহ আনা হয়, পাঠকের ঢল দূরে থাক, অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি বা নামি লেখকও তাঁকে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে অনুপস্থিত ছিলেন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও ব্যাপারটি নতুন কিছু ছিল না। পৃথিবীতে বহু কালজয়ী লেখকেরও এমন অবহেলিত মৃত্যুর ইতিহাস রয়েছে।

এদিক দিয়ে হুমায়ূন আহমেদ নিঃসন্দেহে মহা ভাগ্যবান। জীবিত ও মৃত—দুই অবস্থাতেই তিনি তার প্রাপ্য সম্মান আদায় করে নিয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূনের *নন্দিত নরকে* ও *শঙ্খনীল কারাগার* উপন্যাসের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর রোমান্টিক কাব্যময়তা। এতকাল বাংলা সাহিত্যে (উভয় বঙ্গের) যে মধ্যবিত্ত জীবন আমরা পেয়েছি, সেখানে জীবন ধারণের টানাপোড়েন, উচ্চ মার্গীয় মূল্যবোধ এবং ন্যায়ভিত্তিক আদর্শের জন্য সংগ্রামকেই আমরা দেখেছি, দেখেছি হতাশা আর ভাঙনের সঙ্গে যুদ্ধ। বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল এবং কল্লোলযুগীয় সাহিত্যে বাঙালি মধ্যবিত্তকে একটি গণ্ডির মধ্যেই অবস্থিত রেখেছিলেন বাংলা কথাসাহিত্যিকেরা। মধ্যবিত্ত মানসে যে সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যবোধের চর্চা, সুখ-দুঃখ বা জীবনের অপ্রতিরোধ্য দহনের মাঝেও শিল্পিত বেদনাবোধের নিয়ত আনাগোনা এবং আত্মবিস্ফোরণের যে ব্যাকুলতা সেটা আমরা সম্ভবত সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলাম প্রথমে মাহমুদুল হক ও পরে হুমায়ূন আহমেদের মাঝে—তাঁর *নন্দিত নরকে* ও *শঙ্খনীল কারাগার*-এ। তবে মাহমুদুল হক যেখানে অসংকোচ প্রকাশে দুর্বার, হুমায়ূন সেখানে মৃদু লয়ের।

নন্দিত নরকে ও *শঙ্খনীল কারাগার*-এর মুগ্ধ পাঠক আমি তখনো ব্যক্তি হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি নি। শুনেছি, তিনি খুবই লাজুক মানুষ। তাঁকে নিয়ে অনেক মজার গল্প পাঠিকা মহলে প্রচলিত ছিল। বেশ অনেক বছর আগেও হুমায়ূন আহমেদের এক পাঠিকা (যিনি বয়সে তরুণী এবং হুমায়ূনের লেখার ভক্ত) আমাকে জিজ্ঞেস করে বসলেন—আপনাদের হুমায়ূন আহমেদ নাকি খুব লাজুক আর নার্ভাস ? স্টেজে কথা বলতে গেলে নাকি খুব নার্ভাস হয়ে যান, তার পকেট থেকে কলম পড়ে যায়, কলম তুলতে গেলে নোটবই, পার্স, পড়ে যায় ? কোনো সমাবেশে বক্তব্য রাখবার সময় বিব্রত, নার্ভাস হুমায়ূন আহমেদের কলম, পার্স, নোটবই পকেট থেকে পড়ে যাওয়ার ঘটনা আমার জানা ছিল না। তবু বুঝে নিয়েছিলাম, লেখক হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে তার ভক্ত-পাঠিকাদের মুগ্ধ কৌতূহল ও কল্পকাহিনি তৈরি করার শেষ নেই। নিঃসন্দেহে সেটা ছিল জনপ্রিয় হতে যাওয়া একজন লেখকেরই প্রাপ্য।

হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় এর কিছুদিন পরেই। চীন দেশ থেকে আসা কয়েকজন লেখকের সম্মানে লেখক শিবির একটি নৈশভোজের আয়োজন করে। সেখানে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম আমি। হুমায়ূনও সেখানে ছিলেন। ওকে তখন বললাম, তোমার বই পড়বার পর থেকেই তোমাকে দেখবার দারুণ ইচ্ছে ছিল। ইচ্ছেটা পূরণ হলো আজ। এত অল্প বয়সে এমন সাংঘাতিক বই তুমি কেমন করে লিখলে ? ('তুমি' সম্বোধনই করেছিলাম ওকে। ছোটখাটো মিষ্টি চেহারার ছেলেটিকে গুরুগম্ভীর অধ্যাপক বা বিজ্ঞ ব্যক্তিত্বের লেখক বলে মনেই হয় নি।)

আমার প্রশ্নের জবাবে কিছুই বলতে পারে নি হুমায়ূন, শুধু হাসছিল, অপ্রতিভ হাসি।

চলে আসবার সময় হুমায়ূন যে কখন আমাকে অনুসরণ করেছে, বুঝতেই পারি নি, গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি পেছন থেকে ডাকল—রিজিয়া আপা। মুখ ফেরালাম। জ্যোৎস্না ছিল বেশ হালকা। কুয়াশার শীতের রাতে উলের জ্যাকেট পরা হুমায়ূনকে দেখাচ্ছিল কৈশোর উত্তীর্ণ সদ্য তরুণের মতো। খুব বিনীত ভঙ্গিতে কুণ্ঠিত স্বরে হুমায়ূন বলল, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার ছিল! অবাকই হলাম, খাবার টেবিলে হুমায়ূন আমার সঙ্গেই কেবল নয়, অন্যদের সঙ্গেও কথা খুব কমই বলেছে। ধরে নিয়েছিলাম, নবীন এই লেখক সম্ভবত মিতবাক মানুষ। (পরে অবশ্য জানতে বাকি থাকে নি, ক্ষেত্রবিশেষে হুমায়ূন যথেষ্ট কথা বলতে পারে এবং রসিকতা করতেও পটু) বিস্মিতই হয়েছিলাম, জিজ্ঞেস করলাম—কী কথা ? কী যে হলো হুমায়ূনের বুঝলাম না, খুব লাজুক অভিমানী কিশোরের মতো মাথা ঝাকাল—থাক, পরে বলব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(জানি না কেন, সেই শীতের রাতে কিশোর প্রায় ছেলেটির প্রতি আশ্চর্য মমত্ববোধ আমাকে আপ্লুত করেছিল!)

হেসে ফেললাম—এখন বলতে অসুবিধা আছে ?

সংকোচের হাসিতে হুমায়ূন বলল, পরেই বলব আপা!

কী কথা বলতে চেয়েছিল ছোটখাটো লাজুক সেই ছেলেটি, পরে আর জিজ্ঞেস করি নি কখনো।

অনেক বছর পরে হুমায়ূন আহমেদ যখন বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক এবং জনপ্রিয়তম টিভি নাট্যকার, আমাকে তার না-বলা কথাটি বোধহয় জানতে পেরেছিলাম।

বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে, আমি সভাপতি নাকি প্রধান অতিথির আসনে বসেছিলাম। প্রধান বক্তা লেখিকা মকবুলা মঞ্জুর বাংলাদেশের মহিলাদের লেখা নিয়ে বেশ বড় একটি প্রবন্ধ পাঠক করছিলেন। দর্শকদের আসনের প্রথম সারিতেই ছিলেন আমন্ত্রিত অতিথি হুমায়ূন আহমেদ। স্টেজে বসেই দেখতে পাচ্ছিলাম, তাকে ঘিরে অটোগ্রাফপ্রার্থী তরুণী-কিশোরী ভক্ত পাঠক-পাঠিকাদের ভিড়। প্রিয় লেখকের সঙ্গে কথা বলতে পারার উচ্ছ্বাস-উত্তেজনায় অনেকের মুখই গোলাপি বর্ণ ধারণ করেছে, ইংরেজিতে যাকে বলে 'ব্লাশ' করা। বেশ উপভোগ করছিলাম সেটা। স্টেজে প্রবন্ধ পাঠ শেষ হতেই উঠে দাঁড়ালেন কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ। তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রবন্ধ পাঠিকা মকবুলা মঞ্জুরকে। অনেক আগের কথা, তবু যতদূর মনে পড়ে, মহিলা সাহিত্যিকদের জীবন-অভিজ্ঞতার অভাব ও দুর্বলতাই ছিল হুমায়ূনের আক্রমণের প্রতিপাদ্য বিষয়। তার একটি বাক্য বেশ মনে আছে, বলেছিলেন, 'লেখিকারা যখন লেখেন, তাদের স্বামীরা নিশ্চয়ই পাশে বসে পাখার বাতাস দেন না।'

মহিলা সমিতির অডিটোরিয়াম ছিল দর্শকে পরিপূর্ণ। সেখানে অনেক নবীন-প্রবীণ লেখিকাই উপস্থিত ছিলেন। বলা বাহুল্য তারা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানটি বাদ-প্রতিবাদে জমজমাট উপভোগ্য হয়ে উঠল। এরই মধ্যে হুমায়ূন আহমেদ বলে বসলেন, যিনি পতিতাদের নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন, তারও ঠিক বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে ? আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, পতিতাপল্লী দূরে থাক, তিনি রাত একটায় ঢাকা শহরের রাজপথে একা হেঁটে বেড়াতে পারবেন না, যা কেবল একজন পুরুষ লেখকই পারে। মৌচাকে ঢিল পড়ল যেন, শুরু হলো হল জুড়ে মহিলাদের হইচই, যেন জেন্ডার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

এই উত্তেজিত সময়ে আরেক আমন্ত্রিত অতিথি বিশিষ্ট সাংবাদিক হেদায়েত হোসেন মোরশেদ উঠে দাঁড়ালেন। হুমায়ূনের মন্তব্যের বিরুদ্ধে পাল্টা মন্তব্য দিতে শুরু করলেন। উঠে দাঁড়ালেন আরও অনেকেই, অনুষ্ঠানটি হয়ে গেল যেন একটি বিতর্ক সভা। আমার জন্য সেটা ছিল রীতিমতো বিব্রতকর পরিস্থিতি। তবু নির্বিকার ভঙ্গিতেই বসে থাকলাম। উদ্ভূত পরিস্থিতির পাশ কাটিয়ে নিজের বক্তব্যটি শেষ করতে পেরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম যেন। হল থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ে দেখলাম এক দঙ্গল মহিলার গলাবাজি দ্বারা আক্রান্ত হুমায়ূন রীতিমতো নাজেহাল। তার দ্রুত কথা বলার ভঙ্গিতে আত্মপক্ষের সমর্থন থাকলেও, তাকে নার্ভাসই দেখাচ্ছে। কুয়াশাচ্ছন্ন এক সন্ধ্যারাতে লাজুক যে নবীন লেখকটি আমার স্নেহভাজন হয়ে গিয়েছিল একদল গলাবাজ মহিলা যোদ্ধাদের মাঝে তাকে বিব্রত হতে দেখে খারাপই লাগছিল। তাকে সমর্থন দেওয়ার কোনো উপায়ই সেই মুহূর্তে আমার ছিল না। ভেবে নিয়েছিলাম, জনপ্রিয়তার জ্বালা অনেক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরদিন সকালেই পেলাম হুমায়ূনের ফোন। রিজিয়া আপা! রাগ করেছেন? কণ্ঠস্বর যেন সেই কিশোর চেহারার তরুণের। হাসলাম—কেন রাগ করব ভাই! কী এমন দোষ করেছ তুমি!

মকবুলা আপাকেও ফোন করেছি, খুব রেগে আছেন, আপনিও রেগে আছেন নিশ্চয়ই।

কী যে বলো! হাসতে থাকি আমি।

না, আপা। কাল আপনাকে অনর্থক আক্রমণ করেছি।

হেসেই বললাম, কোথায়! তুমি তো আমার নামও উচ্চারণ কর নি। তা ছাড়া তুমি যা বলেছ, সবই তো সত্যি, আমি কখনো রাতদুপুরে ঢাকার রাস্তায় একা হাঁটতে পারব না।

হুমায়ূনের কণ্ঠস্বর হয়ে যায় বিভ্রান্ত কিশোরের কণ্ঠ—সবাই যে বলছে, আপনার কাছে আমার মাফ চাওয়া উচিত!

সেদিনই ফোনে হুমায়ূন বলেছিল, রিজিয়া আপা, আপনি আমার বড় বোনের মতো! ছোট ভাইয়ের ভুল নিশ্চয়ই মাফ করবেন। প্রথম দেখা হুমায়ূনের না-বলা প্রশ্নটি ততক্ষণে যেন আমার বোঝা হয়ে গেছে। সম্ভবত ও আমার কাছে জানতে চেয়েছিল, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া কী করে পতিতাদের জীবন নিয়ে উপন্যাস লেখা সম্ভব হয়েছে? পরবর্তীকালে সফল ও জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ নিশ্চয়ই জেনে গেছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়াও অনেক সময় সফল উপন্যাস লেখা সম্ভব। এমন অনেক উপন্যাস তিনি নিজেও লিখেছেন। এর কিছুদিন পরেই হুমায়ূন তার লেখা একটি উপন্যাস আমাকে উৎসর্গ করেছিল।

দুটি চমৎকার উপন্যাস পাঠকদের উপহার দিয়ে বেশ অনেক দিন হুমায়ূন আহমেদের কলম থেমে ছিল। সপরিবারে তিনি চলে গিয়েছিলেন আমেরিকায়, উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য। সে সময়ে বিদেশে চলে না গেলে, হুমায়ূন আহমেদের কাছ থেকে আরও ব্যতিক্রমী শিল্পময় উপন্যাস হয়তো আমরা পেতে পারতাম। ফিরে এসে যখন তিনি আবার কলম ধরলেন, আমরা অন্য এক হুমায়ূনকে পেলাম। পেলাম জনপ্রিয় একজন কথাসাহিত্যিককে।

যতদূর মনে পড়ে, হুমায়ূনের অবর্তমানে, তার বিখ্যাত উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রচারিত হয়েছিল বিটিভিতে। সে নাটক যে হুমায়ূনের লেখা থেকে অনেক দূরে, সেটা বুঝতে দর্শকের অসুবিধা হয় নি। নাটক হিসেবে তা তেমন দর্শকের জনপ্রিয়তাও পায় নি। কিন্তু যখন হুমায়ূন আহমেদের নিজের লেখা স্ক্রিপ্ট—'এইসব দিন রাত্রি', 'অয়োময়' বা 'কোথাও কেউ নেই' ইত্যাদি নাটক প্রচারিত হতে শুরু করল, হুমায়ূন হয়ে গেলেন শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় টেলি-নাট্যকার। একইসঙ্গে হুমায়ূন আহমেদ তার লেখা উপন্যাসের জন্য হলেন প্রবল আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক জনপ্রিয় লেখক। তখনো হুমায়ূনের বিশুদ্ধ রুচির চলচ্চিত্র শুরু হয় নি, তবু সবাইকে অবাক করে দিয়ে তৈরি করে ফেললেন বিশাল পাঠকগোষ্ঠী, যা বাংলাদেশের সাহিত্যের অভূতপূর্ব ঘটনা।

পৃথিবীর জনপ্রিয় নায়ক, গায়ক, রাজনৈতিক নেতাদের অনেক সময় সাধারণ মানুষের ভক্তির আতিশয্যের কারণে, ভিড়ের চাপ থেকে রক্ষার জন্য পুলিশের সুরক্ষা ব্যূহের প্রয়োজন হয়। এ দেশে হুমায়ূন আহমেদই সেই রকম ব্যক্তিত্ব যাকে ভক্ত-পাঠকের উচ্ছ্বাসের ঢেউ থেকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য পুলিশের সাহায্য নিতে হয়েছিল। (বইমেলার এই ঘটনা নিশ্চয়ই অনেকেরই মনে আছে। বইমেলায় যে হুমায়ূনের লক্ষ কপি বই বিক্রি হয়েছিল, এটাও মনে থাকবার কথা।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সময়েই সাহিত্যবোদ্ধা এবং সাহিত্যিক মহলে 'অ্যান্টি হুমায়ূন' বা হুমায়ূন-বিরুদ্ধ মতবাদ ও বিতর্কের প্রচলন প্রবল হয়ে ওঠে। আলাপ-আলোচনা বা সভা-সমিতিতেই শুধু নয়, লেখালেখি শুরু হয় পত্রপত্রিকাতেও। ধারণা দেওয়া হয়, হুমায়ূন আহমেদ এ দেশে বুদ্ধিদীপ্ত পাঠক গড়ে উঠবার পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছেন। জীবন-বহির্ভূত কল্পকাহিনির রোমান্টিকতায় পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে সাহিত্যকে অপসাহিত্য করে তুলছেন। অনেকে সাহিত্যের জনপ্রিয় ধারাকে মূল ধারার বহির্ভূত এক ধরনের সাহিত্যের সৃষ্টিকারক আখ্যায় হুমায়ূনকে তাচ্ছিল্য দেখাতেও কার্পণ্য করেন নি।

নন্দিত নরকে ও *শঙ্খনীল কারাগার*-এর বলিষ্ঠ কথাশিল্পীর এই অবমূল্যায়নের প্রচারে লজ্জিত ও ব্যথিত হয়েছিলাম। আমি তখন দৈনিক 'ইত্তেফাকে'র বিশেষ একটি পাতায় নিয়মিত কলাম লিখতাম। বিদগ্ধ-কথিত প্রচারের বিরুদ্ধেই কলাম লিখতে হলো আমাকে। হুমায়ূনের জন্য সেটাই ছিল আমার প্রথম লেখা। লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম, কারণ হুমায়ূনই এ দেশে প্রথম গল্প-উপন্যাসের বাজারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। বইয়ের যে একটি বাণিজ্যিক দিক রয়েছে সেটা অস্বীকার করলে বই লেখার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, লেখার কাজটি হয়ে পড়ে অনুৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড, জাতীয় আয় বা সমাজে তার কোনো অবদানই থাকে না।

হুমায়ূনের আগে অনেক লেখককেই প্রকাশক খুঁজতে হতো, হুমায়ূন আসার পরে প্রকাশকেরাই লেখক খুঁজে বের করবার নিয়মে অভ্যস্ত হতে শুরু করেন। এবং পাঠকের চাহিদা অনুসারে, বেশি হারে লেখককে রয়ালিটির অংশ দিতে আগ্রহী হতে শেখেন। বাণিজ্যিক সফলতার জন্য বইয়ের প্রচারের ব্যাপারটিও হুমায়ূনকে কেন্দ্র করেই প্রতিষ্ঠা পায়।

আমার লেখা কলামটি পড়ে হুমায়ূন জানিয়েছিল, আপনার লেখা পড়ে আমি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছি রিজিয়া আপা। নিজের লেখার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম।

হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্য নিয়ে তবুও বিতর্ক থেকেই যায়। তখনো হুমায়ূন আহমেদের রচনাকে সাহিত্যিক মূল্য দিতে অনেকেই ইতস্তত করেছেন। তার উপন্যাসকে 'অপন্যাস' আখ্যা দিতেও দ্বিধা করে নি কেউ কেউ।

বলা হতো, হুমায়ূনের সৃষ্ট চরিত্ররা প্রায় সবাই একইভাবে কথা বলে, আচরণ করে। (কিছুটা ক্ষ্যাপাটে ধাঁচের।) তা ছাড়া বাস্তবতা বিবর্জিত এক ধরনের অবাস্তব রোমান্টিকতার জগতে হুমায়ূন আহমেদের চরিত্রদের বসবাস। এই অবাস্তব রোমান্টিকতার অধিবাসী মধ্যবিত্ত চরিত্ররাই তরুণ প্রজন্মের পাঠকদের আকর্ষিত করে।

হুমায়ূন আহমেদের অজস্র সৃষ্টির বিস্তৃত আলোচনা সীমিত পরিসরে সম্ভব নয় বলেই তার প্রতি দোষারোপ খণ্ডনের অল্প কিছু যুক্তি এখানে উল্লেখ করছি। প্রসঙ্গক্রমে হুমায়ূন আহমেদের বই কেন লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে, কেনইবা আশি/নব্বই দশক থেকে তরুণ পাঠকদের মাঝে হুমায়ূন-উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে, সেটাও ভাববার বিষয়। এই প্রেক্ষিতে প্রথমেই টিভিতে প্রচারিত হুমায়ূন আহমেদের নাটকের অবদানটির কথা এসে যায়। হুমায়ূন আহমেদের নাটকের মধ্যবিত্ত জীবন আগে শুরুতেই দর্শকদের উপভোগ্যতা অর্জন করে। মধ্যবিত্ত জীবনভিত্তিক মমতাজ হোসেনের আগে লেখা ধারাবাহিক নাটক যথেষ্ট দর্শকপ্রিয়তা পায়। কিন্তু হুমায়ূন আহমেদের নাটক ছিল একজন দক্ষ কথাশিল্পীর লেখা নাটক। তার নাটক মূলত মধ্যবিত্তভিত্তিক হলেও এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংলাপের সংযম ও তীক্ষ্ণতা এবং 'উইট' বা হিউমার সেইসঙ্গে স্বচ্ছতা দর্শককে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছে। রসবোধ থাকলেও সেটা কখনোই স্থূল ভাড়ামি হয়ে ওঠে নি।

এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, ব্যতিক্রমী চরিত্রের উপস্থাপনা হুমায়ূনের নাটকেই শুধু নয়, গল্প-উপন্যাসেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পাওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে দর্শক ও পাঠক মহলে। ফলে হুমায়ূন আহমেদের নাটকের দর্শক ও উপন্যাসের পাঠকেরাও হয়ে গেছে একই বৃত্তের মানুষ। এই কারণে অনেকের ধারণা, টিভি নাটকের সাফল্যই প্রাথমিকভাবে হুমায়ূনের উপন্যাসের কাটতি বাড়িয়েছে। কিন্তু তবু প্রশ্ন জাগে, শুধু কি নাটকের সাফল্যের জন্য গ্রন্থকার হুমায়ূনের সাফল্য এসেছে ? জনপ্রিয় লেখক হয়েছেন ? সম্ভবত নয়, হুমায়ূন নিজেই ছিলেন এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণ থেকে তিনি তার সাহিত্য সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ, বিজ্ঞান, ইতিহাস ছাড়াও পৃথিবীর নানা অনুন্মোচিত রহস্যময়তাকে করে তুলেছেন সাহিত্যের বিষয়। এদিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, বিষয় আহরণে হুমায়ূন আহমেদ বহুগামী। লেখার ধরন বা স্টাইল যদিও তিনি কখনোই পরিবর্তন করেন নি, বিষয় অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারেও উদাসীন ছিলেন, একই আঙ্গিকে বলে গেছেন বিভিন্ন ধরনের কাহিনি, তবু প্রায় প্রতিটি উপন্যাসই শেষ হয়েছে ভিন্ন বোধের জন্ম দিয়ে।

হুমায়ূন আহমেদের দুই শতাধিক উপন্যাসের অনেকগুলিই পড়ে উঠবার সুযোগ আমার হয় নি, তবু দীর্ঘ সংলাপ সংবলিত তাঁর কাহিনি গ্রন্থনার মূল বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে সম্ভবত ভুল হয় নি আমার।

হুমায়ূন তাঁর বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, তিনি সামাজিক কোনো দায়বদ্ধতা থেকে লেখেন না, কালজয়ী কোনো অমর সৃষ্টিও তাঁর উদ্দেশ্য নয়, তিনি লেখেন আনন্দ পেতে ও দিতে।

হুমায়ূন আহমেদ জানতেন, কিংবা জানাতেন না যে, তাঁর এই আনন্দদানের বিষয়টির অন্তরালে প্রখর কোনো সত্যের প্রচ্ছন্ন অবস্থান রয়েছে। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে যখন হুমায়ূন আহমেদের দ্বিতীয় আগমন, যখন তিনি সমভাবে জনপ্রিয় ও বিতর্কিত হয়ে ওঠেন নি, তখন দেশটি এক অচলাবস্থায় প্রায় স্থবির। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অর্জিত গৌরবের স্বাধীনতা তখন ক্ষমতা দখলকারী স্বৈরাচারীর মুঠোয় বন্দি। '৭৫ থেকে '৯০ পর্যন্ত পাকিস্তানি মডেলের ঘৃণ্য অনুসারী সেনাশাসনে সাধারণ মানুষ রুদ্ধবাক। বিজয়ের গৌরবকে পদদলিত করে গণতন্ত্রের বিলোপ, একাত্তরের ঘাতক-যুদ্ধাপরাধীদের উত্থান, এবং সুবিধাবাদী সুযোগসন্ধানীদের দাপটে দেশের মানুষ চরম হতাশা ও নিরানন্দে নিমজ্জিত। নবীন প্রজন্ম যারা অনেকেই মুক্তিযুদ্ধ দেখে নি, জানে নি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা, জানতে পারে নি মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস, দেশকে, দেশের মানুষকে ভালোবাসার দিকনির্দেশনাও ছিল তাদের জন্য বিভ্রান্তিকর। ছাত্র রাজনীতিতে তখন চরম দুর্বৃত্তায়ন শুরু। এসবই তরুণ মনে হতাশাকেই প্রকট করে তুলেছিল। রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকার—অন্ধকারে বন্দি তরুণ সমাজ (তারুণ্যের ধর্ম অর্থাৎ উচ্চকণ্ঠ নির্ভীক আত্মপ্রকাশ থেকে তারা ছিল বঞ্চিত) ঠিক এই সময়েই যেন পেয়ে গেল স্বপ্নলোকের চাবি, পেল হুমায়ূন আহমেদকে।

মধ্যবিত্তের কোমল রোমান্টিকতা তাদের আচ্ছন্ন করল। হুমায়ূনের উপন্যাসের চরিত্ররা হলো তাদের আদর্শ। সেসব চরিত্র অনায়াসে মনের কথা বলে ফেলে, সাবধানি সতর্ক ও অবদমিত মানুষের মতো মনের ভাব প্রকাশে লুকোচুরি করে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূনের সৃষ্ট ব্যতিক্রমী চরিত্ররা অনেকেই প্রচলিত সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় শাসিত মানুষের বন্দিত্ব ভেঙে বেরিয়ে আসা স্বাধীন মানুষের প্রতীক। জীবনাচারণে, ভাবনায়, দর্শনে আপাতদৃষ্টে তারা স্বেচ্ছাচারী বা জীবন আসক্তিশূন্য মনে হলেও প্রকৃত জীবনদর্শনে বহুদূরগামী। বস্তুত হুমায়ূন আহমেদ মানুষের বহিরাবরণ ভেদ করে তার অন্তর্গত সত্তাটাকেই উন্মোচিত করেন।

সংলাপের মাধ্যমেই এটি পরিলক্ষিত হয়। মানুষ যা সাধারণত বলে থাকে তা নয়। যা বলতে চায়, কিন্তু বলে না বা বলতে পারে না, সেটাই হুমায়ূন তার চরিত্রকে দিয়ে বলান। 'অন্তর্গত সত্য' বা 'ইনার ট্রুথকেই' হুমায়ূন গুরুত্ব দেন। সামান্য 'উইট' বা রসিকতার ছলে প্রকৃত সত্যটিকেই তিনি বলে ফেলেন। অনেক সময় এই হাস্যকৌতুকের আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকে কোনো বেদনাবাহী নির্মম সত্য। হুমায়ূন আহমেদের রচনায় আপাতদৃষ্টিতে যা অগভীর তরল বলে মনে হয়, একান্ত পর্যবেক্ষণে তা হয়ে ওঠে গভীর মর্মকথা।

জীবনের নিরুদ্ধ এই গভীর মর্মকথাকে সহজ কথন, সংযত স্বল্পবাক্যে বিধৃত করে হুমায়ূন জয় করেন বিশাল পাঠকশ্রেণীর মন। হয়ে ওঠেন প্রিয় লেখক, প্রিয় ব্যক্তিত্ব।

হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যকে উন্নাসিক তাচ্ছিল্যে যারা বলেন, অপরিপক্ব, তরল, পাঠক ভুলানো সরল লেখা, তাদের প্রতি অনুরোধ তারা যেন হুমায়ূনের ছোটগল্পগুলো আরও একবার পড়ে দেখেন। এমন অসাধারণ গল্পকার আমাদের সাহিত্যে আছেন হাতেগোনা কয়েকজন। হুমায়ূনের প্রায় প্রতিটি গল্পই আমাকে মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক করেছে। খুব নির্মোহ ভঙ্গিতেই নৈর্ব্যক্তিক কলমে এক-একটি গল্প বলে গেছেন তিনি। মানুষের জীবনকে এত ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণে এত নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় অথচ অনবদ্য শিল্প আঙ্গিকে তুলে আনবার দক্ষতা কম গল্পকারেরই থাকে।

হুমায়ূন ছিলেন অনিরুদ্ধ এক লেখক। অসংখ্য লেখা তিনি লিখেছেন। তার সব লেখাই যে উচ্চমানসম্পন্ন একথা বলা যায় না। তবে মান বিচারে তার অনেকগুলো উপন্যাসই উচ্চস্থান পেয়ে যায় নিঃসন্দেহে।

হুমায়ূনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মিডিয়ার অসার উচ্ছ্বাসের ঢেউ কখনো কখনো তাকে কালত্তোর্ণীতার দুয়ারে পৌঁছে দিলেও বলতে হয়, কে হবেন কালজয়ী বা কে হবেন না, সে বিচার একমাত্র কালের হাতেই। এই মুহূর্তে এই মূল্যায়ন করতে যাওয়া নেহাতই হঠকারিতা।

তবে নির্দ্বিধায় বলতে পারি, হুমায়ূন আহমেদের 'নন্দিত নরকে' 'শঙ্খনীল কারাগার'সহ আরও বেশ কয়েকটি উপন্যাস এবং তার ছোটগল্পগুলো আমাদের বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ।

হুমায়ূনের বড় কৃতিত্ব, তিনি শিল্পমাধ্যমের তিনটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ সাহিত্য, টিভি নাটক ও চলচ্চিত্রে তিনটি ভিন্নমাত্রা সংযোজন করেছেন। তিনটিতে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেও একটি অপরটিকে অতিক্রম করে নি বা একটি অপরটির পরিপূরক হয়ে ওঠে নি। টিভি নাটকে হুমায়ূন ছিলেন তার পূর্ববর্তী ও সমকালীন নাট্যকারদের থেকে ব্যতিক্রমী (মূলত মধ্যবিত্ত জীবনই তার নাটকের প্রধান বিষয়)। মধ্যবিত্ত দর্শকশ্রেণী যেমন হুমায়ূনকে সাদরে গ্রহণ করেছে, তেমনি সর্বস্তরের দর্শকের কাছে তার নাটকের জনপ্রিয়তার কারণ তার সাধারণ ঘটনাবলি ও হাস্যরসাত্মক সংলাপ এবং 'হিউমার'। দর্শকদের কাছে তার নাটক ছিল বিশেষত্ব মণ্ডিত হুমায়ূনের নাটক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাসের মতো নাটকে যেমন ছিলেন হুমায়ূন সফল, চলচ্চিত্র নির্মাণেও তেমনি সাফল্য অর্জন করেছেন। বলা বাহুল্য একজন নামি কথাসাহিত্যিক যখন চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন, সেটা অবশ্যই সাহিত্যগুণ থেকে বিচ্যুত হয় না, হুমায়ূন নির্মিত চলচ্চিত্রে সেটা বেশ উপলব্ধি করা যায়। এক্ষেত্রে এ দেশের একজন প্রথম শ্রেণীর কথাশিল্পীর কথা অবশ্যই উল্লেখ্য, তিনি প্রয়াত জহির রায়হান। সাহিত্যমনস্কতা যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তার চলচ্চিত্র প্রচুর দর্শকপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তার বিখ্যাত উপন্যাস 'হাজার বছর ধরে' অসাহিত্যিক নির্মাতার হাতে নিশ্চয়ই সাহিত্যিকের শিল্পিত পরিমার্জনার অভাব থেকে যাওয়ারই কথা। জহির রায়হানের চলচ্চিত্র নির্মাণে সম্ভবত সাহিত্যভিত্তিক বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায়ের প্রেরণা ছিল অন্তর্নিহিত। (পরবর্তীতে 'সূর্য দীঘল বাড়ি'র পরিচালনাতেও প্রচ্ছন্ন ছিল সত্যজিতের প্রভাব) কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ জহির রায়হান বা সত্যজিত রায় হতে চেষ্টা করেন নি। হুমায়ূনের নাটকের মতো তার চলচ্চিত্রও ছিল 'হুমায়ূনের চলচ্চিত্র'। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নির্মিত তার চলচ্চিত্রগুলো স্বাধীন বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডটির স্বপ্নের দিগন্তকে স্পর্শ করতে প্রয়াস পেয়েছে তার নিজস্ব ধারাতেই। সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্র সর্বত্রই হুমায়ূন তার নিজস্ব মৌলিক ভাবনা ও মেধাকে প্রয়োগ করে তৈরি করতে চেষ্টা করেছেন 'হুমায়ূনী স্টাইল'। যা তাকে দিয়েছে অনন্য একক এক পরিচিতি, যা একান্তই হুমায়ূন আহমেদের। এইসব বৈশিষ্ট্যেই হুমায়ূন হয়ে ওঠেন হুমায়ূন আহমেদ। আর কেউ বা আর কারও মতো নন।

আর এইজন্যই তৈরি হয় হুমায়ূনের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা। সম্ভবত এই কারণেই হুমায়ূনের অকাল প্রয়াণে হুমায়ূনের বহুমুখী কর্মক্ষেত্রটি হয়তো অপার এক শূন্যতার জন্ম দিতে পারে। সারা দেশ শোকের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়, একজন বহুপ্রজ হুমায়ূন আহমেদের জন্যই। হুমায়ূন আহমেদের শেষ প্রয়াণের অনুষ্ঠানগুলো তাই তার দর্শক, পাঠক, সহকর্মী, গুণগ্রাহী, আত্মীয় পরিজন সব নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত জনতার সমুদ্র হয়ে যায়। অসংখ্য মানুষ ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার টানেই আসে প্রিয় মানুষটিকে শেষ অভিবাদন জানাবার জন্য। হুমায়ূনের অনন্ত যাত্রাটি হয়ে ওঠে লাখো মানুষের শ্রদ্ধা-ভালোবাসার অশ্রুজলে সিক্ত।

এদেশে বোধহয় এই প্রথম একজন কথাশিল্পী, নাট্যকার, চলচ্চিত্র নির্মাতা এমন লাখ লাখ ভক্ত মানুষের শোকবার্তায় সিক্ত হয়ে চিরবিদায় নেয়। বলতে হয় যেন একজন নয়—বিদায় নিলেন একাধিক সম্মানিত হুমায়ূন।

প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সংবাদ ভাষ্যকার ও প্রতিবেদকেরা উচ্ছ্বসিত আবেগের আতিশয্যে নানা বিশেষণে ভূষিত করে তার বিদায়ের ঘটনা ও দৃশ্যাবলির বর্ণনা দিয়েছেন। অনেকে তাকে রাজপুত্র, কেউবা সম্রাট, আবার কেউ মহানায়ক, লেখক অথবা মহামানব আখ্যায় ভূষিত করেছেন। তাকে সমাধিস্থ করার পারিবারিক বিলম্ব সিদ্ধান্তটিকে নিয়ে টিভি চ্যানেলের টকশোয়ের বিজ্ঞজনেরা আলোচ্য বিষয় করে বিভ্রান্তির জন্মও দিয়েছেন। 'টকশো' টেবিলে কোনো কোনো বক্তা 'বাংলা সাহিত্য এতিম হয়ে গেল' এমনই আশঙ্কা করেছেন। কেউ আবার মনে করেছেন বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পও বোধহয় হুমায়ূনের প্রয়াণের সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করল।

নির্দ্বিধায় বলা যায়, এইসব তরল ফেনিল বিভ্রান্তিকর উচ্ছ্বাস প্রকাশের কারণটি হচ্ছে হুমায়ূন আহমেদের অবদান সম্পর্কে অজ্ঞতা। সাময়িক স্বল্পমেয়াদি এইসব শোক উচ্ছ্বাসের অনেক ঊর্ধ্বেই রয়েছেন হুমায়ূন আহমেদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা যারা সাহিত্য-শিল্প অঙ্গনের মানুষ, আমাদের প্রত্যাশা, হুমায়ূন তার কীর্তিতেই বেঁচে থাকবেন সাহিত্য-শিল্পের জগতে। সংস্কৃতি অঙ্গনের এক বেগবতী নদীর প্রবহমানতা থেমে গেলেও খাতের অবস্থান থেকে যায় তবু।

তাই পাঠকেরা বারবার পড়বেন হুমায়ূন আহমেদের লেখা প্রিয় বইগুলি, প্রতি বছরই পুনর্মুদ্রিত হবে তার জনপ্রিয় সব উপন্যাস। আমরা আশা করব, হুমায়ূন আহমেদ প্রবহমানই থাকবেন; হারিয়ে যাবেন না।

হুমায়ূনের গল্প-উপন্যাসের যথার্থ মূল্যায়নটি ভবিষ্যতে একসময় নিশ্চয়ই হবে। কেন হুমায়ূন এত জনপ্রিয় হয়েছিলেন, কেন তার তিরোধানে সারা দেশের অসংখ্য মানুষ শোকাতুর হয়েছে, এর প্রকৃত রহস্যটিও উদ্‌ঘাটিত হবে।

একসময় আহমদ ছফা (হুমায়ূনের ঘনিষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী) হুমায়ূনের মাঝে অমিত সম্ভাবনার চিহ্ন দেখেছিলেন। হুমায়ূন তার প্রথম লেখা 'শঙ্খনীল কারাগার' ও 'নন্দিত নরকে'র খ্যাতি থেকে সরে, অন্যরকম খ্যাতির অঙ্গনে পা রাখলে, ক্ষুব্ধ আহমদ ছফা হতাশ হয়েছিলেন। তিনি বেঁচে থাকলে আজ আহমদ ছফাকে বলতাম—এবার হুমায়ূনের অবদানের নতুন মূল্যায়নটি আপনি করুন আবার একবার। আমি বিশ্বাস করি, হুমায়ূন আহমেদের অবদানের নিরপেক্ষ, সৎ ও যথার্থ মূল্যায়নের সময়টি আসবেই একদিন এবং প্রমাণিত হবে, জনপ্রিয় হলেই তা বটতলার সস্তা লেখা নয়, সাহিত্যিক মূল্যমানেই তার গুরুত্ব।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্লাশব্যাক

রেজানুর রহমান

একটার পর একটা ম্যাজিক দেখাচ্ছেন হুমায়ূন আহমেদ। দুই পাশে মুখ কাটা দড়ি নিমিষে জোড়া লেগে গেল। তাসের জাদু, পয়সা নিয়ে জাদুসহ বেশ কটি জাদু দেখানোর পর আমার দিকে তাকালেন। বললেন, এই যে জাদু দেখলে এ ব্যাপারে আমাকে কিছু প্রশ্ন করো। দেখি জাদু সম্পর্কে তোমার নলেজ কেমন?

জাদু সম্পর্কে আসলেই আমার কোনো নলেজ নেই। জাদুকরদের আমার মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর মানুষ। ছোটবেলায় গ্রামের হাটে প্রথম একজন জাদুকরকে দেখি। শরীরে অদ্ভুত পোশাক। রঙ-বেরঙের তালি দেওয়া ঢোলা পাঞ্জাবি। সেরকমই ঢোলা পায়জামা। মাথায় রঙমাখা গোলটুপি। মুখেও রঙ মেখেছে। হাটের এক কোনায় মজমা জমিয়েছে তার শিষ্য। এক ফাঁকে গুরু অর্থাৎ জাদুকর সবার সামনে হাজির হলেন একটা লম্বা কৌটা, সঙ্গে লাল রঙের কাপড় আর কিছু ছেঁড়া সাদা কাগজ নিয়ে। জাদুকরকে দেখে লোকজন হাততালি দিল। জাদুকর গর্বের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে সবাইকে স্বাগত জানাল। তারপর লম্বা কৌটা, লাল কাপড় আর কাগজের টুকরা দিয়েই শুরু করল তার জাদুবিষয়ক কর্মকাণ্ড। এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমাকেও সম্পৃক্ত করল। আমি বিস্কুট খেতে পছন্দ করি—এই বিষয়টি জেনে নিয়ে কৌটার মধ্যে কাগজের টুকরা ফেলতে বলল।

আমি তার কথামতো কাগজের টুকরা কৌটায় ফেললাম। তার আগে অবশ্য ফাঁকা কৌটাটা দর্শককে দেখিয়েছে জাদুকর। এবার লাল কাপড় দিয়ে কৌটাটা ঢেকে যন্তর মন্তর ফুস মন্তর জাতীয় নানান শব্দ আউড়িয়ে দর্শকদের তালি দিতে বললেন। দর্শকেরা গগন ফাটানো তালি দিল। এবার জাদুকর আমাকে বলল, খোকা দুই হাত পাতো তো। আমি দুই হাত পাতলাম। লাল কাপড় সরিয়ে কৌটার মুখ খুলল জাদুকর। তারপর আমার হাতে কৌটা কাত করতেই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। শুধুই বিস্কুট পড়ছে আমার হাতে। একসময় দুই হাত ভরে গেল। জাদুকর আমাকে বিস্কুট খেতে বললেন। যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো আমি বিস্কুট মুখে দিলাম। সত্যি তো আমি বিস্কুট খাচ্ছি! কিন্তু সাদা কাগজ বিস্কুট হলো কীভাবে? মনে মনে আশ্বস্ত হলাম—এটাই জাদু। তাই এ নিয়ে আর কখনোই মাথা ঘামাই নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে টিভিতে প্রথম দেখলাম ডেভিড কপারফিল্ডের বিস্ময়কর আরেক জাদু। একটা ট্রেনকে শূন্যে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। পরে সামনাসামনি দেখলাম আমাদের প্রিয় মানুষ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জাদুকর জুয়েল আইচকে এবং তাঁর জাদুকেও। জাদু বিষয়টাই আমার কাছে বিস্ময়কর। আর সেজন্য তখনই এই বিস্ময়ের মাঝে নিজেকে ব্যস্ত রাখার কথা চিন্তা করি নি। এর পেছনে আর একটি কারণও আছে। সেটি হলো যোগ্যতা। সেটি আমার নেই। তাই বলে জাদুবিষয়ক কোনো প্রশ্ন করার যোগ্যতা আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই তা তো নয়। কিন্তু আমি হুমায়ূন আহমেদকে জাদুবিষয়ক কোনো প্রশ্ন করার সাহস পাচ্ছি না কেন ? কত প্রশ্নই তো করা যায়। আপনি জাদু শিখলেন কার কাছে ? জাদু আসলে আপনার কাছে কী ? আপনার প্রিয় জাদুকর কে ? কোন জাদু দেখে আপনি বিস্মিত হয়েছিলেন ? এরকম কত প্রশ্নই তো করা যায়। কিন্তু আমি কাকে প্রশ্ন করব ? হুমায়ূন আহমেদকে ? যার সামনে দাঁড়ালে আমি খেই হারিয়ে ফেলি। সিদ্ধান্ত নিয়ে যাই দেখা হলেই অনেক কথা বলব। অনেক প্রশ্ন করব। কিন্তু তা কখনোই হয়ে ওঠে না।

একটা ঘটনা বলি। আমি তখন *দৈনিক ইত্তেফাকে* যুক্ত। একুশে বইমেলার ওপর *ইত্তেফাকে* প্রতিদিন শেষ পাতায় বিশেষ ফিচার প্রকাশ করা হচ্ছে। আমার সাংবাদিকতা জীবনের গুরু, অনুপ্রেরণা গোলাম সারওয়ার তখন *ইত্তেফাকের* বার্তা সম্পাদক। তিনি ডেকে বললেন, হুমায়ূন আহমেদের ইন্টারভিউ লাগবে। যেভাবে পারো ম্যানেজ করো।

হুমায়ূন আহমেদের সাথে আমার তখনো ভালোভাবে পরিচয় হয় নি। তবে পরিচয়ের একটা যোগসূত্র তৈরি হয়েছিল বাংলা একাডেমীতে একুশে বইমেলায়। ছোট্ট ঘটনা। হুমায়ূন আহমেদ কি তা মনে রেখেছেন ? না রাখাই স্বাভাবিক। কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ সেটা মনে রেখেছেন জেনে আমি যারপরনাই বিস্মিত এবং নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলাম। ঘটনাটা খুলেই বলি। আশির দশকের শেষ দিকে *শূন্যে বসবাস* নামে আমার প্রথম উপন্যাস প্রকাশ করে আমারই একদল বন্ধু। তাদের ধারণা আমার লেখার হাত ভালো। লেগে থাকলে ভবিষ্যতে একটা-কিছু হয়ে যাব। এই ভেবে বন্ধুরাই অর্থকড়ি জোগাড় করল। *ইত্তেফাকে* তখন চিফ রিপোর্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক নাজীমউদ্দিন মোস্তান। তিনিও কিছু আর্থিক সহায়তা দিলেন। 'বই প্রকাশ' নামে একটি প্রকাশনীও দাঁড় করাল তারা। বই প্রকাশ-এর প্রথম বই *শূন্যে বসবাস*। টিএসসিতে বইটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ছিলেন প্রকাশনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। তাঁর কাছে আগেই বইটি পাঠানো হয়েছিল। প্রকাশনা অনুষ্ঠানে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী উপন্যাস হিসেবে *শূন্যে বসবাস*-এর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। সেই সাথে আশাবাদ ব্যক্ত করলেন বইয়ের তরুণ লেখকের ভবিষ্যৎ অনেক উজ্জ্বল। সেই সময় *দৈনিক সংবাদ* প্রচারসংখ্যায় বেশ আলোচিত পত্রিকা। *সংবাদ*-এ 'গাছপাথর' নামে নিয়মিত একটা কলাম লিখতেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। প্রকাশনা অনুষ্ঠানের পরের সপ্তাহে সংবাদের *গাছপাথর* কলামের পুরোটা জুড়েই *শূন্যে বসবাস* সম্পর্কিত লেখা প্রকাশ হলো। আমি একজন অখ্যাত লেখক গাছপাথরের ছোঁয়ায় হঠাৎ করে বিখ্যাত হয়ে গেলাম। বইয়ের স্টলের সামনে ক্রেতার ভিড় বেড়ে গেল। অনেকে আমার অটোগ্রাফ নিচ্ছে। বইমেলায় মোটামুটি আলোচিত হয়ে উঠল *শূন্যে বসবাস*। বোধকরি কবি-লেখকদের মাঝেও বিষয়টি সাড়া ফেলেছিল। সেটা বুঝলাম মেলায় হুমায়ূন আহমেদের সাথে দেখা হওয়ার পর। সেটাই হুমায়ূন আহমেদের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। এর আগে দেখেছি, কিন্তু কথা হয় নি।

ঘটনার দিন শেষ বিকেলে আমি বইমেলায় সবেমাত্র ঢুকেছি। হঠাৎ দেখলাম হুমায়ূন আহমেদ সামনে হেঁটে যাচ্ছেন। মুখোমুখি হতেই সাহস করে সালাম দিলাম—স্যার স্লামালেকুম। হুমায়ূন আহমেদ একটু থামলেন। মাথা নেড়ে সালামের জবাব দিয়ে আমার দিকে তাকাতেই সাহস করে নিজের পরিচয় দিলাম—স্যার, আমার নাম রেজানুর রহমান। মেলায় আমার একটা বই বেরিয়েছে। নাম *শূন্যে বসবাস*...

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদ আমার কথা শেষ করতে দিলেন না। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ও তুমি রেজানুর! বলেই সোজাপথে হাঁটতে থাকলেন। আমি কিছুটা ভড়কে গেলাম। স্যার ওভাবে চলে গেলেন কেন ?

তখনকার দিনে মোবাইল ফোন এত সহজলভ্য ছিল না। টিএন্ডটি ফোনই ভরসা। হুমায়ূন স্যার থাকতেন হাতিরপুলের পাশেই একটি ফ্ল্যাট বাড়িতে। অনেক কষ্টে তাঁকে ফোনে পেলাম। পরিচয় দিতেই তিনি যা বললেন তাতে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। আমার নাম শুনেই যেন কতদিনের চেনা এভাবে বললেন, হ্যাঁ রেজানুর, বলো ভাই! কেমন আছ ? তোমার লেখালেখির খবর কী ? নতুন কী লিখলে... আমি যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। হুমায়ূন আহমেদের মতো এতবড় একজন লেখক আমার লেখালেখির খোঁজ নিচ্ছেন! সেই থেকে হুমায়ূন আহমেদের প্রতি আমার মুগ্ধতার মাত্রাটা বেড়ে গেল। দেখা হলেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে হতো। আমি কার কাছে এসেছি ? বাংলা সাহিত্যের সম্রাটের কাছে। কেন যেন চোখ তুলে তাকাতে সাহস পেতাম না। ভাবতাম যদি প্রশ্ন করেন, তোমার লেখালেখির খবর কী ? উত্তরটা তো জানা নেই।

একদিন হুমায়ূন স্যার ঠিকই আমাকে এই প্রশ্ন করলেন। *আনন্দ আলোর* বিশেষ সংখ্যার জন্য লেখা নিতে গেছি ধানমণ্ডিতে তাঁর বাসা 'দখিন হাওয়া'য়। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, *আনন্দ আলোর* প্রতিটি জন্মদিন ও ঈদসংখ্যায় হুমায়ূন আহমেদ আগ্রহভরে লেখা দিয়েছেন। আমার সম্পাদক জীবনের অনেক সুখস্মৃতি জড়িয়ে আছে হুমায়ূন আহমেদকে ঘিরে। তার মধ্যে একটি হলো নির্ধারিত তারিখেই লেখা পাওয়া। স্যার বলতেন, যাও, অমুক তারিখে লেখাটা নিয়ে যেয়ো। নির্ধারিত দিনের আগেই ফোন করতেন, রেজানুর, তোমাদের লেখা রেডি। দেখো বানান যেন ভুল না থাকে। নিজের নামের বানানের ক্ষেত্রে সর্বদাই সতর্ক করে দিতেন। বলতেন, হুমায়ূন নামের মধ্যে যেন হ-এর মাথা ভেঙে না যায়। হ-এর নিচে '‌ু'-কার হবে। এটা খেয়াল রাখবে। *আনন্দ আলো* সবসময় স্যারের নামের বানানের ব্যাপারে সতর্ক থাকত। তবুও একবার স্যারের নামের ক্ষেত্রে হ-এর নিচে '‌ু'-কার ছিল না। হ-এর মাথা ভেঙে '‌ু'-কার ছিল। স্যার যারপরনাই বিরক্ত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, রেজানুর, মনে রেখো মানুষ তার নামের বানানে কখনোই ভুল দেখতে চায় না।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, হুমায়ূন স্যারের মৃত্যুর পর দেশের অধিকাংশ পত্রপত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমে তাঁর নামের বানানের ক্ষেত্রে যত্ন নেওয়া হয় নি। অনেক পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলে হ-এর মাথা ভেঙে অর্থাৎ হুমায়ূনকে 'হুমায়ূন' করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলে আমি নিজে এ ব্যাপারে কথা বলেছি। কারও উত্তর ছিল—ও তাই নাকি ? আচ্ছা দেখছি। বানান সংশোধনের জন্য বলে দিচ্ছি।... কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের এখানে বাংলা ফন্টে হ-এর নিচে '‌ু'-কার দেওয়ার সুযোগ নেই। কাজেই কিছু করা যাবে না।

এবার আসল ঘটনায় আসি। *আনন্দ আলোর* একটি বিশেষ সংখ্যার জন্য লেখা নিতে গেছি 'দখিন হাওয়া'য়। কম্পিউটারে কম্পোজ করা একটি ছোটগল্প আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে হুমায়ূন স্যার আদেশের সুরে বললেন, বসো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। বলেই চলে গেলেন ভেতরের ঘরে। আমি চিন্তিত হয়ে উঠলাম। স্যার যেভাবে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে'—কী কথা বলবেন স্যার ? আমি কি কোনো ভুল করেছি ? মনে পড়ছে না। সোফায় বসে রীতিমতো ঘামতে শুরু করেছি। হুমায়ূন স্যার আমার পাশে এসে বসলেন, সরাসরি প্রশ্ন—তোমার লেখালেখির খবর কী ?

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। হুমায়ূন আহমেদ আমার লেখালেখির খবর জানতে চাইছেন। বিগত কয়েক বছরে আমি সাহিত্যের ধারেকাছেও ছিলাম না। কেন ছিলাম না—এর পেছনে সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই। কিন্তু হুমায়ূন স্যারের প্রশ্নের উত্তর কী হতে পারে ? লজ্জায় মাথা তুলে তাকাতে পারছিলাম না। আমার অবস্থা দেখে স্যার বললেন, তুমি যে খুব ভালো লেখ তা বলব না। তবে তোমার মাঝে আমি সম্ভাবনা দেখেছি। সম্ভাবনাটাকে কাজে লাগাও। একথা বলেই হুমায়ূন আহমেদ একটা প্রশ্ন করলেন আমাকে। একথা কি ঠিক ? আমি দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলাম, অবশ্যই ঠিক।

হুমায়ূন স্যার পাল্টা প্রশ্ন করলেন, কোনটা ঠিক ? হুমায়ূন আহমেদ দেশে বইয়ের পাঠক সৃষ্টি করেছেন এটা ?

হ্যাঁ। জোর দিয়ে বললাম।

হুমায়ূন স্যার মৃদু হাসলেন। এইখানেই তোমরা ভুল করছ। হুমায়ূন আহমেদ দেশে বইয়ের পাঠক সৃষ্টি করেছেন ঠিকই। কিন্তু কার বই ? হুমায়ূন আহমেদের নিজের বই। বাংলা একাডেমীর বইমেলায় কার বইয়ের জন্য পাঠকের দীর্ঘ লাইন পড়ে ? হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের জন্য। দেশে আরও অনেক কবি-লেখক আছেন। তাঁদের বই কেনার জন্য পাঠকের এত আগ্রহ নেই কেন ? ধরো দেশে একদিন হুমায়ূন আহমেদ নামের লেখকটি হাওয়া হয়ে গেল। তার কোনো বই প্রকাশ হচ্ছে না। পাঠক কার বই লাইন ধরে কিনবে ? তার মানে কী দাঁড়াল ? হুমায়ূন আহমেদ তার নিজের বইয়ের পাঠক সৃষ্টি করেছেন। এটা তো ভাই সাহিত্যের জন্য শুভ লক্ষণ না। দেশে অনেকেই সাহিত্যকর্মের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু লেগে থাকার মানসিকতা দেখি না। সারা বছরে খোঁজ নেই। হঠাৎ ফেব্রুয়ারির বইমেলায় হাজির। শুধু ফেব্রুয়ারিতে বই প্রকাশ করে তো লেখক হওয়া যাবে না। সারা বছর সাহিত্য নিয়ে থাকতে হবে।

নিউইয়র্কে চিকিৎসার মাঝখানে যখন দেশে ফেরেন হুমায়ূন আহমেদ তখন *আনন্দ আলোর* পক্ষ থেকে তাঁর একটা দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেদিন হুমায়ূন স্যারকে পেয়েছিলাম অন্যভাবে, অন্যরূপে। অত্যন্ত প্রাণবন্ত হাসিখুশি। আমাদের দেখেই ডেকে এনে বসালেন তাঁর লাইব্রেরির বারান্দায়। অন্যসময় দেখেছি ছবি তোলার ক্ষেত্রে হুমায়ূন স্যার একটু অস্থির প্রকৃতির মানুষ। ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেই অস্থির হয়ে পড়েন। হয়েছে...হ্যাঁ ঠিক আছে... আর পারব না... বলতে থাকেন। কিন্তু সেদিন দেখলাম ছবি তোলার ব্যাপারেও ভীষণ আগ্রহী। *আনন্দ আলোর* ফটোগ্রাফার শিবেন সরকার মনুকে ফটোগ্রাফি সম্পর্কে একটা কৌশল শেখালেন। জামার বোতাম লাগাতে কষ্ট হচ্ছিল স্যারের। আমি নিজে তাঁর জামার বোতাম লাগিয়ে দিলাম। মনে হচ্ছিল বাবার গায়ে জামা পরিয়ে দিচ্ছি।

সাক্ষাৎকারে হুমায়ূন স্যার সেদিন অনেক কথাই বলেছিলেন। তবে একটি লাইন প্রায় প্রতিদিনই আমাকে একটা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়—একটা কচ্ছপ বাঁচে সাড়ে তিন শ বছর আর একটা মানুষ ? সৃষ্টিকর্তার এ কেমন বিচার ?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখাটি আর বড় করতে চাই না। সবার কাছে সবিনয়ে কয়েকটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চাই। পত্রপত্রিকা ও টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকার ও লেখালেখিতে প্রায়শই দেখছি হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে কথা বলার সময় অনেকেই শুধু তাঁর প্রথম দিককার উপন্যাস *শঙ্খনীল কারাগার* ও *নন্দিত নরকে*র কথা বলেন। নিঃসন্দেহে এই উপন্যাস দুটি তাঁর অমর সৃষ্টি। কিন্তু পাশাপাশি তাঁর আরও অনেক উপন্যাসের কথা আলোচিত হতে পারে। যেমন—*মাতাল হাওয়া, জোছনা ও জননীর গল্প, বাদশাহ নামদার, মধ্যাহ্ন, লীলাবতী, কে কথা কয়*সহ আরও অনেক বই। অনুরোধ করব যারা তাঁকে নিয়ে ভবিষ্যতে আলোচনা করবেন, তারা যেন বইগুলো একবার পড়ে দেখেন।

বাংলা সাহিত্যের সম্রাট হুমায়ূন আহমেদ ইহজগতে নেই—এটা আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারি না। নিউইয়র্ক থেকে যেদিন তাঁর মৃত্যুসংবাদ দেশে এসেছিল সেদিন আমি, শ্রদ্ধাভাজন গোলাম সারওয়ার, বিনোদন সম্পাদক কামরুজ্জামান বাবু *ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনে* একটা অনুষ্ঠানে কথা বলছিলাম। অনুষ্ঠানের মাঝখানেই এল সেই আকাশ ভেঙে পড়া দুঃসংবাদ। বাংলা সাহিত্যের সম্রাট হুমায়ূন আহমেদ আর নেই। টিভির পর্দায় কান্না থামাতে পারি নি। পরে চ্যানেল আইতে একটি অনুষ্ঠানেও কান্না সংবরণ করতে পারি নি। এ নিয়ে আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন, আপনি এভাবে কাঁদলেন? এই প্রশ্নের জবাব কী? কেউ কি আমাকে এ ব্যাপারে সহায়তা করবেন, প্লিজ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাট্যকার হুমায়ূন আহমেদ

শফি আহমেদ

হুমায়ূন আহমেদ অকালে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর হাজারো বন্ধু, আত্মীয় পরিজন, লাখো পাঠক এবং কোটি ভক্তকুল এখনো এই বিষাদের আবহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। শহীদ মিনারে আনীত তার কফিনের প্রতি দৃষ্টিপাত করার জন্য সারা ঢাকা মহানগরী যেন সেদিন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। শ্রাবণী বরিষণ যেন বিচ্ছেদের বেদনাকে আরও নিথর, কিন্তু বাঙ্ময় করে তুলেছিল। টেলিভিশনের আনুকূল্যে বাংলাদেশের বাইরের লাখ লাখ বাঙালি সেই দৃশ্য অবলোকন করে একটি বিষয়ে নিশ্চিত বোধ করেছিলেন যে, জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী স্থানটাই হুমায়ূন আহমেদের। অন্তত জীবনাবসান-উত্তর শেষযাত্রা থেকে তা অনুমান করা যায়। ঢাকার শহীদ মিনার থেকে গাজীপুরের নুহাশপল্লীর দৃশ্য সে কথার পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'তিথিডোর' উপন্যাসে দু'এক পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের যে দৃশ্য এঁকেছেন, তা মনে পড়েছিল আমার, হয়তো আরও হাজারো পাঠকের। আর একটি প্রাকৃতিক মিলও কেমন করে মনটা ভিজিয়ে দেয়। সাত দশকের কিছু আগে ১৯৪১ সালে সে-ও ছিল এক শ্রাবণ মেঘের দিন।

বর্তমান রচনার জন্য আমার এই প্রাথমিক অনুচ্ছেদকে কিছুটা বাহুল্যমণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত বলে বিবেচনা করতে পারেন কেউ কেউ, তবে অনুমান করি এর অন্তরে-বাহিরে যে আন্তরিকতা আছে, তা নিয়ে কেউ সংশয় প্রকাশ করবেন না। তা ছাড়া এই লেখার প্রাথমিক ভিত তৈরি করার জন্য আমি এই সূত্র থেকেই একটা প্রাসঙ্গিক বিষয় অবতারণা করতে চাই। উল্লেখ করতে চাই, টেলিভিশনে যে দৃশ্য দেখা গেছে, তার চেয়ে শত গুণ মানুষ বেদনার্ত হয়েছেন, রোদনার্ত হয়েছেন নাগরিক পরিসরের বাইরে গ্রাম-গ্রামান্তরে, অজ পাড়াগাঁয়, লাখো বসার ঘর, শয়নকক্ষ এবং রান্নাঘরে। টেলিভিশনের কর্মীরা নানা বিদগ্ধজনের প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছিলেন যে, সত্তর পেরিয়ে আশির দশকে পড়ার সেই সময়টাতে সমাজে যে পাঠকখরার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, হুমায়ূন আহমেদের বিভিন্ন রচনা ছিল তার বিপক্ষে এক নির্ভুল সদুত্তর। তিনি আমাদের সমাজে পাঠাভ্যাস ফিরিয়ে আনতে বা তা সুদৃঢ় করতে সবচেয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অনেকগুলো লেখাতেও সেকথা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। আর পাঠাভ্যাসের প্রকৃতি এমন উদারপন্থী ও সংক্রমণপ্রবণ যে, পঠনের ইচ্ছা যখন পরিণতি পায়, তা আর হুমায়ূন আহমেদ নামে একজন জাদুকরী কথাসাহিত্যিকের সৃষ্টির পৃষ্ঠায় আটকে থাকে না, তা কবিতায় শামসুর রাহমান-আল মাহমুদের গন্তব্যে যেতে চায়, ছোটগল্পের নেশায় ছুটে যেতে চায় হাসান আজিজুল হকের দিকে, উপন্যাসের ভুবন ভ্রমিয়া ছুঁয়ে দেখতে চায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ শামসুল হক-সেলিনা হোসেনকে, নাটকের জন্য পদবিক্ষেপে সাহসী হয়ে ওঠে সেলিম আল দীনের জটিল ও ধূসর শিকড় সন্ধানে। এই নামোল্লেখ নেহাতই নেতৃস্থানীয় কতিপয় প্রখ্যাতজনের। এর বাইরে, দেশের বাইরের, এমনকি সাহিত্যজগতের বাইরের বহু লেখক ও অসংখ্য বিষয়ের লেখা আছে। হুমায়ূন পরোক্ষভাবে সেইসব পঠনেও একটা অদৃশ্য কিন্তু ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বলে অনুমান করতে পারি। এজন্য সমগ্র সমাজ এবং বিশেষত প্রকাশকবৃন্দ তাঁর প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবেন। পাঠ এমন একটা বিষয় যা আমাদের সমগ্র সামাজিক উন্নয়নেরও একটি সূচক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এর একটা আবর্তনিক অভিঘাত আমরা অনেকেই অনুভব করতে পারি।

এই যে হুমায়ূনের সুবিপুল পাঠকগোষ্ঠী, তারা তাদের অতিপ্রিয় লেখককে হারিয়েছেন। কিন্তু তাঁর জীবনাবসানের এই এতদিন পরও প্রায় প্রত্যহ এবং বিশেষত ছুটির দিনে আক্ষরিক অর্থেই যে হাজার হাজার মানুষ, যাদের মধ্যে বেশ একটা বড় অংশ নারী, যারা অনেকেই তরুণ বা মাঝবয়সী গৃহবধূ ও প্রৌঢ় পুরুষকুল, নুহাশ পল্লীতে আসছেন কোন এক গভীর প্রাণের টানে, যাকে শুধু কবর জিয়ারত ক্রিয়া ও নুহাশ উদ্যান দর্শন হিসেবে গণ্য করা যায় না বলে আমি মনে করি, তাদের অধিকাংশই তো এমন বিদ্যার্জনের সুযোগ পায় নি, যার দ্বারা তারা হুমায়ূনের বই পড়তে পারেন। সম্ভবত এমন শিক্ষাবঞ্চিত সাক্ষরতা দক্ষতাবিহীন অপাঠক কিন্তু তার প্রশ্নাতীত ভক্তরাই সংখ্যায় অনেক বেশি। এরা যে হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্য সম্পর্কে একেবারে জানেন না, তা কিন্তু নয়। এদের মধ্যে অনেকে হুমায়ূনের বহু কাহিনি প্রায় নিখুঁতভাবে দৃশ্য পরম্পরায় বলে যেতে পারেন। তাদের প্রিয় লেখকের মৃত্যুর পর অনেকেই সেইসব দৃশ্যের স্মৃতিচারণা করেছেন, কারও একটু ভুল হলে অন্যজন বা কয়েকজন তা ধরিয়ে দিয়েছেন। সাধারণ বা আভিধানিক অর্থে এমন লাখ লাখ মানুষ হুমায়ূনের 'পাঠক' নন। হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে, সেই বিগত শতাব্দীর শেষ দশকের প্রথম ভাগে ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মিছিল ও সমাবেশ, সেখান থেকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল বাকের ভাইকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না। বাস্তবে নয়, কথাসাহিত্যের কাহিনির ধারাক্রম বা পরিণতিতে তা করা যাবে না এমন দাবিতে সামাজিক সমাবেশ বা আন্দোলন করার ঘটনা আর কোথাও ঘটেছে বলে আমাদের পরিজ্ঞাত নয়। ঠিক ওই সময় আমি কিছুদিনের জন্য বিদেশে অবস্থান করছিলাম। তখনো অনলাইনে পত্রিকা পাঠের সুযোগ গড়ে ওঠে নি। জার্মানির রাজধানীতে বসবাসরত বাঙালিদের কাছ থেকে ওই সংবাদ শুনে আমি রীতিমতো বিস্মিত হয়েছিলাম। বাকের ভাইকে বাঁচিয়ে রাখার সপক্ষে যারা রাস্তায় নেমেছিল, তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য যা-ই থাক, তাদেরকে আওয়ামী লীগ বা বিএনপির সমর্থক হিসেবে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যাবে না, তাদের সম্মিলিত করার জন্য মাথাপিছু বিশ বা পঞ্চাশ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ছিল না, তারা অধিকাংশই সম্ভবত ছিল 'কোথাও কেউ নেই' গ্রন্থের অপাঠক এবং সাধারণভাবে পাঠক্ষমতারহিত।

আবার উল্লেখ করতে চাই, হুমায়ূন আহমেদ সৃষ্ট পাঠাভ্যাসের বাইরে থাকা জনসংখ্যাই তাঁর কৃতি ও সাহিত্যের সপ্রবল ভক্ত। এরা টেলিভিশনের পর্দায় তাঁর কাহিনির উপস্থাপনার একনিষ্ঠ দর্শক। এই অপাঠক এবং পাঠক সবাই মিলে হুমায়ূনের নাটক দেখেছেন ছোট পর্দায়, গভীর অনুরাগে। সেসব কাহিনি নিয়ে তখনই আলোচনা-পর্যালোচনায় মেতে উঠেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর সবাই মিলে আবার স্মৃতিকাতর হয়ে উঠেছেন। টেলিভিশনের সেইসব পরিবেশনা তখন এবং অদ্যাবধি 'নাটক' হিসেবে পরিচিতি পেয়ে আসছে। শুধু হুমায়ূনের নয়, আরও খ্যাত-অখ্যাত বহুজনের কাহিনিও এমন অভিধা অর্জন করেছে। বিগত কয়েক বছরে দেখা যাচ্ছে, কখনো গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হবে না এমন পূর্বসিদ্ধান্ত নিয়েই টেলিভিশনে প্রদর্শনের জন্য অকাতরে নির্মিত হচ্ছে নাটক। এই এখানে ঢাকায় আর ওই ওখানে কোলকাতায়। আর এর জন্য বিভিন্ন চিহ্নায়ন ব্যবহার করা হচ্ছে। টিভি-নাটক, টেলিনাটক, প্যাকেজ নাটক, পর্বভিত্তিক ধারাবাহিক ইত্যাদি। হুমায়ূন আহমেদ পাঠাভ্যাস সৃষ্টি করতে এক অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন, সেকথা অনস্বীকার্য, কিন্তু আম-জনতার কাছে তাঁর সুবিপুল পরিচিতি নাট্যকার বা আরও বিশেষায়িত করে বললে টিভি নাট্যকার ও নির্দেশক হিসেবে। এবং অবশ্যই তাঁর কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত ও তাঁর নির্দেশিত চলচ্চিত্রের সঙ্গে ব্যাপক জনসাধারণের পরিচিতি, অনেক ব্যাপক। দেশে ও বিদেশে। বিদেশে যাবার সময়, আমরা অবধারিতভাবে আমাদের পরিচিত বাঙালি বন্ধুবান্ধবদের জন্য হুমায়ূন আহমেদের এইসব নাটক ও ছায়াছবির ডিভিডি নিয়ে যাই উপহার হিসেবে। এবং প্রবাসীদের কাছে এসবের কদরও বেশ বেশি।

কিছুটা বন্ধুতার অন্তর্গত চাপে, কিছুটা বিস্তৃত গৌরচন্দ্রিকা রচনার অভিপ্রায়ে, কিছুটা আলোচনা-পর্যালোচনার সূচনাবিন্দুতে পৌছানোর নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় অনেকটা অংশ পেরিয়ে এখন আমার এই রচনার কেন্দ্রে পাঠকদের সম্ভাষণ জানাতে চাই। পাঠক, অপাঠক, অন্ধ ভক্ত, চোখ-খোলা অনুরাগী, মিত্র-অমিত্র, পরিচিত-অপরিচিত, গুণমুগ্ধ ও সমালোচক, এমন সব ধরনের মানুষের কাছে হুমায়ূনের যে পরিচয়ই থাকুক না। (যেমন, আমার কাছে হুমায়ূনের আলাদা একটা পরিচয় হলো, তিনি ছিলেন মানব-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে এক উৎসাহী ও অক্লান্ত পাঠক।) 'নাট্যকার' হিসেবে তাঁকে আমরা সাধারণত পৃথকভাবে গণ্য করি না। যে অর্থে আমরা মুনীর চৌধুরী, আনিস চৌধুরী, সেলিম আল দীন, সৈয়দ শামসুল হক, আবদুল্লাহ আল মামুন বা মামুনুর রশীদকে গণ্য করে থাকি। এর মাধ্যমে আমরা স্পষ্টতই টিভি-নাটকের সঙ্গে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত নাট্যসাহিত্য বা বিভিন্ন গোষ্ঠী কর্তৃক প্রযোজিত ও পরিবেশিত মঞ্চনাটকের পৃথক বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছি। কলকাতায় বা পশ্চিমবঙ্গে একটা প্রয়োগ বেশ প্রচলিত আছে। সম্ভবত সুপ্রসিদ্ধ নাট্যজন শম্ভু মিত্র প্রথমে এটার প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। নাটককার। প্রধানত মঞ্চের প্রয়োজনে বা মঞ্চপ্রযোজনার বিষয়টা মাথায় রেখে এবং নাট্যসাহিত্য ভুক্তির যোগ্যতাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে যারা নাটকের পাঠ বা text বা sub-text রচনা করেন, তাদের আলাদাভাবে নাট্যকার হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস লক্ষ করা গেছে। এর মধ্যে যা বিশেষভাবে বিবেচনার তা হলো, এমন 'নাটককার' মঞ্চভাবনা বা থিয়েটার কলাকৌশল এবং নাট্যকলার পরিবেশনা (performing) গুণের প্রতি সর্বদাই মনোযোগী। কাহিনি নিয়ে প্রাথমিক চিন্তাভাবনার সময়ই তিনি নাট্যরূপের ছক পরিকল্পনা করেন। রবীন্দ্রনাথকে আমরা 'নাটককার' বলি না, যদিও তিনি অনেক নাটকই রচনা করেছেন শুধু পরিবেশনার বিষয়টি নয়, দিনক্ষণ মাথায় রেখেও। কারণ, কাহিনি সঞ্চারের জন্য তাঁর মনোযোগের একাগ্রতা ছিল উপস্থাপনার দৃশ্যরূপের তুলনায় অধিকতর গভীর। হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্য বিচারে আমাদের এই জায়গাটিতে একটা সঙ্কটের মধ্যে পড়তে হয়। তাঁকে আমি কোনোভাবেই নাটককার বলতে পারব না। কারণ তিনি মঞ্চভাবনার প্রতি তাঁর আকর্ষণ তেমনভাবে প্রতিফলিত করেন নি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মনে পড়ে, বেশ কয়েক বছর আগে আমি ব্যক্তিগতভাবে এই প্রসঙ্গটা পেড়েছিলাম তাঁর সঙ্গে, তাঁর আবাসে। আমাদের সেই স্বল্পদৈর্ঘ্য সংলাপের সারকথাটা ছিল এরকম। সদা স্পষ্টবাক হুমায়ূন আহমেদ আমাকে জানালেন যে, মঞ্চনাটক বিষয়ে তাঁর উৎসাহ প্রবল নয়, অন্তত নিজের লেখাকে মঞ্চে পরিবেশনার জন্য নির্দিষ্টভাবে প্রস্তুত করার বিষয়ে। কারণটা খুবই সুস্পষ্ট ও অকপট। তিনি বলেছিলেন, সবাই মিলে কত রকমের পরিশ্রম করে অনেকদিন মহড়া দেওয়ার পর নিজেদের সময় ও অর্থ ব্যয় করে আমরা যে মঞ্চনাটক বানাই, তা খুবই সফল হলেও, পঞ্চাশ সন্ধ্যা অভিনীত হওয়ার পরও, যত মানুষ এটা দেখেন, একবার টেলিভিশনে প্রচারিত হলেই দর্শকসংখ্যা দাঁড়ায় তারও চেয়ে বহুগুণ বেশি। হুমায়ূনের ওই মন্তব্যের মধ্যে যে বাস্তব যুক্তি আছে, তার বিপরীতে বলার মতো আমার কিছু ছিল না। কিন্তু মঞ্চনাটক ও আর ভাবনার সঙ্গে যেহেতু আমার নাড়ির টান, তাই আমি কিছুটা কষ্ট পেয়েছিলাম। এইজন্যে যে, হুমায়ূনকে মঞ্চনাটকের সীমানায় আনতে পারলাম না এবং ওঁকে নিয়ে আমাদের কর্মকাণ্ডের গতিশীলতা বা জনপ্রিয়তা বাড়ানোর কোনো সম্ভাব্য সুযোগ নেই।

আরও একটা বিষয় আমাদের বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই যে হুমায়ূনের অনেকগুলো উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রস্তুত করা হলো, আবশ্যিকভাবেই টেলিভিশনের পর্দায় প্রদর্শনের জন্য, সেই চিত্রনাট্যও আলাদা করে প্রকাশ করার কোনো আন্তরিক তাগিদ দেখা যায় নি তাঁর মধ্যে। টেলিভিশনে পরিবেশিত অত্যন্ত জনপ্রিয়, সুনির্মিত, সুপরিকল্পিত যেসব কাহিনি ও বহুদিন ধরে প্রচারিত ধারাবাহিক সৃজনশীল সাহিত্যের যথার্থ অঙ্গ হয়ে উঠতে পারত, সেইগুলোরও কোনো মুদ্রিত ও প্রকাশিত নাট্যরূপ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। লেখক নিজে যদি এ বিষয়ে যথাবিহিত উৎসাহ প্রদর্শন করতেন, তা হলে তাঁর জনপ্রিয়তার নিরিখেই প্রকাশকবৃন্দ এই কাজে এগিয়ে আসতেন। কিন্তু ব্যাপারটা তো সেভাবে ঘটে নি। ক্যামেরাবন্দি করে ছোটপর্দায় মানবজমিনের যাপিত বিচিত্র রেখাঙ্কনে হুমায়ূন আহমেদের যে আগ্রহ ছিল, নাট্যসাহিত্যে অবদান রাখার বিষয়ে তিনি সে রকম মনোযোগী ছিলেন না। মঞ্চনাটক, বলতে চাইছি বাংলাদেশের বা ঢাকার মঞ্চনাটক, বিষয়ে হুমায়ূন আহমেদ বিশেষভাবে আকর্ষণ বোধ করতেন, এমন তথ্য আমাদের জানা নেই। তিনি যে এর দ্বারা মঞ্চনাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহুজনের উদ্যোগ সম্পর্কে উদাসীনতা প্রদর্শন করছেন বা প্রত্যাখ্যান জ্ঞাপন করছেন সে কথা হয়তো বলা যাবে না। মঞ্চনাটকের অনেক তারকাকে তিনি টিভি নাটকে এবং তাঁর নির্মিত ও নির্দেশিত চলচ্চিত্রে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে সংস্কৃতিজগতে আমাদের মঞ্চনাটকের দায়বদ্ধতা, সম্মিলিত উদ্যোগ, অতীত ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংমিশ্রণ বিষয়ে অনেকেই প্রশংসা করলেও, হুমায়ূন আহমেদকে মঞ্চে এসে আমাদের নাটক উপভোগ করতে দেখি নি। আমার অন্যান্য বন্ধু যাঁরা নাটকে কাজ করেন, তাঁদের জিজ্ঞেস করেও জেনেছি, হুমায়ূন নাটক দেখতে আসতেন না। হতে পারে, তিনি ভিড় পছন্দ করতেন না, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো তাঁর 'জনতার জঘন্য মিতালী' ভালো লাগত না। যাই হোক, মঞ্চনাটকের সঙ্গে তাঁর কোনো দৃষ্টিগ্রাহ্য সখ্য গড়ে ওঠে নি।

তাই সারা দেশে, ভারতে ও বিদেশের বহু অঞ্চলে হুমায়ূন আহমেদের নাটকের লাখো অনুরাগী ও গুণগ্রাহী থাকলেও, তাঁর রচিত নাটক বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রাথমিক রসদ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে বাজারে আছে একটি মাত্র পুস্তক। গ্রন্থের নাম *স্বপ্ন ও অন্যান্য মঞ্চ নাটক সমগ্র*।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থের নামের সঙ্গে 'সমগ্র'-বাচক একটা ব্যাপ্তিসূচক শব্দের অবস্থান সত্ত্বেও এই বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ১৬৩। সময় প্রকাশন থেকে বের হওয়া এই বইটিতে বিভিন্ন আয়তনের নাটক আছে মোট ছয়টি। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারির বইমেলায়। অদ্যাবধি এই গ্রন্থের কোনো দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয় নি। হুমায়ূন আহমেদ রচিত কোনো গ্রন্থ সম্পর্কে এ এক অবিশ্বাস্য তথ্য।

লেখক নিজে যে বইটার শিরোনামে 'মঞ্চনাটক' শব্দবন্ধনির বিশেষায়িত বিশেষ্য জুড়ে দিলেন, তা থেকে যে বিষয়টা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, তা হলো, তিনি নিজে এটাকে আলাদা করে দেখতে চাইছেন। তিনি যেমন সাধারণভাবে পরিচিত ও স্বীকৃত 'নাটক' বলতে পাঠকরা যা বোঝেন, তা থেকে একটা প্রায়োগিক দূরত্ব সৃষ্টি করছেন 'মঞ্চ' শব্দটি জুড়ে দিয়ে, তেমনি তিনি সচেতনভাবে 'জনপ্রিয়' টিভি নাটক থেকেও একটা স্বতন্ত্র অবস্থানকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তাঁর এই সচেতন প্রয়াসটা যুক্তিযুক্তভাবে অনুধাবন করা যায়। তিনি নিজেই টেলিভিশনে পরিবেশিত নানা নাটকের মাধ্যমে এক ধরনের পরিশীলিত জনরুচি এবং দর্শক-প্রত্যাশা সৃষ্টি করেছিলেন। এই গ্রন্থস্থিত নাটকসমূহ ঠিক তার সঙ্গে অভিপ্রেত যুগলবন্দি রচনা করতে পারে না। কিন্তু পরিবেশনাগত ব্যাকরণ ও পরিকল্পনার দিক থেকে তা যে আবশ্যিকভাবে এবং চরিত্রগতভাবে ভিন্ন, আমি নিজে তা মনে করি না। কিন্তু পঠনপ্রক্রিয়ায় ভিন্নতাকে সহজেই শনাক্ত করা যাবে এবং রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতাও এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশে, বিশেষত ঢাকা মহানগরীতে মঞ্চনাটকের দৃশ্যমান সফলতার পরও আমাদের মঞ্চে এই গ্রন্থস্থিত নাটকের প্রযোজনা তেমন দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে নি। অথচ তিনি নিজেই তো বাংলাবাজার এবং টেলিভিশন পাড়ায় বারবার নিজের জনপ্রিয়তার মাত্রা অতিক্রম করে যাচ্ছেন। মঞ্চনাটকের বেলায় যে তাঁর সবিশেষ ঘাটতি রয়েছে, তা পূরণে হুমায়ূন আহমেদ অন্তর্গতভাবে দায় বোধ করেন নি। অবশ্য তিনি একবার অন্তত তাঁর নাটকের মঞ্চ প্রযোজনার বিষয়ে বেশ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। এ বিষয়ে একটু পরে আলোচনা করব।

স্বপ্ন ও অন্যান্য মঞ্চ নাটক সমগ্র গ্রন্থের জন্য হুমায়ূন আহমেদ একটা অতি-ক্ষুদ্র ভূমিকা লিখেছিলেন। সাহিত্য পর্যালোচনার বিচারে এটাকে ভূমিকা হিসেবে চিহ্নিত করা সমীচীন নয়। লেখক নিজেও তা করেন নি, আবার 'লেখকের কথা'— এমন কোনো কিছুও বলেন নি। অন্য অনেক বইয়ের ভূমিকার ক্ষেত্রে যে হালকা একটা মেজাজ দ্রষ্টব্য, এখানেও তা আছে। হুমায়ূনের নিজস্ব ওই বাক্যকতিপয়ের বিচার-বিবেচনার মধ্য দিয়েই আলোচনায় আলোকপাত করা সহজ হয়ে উঠবে।

> যশোহরে একবার নাটকের উপর একটি সেমিনার হলো। সেমিনারেরর বিষয়বস্তু 'বাংলাদেশে মঞ্চনাটক : সঙ্কট ও সম্ভাবনা'। আমি সেই সেমিনারে নিমন্ত্রিত অতিথি। মূল প্রবন্ধ যিনি পাঠ করলেন, তিনি বাংলাদেশের মঞ্চনাটকে সংকট হিসাবে যে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করলেন তার একটি হচ্ছে—'হুমায়ূন আহমেদ'। আমি মন খারাপ করে তাঁর বক্তব্য শুনলাম। তিনি যদি বলতেন, আমি নাটক লিখতে পারি না, যা লিখেছি সবই পা-ধোওয়া পানি, তা হলেও এতটা খারাপ লাগত না। আমি কেন মঞ্চনাটকে সংকট সৃষ্টি করব ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> ঢাকায় একটি সেমিনার হলো। খুব নামি-দামি বক্তারা সেখানে অংশ নিলেন। সেই সেমিনারে বলা হলো, আমি টিভি নাটকে সঙ্কট সৃষ্টি করেছি। অতি হালকা জিনিসে দর্শকদের অভ্যস্ত করে ফেলেছি বলে দর্শকরা এখন আর ভালো নাটক গ্রহণ করছে না।
>
> এই অবস্থায় মঞ্চনাটক সমগ্র বের করতে হলে দুঃসাহস লাগে। আমার তা নেই, তবে আমার প্রকাশকের আছে। সময় প্রকাশন-এর ফরিদ এই কাজটি করল। তাকে তার সাহসের জন্য ধন্যবাদ।

হুমায়ূন আহমেদের এই চটুল ভঙ্গির ব্যঞ্জনাকে বিশ্লেষণ করেই তাঁর নাটক বিষয়ে আলোচনা মূল্যবান হয়ে উঠবে। তার আগে, প্রাসঙ্গিক সূত্রেই অন্য এক ধরনের অভিজ্ঞতার কথা এখানে সংযোজন করতে চাই। ঢাকাতে বেসরকারি উদ্যোগ ও সামষ্টিক প্রচেষ্টায় এক বছরের সময়সীমার একটি নাট্যপ্রশিক্ষণ কোর্স দেওয়া হয় একটি প্রতিষ্ঠানে। মঞ্চনাটকের সঙ্গে যুক্ত গুণী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এখানে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পাঠ দান করেন। ব্যক্তিগতভাবে আমিও এখানকার একজন নিয়মিত শিক্ষক। প্রতিষ্ঠানটির নাম 'থিয়েটার স্কুল'। ভর্তির জন্য অনেক ছেলেমেয়ে আবেদন করে। তাই একটা নির্বাচনী পরীক্ষা নিতে হয়। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় বা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এই প্রশিক্ষণে আগ্রহ প্রদর্শন করে। বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্যে প্রায় অনিবার্য একটা বিষয়ে তাদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়। যখন জিজ্ঞেস করা হয়, বাংলাদেশের একজন প্রধান নাট্যকারের নাম বলো বা কোন নাট্যকারের নাটক দেখেছো, তখন একটা স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর পাওয়া যায়, হুমায়ূন আহমেদ। একথা অনস্বীকার্য যে, ঠিক এই উত্তরটি আমাদের সন্তুষ্ট করে না ও নাটকের ধ্রুপদী এবং আধুনিক উভয় সংজ্ঞায়নের দিক থেকে আমরা এই উত্তরকে যথাযথ বলে বিবেচনা করি না। বছরের পর বছর ধরে এই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ক্রমচলমান।

হুমায়ূন আহমেদকে 'নাট্যকার' হিসেবে চিহ্নিত করার উত্তরটাকে আমরা গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করি না, কারণ, তিনি প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য ও মঞ্চায়নের দিক থেকে নাট্যসৃজনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন নি। আর টেলিভিশন নাটক নামক একটি বিশেষ শাখায় তাঁর জনপ্রিয়তা এতটাই শীর্ষে যে, শিক্ষার্থীরা নাট্যকার হিসেবে তাঁর নাম উচ্চারণে যথাযথভাবেই প্ররোচিত বোধ করে। যশোরে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রবন্ধপাঠক যখন এমন কোনো মন্তব্য করেন এবং যেটাকে হুমায়ূন বলছেন বা মনে করছেন তাঁর নিজের দ্বারা সৃষ্ট সঙ্কট, তখন থিয়েটার স্কুলে আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সেটাকে সমান্তরাল বলে বিবেচনা করতে হবে। সাধারণভাবে যখন টেলিভিশনে প্রচারিত কাহিনিকে 'নাটক' বলা হয়, আমরা তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক দিক থেকে তা মানতে পারি না। থিয়েটার বা মঞ্চে দৃশ্যসংস্থান, আলোকসম্পাত, মঞ্চে কুশীলবদের স্থানিক সংস্থাপন এবং বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর (props) পরিকল্পনা ও মঞ্চে তার বিন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে একটা আলাদা সংহতি রচনা করতে হয়। টেলিভিশন নাটক বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে এসব বিষয়ের বিবেচনা অগ্রাধিকার পায় না। যাকে আমরা টিভিনাটক হিসেবে চিহ্নিত করি এবং বহুদিনের প্রাত্যহিক বহু অবলোকনে যেটা একটা আলাদা শাখার মর্যাদা লাভ করেছে, তার সঙ্গে নাটকের চেয়ে চলচ্চিত্রের যোগ বেশি। চলমানতার যে উপাদান স্বতন্ত্র নামের মধ্যেই বিধৃত, তা থেকে বিষয়টা বোঝা যাবে। মঞ্চনাটকে আমরা গাড়ি, বাস বা ট্রেন চলাচলের দৃশ্যের ওইটুকু সংযোজনই করতে পারি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাতে ওই ক্রিয়া বা চলমানতা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যায়। দৃশ্যান্তরে যানবাহনের গন্তব্যে একটি স্থান দেখাতে পারি। কিন্তু কয়েক মিনিট ধরে গাড়ি চলছে, অভিনেতারা তার মধ্যে কথোপকথন চালিয়ে যাচ্ছেন, এমন ব্যবস্থা চলচ্চিত্রের বেলায় মানিয়ে যায়, নাটকে সাংকেতিক উপস্থাপনা ব্যতীত তা বেমানান। আর পরিবেশনার দিক থেকে এমন চলমান ও গতিশীল এবং নাটকের অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও স্থানগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি সততই উদাসীন উপস্থাপনাকে আমরা নাটক বলে বিবেচনা করব না।

টেলিভিশনে যে কাহিনিগুলোকে নাটক নামে প্রচার করা হয় তার মাধ্যমে ওই শাখার নিজস্ব প্রয়োজনার চরিত্রে পরিবর্তন সূচিত হয় এবং ওই পরিবর্তিত সংজ্ঞাই ইলেকট্রনিক মাধ্যমের বিপুল আগ্রাসী শক্তির চাপে সাধারণ্যে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। নাটক তার আদি কৃতি ও চরিত্র নিয়ে টিকে থাকার জন্য হুমকির সম্মুখীন হয়। টেলিভিশনের জন্য যাঁরা নাটক লিখছেন তাঁরা এভাবেই মৌলিক নাটক বা মঞ্চ পরিবেশনার জন্য সঙ্কট সৃষ্টি করেছেন। একথা তো এখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, অনেকে শুধুই টিভি নাট্যকার। নাটক রচনায় তাঁদের প্রাথমিক বিবেচনা উপলক্ষ (ঈদ, রবীন্দ্র জয়ন্তী, ভ্যালেন্টাইনস ডে), বিশেষ চ্যানেল (যেখানকার কর্মকর্তা বা প্রযোজককে চিত্রনাট্যটি বিক্রি করা সহজ হবে) এবং চরিত্রাভিনেতা (কে কতটা জনপ্রিয়) ইত্যাদি। হুমায়ূন আহমেদ টেলিভিশনে প্রচারিত 'নাটক' রচনা ও নির্দেশনায় মানুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে প্রায় জাদুকরী সাফল্য প্রদর্শন করেছেন। এজন্য তাঁর গুণ ও নিষ্ঠার প্রশংসা করতেই হবে। এবং স্বাভাবিক কারণেই তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে টিভি নাট্যকারদের একটা প্রবল প্রজন্মই তৈরি হয়ে গেল, যারা চটুলতা, অনুসৃতিপ্রবণতা ও শিল্পসৃজনে আপোসকামিতায় প্রায় নেশাগ্রস্ত হয়ে উঠল। হুমায়ূন আহমেদ কথিত সঙ্কটের কথাটা এখন বোঝা যাচ্ছে বোধহয়। এর জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ক্যামেরা, কম্পিউটার ও ক্যাবল অপারেশন, সবকিছুরই দায় আছে, শুধু টিভি নাট্যকারবৃন্দের নয়। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বহু অঞ্চলে সিনেমার প্রেক্ষাগৃহের অস্তিত্বে মড়ক লেগেছে। বাড়িতে বসে টিভির ছোটপর্দায় সব ছবি দেখা যায়। আর ডিভিডি প্রযুক্তি সহজলভ্য ও স্বল্পমূল্য হয়ে ওঠার কারণে সিনেমা ব্যবসায় দুরারোগ্য ধস নেমেছে। থিয়েটারের জন্যও এটা একটা ধ্বংসপ্রবণ হুমকি, যা মঞ্চনাটককে বিপন্ন করে তুলেছে। কিন্তু নাট্যকর্মীরা এমন প্রবল ইলেকট্রনিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের শক্তি দিয়ে লড়ে যাচ্ছে। অস্তিত্বের সঙ্কটের মোকাবিলা করছে। তারা সমাজ ও শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং ভেতরে-বাইরে সর্বদা একটা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। একথাটাও স্বীকার করতে হবে।

এই আলোচনার জন্য আমার কাছে প্রাথমিক সূত্র হিসেবে হুমায়ূন আহমেদের যে বইটি রয়েছে, তার ভিত্তিতে নিশ্চিত করে বলতে পারছি না যে, ছোট-বড় মিলিয়ে এই ছয়টি নাটকের মধ্যে কোনটি কোন সালে লেখা হয়েছিল। তেমন কোনো তথ্য বা পরিচিতি দেওয়া নেই এই গ্রন্থে। সুতরাং নাট্যকার হুমায়ূনের বিবর্তন বিষয়ে কোনো অভিমত প্রকাশ করা যাচ্ছে না। লেখক যে কেন এগুলোকে আলাদা করে মঞ্চনাটক বলছেন, সে বিষয়ে আমার ভাবনা আগেই উল্লেখ করেছি। মঞ্চনাটকের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে যতটুকু প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করতে পেরেছি তা হলো, 'মহাপুরুষ' এবং 'নৃপতি' এই দু'টি নাটক মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। তার মধ্যে প্রথমোক্ত নাটকটির সঙ্গে মঞ্চের যোগটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক। গ্রন্থিত বা প্রকাশিত হওয়ার আগেই হুমায়ূন আহমেদ এই নাটকটি একটি দলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঞ্চায়নের জন্য রচনা করেছিলেন। এই তথ্য আমাদের জন্য সত্যিই সদর্থক। নাটকটির প্রযোজনা করেছিল ঢাকার খ্যাতনামা একটি দল, 'নাট্যজন'। নির্দেশনা দিয়েছিলেন একজন কৃতী অভিনেতা-পরিচালক, কেরামত মাওলা। নাট্যজনের প্রধান তবিবুল ইসলাম বাবু ও নির্দেশকের সঙ্গে আলাপচারিতায় যা জেনেছি তা বেশ স্বস্তিদায়ক ও আনন্দের। তারা দু'জনেই জানালেন যে, হুমায়ূন এই নাটকটির মঞ্চায়ন নিয়ে খুবই রক্ষণশীল ছিলেন। নাট্যজনের আর এক কর্ণধার মমতাজ উদ্দিন আহমদ কিছু কিছু জায়গায় পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন, তাতে তিনি সম্মতি দেন নি। নির্দেশক পাণ্ডুলিপির কাঠামোর মধ্যে রেখেই পরিবেশনায় পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছেন। এই নাটকে হুমায়ূন আহমেদের কি আলাদা কোনো বার্তা ছিল, এমন প্রশ্নের উত্তরে কেরামত মাওলা জানান, নাট্যকার মনে করেছেন কালের নিয়মে বিভিন্ন বিরতিতে বিভিন্ন স্থানে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়; তিনি এমন একজন মানুষ যিনি সাধারণের চেয়ে বিশেষভাবে আলাদা এবং সমকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক দূষণে তাঁর জীবনের পরিণতিও প্রত্যাশিত চরিত্রের হয় না।

প্রচলিত নাটকের আদলে হুমায়ূন আহমেদ তাঁর নাটকের প্রারম্ভে কোনো চরিত্রলিপি প্রদান করেন না। 'মহাপুরুষ' নাটকটিতে সর্বমোট নয়টি দৃশ্য আছে। নাট্যকার যে মঞ্চের বিষয়টা বিবেচনায় রেখেছিলেন তা নাটকের শুরু থেকেই বোঝা যায়। একজন ভিখারি সুর করে ইসলামি গান গেয়ে মানুষের কৃপা প্রার্থনা করছে। সুরটা বেশ ছন্দময় ও পরিচিত। এবং এমন শুরুতেই সাদা চাদর গায়ে দীর্ঘদেহী ব্যক্তি প্রবেশ করেন। তাঁর জন্য কোনো নাম বরাদ্দ করেন না নাট্যকার। তিনিই মহাপুরুষ। ওই ভিখারির একটা ৮/৯ বছর বয়সী মেয়ে আছে। তাদের কথোপকথনে নাটকীয় সংলাপের মজাটা বেশ অনুভব করা যায়। প্রকৃতপক্ষে হুমায়ূন তাঁর কথাসাহিত্যের পাতায় অনুরূপ বহু বিনোদনময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। এর পর রমিজ (বয়স ৪৫/৫০) প্রবেশ করে। সাদা চাদরে পরিহিত ব্যক্তি নিজেই ঘোষণা করেন যে, তিনি একজন মহাপুরুষ। রমিজের সঙ্গে তার সংলাপও বেশ নাটকীয় কিন্তু প্রধানত কৌতুককর। এই নাটকে অন্য যেসব চরিত্র আমরা দেখতে পাই, তারা হলো, ফরিদ, আধুনিক কালের এক যুবক, পরিস্থিতির শিকার হয়ে সে সহিংসতার পথ বেছে নিয়েছে, রমিজের পুত্র সে। আছে ফরিদের সমবয়সী জামিল, সেও ফরিদের মতো একই প্রকরণে ব্যাধিগ্রস্ত। দ্বিতীয় দৃশ্যে ফরিদ দর্শকদের উদ্দেশে একটা সুদীর্ঘ সংলাপ উচ্চারণ করে। তা থেকে বর্তমান সমাজের সঙ্কট ও সংশয় বিষয়ে আঁচ করা যায়। একটা পরিবারের দৃশ্য দেখতে পাই আমরা। বাবা, এক বিপথগামী পুত্র, দুই বোন—তার মধ্যে যেজন বিবাহিতা সে স্বামীগৃহের অত্যাচারে পিত্রালয়ে ফিরে আসে, অবিবাহিতা তরুণী লীনা মহাপুরুষের গল্প শুনে তাকে যে-কোনো মূল্যে তাদের বাড়িতে আনার জন্য হন্যে হয়ে ওঠে, আছে কাদের নামের এক গৃহভৃত্য। হুমায়ূনের কাহিনি সংগঠনের নিজস্ব অবয়বটা সহজেই আবিষ্কার করা যায়। মহাপুরুষ হিসেবে যাকে চূড়ান্তভাবে দেখা যায়, তিনি দরিদ্র শিক্ষক, টিউশনি করে দিনযাপনেই খুশি। কিন্তু ফরিদ আত্মরক্ষায় ও বীতানুতাপ ঘৃণ্য কৌশলে তাকে জামিলের খুনি সাব্যস্ত করে দেয়। নাটকে এমনসব দৃশ্য আছে, যা বাস্তব ও প্রাত্যহিক, কিন্তু এই বাস্তবতা খুব কুটিল। মঞ্চনাটক হিসেবে 'মহাপুরুষ' বেশ সফল হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, এই নাটকটি বেশ মঞ্চসাফল্য অর্জন করেছিল। এই নাটকের ৫৬টি প্রদর্শনী হয়েছিল। ঢাকার মঞ্চে প্রযোজনা হিসেবে খুবই দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছিল। পঞ্চাশতম রজনীর অভিনয় উপলক্ষে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। হুমায়ূনের বিশেষ ইচ্ছাপূরণে ওই সন্ধ্যার প্রধান অতিথি ছিলেন কবি শামসুর রাহমান। মঞ্চনাটক থেকে আধুনিক দর্শকদের প্রত্যাশা বিবেচনা করে যদি 'মহাপুরুষ' কিছুটা পরিমার্জন ও পরিবর্ধনে করে এই এখন প্রযোজনা করা হয়, তা কালের দাবি মেটাতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমার ব্যক্তিগত অভিমত হুমায়ূনের সবগুলো নাটকের মধ্যে 'নৃপতি'-তে মঞ্চনাটকের উপাদান সবচেয়ে বেশি। এই নাটকটিও অবশ্য ঢাকার মঞ্চে প্রযোজিত হয়েছিল। নান্দনিক নাট্য সম্প্রদায় এটা মঞ্চায়ন করেছিল। এটা তেমন প্রতিষ্ঠিত দল নয় এবং সাংগঠনিক শক্তির ঘাটতি থাকার জন্যই সম্ভবত এই প্রযোজনা খুব বেশিদিন চলে নি। আমি এর কোনো প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলাম না। তাই সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারছি না, তবে নির্দেশনা ও সামগ্রিক পরিবেশনার যে চাহিদা, তা-ও হয়তো পূরণ করা হয় নি। 'নৃপতি'র কাহিনির প্রারম্ভিক দৃশ্য থেকেই বোঝা যায় ব্যঙ্গরচনার মাধ্যমে নাট্যকার কাহিনি এগিয়ে নিতে চাইছেন। নেপথ্য কণ্ঠের মাধ্যমে প্রচলিত সূত্রধরের একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে। 'মহিমগড়ের মহামান্য রাজা প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্য পথে নেমেছিলেন। সন্ধ্যার আগেই তাঁর রাজপ্রাসাদে ফেরার কথা—তিনি ফিরলেন না। পথ হারিয়ে ভূষণ্ডি মাঠে বসে রইলেন। রাত বাড়তে লাগল। আমাদের আজকের গল্প মহিমগড়ের নৃপতির গল্প। গল্প শুরু করছি এইভাবে—এক দেশে এক রাজা ছিল।' এরপর কিশোর-কিশোরীদের কণ্ঠে গান পরিবেশিত হবে। রাজা-প্রজার সংলাপে হুমায়ূনের স্বতন্ত্র বাকভঙ্গি ও রসবোধ শনাক্ত করা যায়। রাজা মজনু নামের চোরের পিঠে উঠে বসেন। বৃদ্ধ ও তরুণী সুর করে রাজাকে শুনিয়ে দেয়—'রাজা সাবরে বলতে চাই। আমরার পেটে ভাত নাই, শীত পড়েছে আকাশ-পাতাল শীতে কষ্ট পাই।' এমন পরিস্থিতির পরিবেশনায় বাস্তবতা ও অবাস্তবতাকে চমৎকারভাবে জুড়ে দেওয়া যায় এবং একই সঙ্গে নাটকের অন্তর্নিহিত বার্তাকে মূর্ত করে তোলা যায়। রানীকেও দেখতে পাই পরের দৃশ্যে। কাহিনির গতি ও বিন্যাস একটা ধারায় চলতে থাকে; রানীর সহচরীদের ও একজন গানের ওস্তাদকেও দেখতে পাই। রানীর সঙ্গে তাদের কথোপকথনে রাজার শাসনে প্রজাদের দুর্গতির বিবরণ পাওয়া যায়। হুমায়ূনের এই নাটকে সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' ছায়াছবির একটা দূরাগত প্রভাব আবিষ্কার করা যায়। নাট্যকার চটুল কিন্তু দ্ব্যর্থবোধক গান ব্যবহারের অনেকগুলো অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। নির্দেশক ইচ্ছেমতো পোশাক পরিকল্পনা করতে পারেন, জাঁকজমক দিয়ে অতীতের নৃপতিদের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশের দুঃসময়ের কাহিনিটাও উপজীব্য করে তুলতে পারেন। ছড়ার ঢঙে বাচনভঙ্গি সৃষ্টি করা যায়, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আবহসঙ্গীত তৈরি করা যায়, খুবই চমৎকারভাবে তবলার বোল ব্যবহার করা যায়। আলোকসম্পাতেও নানা নিরীক্ষা সম্ভব। মাঠ, রাজবাড়ি, দরবারি কানাড়া, তা নিয়ে রসালো কৌতুক ইত্যাদির পরিবেশনায় মঞ্চের বিচিত্র কলাকৌশল প্রয়োগ করার অনেক অবকাশ আছে 'নৃপতি' নাটকে। চতুর্থ দৃশ্যের সবটাই গ্রাম; শীতকাল; কুশীলবরা সবাই গ্রামবাসী। এখানে আগের সেই চোর আছে, তরুণ-তরুণী আছে, শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচবার জন্য আগুন পোহানোর দৃশ্য আছে। দৃশ্যের এই বিপরীতধর্মী প্রতিতুলনাকে একজন দক্ষ নির্দেশক মঞ্চনাটকের জন্য চমৎকারভাবে তার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন। বাড়তি নাটকীয় ঝোঁক আনতে ব্রেশটের বিচ্ছিন্নকরণ রীতি প্রয়োগ করাও সম্ভব। হুমায়ূন আহমেদ নাটকটাকে যেভাবে পরিণতির দিকে নিয়ে যান, তাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বক্তব্য স্পষ্টতর হয়ে ওঠে, যদিও বুদ্ধিদীপ্ত দর্শক প্রথম দৃশ্য থেকেই তা অনুধাবন করতে পারেন। রাজা-রাণী-মন্ত্রী-ওস্তাদ-সহচরী এবং অন্যদিকে দরিদ্র দুর্গত মানুষ, এই বৈপরীত্য চরিত্রায়নে একটা দ্বান্দ্বিক অবস্থা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। 'নৃপতি' নাটকটিকে নেহাতই একটা কমেডি হিসেবে বিচার করলে ভুল হবে, বক্তব্যের তির্যক চরিত্র বোঝা যাবে নানা সংলাপ থেকে। প্রজাদের দুঃখে রাজার হঠকারী এবং স্বৈরাচারী প্রতিক্রিয়া আমাদের দেশের বিশেষ একটা সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। এবং তা থেকে বোঝা যায়, হুমায়ূন আহমেদ এমন নাটকের মধ্য দিয়েই নাট্যকর্মীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন।

বিষয়বস্তু মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে বারবার ফিরে ফিরে এসেছে হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যে, *জোছনা ও জননীর গল্প* উপন্যাসে যার বিস্তৃত ও ইতিহাসনিষ্ঠ উপস্থাপনা দেখেছি আমরা। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে হুমায়ূনের সাহিত্যকর্ম খুব বেশি উচ্চকণ্ঠ নয় এবং সেজন্য এই মহান ঐতিহাসিক ঘটনা চমৎকার শৈল্পিক প্রকরণে তাঁর লেখায় স্থান লাভ করেছে, উপন্যাস, ছোটগল্প ও অনেকগুলো টেলিনাটকে। *স্বপ্ন ও অন্যান্য মঞ্চ নাটক* সমগ্র গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে একটি নাটক আছে, নাম '১৯৭১'। গ্রামে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রবেশ, মানুষের জীবনশঙ্কা ও সঙ্কট, রাজাকার, শান্তি কমিটি, ঘরবাড়ির দাহ, হিন্দুদের হত্যা, নারীলালসা ইত্যাদি মুক্তিযুদ্ধের প্রায় সব অনুষঙ্গই এখানে আছে। হুমায়ূনের সাহিত্য হিসেবে আলাদা করে শনাক্ত করা যায় তেমন চিহ্নও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। নাটকে একজন গ্রামীণ কবি আছে, যে ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে বেশ পছন্দ করে, পাকিস্তানি মেজরের সঙ্গে সে ইংরেজিতে কথা বলে নির্ভয়ে, কিন্তু কিছুটা কৌতুকের ঢঙে, বাংলা কবিতা শোনায়, মেজরের সুবিধার্থে প্রতিটি পঙ্‌ক্তির আবার ইংরেজি অনুবাদ করে দেয়। এমন রসসৃজন হুমায়ূনের টিভি নাটকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মীর নামে একটা চরিত্র আছে, সেও হুমায়ূনী টিভি নাটকের ঢঙে কৌতুক পরিবেশন করে। গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনীর উপস্থিতির জন্য যে সামগ্রিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে, তার বিপরীতে পাগলামি, পাগল নিয়ে সংলাপ ইত্যাদি comic relief তৈরি করে। নাটকের একটা প্রধান চরিত্র রফিক। এই চরিত্রায়নে নাট্যকারের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। যে প্রকৃতপক্ষে মুক্তিবাহিনীর বা স্বদেশের পক্ষে কাজ করছে, কিন্তু সে বুদ্ধিমান রাজাকার হয়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে জনগোষ্ঠীর ব্যাপক সংহার থেকে বিরত করে। সম্ভাবনা থাকলেও এই নাটক মঞ্চের জন্য খুব উপযোগী বলে আমার মনে হয় না। কাহিনির মধ্যে একরৈখিকতা আছে, সংঘাতের বিষয়টা তেমন প্রাধান্য পায় না। চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেও তেমন সংহতি নেই।

গ্রন্থভুক্ত একটি নাটকের নাম 'অসময়'। আমার বিচারে এই নাটকের বক্তব্য সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করলেও মঞ্চে এটির উপস্থাপনা সার্থক করে তোলা কষ্টসাধ্য। আমার মনে হয়েছে, হুমায়ূন মঞ্চে নাটক পরিবেশনার বিষয়টি মাথায় রেখে কাজ করেন নি। তাই বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা যা-ই থাকুক না কেন, মঞ্চনাটক একটি পৃথক শিল্পমাধ্যম হিসেবে যা দাবি করে তার প্রতি তো মনোযোগ দিতে হবে। কিন্তু টিভিনাটকের দর্শককে পর্দার সামনে ধরে রাখার কৌশলটার কাছে হুমায়ূন অনেকটা বন্দি হয়ে গেছেন। একটি পরিবার, সেই পরিবারে সাধারণ হিসাবের বাইরে একজন চাচা থাকেন (হুমায়ূন-সাহিত্যের এক অতিপরিচিত রসদ)। তিনি আশেপাশের মানুষের ভান (Pretence) পছন্দ করেন না, কিন্তু অন্যরা তো (এবং তার মধ্যে সেই চেনা বাড়ির কাজে সাহায্যকারী মেয়েটি আছে।) সমাজের সঙ্গে আপোস করে চলতে চায়। চাচা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন আকস্মিকভাবে সিদ্ধান্ত নেন, তিনি আর মিথ্যা কথা বলবেন না। নানাভাবে সংলাপের মধ্যে দিয়ে কাহিনিটা যে এগিয়ে যায়, তাতে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের গতানুগতিক চালচলন, আশা, সহনীয় অসততা ইত্যাদির বিস্তৃতি আছে। কথোপকথনের প্রধান ঝোঁক কৌতুক সৃষ্টিতে। নাটকীয় সংঘাতের কোনো অবকাশ নেই। মঞ্চনাটক হিসেবে এটির প্রযোজনা সার্থক হবে বলে আমার মনে হয় না।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম নাটকটির নাম 'স্বপ্ন'। এই নাটক দিয়েই নাট্যকার তাঁর গ্রন্থের শিরোনাম সাজিয়েছেন। আমার মনে হয়েছে, হুমায়ূন শিরোনাম নির্বাচন করতে গিয়ে সময় নষ্ট করতে চান নি, তাই অবহেলায় এই নাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কারণ, এটি নাটক হিসেবে একাঙ্কিকা। তা-ও কিনা সন্দেহ থেকে যায়। হুমায়ূন যে বহুসংখ্যক টেলিভিশন ধারাবাহিক রচনা করেছেন, এটি তার একটা পর্ব হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, তা-ও খুব সংক্ষিপ্ত। রাতে শুনশান এক গ্রামের রেলস্টেশনে এক তরুণ-তরুণীর হঠাৎ নাটকীয় দেখা ও কিছু সংলাপ। ভীতি, রক্তের উল্লেখ, প্রবাসী নারীর উদ্বেগ এবং অবশেষে তরুণের জন্য সামান্য দুর্বলতা ইত্যাদির মধ্যে মঞ্চনাটকের উপাদান খুবই হ্রস্ব। নাট্যকার নিজেও তা জানতেন অনুমান করি।

শেষ নাটকটিও খুব ছোট, নাম 'স্মৃতিচিহ্ন'। নাট্যকার এটাকে কিশোর নাটিকা হিসেবে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছেন। এমন নির্দিষ্টতার কোনো প্রয়োজন আছে কি না, জানি না। পড়তে গিয়ে তলস্তয়ের Parables-এর কথা মনে পড়ে। শিশুরা যে বয়স্কদের চেয়ে কতটা সংবেদনশীল হতে পারে, তা বোঝা যায়। সাধারণ দর্শকদের জন্য এই নাটকটির মঞ্চায়ন সার্থক করে তোলা কষ্টসাধ্য, তবে বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানে এমন প্রযোজনা অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে। হুমায়ূন আহমেদের নিজের স্বপ্ন ও অর্থে গড়ে তোলা নেত্রকোনার কুতুবপুরের 'শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ'-এ এটা অভিনীত হওয়া উচিত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছিলে তবু আসো নাই

শহিদ হোসেন খোকন

হাসপাতাল থেকে হাসানের ফোন। তার ভয়ার্ত কণ্ঠ—ভাই, তাড়াতাড়ি আসেন...।

আমি বলি, ব্যাপার কী ?

স্যারের ব্লাড রিপোর্টে অ্যাবনর্মালিটি ধরা পড়েছে, এখন আবার সিটিস্ক্যান করাতে হবে।

অ্যাবনর্মালিটি মানে কী ? বুঝিয়ে বলো।

আপনি প্রিন্স হসপিটালে আসেন, তারপর বুঝিয়ে বলছি।

হাসান সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হসপিটালে চাকরি করে। বাঙালি ইন্টারপ্রেটর। গতকাল ওখানে হুমায়ূন স্যারের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল কার্ডিওলজিস্ট ফিলিপ কো'র সঙ্গে। দশ বছর আগে ফিলিপ কো হুমায়ূন আহমেদ আর তাঁর মায়ের ওপেন হার্ট সার্জারি করেছিলেন। মাঝখানে স্যার একবার ফলোআপে এসেছিলেন। তখন হার্টের অবস্থা বেশ ভালো ছিল, এখনো মন্দ নয়। কিন্তু স্যারের স্টুলের সঙ্গে ব্লাড যাচ্ছে—এরকম কমপ্লেন করায় গতকাল ফিলিপ কো তাঁকে ব্লাড টেস্ট করতে দিয়েছেন। আজ স্যার আর শাওন ভাবি রেজাল্ট আনতে গেছেন। সকালেই আমি তাঁদের হাসপাতালে নামিয়ে দিয়েছি।

টেস্টের রেজাল্ট হাসান ফোনে জানাতে চাইছে না, অজানা আশঙ্কায় আমার মন কেঁপে ওঠে। হুমায়ূন আহমেদের ডাক্তারভীতি বেশ প্রবল। কখনোই তিনি ডাক্তার দেখাতে চাইতেন না। ডাক্তারের নাম শুনলেই আঁতকে উঠতেন। শিশুদের যেমন ইনজেকশনভীতি, তাঁরও তেমন ডাক্তারভীতি। ঢাকায় গেলে তাঁকে অনেকবার বলেছি সিঙ্গাপুরে এসে একটা থরো চেকআপ করাতে। তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন, 'আরে রাখো তোমার ডাক্তার...আই এম অলরাইট। তোমাদের সিঙ্গাপুরের ডাক্তারগুলো মহাবদ। গেলেই একগাদা টেস্ট-ফেস্ট ধরিয়ে দেয়। ব্যাটারা মানুষের গলা কাটার জন্যে সবসময় ছুরিতে শান দিয়ে বসে আছে। আমার আর আম্মার সার্জারির বিল করেছে এক লাখ ডলার... বদের বদ।' হুমায়ূন আহমেদের কথার ওপর কথা বলে এমন সাধ্য কার!

হিউম্যান লাইফ বড়ই আনসার্টেন! এই গতকাল পর্যন্ত স্যারের সঙ্গে আমাদের কী আনন্দঘন সময় কেটেছে... কাল সন্ধ্যায় আমরা স্যারের জন্য সমুদ্রের ধারে ইস্ট-কোস্ট পার্কে একটা বার্বিকিউ পার্টির আয়োজন করেছিলাম। স্যারের ফ্যামিলি, তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ি আর এখানকার সোসাইটির কিছু বন্ধুবান্ধব এসেছিলেন ওদের ফ্যামিলি নিয়ে। চিকেন, মাটন আর চিংড়ির পোড়া গন্ধে বাতাস ম ম করছিল।

সবার সঙ্গে পরিচয়পর্ব শেষে স্যার প্রথমেই বললেন, তোমরা কি সবাই ইরানি মেয়ে বিয়ে করেছ নাকি ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, না স্যার, সবাই তো বাঙালি।

মেয়েদের মাথায় দেখছি হিজাব। দশ বছর আগে তোমাদের স্ত্রীদের তো এ রকম দেখি নি! সিঙ্গাপুরের মতো সিকিউর সোসাইটিতে বাস করে তোমাদের মেয়েরা হিজাব নিয়েছে। ডাইনে-বাঁয়ে যেখানেই তাকাচ্ছি সেখানেই হিজাব। তোমরা তো রীতিমতো হিজাবের একটা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছ।

আমি সভয়ে বলি, স্যার চল্লিশ পেরুলেই প্রবাসী বাঙালিরা এক ধরনের আত্মপরিচয়ের সংকটে ভোগে। এ থেকেই কেউবা অতি ধার্মিক অথবা অতি বিদেশি বনে যাওয়ার চেষ্টা করে।

কথাটা খারাপ বলো নি। আমার মেয়ে নোভা আমেরিকায় গেল পিএইচডি করতে, পড়াশোনা শেষ করে ফিরে এল হিজাব নিয়ে। কী আর করা, যে যেভাবে স্বস্তি পায় পাক।

খাবার মুখে দিয়ে স্যার বললেন, এ তো দেখছি অতি অখাদ্য খাবার। ফার্মের মুরগি হলো পৃথিবীর অতি অখাদ্যের একটি। আর কী আছে বলো?

আমি বলি, স্যার আর আছে চিংড়ি, বিফ স্টেক।

বিফ আনো, খেয়ে দেখি কী অবস্থা। পোড়া চিংড়িও আনো...। একটা স্টোরি শোনো। আমেরিকায় এক বাসায় গেছি দাওয়াত খেতে। গৃহকর্ত্রীর ওজন হবে মাশাল্লা দেড়শ কেজি। মাছ-মাংস-ভর্তা-ভাজি মিলিয়ে তিনি নিজ হাতে ১৮ পদ রান্না করেছেন। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল মহিলা সারা দিন বেশ খাটাখাটনি করেছেন। কিন্তু খেতে গিয়ে পড়লাম বিপদে। যেটাই মুখে দেই সেটাই দেখি অতি অখাদ্য। চিংড়ি মাছ রান্নার জন্য কোনো প্রতিভার দরকার হয় না, সেই চিংড়ি মাছও হয়েছে জঘন্য। এমন বাজে রান্না করার জন্যও বিশেষ প্রতিভার দরকার। আমি কেবল ডিমভুনা আর ডাল দিয়ে ভাত খেলাম। খাওয়া শেষ হলে মহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, ডিমভুনা আর ডালটা কে রান্না করেছে?

মহিলা ভীত কণ্ঠে বললেন, আমার হাসব্যান্ড। এ দুটাই কেবল সে রান্না করেছে, বাকিগুলো আমি করেছি।

আপনার বাসায় কি প্রতিদিন আপনার হাসব্যান্ড রান্নাবান্না করে?

মহিলা আমতা আমতা করে বলেন, জি স্যার। আমি একটা ক্লিনিকের অ্যাসিস্ট্যান্ট। সকালে বেরিয়ে যেতে হয়, ফিরি রাতে। বিকেলে অফিস শেষে ও এসে রান্নাবান্না করে।

আমি গম্ভীর হয়ে হয়ে তাকে বলি, আপনার হাসব্যান্ডের রান্নার হাত ভালো। তিনি মজার মজার রান্না করে আপনার বারোটা বাজিয়েছেন। রান্নার ব্যাপারে আপনার প্রতিভাকে তিনি প্রায় জিরো পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছেন।

আমার কথা শুনে তার বেশ মন খারাপ হলো। মহিলার মুখ দেখে আমারও খারাপ লাগল—মুখের ওপর এরকম কথা বলা ঠিক হয় নি। আমি তাকে একটা রান্নার বই উপহার দিলাম। অনেক বছর পর আমেরিকা গিয়ে আবার তার বাসায় গেলাম। এবার উল্টো দৃশ্য...।

স্যারের সঙ্গে নানা গল্প-আড্ডায় কাল সন্ধেটা আমাদের চমৎকার কেটেছে। কিন্তু হাসানের ফোন পেয়ে বেশ টেনশন লাগছে—কী এমন ব্যাপার যা ফোনে বলা যাচ্ছে না! স্যার কি জটিল কোনো ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি দ্রুত হাসপাতালে ছুটে গেলাম। পরিস্থিতি বেশ থমথমে। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পাচ্ছি না—যদি খারাপ কোনো নিউজ শুনতে হয়! শাওন ভাবির চোখের পাতা ভেজা। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই অনেকবার কেঁদেছেন। আমরা কেউ কারও মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। সিটিস্ক্যানের রিপোর্ট এসে গেছে, সবাই ডাক্তারের চেম্বারে গেলাম।

ডাক্তারের রুমে আমি, শাওন ভাবি, স্যার আর হাসান। এক্স-রে আর সিটিস্ক্যানের ছবি দেখে ডাক্তার করুণ মুখ করে বলে যাচ্ছে, স্যারের ক্যানসার এখন স্টেজ ফোর, এই মরণব্যাধি প্যানক্রিয়াস থেকে লিভারে ছড়িয়ে পড়েছে। দ্রুত চিকিৎসার উদ্যোগ না নিলে দুই থেকে ছ'মাসের মধ্যেই পেসেন্ট কলাপ্স করবে।

শাওন ভাবির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা, যেন তার পায়ের তলা থেকে দ্রুত মাটি সরে যাচ্ছে...বুকের ভেতরে কান্নার ঝড়। নিজেকে তিনি সামলে রাখতে পারছেন না। আমার মনে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলা—সত্যিই কি তাঁর ক্যানসার স্টেজ ফোর ? কিন্তু স্যার নির্বিকার!

হুমায়ূন স্যারের প্রথম রিয়েকশন হলো, খাইছে! আমার তো ঘণ্টা বেজে গেছে। দেশে গিয়ে আগাম কুলখানির ব্যবস্থা করতে হয়, কী বলো ? নুহাশপল্লীতে আট-দশটা গরু নামিয়ে দেব। গরুর মাংস আর ঘন মুগ ডাল থাকবে, নিজে উপস্থিত থেকে সবাইকে দেখেশুনে খাওয়াব। মানুষ কুলখানি করে মৃত্যুর পরে। আহা, যে বেচারা মরে যায়, সে তার আত্মীয়স্বজনকে দেখেশুনে খাওয়াতে পারে না! আমি মৃত্যুর আগেই কুলখানির ব্যবস্থা করব, রান্না থেকে খাওয়ানো অবদি সবকিছু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করব। সঙ্গে টক দইয়ের ব্যবস্থা রাখলে কেমন হয় ? হজমে সুবিধা হবে...।

সিটিস্ক্যানের রেজাল্ট জানার জন্য মাজহার ভাই বারবার ফোন দিচ্ছেন। কী করে তাকে এই দুঃসংবাদ দেব ভেবে পাচ্ছি না। এ রকম ভয়াবহ দুঃসংবাদ শোনার মতো কারোরই মানসিক প্রস্তুতি নেই। 'সত্যরে লহ সহজে'। হুমায়ূন আহমেদ ক্যানসার আক্রান্ত—এ রকম সত্য সহজভাবে নেওয়া যায় না।

স্যার হঠাৎ কেমন চুপচাপ হয়ে গেছেন। আমি ড্রাইভ করছি আমার হাত কাঁপছে, কেন এ রকম হলো ? মানুষকে আনন্দ দেওয়ার দায়িত্ব যিনি স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছেন, তাঁকে কেন জরা স্পর্শ করবে, বিধাতা এত নিষ্ঠুর কেন ?

স্যার বললেন, এখনই বাসায় যাওয়ার দরকার নেই। চলো একটু নার্সারিতে ঘুরে আসি।

টমসন রোডে প্রায় দুই কিলোমিটারজুড়ে অনেকগুলো নার্সারি আছে। এটি হুমায়ূন আহমেদের একটি প্রিয় জায়গা। যখনই তিনি সিঙ্গাপুরে এসেছেন দুটি জায়গায় তিনি যাবেন—একটি হলো বইয়ের দোকান, আরেকটি নার্সারি। বই আর গাছের প্রতি স্যারের ভীষণ আগ্রহ। শুধু আগ্রহ নয়, গাছপালার প্রতি এক ধরনের বিশেষ মমতা দেখেছি তাঁর। স্যার গতবার এসে বর্ডার বুক শপের মেম্বারও হয়েছেন।

নুহাশপল্লীর বাগান বিলাসে দুটো ক্ষুদে দস্যি ছেলের মূর্তি আছে। একটি ছেলের হাত ভেঙে গেছে, একটি ছেলে ভাঙা হাত নিয়ে বাগানে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপারটা স্যারের কাছে পীড়াদায়ক। হোক না সেটা পাথরের মূর্তি। ওটা রিপ্লেসমেন্টের জন্য সিমিলিয়ার কিছু পাওয়া যায় কি না আমরা তা খুঁজে দেখছি। না, ওটা ডিসকন্টিনিউ হয়ে গেছে, ওই দস্যি ছেলের দল ওরা আর তৈরি করছে না।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গত বৈশাখে আমি ৩০ কেজি ওজনের একটা মূর্তি নিয়ে গেছি নুহাশপল্লীর জন্য। স্যার বলেছেন, তোমার এই স্বল্পবসনা নারীমূর্তিটি বেশ সুন্দর, কিন্তু এটা নিয়ে বড্ড বিপদ!

আমি বলি, বিপদ কেন স্যার?

ছেলেপেলে যারাই এখানে বেড়াতে আসে, মূর্তিটির সঙ্গেই ছবি তুলবে আর সুযোগ পেলেই গায়ে হাত দেবে। আরে গাধারা, গার্লফ্রেন্ড জোগাড় কর, তার হাত ধরে হাঁটাহাঁটি কর! তা না, মূর্তির গায়ে হাত দেবে! কেমন বেকুব চিন্তা করে দেখো!

স্যার তিনটি গাছ পছন্দ করলেন, সবগুলোই ইনসেক্ট ইটার। পোকামাকড় খেয়ে বেঁচে থাকে। গাছগুলোর পাতা কিংবা ফুল হাঁ হয়ে থাকে, পোকামাকড় সেই হাঁ'র ভেতরে ঢোকামাত্রই গাছ তা খেয়ে ফেলে। একথা শুনে স্যার খুবই উৎসাহ দেখালেন। বললেন, মশার উপদ্রব কমাতে এ গাছ খুবই ইউজফুল। বাংলাদেশের প্রত্যেক বাড়িতে এ গাছ থাকা উচিত।

গাছ অবশ্য তখন কেনা হয় নি। স্যার যখন চিকিৎসার একপর্যায়ে কিছুদিনের জন্য নিউইয়র্ক থেকে ঢাকায় ফিরে এলেন, তখন তাঁকে একদিন ফোন করতেই আমাকে সেই গাছগুলোর কথা মনে করিয়ে দিলেন। আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম তাঁর স্মৃতিশক্তি আর গাছের প্রতি আগ্রহ দেখে। বারোটা কেমোথেরাপি নেওয়ার পরও সেই গাছগুলোর কথা তিনি ভোলেন নি।

সকালে হাসপাতালে যাওয়ার সময় নিনিতকে আমাদের বাসায় রেখে গিয়েছিলেন। স্যার বললেন, চল নিষাদকে নিয়ে তোমাদের বাসায় যাই। নিনিত নিশ্চয় কান্নাকাটি করছে।

আমি ফোনে খবর নিয়েছি, নিনিত ভালোই আছে। আমার মেয়ের সঙ্গে একগাদা টয় নিয়ে সে খেলতে বসেছে। আসলে স্যার নিজেই নিষাদ-নিনিতকে ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না। ওদের জন্য অস্থির হয়ে পড়েন।

আমার স্ত্রী রুমকীকে বললাম, স্যার বাসায় আসবেন, রাতে ডিনার করবেন। তোমার আজ অগ্নিপরীক্ষা।

স্যারকে দেখে নিনিত খুব খুশি। আমার কন্যার সঙ্গে ইতিমধ্যে তার বেশ ভাব হয়েছিল, কিন্তু বাবাকে দেখামাত্রই সে চঞ্চল হয়ে উঠল, ভাব-ভালোবাসা সব উধাও। স্যার নিনিতকে কোলে নিয়ে বললেন, আমার এই এক জীবনে অনেক তো পাওয়া হলো। পরম করুণাময় আমার কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ রাখেন নি। এখন এই অবুঝ শিশু দুটার জন্যই আমাকে আরও কিছুদিন বাঁচতে হবে...

স্যারের কথা শুনে শাওন ভাবির চোখ আবার ভিজে ওঠে।

স্যার বললেন, মাজহারকে জানিয়েছ?

আমি বললাম, জি স্যার...

মাজহার শুনে কী বলল?

এটা সবার জন্যই একটা শকিং নিউজ স্যার।

আমার সব রকম দুঃসময়ে মাজহার আমার পাশে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছে সে। আমার কিছু হলেই মাজহার অস্থির হয়ে পড়ে... তোমার মনে আছে আমার আর আমার আম্মার বাইপাস সার্জারি হয়েছিল তোমাদের মাউন্ট এলিজাবেথ হসপিটালে? অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়ার আগে রাজ্যের আত্মীয়স্বজন এসে অন্য রোগীদের হাসিমুখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভয় দিচ্ছে, আর আমাদের সঙ্গে এক মাজহার ছাড়া কেউ নেই, এই বিদেশ বাড়িতে দুই দুটা সার্জারির পেসেন্ট নিয়ে সে একা। মাজহারকে আবার একটু ফোন করো প্লিজ...।

হ্যালো...মাজহার খবর তো শুনেছ... শোনো, নুহাশপল্লীতে একটা আগাম কুলখানির ব্যবস্থা কর। আট-দশটা নাদুসনুদুস গরু কিনে ফেল...। গরু কেনার দায়িত্বটা কমলকে দাও। সে ভালো বুঝবে। কোরবানির সময় সে ভালো গরু কিনে আর তুমি নিয়া আস সব বুড়ামার্কা গরু...। মাজহার শোনো, চিকিৎসা আমি সিঙ্গাপুরে করাব না... একটা স্টোরি শোনো—এখানকার পত্রিকায় এসেছে মাউন্ট এলিজাবেথের এক ডাক্তার ব্রুনাইয়ের সুলতানের কাজিনের ব্রেস্ট ক্যানসারের চিকিৎসা করেছে, পাঁচ মাসে তার বিল আসছে ২৫ মিলিয়ন ডলার... 'ও মাই গড' বোলো না বলো 'ও আওয়ার গড'... গড তোমার একার না মাজহার...স্টোরি শেষ হয় নাই...ডাক্তারের একটা বিলের কথা শোনো... ক্যানসারের রোগী বাঁচার সম্ভাবনা নাই, সময় শেষ, ডাক্তার বলল, রোগী দেশে নিয়ে যাও ভালো-মন্দ যা খেতে চায় খেতে দাও...সেই মুমূর্ষু রোগীকে ডাক্তার এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিতে এয়ারপোর্টে গেছে, সেদিন আর অন্যকোনো রোগী দেখা হয় নি। সেই একদিনের জন্য ডাক্তার চার্জ করেছে চার লাখ ডলার! অন্য এক ডাক্তার চার লাখ ফি'র কথা শুনে কী বলেছে জান? বলেছে—চার লাখ ডলার বেশি হয়ে গেছে, তিন লাখ হলে ঠিক ছিল... তুমি আমেরিকায় খবর নাও ওদের ওখানে ক্যানসারের চিকিৎসা কেমন...খবর নিয়েছ? হসপিটালের কী নাম আবার বলো... মেমোরিয়াল স্লোন কেটারিং...ওদের একটা অ্যাপয়েন্টের ব্যবস্থা করো... আমরা পরশু দিন ঢাকা আসছি। ভিসার কোনো সমস্যা নেই, পাঁচ বছরের মাল্টিপোল লাগানো আছে। তুমি দ্রুত টিকিটের ব্যবস্থা কর...।

রুমকী ভয়ে ভয়ে ডাইনিং টেবিলে খাবার দিয়েছে। নিনিতকে টেক-কেয়ার করতে হয়েছে বলে আজ বিশেষ কিছু রান্না করতে পারে নি। স্যার খাবার-দাবারের ব্যাপারে খুবই খুঁতখুঁতে। মাছ মুখে দিয়ে বলে দিতে পারেন মাছ কি তাজা ছিল না মরা। খাবারের টেবিলে কাঁচামরিচ, আচার, ঘি আর লবণ অবশ্যই থাকতে হবে।

রুমকীর খাবারের মেন্যু হলো—লেবুপাতা দিয়ে কাচকি মাছ, রুই মাছ ভাজা, চিংড়ি ভর্তা, বেগুন ভর্তা, কাম্পং চিকেন (মালয়েশিয়ার ঘরে পালা মুরগি) আর বেশি করে ধনেপাতা দিয়ে ঘন ডাল। মুরগির মাংস প্রথমে সার্ভ করা হয় নি, স্যার দেশি মুরগি ছাড়া খেতে পারেন না বলে। একটু পর স্যার বললেন, মাংস কোথায়?

রুমকী ভয়ে ভয়ে মাংস বের করে দিল। স্যার বললেন, মাংসের চেহারা তো মাশাল্লা ভালো, দাও দেখি।

আমি বললাম, স্যার এটা মালয়েশিয়ার দেশি মুরগি।

আমাকে ধমক দিয়ে স্যার বললেন, আরে রাখ তোমার দেশি মুরগি, বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথাও দেশি মুরগি নাই, তবে মাংসটা ভালো।

খাওয়া শেষ করে স্যার বললেন, রুমকী, তোমার রান্নার হাত ভালো। তোমাকে ১০-এ ৮ দেওয়া গেল। ২ নম্বর কাটা গেল কারণ ডালে লবণ সামান্য বেশি ছিল। আমাদের নবীজী কারও বাসায় দাওয়াত খেতে গেলে একটা দোয়া পড়তেন (...দোয়াটা মনে করতে পারছি না)। বলতেন, 'তোমার ঘরে কোনোদিন যেন খাবার-দাবারের অভাব না হয়'। আমি তোমার জন্য সেই দোয়াটা করছি, ডেজার্ট কী আছে বের করো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেজার্টের কথা শুনে রুমকীর মুখ শুকিয়ে গেল। ঘরে দই-মিষ্টি কিছুই নাই। কমপ্লিমেন্টে পাওয়া নম্বর এখনই নিচে নেমে যাবে। রুমকীর সৌভাগ্য বলতে হয়, ফ্রিজ খুলে কয়েকটা ইয়োগার্ট পাওয়া গেল।

দু'দিন পর স্যার বাংলাদেশে চলে গেলেন। সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা করাতে তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। সবাইকে নিয়ে এয়ারপোর্টে গেছি। বোর্ডিং পাস নেওয়ার পর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতেই স্যার বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ছোটবেলা থেকেই আমি পিতৃস্নেহ বঞ্চিত। অনেক দিন পর মনে হলো, পিতৃস্নেহের আস্বাদ পেলাম। আরও মনে হলো, আমি বুঝি এই স্নেহের লোভে বারবার ছুটে গেছি তাঁর কাছে। কোনো কথা বলতে পারি নি সেদিন—না একটু আশার কথা, না ভালোবাসার কথা। মনে মনে বলেছি, স্যার আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন... ভালো হয়ে যাবেন...

চলে যাওয়ার আগে স্যার বললেন, মাজহার স্লোন কেটারিং-এ যোগাযোগ করেছে, আমরা শিগগিরই হয়তো চলে যাব, আসবে তো আমেরিকায় আমাকে দেখতে?

আমি ধরা গলায় বললম, যাব স্যার... অবশ্যই যাব...

হুমায়ূন আহমেদ আমাকে একটি বই উৎসর্গ করেছেন *চক্ষে আমার তৃষ্ণা*। উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছেন—

> আমার হৃদয় নামক পাম্পিং মেশিনে কিছু সমস্যা হয়েছে। সমস্যা সমাধানের জন্যে মাঝে মাঝে আমাকে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হসপিটালে যেতে হয়। তখন এক প্রবাসী গল্পকার ছুটে আসেন। প্রাণপণ চেষ্টা করেন আমাকে কিছুটা স্বস্তি দিতে।
>
> শহিদ হোসেন খোকন
>
> স্বস্তিকারেষু

AMARBOI.COM

আমি অকৃতি অধম, স্যারের স্নেহচ্ছায়ায় ধন্য হয়েছি। আমি স্বস্তির ডালি নিয়ে আজীবন দাঁড়িয়ে থাকব অথচ কোনোদিন স্যারের দেখা পাব না! এই গুণী মানুষটির জন্য সবসময় আমার প্রাণ কাঁদবে...।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূনের টেপরেকর্ডার

শাওন

আমার একটি খুব প্রিয় গান আছে, গিয়াসউদ্দিন সাহেবের লেখা 'মরণসঙ্গীত'—'মরিলে কান্দিস না আমার দায়।'

প্রায়ই ভাবি আমি মারা গেছি। শবদেহ বিছানায় পড়ে আছে, একজন কেউ গভীর আবেগে গাইছে—'মরিলে কান্দিস না আমার দায়।'

'নক্ষত্রের রাত' নামের ধারাবাহিক নাটকের শুটিং ফ্লোরে আমি আমার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। এবং একজনকে দায়িত্ব দিলাম গানটি বিশেষ সময়ে গাইতে। সে রাজি হলো। উৎসর্গপত্রের মাধ্যমে তাকে ঘটনাটি মনে করিয়ে দিচ্ছি। আমার ধারণা সময় এসে গেছে।

মেহের আফরোজ শাওন

চলে যায় বসন্তের দিন, হুমায়ূন আহমেদ, ২০০২, উৎসর্গপত্র

AMARBOI.COM

উৎসর্গপত্রে উল্লেখিত গানটি আমি প্রথম শুনি গায়ক সেলিম চৌধুরীর কণ্ঠে। ১৯৯৫ সালের কথা। তখন ডিএফপি-তে বিশাল সেট ফেলে 'নক্ষত্রের রাত' ধারাহিকের শুটিং করছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। শুটিংয়ের অবসরে প্রায়ই গল্পের আসর বসত, সঙ্গে থাকত সেলিম চৌধুরীর গান। 'আইজ পাশা খেলবরে শ্যাম' গানটি গেয়ে সেলিম চৌধুরী তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। তাঁর গাওয়া এই গানটি ছিল হুমায়ূন আহমেদের অত্যন্ত পছন্দের। ডিএফপি-র এক সন্ধ্যায় হুমায়ূন আহমেদ আমাকে বললেন, শুনেছি তুমি নতুন কুঁড়িতে গানে প্রথম পুরস্কার পেয়েছ। দেখি শোনাও তো কেমন গাও।

আমি রাগভিত্তিক একটি নজরুলসঙ্গীত গাইলাম। তিনি বললেন, 'আইজ পাশা খেলবরে শ্যাম' গানটা জানো?

না।

সেলিম, গানটা গাও তো।

সেলিম ভাই শোনালেন তাঁর সেই বিখ্যাত গান। হুমায়ূন আহমেদ মাথা নাড়িয়ে ঝাঁকিয়ে গানের সঙ্গে তাল দিলেন।

গান শেষে আমাকে বললেন, এই গানটা গলায় তুলে আমাকে শুনিয়ো তো।

এখন শোনাব?

এখনই শোনাতে পারবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবাক হলেন তিনি। আমি গান গেয়ে শোনালাম। মাত্র একবার **শুনেই কোনো** গান যে গলায় তোলা যায় এই বিষয়টা হুমায়ূন আহমেদকে খুবই অবাক করল। সেদিন তিনি আমার নাম দিয়েছিলেন 'টেপরেকর্ডার'। এরপর প্রায়ই গানের আসরে তিনি আমার পরীক্ষা নিতেন। নতুন কোনো গান শুনে আমার দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'প্লে।' আমি গানটি কিছুদূর গাওয়ার পর বলতেন, 'স্টপ।' তারপর তাঁর নতুন 'টেপরেকর্ডার' আবিষ্কারের গল্প অন্যদের শোনাতেন। আমার গান শুনে কেউ প্রশংসা করলে তাঁর গর্বিত মুখ দেখে মনে হতো যেন তিনিই আমাকে গান শিখিয়েছেন। একবার শুনেই কোনো গান হুবহু গাইতে পারার সামান্য গুণটি কেন জানি হুমায়ূন আহমেদকে খুব মুগ্ধ করেছিল। একে একে রবীন্দ্রনাথের 'চরণ ধরিতে দিয়োগো আমারে', 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই', 'তোমাকেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'; নজরুলের 'পথহারা পাখি', 'জনম জনম তব তরে কাঁদিব'সহ হুমায়ূন আহমেদের প্রিয় চমৎকার সব গানে সমৃদ্ধ হতে থাকল আমার গানের ঝুড়ি।

হঠাৎ করেই হুমায়ূন আহমেদ আমার গান শোনা বন্ধ করে দিলেন। বেশ কিছুদিন পর আমার হাতে এল একটি চিরকুট—

> তোমার গান কতদিন হলো শুনছি না।
>
> গান শুনলেই বিষাদে আক্রান্ত হই। আমি এমনভাবে গান শুনতে চাই, যেন সেই সময় আশপাশে কেউ থাকবে না। শুধু আমরা দুজন। কোনো ভান না, কোন ভনিতা না—
>
> দেখব শুধু মুখখানি
> শুনব যদি শোনাও বাণী...

AMARBOI.COM

'নক্ষত্রের রাত' নাটকের সেটে একদিন সেলিম চৌধুরী গিয়াসউদ্দিনের সেই বিখ্যাত গানটি গেয়ে শোনালেন—'মরিলে কাঁদিস না আমার দায় রে যাদুধন।' গান শেষে হুমায়ূন আহমেদ বললেন, এটা আমার মৃত্যুসংগীত। এই গানটা এখন শাওনের গলায় শুনব। তার গান শুনে যদি আমার চোখে পানি আসে, তাহলে তার জন্যে পুরস্কার আছে।

পুরস্কার হিসাবে তাঁর মৃতদেহের পাশে বসে উল্লেখিত গান শোনানোর গুরুদায়িত্ব পেলাম।

> শাওন,
> তুমি কি জানো তোমার গান
> আমার কত পছন্দ ?
> এবং তোমাকে আমার কত পছন্দ ?

আমার গান হুমায়ূন আহমেদের কেন যে এত পছন্দ ছিল তা আমি কখনোই পুরোপুরি বুঝে উঠি নি। আমার এই প্রশ্নে তিনি একেক সময় একেক উত্তর দিতেন। আমার মা সবসময়ই আমার গান পছন্দ করতেন। তাঁর আগ্রহেই আমি গান শিখেছি। কিন্তু হুমায়ূন আহমেদের মতো একজন ভক্ত পেয়ে গানের প্রতি আমি আরও যত্নশীল হই। তাঁর মতো করে আমার গানকে ভালোবাসতে শিখি। তাঁর চলচ্চিত্র ও নাটকগুলোতে আমার গাওয়া গান স্থান পেতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শ্রাবণ মেঘের দিন' চলচ্চিত্রের শুটিংয়ের আগে কুসুম চরিত্রটি নিজের মধ্যে ধারণ করার জন্য তিনি আমাকে উপন্যাসটি পড়তে বলেন। পড়তে গিয়ে উপন্যাসের নায়ক মতি মিয়ার গানের একটি লাইন আমার মাথায় পোকার মতো ঢুকে যায়—'কে পরাইল আমার চউক্ষে কলঙ্ক কাজল?'

মাথার পোকাটি বারবার আমাকে বলতে লাগল, 'এখানে তো তোমার কথাই বলা হচ্ছে। গানের লাইনটা আসলে হবে—'কে পরাইল শাওনের চউক্ষে কলঙ্ক কাজল?' হুমায়ূন আহমেদকে অনুরোধ করলাম এই এক লাইনের গানটা সম্পূর্ণ করতে। তিনি শর্ত দিলেন, গানটা যদি আমি গাই তবেই গানের বাকি অংশ লিখবেন।

সম্পূর্ণ গানটি লেখা হলো, সুর দিলেন হুমায়ূন আহমেদের প্রিয় সুরকার মকসুদ জামিল মিন্টু, গাইলাম আমি। গান শুনে 'কিন্নরকণ্ঠী' বিশেষণে আমাকে বিশেষায়িত করলেন তিনি।

কিন্নরকণ্ঠী,

মুগ্ধ হয়ে গান শুনলাম। পরম করুণাময় তোমাকে যে সুর দিয়েছেন (যে দয়া তোমাকে করেছেন), সবসময় সেই দয়ার কথা মনে রাখবে। তোমার অপূর্ব সুরের জন্যে আমি এই মুহূর্তে তোমার দশটা অপরাধ (ভবিষ্যতে যা করবে) ক্ষমা করলাম।

হুমায়ূন আহমেদ

১০-০৪-৯৯

AMARBOI.COM

বিয়ের পর হুমায়ূন আহমেদ আমাকে গায়িকা শাওন বলে পরিচয় করিয়ে দিতেই বেশি পছন্দ করতেন। অভিনেত্রী শাওন, পরিচালক শাওন কিংবা স্থপতি শাওন খুব কমই বলতে শুনেছি। খুব আয়োজন করে একদিন গান শিখতে বসলেন গায়িকা শাওনের কাছে।

'সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে শোন শোন পিতা
কহো কানে কানে শোনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল বারতা।'

আধ ঘণ্টায় এই দুই লাইন গাইলেন বেশ কয়েকবার। তারপর—ধুর! আমার গলায় সুর নেই।—এই বলে রণে ভঙ্গ দিলেন।

নুহাশপল্লীর বেশির ভাগ জোছনারাতে দীঘি লীলাবতীর শ্বেতপাথরের ঘাট কিংবা পানিবিহীন সুইমিংপুলের ভেতরে বসত গানের আসর। সঞ্চালক হুমায়ূন আহমেদ, শিল্পী শাওন, শ্রোতা হুমায়ূনের বন্ধুদল Old Fools Club-এর সদস্য এবং তাদের স্ত্রীরা। চাঁদ ওঠার পর থেকে একের পর এক গান হতো চাঁদ ডুবে যাওয়া পর্যন্ত। সেই সময় হুমায়ূনের প্রিয় কিছু গান ছিল, সেগুলোর সাথে তিনি গলা মেলাতেন। যেমন—

'আমরা পুতুলওয়ালা যাই বেচে যাই
কে নেবে এসো বলো কী রঙ চাই
নগর প্রান্তরে অজানা পথ ধরে
সকাল সাঁঝে পুতুল বেচে যাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাটির মানুষ মাটিতে মিশে
যেতে হবে দিনের শেষে।'

অথবা

'আগুন লাগাইয়া দিল কোনে
হাসন রাজার মনে
নিভে না দারুণ আগুন জ্বলে দিল ও জানে।'

কখনো কখনো অভিনেতা স্বাধীন খসরুর গান হতো। তার গানের মাঝে হুমায়ূনসহ Old Fools Club-এর সবাই কোরাস ধরতেন।

স্বাধীন : পাহাড়ে পাহাড়ে নগরে বন্দরে
খুঁজিয়া তোমারে ধারা বহাব।
কোরাস : আছি তারই আশায় যদি তারে পাওয়া যায়
আছি তারই আশায় যদি তারে পাওয়া যায়
স্বাধীন : নইলে এই ভবে মরিয়ারে যাব
বন্ধুরে....।

আহা, কী সুন্দরই না ছিল সেইসব দিন!

AMARBOI.COM

Old Fools' Club-এর বিদেশি সদস্য হুমায়ূন-বন্ধু ড. নাসির জমাদার (জাপানের রিক্কিও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর) মাঝে মাঝে তাঁর জাপানি ছাত্রীদের নিয়ে নুহাশপল্লীর গানের আসরে যোগ দিতেন। ছাত্রীদের গাওয়া একটি গান হুমায়ূন আহমেদের এতই মনে ধরল যে তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর টেপরেকর্ডারকে সেই গান শোনাতে বললেন। টেপরেকর্ডার কুসুম পড়ল মহাবিপদে। জাপানি গান। সুর তো ঠিক আছে, কিন্তু একবার শুনে কথা মনে রাখা তো সম্ভব না। জাপানি ছাত্রী 'আইহারা এরি'-র সাহায্যে গানের কথা লিখে নিয়ে কিছুক্ষণ পর গানটি শোনানো হলো। গানটিতে একটি মজার ব্যাপার ছিল। প্রত্যেক লাইনের পর হাতে তালি কিংবা মেঝেতে পা দিয়ে বাড়ি দিয়ে উপস্থিত সবাইকে গানে অংশ নিতে হতো। হুমায়ূনের নিয়মিত গানের আসরে যুক্ত হয়ে গেল জাপানি গানটি।

'শিয়া ওয়াসসে নারা তেও তাতাকো
(দুইবার হাতে তালি)
শিয়া ওয়াসসে নারা আসি নারাসো
(পা দিয়ে দুইবার মেঝেতে বাড়ি)
শিয়া ওয়াসসে নারা তাই দোদে শি মেসোয়ো
হোরা মিন নাদে আসি নারাসো
(পা দিয়ে দুইবার মেঝেতে বাড়ি)।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা, ইংরেজি, জাপানি গান ছাড়াও পুরনো দিনের হিন্দি গানও খুব পছন্দ ছিল গানপাগল হুমায়ূনের। 'দিদার' ছবির 'বাচপানকে দিন ভুলানো দেনা', 'চামানমে রেহকে ভিরানা', 'বৈজু বাওয়া' ছবির 'দূর কোয়ি গায়ে দুনিয়া শুনায়ে' সহ আরও অনেক হিন্দি গানই মুখস্থ রাখতে হতো তাঁর ব্যক্তিগত চলমান টেপরেকর্ডারকে যে-কোনো সময় তাঁকে শোনানোর জন্য। 'তেরে ঘরকে সামনে' ছবির একটি গান একেক বৈঠকে প্রায় ১০-১২ বার শুনতেন। একদিন বসে গেলেন গানটির বাংলা করতে।

তেরে ঘরকে সামনে
এক ঘর বানাউঙ্গা
তেরে ঘরকে সামনে
দুনিয়া সাজাউঙ্গা।

হুমায়ূন লিখলেন—

তোমার ঘরের সামনে
ছোট্ট ঘর বানাবোগো
তোমার ঘরের সামনে
দুনিয়া সাজাবোগো।

(এই গানটি পরবর্তীতে 'যে থাকে আঁখিপল্লবে' নামক গানের অ্যালবামে এস আই টুটুল এবং আমার কণ্ঠে দ্বৈতভাবে গীত হয়।)

কয়েক বছর আগে হঠাৎ হুমায়ূন আহমেদ আমাকে বলতে শুরু করলেন, তুমি আমার লেখা গানে সুর করছ না কেন? আমি বোঝাতে চাইলাম এই ভয়ংকর কঠিন কাজটি আমার দ্বারা সম্ভব না। কিন্তু তিনি জোর দিয়ে বললেন, আমি নিশ্চিত তুমি চমৎকার সুর করবে।

শাওন
তোমার সুর করার জন্যে
প্রথম গান
১৫-৫-২০০৮
(দখিন হাওয়া)

দীঘির জলে কার ছায়াগো?
তোমার নাকি আমার?
তোমার কি আর মন চায় না
এই কথাটা জানার?

বন পারুলের ফুল ফুটেছে
সুবাস আসে ঘরে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই সুবাসে শরীর কাঁপে
মন যে কেমন করে।

সাঁঝের বেলায় নেমে আসে
মধ্যরাতের আঁধার।
আমি চলে যাই নদীর কাছে
দাঁড়াই বসি
সময় হলো কাঁদার।

কেন কাঁদি যখন তখন
ইচ্ছে করে জানার?
নদীর জলে কার ছায়াগো
তোমার নাকি আমার?

হুমায়ূন আহমেদ

মূলভাব
[মেয়েটি তার আবেগের কথা জানাতে চাচ্ছে।]

AMARBOI.COM

হুমায়ূন আহমেদ সবাইকে চমকে দিতে পছন্দ করতেন। আমাকে চমকে দেওয়া তিনটি ঘটনা পাঠকদের জানানোর লোভ সামলাতে পারিছি না।

ঘটনা-১ : একবার একটি কলেজের প্রতিষ্ঠার ১২ বছর পূর্তিতে হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন প্রধান অতিথি। কলেজের নাম ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ। প্রধান অতিথির স্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের দর্শকসারিতে আমি, ভোঁতামুখে বসে বক্তৃতা শুনছি। সবার শেষে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় স্বভাবসূলভ ভঙ্গিতে মজার মজার অনেক কথা বললেন হুমায়ূন। এমনকি আগের রাতে হওয়া আমাদের ঝগড়ার কথাও বলে ফেললেন। একপর্যায়ে আমাকে অবাক করে দিয়ে মঞ্চে ডাকলেন তাঁর প্রিয় জাপানি গানটি সবাইকে শোনানোর জন্যে। গানের অর্থ 'সুখী যদি হতে চাও হাতে তালি দাও।' এই তথ্য সবাইকে যেমন জানালেন, তেমনি গানের কোন জায়গায় হাতে তালি কিংবা মেঝেতে বাড়ি দিতে হবে তাও বুঝিয়ে দিলেন। হলভর্তি প্রায় আড়াই হাজার ছাত্রছাত্রী যখন একসঙ্গে গানের ফাঁকে ফাঁকে মেঝেতে পা দিয়ে বাড়ি এবং হাতে তালি দিচ্ছিল তখন এক অভূতপূর্ব পরিবেশ তৈরি হয়েছিল।

ঘটনা-২ : ২০০৮ সালে 'বেক্সিফেব্রিক্স্ অন্যদিন ঈদ ফ্যাশন প্রতিযোগিতা'র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আমি গান গেয়েছিলাম।

'যদি মন কাঁদে তুমি চলে এসো এক বরষায়'। গানের শুরুতেই দর্শকসারিতে চোখ পড়ল। দেখলাম প্রথম সারিতে বসে হুমায়ূন, মিটিমিটি হাসছেন। কী আশ্চর্য! অনেক অনুরোধ করেও তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁকে কোনো অনুষ্ঠানে নেওয়া যায় না। গান শেষে তাঁর পাশে গিয়ে এই প্রশ্ন করতেই উত্তর দিলেন, 'দর্শকসারিতে বসে তোমার গান শুনতে কেমন লাগে তা দেখতে চলে এলাম।'

তাঁকে দেখে আয়োজকরা মহাখুশি। এর পরের বছরগুলোতেও একই অনুষ্ঠানে গান নয়, গানের টানে অনুষ্ঠানে যাওয়া হুমায়ূনকেও তাদের প্রয়োজন।

ঘটনা-৩ : ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত একটি সরাসরি গানের অনুষ্ঠানে গান গাইছিলাম আমি। টেলিফোনে বিভিন্ন গানের অনুরোধ পাঠাচ্ছেন দর্শক। হঠাৎ একজন দর্শকের গলা শুনে চমকে উঠলাম।

"আমার নাম হুমায়ূন আহমেদ। আমি নিষাদের মা'র কাছে একটি গানের অনুরোধ করতে চাই। গানটি হলো... ।"

হুমায়ূন-শাওনের শেষ আনন্দময় গানের আসরটি **বসেছিল** মেরিল্যান্ডের এক বাসায়। শ্রোতা ছিলেন প্রবাসী লেখক মুনিয়া মাহমুদ ও তাঁর স্বামী নুরুদ্দিন মাহমুদ, হুমায়ূন আহমেদের ছেলেবেলার বন্ধু ফানসু মণ্ডল ও তাঁর স্ত্রী স্বপ্না ভাবি, গৃহকর্তা নজরুল ইসলাম ও তাঁর স্ত্রী তানিয়া, প্রবাসী পরিচালক সাইফুল ইসলামসহ আরও কয়েকজন। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর পছন্দের গানগুলোর ইতিহাস বলছেন এবং পরক্ষণেই তাঁর টেপরেকর্ডার, আমি, সেই গানটি গেয়ে শোনাচ্ছি। ১৯০৫ সালে রেকর্ডকৃত প্রথম গান নিধুবাবুর টপ্পা, রবীন্দ্রনাথের গান, নজরুলের গান, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গান এবং হুমায়ূন-সংগীত হলো। আমাদের প্রায় সব গানের আসর মৃত্যুসংগীত দিয়ে শেষ হলেও হুমায়ূন আহমেদ অসুস্থ হওয়ার পর থেকে ওই বিশেষ গানটি আমি গাইতে চাইতাম না।

> পাঠকের যেমন মৃত্যু হয়, শ্রোতারও মৃত্যু হয়। অতি প্রিয় গান একসময় আর প্রিয় থাকে না। তবে কিছু গান আছে কখনো তার আবেদন হারায় না। আমার কাছে মরমি কবি গিয়াসউদ্দিনের একটি গান সে রকম। ওল্ড ফুলস ক্লাবের প্রতিটি আসরে একসময় এই গান গীত হতো। শাওনের প্রবল আপত্তির কারণে এই গান এখন আর গীত হয় না। গানটির শুরুর পঙ্‌ক্তি—
>
> মরিলে কান্দিস না আমার দায়
>
> ও জাদুধন মরিলে কান্দিস না আমার দায়।
>
> *নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ*, হুমায়ূন আহমেদ, পৃষ্ঠা-৫৯

কিন্তু সেদিন হুমায়ূনের গানটি শোনার প্রবল ইচ্ছার কাছে হার মানলাম। গান শুনে প্রথমদিনের মতো কাঁদলেন তিনি।

এরপর আর গান শোনানো হয় নি তাঁকে। দ্বিতীয়বার অপারেশনের সাত দিন পর ফুসফুসে ভাইরাস সংক্রমণের কারণে তাঁকে মেশিনের সাহায্যে কৃত্রিমভাবে শ্বাস নিতে হয়। প্রক্রিয়াটি অস্বস্তিকর বলে বেশিরভাগ সময়ই তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হতো। সারা দিনে কেবল ১-২ ঘণ্টার জন্য তাঁর ঘুম ভাঙত। মুখে নল থাকার কারণে কথা বলতে না পারলেও আমাদের সব কথা শুনতে ও বুঝতে পারতেন তিনি। সেই সময়টাতে তাঁর সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিতাম, তাঁর সাথে কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতাম। নুহাশের কথা, নিষাদের কথা, নিনিতের কথা, নুহাশপল্লীর তাঁর প্রিয় গাছগুলোর কথা, আমার কথা। মাঝে মাঝে তাঁর চোখ বেয়ে পানি পড়ত, তাঁর হাত দিয়ে শক্ত করে ধরতেন আমার হাত। একদিন দেখলাম পাশের রুমে কোমায় থাকা এক রোগীকে নার্স গুনগুন করে গান শোনাচ্ছে আর চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করতেই নার্স জানালেন রোগীকে মিউজিক থেরাপি দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, একইভাবে গান শুনিয়ে হুমায়ূন আহমেদকে আমিও তো থেরাপি দিতে পারি। কিন্তু সেই সুযোগ আর দিলেন না হুমায়ূন। ১৯ জুলাই। নীরব নিথর হুমায়ূনের সাথে ডাক্তাররা যখন আমাকে একা কিছুটা সময় কাটাতে দিলেন তখন...।

না। আমাকে দেওয়া গুরুদায়িত্ব পালনে তাঁর শবদেহের পাশে বসে 'মরিলে কান্দিস না আমার দায়' গান ধরতে পারি নি। হুমায়ূনের টেপরেকর্ডার বিকল হয়ে গেছে সেদিন থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরিলে কান্দিস না ও হুমায়ূন আহমেদ

শাকুর মজিদ

২০০৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। ঢাকা থেকে সিলেট যাচ্ছি। সিলেটের জন্য নতুন হাইওয়ে হয়েছে। সুন্দর সুন্দর বাস যায়। বাসে নাটক দেখায়। দুইটা নাটক দেখতে দেখতে সিলেট পৌঁছানো যায়। অনেক মজা। গাড়ি ছুটছে দ্রুত বেগে। গাড়িতে নাটক দেখানো হচ্ছে। এই নাটকের নাট্যকার কে তা বলার প্রয়োজন থাকে না। এরই মধ্যে কতকগুলো মুখ হুমায়ূন আহমেদের জন্য ব্রান্ডেড হয়ে গেছেন। ডা. এজাজ, ফারুক আহমেদ, মাজনুন মিজান, স্বাধীন খসরু, চ্যালেঞ্জার, মুনিরা মিঠু, কমল, এদের দেখলেই সবাই বুঝে ফেলে নাটকের নাট্যকার কে। আর এ নাটকটিও তারকায় ভরপুর। সবগুলো চরিত্রই খুব মজার। যাত্রীরা আগ্রহ নিয়ে দেখছে।

আমার মোবাইলে ফোন করে রনি।

আনোয়ার হোসেন রনি সিলেটের নাট্যকর্মী। কথাকলি থিয়েটারে নাটক করে। একসময় সিলেট বেতারে আমার লেখা কিছু নাটক প্রচার হয়েছিল। কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছে রনি। আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় নাই। বছর কয়েক ধরে আমি সুনামগঞ্জের বাউল করিমকে নিয়ে কাজ শুরু করেছি, তাঁর বাড়িতে যাই, সিলেটের বাউল উৎসবের ভিডিও করি। সিলেটের লোকসংগীতের সমঝদার হিসেবে আমাকে কেউ কেউ ভাবতে শুরু করে এবং ঠিক এই কারণেই রনি আমাকে অনুরোধ জানায় যে, তার বাবা গিয়াসউদ্দিন আহমদের একটা স্মরণসভা হবে, সিলেট অডিটরিয়ামে, সেখানে ঢাকা থেকে কয়েকজন শিল্পীও আসবেন এবং প্রধান অতিথি হিসেবে হুমায়ূন আহমেদের আসার কথা, আমি যেন আসি এবং তার বাবা এবং তার সেই গানটি সম্পর্কে কিছু বলি।

আমি এক বাক্যে রাজি হয়ে যাই। স্মরণসভা উপলক্ষে যে স্যুভেনিরটি ছাপা হবে, তার বাঁধাইহীন একটা কপি এবং গিয়াসউদ্দিন সাহেবের 'মরিলে কান্দিস না আমার দায়' গানের বইটি পাঠিয়ে দেয়। আমি ভয়ে ভয়ে প্রস্তুত হই এবং ১৫ সেপ্টেম্বর ভোর সাতটার গাড়িতে রওনা দেই সিলেটের পথে। বেলা সাড়ে বারোটায় আমার পৌঁছার কথা, বিকেলে অনুষ্ঠান। আমার প্রধান লক্ষ্য, ওই একই অনুষ্ঠানে হুমায়ূন আহমেদও থাকবেন। সিলেটের এই গীতিকবিকে নিয়ে হুমায়ূন আহমেদ কেমন মুগ্ধতা প্রকাশ করেন তা আমার জানার খুব ইচ্ছা।

হুমায়ূন আহমেদের ছোটবেলা কেটেছে সিলেটে। তাঁর বাবা ছিলেন গানপাগল মানুষ। একবার বেতনের ৮০ টাকা থেকে ৭০ টাকা দিয়ে একটা সেতার কিনে এনেছিলেন পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝির দিকে, সেই সেতারটি তিনি কখনো বাজান নি—এসব কথা হুমায়ূন আহমেদের স্মৃতিকথায় পড়েছি।

সিলেট অঞ্চলের বাউল যেমন সৈয়দ শাহনুর, রাধারমন, হাসন রাজা, শাহ আবদুল করিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর লেখা গান তাঁর বহু নাটকে-সিনেমায় এসেছে। কিন্তু গিয়াসউদ্দিন সাহেবের এই গানটি তাঁর কী করে মনে ধরলো আমি তখনো জানি না।

আমি ফোন ধরি এবং নাটকের দর্শক-শ্রোতা-যাত্রীদের খানিকটা বিরক্ত করেই রনিকে বলি, আমি কোথায় উঠব'?

রনি বলে, সুবিদবাজারে রেইনবো নামে একটা গেস্টহাউজে আপনাদের জন্য থাকার ব্যবস্থা হয়েছে, ঢাকার গেস্টরাও এসে গেছেন, অনুষ্ঠান বিকেল চারটায়।

আমি বলি, হুমায়ূন আহমেদ এসেছেন ?

রনি বলে, হ্যাঁ।

এই 'হুমায়ূন আহমেদ' নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার উল্টাদিকের সিটে বসা স্থূলকায় এক প্রৌঢ়, যাকে আমি আগে *বিচিত্রা* অফিসে দেখেছি, এবং যাকে আমি চিনিও তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেন। নাম জিজ্ঞেস করেন। বলি, আমি শাকুর মজিদ। ভদ্রলোক মাথা নাড়েন। অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলেন, নাম শুনেছি। আপনিও কি হুমায়ূনের অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন ?

আমি বলি, গিয়াসউদ্দিন সাহেবের অনুষ্ঠান।

তিনি বলেন, ওখানেই হুমায়ূন যাচ্ছে। ওরা কাল রাতে গাড়ি নিয়ে গেছে। আমি নাইটে জার্নি করতে পারি না। বাসে গিয়ে যোগ দেব।

আলমগীর রহমানের সঙ্গে আমার এই দিয়ে পরিচয়ের সূত্রপাত। আলমগীর রহমান *বিচিত্রার* সাংবাদিক ছিলেন, এরশাদের আমলে কোনো-একটা রিপোর্ট তার হাত দিয়ে ছাপা হবার কারণে *বিচিত্রা* থেকে তাঁর চাকরি চলে যায়। এরপর পৈতৃক মুদ্রণ ব্যবসায় মনোযোগ দেন। বর্তমানে 'অবসর' ও 'প্রতীক' নামে তাঁর দুইটা প্রকাশনী আছে। ১৯৮৫ সালে হুমায়ূন আহমেদের মিসির আলী সংক্রান্ত প্রথম বই *দেবী* পেপারব্যাক-এ প্রকাশ করার মাধ্যমে হুমায়ূন আহমেদের প্রকাশক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এখন তিনি তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ২০০৪ সালে হুমায়ূন আহমেদের দ্বিতীয় বিয়েতে যারা যারা উপস্থিত ছিলেন সেখানে তাঁর নামও দেখেছি। হুমায়ূন আহমেদের দ্বিতীয় বিয়ের পর বহু পুরনো বন্ধু তাঁকে পিঠ দেখিয়ে চলে গেছেন। তাদের নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা নাই। পুরনোদের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন নিয়েই তাঁর চলাচল। তারাই মূলত হুমায়ূন আহমেদের সফরসঙ্গী।

WWW.AMARBOI.COM

আমাদের বাস চলছে সিলেটের পথে। দর্শক-শ্রোতা-যাত্রীদের নাটক দেখায় বিরক্তির কারণ হবে এ আশঙ্কায় আমি আলমগীর সাহেবের সঙ্গে আর কোনো কথা বলি না। গভীর মনোযোগ দিয়ে অনেক আনন্দের সঙ্গে নাটকটি দেখা শেষ হয়। অনেকদিন পর একটা চমৎকার স্যাটায়ার দেখলাম হুমায়ূন আহমেদের।

দুই ঘণ্টা পর আশুগঞ্জের এক হাইওয়ে রেস্তোরায় বাস থামে কুড়ি মিনিটের জন্য। আবার শুরু হয় নাটক। এই নাটকটিও হুমায়ূন আহমেদের। এর নাম 'এসো'। অনেকদিন হয়ে গেছে, টেলিভিশনে নাটক দেখা হয় না। ইচ্ছাই করে না। এরকম বাসযাত্রা নাটক দেখার জন্য খুবই আরামের।

'এসো' নাটকটি দেখতে দেখতে একটা জায়গায় হঠাৎ আমার চোখ আটকে যায়। যে বাড়িতে শুটিং হয়েছে তার দেয়ালে দু'টো সাদাকালো ছবি টাঙানো। আরে! এ তো আমার তোলা ছবি। এখানে কী করে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ভাবনায় পড়ে যাই। এই দুটো ছবি আমার কাছ থেকে নিয়েছিলেন মিলন ভাই।

২০০২-০৩ সালের দিকে ইমদাদুল হক মিলন ভাইর সঙ্গে আমার আড্ডা হতো সপ্তাহে প্রায় ৩ দিন। আমাদের লালমাটিয়া অফিসে। মিলন ভাই, কায়েস ভাই, তৌকীর, আমরা অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা দিতাম।

একদিন আমার অফিসে বাঁধাই করা কতকগুলো ছবি দেখেন মিলন ভাই। আমার প্রথম প্রদর্শনী 'বাংলার মুখ' এর অনেকগুলো ছবি পড়েই ছিল। তিনি হঠাৎ করে দুটো ছবি আলাদা করে বলেন, 'শাকুর, আমি তোমার এ দুটো ছবি কিনতে চাই, কত দিব?' আমি লজ্জায় পড়ে যাই। আমি কি ছবি বিক্রি করি? তাঁকে অনেকভাবে বুঝালাম—ছবি দুটো আপনি নিয়ে যান, তিনি রাজি না। অবশেষে এর বাঁধাই খরচের দুই হাজার টাকা আমার পকেটে প্রায় জোর করে ঢুকিয়ে দিলেন মিলন ভাই। ছবি চলে গেল তাঁর গাড়িতে।

মিলন ভাই তখন একটা শুটিং ফ্লোর দিয়েছেন ৫০ পুরানা পল্টনে। সেখানে একটা বাসা বাড়ি সাজিয়ে রাখা শুটিংয়ের জন্য। ওই বাসায় কি তবে এ দু'টো ছবি টাঙিয়ে রেখেছিলেন মিলন ভাই?

হুমায়ূন আহমেদের অত্যন্ত প্রিয়ভাজনদের একজন হচ্ছেন ইমদাদুল হক মিলন। মিলন ভাইয়ের এই শুটিং ফ্লোরে নিশ্চয় হুমায়ূন আহমেদ শুটিং করেছেন 'এসো' নাটকটি এবং একবার ক্লোজ শটে ছবি দুটোও তাঁর ক্যামেরাম্যান ধারণ করেছিলেন।

আজ হুমায়ূন আহমেদকে উপলক্ষ করে গিয়াসউদ্দিন সাহেবের এই অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে বাসে বসে এই ছবি-দুটো হুমায়ূন আহমেদের নাটকের ভেতর দেখে ফেলা নিতান্তই কাকতালীয় ব্যাপার। জগত বড় রহস্যময়। কখন যে কাকে কোথায় মিলিয়ে দেয় কেউ জানে না!

সিলেটের বাসস্ট্যান্ডে নেমে আমরা আলাদা আলাদাভাবে গেস্টহাউজে গিয়ে পৌছি। আমাদের মধ্যে আর কোনো কথাবার্তা হয় না। আমার কামরায় আমি চলে যাই, ঢাকা থেকে আসা কোনো অতিথিকে আমি দেখি না। তাঁরা সম্ভবত এসে সঙ্গে লাঞ্চ করছেন। আয়োজকরা তাঁদের নিয়ে খুবই ব্যস্ত। আমাকে বলা হলো, আমার খাবার রুমে দেওয়া হবে। আমি মন খারাপ করে আমার কামরায় বসে বসে টিভি দেখি।

চারটায় অনুষ্ঠান, আমি সাড়ে তিনটার দিকে নিজের দায়িত্বে চলে যাই। গিয়ে দেখি গানের রিহার্সাল হচ্ছে। আমি ভয়ে ভয়ে ভেতরে ঢুকে এক কোনায় বসে পড়ি। বছরসাতেক আগে এই সিলেটের লোকজন আমাকে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করেছিল 'লন্ডনী কইন্যা' নাটক লেখার কারণে। সিলেটের বুদ্ধিজীবী মহলের এক অংশের সায় ছিল অবাঞ্ছিতকরণে। খুব ছোট ছোট কিছু সংস্কৃতি কর্মী আমার পক্ষ নিয়ে কিছু বিবৃতি দিয়েছিল। আজ আমার প্রথম মুখোমুখি হওয়া। আমাকে বক্তৃতাও দিতে হবে গিয়াসউদ্দিন আহমেদ সাহেবের ওপর। আজকের আয়োজনে বড় বড় বুদ্ধিজীবী সংস্কৃতিকর্মীরা থাকবেন। তাঁরা না জানি কী বলে দুয়ো দেন আমাকে সেই আশঙ্কায় চুপচাপ বসে থাকি।

এমন সময় মন্ত্রী মহোদয়রা গাড়ি থেকে নামলে যে রকম পরিস্থিতি তৈরি হয়, এমন একটা হুড়োহুড়ির মতো অবস্থা দেখি। বুঝতে পারি, তিনি এসে গেছেন।

হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আরও এসেছেন তাঁর বন্ধু স্থপতি আবু করিম, প্রকাশক মাজহারুল ইসলাম, অভিনেতা স্বাধীন খসরু, চ্যালেঞ্জার, কমল এবং তাঁর কিশোরপুত্র নুহাশও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নুহাশকে দেখে মনে হয় বাংলাদেশের পতাকা গায়ে জড়ানো। তার সবুজ রঙের টি-শার্টের মাঝখানে লাল রঙের এক বৃত্ত।

যথারীতি শুরু হয় অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথির আসনে বসা হুমায়ূন আহমেদ, বিশেষ অতিথি একজন এমপি, সভাপতি সিলেটের মেয়র কামরান। আরও কয়েকজন আছেন মঞ্চে। বক্তৃতার পালা শুরু হয়। বক্তৃতার নিয়ম হচ্ছে, যে যত ছোট বক্তা, সে দেবে সবার আগে। এক দুইজনের পরই আমার নাম ডাকা হয়।

'মরিলে কান্দিস না আমার দায়' গানটি আমি প্রথম শুনি ১৯৯৪-৯৫ সালের দিকে একটা রিহার্সাল রুমে। তখন তৌকীর আহমেদ আমার ব্যবসায়িক পার্টনার। সে তার দল নাট্যকেন্দ্র থেকে একটা মঞ্চনাটক নির্দেশনা দিচ্ছে, নাম 'হয়বদন'। এ নাটকের একটা মৃত্যুদৃশ্যে ইউসুফ হাসান অর্ক [বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যতত্ত্বের অধ্যাপক] এই গানটি গায়। শুধু এই গান নয়, সিলেট অঞ্চলের আরও দু'একটি গান এই নাটকে ব্যবহার করা হয়। গানগুলোর সংগ্রাহক ফজলুল কবীর তুহিন। তিনিও এই নাট্যদলে কাজ করেন। মূলত গানগুলো এই নাটকের জন্য তাঁরই আমদানি। রিহার্সেল শেষে তুহিন এই গানটি পুরো আমাদের গেয়ে শোনান। কানে লেগে যায়।

কিন্তু হুমায়ূন আহমেদের কানে এই গান লাগে আরও আগে। ১৯৯৪ সালে সুনামগঞ্জের পৌরসভা চেয়ারম্যান মইনুল মইজুদ্দিনের আয়োজনে ৩ দিনের জন্য হাসন উৎসবের আয়োজন হলে গায়ক সেলিম চৌধুরী মূলত হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে যান। সেই দলে তুহিনও ছিলেন। এ আসরে সেলিম চৌধুরী বেশ কয়েকটি গান গেয়ে শোনান, শেষের গানটি ছিল গিয়াস উদ্দিন আহমদের লেখা এই 'মরিলে কান্দিস না আমার দায়' গানটি।

এই অনুষ্ঠানে গান শুনতে এসে মুগ্ধ হুমায়ূন আহমেদ পরিচিত হন শাহ আবদুল করিম ও গিয়াসউদ্দিন আহমদের গানের সঙ্গে। পরবর্তীতে এ দুজন গীতিকারকেই তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনের গীতিকার হিসেবে তালিকাভুক্ত করান। এবং এ দুজনের গান নিয়ে মেতে ওঠেন ঢাকা এসে।

ঘনঘন ডাক পড়ে হুমায়ূন আহমেদের আসরে। সেলিম চৌধুরীকে দিয়ে হুমায়ূন আহমেদ হাসন রাজার গানের একটা অডিও সিডি বের করেন। তাঁর পরবর্তী ধারাবাহিক নাটক 'আজ রবিবার'-এ হাসন রাজার গানগুলো ব্যবহার হতে থাকে।

১৯৯৫-৯৬ সালের দিকে হাসন রাজার গানের সিডি বের করা অনেক কঠিন কাজ ছিল। সিডি বের করতে হয়েছিল লন্ডন থেকে। হুমায়ূন আহমেদের এই উৎসাহকে অনুপ্রাণিত করার জন্য তাঁর দুই বন্ধু প্রকাশক আলমগীর রহমান এবং স্থপতি আবু করিম পঞ্চাশ হাজার করে একলাখ টাকা লগ্নি করেন। জানি না এ টাকা তারা ফেরত পেয়েছিলেন কি না। কারণ শুনেছিলাম বেশ কটি অডিও প্রতিষ্ঠান এই সিডিটি জালিয়াতি করে বাজারে ছেড়ে দিয়েছিল। তাতে এর মূল উদ্যোক্তাদের পয়সা ফেরত পাওয়ার সুযোগ থাকে না।

হুমায়ূন আহমেদ এর পর তাঁর 'শ্রাবণ মেঘের দিন' উপন্যাসটির চিত্ররূপ দেন। সেই চিত্রনাট্যে তিনি 'মরিলে কান্দিস না আমার দায়' গানটিও অন্তর্ভুক্ত করেন।

'মরিলে কান্দিস না আমার দায়'সহ অন্য কয়েকটি গান রেকর্ড করার জন্য স্টুডিও ভাড়া করা হয়। সেখানে বাঁশি বাজানোর জন্য ডাক পড়ে বারী সিদ্দিকীর। মগবাজারের সাসটেইন স্টুডিওতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মকসুদ জামিল মিন্টুর সংগীত পরিচালনায় শুরু হয় গানের রেকর্ডিং। হুমায়ূন আহমেদ নিজেও উপস্থিত থাকেন এই রেকর্ডিংয়ে। একসময় রেকর্ডিংয়ের অবসরে বংশীবাদক বারী সিদ্দিকী তাঁকে নেত্রকোনার ভাটি অঞ্চলের কিছু গানও শোনান। এর ফলাফল সবাই জানেন। 'শ্রাবণ মেঘের দিন' এর 'মরিলে কান্দিস না' গানটির জায়গায় স্থান পেল 'শুয়াচান পাখী, আমি ডাকিতাছি তুমি ঘুমাইছো নাকি', আর বাংলাদেশ পেল বারী সিদ্দিকীর মতো এক সংগীত শিল্পীর।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় হুমায়ূন আহমেদ মূলত কী করে এ গানটি পেলেন এবং কোথায় ব্যবহার করলেন, তারই বর্ণনা দিলেন। একসময় বললেন, তিনি তিনজন শিল্পীকে দিয়ে [সম্ভবত; সেলিম চৌধুরী, বারী সিদ্দিকী ও সুবীর নন্দী] এ গানটি আলাদা আলাদাভাবে রেকর্ড করিয়েছিলেন, প্রতিবারই তাঁর অনেক টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু শেষমেশ তিনি বেছে নিয়েছিলেন সুবীর নন্দীর গাওয়া গানটি।

সুবীর নন্দীও ছিলেন অনুষ্ঠানে। ঢাকা থেকে তিনিও গিয়েছেন এ অনুষ্ঠানে শুধু ওই গানটি গাওয়ার জন্য। গাইলেনও তিনি খুব দরদ দিয়ে। গান গাইতে গিয়ে প্রথমেই তিনি এ গানের সুরকার এবং তাঁর ওস্তাদ বিদিতলাল দাশ [পটলবাবু] এর কথা বলছিলেন। বিদিতলাল দাশও তাঁর দলবল নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত। আলোচনা পর্বের শেষে গানের অনুষ্ঠান শুরু হয়।

১৯৩৫ সালের ১৪ আগস্ট সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক থানার শিবনগর গ্রামে জন্ম নেওয়া গিয়াসউদ্দিন আহমদ ছিলেন সিলেটের সাপ্তাহিক *যুগভেরীর* ছাতক সংবাদদাতা, ছাতক প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং ফুটবলার—এসব পরিচয়ই দেওয়া হলো তাদের বক্তৃতায়। দির্ঘাঙ্গী, রসিক এবং সংগীতপ্রিয় এ মানুষটি অনেকগুলো জনপ্রিয় সিলেটী আঞ্চলিক গান লিখেছিলেন। তাঁর লেখা 'সিলেট পরথম আজান ধনি বাবায় দিয়েছে', 'ও বাবা শাহপরাণ আউলিয়া', 'প্রাণ কান্দে মন কান্দে, কান্দে আমার হিয়া' এসব গান গাওয়া হলো। জারি সারি কিছু গানও লিখেছিলেন। নৌকাবাইচের গান। মঞ্চের মধ্যে নৌকাবাইচের চমৎকার কোরিওগ্রাফি করে দেখালেন সিলেটের শিল্পীরা।

এই অনুষ্ঠানে সংগীত পরিচালক এবং গানগুলোর সুরকার বিদিতলাল দাশ তাঁর বক্তৃতায় জানান যে, বহু আগে [১৯৭৪ সালের ৪ নভেম্বর] গিয়াসউদ্দিন সাহেব খুব অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে ছিলেন। এ সময় বিদিতলাল দাশ তাঁকে দেখতে গেলেন। তাঁকে দেখেই একটা কাগজ তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই গানটা আজ লিখলাম। আপনি সুর করেন'।

গানের প্রথম স্তবকটি হচ্ছে—

"মরিলে কান্দিস না আমার দায়রে, যাদুধন,
মরিলে কান্দিস না আমার দায়।।
সূরা ইয়াসিন পাঠ করিও বসিয়া কাছায়
আমার প্রাণ যাওয়ার বেলায়
বিদায় কালে পড়িনা যেন শয়তানের ধোঁকায়
রে যাদুধন...।"

এ গানটি যখন লেখা হয় কবির বয়স মাত্র ৩৯। এপর আরও প্রায় ৩০ বছর বেঁচেছিলেন তিনি। মারা যান ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে। নিতান্ত নিজের মৃত্যুচিন্তা থেকেই তাঁর এই মরণসংগীতটি লিখে দিয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপর অনুষ্ঠান শেষ হয়। হুমায়ূন আহমেদ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের আমি দেখি। একমাত্র স্থপতি আবু করিম আমার সঙ্গে কথা বলেন। সিলেট অডিটরিয়ামের পাশের একটা চায়ের দোকানে আমরা বসে চা খাই। সিলেট শহরে আমাদের দুজনেরই ডিজাইন করা কিছু বড় বড় প্রজেক্ট আছে, আমরা সেগুলো নিয়েই আলাপ করি। এবং একসময় সাবাই উঠে যান। আমি আমার মতো গেস্টহাউজে গিয়ে শুয়ে থাকি।

আমার সঙ্গে হুমায়ূন আহমেদের দেখা বা কথা হয় না। আমি তাঁদের রাতের প্রোগ্রাম জেনে গেছি। হ্যারল্ড রশীদ সাহেবের বাসায় তাঁরা রাতে যাবেন। ওখানেও গান-বাজনা হবে।

আমার খাবার আসে রুমে। আমি খেয়ে-দেয়ে টিভি দেখতে দেখতে ঘুমাই এবং পরদিন বেশ বেলা করে ঘুম থেকে উঠে শুনি ঢাকার মেহমানরা সবাই সকালেই চলে গেছেন। আমার সঙ্গে আর কারও দেখা হয় না।

তাঁর গানের আসরে নানারকমের সংগীত পরিবেশনা হতো। 'মরিলে কান্দিস না আমার দায়', গানটি দিয়ে তাঁর সব আসরের সমাপ্তি ঘটত। হুমায়ূন আহমেদসহ তাঁর বন্ধুরা চোখ মুছতে মুছতে আসর ছাড়তেন। একসময় হুমায়ূন আহমেদও শাওনকে বলতেন, তাঁর মৃত্যুর পর লাশের সামনে যেন শাওন এ গানটি গায়। অতি বেদনার কারণ হওয়ার জন্য একসময় এ গানটি গাওয়া বাদ পড়ে যায়। তাঁর স্মৃতি থেকে প্রায় আড়াল হয়ে যায়।

AMARBOI.COM

হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা হয় ২০০৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে। এ সময় শুনি তিনি নিজেই তাঁর মৃত্যুসংগীত রচনা করিলেন, 'ও কারিগর দয়ার সাগর, ওগো দয়াময়/চান্নিপশর রাইতে যেনো আমার মরণ হয়।' গানটি সুর করেছেন এস আই টুটুল, আসরে গাইতেনও তিনি। এস আই টুটুল পাবলিক কনসার্টে তার গানের আসরও শেষ করতেন এই গান দিয়ে। মনে হলো হুমায়ূন আহমেদ হয়তো তাঁর প্রিয় মৃত্যুসংগীতটি ভুলে গিয়েছেন।

কিন্তু আসলে কি তাই?

হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুর পর ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখে আমি বিস্মিত। আমেরিকার মেরিল্যান্ডের এক বাড়িতে কয়েকজন বাংলাদেশি স্বজন এসেছেন আড্ডায়। খাওয়া দাওয়া হবে। এ অবসরে তিনি বললেন, 'আমরা রবীন্দ্রনাথের গান শুনলাম, নজরুলের গান শুনলাম, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষও কিন্তু অসাধারণ কিছু গান লিখতে পারেন, এটা কিন্তু ফ্যাক্ট।... সিলেটের এক লোকের নাম গিয়াসউদ্দিন আহমদ...'।

এ সময় পাশ থেকে শাওন বললেন, 'এটা খুব অপছন্দের গান, এটা করব না।'

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, 'বাট দিস ইজ ট্রু ফর ইচ এন্ড এভরি ওয়ান অব আস।'

এটুকু বলে শাওনকে অনুরোধ করেন গানটি গেয়ে শোনানোর জন্য।

শাওন গাইছেন। অবিকল সেই সুর, সেই দরদ।

সিলেটের এক প্রত্যন্ত গ্রামের এক গীতিকবি কী অসাধারণ কথাগুলো বলে গেছেন। সেটাই কি তবে ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মৃত্যুসংগীত?

কে জানে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদকে যেভাবে দেখি

শামসুজ্জামান খান

হুমায়ূন আহমেদের আগে আমাদের এখানে অনেকের লেখা সাহিত্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলেও পুরোপুরিভাবে পাঠকদের বিশেষ করে নবীন পাঠকদের আকৃষ্ট করতে পারেন নি। এই জায়গাটাতে হুমায়ূন আহমেদের অনন্যতা আর এজন্যেই হুমায়ূন আহমেদ আমাদের এক গুরুত্বপূর্ণ লেখক। হুমায়ূন আহমেদের দ্বিতীয় কৃতিত্ব—তিনি শুধু নতুন প্রজন্মের পাঠক নয় সামগ্রিকভাবেই বাংলাদেশের পাঠকদের বাংলাদেশের সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে বাধ্য করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন একজন নিপুণ গল্পবলিয়ে। গল্প বলার শিল্পকলাটি তিনি এত দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ব করেছিলেন যে তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাস এবং বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি বিপুল পাঠককে সহজেই মুগ্ধ এবং অভিভূত করত। অনেকেই মনে করেন, শুধু একজন বড় সাহিত্যিকের যে অসাধারণ এবং উদ্ভাবনাময় কল্পনাশক্তি থাকা দরকার হুমায়ূন আহমেদের তা ছিল বিশেষভাবেই; দ্বিতীয়ত আগে যেমনটি বলেছিলাম, গল্প বলার নিপুণ কৌশলটি তিনি অনায়াস দক্ষতায় আয়ত্ত করেছিলেন। তৃতীয়ত তাঁর লেখার মধ্যে যে বৈচিত্র্য ছিল সাধারণত তা দেখা যায় না। এছাড়া পূর্ববঙ্গের মানুষের জীবনবোধ ও জীবনযাত্রার যে আলাদা একটি চারিত্র্য আছে, তাদের যাপিত জীবনের মধ্যে একটি সরলতা আছে এবং সরলতার মধ্যে যে একটা গভীরতা আছে হুমায়ূন তাকে চমৎকারভাবে চিত্রিত করেছেন তাঁর লেখা নানাপত্রে। পূর্ব বাংলার দুঃখ দৈন্য-পীড়িত-মেহনতি মানুষের জীবনের মধ্যেও যে রঙ্গ-তামাশাময় একটা রূপ আছে সেটি হুমায়ূন আহমেদ আবিষ্কার করিতে পেরেছিলেন। শুধু আবিষ্কার করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি; তাঁর সাহিত্যে এবং টিভি-নাটকে চমৎকারভাবে তা তুলে আনতে পেরেছেন। এই কারণে এদেশের মানুষ ও তাদের জীবনযাত্রা, তাদের বোধ-বিশ্বাস-ভালোবাসা, আনন্দ-বেদনা-নিষ্ঠুরতার চিত্রায়নে তিনি অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এ জন্যই তাঁর সাহিত্য এতটা জীবনঘনিষ্ঠ, আনন্দময় এবং সুখপাঠ্য। চতুর্থত তিনি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশে যে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সমন্বয়বাদী জীবন দর্শন এবং ধর্মনিরপেক্ষ জীবনবোধ রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত দেখতে চেয়েছিলেন তারও একজন শক্তিশালী রূপকার ছিলেন। একজন লেখকের মধ্যে যদি এতগুলো গুণ থাকে, তাঁকে আমরা নিশ্চয়ই একজন মেজর রাইটার বলব। আমি সেদিক থেকেই মনে করি হুমায়ূন আহমেদ আমাদের একজন মেজর রাইটার বা প্রধান লেখক।

হুমায়ূন আহমেদ পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ছিলেন একজন সৃষ্টিমুখর শিল্পী এবং তাঁর শিল্প সত্তায় নানামাত্রিকতা তাঁর লেখালেখি, নাটক ও চলচ্চিত্র, তাঁর গান এমনকি রংতুলির ছোঁয়ায় বর্ণময় চিত্রকলা সাধন-প্রয়াসে বিধৃত। টিভি নাটকে তিনি যে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন, যে শিল্পকুশলতা দেখিয়েছিলেন, সেটিও তাঁকে একটি ভিন্নমাত্রিক জনপ্রিয়তা দিয়েছিল। বাংলাদেশের মানুষের যে স্বকীয় বাকরীতি, আঞ্চলিক বুলির স্বরাঘাত, শ্বাসাঘাত, কথা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলার ঢং, ঠাট্টা-তামাশার ধরন সেগুলো তিনি চমৎকারভাবে তাঁর নাটকে উপস্থাপন করতেন। সেজন্য তিনি একজন জননন্দিত নাট্যকারও হতে পেরেছিলেন। তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, গল্প বলার ভঙ্গি এবং কলাকৌশল চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন চলচ্চিত্রশিল্পেও। যিনি এতগুলো ক্ষেত্রে একই সঙ্গে এবং সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন, তাঁকে কি আমরা একজন সামান্য লোক বলতে পারি? তাঁকে কি আমরা শুধু জনপ্রিয় লেখক বলতে পারি? তিনি নিশ্চয় একজন বড় মাপের সাহিত্যশিল্পী এবং সৃজনধর্মী লেখক। তাঁর প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা।

হুমায়ূন আহমেদের গল্পে অতিপ্রাকৃতের ব্যবহার আছে; এটিও হুমায়ূন আহমেদের অসাধারণ চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য। বড়মাপের লেখকরা যা করেন হুমায়ূন আহমেদও তাই করেছেন। ফেরদৌসীর *শাহনামার* দিকে তাকালে দেখব, সেখানে সোহরাব রুস্তমের যে ঘটনা— রুস্তম ৩০০ বছর বেঁচেছিল। *শাহনামায়* দেখা যায় একজন রাজা ১০০০ বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। বাস্তবে কি তা সম্ভব? সম্ভব নয়। কিন্তু লেখকের কল্পনায় একটা যুগকে ধারণ করার জন্য, কালকে ধারণ করার জন্য ওইরকমভাবে যদি চরিত্রটি পরিকল্পিত হয়ে থাকে, সেটাকেই বলতে হবে সাহিত্যের বাস্তবতা। হুমায়ূন আহমেদ সেই বাস্তবকে তাঁর কল্পনা জগতের সদাউদ্ভাবনাময় প্রকৃতি এবং বৈভব ও অনন্য বৈশিষ্ট্যে তাঁকে এভাবেই রূপায়িত করেছেন। পাঠক তো কখনোই সেখানে হোঁচট খায় নি কিংবা কখনো বলে নি এ কী লিখল? এ-কথা বলে বইটি ছুড়ে ফেলে নি। বরং আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করেছে এবং বলেছে, বাহ, মারহাবা, বাঁ আওয়াব—এই তো চাই।

হুমায়ূন আহমেদ তাঁর জীবন দিয়ে রক্তমূল্যে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে কিনেছেন। তাঁর বাবাকে তিনি হারিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে। তিনি মুক্তিযুদ্ধকে যতটা গভীরভাবে, যতখানি অনুপুঙ্খতায় ধারণ করেছেন তার একটু উদ্ভাসন ঘটেছে টিভি নাটকে টিয়াপাখির মুখে 'তুই রাজাকার' সংলাপে। অন্য লেখক তো শুধু লেখকের অভিজ্ঞতা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে চিত্রায়ণ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ তিনি যেমন গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন তেমনি তা প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর একটি নিজস্ব ধারা তৈরি হয়ে গেছে এবং সেগুলো এতটাই সংগত, স্বাভাবিক এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ যে সাধারণ মানুষ তা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সন্তুষ্টচিত্তে এবং আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের বিষয়-আশয়ের বর্ণনায়ও হুমায়ূন আহমেদ একজন অক্লান্ত লেখক।

আমাদের সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধের পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন সময় প্রচুর লিখেছেন হুমায়ূন আহমেদ। কেউ কেউ মনে করতে পারেন, তিনি সস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং তাঁর উদ্ভট চিন্তার কথা বর্ণনা করেছেন তাঁর বিভিন্ন রচনায়। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, এসব হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রূপ কিংবা তাঁর উদ্ভট চিন্তার মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের ভেতরের প্রকৃত স্বরূপটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। মানুষের জীবন রহস্য, অন্তর্জগতের ভাবনার যে টানাপোড়েন সেই সঙ্গে ভালো ও মন্দের দ্বন্দ্ব—এসব ক্ষেত্রে অনেক সাহসী কালজয়ী বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। যা অন্য কেউ বললে হয়তো বিপদগ্রস্থ হতেন। কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ অনেক সাহসী কথা অবলীলায় বলতে পেরেছেন। এটাও তাঁর অনন্য দৃষ্টিভঙ্গির একটি বড় পরিচয়। এইখানেই তিনি ভিন্নতর উচ্চতায় স্থিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিংহহৃদয় হুমায়ূন আহমেদ

শাহাবুদ্দিন আহমেদ

হুমায়ূন আহমেদের সাথে আমার খুব বেশি দেখা হয় নি। সব মিলিয়ে ৬-৭ বারের বেশি হবে না। তবে প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর সাথে আমার একটা আন্তরিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল।

আমাদের প্রথম দেখা হয় প্যারিসে। ২০০২ সালের অক্টোবরে। মাজহার ফোন করে জানিয়েছিল, সে প্যারিসে আসছে। মাজহার আরও জানিয়েছিল, তার সঙ্গে হুমায়ূন আহমেদও আছেন। তারা দুজন জার্মানিতে এসেছে। হুমায়ূন আহমেদ সেখানে বাংলা বইয়ের একটি মেলা উদ্বোধন করেছেন। জার্মানি আর ইতালির বিভিন্ন শহর ঘুরে তারা প্যারিসে আসবে। আমি খুবই খুশি হলাম। মাজহারকে বললাম, হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে অবশ্যই আমার বাসায় আসবে। আমার তাঁকে জানার খুব আগ্রহ ছিল। যখন ঢাকায় যেতাম তখন প্রায়ই দেখতাম, আমার ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা খুব আগ্রহ নিয়ে তাঁর লেখা পড়ছে। আর তখন তাঁর একটা নাটক প্রচারিত হতো টিভিতে, 'বহুব্রীহি' নাম। যেদিন এই নাটকটি প্রচার হতো সেদিন আমি সময়মতো রাতের খাবার পেতাম না। কারণ বাড়ির সবাই নাটক দেখায় মগ্ন থাকত। সেসময় এমনকি কাজের লোকটিও কাজ করতে চাইত না। প্রথম প্রথম রাগ হতো আমার। আমি সাধারণত নাটক দেখি না। পরে আমিও একদিন নাটকটি দেখলাম। ভালো লাগল। বুঝতে পারলাম কেন সবাই হুমায়ূন আহমেদের নাটকের জন্য এত পাগল। আমারও তাঁর সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি হয়।

AMARBOI.COM

তাঁর সম্পর্কে সবার আগে আমি যেটা বলতে চাই তা হলো, তিনি মারাত্মক সেনসিটিভ লোক। এত সেনসিটিভ লোক আমি কম দেখেছি আমার জীবনে—ইউরোপে কিংবা নিজ দেশে। তবে তিনি সেটা লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু প্রথম দেখাতেই আমি সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। আমরা কয়েকজন—হুমায়ূন আহমেদ, আমি, আমার স্ত্রী আনা, মাজহার একসাথে আড্ডা দিচ্ছিলাম। কথায় কথায় মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ এল। স্বভাবতই অনেক কথা বলছিলাম আমি। হুমায়ূন আহমেদ হঠাৎ জানতে চাইলেন, আপনি এত কিছু জানেন কীভাবে? আমি বললাম, আমি জানব না! আমি তো মুক্তিযোদ্ধা। এ কথা শুনে তাঁর মুখের অভিব্যক্তি একেবারে বদলে গেল। কথাই বলতে পারলেন না কিছু সময়। পরে বললেন, আমি জানতাম আপনি একজন বড় শিল্পী, কিন্তু আমি জানতাম না আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। তখন থেকেই আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল। আমাকে একটা বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতেন তিনি। তারপর থেকে আমাদের সম্পর্কটা গভীর হয়ে যায়। আর একবার, আমি দেশে এসেছি, কথাপ্রসঙ্গে মাজহার আমাকে বলেছিল, শাহাবুদ্দিন ভাই, হুমায়ূন ভাই সাধারণত কারও বাসায় যান না। আমি বললাম, তাই? দেখি আমার এখানে আসেন কি না? একদিন তাঁকে নিমন্ত্রণ করলাম আমার ঢাকার বাসায়। ঠিকই তিনি এসেছিলেন। আমাকে বলেছিলেন, এমন আনন্দ আমি আর কোথাও পাই নি। আসলে মনমতো মানুষ পেলে সবখানেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাওয়া যায়, আনন্দ পাওয়া যায়। তারপর থেকে যতবার ঢাকায় আসি, একবার অন্তত তাঁর সাথে আড্ডা দেওয়া হয়।

একটি বিশেষ ঘটনা মনে পড়ছে। আমি শুনেছিলাম, হুমায়ূন আহমেদ বাইরে কোথাও যান না। কোনো অনুষ্ঠানে তো নয়ই। যা হোক, ২০১০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমার জন্মদিনে তিনি এসেছিলেন। আগের দিন মাজহারের বাসায় ডিনারের সময় কথা দিয়েছিলেন, বেঙ্গল গ্যালারিতে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আসবেন। হুমায়ূন ভাই এসেছিলেন। আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম। আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তাঁকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিলাম; তিনিও আমার গালে চুমু খেয়েছিলেন।... কিছুদিন আগে আমি জানতে পারলাম, হুমায়ূন ভাই কাউকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছেন—এমনটি শুধু আমার ক্ষেত্রে ঘটেছে। এখন আমার মনে হচ্ছে, তাঁর হৃদয়ে একটু হলেও আমার জায়গা ছিল। বিষয়টি ভাবলে খুবই ভালো লাগে। আবেগে আপ্লুত হই।

আমি বই খুব একটা পড়ি না। বেশিরভাগ বইই দুই-তিন পৃষ্ঠা পড়ে রেখে দেই—এটা আমার একটা দোষ। আমি এতটুকু পড়েই লেখকের লেখার ধরন বুঝে নেই। হুমায়ূন আহমেদের বইও আমি পুরোপুরি খুব একটা পড়ি নি। তবে আমার মেয়েরা তাঁর বই পড়ে। আমি ছবি আঁকার সময় ওরা আমাকে প্রায় দশ-বারোটি বই পড়ে শুনিয়েছে। এছাড়া আনা মোটামুটিভাবে হুমায়ূন আহমেদের সব বই-ই পড়েছে। ও মাঝে মাঝে কোনো কোনো বই থেকে দু-এক পৃষ্ঠা পড়ে শোনায় আমাকে। আমার *শঙ্খনীল কারাগার*, *নন্দিত নরকে*, *মাতাল হাওয়া*, *লীলাবতী*, *তেতুল বনে জোছনা*, *রূপার পালঙ্ক*, *জোছনা ও জননীর গল্প* আর হিমু ও মিসির আলির বইগুলোর কথা মনে পড়ছে এখন। অনেক সময় এমন হয়েছে, তাঁর বইয়ের কোনো অংশ মনে করে একা একা হেসেছি আমি। তাঁর লেখায় আসলেই একটি আলাদা আকর্ষণ আছে। পশ্চিম বাংলায় আমার লেখকবন্ধুদের বলতে শুনেছি, হুমায়ূন বই পড়াকে জনপ্রিয় করেছেন। ওদের মেজরিটি অংশই মনে করে, শরৎচন্দ্রের পর হুমায়ূন আহমেদই সবচেয়ে বেশি পাঠক তৈরি করেছেন। এটা খুব গর্বের বিষয়।

হুমায়ূন আহমেদের নাটক-সিনেমা আমি খুব বেশি দেখি নি। তবে যতটুকু দেখেছি বা জেনেছি তাতে মনে হয়েছে এক্ষেত্রে তিনিই দেশের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। সহজ-সরল কথায় তিনি চরিত্রগুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করতেন যে খুব সহজেই তা মনের ভেতরে জায়গা করে নিত। তাঁর আঁকা ছবিও আমি দেখেছি। আমি বলব তিনি যদি আরও কিছুদিন বাঁচতেন, তা হলে এক্ষেত্রেও আমরা তাঁর কাছ থেকে অবিস্মরণীয় কোনো সৃষ্টি পেতে পারতাম। ছবি আঁকতে তাঁর যে চেষ্টা, নিষ্ঠা ছিল—তা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

হুমায়ূন আহমেদের কয়েকটি দিক আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে। অনেকেই আমাকে বলেছেন তিনি বেশ অহংকারী। তিনি কারও সাথে দেখা করেন না, সময় দেন না। এই অহংকার নিয়েও তাঁর সাথে আমার অনেক আলাপ হয়েছে। আমি কথাচ্ছলে ঠাট্টা করে তাঁকে বলেছিলাম, অহংকার করবেন না, আপনি আমার কাছে কিছু না। আপনি কতটা বিখ্যাত—আমার খ্যাতি আরও বেশি। আমি দেশে যেমন বিখ্যাত, বিদেশেও বিখ্যাত। আমি কিন্তু একদমই সিরিয়াসলি বলি নি কথাগুলি। কিন্তু আমার কথা শুনে হুমায়ূন ভাই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, আমার সাথে কেউ অহংকার করে না। একটা মানুষকে পেলাম যার অহংকার আছে। আমি বললাম, অহংকার থাকতে হবে। অহংকার না থাকলে মানুষের থাকে কী! তিনি আমার কথাটা গভীরভাবে নিলেন। তাঁর হার্টটা ছিল অনেক বড়, যাকে বলে একেবারে 'লায়ন হার্ট'। তাঁর চিন্তাধারা খুবই সরল, মোটেই কমপ্লিকেটেড না। তাঁর সেন্স অব হিউমার ছিল অসাধারণ। আমার একটা কথা মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে—একবার আমার এক বিদেশি ফটোগ্রাফার বন্ধুকে নিয়ে গেলাম তাঁর 'দখিন হাওয়া'র বাসায়। বন্ধুটি বিশালদেহী, দেখতে অনেকটা গরিলার মতো। তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম। আমরা ডিনার করার সময় জানা গেল বন্ধুটি মাছ-মাংস খাবে না, সে ভেজিটেরিয়ান। হুমায়ূন ভাই বলে উঠলেন, 'আর ইউ ভেজিটেরিয়ান? ইউ নো গরিলাস আর অলসো ভেজিটেরিয়ান।' আমরা সবাই গলা ফাটিয়ে হেসে উঠলাম। আমার এই ঘটনাটি সারা জীবন মনে থাকবে। তাঁর আরেকটি দিক—খুবই খাদ্যরসিক ছিলেন তিনি। এমনকি ভিনদেশি খাবারগুলোও খুব আগ্রহ নিয়ে খেতেন। বাঙালিদের মধ্যে সাধারণত এরকম দেখা যায় না। প্যারিসে একদিন আমরা একটা রেস্টুরেন্টে একসঙ্গে খেয়েছিলাম। নানারকম খাবার অর্ডার দিয়েছিলাম। আমি প্যারিসে থাকি, এসব খেয়ে অভ্যস্ত। দেখি তিনি সব খাবারই খেলেন কম-বেশি। আমি সত্যিই অবাক হয়েছিলাম।

হুমায়ূন ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ পাই ইন্টারনেটে। আমি তখন প্যারিসে। প্রচণ্ড শকড্ হলাম। আমি এমনিতেই মৃত্যুসংবাদ সহজে নিতে পারি না। মৃত্যুসংবাদ আমার ভেতর ভয় ঢুকিয়ে দেয়। লক্ষ করলাম, হুমায়ূন ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনে আনা চোখের পানি ফেলছে। আমাকে বলল, শাহাবুদ্দিন দেখো...। আমি বললাম, প্লিজ আমাকে দেখিয়ো না।

নিউইয়র্কে হুমায়ূন ভাইয়ের ক্যানসার চিকিৎসা চলাকালে প্রায়ই আনা ফোন করত মাজহারকে। মাজহারের কাছ থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিত। অপারেশনের পরেও মাজহারকে কয়েকবার ফোন করেছিল আনা। আমাকে সে বলেছে, দেখো হুমায়ূন ভাই সুস্থ হয়ে যাবেন। আমারও সে বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সবকিছু কেমন ওলটপালট হয়ে গেল।

আগেই বলেছি আমার সাথে হুমায়ূন ভাইয়ের ৬-৭ বারের বেশি দেখা হয় নি। শেষ দেখা ২০১১-তে রোজার সময়। ঈদের কয়েকদিন আগে সন্ধ্যায় আড্ডা শেষে ডিনার। নুহাশপল্লীতে যাওয়া হয় নি বলে দেখা হলেই তিনি বেড়াবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতেন। সময়াভাবে ইচ্ছে সত্ত্বেও সম্ভব হয় নি। হুমায়ূন ভাই চাইতেন অন্তত দুই একদিনের জন্যও যেন যাই, সেখানে সময় কাটাই। দেখা হলেই বলতেন তাঁর স্বপ্ন ও ইচ্ছার কথা।

শেষ দেখার রাতেও বলেছিলেন, নুহাশপল্লীতে একটা স্তম্ভ বা বেদীর মতো করবেন, যেখানে দেশি-বিদেশি গুণীজনদের হাতের ছাপ রাখবেন। সেদিন রাতেও একই ইচ্ছার কথা জানিয়ে বলেন, আমার হাতের ছাপ তিনি রাখতে চান। ব্যস্ততার জন্য আমার যাওয়া হয় নি। সেবার ঈদের আগে উপহারের প্যাকেট পাঠিয়েছেন। লাল পছন্দ করি বলে লাল পাঞ্জাবি আর আনার জন্য শাড়ি। রাতে টেলিফোনে কথা হয়। অপ্রত্যাশিত উপহার পেয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের ভালো লাগার কথা বলি। এটাই ছিল শেষ কথা হুমায়ূন ভাইয়ের সঙ্গে।

আমি তাঁর সম্পর্কে খুব বেশি জানি না, তিনি আমার সম্পর্কে খুব বেশি জানতেন না। কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। আমাদের মধ্যে সত্যিই একটি হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। তাই তাঁর মৃত্যুর খবরে বড় আঘাত পেয়েছিলাম আমি। আমার মনে পড়ে, আমি হুমায়ূন ভাইয়ের অসুস্থতার কথা সিরিয়াসলি নেই নি। কারণ, আমার মনের মধ্যে ছিল হুমায়ূন ভাইয়ের নিরুদ্বেগ মুখচ্ছবি। শেষবার যখন তাঁর সাথে দেখা হয়েছিল তখন একবার খাওয়ার টেবিলে তাঁকে বাড়তি কিছুটা গরুর মাংস নিতে অনুরোধ করলে তিনি বলেছিলেন, 'আরে খাব তো। মরব তো সিংহের মতোই মরব। খেয়েই মরব।' তাঁর মধ্যে ভয়ের কোনো চিহ্নই ছিল না। আমি ঠিক করে রেখেছিলাম এরপর তাঁর সঙ্গে দেখা হলে বলব, 'কী সিংহ? কী অবস্থা?' কিন্তু সেটা আর বলা হলো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃসঙ্গ ভুবনে হুমায়ূন আহমেদ

শিহাব সরকার

১৯৭২-এর মাঝামাঝি সময়ের কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের অনার্সের ছাত্র আমি। পড়াশোনার পাশাপাশি আহমদ ছফা সম্পাদিত সাপ্তাহিক *দাবানল*-এ কাজ করি। ওখানেই আমার সাংবাদিকতার হাতেখড়ি। কাগজটি প্রথম বেরিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বেরুতে থাকে ঢাকা থেকে। ওই সময়ের গাছপালা-ছাওয়া, ছায়ানিবিড় হাটখোলায় অফিস। এক দুপুরে ছফা ভাই হন্তদন্ত হয়ে অফিসে ঢুকে লম্বালম্বি ভাঁজ করা এক তাড়া কাগজ আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'শিহাব, একটা দুর্দান্ত গল্প পেয়েছি। এখনই কম্পোজে দিয়ে দাও। আগামী সপ্তাহে যাবে। তুমি দেখার পর আমি আরেকবার প্রুফ দেখব।' ছফা ভাই কাগজটা আমার টেবিলে রেখে চলে গেলেন তাঁর রুমে। আমার তর সইছিল না। তিনি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি গোটা গোটা অক্ষরে ফাউন্টেনপেনের কালো কালিতে লেখা গল্পটি পড়তে শুরু করি। লেখকের নাম হুমায়ূন আহমেদ। নামটি কি চেনা চেনা? গল্পের প্রথম লাইন, 'এক সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি দেখলাম আমি কাফকার পোকা হয়ে গেছি।' এরপর নানা অ্যাবসার্ড ঘটনা ও ফ্যান্টাসির ভেতর দিয়ে কাহিনি এগিয়ে চলে। এক বিমূর্ত পরিস্থিতিতে গল্প শেষ হয়। *নন্দিত নরকে* পড়ি আমি আরও দুই বছর পর। এক নিম্নমধ্যবিত্ত শহুরে পরিবারের গল্প সেটি। মর্মস্পর্শী একরৈখিক গল্প। অ্যাবসার্ডিটির লেশমাত্র নেই। হুমায়ূন আহমেদের অধিকাংশ উপন্যাস এই চরিত্রের। অথচ তাঁর সাহিত্যজীবনের শুরুতে লেখা একটি গল্প পুরোপুরি বিমূর্ত। তিনি প্রচুর আধিভৌতিক ও রহস্যালু গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। সায়েন্স ফিকশন ধরনের কাহিনিও তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল। ১৯৭২ সালে ফ্রানস কাফকার ছায়াশ্রিত *দাবানল*-এর লেখাটির কথা মনে করে আমি আজও বিস্মিত হই।

বই, বিশেষ করে গল্প-উপন্যাস পড়ার ব্যাপারে আমার দারুণ বাছবিচার। কলেজে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষেই আমার পড়া হয়ে গেছে বাংলা সাহিত্যের ধ্রুপদী উপন্যাসগুলো। স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়েছি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর প্রমুখের গল্প—সেই সঙ্গে *গল্পগুচ্ছ*। পাঠের রুচি আমার তৈরি হয়েই ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিষয়ে পড়ার সুবাদে নিজেকে আবিষ্কার করলাম বিশ্বসাহিত্য ভাণ্ডারের এক রোমাঞ্চকর দরজার সামনে। এসব কারণে হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয় ও ভীষণভাবে পাঠকনন্দিত উপন্যাসগুলো সম্পর্কে আমার এক ধরনের অনীহাই ছিল। মূলত কবিতা এবং মাঝেমধ্যে গল্প-উপন্যাস রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল আমার সাহিত্য-তৎপরতা। বহু বছর বাদে বিয়ে এবং সংসার শুরু করার পর স্কুল-কলেজ পড়ুয়া দুই সন্তানের হাত ধরে আমার কাছে তখনো অজানা হুমায়ূনের ঘোর-লাগানো জগৎ, যা পরবর্তী বছরগুলোয় গাঢ় হতে থাকে। আমার ছেলেমেয়ে দুজনই বইয়ের পোকা। তারা একসঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবলীলায় পড়ে যায় হুমায়ূন ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর আমি রাতে বাসায় ফিরে খাওয়া-দাওয়ার পর টিভির রিমোট টিপতে টিপতে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে ওদের টেবিল থেকে নিয়ে আসি হুমায়ূন আহমেদের *বৃহন্নলা* বা *তিথির নীল তোয়ালে* অথবা *ভৌতিক অমনিবাস*। হুমায়ূন নিজেই বিভিন্ন সময় বলেছেন, তিনি সিরিয়াস সাহিত্য করতে নামেন নি। বুদ্ধদেব বসু আজ থেকে ৭০-৮০ বছর আগে বলেছিলেন, 'চাই আনন্দের সাহিত্য।' কিছুটা ভিন্ন অর্থে হুমায়ূন তাঁর লাখো পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন সেই আনন্দে আর্দ্র সাহিত্য। এ সাহিত্য কেবল পাঠের জন্য, গ্রন্থবিশেষের গভীরে ডুবে গিয়ে ক্ষণস্থায়ী মণিমানিক্য বা অমিয় সুধা আহরণের জন্য, পাঠ-পরবর্তী ভারী তর্ক-বিতর্ক অথবা ডিসকোর্সের জন্য নয়।

সন্তানদের হাত থেকে হুমায়ূনের এ-বই সে-বই পড়তে পড়তে আমি একদিন আবিষ্কার করলাম, আমার টেবিলে মার্কেজের *লাভ ইন দ্য টাইম অব কলেরা* বা হান্টিংটনের *ক্ল্যাসেজ অব সিভিলাইজেশনস*-এর পাশাপাশি বুকমার্কার দেওয়া হুমায়ূনের *জোছনা ও জননীর গল্প*। আমার কথা শুনে অনেক উঁচকপালি পাঠক ভ্রু কুঁচকাতে পারেন। বলতে পারেন, পাঠক হিসেবে আমার এখনো পরিপক্কতা আসে নি। কিন্তু আমি নাচার। আমি স্কুলজীবনে *কড়ি দিয়ে কিনলাম* ও নীহার গুপ্তের *কালোভ্রমর* পড়েছি রুদ্ধশ্বাসে। হুমায়ূন আহমেদের চৌম্বক শক্তি এড়ানোর সাধ্য আমার নেই। তাঁর 'গল্প' বলার সরল ভঙ্গি, কাহিনির বুনন ও চরিত্র বানানোর শৈলী আমাকে টানে; আমি মোহিত হয়ে থাকি তাঁর সেন্স অব হিউমার বা রসবোধে। নিত্যদিনের জীবন থেকে কী জাদুকরী পারদর্শিতার সঙ্গেই না তিনি মানুষের আনন্দ-বেদনার কাব্যকণা তুলে এনেছেন! অনেকে বলে, তিনি কেবল নাগরিক জীবনের কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁর অনেক বইয়ের পটভূমি পুরোপুরি গ্রাম। অন্যদিকে, ধুলো-কাদার বাস্তবের অতীত অতীন্দ্রিয় ও ব্যাখ্যাতীত জগৎ নিয়ে লেখা তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলো ছেলে-বুড়োনির্বিশেষ সব পাঠককে টানে। আসলে এসব বই পড়ার জন্য বিশেষ ধরনের 'মন' থাকা চাই, যে মন থাকবে চিরসজীব। দেখে ভালো লাগে যে এ ধরনের সম্মোহিত পাঠক আমাদের সমাজে এখনো প্রচুর আছে, বর্তমান আইসিটি যুগের অজস্র সোশ্যাল মিডিয়াকেন্দ্রিক চিত্তহারী বিনোদন সত্ত্বেও।

কোনটা ধ্রুপদ বা কালজয়ী সাহিত্য, কোনটা সময়ের পরীক্ষায় ফিকে হয়ে যাবে, তা নিয়ে বির্তক আছে বরাবর। এরপরও কিছু কাজ সমসময়কে অতিক্রম করে সহস্রাধিক বছর টিকে গেছে। যেমন গ্রিক, ল্যাটিন বা সংস্কৃত এপিক, শেক্সপিয়ারের নাটক এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত অজস্র কবিতা ও গদ্যকর্ম। এ তালিকায় অবশ্যই আছেন রবীন্দ্রনাথ, গ্যাটে, টমাস মান, টিএস এলিয়ট, সার্ত্রে, কামু-কাফকাসহ বিভিন্ন দেশের অগণিত লেখক। জীবদ্দশায় তাঁদের প্রত্যেকের ভবিতব্যই ছিল অনিশ্চিত, অস্পষ্ট। বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে আসি। তুমুল জনপ্রিয়তা এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র কর্তৃক জাতীয় কবির স্বীকৃতি পাওয়ার ফলে কাজী নজরুলের স্থান মহাকালের পাতায় খোদিত হয়ে গেছে। একই সঙ্গে জীবনানন্দ দাশ জীবনভর অনুজ্জ্বল থাকলেও মৃত্যুর পর উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছেন। এ রকম দৃষ্টান্ত বিশ্ব ইতিহাসে প্রচুর। আসলে ক্ষণস্থায়ীত্ব বা অমরতার হিসেব বেশ জটিল। মনে হয়, কোনো নেপথ্য শক্তি অত্যন্ত নিরাসক্তির সঙ্গে এটা নির্ধারণ করে দেয়। কখনো লেখক যদি তাঁর মেধা এবং বহুমুখী সৃজনশীলতা দিয়ে তাঁর সময়েই আকাশচুম্বী পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন, তা মন্দ কিছু নয়। কিটস, বায়রন, শেলি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ ইংরেজ রোমান্টিক কবি তাঁদের সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন এবং এখনো আছেন। একই কথা খাটে আমেরিকান কবি হুইটম্যানের ক্ষেত্রে। হুমায়ূন আহমেদ সম্পর্কে এখনই কোনো মন্তব্য করা বোধহয় সমীচীন হবে না। অনেকে অবশ্য বলতে শুরু করেছেন, ২০-২৫ বা ৩০ বছর পর তাঁর পরিণতি হবে নীহাররঞ্জন গুপ্ত বা বিমল মিত্রের মতো। এটা বলার সময় আমরা ভুলে যাই, হুমায়ূন ছিলেন আপাদমস্তক শিল্পে নিবেদিত একজন মানুষ। তিনি প্রচুর লিখেছেন। কারণ সাহিত্য ছিল তাঁর জীবিকা। তাঁর তিন শ'রও বেশি বই থেকে এক বড় অংশ হয়তো পালপ-ফিকশন হিসেবে হারিয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর বড় কাজগুলো এবং এর বিষয় ও রচনাশৈলী ? পৃথিবীর অনেক অনেক বড় মৃত ও জীবিত লেখকের মতো প্রচুর মেধা ক্ষয় করে এবং ঘাম ঝরিয়ে লেখেন নি হুমায়ূন। তাঁর লেখার অন্যতম গুণ তাঁর স্বতঃস্ফূর্ততা। লিখতে বসে তাঁকে গভীর ভাবনা বা চিন্তার জগতে ডুবে যেতে হয় নি। সৃজনশীলতায় টগবগে ছিল তাঁর মন, চোখের সামনে ভাসত বৈচিত্র্যময় জীবনের সারি সারি ছবি। এর সঙ্গে ঈর্ষণীয় এক সৃজনশীলতা যুক্ত হওয়ায় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বহুলপ্রজ লেখক হয়ে উঠতে তাঁর সময় লাগে নি।

সাহিত্য পাঠ আমাদের নৈতিক শিক্ষা দেয় না। কিন্তু আমাদের অন্তর্লোককে পরিশীলিত করে বৈকি। হুমায়ূন বাঙালি তরুণ পাঠক-পাঠিকাদের চিন্তার নির্মলতায় দীক্ষিত করেছেন, বিশেষ কোনো উপন্যাস বা গল্পের বিষয়গত রূঢ় বাস্তবতা সত্ত্বেও। একইসঙ্গে তিনি আমাদের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন, কল্পনাপ্রবণ করেছেন। শিখিয়েছেন চারদিকের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ও পর্যবেক্ষণের যোগ্য। মূলত সাহিত্য এবং এর শাখা-প্রশাখা, টিভি নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদি মিলিয়ে হুমায়ূনের বিশাল সৃষ্টিসম্ভার তাঁকে বাঙালি জীবনের এক 'কালচারাল ফেনোমেনন'-এ পরিণত করেছে। হুমায়ূন আহমেদের চার দশকব্যাপী বিস্তৃত সৃষ্টিশীল অধ্যায়কাল কি পুরোপুরি পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারে ? পরপারে চলে যাওয়ার পর তিনি এখন একা, পুরোপুরি নিঃসঙ্গ। তাঁকে ঘিরে নেই ভক্ত-পাঠকের দল। নেই তাঁর পাণ্ডুলিপি পাওয়ার জন্য প্রকাশকদের ছুটোছুটি। নেই পুলিশি পাহারায় বাংলা একাডেমীর একুশে বইমেলার কোনো ভক্তপিষ্ট স্টলে তাঁর বসে থাকার দৃশ্য। তিনি সম্পূর্ণ একা। এখন শুরু হবে তাঁর টিকে থাকা না-থাকার পরীক্ষা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন, কান পেতে শুনছি আপনার 'অন্ধকারের গান'

সরদার আবদুস সাত্তার

প্রিয় ঔপন্যাসিক।

কাল মাঝরাতে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিল সদ্য ছেড়ে যাওয়া আপনার এই প্রিয় শহরে। বৃষ্টির তুমুল শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বৃষ্টিভেজা বাতাসের ঝাপটায় কেঁপে কেঁপে উঠেছিল জানালার শার্সি। ঘুমভাঙা চোখে আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম রাতের বৃষ্টিকে, বাতাসে ভর করে তার ওড়াউড়ি আর নাচানাচিকে। এই বর্ষায় এমন অঝোর বৃষ্টি এর আগে আর নামে নি। চুপচাপ অন্ধকারে বসে এই বৃষ্টির গান শুনতে শুনতেই মন পড়ে গেল আপনার *অন্ধকারের গান* উপন্যাসটির কথা। হঠাৎ করে যে মনে পড়ে গেল—তা নয়। আসলে তা মনের মধ্যেই ছিল। ঘুমের আচ্ছন্নতা কেটে যেতেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। কেননা গতকাল সারা দিন আমি আপনার এই উপন্যাসটির মধ্যেই মুখ গুঁজে ছিলাম। ১০৪ পৃষ্ঠার একটা উপন্যাস শেষ করতে সারা দিন লাগার কথা নয়। কিন্তু রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমি আপনার এই বইটির মধ্যেই মগ্ন হয়ে ছিলাম। মাঝখানে কিছুক্ষণের ঘুম। তারপর হঠাৎ করে ঘুম ভাঙানিয়া শ্রাবণধারার শব্দে জেগে উঠে বৃষ্টির নাচন দেখতে দেখতে, তার ছন্দময় সংগীত শুনতে শুনতে আবার সেই *অন্ধকারের গান*-এর বিষণ্ন জগতে ফিরে যাওয়া। ফিরে যাওয়া—উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বীণা ও তার পরিবারের কাছে। সেখানে এখন আর সেই সপ্রতিভ তরুণ বুলু নেই। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার দুঃখ এবং পায়ের ক্ষত নিয়ে সে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু আর ফিরে আসে নি। অলিক চলে গেছে সাগরপারে। নিঝুম দুপুরে কুয়োতলায় একা একা বসে আছে বীণা। গতকাল থেকে আমার জন্যও সেখানে একটা আসন পাতা হয়ে গেছে। কাল থেকে আমিও হয়ে পড়েছি তার জীবনকাহিনির একজন সমব্যথী পাঠক। শ্রোতা এবং দর্শক। আপনি আপনার গল্প-উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের সমুদয় সুখ-দুঃখকে এমনভাবে পাঠকের বোধ-বিচার ও উপলব্ধির সঙ্গে একীভূত করে দেন যে এক অচ্ছেদ্য আত্মীয়তাসূত্রে তখন তাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর থাকে না। আপন সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে লেখক থাকেন নাড়ির বাঁধনে বাঁধা আর তাঁর লেখনীর জাদুমন্ত্রে পাঠক হয়ে পড়েন মায়ার ঘোরে আচ্ছন্ন। অতএব আপনি, আমি এবং বীণা গতকাল থেকে তাদের বাড়ির বহু পুরনো কুয়োতলাতেই অবস্থান করছি। কথা বলছি। পায়চারি করছি। এবং আপ্লুত হচ্ছি একই হৃদয় বেদনার সিক্ত অনুভবে। তবে আমি সেখানে যোগ দিলাম আপনার ২৩ বছর পর—মাত্র গতকাল। মাঝখানে নিঃশব্দে ঘুমিয়ে আছে ২৩ বছরের অলিখিত উপাখ্যান।

'এমনি বরষা ছিল সেদিন'—২৩ বছর আগের এক মত্ত আষাঢ়-সন্ধ্যায় কাকভেজা অবস্থায় আপনি এসে দরজায় কড়া নেড়েছিলেন। আজকের সকালের মতো সেদিনের সেই বিদ্যুৎ শিখা ভরা সন্ধ্যায় কাচের জানালার সামনে বসে আমি বাইরের মেঘ-বৃষ্টি-বাতাস আর সৌদামিনীর নাচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখছিলাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো সেই কবেই এমন দিনে সকলকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করে গেছেন। কিন্তু সেই নিষেধ আমার মতো ঘরকুনো মানুষের জন্য শিরোধার্য হলেও হুমায়ূন আহমেদের মতো সৃষ্টিপাগল, গানপাগল আর বৃষ্টিপাগল মানুষের জন্য নিশ্চয়ই নয়। বরং ঝড়-বৃষ্টি-মেঘ, আরও বেশি বেশি করে তাদের ঘরের বাইরে বের হওয়ার উৎসাহ যোগায়। অতএব এমন সন্ধ্যায় সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ভরা হুমায়ূন আহমেদ অথবা তাঁর মতো কেউ ছাড়া আমার মতো গৃহবাসীর দুয়ারে আর কেই-বা করাঘাত করবে! আমি তখন থাকি ইস্কাটন গার্ডেনের নিউ সার্কিট হাউসে। পাঁচতলায় ৭৬ নং স্যুটে আমার বসবাস। অস্থির কড়া নাড়ার শব্দে সচকিত হয়ে দরজা খুলেই দেখি—যা ভেবেছি তা-ই। মোটা ফ্রেমের চশমার আড়ালে চোখের কোণে কৌতুক মেশানো হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি—হুমায়ূন আহমেদ। কী আশ্চর্য! আমার স্ত্রী শাহীন তাড়াতাড়ি একটা শুকনো তোয়ালে নিয়ে এসে আপনার হাতে তুলে দিল—গা মাথা মুছে নেওয়ার জন্য। আপনি হাত বাড়িয়ে তোয়ালেটা নিলেন। কিন্তু নিজের ভেজা মাথা কিংবা চোখ-মুখের দিকে তা এগিয়ে না নিয়ে বাঁ হাতে আগলে রাখা একটা বই ভালো করে মোছার জন্য উদ্যোগী হলেন। মুখে বললেন, 'আমি ভিজলে কোনো ক্ষতি নেই। বরং আরেকটু তাজা হব। কিন্তু বইটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই এর পরিচর্যাটাই আগে দরকার।'

'আপনারা বসুন। আমি একটু আদা-চা করে নিয়ে আসি' বলে শাহীন দ্রুত পায়ে রান্নাঘরের দিকে যায়।

তোয়ালেটা আমার হাতে দিয়ে আপনি বসলেন। আপনি চোখের চশমার কাচে তখনো বৃষ্টির দাগ। আমার নিজের চশমাও অনেক পুরু লেন্সের। আপনার চেয়েও। সামান্য বৃষ্টির ফোঁটাও সেখানে কী ধরনের সমস্যা জাগায় আমি তো তা ভালো করেই জানি। তাই তোয়ালেটা আবার আপনার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলি, 'চশমাটা ভালো করে মুছে নিন। নইলে আপনার সেই "সাদা গাড়ি" গল্পের সাব্বিরের মতো অবস্থা আপনার নিজেরই হবে।'

সাব্বিরের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিষাদছোঁয়া হাসি ফুটে উঠল আপনার মুখে। বললেন, 'সাব্বিরের কথা আপনার মনে আছে দেখছি!'

'শুধু আমি কেন, আমার মতো যারা হাই-মায়োপিয়ায় ভুগছেন অন্তত তাদের কেউই সাব্বিরকে কখনো ভুলবে না।'

শাহীন চা নিয়ে এল। সেইসঙ্গে একটা 'অ্যাশট্রে'। আমি সিগারেট খাই না। কিন্তু আমার চার প্রিয়বন্ধু আহমদ ছফা, জামান ভাই, সবুজ ভাই এবং আপনার কাছে সিগারেটই প্রধান খাদ্য। ছাইদানি না থাকার কারণে চায়ের খালি কাপগুলোই হয়ে উঠত অস্থায়ী ছাইদানি। সমস্যাটা সমাধান করার জন্য শাহীন সপ্তাহখানেক আগে কয়েকটা বাজার ঘুরে একটা বেশ সুন্দর ছাইদানি কিনে এনেছে। যে-কোনো সুন্দর জিনিসই তো আপনার চোখ ছুঁয়ে যায়। সেই বাদল সন্ধ্যাতেও তার কোনো ভিন্নতা দেখি নি। তাই মুহূর্তেই সেটা আপনার হাতে উঠে গিয়েছিল। বেশ কয়েকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার পর নিজের মুগ্ধতা প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'বাঃ বেশ তো দেখতে! কিন্তু একজন অধূমপায়ীর ঘরে এটা এল কী করে?'

আমি কিছু বলার আগেই সারামুখে একরাশ হাসি ছড়িয়ে শাহীন বলে, 'হুমায়ূন ভাই, এটা আমি আপনার জন্য কিনে এনেছি।'

'তাই! তাহলে তো বেশি করে সিগারেট খেতে হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এবং বেশি বেশি করে আমাদের বাসায় আসতেও হবে।' শাহীন বলে। আমরা তিনজনেই হেসে উঠি একসঙ্গে।

চা খেতে খেতে এবং গল্প করতে করতে আপনি একটু আগে তোয়ালে দিয়ে যত্ন করে মুছে হাতের যে বইটি টেবিলের ওপর রেখেছিলেন, তা আবার হাতে তুলে নিলেন। প্রিয় সন্তানের দিকে যেভাবে সস্নেহে তাকায় একজন পিতা, ঠিক সেইভাবে কয়েকটি মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বইটি আমার হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, 'এটা আপনার জন্য।'

আমি বইটির দিকে তাকালাম। ঝকঝকে সুন্দর প্রচ্ছদ। কালো রঙের পটভূমির ওপর চারটি সুন্দর রঙের বিন্যাস—দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়, মন খুশি হয়। তার ওপর মানানসই গোল গোল অক্ষরে লেখা 'অন্ধকারের গান'।

এর আগেও এমনটি ঘটেছে একাধিকবার। সদ্যপ্রকাশিত নতুন বইয়ের একটি কপি হাতে নিয়ে আপনি চলে এসেছেন আমাদের বাসায়। তাই আষাঢ়ের সেই বৃষ্টিমাতাল সন্ধ্যায় সদ্য প্রকাশিত *অন্ধকারের গান*-এর কপি হাতে পেয়ে খুব বেশি বিস্মিত হই নি। আর আমার তখনকার আনন্দ কিংবা বিস্ময়ের মাত্রা পরিমাপ করতে মোটেই দেরি হয় না আপনার। গল্প-উপন্যাস-নাটকে আপনি চমকের পর চমক সৃষ্টি করেন। ব্যক্তিগতভাবেও আপনি আপনার প্রিয় কিংবা পরিচিতজনদের চমকে দিতে পছন্দ করেন। ভালোবাসের বিস্ময়ের আনন্দে তাদের সারাক্ষণ আপ্লুত করে তুলতে। এবং এত নিপুণভাবে সেই কাজটি সম্পন্ন করেন যে তা নিজেই হয়ে ওঠে একটা শিল্প। কিন্তু সেই বিস্ময়বোধ প্রবলভাবে আমার মধ্যে কাজ করছে না দেখে আপনি বোধহয় মনে মনে একাই হাসলেন। কেননা আমার জন্য তখন বড় একটা বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে, তখন পর্যন্ত তা শুধু আপনারই জানা। ব্যাপারটিকে তার নির্দিষ্ট পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একইসঙ্গে আগ্রহ ও উদাসীনতার এক অসাধারণ যুগলবন্দি কণ্ঠে ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'এই বইয়ের প্রথম কপিটি সকলের আগে আপনার হাতে তুলে দেব বলেই বৃষ্টি উপেক্ষা করে চলে এলাম।'

'এটা আপনার বাড়াবাড়ি হুমায়ূন ভাই।' মৃদু অনুযোগের সুরে শাহীন বলল, 'বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বই হাতে নিয়ে চলে আসা। বৃষ্টি ছাড়লে কিংবা কাল দিলেও একই ধরনের আনন্দ হতো।'

'তা হয়তো হতো। সেটা সাধারণ উপহার দেওয়ার এবং পাওয়ার আনন্দ। কিন্তু উৎসর্গের আনন্দকে কিছুতেই বাসি করা যায় না। তাকে পেতে হয় হাতে হাতে, ভাগ করে নিতে হয় তখন তখনই।'

'মানে ?' প্রায় একইসঙ্গে শাহীন এবং আমি উচ্চারণ করি। আপনার চোখদুটো তখন রহস্যময় হাসিতে ভরা। কণ্ঠে নির্লিপ্ততা। বললেন, 'বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠাটি ওলটান। তাহলেই বুঝতে পারবেন।'

পাতা উল্টালাম। বেরিয়ে এল উৎসর্গের পাতা। মাত্র দুটি লাইন সেখানে। কিন্তু আমার দৃষ্টি যেন একেবারে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আসন পেতে বসে পড়ল। ওই জায়গাটুকু ছেড়ে যেন তা আর অন্যত্র যেতেই চায় না। পাঁচটি শব্দের মাত্র দুটি লাইনে যে বিপুল বিস্ময়ভরা মায়ালোক সেখানে আপনি সৃষ্টি করে রেখেছেন তা ছেড়ে আমার সমগ্র দৃষ্টি, সত্তা, মন ও মনোযোগের অন্য কোথাও যাওয়ার তো সামান্যতম শক্তিও ছিল না। আমি তাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। দাঁড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকলাম বইয়ের ওই পৃষ্ঠাটির দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে। কৌতূহল দমন করতে না পেরে শাহীন উঁকি দিল সেখানে। এবং তারপরই ওর উচ্ছ্বাসভরা উচ্চারণ--'দারুণ ব্যাপার তো! সরদার আবদুস সাত্তার এবার তাহলে সেই ভাগ্যবান মানুষদের তালিকাভুক্ত হলো—যাদের নামে হুমায়ূন আহমেদের বই উৎসর্গীত হয়েছে।'

কিন্তু কোনো কথা ফুটছে না আমার মুখে। চোখও তুলতে পারছি না। সেখানে অশ্রুর ঝিকিমিকি। নোনা জলের জোয়ার।

আপনার সৃষ্ট অনেক চরিত্রকেই আনন্দে কাঁদতে দেখেছি। এবার আমি নিজেও তাদের দলভুক্ত হলাম। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে তাকালাম আপনার দিকে। এক অপূর্ব স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আপনি তখন আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন। এবং কী আশ্চর্য! সেখানেও অশ্রুর মুক্তাবিন্দু। চোখের জলের রুপালি উপহার। আমাদের দুটি হাত পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হলো--উষ্ণ আন্তরিকতায়। আমি নতুন করে আপনার দানের মহিমায় অভিভূত হলাম। কৃতজ্ঞ হলাম। সমৃদ্ধ হলাম। এবং জীবনের চারপাশের সবুজ বেষ্টনীকে আরও প্রগাঢ়, আরও অপরূপ হয়ে উঠতে দেখলাম।

শৈশবে আমার একটা ভারি অদ্ভুত অভ্যাস ছিল। আর পাঁচটা বাচ্চার মতো আমিও বড়দের কাছ থেকে চকলেট পেতে এবং খেতে পছন্দ করতাম। বলা যায় পাওয়ামাত্রই সেগুলো খেয়ে আমি সাবাড় করে দিতাম। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটত রহমান ভাইয়ের দেওয়া উপহারের বেলায়। আমার ছোটবেলায় তিনি ছিলেন আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। তাঁর কাছ থেকেও আমি চকলেট উপহার পেতাম। কিন্তু সেই চকলেট আমি কিছুতেই তাৎক্ষণিকভাবে খেতে পারতাম না। সেগুলো দীর্ঘসময় হাতে এবং পকেটে নিয়ে ঘুরতাম। মাঝেমধ্যে চোখের সামনে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতাম। তারপর আবার রেখে দিতাম। মুখে পুরতে গেলেই মনে হতো—আহা, চকলেটটা তো তাহলে এখনই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু রহমান ভাইয়ের দেওয়া কোনো উপহার ব্যবহারের মাধ্যমে মলিন কিংবা নিঃশেষ হয়ে যাক—মন তাতে মোটেও সায় দিত না। আমি তাকে অক্ষত এবং আনকোরা রাখতে চাইতাম। তাই মায়ের একটা তালাখোলা ট্রাংকের মধ্যে সেগুলো লুকিয়ে রাখতাম। সেই ছোটবেলাকে পিছে ফেলে এসেছি অনেক আগে। কিন্তু শৈশবের কিছু অভ্যেস আজও সঙ্গী হয়ে আছে। তাই আমাকে উৎসর্গ করা আপনার *অন্ধকারের গান* উপন্যাসটি বহুবার ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেছি। যত্ন করে আলমারিতে তুলে রেখেছি। আবার সেখান থেকে বের করে এনে তার সমগ্র অবয়বে আদরের স্পর্শ বিলিয়েছি। পৃষ্ঠাগুলোতে আঙুল বুলিয়েছি। কিন্তু প্রচণ্ড আগ্রহ জন্মানো সত্ত্বেও উপন্যাসটির প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম বাক্য ছাড়া আর কিছুই পড়ি নি। ১৯৮৯-র সেই বৃষ্টিভেজা আষাঢ়সন্ধ্যা থেকে ২০১২-এর আষাঢ়, এই তেইশটি বছর নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছি এক নিঃশ্বাসে উপন্যাসটি পড়ে ফেলার স্বপ্নিল আকাঙ্ক্ষা থেকে। কেননা সব পাতা পড়ে ফেলা উপন্যাসের মধ্যে আর কোনো রহস্য থাকে না। কৌতূহল থাকে না। এবং একই সঙ্গে থাকে না নতুন করে তার অন্দরমহলে প্রবেশের অনিবার আগ্রহ। মুখে পুরে ফেলা চকলেটের মতোই তা যেন গলে গলে নিঃশেষ হয়ে যায়। অথবা অস্তিত্বহীন না হলেও তা হয়ে পড়ে আকর্ষণহীন। কিন্তু আপনার এই অমূল্য উপহারের ক্ষেত্রে তা হোক—সেটা তো আমি কিছুতেই চাই না। তাই ছোটবেলায় অতিপ্রিয় রহমান ভাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া চকলেটগুলোকে যেমন আমি মুখে না পুরে অক্ষত অবস্থায় তা সংরক্ষণের চেষ্টা করতাম, চেষ্টা করতাম তার রঙ-রূপ-রস-গন্ধ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌন্দর্যের সামান্যতম অংশকেও না হারাতে—*অন্ধকারের গান*-এর ক্ষেত্রে আবার সেই ইচ্ছেটা ফিরে এল। তাই 'সব পাতা পড়ে ফেলা উপন্যাস'-এর সারিতে তাকে সাজিয়ে রাখতে পারি নি। বরং গত ২৩ বছর ধরে অনাঘ্রাতা ফুলের মতোই তা তার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য, রহস্য এবং আনন্দময়তা নিয়ে কখনো আমার পড়ার টেবিলে, আবার কখনো বইয়ের আলমারিতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে আসছে। কিন্তু ২০১২-র এই মত্ত শ্রাবণে এসে কত কী-ই না ঘটে গেল। কোটি মানুষ আপনার রোগমুক্তির প্রার্থনা জানাল। অগণিত মানুষ তাদের বেদনাহত হৃদয় নিয়ে শহীদ মিনার চত্বরে ভিড় জমালো। কিন্তু আমরা কেউই আপনাকে ধরে রাখতে পারলাম না। সেই মহাকালের সোনার তরী এসে কূলে দাঁড়াল। আপনার বিস্ময়কর বিপুল সৃষ্টিসম্ভারের কোনোকিছুই সে গ্রহণ করল না। শুধু একা আপনাকে নিয়ে সে চলে গেল লোকান্তরের উদ্দেশে। আর আপনার সারা জীবনের সাধনার ফসল 'রাশি রাশি ভারা ভারা' সোনার ধান পড়ে রইল 'শূন্য নদীকূলে'। মর্তভূমে। আর এখনো এখানে আমরা যারা বসবাস করছি—তাদের ওপরই রয়ে গেল তা ঘরে তোলার কাজ। তাই আপনার বিদায়ের এই শ্রাবণে কান পেতে শুনতেই হচ্ছে 'অন্ধকারের গান'-এর বিষণ্ন সুর। দৃষ্টিনিবদ্ধ করতে হলো ২৩ বছর আগে দেওয়া আপনার সেই অমৃত-উপহারের অন্দরমহলে—যেখানে ভীষণভাবে একা হয়ে যাওয়া তরুণী বীণার হাতে লাগানো চাঁপাগাছটি শ্রাবণধারার মতোই অকাতরে বিলিয়ে যাচ্ছে গন্ধধারা। বীণার উচ্চারিত 'লুবু' শব্দটি বহু পুরাতন কুয়োটির ভেতরে প্রতিধ্বনিত হয়ে 'বুলু' শব্দের অনুরণন তুলছে—যে বুলু হারিয়ে গেছে অনন্ত অন্ধকারে।

পড়তে বসে উপন্যাসটির তৃতীয় পৃষ্ঠাতেই একটা অবাক করা বিষয়ের ওপর আমার দৃষ্টি আটকে গেল। মিজান সাহেবের পরিবারের একটি কেনা বাড়িকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে *অন্ধকারের গান*-এর কাহিনিবৃত্ত। আর এই কাহিনিবৃত্তের সময়কাল সম্পর্কে আপনি লিখেছেন, 'এক শ্রাবণ মাসের মেঘলা দুপুরে তিনি এই বাড়িতে ঢুকেছিলেন। আজ আরেক শ্রাবণ মাস। মাঝখানে চব্বিশ বছর পার হয়েছে।' আপনার হাত থেকে *অন্ধকারের গান* পাবার পর আমার জীবন থেকে পার হয়ে গেছে তেইশ বছর। আর এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের জীবন থেকে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে চব্বিশ বছর। বর্ণিত কাল-পরিধিতে মিজান সাহেবের জীবন একটি পর্যায় থেকে পৌঁছে গেছে আরেকটি পর্যায়ে। উপমহাদেশের রাজনীতি এবং জনজীবনে ১৯৪৭ সাল একটি বহুমুখী প্রভাবসঞ্চারী বছর। বহুমুখী পাওয়া না-পাওয়ার বিচিত্র দোলায় এই সালটি আমাদের ইতিহাসকে আন্দোলিত করেছে। নতুন স্বপ্ন-কল্পনায় উদ্দীপ্ত করেছে। রক্তে ভাসিয়েছে। অশ্রুতে ডুবিয়েছে। দ্বিখণ্ডিত করেছে অখণ্ড বাংলাকে। ফলে পশ্চিমবঙ্গ বিহার-পাঞ্জাব এবং পূর্ববঙ্গ থেকে আকস্মিকভাবে সংখ্যালঘু হয়ে পড়া বিপুলসংখ্যক মানুষ দেশান্তরিত হতে বাধ্য হয়। এসব বাস্তুত্যাগী মানুষের ছেড়ে যাওয়া বিষয়-আশয় কিংবা ঘরবাড়ি ও তাদের দখলদারিত্ব নিয়ে শুরু হয় এক নতুন ধরনের খেলা। শুধু আমাদের সামাজিক ইতিহাসে নয়, সাহিত্যেও তার নানামাত্রিক পরিচয় ধরা আছে, এবং হুমায়ূন—আপনার *অন্ধকারের গান*-এর কাহিনি যাত্রাও শুরু হয়েছে এই তরঙ্গক্ষুব্ধ কালসীমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে। মিজান সাহেবের পুরনো আমলের যে বাড়িটি এই উপন্যাসের মূল কেন্দ্রভূমি, সেটিও ওই সময়ে সংখ্যালঘু হয়ে পড়া এক স্বচ্ছল হিন্দু পরিবারের পরিবারকর্তা ঢাকা ছেড়ে কলকাতা চলে যাওয়ার প্রাক্কালে একেবারে 'জলের দরে' বাড়িটি বিক্রি করে দেন বলেই মিজান সাহেবের মতো এক নিম্নবিত্ত মানুষের পক্ষে তা কেনা সম্ভব হয়েছিল। তবে অতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সস্তায় বাড়িটি কিনতে পারলেও দখল নেওয়ার সময় নানান অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা ও অভিজ্ঞতার মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হয়। সবকিছু জয় করতে পেরেছিলেন বলেই ওই বাড়িতে তার গৃহপ্রবেশ ঘটেছিল ২৪ বছর আগে—প্রথম সন্তান বুলুর বয়স যখন দুই বছর। এখন সে ২৬ বছরের যুবক এবং ব্যর্থ জীবনের গ্লানিভারে মৃত্যুপথযাত্রী।

মিজান সাহেবের গৃহপ্রবেশকালে পাকিস্তান আমলের প্রথমদিকে মিরপুর ছিল ঢাকা শহরের প্রান্তবর্তী জনপদ। দ্রুত বর্ধনশীল ঢাকা শহর ও শহরবাসীর আবাসিক চাহিদা মেটাবার জন্য তখন শহর-সন্নিহিত যেসব এলাকায় নিত্যনতুন ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট গড়ে উঠছে, মিরপুর ছিল তাদেরই অন্যতম। কিন্তু শহরতলীর মর্যাদা পেলেও তার সারা শরীরে তখন গ্রামের এঁদো ডোবা ও কাদামাটির ছড়াছড়ি। আবার গ্রামের স্নিগ্ধ মমত্ব এবং প্রশান্তিটুকু থেকেও তা বঞ্চিত। তাই সপরিবারে গৃহপ্রবেশের সময় মিজান সাহেবের স্ত্রী ফাতেমা হতাশ এবং চিন্তাগ্রস্ত হয়ে তাঁর স্বামীকে বলেছিলেন, 'কোথায় নিয়ে এলে? এ যে সাপ-খোপের আড্ডা। চারদিকে একটা বাড়িঘর নেই। ডাকাত মেরে রেখে গেলেও কেউ জানবে না।'

সে মিরপুর এখন জনারণ্য, আলোয় আলোয় শোভাময়। সে মিরপুর এলাকা—গত শতকের ষাটের দশকেই ছিল অনেকটাই জনহীন প্রান্তর—বিষয়টা ভাবতেই এখন আমাদের বেশ মজা লাগে। কৌতূহল জাগে আজ থেকে ৫০/৬০ বছর আগে মিরপুর অঞ্চলের চালচিত্রটি চোখের সামনে মেলে ধরতে। সামান্য কিছু তথ্য বা ইঙ্গিত পেলেও আমরা মনের মধ্যে তার একটি নিখুঁত দৃশ্যকলা তৈরি করে ফেলতে পারি। আমাদের সেই প্রত্যাশা অপূর্ণ রাখেন নি আপনি। ছবির মতো সাজিয়ে রেখে গেছেন সেই সময়ের বর্ণনা। লিখেছেন, 'শ্রাবণ মাসের এক মেঘলা দুপুরে মিজান সাহেব, তাঁর স্ত্রী এবং দু'বছর বয়েসী বুলুকে নিয়ে কল্যাণপুরের এই বাড়িতে এসে উঠেছিলেন। শ্যাওলাধরা প্রাচীরের নোনা লাগা বাড়ি, চারদিকে ঝোপঝাড়। বাড়ির বাঁ দিকে ডোবার মতো আছে। ডোবার চারপাশে ঘন কচুবন। তাঁদের চোখের সামনেই ডোবার পানি কেটে একটা খয়েরি রঙের সাপ চলে গেল।'

AMARBOI.COM

এখনো শহর হয় নি, কিন্তু গ্রামের আদল ভেঙেছে। এমন এক রঙছুট পরিবেশে বুলুদের সেই ক্রয়কৃত বাড়িটি কিন্তু বেশ খানিকটা গাম্ভীর্য এবং প্রাচীনকালের গৌরব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই বর্ণনাটাও একটা ছবি। অতীতের গন্ধমাখা বিকেলের ধূসর আলোয় আঁকা এক মন কেমন করা ছবি। যে মানুষগুলো একদিন ছিল, কিন্তু এখন নেই ছবিটিতে তাদের সেই সময়ের ক্রিয়াকর্ম এবং সরব উপস্থিতি অতি অল্প আয়োজনেই চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। পুরনো আমলের হিন্দু বাড়ি। তুলসি-মঞ্চ আছে। ছোট একটা ঠাকুরঘর আছে। ঠাকুরঘরের দক্ষিণে গহীন একটা কুয়ো। বাড়ির গেটে সিংহের দুটি মূর্তি।

'৪৭-পরবর্তী সময়ে 'নিজ বাসভূমে' পরবাসী হয়ে পড়া যে বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তু মানুষের দীর্ঘ পদযাত্রা চলেছিল দুই বাংলা জুড়ে তাদের কোথাও পরিত্যক্ত আবার কোথাও-বা দু'হাতে প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরা বাড়িঘরের কথা বাংলা সাহিত্যে অদৃষ্টপূর্ব নয়। বিশেষ করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোঁয়ারি' গল্প দুটির তো কোনো তুলনাই চলে না। দেশবিভাগের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তেমনই একটি পুরাতন হিন্দু-বাড়ি আপনার এই উপন্যাসেও একটা নিজস্ব অবস্থান গড়ে নিয়েছে। একটা হিন্দু-বাড়ি যখন মুসলমান-বাড়ি, অথবা একটা মুসলমান-বাড়ি যখন হিন্দু-বাড়িতে পরিণত হয়—তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো তার কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এখানেও হয়েছে। ফলে প্রবেশ দুয়ার থেকে তুলসি মঞ্চ কিংবা ঠাকুরঘরের কিছু রদবদল হলো। কিন্তু অপরিবর্তিত ও অক্ষত রয়ে গেল বাড়ির গহীন কুয়োটি। এবং আপনার দরদি দৃষ্টির ছোঁয়ায় একটু একটু করে তা হয়ে উঠল এই উপন্যাসের একটি অপরিহার্য চরিত্র। সহমর্মিতায় ভরা সজীব আত্মার প্রতিনিধি।

তবে মিজান সাহেবের কাছে এই পুরাতন এবং বিশাল কুয়ো কোনো অপরিহার্য গৃহসামগ্রীর মর্যাদা পায় নি। বরং এটি তাঁর কাছে আনন্দের পরিবর্তে ভীতির উৎস হিসেবেই গণ্য হয়েছে। তাই একসময় তিনি এটির মুখ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে শেষাবধি সেটি কার্যকর থাকে নি। বরাবরই তিনি নিরাবেগ ধরনের মাথা গরম মানুষ। এই কুয়োকে ঘিরেও তাঁর কোনো আবেগ নেই। কিন্তু পরিবারের অন্য সদস্যদের অবস্থান এর সম্পূর্ণ বিপরীতে। গৃহপ্রবেশের প্রথম দিনেই দুই বছরের শিশুপুত্র বুলু বাড়ির মধ্যে এতবড় একটা কুয়ো দেখে খুশি হয়ে উঠেছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই সে কুয়োটাকে তার খেলার সঙ্গী করে তুলেছিল। তার পরবর্তী ভাইবোনেরাও ছিল তারই অনুসারী। ছোট বোন বীণা এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে কুয়োর পাশে একটা চাঁপা গাছ লাগিয়ে কুয়োতলাটাকে একইসঙ্গে চাঁপাতলাও করে তুলেছিল। মিজান সাহেবের বৃদ্ধ এবং অসহায় পিতা শহরের ঘেরাটোপে বন্দি তাঁর শেষ দিনগুলোতে এই কুয়োতলাতে বসেই মুক্ত বাতাসের সঙ্গে একটু কোলাকুলি করতে পেরেছিলেন। বীণার একমাত্র বান্ধব অলিক সারা রাত ধরে কুয়োতলায় বসে বীণার সঙ্গে গল্প করার লোভে তাদের বাড়িতে রাত কাটিয়েছে। উপন্যাসে বর্ণিত দিনরাতগুলোর মধ্যে ওই রাতটিই বিশেষভাবে ছায়া ফেলে যায় আমাদের মনে। সঙ্গী হয়ে থেকে যায়। কিন্তু থাকে না বুলু। থাকে না অলিক। দূর পৃথিবীর গন্ধভরা বাতাস বুকে নিয়ে তারা চলে যায় দৃষ্টির বাইরে। আকাশ তার হাত বাড়িয়ে ডেকে নেয় কাউকে। আবার কাউকে ডাক পাঠায় পাশ্চাত্যের কোনো আলোকবরণী শহর। নিস্তব্ধ দুপুরের উদাসী বাতাস আপন মনে ঢেউ খেলে যায় কল্যাণপুরের এই পুরনো বাড়িটার আঙিনায়। স্নিগ্ধতার স্পর্শ ছড়ায় কুয়োতলায়, চাঁপা গাছটির পাতায় পাতায়। শ্রাবণের কালো মেঘ বৃষ্টি ঝরিয়ে যায়। আলো ছড়ায় মধ্যাহ্ন আকাশ। বীণা চুপচাপ বসে থাকে কুয়োতলায়। একা একা।

না, কুয়োতলায় বীণা এখন আর একা বসে নেই। তার সঙ্গে আছি আমি। এবং আমরা—আপনার অগণিত পাঠক, দর্শকশ্রোতা এবং ভক্তমণ্ডলী। আপনার সৃজনশীল চিন্তা, উষ্ণ হৃদয় এবং জাদুকরী কলম থেকে সৃষ্ট আপনার প্রতিটি চরিত্রের জন্য আপনার মমত্ব যেমন অনিঃশেষ, আমাদের ভালোবাসাও তেমনি অপরিমেয়। এক অপূর্ব স্বপ্ন কল্পনা ও মায়া—বাস্তবতার জগৎ থেকে বের করে এনে আপনি যখন আপনার চরিত্রদের সত্তা এবং স্বাতন্ত্র্য দান করেন, সেই স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত সত্তার সপ্তপ্রদীপ জ্বালিয়েই তারা হয়ে ওঠে আমাদের আত্মার আত্মীয়, স্বপ্ন-সহচর। চারপাশের নিরেট বাস্তবতায় বিরাজমান মানুষগুলোর চেয়েও তারা হয়ে ওঠে অধিকতর বাস্তব। অধিকতর কাছের মানুষ। আর সে কারণেই 'এইসব দিনরাত্রি'তে কিশোরী টুনীর মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসে, এক অকথিত বেদনার ভারে আমরা তখন ন্যুব্জ হয়ে পড়ি। 'কোথায় কেউ নেই'-তে বাকের ভাইয়ের ফাঁসি যখন অবধারিত হয়ে আসে, সত্য মিথ্যা কিংবা মায়া-বাস্তবতার মধ্যে বিরাজমান দূরত্বের কথা ভুলে গিয়ে আমরা বাকের ভাইয়ের জন্য রাস্তায় মিছিল নামাই। শ্লোগানে শ্লোগানে উচ্চকিত করে তুলি দশদিক। 'শ্যামল ছায়া'র সেই ছোট্ট গেরিলা দলটি যখন '৭১-এর এক অন্ধকার রাতে কখনো নৌকা আবার কখনো হাঁটাপথে এগিয়ে চলে মেথিকান্দা থানার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্দেশে আমাদের ভালোবাসা আর শুভকামনার সবটুকুই শুভ্র ফুল হয়ে ঝরে পড়তে থাকে তাদের পথের ওপর। *অন্ধকারের গান*-এর বীণাও তেমনি আমাদের ভালোবাসার কেন্দ্রস্থলে নিজেকে অস্তিত্বময় করে রেখেছে। তাই এখন আর তার একা থাকার কোনো উপায়ই নেই। আমরা বসে আছি তাকে ঘিরে—চাঁপা ফুলের গন্ধে ভরা কুয়োতলার চারপাশে। কিন্তু হুমায়ূন, চোখ তুললেই আমরা দেখতে পাচ্ছি—একটি মখমল-মোড়া উঁচু আসন সেখানে খালি পড়ে আছে। এবং সে আসনটি আপনারই। এই তো সেদিনকার শ্রাবণ বেলায় তা শূন্য করে দিয়ে আপনি চলে গেছেন। তাই বীণা, বুলু কিংবা অনিকের জন্য এখন আর আমাদের চোখ ছলছল করে না। প্রিয় ঔপন্যাসিক—এখন তা করে শুধু আপনার জন্য—যে আপনি অন্ধকারে গেয়েছেন আলোর গান, মুখর করে তুলেছেন অগণিত মূক হৃদয়ের সংগীত, এবং শব্দের শ্বেত-মর্মরে বাজিয়েছেন শ্রাবণধারার সিম্ফনি—Rainbowed Sonata.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদের চরিত্রেরা

সালেহ চৌধুরী

হুমায়ূন আহমেদ এই সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। ('জনপ্রিয়' বিশেষণটি ব্যবহারে অনেকের দ্বিধা আছে। কেননা একে ভালো এবং মন্দ এই দুই অর্থেই প্রয়োগ করা যায়। তবে সদর্থে জনপ্রিয়তা ঈর্ষণীয় সাফল্যের দ্যোতক। স্মর্তব্য, শামসুর রাহমানের উক্তি। বিশেষণটিকে আমি সেভাবেই গ্রহণ করেছি।) কথা বা কাহিনীর বিস্তার ঘটে সৃষ্ট চরিত্র অবলম্বন করে। কথাসাহিত্যিককে তাই চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়। বিপুলপ্রজ হুমায়ূন আহমেদকেও তা-ই করতে হয়েছে। এইসব চরিত্রেরাই নির্ধারণ করেছে হুমায়ূন-সাহিত্যের পরিচিতি আর মান। সাহিত্যের অনুধাবন বা মূল্যায়নের জন্যে এসব চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন আবশ্যিক।

হুমায়ূন এত অজস্র চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, একটি নিবন্ধে যার আলোচনা অসম্ভব। হয়তো একটু আভাস দেওয়া যেতে পারে। এ নিবন্ধে সে চেষ্টাই করা হবে।

কথাসাহিত্যের চরিত্রেরা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট লেখকের সৃষ্টি, কল্পনার ফসল বলেই আমরা গণ্য করে থাকি। এ ক্ষেত্রে ভুলে গেলে চলবে না যে, কল্পিত চরিত্রের ভিতও চলমান জীবন। কেননা, কল্পনা সকল অবস্থায়ই অভিজ্ঞতার সীমায় আবদ্ধ থাকতে বাধ্য। সে অভিজ্ঞতা হতে পারে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ কিংবা উভয়ের মিশ্রণ। এভাবে সৃষ্ট বলেই এইসব চরিত্র কোনো না কোনোভাবে পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। তাকে আন্দোলিত কিংবা বিক্ষুব্ধ করে। আপাত দৃষ্টিতে যা উদ্ভট তাও একান্ত আপন হয়ে দাঁড়ায়। দেশে-বিদেশে হিমুদেরও ভিড় জমে। নাটকে উপস্থাপিত চরিত্রের ভালো-মন্দ বাদ-প্রতিবাদের ঝড় তোলে। হুমায়ূন-সৃষ্ট চরিত্রদের জয় এখানেই। তাঁর জনপ্রিয়তার রহস্যও এতেই নিহিত।

AMARBOI.COM

হুমায়ূন আহমেদ রচিত তিন উপাখ্যানমালায় মুখ্য চরিত্র যথাক্রমে মিসির আলি, হিমু বা হিমালয় এবং শুভ্র। এই তিনটি চরিত্র নিয়েই আলোচনার সূত্রপাত ঘটানো যাক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বা প্যারা-সাইকোলজির খণ্ডকালীন অধ্যাপক মিসির আলি। অধিত বিদ্যা আর মননের সাহায্যে রহস্যের উন্মোচনে তার অসীম আগ্রহ। এই আগ্রহকে তিনি অন্যের সাহায্য বা সংকট মোচনে প্রয়োগ করে থাকেন। প্রায়ই আধি-ব্যাধিতে কাবু থাকলেও রহস্যের আভাস পেলে তিনি কখনো পিছিয়ে থাকেন না। আর এভাবেই মুখোমুখি হন বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার। এটাই হচ্ছে পরহিতব্রতী মিসির আলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

মিসির আলি এমন একজন মানুষ, যার কাছে যুক্তি আর বিজ্ঞানের স্থান সবার উপরে। মানবিকতার তাগিদে যেটুকু না হলেই নয় তার অতিরিক্ত আবেগ তার কাছে সর্বাবস্থায়ই পরিত্যাজ্য'। মিসির আলির ভাবনাতেই তার স্বরূপ পরিস্ফুট :

> অকারণে তো কেউ নিঃশ্বাস ফেলে না। সব কিছুর পেছনেই কারণ থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> এই জগতে কার্যকারণ ছাড়া কিছু হয় না, সবই লজিক। জটিল লজিক। জটিল কিন্তু অভ্রান্ত। লজিকের বাইরে এক চুলও কারও যাওয়ার ক্ষমতা নেই।

লজিক তথা যুক্তির প্রয়োগ আর তারই আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে রহস্যভেদ করাই মিসির আলির ব্রত। এদিক থেকে মিসির আলি আমাদের সাহিত্যে এক অভিনব সত্য-সন্ধানী।

এ চরিত্রটির জন্ম প্রসঙ্গে হুমায়ূন এক বিশেষ অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেছেন। আমেরিকার পথে যেতে যেতে শুনেছিলেন একটা লোকগীতি—'ক্লোজ ইউর আইজ এন্ড ট্রাই টু সি'। 'চোখ বুজে দেখা' কোনো নতুন কথা নয়। আমাদের হাছন রাজাও বলেন, 'আঁখি মুজিয়া দেখ রূপ-রে'...। হুমায়ূন এই চোখ বুজে দেখার তাগিদ থেকেই নাকি মিসির আলির জন্ম দিয়েছিলেন। তবে লোকগীতির চোখ বুজে দেখা আর মিসির আলির দেখা এক নয়। লোকগীতির ব্যঞ্জনা আধ্যাত্মিক আর মিসির আলির দেখা বিজ্ঞান তথা যুক্তিনির্ভর। 'দেবী' উপন্যাসে মিসির আলির প্রথম আবির্ভাব।

হুমায়ূন আহমেদের সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্র হিমু। হিমু এক কথায় মিসির আলির বিপরীত চরিত্র। আবেগের বশেই তার সব চলা-বলা। হিমু কোনো যুক্তির ধার ধারে না। যুক্তির নির্দেশ উপেক্ষা করে চলাই রহস্যময় ক্ষমতার অধিকারী এই তরুণের রীতি। 'ময়ূরাক্ষী' উপন্যাসে প্রথম দেখা দেওয়া হিমুর জনপ্রিয়তা এরই মাঝে দেশের সীমা ছাড়িয়েছে। প্রতিবেশী দেশের কলকাতা নগরী আর সুদূর রাশিয়ার মস্কোতে হিমু ক্লাব গড়ে উঠেছে বলে জানা গেছে। দেশের এখানে-ওখানে হলুদ পাঞ্জাবিপরা নগ্নপদ হিমুদের দেখা পাওয়া তো সাধারণ ঘটনা। মস্কোতে ওরা নাকি হলুদ টাই পরে।

AMARBOI.COM

হিমুর বর্ণনার আগে অন্য কিছু কথা বলা জরুরি মনে করছি। বিজ্ঞানের ছাত্র এবং শিক্ষক হুমায়ূন কঠোরভাবে যুক্তির অনুসারী। যুক্তি আর বিজ্ঞানের আলোকে পরিপার্শ্ব অবলোকন আর বিশ্লেষণ তাঁর জন্যে খুবই স্বাভাবিক। মিসির আলি সৃষ্টি করে তাঁর চোখে জগৎ ও জীবনের রূপায়ণ তাই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে হিমুর আবির্ভাব কেন অনিবার্য হলো? এ প্রশ্নের জবাব কিন্তু কঠিন কিছু না। জীবন কখনো এক রৈখিক নয়। কঠোর যুক্তিবাদীর মনেও আবেগের স্রোত প্রবহমান থাকতে পারে। হুমায়ূনের মধ্যে তা প্রবলভাবেই আছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই জন্ম নিয়েছে জীবনকে বিপরীত দিক থেকে দেখার তাগিদ।

চরিত্র দুটির উৎস অভিন্ন। ফলে সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয় যে, মিসির আলি আর হিমু মাঝে মধ্যে একে অন্যের সীমায়ও পা বাড়িয়ে দেয়। তাতে অবশ্য রসভঙ্গের কারণ ঘটে না। তেমনি রসভঙ্গ হয় না সবসময় যার খালি পায়ে চলার কথা, কখনো-সখনো তার পায়ে স্যান্ডেল দেখলে কিংবা যার পাঞ্জাবিতে পকেট না থাকার কথা তার 'পকেট থেকে' দরকারে টাকা কিংবা সিগারেট বেরিয়ে আসায়; ফুফু মাজেদার খালায় রূপান্তরে। কথা বিস্তারে হুমায়ূনের অসাধারণ দক্ষতার ফলেই এমনটা সম্ভব হয়।

এবার হিমুর দিকে নজর দেওয়া যাক। হিমু লালিত হয়েছে অনেকটা উন্মার্গ পিতার কঠোর তত্ত্বাবধানে। সচ্ছল জীবন ছেড়ে আসা এই পিতা-পুত্রকে 'মহাপুরুষ' বানাতে বদ্ধপরিকর। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুত্রের মনে যাতে আসক্তি না জন্মায় সেজন্যে পাখি উপহার দিয়ে আগ্রহ সৃষ্টির পরেপরেই গলাটিপে পাখিটা মেরে ফেলে। হয়তো মাতৃস্নেহের বাঁধন মুক্ত করার লক্ষ্যেই সে হিমুর মাকেও হত্যা করেছিল। এভাবে মহাপুরুষ বানানোর প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে বেড়ে ওঠা হিমুর জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে পিতার রেখে যাওয়া নির্দেশাবলী দ্বারা। হিমু তাই বাঁধনহারা, বেপরোয়া। স্নেহপ্রীতিতে আকৃষ্ট হলেও কোথাও আটকা পড়তে একান্ত অনীহ। আলটপকা ভবিষৎ বলে দেওয়ায় দক্ষ বোহেমিয়ান হিমু অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারেরও অসীম ক্ষমতা রাখে। আর এসব মিলিয়েই হিমু হয়ে উঠেছে পাঠকচিত্তহারী।

হিমুর কাণ্ডকারখানায় (মিসির আলিরও) ইচ্ছে পূরণের প্রতিফলন ঘটে। যুক্তি ছাড়া উদ্ভট আচরণের মাধ্যমে হিমু এমনসব কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে, যা পাঠকের মনে আনন্দের পরশ বুলায়। যা কেউ পারে না, বা পারছে না তা ঘটতে দেখলে কার না ভালো লাগে!

হিমু কিন্তু এখন আর নেহাত ভালো লাগা আর না-লাগাতেই সীমাবদ্ধ নেই। চরিত্রটি বিবর্তিত হতে শুরু করেছে। হিমু হয়ে উঠছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে সমাজ-বাস্তবতার অসঙ্গতি কিংবা অস্বচ্ছতাকে স্পষ্ট করারও প্রবক্তা।

হিমু তার নিজের ধারায় এগিয়ে চলেছে। কোথায় গিয়ে থামে তাই এখন দেখার আর কৌতূহলের বিষয়।

হুমায়ূনের কিছু পার্শ্বমন্তব্য হিমুর চরিত্রের উপর আলো ফেলে। যেমন, 'সব মানুষই কিছু **রহস্য নিয়ে জন্মায়'**। বা 'যে যে লাইনে থাকে তার স্বপ্ন সে লাইনেই হয়।'

শুভ্র বড় লোকের প্রায়-প্রতিবন্ধী ছেলে। তরুণ শুভ্রের দৃষ্টিশক্তি খুবই ক্ষীণ। হয়তো তা হারিয়ে যেতেই বসেছে। এমন একটা বৈরী অবস্থায়ও সুদর্শন শুভ্র যাবতীয় স্নিগ্ধতার প্রতীক। নিজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা উপেক্ষা করে সে চারপাশের জগৎ ও জীবনকে অবলোকন করতে চায়, চায় কল্যাণকামীতার পরশ চারপাশে ছড়িয়ে দিতে।

প্রয়াত বন্ধুর অসহায় পরিবারকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সে তার বন্ধুর বড় বোনকে বিয়ে করতে উদ্যত হয়। বেকার বন্ধুর বিবাহিত জীবন সফল করে তুলতে নেয় সাহায্যের উদ্যোগ। মনের আলো দিয়ে চোখের আলোর ঘাটতি পুষিয়ে নিয়ে অনায়াসে মমতার কেন্দ্রে ঠাঁই করে নেয়।

হুমায়ূন আহমেদের চরিত্রগুলোর সৌন্দর্য আর প্রভাবের দৃষ্টান্ত হিসেবে তার নাটকের কিছু চরিত্রের প্রতি নজর দেওয়া যায়। *এইসব দিনরাত্রি* একটি পরিবারভিত্তিক উপাখ্যান। নীলু-আনিসের কন্যা টুনির ভূমিকা নাটকে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু না। কিন্তু চরিত্রগুলোর সজীব আবেদন দর্শকমনে এমনই গভীর রেখাপাত করে যে টুনি মরণ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে একটি প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয়তে দাবি করা হয়—টুনিকে মরতে দেওয়া যাবে না।

এককালের পদস্ত আমলা আবুল খায়ের ছিলেন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। অভিনয় দক্ষতা তাঁর পরিচিতিকে উজ্জ্বলতর করেছিল। কিন্তু *এইসব দিনরাত্রির* কবির মামা চরিত্র রূপায়ণের পর সর্বত্র তিনি 'কবির মামা' নামেই সম্বোধিত হতে থাকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথাও কেউ নেই নাটকের বাকের ভাই প্রায় বখে যাওয়া এক বেকার তরুণ। কাজে আর চলনে-বলনে মাস্তান। এই 'বাকের ভাই' যখন ফাঁসির আসামি, দেশজুড়ে তখন মিটিং-মিছিল শুরু হয় বাকের ভাইকে ফাঁসি দেওয়া যাবে না।

প্রতিটি ক্ষেত্রে হুমায়ূন-সৃষ্ট কাল্পনিক চরিত্রগুলো জীবন্ত মানুষের মতো ক্ষেত্রবিশেষে আমাদের আচরণ-প্রভাবিত করে। একজন চরিত্রস্রষ্টার পক্ষে এরচে' বড় কৃতিত্ব আর কী হতে পারে!

'অয়োময়' নাটকে অভিনেতা-অধ্যাপক মোজাম্মেল হোসেনের ভূমিকা ছিল খুবই সামান্য—ছোট-মীর্জার লেঠেল বা পাইক হানিফ। সংলাপও তেমন ছিল না—ছিল কথা শুরুর আগে বিশেষ এক ধরনের কাশি। হুমায়ূন এ চরিত্রটিকে এমনভাবে তৈরি করেছিলেন যে, মোজাম্মেল হোসেনের পরিচিতিই পাল্টে যায়—সর্বত্রই তিনি 'হানিফ সাহেব' হিসেবে সম্বোধিত হতে থাকেন।

সাহিত্যে চরিত্র যে কেবল মানুষই হতে হবে এমন বাঁধাধরা কিছু নাই। স্থান-কাল তো বটেই—পশুপাখিও চরিত্র বলে গণ্য হতে পারে। *বহুব্রীহি* নাটকে তেমনি এক চরিত্র খাঁচায় বন্দি একটা পাখি। পাখিটি একদিন 'তুই রাজাকার' এই একটি সংলাপ উচ্চারণ করে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এই দেশে কী ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল দু'শব্দের এই সংলাপ বা পাখিটি তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

AMARBOI.COM

হুমায়ূন আহমেদ বেশ কিছু অবিস্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তাঁর ছোটগল্পগুলোতে। সামান্য কয়েকটি উল্লেখ করছি। 'জলীল সাহেবের পিটিশান' গল্পে আমরা এমন একজন মানুষের দেখা পাই যিনি স্থিরভাবে বিশ্বাস করেন যে, একদিন না-একদিন একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবেই। ওই সময়টায় (গল্পটা যখন লেখা হয়) আমরা একাত্তরের স্মৃতি বা চেতনা থেকে এত দূরে সরে এসেছিলাম যে এই বর্বর অপরাধীদের বিচার নিয়ে কারও কোনো ভাবনাই ছিল না। গল্পের জলীল সাহেব কেবল বিচারের দাবিতে সই সংগ্রহ করে যাচ্ছিলেন।

আজ যখন দেশে এই বিচার সংঘটিত হতে যাচ্ছে, অবাক হয়ে ভাবি ছোটগল্পের একটা সামান্য চরিত্র কেমন বলিষ্ঠভাবে ইতিহাস আরোপিত কর্তব্যের অনিবার্যতা তুলে ধরেছিল।

'অয়োময়' গল্পের দরিদ্র মজুর কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত। শরীরে পচন ধরে গেছে। অবস্থা যখন-তখন। তার মনিব একজন মৌলবি ডাকিয়ে আনলেন। মরার আগে ওকে তওবা পড়িয়ে দেবেন বলে। মৃত্যুপথযাত্রীটি কিন্তু তওবা পড়তে রাজি না। তার অভিজ্ঞতা বলে, তওবা পড়লেই মানুষ মরে যায়। সে মরতে রাজি নয়। জীবনের প্রতি এই আকুতি মনিবটিকে উদ্বুদ্ধ করে, হয়তো অর্থহীন, তবু ওর চিকিৎসার নয়া উদ্যোগ নিতে।

চরিত্রটি চিরন্তন সত্যের উদ্ভাসনে দৃপ্ত।

'পিশাচ' গল্পের পিশাচ সাধক খাঁচায় বন্দি একটা কাক নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ কাকটিকে পানিতে চুবিয়ে মারা। ওটা করে সাধনা পূর্ণ করলেই সে পিশাচের শক্তির অধিকারী হবে। তখন যাকে খুশি হত্যা করলেও তার কিছুই হবে না।

কাকে হত্যা করবে তা-ও স্থির করা আছে। সে তার খালাত বোনকে ভালোবাসত। বোনটির অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেলেও সে তা মানতে পারছে না। পিশাচ হয়ে সেই ভগ্নিপতিকে মেরে ফেলে সে তার প্রেমিকাকে ফিরে পেতে পারে। সাফল্য-সম্ভাবনা নিয়ে তার সংশয় নেই। মুশকিল হয়েছে কেবল কাকটিকে চুবিয়ে মারার মতো নির্মম হতে পারছে পারছে না!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইচ্ছে করলেও সবার পক্ষে মন্দ কাজ সম্ভব নয়, তাদের অজান্তে লালিত মমত্ব কিংবা মানবিক মহত্ত্বের জন্যে। এ সত্যের মূর্তরূপ এই পিশাচ-সাধক।

'অচিনবৃক্ষ' গল্পের মাস্টার সাহেব, তার অসুস্থ স্ত্রী এবং বেড়াতে আসা লেখক—একগুচ্ছ জীবন্ত চরিত্র। কিন্তু তাদের সবাইকেই ছাপিয়ে গেছে অচেনা গাছটি। যখন লেখক উপলব্ধি করেন, একটা গাছ যে আশ্বাস বা ভরসা দিতে পারে, মানুষ হয়ে আমরা কেন তা পারব না!

হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্ট চরিত্রগুলো জীবন্ত এবং আকর্ষণীয়। এই আকর্ষণই পাঠক হিসেবে আমাদের ধরে রাখে। এমনটা সম্ভব হয় এ জন্যে যে, আলোর ফুল বা সৌন্দর্যকে হাতে ধরার যে আকুতি তাঁর মনে কাজ করে আসছে হুমায়ূন তা এইসব চরিত্রের মাধ্যমেই সম্পন্ন করতে চান। জীবনের সৌন্দর্য আবিষ্কার আর তাকে প্রস্ফুটিত করে তোলাই তো কথাসাহিত্যিকের সাধনা। হুমায়ূন-মানস এমন একটা চেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো একরৈখিক নয়। একজন খুনির মাঝেও যে কিছু সৌন্দর্য আছে তা তাঁর নজর এড়ায় না। এখানে এসেই বলতে ইচ্ছে করে, হুমায়ূন আহমেদ কেবল একজন কথাকারই নন—সার্থক জীবন-শিল্পীও।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার কল্পিত চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলতে হলে তাকে মাটির উপর দাঁড় করাতে হবে। অর্থাৎ, বর্তাতে হবে বিশ্বাসযোগ্যতা। চরিত্রানুগ আচরণ আর সংলাপ এ ক্ষেত্রে একজন লেখকের প্রধান অবলম্বন। এই অবলম্বন ব্যবহারে হুমায়ূন আহমেদের দক্ষতা এমন যে, সৃষ্ট চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলতে তার দীর্ঘ বর্ণনাও দরকার পড়ে না। যেন বইয়ের পাতায় নয়, আমাদের আশপাশে বিচরণ করে তারা আমাদেরই প্রিয় কিংবা পরিচিত জনে পরিণত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূনকে স্মরণ-করা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

হুমায়ূন আহমেদকে তো ভুলবার কোনো উপায় নেই, যেমন উপায় ছিল না তাকে না-জানার। বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষমাত্রেই হুমায়ূনকে কোনো-না-কোনোভাবে জানত, যারা শিক্ষাবঞ্চিত সেই মানুষরাও হুমায়ূনকে জেনেছে টেলিভিশনে তার নাটক দেখে, কেউ কেউ হয়তো অতিরিক্তরূপে জেনেছে তার তৈরি ফিল্ম দেখে। আমার নিজের জন্য হুমায়ূনকে একটু বিশেষভাবেই জানবার সুযোগ ঘটেছিল, কারণ সে লিখত, যেমন আমিও লিখি এবং আমরা উভয়েই একই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতাম। এই দুই কারণেই তার প্রথম জীবনের এবং আমার নিজের চলাফেরাটা ছিল একই বলয়ের মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ভেতর নির্বাচন হতো, সেই নির্বাচনে একবার হুমায়ূন আমাদের সঙ্গে একই প্যানেল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। ওর সঙ্গে আমার উল্লেখযোগ্য অন্তরঙ্গতা তৈরি হয় আমরা যখন একইসঙ্গে চীন ও উত্তর কোরিয়া ভ্রমণে যাই।

ভ্রমণটি ছিল এক মাসের। বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দলের ভেতর হুমায়ূন ছিল, আমিও ছিলাম। দলনেতা ছিলেন প্রয়াত ফয়েজ আহমদ, আমাদের সকলের ফয়েজ ভাই। অন্য চারজন সদস্য ছিলেন মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মুনতাসীর মামুন ও শাহরিয়ার কবির। আমরা সাতজন ব্যাংকক হয়ে চীনে গেছি। দলের ভেতর হুমায়ূন ছিল সর্বকনিষ্ঠ। প্রায়ই দেখা যেত থাকবার ব্যবস্থা হতো দলনেতা ফয়েজ ভাইয়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র কামরা, বাকি ছয়জনের জন্য তিনটি, অর্থাৎ দুজন করে একটি কামরায় থাকতাম। হুমায়ূন ও আমি একই কামরায় থাকতে পছন্দ করতাম, এবং সে সময়ে তার সঙ্গে বেশ কথা হতো। হুমায়ূন স্বল্পভাষী ছিল, কিন্তু অল্পকথায় তার নানা অভিজ্ঞতা ও পেছনের জীবন সম্পর্কে তথ্য সুন্দর ও সরসভাবে বলত। চীন-ভিয়েতনামে যাওয়ার সময় আমরা সবাই নিজের লেখা কিছু বই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। বিমান পথেই হুমায়ূন আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আমার দুটি বই, *শরৎচন্দ্র ও সামন্তবাদ* এবং *বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক*, দ্রুত পড়ে ফেলেছিল। পড়ে আমাকে বলেছে, 'আপনার লেখাতে কৌতুক থাকে, আমিও কৌতুকের সঙ্গে লিখি।' সেটা সত্য। হুমায়ূনের কৌতুকবোধ ছিল খুব জীবন্ত। এবং পাঠকমাত্রেই জানেন যে সে দুঃখের কথা অনেক লিখেছে। সে সব রচনায় গভীর অনুভূতি আছে, কিন্তু আড়ম্বর নেই। তার পরিমিতিবোধটা ছিল অসামান্য। তার সংলাপ বিদগ্ধ ও তীক্ষ্ণ। আর যখন সরাসরি কৌতুক নিয়ে লিখত তখন তো কথাই নেই, পাঠকের পক্ষে হাস্যসম্বরণ কঠিন হতো। আর ওই হাস্যরসে ভাঁড়ামোর বিন্দুমাত্র ছাপ দেখা যেত না। তার শালীনতাবোধ ও পরিমিতিবোধ পরস্পর থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় নি। যেটা একটা কারণ যে জন্য তার রচনা সমাজের সকল পর্যায়ের মানুষের কাছে অমনভাবে গৃহীত হয়েছে। তার বই মা পড়েন ছেলে পড়েন, বাবা এবং বোনও

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাদ যান না। হুমায়ূনের টেলিভিশন নাটক গৃহপরিচারিকা থেকে শুরু করে পরিবারের সকল সদস্য একসঙ্গে উপভোগ করতে পারেন। কোনো অস্বস্তির সৃষ্টি হয় না।

হুমায়ূনের স্মৃতিশক্তিও ছিল খুব শক্তিশালী। ঘটনার তাৎপর্য তো বটেই, ঘটনাও সে পরিষ্কারভাবে মনে রাখত। যে-কোনো কথাশিল্পীর জন্যই এটা একটা বড় গুণ, হুমায়ূন বলত, এবং আমরাও নিশ্চয়ই স্বীকার করব। প্রথম যখন আমেরিকায় যায় তখনকার স্মৃতি খুবই উজ্জ্বল ছিল তার কাছে। এমনিতেই সে লাজুক স্বভাবের, তার ওপরে গিয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে, বয়স অল্প, অভিজ্ঞতা একেবারেই নেই। একটি ঘটনা তার খুবই মনে ছিল। আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছবার পর প্রথম কয়েকদিন সকালে সে খেতে যেত একটি রেস্টুরেন্টে। খাবার অপরিচিত, দাম অজ্ঞাত। তাই রোজই সে এগ-অন-টোস্ট খেত। টোস্ট করা রুটির ওপর ডিম। কদিন দেখে রেস্টুরেন্টের মালিক পাত্রে করে অন্য একটি খাবার এনে তার টেবিলে রেখে বলছে, 'এটি রেস্টুরেন্টের পক্ষ থেকে আপনাকে উপহার। এর জন্য কোনো দাম দিতে হবে না।' হুমায়ূনের ধারণা লোকটির মায়া হয়েছিল। ছেলেটি, যাকে শিক্ষিত বলেই মনে হয়, সে রোজই এক ও সামান্য একটি খাবার খাচ্ছে দেখে ধারণা হয়েছিল যে ছেলেটি অর্থকষ্টে আছে। অথবা, হুমায়ূন যোগ করেছিল, একই খাবার রোজ রোজ দিতে দিতে বিরক্ত হয়ে গেছে। শুনে আমি হেসেছি। হুমায়ূন তেমনভাবে হাসে নি, কেবল প্রসন্ন একটি কৌতুকের রেখা তার মুখে খেলা করেছিল। যে-রেখা ততদিনে আমার বেশ পরিচিত হয়ে গেছে। তবে নির্মল পরিহাসের পাত্র-তালিকা থেকে নিজেকে যে সে সরিয়ে রেখেছিল তা নয়।

তার একটি নাটকের কথাও বলেছিল হুমায়ূন। মঞ্চের জন্য লেখা। এতে ব্যঙ্গ ছিল। গল্পটা শোনায় নি, তবে একটি দৃশ্যের কথা জানিয়েছিল। রাজা দেখেন তিনি খুবই জনপ্রিয়। প্রতিদিন অগুনতি ভক্ত এসে ভিড় করে। কেউ কেউ রাজার পা ধরে চুমো খেতে চায়। রাজা দেখেন মহা বিপদ। তখন বুদ্ধি করে একটা কাঠের পা বানিয়ে নিলেন। অতিভক্ত প্রজা এলে ওই কাঠের পা'টি এগিয়ে দিতেন। প্রজারা কাঠের পায়ের সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়ে প্রীত হয়ে চলে যেতেন, রাজার আসল পা নিরাপদে থাকত। হুমায়ূনের উদ্ভাবনাশক্তি ছিল অসাধারণ। এ ধরনের দৃশ্য সে তার লেখায় অনায়াসে তৈরি করত এবং এ ক্ষমতা তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে নিঃসন্দেহে সহায়ক হতো। ওই যে দৃশ্যের বর্ণনা দিল সে সময় সে নিজে কিন্তু হাসে নি যদিও আমি নিজে শব্দ করেই হেসে ফেলেছি।

উত্তর কোরিয়ায় পৌঁছার আগেই সেখানকার কর্তৃপক্ষ ঠিক করেছিল যে ওই দেশে আমাদেরকে নিদেনপক্ষে একমাস থাকতে হবে, যাতে আমরা তাদের অর্জনগুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করতে পারি এবং দেশে ফিরে সেসব বিষয়ে ভালোভাবে লিখতে পারি। শুনে আমরা সবাই কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলাম। বিচলিত হয়েছিল হুমায়ূন, এবং আমিও। মুখ ফুটে বলি নি, কিন্তু উভয়েরই বক্তব্য ছিল এরকম যে আমাদের তো অনেক কাজ আছে, চীনে পনের দিন কাটিয়েছি, ভালো লেগেছে, তারপরে উত্তর কোরিয়াতে পুরো একমাস, সে তো অনেকটা সময়। আমরা পারব না। শেষ পর্যন্ত আমাদের আপত্তিতেই সময়টা কাটছাট করে পনের দিনে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল।

হুমায়ূন যে অনেক বই পড়ত সেটা বাইরে থেকে বোঝা যেত না। নানা বিষয়ে তার আগ্রহের কথা জেনেছি। প্রধান আগ্রহটা অবশ্য ছিল সাহিত্য বিষয়েই। চীন যাত্রায় আমরা রওনা হয়েছিলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের বাসা থেকেই। আমরা তখন থাকতাম শহীদ মিনারের উল্টোদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাড়ির একতলায়। হুমায়ূন থাকত আজিমপুরে। মনে পড়ে সকালে সে আমাদের বাসায় চলে এসেছিল এবং আমরা বিমানবন্দরে গেছি একইসঙ্গে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাড়ায় নেওয়া একটি গাড়িতে। যাওয়ার সময় সে আমাকে বলেছিল, 'চীন সম্পর্কে আপনার তো অন্যরকম আগ্রহ, আপনি সেখানকার সামাজিক পরিবর্তন দেখবেন, আমার আগ্রহ সাহিত্যে। সেদিক থেকে আমি খুশি হতাম রাশিয়াতে যেতে পারলে।' দেখলাম চীনের সংস্কৃতি-সাহিত্য বিষয়ে বেশ কিছু বই সে পড়ে গিয়েছে। এবং প্রস্তুত হয়েই যাচ্ছে সে চীন ভ্রমণে। কথাটা সে চীনে থাকতে থাকতেই একদিন জানাল, অন্যভাবে এবং ভিন্ন প্রসঙ্গে। আমরা সবাই মিলে একটি পার্কে গিয়েছিলাম, সেখানে ঢোকার পথেই হুমায়ূন নিম্ন ও সজীব কণ্ঠে বলল, 'চীন সম্পর্কে অনেকেই অনেক কথা লিখেছেন, কিন্তু এখানে যে একটা বোটকা গন্ধ পাওয়া যায় সেটা কেউ জানান নি।' আমরা সবাই হাসলাম, এবং নিঃসন্দেহ হলাম যে, হুমায়ূনের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাটা ভিন্ন রকমের। তার আবিষ্কৃত বোটকা গন্ধটা যেন আমরাও টের পেলাম প্রত্যেকেই; অথচ হুমায়ূন সেটার কথা না বলার আগে সবাই ওই ব্যাপারে অনবগত ছিলাম।

তার স্পর্শকাতরতাও ছিল অত্যধিক। আমরা যখন চীনে গেছি ওখানকার যৌথ ও সমবায়ী জীবনযাপনভিত্তিক কমিউনগুলো তখন দুর্বল হয়েছে বটে, কিন্তু ভেঙে পড়ে নি। তারই একটিতে আমাদের আমন্ত্রণ ছিল মধ্যাহ্ন ভোজনের। চীনের খাবারদাবারের বহুধা বিস্তৃতি সম্পর্কে ততদিনে আমাদের কিছুটা অভিজ্ঞতা হলেও পুরোপুরি জ্ঞানপ্রাপ্তি তখনো অসম্পূর্ণ ছিল। সম্পূর্ণতা প্রাপ্তির সুযোগ ঘটল ওই ভোজানুষ্ঠানে। টেবিলভর্তি নানা ধরনের খাবার। সবগুলোই কমিউনের খেতখামারে তৈরি। একেবারে খাঁটি ও তরতাজা। খাবারদাবার আসছেই। নতুন নতুন সংযোজন ঘটছে। আমরা আছি, কমিউনের গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ ও মহিলারা রয়েছেন। একপর্যায়ে আমাদের ভীষণ বিস্ময় উদ্রেক করে টেবিলের ওপর রাখা হলো আস্ত একটি কাছিম। স্থানীয় পুকুরেই উৎপাদিত। ঠিক জ্যান্ত নয়, মনে হলো অর্ধসিদ্ধ। ওই বিশেষ খাদ্যটির আস্বাদ গ্রহণ না করলে বড় রকমের অভদ্রতা করা হবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা বেশ বিচলিত। ফয়েজ ভাইয়ের কথা আলাদা, চীনদেশ ও তাদের খাদ্যাভ্যাস তাঁর পরিচিত। পাকিস্তান আমলে তিনি পিকিং বেতার কেন্দ্রে এক বছর কাজ করে গেছেন, ওই কেন্দ্রের বাংলা সার্ভিসের সূচনাতে তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর আমাদের নতুন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে চীন যখন গড়িমসি করছিল তখন বাংলাদেশের অনানুষ্ঠানিক বিশেষ দূত হিসেবে একেবারেই গোপনে হলেও তিনি চীন ঘুরে গেছেন, তা ছাড়া নানাদেশ ভ্রমণ ও অন্তর্গত দৃঢ়তার দরুন সহজে বিচলিত হওয়ার পাত্র তিনি নন। তিনি অবিচলিতই রইলেন। কিন্তু আমাদের দশা ভিন্নতর। হঠাৎ দেখা গেল হুমায়ূন উঠে পড়েছে, কচ্ছপটি দেখে তার বিবমিষা জেগেছে, সে স্থির থাকতে পারছে না। ব্যবস্থাপকরা বুঝলেন কী ঘটেছে, তাঁরা তাকে দ্রুত হাতমুখ ধোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। প্রমাণ সাইজের কচ্ছপটিকে সরিয়ে ফেলা হলো, এবং ফিরে এসে হুমায়ূন শান্ত হয়ে বসল। তার প্রতিক্রিয়াটি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, এবং এতই প্রবল যে তাকে দমন করাটা ছিল তার সাধ্যের বাইরে।

চীনে এবং ফেরার পথে ব্যাংককে দেখবার জিনিস তো ছিলই, কিনবার মতো ছোটখাটো পণ্যও ছিল প্রচুর। আমরা সকলেই কিছু কিছু সংগ্রহ করেছি, তবে হুমায়ূনের আগ্রহটাই দেখা গেল সবচেয়ে কম। বেজিংয়ে ফ্রেন্ডশীপ শপে নানা ধরনের জিনিসপত্র পাওয়া যায়, হুমায়ূনকে দেখলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিশুদের কাপড়জামার এলাকায় ঘুরছে। কী কিনেছে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে ঢাকায় ফিরে। কয়েকদিন পরে এক বিকেলে হুমায়ূন এসেছে আমাদের বাসায়। আগে কিছু জানায় নি, একবারেই অপ্রত্যাশিত। এসে বলল তিন কন্যাকে চীনের জামাকাপড় পরিয়ে নিয়ে এসেছে, আমার স্ত্রী ও আমাকে দেখাবার জন্য। এই হলো হুমায়ূন।

এর পরে হুমায়ূনের একটি পুত্রসন্তান জন্ম নেয়, এবং অল্প ক'দিন পরেই শিশুটি মারা যায়। আমার স্ত্রী তাকে ফোন করেছিল তাদের দুঃখে সহানুভূতির জানাবার জন্য। হুমায়ূনকে পায় নি, নিজের নাম বলে রেখেছিল। কিছুক্ষণ পরে হুমায়ূন ফোন করেছে। শুনি বলছে, 'নাজমা জেসমিন চৌধুরী কি আছেন, তিনি আমাকে ফোন করেছিলেন?' ফোনটা আমিই ধরেছিলাম, হুমায়ূন তার ব্যস্ততায় ও বিষণ্ণতায় সেটা খেয়াল করে নি, আমি বললাম, 'হুমায়ূন, হ্যাঁ ফোন করেছিল, তোমাদের দুঃখের খবর শুনে, নাজমার এবং আমার সহানুভূতি জেনো।' হুমায়ূন বলল, 'হ্যাঁ, ছেলেটা বাঁচল না। জন্ম মৃত্যু এই তো দেখছি নিয়ম।' আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয় ১৯৮৯-এর ১২ সেপ্টেম্বর। সেদিন দুপুরে অনেকেই এসেছিলেন আমাদের বাসায়, প্রথম যারা এসেছিলেন তাদের মধ্যে হুমায়ূন ছিল। দৃশ্যটা মনে আছে। চুপচাপ বসে ছিল।

কোরিয়াতে থাকার সময় হুমায়ূন তার নিজের পিতার মৃত্যুর ঘটনাটা বলেছিল। একাত্তরে তিনি শহীদ হয়েছেন। বিস্তারিত বলে নি। বিস্তারিত সে বলত না কথাপ্রসঙ্গে নয়, কথাসাহিত্যেও নয়। অল্পকথায় সজীব চিত্র আঁকার দক্ষতাটা ছিল তার স্বভাবজাত। পিতার রাজনৈতিক বিশ্বাসের কথা বলেছে সে আমাকে, সে বলাতে গর্বের সুরটা থেকেছিল না তা নয়। কিন্তু মোটেই ভাবাবেগ প্রকাশ করে নি। কঠিন দুঃখ ও ভয়ংকর দুঃসময়ে পড়েছিল সে। পিতার সে জ্যেষ্ঠ সন্তান, নিজের ছাত্রজীবন শেষ হয় নি। দুঃখটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে নি, যে জন্য তা মর্মস্পর্শী ঠেকেছিল আমার কাছে, বিশেষভাবে।

AMARBOI.COM

সেই দুঃসময়ে যাঁরা তার পাশে দাঁড়িয়েছেন সে প্রসঙ্গও এসেছে। একজনের কথা মনে পড়ে, হুমায়ূনের চেয়ে এক দু'বছরে উপরের ক্লাসে পড়ত, নাম আনিস সাবেত, একই আবাসিক হলে থাকত, খুব ভালো ছাত্র, হুমায়ূনকে স্নেহ করত। অমন ভালোমানুষ হুমায়ূন কম দেখেছে বলে জানিয়েছে। হুমায়ূনের প্রয়োজনের কথাটা তার জানা ছিল। এক সন্ধ্যায় অনেকগুলো নতুন শার্ট এনে হুমায়ূনের বিছানায় হইচই করে ছড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, 'দেখো তো কী মুশকিল, এতগুলো জামা পাঠিয়েছে আমেরিকা থেকে, কিন্তু কোনোটাই আমার গায়ে ঠিক লাগছে না। দেখো তো তোমার গায়ে লাগে কি না।' বলে সবগুলো শার্ট রেখে আনিস সাবেত চলে গেছে। হুমায়ূন বলেছে, 'আমার তো জানতে কোনো অসুবিধা হয় নি যে জামাগুলো আমেরিকা থেকে আসে নি, ঢাকা থেকেই কেনা হয়েছে, আমার প্রয়োজনের কথা মনে রেখে।' কিন্তু ওই যে ছলনা ওইখানেই ছিল আনিস সাবেতের মহত্ত্ব। দুঃখ করে বলেছে হুমায়ূন, আনিস আমেরিকা গিয়েছিলেন, ফেরত আসতে পারেন নি, ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। তখন কে জানত যে ওই একই রোগে হুমায়ূনকেও একদিন চলে যেতে হবে। এসব কথা যখন হচ্ছিল তখন আমারও কি জানার কোনো কারণ ছিল যে, এই আলোচনার কয়েক বছরের মধ্যেই আমার স্ত্রী নাজমাকেও চলে যেতে হবে ওই একই মরণব্যাধির আক্রমণে।

হুমায়ূনের সঙ্গে শেষ দেখা তার মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে। চিকিৎসার ফাঁকে তখন সে ঢাকায়। ব্যবস্থা করে দিয়েছিল মাজহারুল ইসলাম। ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক জাহেদা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহমদ, অধ্যাপক আহমেদ কামাল ও আমি, এই তিনজন একদিন দুপুরে অল্পক্ষণের জন্য তার ওখানে গিয়েছিলাম, ধানমণ্ডিতে। অনেক বছর পরে দেখা। অথচ একসময়ে দেখা সাক্ষাৎ ঘনঘন ঘটত, যখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল। দেখি কথাবার্তায় আগের মতোই আছে। ক্যান্সারের কথা বলল, সে রোগে কী কঠিন বেদনা, কেমোথেরাপিতে কী কষ্ট অল্পকথায় উল্লেখ করল সে। যখন বলছিল তখন মুখের দিকে আমি তাকাতে পারি নি, পাছে রোগের ব্যথায় কাতর হুমায়ূনের মুখে নাজমার মুখটি দেখতে হয়, সেও আমেরিকায় গিয়েছিল চিকিৎসার জন্য। ফিরে এসেছিল, কেমোথেরাপি নিয়েছিল, কিন্তু নিরাময় হতে পারে নি। হুমায়ূন নিরাময় হবে এটা আমরা আশা করেছিলাম, কেননা পঁচিশ বছরের ব্যবধানে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে, এবং তার ক্ষেত্রে কেমোথেরাপিতে ভালো ফল পাওয়া গেছে, যা সে নিজেই বলেছিল আমাদেরকে। অপারেশন করা হবে, তাতে ক্ষতস্থানগুলো ফেলে দেওয়া হবে, এরপর আর বিপদ ঘটবে না। নাজমার ক্ষেত্রে অপারেশন সম্ভব হয় নি, ক্যান্সার তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

ওই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারেই পঞ্চাশ পার হলে স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া যে আবশ্যক সে কথা বলল, আমেরিকার ওই হাসপাতালে না গেলে ক্যান্সার যে কেমন ব্যাপক ব্যাধি তা বুঝত না সেটা জানাল। বলল আমেরিকান রোগীরা একা একাই আসে, চিকিৎসা নিয়ে চলে যায়, আমরা যাই ঘটা করে, অনেককে নিয়ে, তবে এশীয় ধারাই তার কাছে ভালো লাগে বলে জানাল সে। ওই রোগের ভয়াবহ ধরনের অভিজ্ঞতা যে তাকে একটা দাতব্য ক্যান্সার হাসপাতাল তৈরির ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে তার কথাও উল্লেখ করল। সবমিলিয়ে খবর যেটা তা আশার।

বের হয়ে আসার সময় বারান্দায় দেখি সাদা-কালোতে একটা ছবি। মাজহারের স্ত্রী, যে আবার জাহেদা আহমদের ভগ্নিকন্যা, বলল ছবিটা হুমায়ূন ভাইয়ের আঁকা। হুমায়ূন বলল, দৃশ্যটা নেপালের। ছবি দেখে আরেকটি ছবির কথা মনে পড়ল আমার। ছোট্ট ছবি, একটি চায়ের কাপের। সেটিও হুমায়ূনেরই আঁকা। আমরা তখন চীনে; এক বিকেলে চা পানের ইচ্ছা হয়েছে; চা তো চীনারা পানির মতোই পান করে, কিন্তু পরিচারিকাকে কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছিল না যে আমরা চায়ের প্রার্থী। হুমায়ূন তখন চট করে একটা কাগজ নিয়ে পকেট থেকে কলম বের করে চায়ের একটি কাপ এঁকে দিল, অতি দ্রুতবেগে। তারপর কয়েকটি টানে দেখিয়ে দিল কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। আমরা কাপ চাই না, চা চাই, এটা বুঝে পরিচারিকাটি দ্রুত বেরিয়ে গেলেন গরম চা সংগ্রহ করতে। ছবি আঁকায় হুমায়ূনের দক্ষতার একটা ইশারা সেদিন পাওয়া গিয়েছিল। পরে দেখি সে অসুস্থ অবস্থায় অনেকগুলো ছবি এঁকেছে। ওই প্রতিভাটিও তার ভেতর ছিল।

ছিল যে তার প্রমাণ তো আমরা তার গল্প, উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্র সবখানেই দেখতে পাই। অল্পকথায়, ছোট ছোট সংলাপে, ইশারায় সে ছবি এঁকেছে। তার গল্পতে আমরা একের পর এক ছবি দেখতে পাই; সেটি একটি কারণ যে জন্য তার সৃষ্টিকর্ম অতটা জনপ্রিয় হয়েছে।

বৃষ্টি হুমায়ূনের খুব প্রিয় ছিল। যেদিন তার সঙ্গে ওই আমাদের শেষ দেখা সেদিনও হঠাৎ করেই এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। সেই বৃষ্টির কথা স্মরণ করতে গিয়ে এখন আরেক বৃষ্টির কথা মনে পড়ছে। হুমায়ূন তখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ নিয়েছে শহীদুল্লাহ হলের হাউস টিউটরের। হুমায়ূন তখন ছোট্ট একটি মোটর গাড়ি কিনেছে, রাখে সেটা প্রভোস্টের বাসার সামনে। জায়গাটা নিচু। সেদিন সকালে ভারি বর্ষণ নেমেছিল, থেমেছে বিকেল পার হয়ে। হলের প্রভোস্ট সারা দিন বাসায় আটকা ছিলেন, বিকেল শেষে বৃষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থামায় এসেছেন বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে। আমার দেখা পেয়ে বললেন, 'আপনারা লেখকরা দেখি অন্যরকমের মানুষ।' তার পরে ব্যাখ্যাটা নিজেই দিলেন। ব্যাপারটা হুমায়ূনের ওই নতুন কেনা গাড়িটি নিয়েই। প্রভোস্ট দেখছেন বৃষ্টির পানি জমে গাড়িটাকে গ্রাস করে ফেলবে এমন ভাব। তিনি লোক পাঠিয়েছেন হুমায়ূনের কাছে দুঃসংবাদটি জানাবার জন্য। সেই বার্তাবাহক ফিরে এসে জানালেন যে গাড়ির মালিক বাসার জানালার পাশে বসে গাড়িটির দুর্দশা উপভোগ করছেন। আস্তে আস্তে পানি উপরের দিকে উঠছে আর গাড়িটা ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে, এটা নাকি একটা বিরল দৃশ্য। 'তা হলে বুঝুন!' প্রভোস্ট ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন।

যা বুঝবার তা-ই বুঝলাম। নতুন করে জানা গেল যে, হুমায়ূন নিয়মমাফিক নয়, সে ব্যতিক্রম। আর ওই যে সে গাড়ি কিনেছিল সেটাও, আমার ধারণা, তার নিজের ব্যবহারের জন্য যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি গুলতেকিনের প্রয়োজনে। গুলতেকিন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী হয়ে এসেছে। আইএ পাস করার পর আর তার পড়াশোনা হয় নি, দীর্ঘদিন ঘর-সংসার করে এখন ভর্তি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। গুলতেকিনের আসা-যাওয়া এবং তিন মেয়েকে স্কুলে পৌঁছানো ও ফেরত নেওয়া এসব কাজে গাড়িটি ভালো ভূমিকা পালন করেছে বলে আমার বিশ্বাস। গুলতেকিনের কথা মনে পড়ছে বিশেষ করে এই কারণেও যে, হুমায়ূন তাকে আমাদের বিভাগে ভর্তি করতে খুবই উৎসাহী ছিল, এবং ভর্তি হয়েছে জেনে খুব আশ্বস্ত বোধ করেছিল। এর সাক্ষী আমি নিজে। ভর্তি হওয়ার পর গুলতেকিন একবছর সরাসরি আমার টিউটরিয়াল গ্রুপের ছাত্রী ছিল। অতসব সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালন করে যেভাবে সে তার পড়াশোনার কাজটি চালিয়ে যাচ্ছিল সে জন্য তাকে স্নেহ তো করতামই, মনে মনে বাহবাও দিতাম। অনেক বছর পরে গুলতেকিনকে সংবাদপত্রে দেখতে পেলাম ছবিতে, বিভিন্ন শোকানুষ্ঠানে, স্বভাবতই ভিন্ন এক অবস্থায়।

হুমায়ূনের সাহস ও আত্মপ্রত্যয় ছিল অনমনীয়। আমাকে একবার বলেছিল সে, স্বাধীনতার পর ওরা ছয়জন সহপাঠী একসঙ্গে আমেরিকা গিয়েছিল উচ্চশিক্ষার জন্য। তাঁদের ভেতর পাঁচজনই সেখানে রয়ে গেছে, কেবল সে-ই চলে এসেছে দেশে। ওর ভাষায় পাঁচজন রয়ে গেল উচ্চ আয়ের প্রলোভনে, সে চলে এসেছে দেশেই সে ওদের চেয়ে অধিক আয় করবে এই চ্যালেঞ্জটি রেখে দিয়ে। তা সে করেছে বৈকি। আয়-উপার্জনের দিক থেকে ওদের সবাইকেই ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু রহস্য করতে ভালোবাসত বলেই হয়তো সে আসল কারণটা বলে নি বলে আমি অনুমান করি। আসল কারণটি ছিল লেখক হওয়ার অঙ্গীকার। তার প্রথম উপন্যাস যে ছাত্রজীবনেই লিখেছে, যদিও সেটা প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে। তারপরে অনেক বছর সে ব্যস্ত ছিল আমেরিকায়, অধ্যয়নে। সেটা তার জন্য দরকার ছিল। কিন্তু সেখানে তার প্রাণ ছিল না। প্রাণ ছিল সাহিত্যে। তার টানেই দেশে ফেরা। এবং কিছুদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো চাকরিটি ছেড়ে পূর্ণসময় লেখক হয়ে যাওয়া।

চীন থেকে ফেরার পরে হুমায়ূনের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এতটা কাছাকাছি চলে এসেছিল যে আমরা উভয়েই, একে অপরকে না জানিয়ে, পরস্পরকে নিজের লেখা বই উৎসর্গ করেছিলাম, প্রায় একই সময়। কিন্তু সে যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেল তারপরে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে খুবই কম। শেষ দেখার আগে একবার দেখা হয়েছিল ওর একটি চলচ্চিত্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, কেবল সেটির কথাই মনে পড়ে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একসঙ্গে নিবাচনে অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করেছি। সেটা ছিল সিনেটের জন্য ২৫ জন শিক্ষক-প্রতিনিধির নির্বাচন। তাতে হুমায়ূন দাঁড়িয়েছিল আমাদের সঙ্গে; আমাদের ২৫ জন প্রার্থীর ভেতর ২১ জন জিতেছেন, ৪ জন পারেন নি। না-পারাদের ভেতর হুমায়ূন ছিল একজন।

অপ্রত্যাশিত এই ফলটা মেনে নেওয়া তার পক্ষে কঠিন হয়েছিল, কেননা ব্যর্থতা দেখতে সে অভ্যস্ত ছিল না। হুমায়ূন যে নির্বাচিত হলো না তার দুটি কারণের কথা ভাবতে পারি। একটি হচ্ছে তার বয়স, অপরটি তার জনপ্রিয়তা। প্রার্থীদের ভেতর সে-ই মনে হয় ছিল কনিষ্ঠতম। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে দেখা গেছে প্রবীণরাই ভালো করেন নবীনদের তুলনায়। দ্বিতীয় কারণ তার জনপ্রিয়তা। ততদিনে হুমায়ূন জনপ্রিয় লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, তার নাটক তখন টেলিভিশনে দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিচ্ছে। ভোটারদের কাছে দলেবলে আমাদের যেতে হতো, হুমায়ূনও যেত, শিক্ষকরা হুমায়ূনকে কাছে পেয়ে খুশি হতেন। কিন্তু হুমায়ূন ছিল লাজুক, কথা বলত কম, তাই তার পক্ষ থেকে শিক্ষকরা তেমন উষ্ণ সাড়া পেতেন না যেমনটা তাঁরা আশা করতেন। ফলে ধারণা তৈরি হতো যে, হুমায়ূন অহমিকায় ভরপুর। ভোটাররা হয়তো সে কারণে বিরূপ হয়েছিলেন।

নির্বাচনের ফল বের হওয়ার পর আমরা মিলিত হয়েছিলাম। সেই সভাতে হুমায়ূনকে কিন্তু নিষ্প্রভ মনে হয় নি। বরঞ্চ ভোটারের খোঁজে ক্যাম্পাসের বাইরে ঘোরাঘুরির অভিজ্ঞতা সে সকৌতুকে বর্ণনা করেছিল। অপরিচিত রাস্তাঘাট, রাতে অন্ধকার, দরজায় টোকা দেওয়া এসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তার বিবৃতিতে প্রচুর হাস্যরসের সৃষ্টি করেছিল। ওইসব অভিযানে মুনতাসীর মামুন আর সে একসঙ্গে যেত, মামুনকে সাক্ষী মেনে সে গল্পের মতো করে অভিজ্ঞতার কথা বলেছিল, আমার মনে পড়ে। এর ভেতর শিক্ষকরা কেমন অবস্থায় থাকেন তাও সে বিলক্ষণ পর্যবেক্ষণ করেছে, এবং ফলাফল উল্লেখ করেছে। ওর একটি ধারণা হয়েছিল এই রকমের যে, তুলনামূলকভাবে মহিলা শিক্ষকরা ভালো অবস্থায় আছেন পুরুষ শিক্ষকদের তুলনায়।

আমি পড়ি নি, অন্যদের কাছে শুনলাম যে চিকিৎসারত অবস্থায় হুমায়ূন নিউইয়র্ক থেকে সংবাদপত্রে পাঠানো তার লেখাগুলোর একটিতে এই নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে বলেছে যে এতে অংশগ্রহণটা ছিল তার জন্য মস্ত বড় রকমের একটি ভুল। আর এর জন্য সে দায়ী করেছে প্রয়াত অধ্যাপক আহমদ শরীফ এবং আমাকে; আমরাই নাকি তাকে এই ভ্রান্ত পদক্ষেপ নিতে পরামর্শ দিয়েছিলাম। মনে হয় দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন থাকার এবং রোগ ভোগের শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার দরুন হুমায়ূন ঘটনার প্রেক্ষিতটা যথার্থরূপে লিখতে পারে নি। আমরা ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে এবং স্বভাবতই তরুণ শিক্ষক হুমায়ূনও তাতে যোগ দিয়েছিল। ওটি ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল না। ছিল স্রোতের টান। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রামটা দীর্ঘদিনের; স্বায়ত্তশাসন আমরা পেতামও না, বাংলাদেশ যদি স্বাধীন না হতো। কিন্তু ওই অধিকার রক্ষা করাটা সহজ ছিল না। আমরা নির্বাচনে দাঁড়াতাম আমাদের যে প্রতিপক্ষ—রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিতদেরকে সমর্থন জানানোর দিকে ঝুঁকে পড়েছিল তাদের বিরুদ্ধে। ব্যাপারটা পদলাভের ছিল না, ছিল মতাদর্শগত অবস্থানটাকে দৃঢ় করবার। এ কাজে হুমায়ূন যোগ দেবে এটাই ছিল স্বাভাবিক এবং সেটাই সে করেছিল।

হুমায়ূন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল তখন প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা হতো। চলে যাওয়ার পর বিচ্ছেদ ঘটেছে, দেখা হয়েছে খুব কম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

কিন্তু হুমায়ূন আছে। এবং থাকবে। সে আমাদের স্মৃতিতে আছে, খুবই উজ্জ্বলভাবে আছে তার নিজের সৃষ্টির ভেতর।

হুমায়ূন জাদু পছন্দ করত এবং জাদু জানত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র হিসেবে বিভাগীয় অনুষ্ঠানে তার প্রথম উপস্থিতি গল্পকার হিসেবে ঘটে নি। ঘটেছে জাদু-প্রদর্শক হিসেবে, যে কথা সে নিজেই স্মরণ করেছে। তার লেখায়, নাটকে, চলচ্চিত্র একটা জাদুকরী শক্তির কার্যকারিতা আছে। হুমায়ূন গল্প তৈরি করতে এবং গল্প বলতে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। তার গল্পে অপ্রত্যাশিত থাকে, কিন্তু তা বাস্তবতাবর্জিত নয়, এবং তার জাদুকরী ক্ষমতা ছিল গল্পকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবার। অল্পকথায় সে অনেক কথা বলে দিত। বর্ণনার চাইতে সংলাপে সে দক্ষ। এবং সেই সংলাপে তীক্ষ্ণ কৌতুক ও বাগবৈদগ্ধ থাকে। আর থাকে ছবি। আড়ম্বরহীনভাবে সে ছবি আঁকতে জানে। ছবির পর ছবি আসে, পাঠক ও দর্শক অভিভূত হোন।

হুমায়ূন বিজ্ঞানের ছাত্র। তার লেখায় বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণশক্তি দেখি। কিন্তু সঙ্গে থাকে কল্পনার অসাধারণ শক্তি। সে কল্পনা করে এবং তার কল্পনার কথা অন্যদেরকে জানানোতে আনন্দ পায়। তার প্রথম দিককার একটি উপন্যাস *ফেরা*, সেটি নিয়ে ছোট একটি আলোচনা লিখেছিলাম আমি সেই ১৯৮৪ সালে, *সাহিত্যপত্র* পত্রিকাটিতে। পত্রিকাটির সম্পাদনা দায়িত্ব ছিল আমার ওপর; পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যাতে সমালোচনাটি ছিল। উপন্যাসটির পটভূমি গ্রামের। বিস্তৃত বর্ণনা দেয় নি, কিন্তু অল্পকথায় হুমায়ূন তাতে গ্রামের জীবনকে প্রবহমান টানাপোড়েন সুন্দরভাবে তুলে ধরেছিল। সে বিষয়ে আমার মন্তব্য ছিল। হুমায়ূন পড়ে খুশি হয়েছে। কিন্তু চমকে দিয়েছে আরেকটা কথা বলে। বলেছে সে মামলা করবে। আমি বলেছি হুমায়ূন গ্রামকে চেনে, অন্যএকজন নাকি বলেছেন গ্রাম বিষয়ে সে অজ্ঞ। এখন কোনটা সত্য, এটা মীমাংসা করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া তো উপায় নেই। কথাটা সে হুমায়ূন আজাদকে বলেছিল, দুজনের তখন খুবই বন্ধুত্ব; এবং হুমায়ূন আজাদ সেটা আমাকে জানিয়েছে হুমায়ূন আহমেদ এবং আরও কয়েকজনের সামনে। আমরা সবাই হেসেছি। হুমায়ূন আহমেদও হেসেছে হালকা করে। কিন্তু ওই বৈশিষ্ট্যটা তো ছিল তার স্বভাবজাত, চমকে দিতে পারত, এবং এসব চিন্তা নিয়ে আসত অন্যরা যা ভাবতেও পারত না।

জাদুকরী ক্ষমতায় সে বাংলাদেশের মানুষকে চমকে দিয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর সর্বক্ষেত্রেই একটা চাহিদা ও শূন্যতা দেখা দিয়েছিল। পাঠক চাইছিল নতুন ধরনের লেখা, নাটক ও চলচ্চিত্রে হুমায়ূন চাহিদা চমৎকারভাবে মিটিয়েছে, শূন্যতার অনেকটা ভরাট করে দিয়েছে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম যা চাইছিল হুমায়ূন তার সরবরাহে ছিল অতুলনীয়। সে পাঠক টেনে এনেছে, পাঠক তৈরি করেছে। কিন্তু তার পাঠক তারই পাঠক, হুমায়ূন যে কথাটা বলেছে। এ পাঠক তার নিজের হাতেই তৈরি। সব বড় লেখকই এই কাজটা করেন। নিজের পাঠক নিজেই তৈরি করে নেন। এবং সেখানেই একজন লেখকের সবচেয়ে বড় ও প্রাথমিক পরীক্ষাটা ঘটে। হুমায়ূন এক্ষেত্রে অসামান্যরূপে সফল। অন্য লেখকদের জন্য হুমায়ূন একটি চ্যালেঞ্জ রেখে গেছে, নিজস্ব পাঠক তৈরি করে নেওয়ার। বলা বাহুল্য, চাহিদা ও শূন্যতা রাজনীতির বেলাতেও তৈরি হয়েছিল, সেটা এখনো আছে, নতুন নেতারা সেখানে এখনো আসেন নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

হুমায়ূনের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের উল্লেখ করেছি। সেটা দিয়েই শেষ করি। আমরা কেউ ভাবি নি যে, হুমায়ূন অত দ্রুত চলে যাবে। তার ভেতর শঙ্কা থাকবার কথা, নিশ্চয়ই যন্ত্রণাও ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে বুঝবার উপায় ছিল না। তার মায়ের সঙ্গেও অল্পক্ষণের জন্য দেখা হয়েছিল। হুমায়ূন আমার পরিচয়টা জানাল এভাবে যে, আমি কঠিন কঠিন বিষয় নিয়ে লিখি। বলল, 'ওসব তুমি বুঝতে পারবে না মা। তবে ইনি পা'য়ের কথাও লিখেছেন'। বুঝলাম আমার সেই যে দুটো বই সে একদা পড়েছিল—*শরৎচন্দ্র ও সামন্তবাদ* এবং *বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক*—যাতে পা'য়ের ব্যবহার নিয়ে কিছুটা মন্তব্য ছিল, সেটা তার মনে পড়েছে। হুমায়ূনের স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। দেখলাম সংকটকালেও তা অক্ষুণ্ণ আছে, যেমন রয়েছে সকলকে সজীব করে তোলার ক্ষমতা।

হুমায়ূনের মেধা ছিল অসামান্য, কর্মশক্তি অসাধারণ। কাজে তার বিরতি ছিল না। এত অল্প সময়ে এমন বিপুল সৃষ্টিসম্ভার ক'জন রেখে যেতে পেরেছেন? শেষ সাক্ষাতেও মনে হয়েছিল সে আরও অনেক কাজ করবে। সে-অগ্রগমনটা থেমে গেল। সান্ত্বনা এই যে, যা সে রেখে গেছে তার মূল্য কম নয়, অনেক। তাকে ভুলবার কোনো উপায়ই নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদের বডিগার্ড

সিরাজুল কবির চৌধুরী কমল

স্কুলজীবন থেকে হুমায়ূন আহমেদের বই পড়ছি। আমার পরিবারের অন্য সদস্যরাও হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের দারুণ ভক্ত। মনে পড়ে, তাঁর একটা বই কিনে আনলে কে আগে পড়বে তা নিয়ে আমাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যেত। পরিবারের সবাই মিলে তাঁর নাটক (এইসব দিনরাত্রি, অয়োময়, বহুব্রীহি, কোথাও কেউ নেই, নক্ষত্রের রাত...) দেখার স্মৃতিও প্রোজ্জ্বল। একুশে বইমেলায় তাঁর অটোগ্রাফ নেওয়ার বিষয়টিও ভোলার নয়।

১৯৯৬ সালের জানুয়ারিতে পাক্ষিক *অন্যদিন*-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। মূলত মাজহার, মাসুম, নাসেরসহ আমরা চারজন মিলে পত্রিকাটি প্রকাশ করি। এটি এখনো প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৯৭ সালে আমাদের হাতে গড়ে উঠে সৃজনশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'অন্যপ্রকাশ'। ওই বছরই প্রথম অন্যপ্রকাশ একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণ করে।

'অন্যপ্রকাশ' ১৯৯৯ সালে *রূপার পালঙ্ক*-র মাধ্যমে হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের প্রকাশক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। একুশে বইমেলায় ওই বছরে উপন্যাসটি বেস্ট সেলারের মর্যাদা পায়। পরিচয় হয় হুমায়ূন স্যারের সাথে (অবশ্য মাজহার ও মাসুমের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আগেই হয়েছিল)। অল্পদিনেই স্যারের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা তৈরি হয়। বন্ধুত্ব এমন পর্যায়ে চলে আসে যে সপ্তাহে সাতদিন তথা বছরের ৩৬৫ দিনই স্যারের সাথে আড্ডা হতো। একসময় স্যারের এমনি ভক্ত হয়ে গেলাম যে নিজেকে আমি স্যারের 'বডিগার্ড' হিসেবে ভাবতে শুরু করলাম। দেশে-বিদেশে যেখানে স্যার যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে আমিও যাচ্ছি। স্যার নুহাশপল্লী যাচ্ছেন সাথে আমি, কক্সবাজার যাচ্ছেন সাথে আমি। বলা যায়, আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে তাঁর বডিগার্ডের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। ব্যাপারটা আবার কাউকে বুঝতেও দিতে চাইছি না। এমনও হয়েছে স্যার বইমেলায় যাচ্ছেন, আমি লোকজন সরিয়ে স্যারকে এগিয়ে নিচ্ছি। অনেকেই বিরক্ত হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছে, 'আপনি কে?' আমি নিচু স্বরে বলছি, 'আমি স্যারের বডিগার্ড।' কিন্তু লেখকের কান বলে কথা, হুমায়ূন স্যার কথাটি শুনে ফেলেন। ২০০২ সালে তিনি আমাকে একটা বই উৎসর্গ করেন। বইটির নাম *দ্বিতীয় মানব*। আমার মতো একজন নগন্য মানুষকে স্যার একটা বই উৎসর্গ করলেন! আনন্দে আমার চোখে পানি এসে গেল। পাঠকদের কৌতূহলের কথা বিবেচনা করে উৎসর্গপত্রটা তুলে ধরলাম :

> সম্প্রতি আমি একজন বডিগার্ড পেয়েছি। ভিড়ের মধ্যে যখনই পড়ি, সে এগিয়ে এসে ধাক্কাধাক্কি করে আমার চারদিকের ভিড় সরাবার চেষ্টা করে। লোকজন বিরক্ত হয়ে যখন বলে, 'আপনি কে?' সে গম্ভীর ভঙ্গিতে বলে, 'আমি ওনার বডিগার্ড।' এই বাক্যটি বলার সময় তাকে খুবই আনন্দিত মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। হঠাৎ পাওয়া বডিগার্ড সিরাজুল কবির চৌধুরী (কমল)।
আচ্ছা কমল, বডিগার্ডের মতো soul guard পাওয়া যায় না ?

সেই সময় স্যারের সঙ্গে বহুবার নুহাশপল্লীতে গিয়েছি। নাটকের শুটিং থাকলে কখনো কখনো তিন-চারদিনও থাকা হতো। ২০০৫ সালের কথা। স্যার একদিন বললেন, কমল, তুমি তো আমার সাথে সবসময়ই থাকো, এক কাজ করো—তুমি আমার নাটকে অভিনয় করো। এভাবেই হুমায়ূন স্যারের অনুপ্রেরণায় শুরু হলো আমার অভিনয়জীবন। যদিও নাটকে আমার উপস্থিতি থাকত খুবই সামান্য। পরে আমি স্যারের অনেক নাটকে কাজ করেছি। স্যার যে আমাকে কতটা পছন্দ করতেন তার নমুনা দেই। স্যারের নাটকে কাজ করার সময় আমার শটগুলো নেওয়া হতো শেষ দিনে। হয়তো তিনি ভাবতেন আমার কাজ আগে হয়ে গেলে আমি ঢাকায় চলে যাব। একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত হিসেবে প্রায় এক যুগেরও অধিক স্যারের সাথে থাকতে পারাটা ছিল আমার জন্য পরম পাওয়া।

স্যারের মতো মহান এই মানুষটির বডিগার্ড (Non-recruited) হতে পেরে আমার জীবন ধন্য হয়েছিল। নিউইয়র্কে তাঁর চিকিৎসা শুরুর আগ পর্যন্ত, এমনকি চিকিৎসার মাঝখানে স্যার যে ক'দিন বাংলাদেশে ছিলেন, সেই সময়টুকুতে সব সময় তাঁর সাথে থাকতে পারাটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

২০১১ সালে হুমায়ূন স্যার সিঙ্গাপুরে যান। রুটিন চেকআপে তাঁর কোলন ক্যানসার (চতুর্থ পর্যায়) ধরা পড়ে। খবরটি শোনার পর আমি হতবিহ্বল হয়ে পড়ি। যাক, এরপর তিনি উন্নত চিকিৎসার্থে নিউইয়র্ক গমন করেন। আমি নিশ্চিত ছিলাম, স্যার সুস্থ হয়ে ফিরে আসবেন। ভীষণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। চিকিৎসার পুরো সময় মাজহারের সাথে প্রতিদিন একাধিকবার কথা হতো। শেষের দিনগুলোতে যখন শুনলাম তাঁর অবস্থা ভালো না, তখনো মনে হয়েছে স্যার নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু হায়, স্যার আর ফিরলেন না আমাদের মাঝে!

চিকিৎসা চলাকালে স্যার অনেকবারই মাজহারকে বলেছিলেন, কমলকে আসতে বলো। এমনকি আমার জন্য একটি রুমও রেডি করে রেখেছিলেন নিউইয়র্কের বাসায়। দুর্ভাগ্য সেসময় আমার ভিসা ছিল না। যখন ভিসা পেলাম, তখন আর যাওয়ার সৌভাগ্য হলো না। স্যার নিজেই ভিসা নিয়ে চলে গেলেন না-ফেরার দেশে।

বড়ই আফসোসের বিষয়, শেষ দিনগুলোতে স্যারের বডিগার্ডের দায়িত্ব পালন করতে পারি নি; পারি নি *soul guard* হতে। স্যার, আমাকে মাফ করবেন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, মৃত্যুর পর যেন আপনার সান্নিধ্য আবার পাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সে বড় অদ্ভুত সময় ছিল'

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা যেসব গল্প ও উপন্যাস বিষয় ও শিল্পের দ্বিবিধ বিচারে উত্তীর্ণ হয়েছে, সেগুলোতে লেখকের সততার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি এবং এই বিশাল গৌরবের ঘটনাটি একটি যথাযথ শিল্পকাঠামোয় দাঁড় করানোর প্রয়াস। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *দ্বিতীয় দিনের কাহিনী*তে একটি নিরীক্ষাধর্মী কাঠামো তৈরি করেছিলেন, এটি রুদ্ধশ্বাস গল্পের জন্য অনেকটা জয়েসীয় স্থিতিস্থাপক কিন্তু তলে একটি গতিশীল কাঠামো। শওকত ওসমান, হাসান আজিজুল হক বা সেলিনা হোসেন তাঁদের গল্পে-উপন্যাসে জোর দিয়েছেন ঘটনার এপিক বিস্তার এবং মনস্তত্ত্বের ওপর। হাসান আজিজুল হকের লেখায় এপিফ্যানির হঠাৎ আলোয় একটি সামান্য ঘটনা বিস্তৃত হয় অসামান্যতায়। অনেক তরুণ লেখক, যাদের মুক্তিযুদ্ধের কোনো স্মৃতি থাকার কথা নয়—অথবা যাদের জন্ম মুক্তিযুদ্ধের পর এবং যারা লিখেছেন এই যুদ্ধ বা একাত্তরের কথা নিয়ে, তাঁরাও ইতিহাসের সত্য এবং গল্পের সত্যের একটি সুফল নির্মাণের চেষ্টা করেছেন, প্রকরণের নতুনত্ব অন্বেষণ করেছেন। হুমায়ূন আহমেদের *জোছনা ও জননীর গল্প* এই নিরন্তর প্রয়াসে নতুন এক সংযোজন। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক কথাসাহিত্যে একটা মোড় দেওয়ার ইঙ্গিত দিল উপন্যাসটি, কেননা ইতিহাস ও ফিকশনকে একই আখ্যানের কাঠামোয় প্রায় এক জায়গায় নিয়ে এসেছে উপন্যাসটি। ইতিহাস ও কল্পনার এমন মিশেল আমাদের সময়ে উত্তর-আধুনিক সাহিত্যেই দেখা যায়। কিন্তু *জোছনা ও জননীর গল্প* মোটেও উত্তর-আধুনিক কোনো উপন্যাস নয়। এর বিষয়বস্তু আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, যার মতো বাস্তব, রক্তাক্ত ঘটনা—যা একই সঙ্গে বীরত্বের এবং গৌরবেরও—খুব কমই ঘটে একটি জাতির জীবনে। কিন্তু ইতিহাস ও গল্পের এই মিশ্রণ হয়তো ওই রক্তাক্ত বাস্তবের কঠিন ভারটা কিছুটা হলেও হালকা করেছে। চরিত্রগুলোকে এবং পাঠককেও—কোনো কোনো সময় ভুলতে দিয়েছে বর্তমানকে এবং কাহিনির একটি অনিবার্য পরিণতিকে কিছু সময়ের জন্য হলেও মুলতবি রেখেছে।

হুমায়ূন আহমেদের যে কয়টি বই আমি পড়েছি, সেগুলো থেকে *জোছনা ও জননীর গল্প* অনেকটাই আলাদা। ইতিহাস, এমনকি গবেষণাগ্রন্থ থেকেও লেখক উদ্ধৃতি দিয়েছেন অনেক জায়গায়, একটি গবেষণাপত্রের মতো টীকা-টিপ্পনী, গ্রন্থসূত্র এবং পরিশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জিও দিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি কোনো ইতিহাস বইয়ের অথেনটিসিটি নয়, বরং একটি গল্পের মর্যাদাই দাবি করে। এভাবে এত সহজে ইতিহাসকে জুড়ে দিয়ে গল্পের কাঠামো তৈরির উদাহরণ খুব কমই আছে আমাদের সাহিত্যে। তিনি নিজেও সে পথে আগে যান নি।

জোছনা ও জননীর গল্প উপন্যাসে হুমায়ূন আহমেদ তিনটি কাজ করেছেন। প্রথমত, তাঁর নিজের ভাষায়, 'দেশমাতার ঋণ শোধ করার চেষ্টা' করেছেন। দ্বিতীয়ত, একটি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাস লিখেছেন এবং তৃতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করেছেন। প্রথম দুটি কাজ নির্বিঘ্নে করতে পেরেছেন, কিন্তু তৃতীয় কাজটি করা এত সহজ নয়। যারা বিভিন্ন সময় সরকারি ইতিহাস রচনার দায়িত্বে থাকেন—একেবারে ইতিহাস লেখক থেকে নিয়ে বিশেষ দিবসের সংবাদপত্রের ক্রোড়পত্রে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর বাণী ও মূল প্রবন্ধ লেখক পর্যন্ত—তারা সবাই মুক্তিযুদ্ধের জানা ইতিহাসকেও এমন অজানা করে রেখেছেন যে, একটি মাত্র উপন্যাসে সত্য-মিথ্যার মীমাংসা করে ফেলা সম্ভব হওয়ার কথা নয়। তবে হুমায়ূন আহমেদ তাঁর মতো করে চেষ্টা করেছেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ মার্চের ভাষণের শেষে 'জয় বাংলা'র সঙ্গে 'জিয়ে পাকিস্তান' বলেছিলেন কি না, এ নিয়ে তিনি তাঁর ধারণা পরিষ্কার করতে চেয়েছেন। 'ভারতীয় সেনাবাহিনীর কার্যক্রম ছোট করে দেখানোর' একটি প্রবণতার বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি তাদের অবদানের ঋণ স্বীকার করেছেন, বীরশ্রেষ্ঠদের তালিকায় কেন কোনো বেসামরিক সাধারণ মানুষের নাম নেই—সে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আবার আওয়ামী লীগ প্রণীত ইতিহাসে জিয়াউর রহমানের অবদানের কোনো উল্লেখ কেন থাকে না, এ নিয়েও তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এ রকম আরও কিছু অমীমাংসিত বিষয় তিনি উত্থাপন করেছেন এই উপন্যাসে। আমাদের এই ভয়ঙ্কর রকম বিভাজিত সময়ে এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়ার কথা নয়। বঙ্গবন্ধু 'জিয়ে পাকিস্তান' বলেছিলেন কি না, তা সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করা যায় না। তবে বড় কথাটি হলো সেদিন ওই জনসভায় উপস্থিত সব মানুষের কাছে এই বাণীটি স্পষ্টভাবে পৌঁছে গিয়েছিল যে, এবার মুক্তির এবং স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। বিদায় পাকিস্তান। *জোছনা ও জননীর গল্পের* গল্পকাঠামোয় এই বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছে। ৭ মার্চের সত্যটিই প্রধান হয়ে উঠেছে, তার খুঁটিনাটি নয়।

একইভাবে জিয়াউর রহমানের চরিত্রটিও এসেছে *জোছনা ও জননীর গল্পে*তে। কিন্তু জিয়াউর রহমান এই উপন্যাসে সেই জিয়া, যে জিয়া হিসেবে তিনি নিজেকে পরিচিত করেছিলেন ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে লেখা একটি প্রবন্ধে, যে প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা উল্লেখ করে জিয়া লিখেছিলেন, সমগ্র বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর নামেই তিনি ঘোষণাটি দিয়েছিলেন। হুমায়ূন আহমেদ ওই ঘোষণার দিন হিসেবে ২৭ মার্চকেই উল্লেখ করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে জিয়ার নিজের লেখা ডায়েরির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি তাঁর 'লেখক' পরিচিতির অধীনে আধাপৃষ্ঠার একটা বিবরণও জুড়ে দিয়েছেন ১৮৩ পৃষ্ঠায়, যেখানে শুধু একজন সর্বোচ্চ বর্ণনাকারী হিসেবে নন, এই গ্রন্থের লেখক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সব বিভ্রান্তির অবসান চেয়েছেন। হুমায়ূন আহমেদ বঙ্গবন্ধুকে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর মর্যাদা, জিয়াকে জিয়ার। এই কাজটি অনেক ইতিহাসবিদও করতে পারবেন না, নব্য জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদরা তো নয়ই।

দেশমাতার প্রতি ঋণটি লেখকের ব্যক্তিগত, তবে জাতি হিসেবে আমরা তাতে ভাগ নিতে পারি। হুমায়ূন আহমেদ যখন গভীর মমতা নিয়ে আঁকেন একজন অজানা মুক্তিযোদ্ধার একদিনের জীবন ও মৃত্যুর ছবি, তখন ওই মুক্তিযোদ্ধা হয়ে দাঁড়ায় সকল মুক্তিযোদ্ধার প্রতিনিধি। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমাদের ঋণ সারা জীবনের, সেটি উপলব্ধির সুযোগ হুমায়ূন করে দেন।

জোছনা ও জননীর গল্পের কাঠামোটি খুব আকর্ষণীয়। অনেকগুলো আলাদা গল্পকে একটা সমন্বিত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন হুমায়ূন আহমেদ। একই সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন ইতিহাস, মন্তব্য, ব্যাখ্যা, খবরের কাগজের প্রতিবেদন। গল্পটি শুরুতে নীলগঞ্জ হাইস্কুলের আরবি শিক্ষক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাওলানা ইরতাজউদ্দিন কাশেমপুরির। এটি নানাভাবে এগোবে। একসময় তিনি হবেন স্থানীয় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান। তারপর হঠাৎ একদিন তিনি মসজিদে জুমার নামাজ পড়াতে অস্বীকার করবেন। কারণ পরাধীন দেশে জুমার নামাজ পড়া যায় না। পাকিস্তানি আর্মি তাঁকে উলঙ্গ করে নীলগঞ্জে ঘোরাবে, তারপর গুলি করে মারবে। তাঁর লাশ পরম যত্নে তুলে এনে সমাহিত করবেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মনসুর সাহেব। তাঁর স্ত্রী মাঝে মাঝেই পাগল হয়ে যান। কিন্তু সেদিন তিনি খুবই প্রকৃতিস্থ থাকবেন এবং স্বামীকে এই কাজে সাহায্য করবেন। মনসুর সাহেবের গল্পটা কিছুটা সমান্তরাল কিন্তু গৌণ। অথচ শেষের ওই বিন্দুতে এসে দু'টি গল্প একটা জায়গায় মিলে যায়, যেখানে বীরত্ব, সাহস, প্রতিবাদ, মনুষ্যত্বের প্রতি নিষ্ঠা প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই বিষয়গুলোর যোগফল ছিল মুক্তিযুদ্ধ।

ইরতাজউদ্দিন সাহেবের ছোট ভাই শাহেদের গল্পটি তাঁকে দিয়েই বস্তুত শুরু। কিন্তু শাহেদ চলে যাবে অনেক দূরে। আরও দূরে ছিটকে পড়বে তার স্ত্রী আসমানী ও তাদের মেয়ে। সেই বারাসতের এক আশ্রয়স্থলে। কিন্তু শাহেদ তাদের আবিষ্কারের আগে আমরা পাব আরও অনেক গল্প—গৌরাঙ্গের, তার স্ত্রী ও কন্যার, পুলিশ ইন্সপেক্টর মোবারক হোসেন, তার স্ত্রী ও তিন কন্যার এবং কবি হতে চাওয়া কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলবদর বনে যাওয়া কলিমুল্লাহর, যে মোবারক হোসেনের একটি মেয়েকে বিয়ে করে, বিহারি জোহর সাহেবের, সন্তসদৃশ অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর। শাহেদ একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয় ২৫ মার্চ রাতে—সে বাড়ির ছেলেটি বরিশালে তখন, ঢাকার বাড়িতে বাবা-স্ত্রী-কন্যা। তাদের গল্পটিও জড়ায় *জোছনা ও জননীর গল্পের* গল্পবেণীতে। হুমায়ূন আহমেদ নিজে আছেন এই উপন্যাসে, তাঁর বাবা-মা আছেন স্বনামে, মুহম্মদ জাফর ইকবাল আছেন। শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুণও আছেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের এই একটি গল্পে প্রকৃত-অপ্রকৃত, একান্ত-প্রকাশ্য সব একখানে মিলে যায়। মুক্তিযুদ্ধ ছিল সেই প্যারাডাইম, যা ছিল সম্ভব-অসম্ভব, প্রকৃত-অপ্রকৃতের এক যৌগিক রসায়ন-ক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বিকল্প একটি নির্মাণ। উপন্যাসটির এই নির্মাণকলার পেছনে ছিল এর বিষয়গুণ ও হুমায়ূন আহমেদের **গল্প বলার কুশলতা।**

এ কথা কেউ অস্বীকার করবেন না যে, হুমায়ূন আহমেদ গল্পকার হিসেবে রয়েছেন অতুলনীয় এক অবস্থানে। তিনি পুরনো ঐতিহ্যের কথকদের মতো, লাতিন আমেরিকার সেই হাবলাদরদের মতো সহজ অন্তরঙ্গতায় অনেক জটিল বিষয়ও মনোগ্রাহীভাবে বর্ণনা করে যান। এটি তার বড় একটি শক্তি, আবার ঠিক এ কারণে এই সহজ, ভণিতাহীন বর্ণনাভঙ্গির জন্য তিনি সমালোচিতও হয়েছেন। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় অনেকেই স্বীকার করবেন, তিনি যখন বলেন, আমরা অমনোযোগী হতে পারি না। *জোছনা ও জননীর গল্পে*তে এতগুলো আলাদা গল্প একটা জায়গায় ঠিকভাবে সমন্বিত হবে কি না, এ রকম একটা কৌতূহল পাঠকের থাকতেই পারে গল্পের মাঝামাঝিতে এসেও। কিন্তু তারা সমন্বিত শুধু হয় না, অনিবার্যভাবেই হয়। তবে মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলে আমরা গল্পগুলোর পরিণতি কী হতে পারে, আন্দাজ করে নিই। কলিমউল্লাহ যে আলবদর হবে এবং বেঁচেও যাবে, এটি আমরা বুঝতে পারি। আমরা আগেই জেনে নিই, ধীরেন্দ্রনাথকে সে তুলে নিয়ে যাবে। গৌরাঙ্গের কী হবে, আমরা জানি। শাহেদ যে আসমানীকে পাবে, তাও আমরা বুঝতে পারি। শুধু ইরতাজউদ্দিন এবং মনসুর হোসেন আমাদের বিস্মিত করেন, তবে আমরা আসলে বিস্মিতও হই না। মুক্তিযুদ্ধ মানুষকে এভাবেই যে ছুঁয়ে গিয়েছিল, সে তো আমরা জানি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসের পাতা থেকে যখন কিছু তুলে নেন হুমায়ূন আহমেদ, তখন তাঁকে একটা জটিল গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কোনটা তুলে নেবেন, এত লক্ষ লক্ষ ঘটনা থেকে? তিনি তুলে নেন ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালের ডোমদের গল্প, স্বরূপকাঠির যতীন্দ্রনাথ মণ্ডলের মতো সাধারণ মানুষের সাক্ষ্য, হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধের দলিল থেকে কোনো চিঠি অথবা বয়ান। হুমায়ূন আহমেদের দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষজনের গল্পগুলোই বেশি মর্যাদা পায়, কারণ সেগুলোতেই মুক্তিযুদ্ধের মর্মবাণী লুকিয়ে আছে। তাদের প্রকাশ করার মধ্যে দেশ-মাতার দায়শোধের একটা ব্যাপারও থাকে। তবে পাকিস্তানিদের চরিত্রায়ণে অনেক বেশি সংযত এবং দয়াশীল তিনি। একজন পাকিস্তানি কাপ্টেন, যে তার মাকে ছেড়ে এ দেশে আছে, তার প্রতি কিছুটা মমত্ব দেখাতেই পারেন লেখক, কিন্তু ওই ক্যাপ্টেনের উদ্দেশ্য ছিল না ত্রাণ বা ভালোবাসা বিতরণ। সে এসেছে মানুষ মারতে। সে খুনি। যেমন খুনি ছিল আলবদর গোষ্ঠী। এই খুনিদের ব্যাপারে আরেকটু কঠোর হতে পারতেন হুমায়ূন আহমেদ। আলবদরদের চেহারাটা আরেকটু বেশি দেখাতে পারতেন।

জোছনা ও জননীর গল্পের প্রতিটি গল্প নিয়ে একটা আলাদা উপন্যাস হতে পারে। অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ যেন তারা, তাদের পরস্পর সংযুক্তি ছাড়াও যেন প্রত্যেকের আলাদা একটা আখ্যান তৈরির ক্ষমতা রয়েছে। এ জন্য প্রতিটি গল্পে আছে খুঁটিনাটি। রান্নার বর্ণনা আছে, স্নানের বর্ণনা আছে, এমনকি খাদ্যগ্রহণের বর্ণনা আছে। কিন্তু এসব বর্ণনা নিজেদের একটা কার্যকারণসূত্র তৈরি করে নেয়। এই বর্ণনাশক্তির সঙ্গে আছে তাঁর ট্র্যাজেডি রূপায়ণের অপূর্ব দক্ষতা। খুব সহজ বর্ণনায়, আয়রনির ন্যূনতম ব্যবহারে, বোধ-অনুভূতিতে কোনোভাবে আলোড়ন না তুলে এবং যেন একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুকের হালকা আবরণে যা হুমায়ূন আহমেদের একান্ত নিজস্ব—তিনি একটি ট্র্যাজিক বর্ণনা দিয়ে ফেলেন। *ঠেলাগাড়িচালক* আসগর আলির ও তার ছেলের গল্পটির কথা ধরা যাক। যেমন—এটি হচ্ছে গল্পের ভেতরে একটি গল্প। যদি একটি আলাদা গল্প লেখা যেত আসগরকে নিয়ে নাম হয়তো দেওয়া যেত 'আসগর আলির শেষ দিন' অথবা এ রকম কিছু। কিন্তু একটা আস্ত দিন পিতা-পুত্র একসঙ্গে জীবনটা ভোগ করে নিল, তাদের মতো করে। বাড়ি যাওয়ার কথা নয়, কিন্তু পাকিস্তানি টেলিভিশন 'দেশের সব ঠিক আছে'— এই মর্মে আসগর আলির বক্তব্য নিয়ে তাকে পাঁচটা টাকা দিয়ে ওই সিদ্ধান্তের দিকে তাকে *ঠেলে* দিল, যা নিয়ে এল তার মৃত্যু। আসগর আলির গল্প পড়ে চোখ হয়তো ভিজে যায়, কিন্তু একই সঙ্গে এ-ও মনে পড়ে, তার মতো লাখ লাখ আসগর আলি মারা পড়েছেন এই দেশে, যাদের নামটাও কেউ মনে রাখে নি পরিবারের নিকটজন ছাড়া, তখন এই কথাটি হয়তো প্রতিষ্ঠা পায় যে, এসব মৃত্যুকে ভুলে যাওয়াটা জাতি হিসেবে আমাদের অপরাধ।

হুমায়ূন আহমেদ চাঁদে পাওয়া মানুষ। তাঁকে নিসর্গ নানাভাবে উদ্বেলিত করেছে। যখন জীবন নিয়ে পালাচ্ছেন তিনি, নৌকায় করে, নদীতে ভেসে যাচ্ছে মৃতদেহ, তখনো আকাশের জ্যোৎস্না দেখে পুলকিত হয়েছেন। *জোছনা ও জননী গল্পে*তে ওই চাঁদে পাওয়ার বর্ণনা আছে অনেক, এটি হুমায়ূন আহমেদের গল্পে জীবনের রহস্য নির্ণয়ের একটা উপায়ও বটে। বইটি হাতে নিয়ে ভাবছিলাম, শিরোনামের জননীর তো বোঝা গেল। জোছনা কীভাবে প্রাসঙ্গিক? মাঝখানের ওই জ্যোৎস্না বর্ণনা থেকে বিষয়টি আন্দাজ করা গিয়েছিল, কিন্তু উপন্যাসের শেষ কয়টি পঙ্‌ক্তিতে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি নিজেই প্রায় ব্যাখ্যা করে দিলেন, 'জোছনার রাতে সে (অর্থাৎ দেশজননী, মৃত্তিকা) তার বীর সন্তানদের কবরে অপূর্ব নকশা তৈরি করে। এ উপন্যাসের আসলে দুটি 'শেষ' আছে। এক হলো, মুক্তিযোদ্ধা নাইমুল তার স্ত্রী মরিয়মের কাছে ফিরে আসে। কিন্তু অন্যটি, যেটি অনেক বেশি বাস্তব, সেটি ভিন্ন, নাইমুল কথা রাখে নি। সে ফিরে আসতে পারেনি তার স্ত্রীর কাছে। বাংলার বিশাল প্রান্তরের কোথাও তার কবর হয়েছে।'

এই সমাপ্তিটিও চমকের এবং এ রকম একটি দ্বিপথী সমাপ্তির জন্য সাহসের দরকার। তবে নাইমুলের দুই গল্পের মতো, উপন্যাসের অন্যসব গল্পের মতো, জোছনার গল্প শেষ পর্যন্ত আসলে একটিই—যার নাম মুক্তিযুদ্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদ : তাঁর চলে যাওয়া

সৈয়দ শামসুল হক

নিউইয়র্কে তিনি ছিলেন চিকিৎসার অধীন, অধোগতির খবর আসছিল প্রতি মুহূর্তে, শেষ খবরটা জেনে যাই তাঁর চলে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই। জেনেও সে খবরের সত্যতা বোধে আনতে আমাদের কষ্ট হচ্ছিল। বাংলাদেশের সাহিত্যে এবং ব্যক্তিগত আমাদের কলম-সংসারে এতটাই প্রবল ছিল তাঁর উপস্থিতি, মনে হচ্ছিল মৃত্যু তাঁকে ছুঁতে পারবে না; অন্তত ক্যানসারের মতো দুশ্চিকিৎস ব্যাধিও তাঁর কাছে হার মানবে।

অলৌকিকে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর সে বিশ্বাস আমাদের কাছে, সম্ভবত তাঁর কাছেও, জপিয়েছিল যে ব্যাধিটা যতই তীব্র ও মারণের হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত অলৌকিক একটা কিছু ঘটবেই এবং তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন, আমাদের কাছে ফিরে আসবেন। তিনি কফিনবন্দী হয়ে ফিরেছেন বাংলার বৃষ্টির ভেতরে। আকাশও যেন তাঁর জন্যে অশ্রুপাত করছিল।

মানুষ মরণশীল। সব মানুষই জন্মগ্রহণ করে মৃত্যুদণ্ড মাথায় নিয়ে। কিন্তু কোনো কোনো মানুষ এমন, তাঁরা মৃত্যুকেও জয় করেন—শরীরে নয়, তাঁদের কাজে। কাজের ভেতরেই তাঁরা রয়ে যান। হুমায়ূন তাঁদেরই একজন। তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর লেখায়। লেখার অতিরেকে তিনি অন্য মাধ্যমেও কাজ করেছেন, নির্মাণ করেছেন চলচ্চিত্র আর টেলিভিশনের জন্যে নাটক। কিন্তু তাঁর মূল কাজ লেখাতেই; চলচ্চিত্র আর টেলিনাটক তাঁর সাহিত্য-সৃজনেরই সম্প্রসারণ বলে আমি দেখে উঠেছি।

কিন্তু তাঁর ওই উত্তুঙ্গ খ্যাতির সূচনা টেলিনাটক থেকেই। একের পর এক তুমুল জনপ্রিয় নাটক ও নাট্য-সিরিজের জন্য দেখি তিনি, পৌঁছে যান সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় নেই বা থাকলেও খুবই ক্ষীণ, বা কখনোই কোনো বই পড়েন নি এমন মানুষেরও কাছে। তাঁরাও তখন আবিষ্কার করেন তাঁকে লেখক হিসেবে এবং তাঁর পাঠক হয়ে ওঠেন।

আর, কী তাঁর পাঠক! অগণিত! একদিকে টেলিনাটক ও চলচ্চিত্র, আরেকদিকে উপন্যাস, দুই ক্ষেত্রের প্রিয়তার তরঙ্গ ধাবিত হয়ে এক উত্তুঙ্গ তরঙ্গে পরিণত হয়; তিনি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। অনেকেই বলেছেন, যেমন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আগেও বলেছেন, তাঁর চলে যাওয়ার পরও বলেছেন যে, হুমায়ূনের জনপ্রিয়তা শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। কথাটায় যতটা না যুক্তি তার অধিক উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগই আমি লক্ষ করি।

নিশ্চয়ই শরৎচন্দ্রের সেই জনপ্রিয়তার 'জন' আর হুমায়ূনের এই জনপ্রিয়তার 'জন', এ দুই 'জন' অভিন্ন বা পরষ্পর বিনিময়যোগ্য নয়, কেননা এরা এক কালের তো নয়ই, এক শ্রেণী বা বয়সেরও নয়, যাপিত জীবনের একই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েও তারা যায় নি। কালের অগ্রযাত্রায় পাঠের প্রসঙ্গ, প্রয়োজন ও কারণ বিবর্তিত হয়। তাই আমি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর তুলনা করব না—সাহিত্যিক বিচার-কারণে তো নয়ই, জনপ্রিয়তার মাপজোঁকেও নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনপ্রিয়তা কোনো লেখকের সাহিত্যিক মূল্যায়নের মাপকাঠি হতে পারে না। জনপ্রিয়তার বিষয়টি ততক্ষণই প্রাসঙ্গিক যতদিন লেখকটি জীবিত আছেন; মৃত্যুর পরে সাহিত্যিক কৃতি ও অর্জনই হয় আমাদের একমাত্র বিবেচ্য। হুমায়ূন চলে যাওয়ার পরে, এমনটিও হতে পারে—হবে বলেই বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে ২০১৩-র বইমেলা পর্যন্ত এখনই বলা যায়—তাঁর বইয়ের বিক্রি তাঁর জীবদ্দশার হিসেবটাকেও ছাড়িয়ে যাবে। তা সত্ত্বেও তাঁকে আর জনপ্রিয় বলা যাবে না; প্রকাশক-মহলে চালু ইংরেজি শব্দে, বড়জোর বলা যাবে তিনি বেস্টসেলার, কিন্তু পপুলার আর নন। পপুলারিটি কেবল জীবিতদেরই জন্যে উচ্চার্য।

তাহলে, হুমায়ূন আহমেদের পদপাত মাটির ধুলি ছেড়ে আকাশের নীলিমায় নিরালোকে দিব্যলোকে চলে যাওয়ার পর, এখন তাঁর সাহিত্য বিচারটাই সম্মুখে এসে যায়। কিন্তু শোকের এই মুহূর্ত সে মূল্যায়ন করবার সময় নয়। এত দাপটে যিনি ছিলেন এবং এত মিডিয়া-প্লাবিত ছিল যাঁর বিদায়, তাঁর জন্যে তো সময় আমাদের নিতেই হবে যতদিন না এই অশ্রুপাত সংবরিত না হচ্ছে।

এই অশ্রুপাত আমাদের দৃষ্টি ও বিবেচনা বোধকেও যে কতখানি ঝাপসা করে দেয় তার একটি উদাহরণ—তাঁর অতীত ও বর্তমান পাঠকদের হাজারো মুখে একটা কথা শোনা যাচ্ছিল যে, বৃষ্টি আর জ্যোৎস্না তিনি আমাদের চিনিয়েছেন; এমন করে ঝরোঝরো বরিষণে ভিজে উঠতে, এমন করে ভুবন-ডোবানো চাঁদের আলোয় স্নান করতে তাঁর আগে কেউ তো এমন করে ডাকেন নি! কেন রবীন্দ্রনাথ?—হুমায়ূনের জনপ্রিয়তার তোড়ে রবীন্দ্রনাথও তবে দৃষ্টির অগোচরে চলে গেলেন! রবীন্দ্রনাথের বর্ষার অজস্র গান আর তাঁর কত শত পূর্ণিমা প্রসঙ্গের ভেতরে ওই যে আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে কি আমরা ভুলে গিয়েছি? হুমায়ূন নিজে তো ভোলেন নি!

কতভাবেই না তিনি রবীন্দ্রগান ব্যবহার করেছেন তাঁর নাটকে আর রবীন্দ্রলেখা থেকে অবিরাম ধার করেছেন তাঁর উপন্যাসের শিরোনাম। বরং রবীন্দ্রনাথকে যে তিনি রবীন্দ্র উদাসীন তরুণদের কাছে তুলে ধরেছেন, এটাই তো ছিল তাঁদের উচ্চারণে প্রত্যাশিত। আমার সে-আশাটি যে ভগ্ন হয়েছে, এতেই আমি আরও একবার দেখে উঠি হালের মানুষ—বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের—উত্তরাধিকারবোধ কতটাই না আজ রাহুগ্রস্ত। এ থেকে উত্তরণ তো হুমায়ূন নিজেই চেয়েছিলেন!

তিনি ছিলেন গল্পের জাদুকর, স্বপ্নের কারিগর আর জাতির কোনো কোনো পরিস্থিতিতে বিবেকের কণ্ঠস্বর। একটা তো সোনার অক্ষরে ইতিহাসে লেখা থাকবে—একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী রাজাকারদের বিষয়ে প্রকাশ্যে হুমায়ূন আহমদই প্রথম সাহসী উচ্চারণটি করেছিলেন তাঁর নাটকে অসামান্য এক শিল্পকৌশল প্রয়োগ করে, পাখির বুলিতে 'তুই রাজাকার' তুলে এনে।

হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালার সঙ্গে তাঁকে তুলনা করতে ইচ্ছে হয়। বাংলাদেশে কৈশোর ও প্রথম-যুবা-বয়সের প্রায় সবাইকে হুমায়ূন টেনে নিয়ে গিয়েছেন যেখানে যাওয়ার তারা স্বপ্ন দেখে ওঠে; হতে পারে সে স্বপ্ন সমসময়ের রূঢ় বাস্তবতাকে এড়িয়ে গিয়েই বা গিয়েও। তাদের সেই স্বপ্নে তিনি নিজের উপাদানও অনেকটাই চারিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সবটা বোধহয় সফলও হতে পারেন নি—উত্তরাধিকার-বিস্মৃতির চলমান পরিস্থিতি দেখে এটা মনেই হতে পারে।

বাঙালি পাঠকদের সাহিত্যপাঠ দশ বছরের অধিক নয়, এই হিসেবে হুমায়ূন চল্লিশ বছর নিরন্তর লিখে চার-চারটি পাঠক-প্রজন্মকে তাঁর কলমের জাদু দিয়ে ছাপা বইয়ের দিকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশ্চিমবঙ্গের উপন্যাস থেকে এই বাংলার লিখনের দিকে, আকর্ষণ করেছেন। হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালা তিনি এইখানেই। আর এরই টানে যে বাংলাদেশের উপন্যাস-প্রকাশনা ক্ষেত্রে প্রমত্ত কোরাস শুরু হয়ে যায়, আশা করি হুমায়ূন বিহনেও তা অব্যাহত থাকবে।

হুমায়ূন আহমদের রচনা-গভীরে তিনটি আলো আমি দেখতে পাই : সত্য, শুদ্ধতা ও সুন্দর। এই আলোত্রয়ী তাঁর গল্প উপন্যাস ভ্রমণকথা স্মৃতিকথা, এমনকি খেলাচ্ছলে লেখা তাঁর রম্য রচনারও অক্ষরগুলোকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। কিন্তু এ কথাও সত্য, তাঁর লেখায় ওই আলো আবিষ্কার করবার বদলে তাঁর পাঠকেরা রচনার স্বাদুতা সহায়ে বিনোদন সন্ধানেই তৎপর থেকেছে অধিক।

এবং এরই ফলে, হুমায়ূনের আগের লেখা ক্রমাগত পেছনে পড়ে গেছে পাঠকের স্মৃতিতে, প্রতি বছরে তাঁর নতুন বইয়ের জন্যে প্রত্যাশা জেগেছে, যেন কবেকার সেই দস্যু মোহন সিরিজ ফিরে এসেছে!—এটা তো পড়েছি, এরপরে কী আছে! এই চাপটি হুমায়ূনের কলমের পক্ষে সবসময় স্বাস্থ্যপ্রদ হয়ে ওঠে নি। ব্যাপারটি তিনি নিজেও যে অনুভব করতে পেরেছিলেন তারই জন্যে কি সাম্প্রতিক কালে তিনি **অন্যস্বাদের রচনায় প্রবৃত্ত** হয়েছিলেন—যেমন *মধ্যাহ্ন*, *বাদশা নামদার*, *দেয়াল*-এর মতো উপন্যাস?

AMARBOI.COM

কালের অতিক্রমণ পরে তাঁর চলচ্চিত্রের প্রেক্ষণ আর হবে না, তাঁর টেলিনাটকও অচিরে বিস্মৃতির গর্ভে চলে যাবে, থেকে যাবে শাদা পৃষ্ঠায় অক্ষরে তাঁর লেখা—শুধু লেখা; আর, সেই লেখা-সকলেরও অনেকটাই ঝরে যাবে কালের ঝাঁঝরিতে—তাঁর শুধু নয়, সব লেখকেরই এই গতি। জনপ্রিয়তার প্লাবন শেষে, বিদায়জনিত অশ্রু নিঃশেষে সেই ভূমি জেগে ওঠে; হুমায়ূন আহমেদেরও থেকে যাবে শুধু সেই লেখা যা শিল্প-বিচারে উত্তীর্ণ এবং কালচাবুকের মার সহেও চিরকালীন; এমন লেখা তাঁর বিরল নয়, অনেকই—বিশেষ করে তাঁর কয়েকটি ছোটগল্প তো বিশ্বসেরার সারিতে।

আর, তিনি থেকে যাবেন আমরা যারা তাঁকে দেখেছি জেনেছি পেয়েছি—তাঁর সেই রহস্যপ্রিয় উচ্চারণ, ক্ষণিক স্মিতমুখে তাঁর সেই দীপ্তি, বালকোচিত কৌতুহল, উদার আতিথেয়তা, তাঁর একান্ত নিজের ধরণে জীবনযাপন ও সমুদ্র-বিলাস, বৃষ্টিবিলাস, জ্যোৎস্না-বিলাস, বৃক্ষ-বিলাস নিয়ে—আমাদের স্মৃতিতে, এখনো আমরা যারা ঘাসের ওপরেই আছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদের অচিনপুর : একটি সরল পাঠ

হামিদ কায়সার

'তোমাকে' উপন্যাসের নিলু, রাত্রি, সেতারা—ওদের তিন বোনকে আমি চোখে দেখি নি, ওদের বাবাকেও না। কিন্তু ওদের মাকে আমি দেখেছি। সেটা ১৯৮৫ কী '৮৬ সালের ঘটনা, যখন হুমায়ূন আহমেদ ইতোমধ্যেই বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে ফেলেছেন এবং জ্ঞানপাপী কিছু অধ্যাপক এবং বোদ্ধা পাঠক ছাড়া সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য লেখক হয়ে উঠেছেন। ঠিক সেই সন্ধিক্ষণেই আমি দেখেছি কী চমৎকার সুন্দরী এবং শিক্ষিতা এক মা উত্তরবঙ্গের কোনো এক শহরে তার সন্তান এবং স্বামীকে ফেলে রেখে, শুকনো টিঙটিঙে রসকষহীন এক ভদ্রলোকের হাত ধরে চলে এসেছে ঢাকার সন্নিকটস্থ গাজীপুরে, যেখানে সেই টিঙটিঙে ভদ্রলোক তখন ভবঘুরে কেন্দ্রের সুপারেন্ডেন্ট-এর দায়িত্ব পালন করছিলেন। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে প্রায়ই আমাকে ওই ভবঘুরে কেন্দ্রে যেতে হতো, তারই সুবাদে জানা হয়েছিল 'তোমাকে' উপন্যাসের সেই ভদ্রমহিলাকে এবং তিনি যার হাত ধরে স্বামী-সংসার সব ফেলে চলে এসেছিলেন, সেই ম্যানেজার কাকুকে।

আমি সেই মাকে গভীরভাবে দেখেছি, দেখেছি যে কী স্মার্টলি সে তার নতুন সংসার করছে, জাতীয় এক অনুষ্ঠানে চোখে সানগ্লাস লাগিয়ে ক্যামেরা দিয়ে সবার সামনে স্বামীপ্রবরের ছবি তুলছে, একা একাই গাজীপুর থেকে চলে যাচ্ছে ঢাকায় শপিং করতে। দেখে দেখে কতবার ভেবেছি, এই আনন্দময়ীর সাবেক স্বামীর কথা না হোক, অন্তত একবারও নিজের ফেলে আসা সন্তানের কথা মনে পড়ে না ? আমি কিছুতেই হিসেব মিলাতে পারি নি তখন, এই আনন্দময়ী রসকষহীন টিঙটিঙে ভদ্রলোকের মধ্যে কী এমন দেখলেন যে সর্বস্ব ছেড়ে তার সঙ্গে চলে আসতে হলো ? না সে হ্যান্ডসাম, না আছে গুণ—যখনই দেখেছি, তখনই মনে হতো বদমেজাজের লোক, সারাক্ষণই খিটিমিটি লেগে আছে।

এতক্ষণে হয়তো কারও কারও মনে প্রশ্ন আসতে পারে, কার জীবনে কী কারণ থাকে কার সঙ্গে কে থাকবে না থাকবে, তা নিয়ে তোমার এত ভাবিত হওয়ার কী ছিলরে বাপু! তার উত্তরে বলছি, এই জীবনটা আমি যখন দেখছিলাম, তখনই যে আমার হুমায়ূন আহমেদের *তোমাকে* উপন্যাস পড়া। এবং সেটাই আমার হুমায়ূনের প্রথম পাঠ। *নন্দিত নরকে* নয়, *শংখনীল কারাগার* নয়, কিংবা *অচিনপুর*ও নয়, আমার হুমায়ূন পাঠ শুরু হয়েছিল *তোমাকে* দিয়ে। বলার অপেক্ষা রাখে না, প্রথম পাঠের অভিজ্ঞতাতেই আমি অনুধাবন করেছিলাম, জীবনকে কত কাছ থেকে এবং কত গভীরভাবে দেখার ক্ষমতা আছে লেখকের। আমি জানি না, বাস্তবের সেই রূপসী ভদ্রমহিলা *তোমাকে* উপন্যাসটি পড়েছেন কি না, হিসেবে তো পড়ার কথা। তখন হুমায়ূন-ক্রেজ শুরু হয়ে গেছে। সেটা পাঠের সময়, তার ফেলে আসা সন্তান এবং স্বামীর প্রতি তার অনুভূতিটা কী হয়েছিল আমি জানি না। *তোমাকে* উপন্যাসে কিন্তু লেখক মাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, তবে অনেক দেরিতে, নিলু-রাত্রি-সিতারার বাবা তখন মৃত্যুশয্যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভদ্রলোকের সুস্থ অবস্থাতেও ওদের মাকে হুমায়ূন আহমেদ উত্তর দিঘি নামের বাড়িটাতে ফিরিয়ে আনতে পারতেন, কিন্তু তাতে ক্যাথারসিস তৈরি হতো কি না সন্দেহ। পাঠকের মন নিজেরই অজান্তে তাহলে ভিজে যেত কি না কে জানে? পাঠকের মনকে করুণ রসে আর্দ্র করে দেওয়ার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল লেখকের। হাসিয়ে ভাসিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাও তার ভালোই জানা ছিল। আমি জানি না, পাঠকের অনুভূতি নিয়ে, এই যে কান্নাহাসির দোলদোলানোর যে অসম্ভব ক্ষমতা ছিল হুমায়ূন আহমেদের, সে ক্ষমতা আর কোনো লেখকের আছে কি না। পাঠকের মন নিয়ে কী যে ছেলেখেলা করার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল হুমায়ূন আহমেদের, সেটা যেমন দুর্লভ তেমনি অলৌকিকও বটে।

আমি অবশ্য আজ *তোমাকে* নিয়ে লিখতে বসি নি। তবু এটা দিয়ে ভূমিকা টানার মানেটা হলো কীভাবে আমি হুমায়ূন-রাজ্যে প্রবেশ করেছিলাম, তারই একটা ফিরিস্তি। আমি আজ এই সুযোগে *অচিনপুর* উপন্যাস নিয়ে আমার অনুভূতি জানাতে চাই। হুমায়ূন আহমেদের অনেক উপন্যাসই আমার প্রিয়, তবে অতি প্রিয় উপন্যাসও আছে বেশ কয়েকটি, তার মধ্যে অন্যতম হলো এই *অচিনপুর*।

২

AMARBOI.COM

বাংলাদেশে গ্রামভিত্তিক উপন্যাসের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। শহীদুল্লাহ কায়সারের *সংশপ্তক*, *সারেং বৌ*, শামসুদ্দিন আবুল কালামের *কাঞ্চনগ্রাম*, জহির রায়হানের *হাজার বছর ধরে*, আবু জাফর শামসুদ্দিনের *পদ্মা মেঘনা যমুনা*, আবু ইসহাকের *সূর্য দীঘল বাড়ি*, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা*, ইমদাদুল হক মিলনের *নূরজাহান*—এরকম তালিকা করলে তা আরও দীর্ঘ হয়ে যাবে।

সাহিত্যিক হিসেবে পরম সাফল্য পাওয়া হুমায়ূন আহমেদ নানান রকম দুর্ভাগ্যেরও শিকার হয়েছেন। বেশ কয়েকটি সার্থক গ্রামভিত্তিক উপন্যাস রচনা করলেও প্রাজ্ঞ সমালোচকেরা কেন যেন তার নামটি নিতে দ্বিধাগ্রস্ত থাকেন। এর কারণগুলোর মধ্যে সম্ভবত এই যে, তিনি অসম্ভব জনপ্রিয় লেখক ছিলেন, অন্যান্য সাহিত্যিকরা যেমন ঘটা করে দীর্ঘসময় নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন তিনি সেভাবে লেখেন নি, খুব দ্রুত সময়েই একটি উপন্যাস নামিয়ে দিয়েছেন, তার উপন্যাসের ভাষা এবং উপস্থাপনা সহজ সরল, অন্যান্যদের মতো ততটা আলংকারিক নয়।

অথচ তাঁর গ্রামভিত্তিক উপন্যাসগুলো যেমন, *অচিনপুর, ফেরা, মধ্যাহ্ন* প্রতিটিই সার্থক, নান্দনিক এবং এপিকধর্মী, অন্তত আমার দৃষ্টিতে।

৩

গ্রামীণজীবন নিয়ে লেখা যে দুটি উপন্যাস আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছে তার একটি হলো জহির রায়হানের *হাজার বছর ধরে*, অন্যটি হুমায়ূন আহমেদের *অচিনপুর*। দুটো উপন্যাসের ভাষাই আশ্চর্য রকমের সরল, সহজবোধ্য। গ্রামীণ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষেরা কেমন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। গ্রামবাংলার চিরন্তনী জীবনের ধারা বয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসেছে গভীর জীবনবোধ।

জহির রায়হানের *হাজার বছর ধরে* উপন্যাসটি যখন আমি পড়ি, তখনো আমার গ্রামে বিদ্যুৎ আসে নি, টিভি আসে নি, রাস্তাঘাট পাকা হয় নি, তখন বৃষ্টি এলে কখনো টানা সাতদিনও হতো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর বাড়িতে মেহমান এলে বিপুল আনন্দের হিল্লোল বয়ে যেত, সেটা ছিল এক অদ্ভুত রসাস্বাদান—গ্রাম, গ্রামীণ জীবনের এমন সুন্দর নান্দনিক উপস্থাপন এক জসীমউদ্‌দীনের কাব্যকাহিনী *নক্সী কাঁথার মাঠ* ছাড়া আর কোথাও আগে পাই নি। শৈশবে পড়া সে উপন্যাসটির টুনি চরিত্র ছাড়া আর কোনো চরিত্রের নাম মনে না থাকলেও আবছা আবছা উপন্যাসের অনেক কিছুই মনে আছে, যেমন নৈসর্গিক বর্ণনাগুলো, নদী, জোছনা, পুঁথিপাঠ...পরিণত বয়সে এসে *হাজার বছর ধরে* আর পড়ি নি, ভয়ে, যদি শৈশবের সেই ভালো লাগাটা আমার হারিয়ে যায়!

আর হুমায়ূন আহমেদের *অচিনপুর* পড়েছি এমন এক সময়ে, যখন আমার গ্রামের সব লাবণ্য একেবারে শুকিয়ে গেছে, নদীটা মরে যেতে শুরু করেছে, রাস্তাঘাট পাকা হয়েছে, বিদ্যুৎ এসেছে টিভি এসেছে, মিল হয়েছে ইন্ডাস্ট্রি হয়েছে, মানুষের বুকের ভেতর চর পড়তে শুরু করেছে। পড়ে আমি মন্ত্রমুগ্ধ, কেন যেন জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের কথা মনে পড়েছে। টুনির কথা মনে পড়েছে। না, *হাজার বছর ধরে*-র সঙ্গে *অচিনপুর*-এর কোনো মিল নেই, পটভূমি ভিন্ন, মানুষ ভিন্ন, উপস্থাপন ভিন্ন। তা হলে সম্পর্কটা ঠিক কোন জায়গায়? হ্যাঁ, যোগসূত্র একটা আছে, অবশ্যই আছে। সেটা হলো, এ দুটি উপন্যাসই আমাকে আমার আবহমান গ্রামটাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে।

অচিনপুর পড়ে পড়ে বারবারই চমকে গিয়েছি, নিজেকে খুঁজে পেয়ে। অথচ আমি ভাটির দেশের মানুষ নই। *অচিনপুর* ভাটির দেশের কাহিনি। আমি টেঙরের লোক। তবে আমার নানার বাড়ি ঠিক ভাটির দেশে না হলেও, অনেকটা সে মেজাজের। সারা বর্ষায় পদ্মার পানিতে সয়লাব হয়ে যেত বিক্রমপুরের সেই পুরো এলাকা। দাদার বাড়ি আর নানার বাড়ি দু'অঞ্চলের অভিজ্ঞতাতেই *অচিনপুরে* নিজেকে মাঝে মাঝেই কী চমৎকৃতভাবেই না পেয়ে গেছি আমি। আমি মানে কিন্তু শুধু আমি নই, আমরা, হুমায়ূন আহমেদের বিপুল শ্রেণীর পাঠকগোষ্ঠী, যারা নিজেকে হুমায়ূন আহমেদের লেখায় খুঁজে পেয়েছেন বলেই তার বই গোগ্রাসে কিনেছেন, গলা ডুবে পড়েছেন। সম্ভবত এটাই হুমায়ূন আহমেদ-এর বিপুল শক্তি ও কিংবদন্তি লেখক হয়ে ওঠার নেপথ্য কারণ।

নিজের শেকড়কে আমি কীভাবে খুঁজে পেলাম *অচিনপুর*-এ, উপন্যাস থেকে কিছু বর্ণনা উদ্ধৃত করলেই সম্ভবত বিষয়টি স্বচ্ছতর হবে। 'সোনাখালি খালের বাঁধান পুলের ওপর বসে থাকতে থাকতে একসময় তার কাঁদতে ইচ্ছে হবে? আসলে আমি মানুষ হয়েছি অদ্ভুত পরিবেশে। প্রকাণ্ড একটি বাড়ির অগুনতি রহস্যময় কোঠা। বাড়ির পেছনে জড়াজড়ি করা বাঁশবন। দিনমানেই শেয়াল ডাকছে চারিদিকে। সন্ধ্যা হব-হব সময়ে বাঁশবনের এখানে-ওখানে জ্বলে উঠছে ভূতের আগুন। দোতলার বারান্দায় পা ছড়িয়ে বিচিত্র সুরে কোরান পড়তে শুরু করেছে কানাবিবি। সমস্তই অবিমিশ্র ভয়ের।' এরপর আরেক জায়গার বর্ণনায় আছে, 'আমরা সোনাখালির খাল পর্যন্ত চলে গেলাম। সেখানে পাকা পুলের উপর দুজনে বসে বসে সূর্যোদয় দেখলাম। প্রচণ্ড শীত পড়েছিল সে-বার। কুয়াশার চাদরে গাছপালা ঢাকা। সূর্যের আলো পড়ে শিশিরভেজা পাতা চকচক করছে।' এ দুটো বর্ণনাই সম্পূর্ণ আমার নানাবাড়ির। হুবহু, এখনো সেই শেয়ালের ডাক আমি শুনতে পাই, ভুতুড়ে আবহটা এতটাই ছিল যে, সন্ধের পর ঘরের বাইরেই আমরা বের হতে ভয় পেতাম, এমনকি জানালা দিয়ে তাকাতেও দম আটকে যেত। কেউ কি বিশ্বাস করবে, সোনাখালি নামের একটা খালও ছিল রাজাবাড়ি নামের সে গ্রামটিতে, কিন্তু পুলটা বাঁধান ছিল না,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলটা ছিল কাঠের। আমরা সে পুলের ওপর কত যে বসে থেকেছি, কল্পনার আঁক কষেছি, কিছুই লুকোব না, বয়োঃসন্ধিক্ষণে সে পুলের ওপর একা একা যখন বসে থেকেছি, তখন আমারও কাঁদতে ইচ্ছে করেছে। তো, এই লেখক হৃদয়ে চিরস্থায়ী হবে না তো, কে হবে ?

অচিনপুর-এর গ্রামের মতো আমার নানাবাড়িতেও আশ্বিন মাসে সাজ সাজ রব পড়ে যেত নাটক নিয়ে। প্রতি বছরই নিয়মিত নাটক হতো। সেখানেও ড্রপসিনে ভেসে উঠত কত ছবি। এখনো চোখে ভেসে ওঠে একটা পথ। দু'পাশে ফসলের মাঠ, শেষ বিকেলের কমলা আলোয় কেমন মায়াময় হয়ে উঠেছে, মাঝখান দিয়ে একটা রাঙা মাটির পথ, পথটা এঁকেবেঁকে ছোট হতে হতে হারিয়ে গেছে গ্রামের দিগন্ত রেখায়, আর সেই নির্জন পথ দিয়ে সেই হারিয়ে যাওয়া পথে হেঁটে যাচ্ছে একটি মেয়ে, রূপসী মেয়ে...ড্রপসিনের এই ছবিটা যখন স্টেজে ভেসে উঠেছিল, নেপথ্যে বাজছিল শচিন কর্তার গান, বাঁশি শুনে আর কাজ নেই, আমার ডাকাতিয়া বাঁশি...অনেক অনেকক্ষণ ছবিটা স্টেজে স্থির ছিল, তারপর শুরু হয়ে গিয়েছিল নাটক। কত বাদশা মিয়ার প্রাদুর্ভাব!

আশ্চর্য চরিত্র এই বাদশা মামা। অভিনয়ের স্বপ্ন তার, সর্বাঙ্গ জুড়ে শিল্পের জ্বর। ছোটভাই নবু মিয়া আর ভাগ্নে রঞ্জুকে যাত্রার পাঠ শুনিয়ে বেড়ায়। তা, অভিনয়টা সে নিছক মন্দ করল না গ্রামের বার্ষিক নাটক 'হিরণ্য রাজা'য়। আর, এই নাটকটিই তার জীবনের তথা এই উপন্যাসের এক টার্নিং পয়েন্ট। কারণ, 'সে রাতে নাটক দেখে সবাই বাদশা মামার ওপর মহা প্রসন্ন ছিলেন। বাড়ি এসে দেখেন, ফুলের মতো একটি মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাদশার সঙ্গে এর বিয়ে হলে কেমন হয় ? এই ভাবনা চকিতে খেলে গেল সবার মাথায়। এলাচি স্থায়ীভাবে নানাবাড়িতে উঠে এলেন। নাম হয়ে গেল লালবউ, আমি ডাকতাম লাল মামি, নবু মামা ডাকত লাল ভাবি। টকটকে বর্ণ, পাকা ডালিমের মতো গাল। আর কী নামেই-বা ডাকা যায় ? নবু মামা এবং আমি দুজনে একইসঙ্গে লাল মামির প্রেমে পড়ে গেলাম। সদা ঘুরঘুর করি, একটু যদি ফুট-ফরমাস করতে দেন এই আশায়...' এরপর উপন্যাসের গতিধারা নদীর স্রোতের মতোই বয়ে চলল। বাদশা মামা আর লাল বউ মূল চরিত্র হলেও, ওদের সঙ্গে মহাকালের অংশ হয়ে উঠল নবু মামা, উপন্যাসের কথক রঞ্জু, নানাজান, সফুরা খালা, নানিজান।

AMARBOI.COM

উপন্যাসের মধ্যে একজন সৎ সমালোচক সবসময়ই খোঁজেন চরিত্রটা পরিপূর্ণতা পেল কিনা, পরিব্যাপ্ত হলো কি না। এখানেই হুমায়ূন আহমেদের বিশাল শক্তির পরিচয় যে, একটি ছোট পরিসরের উপন্যাসেও তিনি প্রতিটি চরিত্রের প্রতি সমান যত্ন নিতে জানেন, গভীর থেকে তুলে আনতে পারেন সে চরিত্রের অন্তর্সত্তা, ভেতরের মর্মমূল। সেজন্যে তিনি যে সব সময় ডিটেইলস বর্ণনায় যান, এমন নয়, মাঝে মাঝে তুলির আঁচড় বুলিয়েও নিপুণ দক্ষতায় সর্বসত্তাকে তুলে আনেন। নানাজানের কথাই বলি, "কিছু কিছু মানুষ ভাগ্যকে নিজের হাতে গড়ে, আবার কারও কারও কাছে ভাগ্য আপনি এসে ধরা দেয়। নানাজান এ দুটির কোনোটির মধ্যেই পড়েন না। পূর্বপুরুষের গড়ে-যাওয়া সম্পদ ও সম্মানে লালিত হয়েছেন। কিন্তু অসংযমী হন নি। অহংকার ছিল খুব, সে-অহংকার প্রকাশ পেত বিনয়ে। হয়তো কোন আত্মীয়-কুটুম্ব এসেছে বেড়াতে, নানাজান ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বারবার বলছেন, 'গরিবের ঘরে এসেছেন, কী দিয়ে খেদমত করি, বড়ো সরমিন্দায় পড়লাম, বড়ো কষ্ট হল আপনার। ওরে তামুক আন, আর খাসি ধর দেখি একটা ভালো দেখে।' যিনি এসেছেন আয়োজনের বাহুল্য দেখে লজ্জায় পড়ে যেতেন।" ক্ষমতাবান এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটি কিছুটা নিঃসঙ্গও বটে। বাইরে ক্ষমতাবান আর ভেতরে ভেতরে নিঃসঙ্গ এ মানুষটি যেমন উপন্যাসে সঠিক পরিণতি পেয়েছেন, তেমনি বাদশা মামা, নবু মামা, লাল বউ, রঞ্জু, সফুরা খালাও সর্বাঙ্গীণ সার্থকভাবে অঙ্কিত হয়ে উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ, ঘাতপ্রতিঘাত অভিঘাত তৈরিতে সঞ্চারিত থেকেছে।

হুমায়ূন আহমেদের পরিমিতিবোধ যে কতটা সূক্ষ্ম ও নিক্তির মাপে পরিশুদ্ধ সে ক্ষমতা তার সাহিত্যের প্রতিটি কর্মেই পাওয়া যায়, যা এতটাই শিল্পিত মাত্রা অর্জন করেছে যে, পাঠক সে রসে গভীরভাবে জারিত হয়ে পড়েন। চরিত্রগুলোও সে কারণে বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে। অনেকেই হুমায়ূন আহমেদের কিছু চরিত্র নিয়ে বলেন যে, তারা যেন কিছুটা ভিন্ন জগতের মানুষ। তা হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঠিক আছে। যেমন, মিসির আলি, হিমু, শুভরা। চরিত্রগুলো সেভাবেই নির্মিত, উপন্যাসগুলোর মধ্যেও হয়তো সে ধরনের কিছু চরিত্র এসেছে, সেটাও ওই প্লটের প্রয়োজনে, উদাহরণস্বরূপ যেমন এ মুহূর্তে *নি* উপন্যাসটির কথা মনে পড়ছে। সেটাও তার ব্যতিক্রমী একটি ধারা। কিন্তু এই ব্যতিক্রম বাদে যা বলছিলাম, পরিমিতিবোধের পরিমাপে হুমায়ূনের চরিত্রগুলো পাঠকের মননে জারিত হয়ে যায়। এ উপন্যাসের বাদশা মিয়ার কথাই যদি বলি, লেখকের আশ্চর্য পরিমিতিবোধের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। বাদশা মিয়ার শারীরিক অক্ষমতার কথা লেখক একবারও আমাদেরকে বলেন নি, বরঞ্চ প্রথম থেকেই আমরা তাকে বেশি নায়কোচিত স্বভাবের বলেই জানতে থাকি। কিন্তু ধীরে ধীরে পারিপার্শ্বিক ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে উন্মোচিত হতে থাকে তার চরিত্রের স্বরূপ। একইভাবে লেখক কোথাও বলেন নি বাদশা মামার শারীরিক অসামর্থ্যের কারণে লাল বউয়ের মধ্যে কোনো অতৃপ্তিবোধের জন্ম আছে। কিন্তু আমরা দেখি, অনেকটা প্রাকৃতিকভাবেই যেন নবু মামার সঙ্গে লাল বউয়ের আচরণ এবং কথোপকথন—এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নবু মামার সঙ্গে যে লাল বউয়ের সম্পর্কটা শারীরিক পর্যায়ে গড়াল, সেটার জন্য তখন আর কাউকেও দায়ী করা গেল না। নবু মামার হাত ধরে লাল বউয়ের বেরিয়ে যাওয়াটা, বাদশা মামার করুণ পরিণতি—সবই যেন নিয়তি নির্ধারিত, এসবই অনিবার্য ছিল, এসব এড়ানো যেত না। এমনভাবেই গল্পের বুনুনিটা শক্ত হাতে গেঁথে দিয়েছেন হুমায়ূন আহমেদ। *অচিনপুর* উপন্যাসটি তাই শুধু কয়েকজন মানুষের অচিন ভুবনের জটিল ছবি হয়ে থাকে নি, এই পৃথিবী নামক গ্রহে যে আমাদেরকে কত রকমের অচিন আনন্দ অচিন বেদনার স্বাদ কিংবা বিস্বাদ নিতে হয়, তার যেন এক পটচিত্রও।

তোমাকে উপন্যাসে নিলু-রাত্রি-সেতারার মা অবশেষে ফিরে এসেছিল, মৃত্যুপথযাত্রী ওর বাবার শিয়রে। *অচিনপুর*-এও লাল বউকে ফিরিয়ে এনেছেন লেখক, তার কোলে একটা বাচ্চা। বাদশা মামা একটি বারও প্রশ্ন করলেন না বাচ্চাটার অস্তিত্ব নিয়ে। বরঞ্চ বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে আপন ভুবনের অচেনা আনন্দে মেতে রইলেন। এই যে নিলু-রাত্রি-সেতারার মাকে ফিরিয়ে আনা, লাল বউকে ফিরিয়ে আনা, এ যেন জীবনের জন্য হুমায়ূন আহমেদের এক নতুন দর্শন, আধুনিক এই জীবনপ্রবাহ যতই ভাঙন দিক ক্ষরণ আনুক ক্ষতি করুক, তার সব হলাহলটুকু নিয়েও জীবনকে আঁকড়ে থাকব, সমর্পিত থাকব প্রত্যাশার কাছে। বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্নে *বিষবৃক্ষে* বঙ্কিমচন্দ্র রোহিনীকে মেরে ফেলেছিলেন, আর হুমায়ূন আহমেদ লাল বউকে সন্তানসহ পরম আদরে ঠাঁই দিলেন তার স্বামী বাদশা মামার কাছে। এটাই যুগধর্ম, জীবনের অনন্ত প্রবাহমানতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদ : শূন্যতার শিক্ষা

হামীম কামরুল হক

হুমায়ূন আহমেদ বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক—সর্বত্র একথাটা খুব জোর দিয়ে বলা হচ্ছে, কিন্তু কোনোখানেই খুব জোর দিয়ে বলা হচ্ছে না যে হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত লেখক; যে বয়সটা থেকে লিখতে শুরু করেছিলেন, সেই লেখার শুরু থেকে তিনি তার প্রধান পরিচয় হিসেবে লেখক পরিচয়টাকেই বড় করে দেখতেন—সে কথাটি। কোথাও খুব জোর দিয়ে বলা হচ্ছে না—তিনি ছিলেন সাম্প্রতিক বাংলাদেশের সাহিত্যে 'একমাত্র ২৪ ঘণ্টার লেখক'।

কারও কারও মনে পড়বে যে, ১৯৮৬ সালে *দিশা* পত্রিকায় দেওয়া তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারে হুমায়ূন আহমেদের কাছে শাকুর মজিদের একটি প্রশ্ন ছিল, 'নিজের কাছে আপনার পরিচয়, একজন লেখক, নাকি শিক্ষক?'

তাঁর সংক্ষিপ্ত জবাব ছিল, 'লেখক।'

শাকুর মজিদ হুমায়ূন আহমেদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার পাশাপাশি তাঁর মা এবং তৎকালে তার স্ত্রী গুলতেকিন আহমেদের সাক্ষাৎকারও নিয়েছিলেন। গুলতেকিনের কাছেও জানতে চেয়েছিলেন, 'আপনার চোখে হুমায়ূন আহমেদকে কী মনে হয়— একজন অধ্যাপক, নাকি লেখক?' গুলতেকিনের জবাব ছিল, 'লেখকটাই বেশি।' তো তিনি নিজেরই এই পরিচয়টিকে এতটাই অমোঘ করে তুলেছিলেন, এতটাই নিশ্চিত করে তুলেছিলেন, নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে এতটাই দ্বিধামুক্ত হতে পেরেছিলেন যে একপর্যায়ে অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে তিনি ২৪ ঘণ্টার লেখকবৃত্তি বেছে নিয়েছিলেন। এখন বলতে দ্বিধা নেই বাংলাদেশের সব লেখকের ভেতরে কেউ আর নিজের ২৪ ঘণ্টার লেখকত্ব ধরে রাখতে পারেন নি। দুয়েকজন যাঁরা সেটি ধরে রাখতে পারতেন, তাঁরা লেখার চেয়ে অন্য অনেক কিছুতে নিজেদের ব্যস্ত করে তুলেছেন, তুলে হরদম রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক ফায়দা লুটেছেন। হুমায়ূন আহমেদ সেদিক থেকে সভা-সমিতিতে সভাপতি হতে যান নি, পুরস্কার পাওয়া ও দেওয়ার কমিটিতে ঢুকতে চান নি, সুন্দরী প্রতিযোগিতার বিচারক হওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকেন নি, (যদিও তাঁকে খুদে গানরাজ প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে কিছুদিন ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল। সেটি তিনি কেন করেছিলেন, নিজেই সে ব্যাপারে লিখে গেছেন, আগ্রহী পাঠক তার 'আমি' গ্রন্থ থেকে সেটি পড়ে নিতে পারেন)।

নিজেকে তিনি সবসময় সাধারণ এবং 'সস্তা লেখক', 'বাজারে লেখক' হিসেবে অবলীলায় আখ্যায়িত করেছেন, এমনকি বলেছেন 'অন্যপ্রকাশের পোষা লেখক'। নিজের সম্পর্কে এই সোজা স্বীকারোক্তি করার সাহস বাংলাদেশের খুব কম লেখকই রাখেন।

হুমায়ূন আহমেদ তা রাখতেন। লেখা তাঁর কাছে তাঁর মতো করে জীবনের উদ্‌যাপন ছিল, তাঁর মতো করে সাহসেরও উদ্‌যাপন ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যুর পরপরই তাঁর জনপ্রিয়তাটিকেই কেবল মূল্যায়ন করা হচ্ছে, সেটিকেই বড় করে দেখা হচ্ছে, দেখানোও হচ্ছে, কিন্তু তিনি লেখার জন্য কী পরিমাণ শ্রম দিয়েছেন, কীভাবে তিনি লেখালেখির কাজটি শিখেছেন, লেখক হিসেবে কীভাবে দিনযাপন করেছেন, দেশ ও বিশ্বসংস্কৃতির পাঠ নিয়েছেন কীভাবে সেসব আড়ালেই থেকে গেছে, কিন্তু এর কোনোটাই হুমায়ূন আহমেদের নিজের লেখায় আড়ালে থাকে নি। তাঁর নানান আত্মজৈবনিক লেখা থেকে সহজেই যে কেউ এইসব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।

হিসাব করে দেখা গেছে, তিনি প্রায় ৩২২টি, মতান্তরে ৩৬৮টি বই লিখেছেন। জানা গেছে, তিনি প্রায় প্রতিদিন গড়ে ২০ পৃষ্ঠা করে লিখতেন। প্রতিদিন গড়ে কুড়ি পৃষ্ঠা মানে হাতের লেখায় বোধ করি কম করে হলেও ১০ হাজার শব্দ করে লিখতেন, যদি ৫ হাজার এমনকি ১ হাজার করেও লেখা হয়, তাহলে বাংলাদেশে কয়কজন লেখক প্রতিদিন এই পরিমাণ লেখেন যদি গোনা হয় তাতে কারও হাতের আঙুলের কররেখা দ্বিতীয় আঙুলে পৌঁছাবে কি না সন্দেহ। আরও বড় কথা হলো তিনি যখন লিখতে বসতেন, তাঁকে হাতি দিয়েও টেনে ওঠানো সম্ভব ছিল না। বর্তমান লেখক এই তথ্যটিও হুমায়ূনের নিজের স্বীকারোক্তি থেকেই নিয়েছেন। এই যে হাতি দিয়ে টেনে তুলতে না পারা, তার মানে একজন লেখকের লেখার জোর বা লেখার প্রতি নিবিষ্টতা কতখানি প্রচণ্ড ছিল সেটি তাঁর এই উক্তি থেকে বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ এবং জীবনানন্দ দাশের নানান প্রবণতা তাঁর লেখার ভেতরে এসেছে। কিন্তু খুব খুঁটিয়ে করে লক্ষ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট বুঝা যায় হুমায়ূন আহমেদের লেখার পেছনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছেন যে লেখক তাঁর নাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাক্য গঠন থেকে শুরু করে জীবনকে তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে মানিকের লেখা তাঁকে পথ দেখিয়েছে। তিনি মানিককে নিজের গুরু হিসেবেই সরাসরি স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন তাঁর একটি প্রবন্ধে। যেকেউ পাঠক তার *আমি* গ্রন্থ থেকে দেখে নিতে পারেন।

জন স্টেইনব্যাকের মতো লেখকও তাঁর প্রিয় ছিলেন। হতদরিদ্র, ভবঘুরে ও অনিশ্চিত জীবনের অধিকারী যে মানুষেরা তাঁর লেখায় এসেছেন এটা বোধ করি মানিকের পাশাপাশি স্টেইনব্যাকেরও প্রভাবজাত হতে পারে। প্রথম দিকের লেখায় সোমেন চন্দের নিম্নমধ্যবিত্তদের নিয়ে গল্প লেখার প্রেরণা ছিল। অবশ্য এ সম্পর্কে বর্তমানে সবাই কমবেশি অবহিত। যেটি আড়ালে পড়ে যাচ্ছে তাহলো তাঁর লেখক হিসেবে বেড়ে ওঠা ও লেখক হিসেবে জীবনযাপন করার বিষয়টি। আমেরিকার যাপিত সময় হুমায়ূন আহমেদকে সেই দৃষ্টি দিয়েছিল, একসময় যে দৃষ্টির জন্য আমেরিকা কি লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার লেখক হতে চাওয়া মানুষেরা ইউরোপীয় জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আসতেন। আলেহো কার্পেন্তিয়ের-এর মতো লেখক, বা বোর্হেসের মতো লেখক ইউরোপীয় জীবনপাঠে নিজেদের ঋদ্ধ করেছেন। সুদানের বিখ্যাত লেখক তায়েব সালেহ গুটিকয়েক লেখা লিখে বিশ্বসাহিত্যের পাঠককে মুগ্ধ করে রেখেছেন, সেদিক থেকে বিচার করলে হুমায়ূন আহমেদের সেই জায়গায় শূন্যতা চোখে পড়ে; কিন্তু তিনি বরাবরই বলেছেন, তিনি অমরবৃন্দের কেউ নন, তিনি একেবারেই সাধারণ লেখক, লিখে তাকে বাঁচতে হয়, ফলে প্রকাশকের প্রতি পাঠকের প্রতি একটি দায় পালন করতে হয় তা হলো লেখার যোগান দেওয়া। যদিও বহুবার বলেছেন, তিনি লেখেন নিজের আনন্দের জন্য, অন্য কিছুর প্রতি তাঁর তেমন দায় নেই, কিন্তু দায় কি ছিল না? ছিল বলেই দেশের নানান সঙ্কটে তিনি দৃঢ়ভাবে তার বক্তব্য প্রদান করতে দ্বিধা করেন নি, রাজনীতির নামে দেশে যা চলে তা নিয়ে বহু রচনায় ও রচনাংশে তীব্র শ্লেষ হেনেছেন। কিন্তু তাঁর সেই আহ্বান যারা এদেশের মাথা তারা খুব একটা আমলে নেন নি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর যারা হুমায়ূন আহমেদকে সস্তা জনপ্রিয় ধারার লেখক মনে করতেন তাদের মনে হয়েছে, বাজারে বারনারীরা যেমন অনেক সত্য ও কঠিন কথা বলে, কিন্তু সেকথার কোনো মূল্য নেই—সেই রকম কিছু। তিনি সাহিত্যের নামে সাহিত্যকে 'বাজারে' করে তুলেছেন এই আপত্তি যারা করেন, তারা মনে রাখেন কি তারাশঙ্কর, সমরেশ বসুর মতো লেখকের কথা ? বারবার শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার সঙ্গে হুমায়ূন আহমেদের তুলনা করা হচ্ছে, কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখতে গেলে হুমায়ূন আহমেদ জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে এতটাই অদ্বিতীয় যে এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে কারও তুলনাই চলে না।

আরও একটি বড় ব্যাপার হলো হুমায়ূন আহমেদের লেখা পড়ামাত্রই চেনা যায়। বর্ণনাভঙ্গি, চরিত্র নির্মাণ, পরিস্থিতি নির্মাণ, সংলাপে তিনি এমন এক শৈলীর উদ্ভাবনকারী যা বোধ করি বাংলাসাহিত্যে অদ্বিতীয়। মজার ব্যাপার হলো এসব তিনি নিয়েছেন, তিনি যে অঞ্চলের মানুষ সেই নেত্রকোনা ও বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের মানুষের কথনভঙ্গি থেকে। বিশেষ করে তাঁর কৌতুকপ্রিয়তার যে ভঙ্গি—এটি এতই স্বতন্ত্র-চিহ্নিত যে, কারও কাছে কোনো ঘটনার কারণ জানতে চাইলে, 'সে একটা বিরাট ইতিহাস', কোনো লেখক ইউনিক, সেটি তিনি দেখাচ্ছেন, 'তার মতো মানুষ আল্লাহর আমলে নাই', 'শইলডা ভালা', 'মনডা ভালা'-র মতো সংলাপের ক্ষেত্রে তিনি যেটি করেন প্রতি সংলাপ তৈরি, যে বলাই যায়, কিন্তু বলা হয় না, বলতে একরকম তর্কের সৃষ্টি হয় হুমায়ূন আহমেদ সেই সংলাপ এমনভাবে হাজির করেন তা একইসঙ্গে কাঙ্ক্ষিত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত। ফলে কোনো বইয়ের মলাট ছিঁড়ে ফেলে, তার প্রথম দিকের যে পৃষ্ঠাগুলোতে বইয়ের নামমাত্র, লেখকের নাম, প্রকাশকের নাম মানে যে প্রিন্টার্স লাইন উল্লিখিত সেই পাতাগুলো বাদ দিয়েও কাউকে তাঁর বই পড়তে দিলেও সে বই যে হুমায়ূন আহমেদের বই সেটি বুঝে নিতে কষ্ট হবে না। রূপা, নীলু, মন্টু, মিসির আলি, হিমু, শুভ্রর মতো চরিত্রগুলোকে এমন জীবন্ত করে দিয়েছেন, যে এখান থেকে হুমায়ূন আহমেদের শক্তির বড় একটা দিক শনাক্ত করা যেতে পারে। শনাক্ত করা যেতে পারে শিশুদের জন্য লেখাগুলো থেকেও। সাইন্স ফিকশন, ভৌতিক ও অতিপ্রকৃত লেখাগুলো তাঁর মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর চেয়ে কিছু আলাদাই বলা যায়, সেখানে তাঁর আরেকরকমের বুদ্ধির দীপ্তি অনুভব না করে পারা যায় না।

আর মূল্যায়নের আরও একটি প্রশ্ন থেকে যায়, হুমায়ূনের সাহিত্যকে আমরা কীভাবে বুঝতে পারব ? ৩২২ বা ৩০০টা বই পড়াই তাঁকে বোঝার উপায় ? তাঁর আত্মজৈবনিক লেখাগুলো, তাঁর মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস, মিসির আলি, হিমু, শুভ্র প্রভৃতি চরিত্রকে নিয়ে লেখা বইগুলো থেকে তাঁকে অপেক্ষাকৃত সহজে চেনা যেতে পারে।

আর হুমায়ূন আহমেদের সেরা লেখা ? বোধ করি অনেকেই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে তাঁর ছোটগল্পই হলো সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের সেরা কীর্তি। সেলিম আল দীনকে প্রশ্ন করেছিলাম, শরৎচন্দ্র আপনাকে কী দিয়েছেন ? তিনি বলেছিলেন, অনুভূতি, মানুষ সম্পর্কে অনুভূতি, দেখা ও অনুভব করার চোখ; হুমায়ূন আহমেদ থেকেও সেই মানুষের প্রতি, জীবনের প্রতি ভালোবাসা, একইসঙ্গে জীবনের ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতাগুলোকে চিনে নেওয়ার নতুন একটি চোখ তিনি সৃষ্টি করে যেতে পেরেছেন।

হুমায়ূন আহমেদকে এখনই মূল্যায়ন করা মানে অনেকটা তাৎক্ষণিক মূল্যায়নের মতো হয়ে যায়। যেমনটা তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনে বুকের ভেতর ধক করে উঠেছিল আর আমার দিনপঞ্জিতে লিখেছিলাম তাৎক্ষণিক অনুভূতির কথা, তেমন কিছু। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ ছিল প্রতিটি জাতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে, কেবল তাই নয় সপ্তাহ পার হয়ে মাস শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ-বিষয়ক সংবাদ ও নানান প্রতিবেদন বোধ করি এখনো থেমে নেই। তাঁর মৃত্যুর সংবাদে আমি আমার প্রতিদিনের দিনপঞ্জিতে যে কথাগুলো লিখেছিলাম, 'হুমায়ূন আহমেদ চলে গেছেন। সত্যিই আরেকটি যুগের অবসান হলো। (কারণ লিখতে শুরু করার পর বা) নব্বইয়ের প্রজন্মের বলতে গেলে সবাই মনে মনে প্রথম দিকে হুমায়ূন আহমেদ হওয়ার স্বপ্ন দেখত, যেভাবে বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিকরা স্বপ্ন দেখতেন শরৎচন্দ্র হওয়ার। তারা শরৎচন্দ্রের চেয়ে বড় লেখক হয়েছিলেন। হুমায়ূন আহমেদের চেয়েও তাহলে সবদিক থেকে বড় লেখক হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হলো এবং তিনিই তা তৈরি করে দিয়ে গেছেন। একজন লেখককে ঘিরে এমন বিকাশ আগামীতে সম্পন্ন হতে যাচ্ছে—এজন্য হুমায়ূন আহমেদের গুরুত্ব অনেক।'

২

তিনি আগে সাহিত্যিক, পরে তিনি নাটক-রচয়িতা এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা। *নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগারের* মতো 'পড়তে গেলে গলা ধরে আসা'-র মতো লেখা, মাত্র চারটি ক্ষীণকায় উপন্যাস লিখে অতিঅল্প বয়সে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়েছিলেন যে লেখক তিনি যখন টিভি-নাটক রচনা ও চলচ্চিত্র নির্মাণ করলেন সেগুলোকে তাঁর লেখারই আরেক রকমের সম্প্রসারণ বলেই মনে হয়। সেখানে তার কাহিনির সেই ছক, সংলাপের সেই প্রতি-সংলাপ (অ্যান্টি-ডায়ালগ), একইভাবে বিদ্যমান। একটি নাটকে আলী যাকের মামার ভূমিকায়, তিনি ভালোবাসা নিয়ে গবেষণা করছেন, বিভিন্ন জনকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করছেন যে, সেই ব্যক্তি ভালোবাসা বলতে কী বোঝেন। এরকম একপর্যায়ে তিনি বাড়ির কাজের লোক কাদেরকেও জিজ্ঞাসা করেন, 'আচ্ছা কাদের বলত তুই ভালোবাসা বলতে কী বুঝিস?' কাদের একটু চিন্তা করে বলে, 'মামা ভালোবাসা একটা শরমের ব্যাপার মামা।' এই দৃশ্যটি যারা দেখেছেন তারা সেখানে না হেসে নিশ্চয় পারেন নি, কিন্তু ভালোবাসা যে শরমের ব্যাপার—অতি সহজভাবে কত গভীর দিকটি হুমায়ূন হাজির করতে পারেন তারই একটি দৃষ্টান্ত। হুমায়ূন আহমেদের লেখায় বলে দর্শন নেই, জীবন সম্পর্কে মন্তব্য নেই—অনেকেই এমন অভিযোগ করেন, কিন্তু দেখা যাবে তার যদি কোনো দর্শন থাকে তো সেটি হলো 'মানুষকে ভালোবাসা'। রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো'—হুমায়ূন আহমেদের লেখা বলি, টিভি-নাটক রচনা বলি বা চলচ্চিত্র বলি, সেই ভালোবাসা, সেই করুণাধারায় যাওয়ারই পথ সন্ধানী এবং তিনি কতটুকু সফল হয়েছেন সেটি সিনেমা নিয়ে সূক্ষ্মদর্শীরা আরও তীক্ষ্ণভাবে বিচার করতে পারবেন। তাঁর ক্যামেরার কাজ, লেন্সের কী সব ব্যাপার থাকে, সে সব, আরও আরও দিক নিয়ে তার চলচ্চিত্রকে কেউ খারিজও করে দিতে পারেন, কিন্তু তাঁর লেখার ভেতরে যে শৈলী, যে শৈলীতে তাঁর লেখা পড়ামাত্র বোঝা যায় যে, এটি তাঁর লেখা; তিনি তাঁর নাটকে ও চলচ্চিত্রে এমন কিছু চরিত্র ও তাতে রূপদানকারীদের বেছে নিয়েছিলেন, যে তাঁর ছবির যে-কোনো অংশ দেখেই বলে দিতে কষ্ট হয় না যে এটা তাঁর চলচ্চিত্র। 'দুই দুয়ারী' চলচ্চিত্রে, গৃহশিক্ষককে গৃহকর্ত্রী ডেকেছেন, এ খবর তাকে দিতে এসে গৃহশিক্ষককে বলা হচ্ছে, 'চাচাজান আপনাকে আম্মা ডাকেন।' গৃহশিক্ষক বললেন, 'তোমাকে না বলেছি আমাকে চাচাজান বলবে না।' তখন বলা হলো, 'খালুজান আপনাকে আম্মা ডাকেন।' গৃহশিক্ষক আবার বললেন, 'তোমাকে না বলেছি আমাকে খালুজান বলবে না। স্যার বলবে।' তখন তাকে বলা হলো, 'স্যার আপনাকে আম্মাজান ডাকেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদের সংলাপ নির্মাণেই এই অতি সাধারণ রসবোধটাই অসাধারণ বলে মনে হয়। আমরা আমাদের আন্তরিক সম্মানবোধ সম্বোধনের চেয়ে ঔপনিবেশিক প্রভুদের শিখিয়ে 'স্যার' শব্দটিকে বেশি পছন্দ করি এই সংলাপে তারই প্রমাণ। নানান রকমের ভাবুক, দার্শনিক চরিত্র, ভবঘুরেরা তাঁর টিভি-নাটকে ও চলচ্চিত্রে অবিরল হাজির হয়। তাদের আচরণ কথাবার্তা অতীব কৌতুকপ্রদ, কিন্তু কৌতুকের আড়ালে করুণা, কোথাও তীব্র শ্লেষ অনেকক্ষেত্রেই আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। 'অয়োময়ে'র মতো টিভি-নাটকে ও 'চন্দ্রকথা'র মতো চলচ্চিত্রে সামন্তবাদী নির্মমতা ও সামন্তবাদের ধ্বংস ও ক্ষয় তিনি যেভাবে দেখিয়েছেন তা স্মরণীয়। তাঁর চলচ্চিত্র মূলত কাহিনিচিত্র, চলচ্চিত্রের যে ভাষা, যে কারণে কাহিনিচিত্র চলচ্চিত্র থেকে আলাদা হয়ে যায়, সেদিক থেকে মনে হয় তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোকে দেখা যেতে পারে। কিন্তু এ সত্য স্বীকার না করে পারা যায় না যে চলচ্চিত্রেও তিনি তাঁর বিশেষ ভঙ্গিটি বজায় রাখতে পেরেছেন, সেই কৌতুক, জীবন সম্পর্কে উন্মাদনা, প্রতিটি মানুষের ভেতরে যে পাগল বাস করে যে-পাগল কোনো মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়া পাগল নয়, যে পাগল জীবনের পাগল (যেমনটা সৈয়দ শামসুল হক বলেছেন) হুমায়ূন আহমেদ সেই জীবনের পাগলদের তাঁর সাহিত্যের মতো, টিভি-নাটকের মতো তাঁর চলচ্চিত্রেও হাজির করেছেন। তাঁর সেই উন্মাদনায় গোটা দেশের মানুষ একসময় পাগলামি করেছে, বাকের ভাইয়ের যাতে ফাঁসি না হয় এ নিয়ে মিছিল মিটিং হয়েছে—এসবের মাধ্যমে মনে হয়, তিনি তাঁর টিভি-নাটক ও চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের সেই ভেতরকার উন্মাদনা, তা যতই তুচ্ছ কি নগণ্য হোক, সেটিকে স্পর্শ করেছেন।

AMARBOI.COM

৩

সাহিত্যের ইতিহাস বলতে আমাদের গুলিয়ে ফেলার একটা সম্ভাবনা থাকে, আমরা প্রায় ক্ষেত্রে বিশ্বসাহিত্যের কথা বাদ দিয়ে চিন্তা করি, তাতে করে আমাদের বাংলাসাহিত্যের লেখকরা প্রায় ক্ষেত্রে কোথাও অতিমূল্যায়িত, কোথাও অবমূল্যায়িত, কোথাও বা মূল্যায়নহীন হয়ে থাকেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মতো লেখকের মূল্যায়ন কি আমরা যথাযথভাবে করতে পেরেছি? মাহমুদুল হক, শহীদুল জহিরের মতো লেখকের মূল্যায়ন কি আমরা সে অর্থে করতে পেরেছি? অনেক ক্ষেত্রে আমাদেরকে কূপমণ্ডূকতা পেয়ে বসে। পৃথিবীতে কী ধরনের লেখা হয়েছে, বা হচ্ছে সে সম্পর্কে আমাদের জানাশোনার গণ্ডি এই ইন্টারনেটের যুগেও তেমন বাড়ে নি। এখনকার ইউরোপ-আমেরিকা, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকায় কেমন লেখা হচ্ছে তা তো দূরের কথা, আমাদের পার্শ্ববর্তী মায়ানমার, কি এতবড় ভারতে বিভিন্ন ভাষায় কী ধরনের সাহিত্য হচ্ছে সে সম্পর্কে জানার আগ্রহও আমাদের জোরদার নয়। ফলে আমাদের বাংলাদেশের হুমায়ূন আহমেদ কেবল বাংলাদেশের গণ্ডিতে সর্বতোভাবে আটকে পড়া লেখক। তাঁকে দেখতে হলে তার বাংলাসাহিত্য ব্যতিরেকে উপায় নেই। সেই বিচারে আগেই বলা হয়েছে তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র গদ্যভঙ্গির উদ্ভাবক, কৌতুক রসের এমন এক নির্মাতা যে তাঁর মতো করে কিছু বলা মানেই সেটি হুমায়ূনী-ভঙ্গি হিসেবে সহজেই ধরা পড়ে যাবে। আমাদের সংগীতের ধারায় যেমন রামপ্রসাদী, অতুলপ্রসাদী, লালনের গান বা রবীন্দ্রসংগীত যে নতুন করে রচনা করা সম্ভব নয়, সাহিত্যের কৌতুক সৃষ্টির যে বিশিষ্ট ভঙ্গি হুমায়ূন আহমেদ উদ্ভাবন করেছেন, সেটিই আর সৃষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা সম্ভব নয়। তিনি তো মূলত উপন্যাস ও ছোটগল্পই রচনা করেছেন, সেদিক থেকে বিচার করলে তাঁর ছোটগল্প বাদ দিয়ে অন্তত বাংলাদেশের সাহিত্যের ছোটগল্পের ইতিহাস লেখাটা ভুল হবে সেটি জোর দিয়ে বলা যেতে পারে।

৪

তাঁর ব্যক্তিজীবন কি তাঁর লেখালেখির জীবনকে বাদ দিয়ে মূল্যায়ন করা সম্ভব ? যে-লোকটি নিজেকে ২৪ ঘণ্টার লেখকে পরিণত করেছিলেন, সেটি বাদ দিয়ে তাকে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না। তবে কেন জানি মনে হয়, তিনি মানুষ হিসেবে ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে ছিলেন না, অনেক দুর্বলতা তাঁর ছিল, নিজেই সেসব অকপটে স্বীকারও করে গেছেন, কিন্তু তিনি একজন লেখক হিসেবে আরেকটু ক্ষমার দাবিদার ছিলেন, সে ক্ষমা তাঁকে জীবিতকালে কেউ করে নি। ব্যক্তিজীবনে একজন জীবনমুগ্ধ, রূপমুগ্ধমানুষ হিসেবে তিনি তাঁর প্রাপ্ত ক্ষমাটি পেলে মনে হয় আরও অনেকদিন বাঁচতেন, আমাদের জাতীয় রাজনীতির যে স্পর্শকাতর জায়গায় তিনি হাত দেওয়া শুরু করেছিলেন, তেমন কিছু কাজ আমরা পেতাম। অথচ তিনি নিজে অনেক কিছু ক্ষমা করেছেন, উপেক্ষা করেছেন, কিন্তু তাঁকে কেউ ক্ষমা করেন নি। ব্যক্তিজীবনের কথা তো বলা মুশকিল, তাঁর পাঠক, প্রকাশকরা কি তাঁকে সময় দিয়ে আরও ভালো কিছু লেখা আদায় করতে পারতেন না ? কিন্তু কেউ তাঁকে সময় দেন নি বলেই বোধহয়। অবশ্য এসব কথা বলা এখন অবান্তর। তিনি যেটুকু করে গেছেন, তাঁর সেই ব্যক্তিজীবন থেকে বাঙালি লেখকদের ব্যক্তিজীবনের জন্য কিছু শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপার তো আছেই। সেদিকগুলোকে খেয়াল করার দরকার।

৫

তাঁর অনুপস্থিতি ? তিন শ'র বেশি যে-লোকটি বই লিখেছেন, তিনি কেবল অনুপস্থিত কেবল এই অর্থে যে, তিনি নতুন কোনো বই আর লিখতে পারবেন না। যে অর্থে তাঁর আগেও বেশ কিছু জনপ্রিয় লেখক কেউ বেঁচে নেই, কিন্তু তাদের কিছু বই তো এখনো খুঁজে খুঁজে লোকে পড়ে। তাতে আগের মতো হু হু করে তাদের বই বিক্রি হয় না বটে, কিন্তু ধীরে হলেও তাদের বই প্রকাশ করে প্রকাশকরা লাভবান হন।

আমাদের প্রকাশনাশিল্পের একটা বড় দিক হুমায়ূন আহমেদের দিকে ঝুঁকে ছিল, কিন্তু বইমেলায় যে বই বিক্রি হয় তাতে যে পরিমাণ বই প্রকাশিত হয়—তিন চার হাজার—তার ভেতরে হুমায়ূন আহমেদ তো লিখতেন খুব বেশি হলে ৭/৮টি বই। ফলে আর যে বই বিক্রি হয় বা হবে তারা তো হুমায়ূন আহমেদ নির্ভর প্রকাশক নন। তাঁর বই প্রকাশ করতেন ১০/১৫ জনের মতো প্রকাশক। ইউপিএল, সাহিত্য প্রকাশের মতো প্রকাশনা সংস্থা হুমায়ূন ছাড়াই তো সবদিক থেকে টিকে আছে, ক্রমে প্রসার ও বিস্তার লাভ করেছে নতুন নবীন অনেক প্রকাশক, যারা কখনো হুমায়ূন আহমেদের বই পান নি, আর তো পাবেনই না, তাঁরা কীভাবে টিকে আছেন ? একটা প্রভাব তো পড়বেই, কিন্তু সেটা বিরূপ প্রভাব না হয়ে ইতিবাচক প্রভাবের দিকেও ঘুরে যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে, তিনি নিজেই তাঁর না-থাকার ভেতর দিয়ে এমন এক পথ নির্মাণ করে গেছেন, যে পথে নতুন লেখকরা অনেক বেশি সতর্ক হবেন—কী সাহিত্যচর্চায় কী জীবনচর্চায়।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়নের মাঝখানে নিয়েছে যে ঠাঁই...

হাসান হাফিজ

মৃত্যুকে নিয়ে কৌতুক করতে পারে ক'জন ? তাও আবার নিজের মরণ বিষয়ে। তেমন বুকের পাটা আছে ক'জনারই বা ? হাস্য কৌতুক, রঙ্গ ব্যঙ্গ—তা যদি হয় নিজের মৃত্যুকে নিয়ে, সে তো আরও বেশি ভয়ংকর। সেই বিরল দুঃসাহস হুমায়ূন আহমেদের মধ্যে ছিল। সেই দুঃসাহসের মাত্রা ও প্রখরতা কোনোমতেই মামুলি নয়। তাঁর ঘনিষ্ঠ স্বজনেরা, বন্ধুরা এই অধ্যায়টি সম্পর্কে কমবেশি জানেন। হুমায়ূন আহমেদের জীবনে, সৃষ্টিকর্মে মৃত্যুচিন্তা বড় একটি জায়গা দখল করে আছে। তাঁর মৃত্যুভাবনার সবটুকুই যে রচনাকর্মে প্রতিফলিত হয়েছে, এমনটা বলা যাবে না।

হুমায়ূন আহমেদ যখন এলিফ্যান্ট রোডের অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন, সে সময়কার কথা মনে পড়ে। সেই বাড়িতে একটি কফিন ছিল তাঁর। বেশ দামি, বিদেশ থেকে আমদানি করা। বড়সড় সাইজ। লালচে বার্নিশের ডালা। ভেতরটা ধবধবে সাদা। খ্রিষ্টানদের মরদেহ কফিনসমেত কবরস্থ করা হয়। হুমায়ূন ভাইয়ের কাছেই শুনেছি, ওই কফিনের ভেতরে তিনি মাঝে মাঝেই শুয়ে থাকতেন। বন্ধু বান্ধবদের তিনি এই কফিন দেখাতেন সাগ্রহে। এই অভিজ্ঞতা সবাইকে পুলকিত করত, এমনটা বলতে পারি না। কেউ কেউ নিশ্চয়ই ভয় পেতেন। মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যামসমান—বলে কফিনের ভেতর শায়িত হওয়ার ইচ্ছা সবারই জাগত না।

মরমী কবি হাছন রাজার কথা আমরা অল্পবিস্তর জানি। হাছন রাজার গানকে ব্যাপক জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল নন্দিত এই কথাশিল্পীর। হাছন রাজার বাড়িতে একবার এক বিদেশি ভদ্রলোক এসেছিলেন। সেই ভিনদেশী জানতে চেয়েছিলেন, তোমার বাড়ি কোনটা ? হাছন রাজা ওই অতিথিকে নিয়ে গিয়েছিলেন বসতভিটার অদূরে। সেখানটায় হাছন রাজার কবর তৈরি করে রাখা হয়েছিল। আগাম প্রস্তুতি। হাছন রাজা বলেছিলেন, এই দ্যাখো এটাই আমার বাড়ি। আমরা দেখব অধ্যাত্মচিন্তা হুমায়ূন আহমেদকে আচ্ছন্ন করে ছিল বেশ ভালো রকমই। তাঁর কথাশিল্পে, নাটকে, গানে সেই ছাপ অতীব স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় তাঁর লেখা মর্মস্পর্শী সেই গানের কথা—ও কারিগর দয়ার সাগর ওগো দয়াময়/চান্নি পসর রাইতে যেন আমার মরণ হয়।

উনিশ জুলাই দু'হাজার বারো খ্রিষ্টাব্দ। মাঝরাতে টিভি পর্দায় ভেসে উঠল হুমায়ূন আহমেদের প্রয়াণ সংবাদ। ঠিক ওই দিনই বিকেলবেলা অফিসে একটা বইয়ের ওপর হাত বুলোচ্ছিলাম। যুগপৎ পরমমমতা ও আশঙ্কায়। বইটির নাম 'হুমায়ূন আহমেদ : সমকালের চোখে'। আমারই সম্পাদিত বই। বেরিয়েছিল ১৯৯৫ সালে, কাকলী প্রকাশনী থেকে। হুমায়ূন ভাইয়ের তত্ত্বাবধান, সাজেশন, পেয়েছি বইটি বের করার সময়। ওই দিন ভাবছিলাম, এ গ্রন্থের নতুন এডিশন করার সময় কি এসে গেল নাকি। সত্যি সত্যি এসে গেল। হায়, এখন হুমায়ূন আহমেদকে কোথায় পাব ? কবির ভাষায় বলতে হয় : কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলছিলাম 'হুমায়ূন আহমেদ : সমকালের চোখে' বইটির কথা। সে বইয়ের শুরুর দিকে হুমায়ূন আহমেদের একটি আলোকচিত্র রয়েছে। বিখ্যাত আলোকচিত্রী চঞ্চল মাহমুদের তোলা ছবি সেটা। বই ছাপা হওয়ার আগে আগে উল্টে-পাল্টে দেখলেন তিনি। ছবির পৃষ্ঠাটায় এসে থমকে গেলেন একটু। ছবির নিচে লেখা আছে লেখকের জন্ম তারিখ। এরকমটিই নিয়ম। হুমায়ূন ভাই এ নিয়েও রসিকতা করতে ছাড়লেন না। বললেন, হাসান হাফিজ, বই তো বের করছেন, একটা কাজ করেন ভাই।

আমি : কী কাজ, বলুন।

হুমায়ূন : জন্ম তারিখের পর ড্যাশ দিয়ে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে দিন।

আমি : তার মানে ? আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন, বুঝলাম না।

হুমায়ূন : প্রশ্নবোধক চিহ্নের অর্থ হলো, এই লোক কবে মরবে ?

এ রসিকতা বড়ই নির্মম। অপ্রত্যাশিতও। আমার মুখে আর কথা জোগায় না। চুপ করে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

হুমায়ূন সিক্সটি ফোর : রিটায়ার্ড হার্ট

AMARBOI.COM

জীবদ্দশায় স্বদেশে নিজের জন্মদিনের (২০১০ খ্রিষ্টাব্দে) অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। তার পরের বছর ২০১১-তে চিকিৎসাধীন ছিলেন আমেরিকায়। লড়ছিলেন কর্কট ব্যাধির সঙ্গে। ঢাকায় অনুষ্ঠান হয়েছে যথারীতি। তবে লেখকের উপস্থিত থাকা সম্ভব হয় নি। ২০১০ সালের অনুষ্ঠানের একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করব এখানে। আমিও ছিলাম অল্পসংখ্যক বক্তার একজন। কথায় কথায় বলছিলাম ক্রিকেট খেলার কথা। আমার বক্তব্য ছিল, কোনো কোনো সময় ক্রিজে টিকে থাকাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। রান না পেলেও চলে। আপাতত টিকে যাওয়া নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। অনুষ্ঠানের শেষ দিকে হুমায়ূন ভাই তাঁর বক্তৃতায় ওই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করলেন। স্পষ্ট বললেন, রান ছাড়া আমি একদিনও টিকে থাকতে চাই না। যদ্দিন আছি, ততদিন রান করে যাব।

তিনি তাঁর কথা রেখেছেন। আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন—সেটা নিশ্চিন্তে বলা হয়। মরণব্যাধির ছোবলে ধুঁকতে ধুঁকতে যখন ক্ষয়ে আসছিল তাঁর জীবনীশক্তি, তখনো তাঁর কলম ছিল সক্রিয়, সচল। আমেরিকায় রোগ নিরাময় প্রচেষ্টাকালীন তিনি রচনা করেছেন একাধিক গ্রন্থ। তিনি যা বিশ্বাস করতেন, তাই লিখতেন। কপটতা, ভণ্ডামি ছিল না তাঁর অভিধানে। হুমায়ূন আহমেদের জীবনের যে ইতিহাস, তাতে ৬৪ রান (৬৪ বছরের জীবন, বাংলাদেশীদের গড় আয়ুর চেয়ে এক বছরের কম)—বেশি কিছু না। তারপরও স্বর্ণপ্রসূ প্রতিটি বছর। ক্রিকেটে কোনো ব্যাটসম্যান গুরুতর আহত হলে, যখন তিনি দৌড়াতে পারেন না—তখন তাকে মাঠ থেকে তুলে নেওয়া হয়। তিনি আউট হন না—তাকে বলা হয় রিটায়ার্ড হার্ট (Retired Hurt)। আমরা জননন্দিত কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদকে বলতে পারি রিটায়ার্ড হার্ট। তাঁর শরীরী মৃত্যু ঘটেছে, একথা ঠিক। কিন্তু রয়ে গেছে তাঁর কাজ, স্বপ্ন, বিপুল সৃষ্টি সম্ভার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নও ছবি নও ছবি নও শুধু ছবি

নব্বইয়ের টালমাটাল গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ের একটি প্রসঙ্গ টেনে শেষ করব এই লেখা। আমি তখন *দৈনিক বাংলায়* সিনিয়র রিপোর্টার। সাহিত্য পাতায় গুণী লেখক-শিল্পীদের সাক্ষাৎকার নিয়ে ছাপছি। 'দ্বাবিংশতি' নামে ২২ জন লেখক-শিল্পীর সাক্ষাৎকার গ্রন্থিত হয়েছে। বইটি বের করেছে আগামী প্রকাশনী। ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশ। সে বইয়ে যাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তাঁদের অনেকেই আজ প্রয়াত। হুমায়ূন ভাইও অকালে যুক্ত হলেন সেই মিছিলে।

দৈনিক বাংলা ছিল তাঁর অতি প্রিয় পত্রিকা। তাঁর বহু লেখা বেরিয়েছে *দৈনিক বাংলা* ও একই প্রতিষ্ঠানের পত্রিকা সাপ্তাহিক *বিচিত্রায়*। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ৪ জানুয়ারি *দৈনিক বাংলায়* হুমায়ূন আহমেদের সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়। মনে পড়ে, হুমায়ূন ভাই আমার অফিসে বসেই তাৎক্ষণিকভাবে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেন। বেশি সময় নেন নি। বছর তিনেক পর বই আকারে বেরোয় ২২টি সাক্ষাৎকার। হুমায়ূন ভাইকে অভিযোগের সুরে বলি, এত সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিলেন কেন? জবাবে তাঁর কণ্ঠেও পাল্টা অভিযোগ ফুটে ওঠে—তখন তো বলেন নি যে, এটা বইয়ে যাবে? বললে আরও সিরিয়াসলি উত্তর দিতাম।

সেই ক্ষুদ্র সাক্ষাৎকার এখানে কোনো পরিবর্তন ব্যতিরেকেই ছাপা হলো। এতে সেই সময়কার হুমায়ূন আহমেদের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা পাওয়া যাবে।

আমি যা বিশ্বাস করি তা-ই বলি : হুমায়ূন আহমেদ

সুন্দর, গোছানো টেবিল থাকলেও তিনি লিখতে ভালোবাসেন মেঝেতে উপুড় হয়ে। কখনো ছোট টুলের ওপরে কাগজ রেখে, কখনো টুল ছাড়াই। সঙ্গে থাকে প্রচুর আঠা। সংশোধন যেখানে দরকার, সাদা কাগজ সেঁটে তার ওপর লেখেন নতুন করে। প্রতিদিন নিয়ম করে লিখতে বসেন না। মাঝে মাঝে যখন লেখার ইচ্ছে হয়, তখন লিখে যেতে পারেন অনর্গল। এই লেখকের নাম হুমায়ূন আহমেদ। বর্তমান সময়ের বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় কথাশিল্পী ও টিভি নাট্যকার। তাঁর পাঠক নানা বয়সের, তবে তরুণই অধিকাংশ। পাঠক সংখ্যা অনেক লেখকের জন্যই ঈর্ষণীয়। প্রকাশকরা হন্যে হয়ে ছোটেন তাঁর কাছে। তাঁর টিভি নাটক জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। '৯৩ সালে তাঁর টিভি সিরিয়াল 'কোথাও কেউ নেই' দেশব্যাপী যে তোলপাড় তোলে, তা দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিটিভি'র ইতিহাসে নাটক নিয়ে দেশ কাঁপানো এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম।

সহজ, সরল, ছোট বাক্যবিন্যাস, মানব মনস্তত্ত্বের জটিল সূক্ষ্ম দিক, মধ্যবিত্ত সমাজের হাসিকান্না, স্বপ্ন ও আবেগ দক্ষতা-নৈপুণ্যের সঙ্গে এই কথাশিল্পী ফুটিয়ে তুলতে পারেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'নন্দিত নরকে' দুর্দান্ত সাড়া জাগিয়েছিল পাঠকসমাজে। মূল্যবোধের শেকড় ধরে টান দিয়েছিল সাহসী সেই উপন্যাসটি।

স্বভাবে লাজুক হলেও সূক্ষ্ম সহজাত শিল্পিত রসবোধ তাঁর লেখার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। জটিল ব্যাপারগুলো তিনি উপস্থাপন করতে সক্ষম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবলীলায়। তাঁর ভাষা তীব্রভাবে গতিশীল, স্বচ্ছন্দ-কাহিনি, ট্রিটমেন্টও আকর্ষণীয়। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, ভ্রমণকাহিনি, রূপকথা, শিশুতোষ, কল্পবিজ্ঞান, আত্মজৈবনিক, কলাম, সাহিত্যের বহু শাখায় তাঁর বিচরণ ও সিদ্ধি।

হুমায়ূন আহমেদের জন্ম নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার শেখরবাড়িতে, মাতুলালয়ে। তারিখ ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮। বাবার ছিল বদলির চাকরি। সুতরাং ছাত্র জীবন কেটেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায়। প্রাথমিক স্কুলজীবন কেটেছে সিলেটে। বগুড়া জিলা স্কুলের ছাত্র হুমায়ূন আহমেদ এসএসসি-তে রাজশাহী বোর্ডে দ্বিতীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এইচএসসি পাস করেন স্টার মার্কসহ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন রসায়নশাস্ত্রে। অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এমএসসিতেও ফার্স্ট ক্লাস। পলিমার কেমিস্ট্রিতে পিএইচডি করেছেন আমেরিকার নর্থ ডেকোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করেছেন পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চও। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের প্রফেসর।

AMARBOI.COM

হুমায়ূন আহমেদের বাবা ফয়েজুর রহমান আহমেদ ১৯৭১ সালে ছিলেন পিরোজপুরের এসডিপিও। ১৯৭১ সালের ৫ মে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে তিনি শহীদ হন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে হুমায়ূন আহমেদ নিজেও নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। ডিসেম্বরে ঢাকা 'ফল' করার আগে তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পাক বাহিনী। তাঁর সহবন্দিদের পাক সৈন্যরা গুলি করে হত্যা করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের তদানীন্তন চেয়ারম্যান প্রফেসর খন্দকার মোকাররম হোসেনের প্রচেষ্টায় তিনি সে সময় প্রাণে বেঁচে যান। মুক্তিযুদ্ধ তাঁর লেখায় বিভিন্নভাবে এসেছে। অবধারিত মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার কাহিনি লিখেছেন। বললেন, লোকে বিশ্বাস করতে চায় না। মনে করে, গল্প। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বড় ক্যানভাসের একটি উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। পটভূমি হবে মুক্তিযুদ্ধপর্ব। বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তী বাংলাদেশ। এ নিয়ে পড়াশোনা চলছে।

হুমায়ূন আহমেদের প্রথম লেখা ছাপা হয় চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল ম্যাগাজিনে, ১৯৬৩ সালে। সেটা ছিল ছোটগল্প। লেখালেখির ভুবনে নিজে নিজেই প্রবেশ করেন, অন্য কারও কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে নয়। স্কুল-ম্যাগাজিনে লেখকের ছবি ছাপা হতো। গল্প লেখার অন্যতম কারণ ছিল সেটাও। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকার সময় ছোট বোনের নামে পূর্বতন *দৈনিক পাকিস্তানের* মহিলা পাতায় কবিতা লেখেন। কবিতাটি উপন্যাস *শঙ্খনীল কারাগার*-এ ব্যবহৃত।

হুমায়ূন আহমেদ পেয়েছেন লেখক শিবির পুরস্কার, বাংলা একাডেমী পুরস্কার, অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার, মধুসূদন সাহিত্য পুরস্কার, হুমায়ূন কাদির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মৃতি পুরস্কার, লায়লা সামাদ স্মৃতি পুরস্কার, অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার। এ ছাড়াও ছোটখাটো পুরস্কার আরও আছে।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে উপন্যাস : নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার, অচিনপুর, শ্যামল ছায়া, নির্বাসন, সৌরভ, তোমাকে, এই বসন্তে, দূরে কোথায়, এইসব দিনরাত্রি, সবাই গেছে বনে, ফেরা, ১৯৭১, কেথাও কেউ নেই, অপরাহ্ন, বহুব্রীহি; উপন্যাস সমগ্র (কয়েক খণ্ডে) হুমায়ূন আহমেদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, মন্দ্রসপ্তক, সাজঘর, আকাশ জোড়া মেঘ, ইরিনা, নিষাদ, নিশীথিনী, রজনী, দিনের শেষে, প্রথম প্রহর, নক্ষত্রের রাত, একা একা, অন্যদিন, তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে, জননী, পারাপার, নবনী, হিমু, তিথির নীল তোয়ালে, রূপালী দ্বীপ, অনিল বাগচীর একদিন, জনম জনম, অনন্ত নক্ষত্রবীথি, জল জোছনা, আমাদের শাদা বাড়ি, পাখি আমার একলা পাখি, গৌরীপুর জংশন, পোকা, নি, চাঁদের আলোয় কয়েকজন যুবক, একজন মায়াবতী, আগুনের পরশমণি, আশাবরী, সমুদ্র বিলাস, ময়ূরাক্ষী, আমার আছে জল, যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ ইত্যাদি।

ছোটগল্প : ছায়াসঙ্গী, শীত ও অন্যান্য গল্প, অয়োময়, হুমায়ূন আহমেদের শ্রেষ্ঠ গল্প, গল্পসমগ্র।

ভ্রমণকাহিনি : আমেরিকার জীবন, হোটেল গ্রেভার ইন, মে ফ্লাওয়ার; কৌতুক : এলেবেলে (দুই খণ্ডে)।

শিশু-কিশোর গ্রন্থ ও কল্পবিজ্ঞান : তোমাদের জন্য ভালোবাসা, তারা তিনজন, সূর্যের দিন, ভূত ভূতং ভূতৌ, বিপদ, নুহাশ এবং আলাদিনের আশ্চর্য চেরাগ, নীল হাতি, পুতুল, বোতল ভূত, তোমাদের জন্য রূপকথা, একি কাণ্ড! পিপলী বেগম, মজার ভূত।

মঞ্চনাটক : মহাপুরুষ, নৃপতি, অসময়, ১৯৭১, স্মৃতিচিহ্ন। তাঁর লেখা অনূদিত হয়েছে ইংরেজি ও নেপালি ভাষায়।

হুমায়ূন আহমেদের প্রিয় লেখক জন স্টেইনবেক, ফিওদর দস্তয়ভস্কি, চার্লস ডিকেন্স, টমাস হার্ডি এবং ন্যুট হামসুন। চলচ্চিত্রেও তাঁর অপার কৌতূহল এবং আগ্রহ। তাঁর উপন্যাস 'শঙ্খনীল কারাগার' ফিল্ম হয়েছে। দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। চলচ্চিত্রের কাহিনি ও সংলাপ তাঁরই। নিজে চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি 'আগুনের পরশমণি' নির্মিত হচ্ছে নুহাশ চলচ্চিত্রের ব্যানারে।

জননন্দিত কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার—

প্রশ্ন : গল্প, উপন্যাস, নাটকের মাধ্যমে আপনি মূলত কী কথা বলতে চান?
উত্তর : আমার কিছু চিন্তা-ভাবনার কথা বলতে চাই। চারপাশের মানুষদের কথা বলতে চাই। জীবনকে আমি যেভাবে দেখছি এবং দেখতে চাই, তা অন্যদের জানাতে চাই—এর বেশি কিছু না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন : লেখকের সামাজিক দায়বদ্ধতা আপনার মতে কী ?

উত্তর : সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে কোনো লেখকই মুক্ত নন। বেশিরভাগ লেখক সেই দায়িত্ব পালন করেন।

প্রশ্ন : ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলা গদ্যের কোনো বৈশিষ্ট্য আছে বলে কি আপনি মনে করেন ?

উত্তর : অবশ্যই আছে। আমাদের কথ্যরীতি পশ্চিমবঙ্গীয় রীতি থেকে আলাদা। আমাদের গদ্যও সেই কারণে অনেকখানি অন্যরকম। আমার ধারণা, আমরা নিজস্ব গদ্যরীতি তৈরি করতে যাচ্ছি।

প্রশ্ন : জনপ্রিয়তা, খ্যাতি একজন লেখকের জন্য কতটা প্রয়োজনীয় ? জনপ্রিয়তার কোনো ক্ষতিকর দিক আছে কি ?

উত্তর : জনপ্রিয়তা অনেকখানিই প্রয়োজন। লেখক পাঠকের জন্য লেখেন। শুধু নিজের আনন্দের জন্য নিশ্চয়ই লেখেন না।

জনপ্রিয়তার ক্ষতিকর দিক অবশ্যই আছে। এই মোহ এড়ানো মুশকিল। জনপ্রিয় লেখক অনেক সময় নিজের অজান্তেই জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে গিয়ে পাঠকদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেন। নতুন কিছু করতে দ্বিধাবোধ করেন। এটি জনপ্রিয়তার খুব খারাপ দিকের একটি।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের মূল সংকট কী ? এ থেকে উত্তরণ কীভাবে সম্ভব ?

উত্তর : আমার মতে, বাংলাদেশের লেখকদের গদ্য রচনায় অনাগ্রহ। নতুন গদ্য লেখক উঠে আসছেন না। বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিকরা গদ্য রচনায় নতুনদের আগ্রহী করতে পারছেন না। কাজেই সঙ্কটের দায়ভাগ অনেকটা তাঁদেরও।

AMARBOI.COM

প্রশ্ন : গল্প, উপন্যাস, নাটক—কোন মাধ্যমে আপনি সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছন্দ ? স্বাচ্ছন্দ্যের কারণটা কী ?

উত্তর : উপন্যাস এবং নাটকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। গল্প লিখতে ভয় লাগে। বারবার লিখতে হয়। তারপরও মনে হয়, যা বলতে চেয়েছিলাম বলতে পারলাম না।

প্রশ্ন : বাংলা গদ্যশিল্পের দুর্বলতা ও শক্তি হিসেবে আপনি কোন ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করেন ?

উত্তর : একাডেমিক প্রশ্ন। জবাব দিতে দ্বিধা বোধ করছি। বাংলা গদ্যশিল্পের দুর্বল দিক সম্ভবত ভাবালুতা। সবল দিক গদ্য। চমৎকার গদ্য।

প্রশ্ন : '৯০-এর সফল গণঅভ্যুত্থান আপনি লেখক হিসেবে কীভাবে মূল্যায়ন করেন ?

উত্তর : '৯০-এর গণঅভ্যুত্থান কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয় নি। পুরো সময়টা আমি ছিলাম দেশের বাইরে। বাইরে থেকে যেসব খবরাখবর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়েছি, তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। বাংলাদেশে যে ঘটনা ঘটেছে, তার গুরুত্ব চীনের তিয়েন আন মেন স্কয়ারের ঘটনার চেয়েও অনেক অনেক বেশি। তৃতীয় বিশ্বের সব দেশের জন্য আমরা একটা উদাহরণ তৈরি করেছি।

প্রশ্ন : সমসাময়িক লেখকদের কার কার লেখা আপনার ভালো লাগে ?

উত্তর : সবারই কিছু না কিছু লেখা ভালো লাগে।

প্রশ্ন : তরুণ লেখকেরা গদ্যের চেয়ে কবিতার প্রতি বেশি আকৃষ্ট। এটা কেন ঘটছে ?

উত্তর : আমি নিজে অনেক চিন্তা করেও এর কারণ বের করতে পারি নি। শ্রমবিমুখতা কি একটা কারণ হতে পারে ? হয়তো বা। গদ্য লেখা—পরিশ্রমের কাজ।

প্রশ্ন : আজকালের সাহিত্যচর্চা দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য সাময়িকী-নির্ভর হয়ে পড়েছে। সাহিত্য পত্রিকা ও লিটল ম্যাগাজিনের সংখ্যা বেশি নয়। সাহিত্যের ঈপ্সিত বিকাশ এতে ব্যাহত হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী ?

উত্তর : আপনার মন্তব্য এক শ' ভাগ ঠিক। যারা সবেমাত্র লেখালেখি শুরু করতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য সাহিত্য পত্রিকার গুরুত্ব অনেকখানি। তেমন পত্রিকা নেই, লিটল ম্যাগাজিন নেই—কোথায় লেখা ছাপা হবে ? দৈনিক পত্রিকার স্থায়িত্ব একদিন। দ্বিতীয় দিনে বাসি পত্রিকা ফেলে দেওয়া হয়, হারিয়ে যায় প্রকাশিত গল্প, কবিতা।

প্রশ্ন : আপনি যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, তার কী কারণ রয়েছে বলে আপনি মনে করেন ?

উত্তর : সহজভাবে সহজ কথা বলার চেষ্টা করি। এটা একটা কারণ হতে পারে। যা বিশ্বাস করি, তা-ই বলি। আমার আন্তরিকতা লেখায় হয়তো ধরা পড়ে। এ ছাড়া অন্য কোনো কিছু তো এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে লেখাকে জীবিকা হিসেবে নেওয়া কি সম্ভব ?

উত্তর : অবশ্যই সম্ভব। পাঠক বাড়ছে। আগের অবস্থা এখন নেই। পত্রিকাগুলোও লেখার সম্মানী বাড়িয়েছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~